হুগলীজেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ

হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ

সুধীরকুমার মিত্র

১

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৩৬৮, মার্চ ১৯৬২

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড.
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সার্কুলার রোড
হাওড়া-৪

অলংকরণ ও বর্ণলিপি
পূর্ণেন্দু পত্রী. সমীর ঘোষ.
মলয়শংকর দাশগুপ্ত

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ :
কলকাতা-৯

মুদ্রণ
স্বপ্না প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটে৻
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলকাতা-৯

গ্রন্থকারের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই:

হুগলীজেলার দেবদেউল

হুগলীজেলার ইতিহাস

দক্ষিণের দেবস্থান

দেবদেবীর কথা ও কাহিনী

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী

যুগাবতার রামকৃষ্ণ

যুগাচার্য বিবেকানন্দ

আমাদের নেতাজী

দিব্যপথের দিশারী

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল

তীর্থ সপ্তক

মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই

নয়া-বাংলা

বাঘা যতীন

বরণীয় বাঙালী

বিষয়সূচী

গবেষণামূলক গ্রন্থ বাহির হইতেছে সেগুলিতে লেখকের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় বিদ্যাবত্তার পরিচয় কমই দেখিতে পাই। আপনার বইখানি ইহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। দেশের সমস্ত জেলারই এই রকম তথ্যবহুল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচিত হওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় উৎসাহের সহিত উপাদান সংগ্রহ করিয়া সযত্নে এইরূপ একখানি স্থানীয় ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে বিরল।

—**দীনেশচন্দ্র সরকার**

সুধীরকুমার মিত্রের ত্রিরিশ বছরের গবেষণার ফল 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি আমার মতে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একশো গ্রন্থের মধ্যে নির্ধারিত হওয়ার দাবী রাখে। এ গ্রন্থ শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ভিত্তিতে সমাজ, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস রচনায় সুধীরবাবু এক মহান পথ প্রদর্শক।

—**মন্মথ রায়**

"হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" কি শুধু ভূগোল, না ইতিহাস? এ এক পরিব্যাপী গভীর বিস্তারী অনুসন্ধান। এ অনুসন্ধান শুধু তথ্যের নয়, তারিখের নয়, নয় শুধু ঘটনার বা রটনার—এ অনুসন্ধান প্রাণের, রসের মানবীয়তার পুঙ্খানুপুঙ্খ থেকে তুঙ্গাতিতুঙ্গ পর্যন্ত। এক কথায় বলা যায় এও ব্রহ্মসন্ধান। শুধু সন্ধান নয়, আবিষ্কার, শুধু আবিষ্কার নয়, প্রতিষ্ঠা। নিষ্ঠা থেকে নির্মাণ, সংগ্রহ থেকে সৃষ্টি—সুধীরকুমার মিত্র অসাধ্যসাধক। তিনি ইতিহাসকে শুধু বিজ্ঞান নয়, ইতিহাসকে তিনি সাহিত্য করে তুলেছেন। তাঁর সংবর্ধনায় স্বতঃউচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাই।

—**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**

পশ্চিম বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চল হুগলী জেলা নিয়ে সুধীরকুমার মিত্র শুরু করেছিলেন তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিক্রমা। এরই ফসল "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ"। তারপর থেকে জেলাওয়ারি যতো ইতিহাস লেখা হয়েছে তার তালিকায় সুধীরকুমারের বইটি আজও শীর্ষস্থানীয়।

—**নিশীথরঞ্জন রায়**

সুধীরকুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" বইটি পড়ে বিশ্বাস করেছি তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক। এই বইটির পিছনে যে অসাধ্য সাধনার কাহিনী রয়েছে, সেটি চট করে ভারতের কোথাও একালে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে নিয়ে স্তরবিন্যাস করা এবং তার সঙ্গে বংশ পরম্পরার মানসসংযোগেব ছবিগুলি তুলে ধরার মধ্যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব রয়েছে। বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে হুগলীর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং হুগলী যে একদা আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি

প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তার উত্থান পতনের সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গদেশ কি প্রকার সংলিপ্ত ছিল—তার আনুপূর্বিক ইতিবৃত্তকে সুন্দর ও সরল ভাষায় মিত্রমহাশয় বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কেবল শুষ্ক ঘটনাবলীর পুঞ্জীভূত তালিকা হয়ে ওঠেনি, এটিকে নিঃসংশয় সাহিত্যকীর্তি বলতে বাধে না। সেই কারণে বইটি কেবল যে অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠেছে তাই নয়, এই বইটি পাঠকমাত্রকেই একপ্রকার রসসাহিত্যের অনুভূতিতে তন্ময় করে রাখবে। তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, ইতিহাসকে তিনি রসসাহিত্য পরিণত করেছেন।

—প্রবোধকুমার সান্যাল

সাহিত্য নিবেদিত প্রাণ শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র, "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" তাঁর বিস্ময়কর কীর্তি। বিপুলায়তন গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি রোমাঞ্চক উপন্যাসের মতো অখণ্ড আগ্রহে পড়ে শেষ করেছি। বঙ্গদেশ, বাঙ্গালী জাতি, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর অতুল বৈদগ্ধ্য ও ভালোবাসার পরিচয় বইয়ের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে।

—মনোজ বসু

হুগলী জেলার ইতিহাস রচনায় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্র মহাশয়ের নিষ্ঠা ও ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের পরিচয় ইতিপূর্বেই পেয়েছিলাম প্রথম খণ্ডে, বর্তমান পুস্তকের অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ঐতিহাসিক দিক হইতে যে অভাব আজও হইয়া আছে, তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে মিত্র মহাশয় যেন অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।
হুগলী জেলার ঐতিহ্য, বাংলা তথা ভারতের পুণ্যভূমিতে তার অবদানে হয়ত কালের স্রোতে বিস্মৃতির অতল গর্ভে একদিন নিমজ্জিত হইতেও পারে, কিন্তু তাহাকে চিরজাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়া সত্যকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায় যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো পুস্তকের গোড়া বর্ধন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

—হরিহর শেঠ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ঠাকুরের অপার করুণায় **হুগলী জেলার ইতিহাস** পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় কেবল যে হুগলী জেলার অধুনা অখ্যাত কতকগুলি প্রাচীন স্থানের বিবরণ প্রকাশিত হইল তাহা নহে, পঙ্গুও যে ঠাকুরের কৃপায়, গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাও আর একবার জগৎ সমীপে প্রমাণিত হইল। ইতিহাসের ছাত্র আমি নহি; ইতিহাসকে চিরদিন বিশ হাত দূরে রাখিয়া চলিয়াছি, তথাপি হুগলী জেলার ইতিহাস আমার হাত দিয়া যিনি লিখাইলেন, তাঁহাকে সর্বাগ্রে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইতেছি।

বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার সুন্দর সুন্দর ইতিহাস বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষায় সভ্যতায় সর্বাগ্রগণ্য **'মনীষার-শ্রীক্ষেত্র' হুগলী জেলার** কোন ভাল ইতিহাস না থাকায় বহুদিন হইতেই সে অভাব আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন এই বিষয়ে কিছুই করিতে পারি নাই। তবে আমার আশা ছিল যে, হুগলী জেলার কোন মনীষী ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

১৩৫০ সালে দৌলতপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশনে প্রথিতনামা ঐতিহাসিক 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, আমি হুগলী জেলার অধিবাসী শুনিয়া, আমাকে **হুগলী জেলার ইতিহাস** রচনা করিতে তিনি সর্বপ্রথম আমায় উদ্বুদ্ধ করেন। আমার সীমাবদ্ধ বিদ্যায় উহা সম্ভব নয় জানিয়া তখন তাঁহার কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও, তিনি তথায় তিন দিন যাবত হুগলী জেলার ইতিহাস রচনার যে সকল প্রচুর উপাদান রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু আমার হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়।

বহুদিন পূর্বে স্বর্গীয় কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের আমন্ত্রণে একবার বাঁশবেড়িয়াতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তখন বংশবাটীর প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখিলেও সত্য কথা বলিতে কি আমার মনে তখন কোন রেখাপাত করে নাই। এইবার দৌলতপুর হইতে ফিরিয়া সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, ত্রিবেণী প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে যাইয়া হৃদয়ে গভীর আনন্দ অনুভব করিলাম, সঙ্গে ক্যামেরা থাকায় কয়েকখানি ছবি তুলিলাম, কিন্তু আশা যেন আর মিটিতে চায় না, দুই দিন পর পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

'কলিকাতা রিভিয়ু' পত্রে রেভারেন্ড লং সাহেব On the Banks of Bhagirathi নামক যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পুরাতন তথ্য

অবগত হইলাম এবং শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্র বাবুর নির্দেশে পাঠাগার হইতে কয়েকখানি প্রাচীন পুস্তক আনাইয়া তাহাও পাঠ করিলাম। হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী প্রাচীনতম স্থান উহাদের কতকগুলি ছবি পূর্বেই আমার তোলা ছিল; পূর্বোক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া বহু কষ্টে দুইটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিলাম। পরে সেই সচিত্র প্রবন্ধ দুইটি সাপ্তাহিক 'দেশ' ও মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করি। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া সকলেই আমাকে অনুরূপ সচিত্র প্রবন্ধ লিখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেন। চন্দননগরের প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীহরিহর শেঠ একখানি পত্রে এই বিষয়ে আমাকে লেখেন:

> "আপনার প্রবন্ধগুলি আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি এবং আমার উহা খুব ভাল লাগে। আপনি যেভাবে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছেন, যদি জেলার সকল প্রসিদ্ধ স্থানের বিষয় ঐ ভাবে লেখেন, আমার বিশ্বাস, সমষ্টিগতভাবে প্রকাশ হইলে উহা একখানি সুরচিত ইতিহাস হইবে। হুগলী জেলার এইরূপ ইতিহাসের একান্ত অভাব আছে।"

হরিহর বাবুর পত্রখানি আমায় খুবই উৎসাহিত করিল এবং ১৩৫০ সাল হইতে ১৩৫৪ সাল এই পাঁচ বৎসর প্রতি শনি ও রবিবার হুগলী জেলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যত্নবান হই এবং বলা বাহুল্য তাহাই আজ **'হুগলী জেলার ইতিহাস'** নামে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের অংশ-বিশেষ খণ্ডাকারে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বঙ্গশ্রী, প্রবর্তক, মাতৃভূমি, দেশ, কৃষক, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে যে সমস্ত প্রাচীন স্থানসমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদি দৃষ্টে লিখিত হইয়াছে এবং যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ইতিহাস বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা এতই অদ্ভুত এবং অলৌকিক কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন, যে তাহার মধ্য হইতে সত্য ঘটনাটি বাছিয়া লওয়া সুকঠিন; সেইজন্য বাধ্য হইয়া ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার অবতারণা করিয়াছি। বলাবাহুল্য যে আমার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণও উক্ত কাহিনী সত্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। উদাহারণ স্বরূপ তারকেশ্বরের রাজা বিষ্ণুদাসের জলন্ত লৌহ শাবল হস্তে ধারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হান্টার সাহেব এবং সরকারী গ্রন্থেও উক্ত কথা লিখিত আছে এবং আমাকেও ইতিহাসের অঙ্গ অক্ষত রাখিবার জন্য সেই কাহিনী লিখিতে হইয়াছে। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন:

"The tradition says as proof of his innocence, Vishnu Das held in his hands a red hot iron bar without being injured in the least."

হুগলী জেলার ইতিহাস বর্ণনা করিতে যাইয়া বহু স্থলে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আমাকে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবে আমাদের হুগলী জেলার প্রভাব যে কতখানি ছিল, তাহাতে ইহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ইংরাজ রাজত্ব পর্যন্ত হুগলী জেলার মধ্যে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক পৃথক অধ্যায়ে

লিখিয়াছি; কিন্তু এই সকল বিষয়ে লিখিবার এত উপাদান রহিয়াছে, যে প্রত্যেকের বিষয় এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিলে, তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ হুগলী জেলায় ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম বাঙ্গলা হরপ, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, প্রথম ইংরাজী-বাংলা অভিধান, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম কাগজের কল, প্রথম চটকল, প্রথম সাময়িক পত্র, প্রথম সংবাদপত্র, প্রথম বরফ কল, প্রথম হাইকোর্টের জজ, প্রথম খৃষ্টান, প্রথম রেলওয়ে প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া অসংখ্য পুস্তক রচিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস ও কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের জীবনী লিখিলেও অনেকগুলি পুস্তক হয়। আমি প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে কেবল স্থূল ঘটনা-গুলির উল্লেখ করিয়াছি; বিশদভাবে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস যাহা, হুগলী জেলার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই; তবে হুগলী জেলার সামাজিক ইতিহাস পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য এই স্থানের প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পুস্তক এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" হইতে তৎকালীন সময়ের ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই গ্রন্থে হুগলী জেলায় যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান-সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পুরাতন দলিলাদি ও সরকারী কাগজপত্র দৃষ্টে লিখিত। এইরূপ বিরাট গ্রন্থ একক কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সঙ্কলন করা কখনই সম্ভব নয় জানিয়াও, এই দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম এই আশায় যে, আমার জেলাবাসী-গণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব না। কিন্তু আজ গভীর দুঃখের সহিত এই কথা প্রকাশ করিতেছি যে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ ঔদাসীন্য আমি কখনও দেখি নাই। পত্রের জবাব দেওয়ার সৌজন্যটাটুকুও তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। বরং অর্ধশিক্ষিত ও দরিদ্র গ্রামবাসীগণ, আমি ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছি শুনিয়া, আমায় তাঁহাদের অবস্থাতীত আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত করেন, কিন্তু শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিগণের আবাসে যখনই গিয়াছি, তাঁহারা আমায় সহানুভূতি দেখানো দূরে থাকুক, এইরূপ বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়াছেন, যে বহুবার আমি ক্ষোভে, দুঃখে, ইতিহাস-সঙ্কলনের বাসনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

এই পুস্তক রচনায় ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট নানাপ্রকার উৎসাহ পাইয়াছি। তাঁহারা ভিন্ন জেলাবাসী হইয়াও হুগলী জেলার এই ইতিহাসের প্রকাশ দেখিতে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে। আজ এই দুই জন প্রবীণ সাহিত্যিকের নাম হুগলী জেলার ইতিহাসের সহিত সংযুক্ত করিয়া আমি ধন্য হইলাম। চন্দননগরের শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক; আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর তিনি আমায় যেভাবে উৎসাহিত করেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকের জন্য হুগলী জেলার গ্রন্থ,

গ্রন্থকার ও গ্রন্থাগারের সম্বন্ধে সুচিন্তিত অধ্যায়টি তিনি সংকলন করিয়া দিয়াছেন এবং তল্লিখিত চন্দননগরের সচিত্র বিবরণ এই পুস্তকে প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় কয়েকখানি প্রাচীন দলিল আমায় দেখাইয়াছেন, তাহার আলোকচিত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ফণীন্দ্রবাবুর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তকে যে সমস্ত আলোকচিত্র দিয়াছি তাহার অধিকাংশই আমার আত্মীয় শ্রীবিষ্ণুপদ কর কর্তৃক গৃহীত। কতকগুলি আলোকচিত্র আমি নিজে তুলিয়াছি এবং কতকগুলি শ্রীঅমরেশচন্দ্র বসু ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কর তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া মহানাদের শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, বড়-তাজপুরের মিঃ তরফদার, বৈদ্যবাটীর শ্রীবিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরামপুরের শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিকট হইতেও দু-একখানি করিয়া ছবি প্রাপ্ত হইয়াছি। সেইজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি ঋণী রহিলাম।

'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদক ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং 'দেশ' পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ, তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় ব্লকগুলি আমায় এই পুস্তকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীঅমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও অদ্বৈত মল্লবর্মনের আনুকূল্যে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গশ্রীর ব্লকগুলির জন্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহাদের কৃত উপকারের জন্য আমি প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই গ্রন্থ-রচনায় সহস্রাধিক গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিলেও, শম্ভুচন্দ্র দের "হুগলী পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট" অম্বিকাচরণ গুপ্তের হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস, টয়েনবি সাহেবের "এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি হুগলী ডিস্ট্রিক্ট", ক্রফোর্ড সাহেবের "হুগলী মেডিক্যাল গেজেটিয়ার", হান্টার সাহেবের "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার" ও "স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল" এবং মনোমোহন চক্রবর্তী ও ওম্যালি সাহেবের "হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার" হইতে প্রভূত সাহায্য লইয়াছি। আজ তাঁহারা জীবিত না থাকিলেও অগ্রগামী বিধায় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। ইহা ছাড়া যে সকল স্বদেশবাসী ও বিদেশী গ্রন্থকারের রচনা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার; এই গ্রন্থাগার হইতে বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পড়িবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই। এমন কি লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক মিঃ কে, এম, আসাদুল্লা আমার গবেষণার জন্য গ্রন্থাগারে একটু স্থান দিতেও কার্পণ্য করেন। তিনি এই বিষয়ে আমায় যে পত্র দেন, তাহা এই স্থানে পাঠকগণের অবগতির জন্য উল্লিখিত হইল:

॥ গ্রন্থাগারিকের পত্র ॥

No. 2347

Government of India.
IMPERIAL LIBRARY
Calcutta the 30th July 1945.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated the 21st, July 1945, asking for a seat in the Private Reading Room of the Library. As the Private Reading Room is primarily intended for systematic research scholars, I am afraid, you will not be alloted a seat there. All possible facilities will however, be given to you in the general Reading Room to consult the rare books referred to in your letter. You will please see the Superintendent of the Reading Room, in this connection, who will make the necessary arrangements for your studies there.

Sudhir Kumar Mitra, Esq.
"Mitra Cottage,"
2, Kali Lane, Calcutta.

Yours faithfully,
(Sd) K. M. Assadullah
Librarian.

বলা বাহুল্য গ্রন্থাগারিকের নির্দেশমত সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ফলই পাই নাই। আমার ন্যায় শত শত দরিদ্র গবেষক সরকারী গ্রন্থাগার হইতে কেন যে, এই প্রকারের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয়, তাহা কর্তৃপক্ষের দেখা অবশ্য কর্তব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সত্যচরণ ইনাস্টিটিউট ও অবৈতনিক পাঠাগার এবং কায়স্থ সভা গ্রন্থাগার হইতে কতকগুলি পুরাতন গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল; উহাদের কর্তৃপক্ষকে আজ ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়, হুগলী জেলা সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে, সেই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটি তালিকা আমায় পাঠাইয়া দিয়া, বিশেষ উপকার করেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ডাঃ নিশাপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও ডাঃ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার বন্ধু শ্রীপাঁচুগোপাল দাঁ (শ্রীরামপুর), শিল্পী বিষ্ণুপদ কর, শ্রীসুনীলকুমার দাস (চুঁচুড়া) এবং মান্দ্রাজবাসী মিঃ আর, ভি, নাথন সহযাত্রী হিসাবে হুগলী জেলার সর্বত্র আমার সহিত ভ্রমণ করিয়া, আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া কোথাও তাহারা আমার সহিত এক পর্ণকুটীরে সযত্নে অভ্যর্থিত হইয়াছেন, কোথাও বা ধনীর আবাসে রাত্রিতে থাকিবার স্থানটুকু পর্যন্ত না পাওয়ায় স্টেশনে গল্প করিয়া অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছেন। এইরূপ সাথী ব্যতীত আমার পক্ষে ভ্রমণ করা কখনই সম্ভব হইত না! আজ তাঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উপকরণ সংগৃহীত হইবার পর গ্রন্থ-মুদ্রণ করাকে বর্তমান সময়ে রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য বলিতে পারা যায়। এইরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব বিধায় হুগলী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং 'প্রবর্তকের' শ্রীরাধারমণ চৌধুরীর সহিত ইহার প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করি। তাহারা উভয়েই ইহা প্রকাশ করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, কিন্তু বর্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য আমার কিছুকাল ধৈর্যাবলম্বন করিতে বলেন। আমি কিন্তু দু-একটি কারণে তাহাদের কথায় সম্মত হইতে পারি নাই। আমার পূর্বে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, ১ম খণ্ড, প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহার পর আর উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। চুঁচুড়া বার্তাবহ পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শুনিয়াছি, হুগলীর একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে মুদ্রিত না হওয়ায় তিনি গতায়ু হন এবং তাহার পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত নিখোঁজ হইয়াছে। হরিহর বাবু উহা সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হয়। হুগলী জেলার ইতিহাস রচনাকারী আমার অগ্রগামী দুইজনের অবস্থার কথা শুনিয়া আমি একটু ভীত হই, এবং দেরী করিলে আমার জীবিতকালে এই গ্রন্থ-প্রকাশ হইবে কিনা, সেই বিষয়ে আমার সংশয় হয় এবং সেই জন্যই আমি সত্বর মুদ্রণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকি।

যে সময় আমি ইহা মুদ্রণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে শিশির পাবলিশিং হাউসের শ্রীশিশিরকুমার মিত্রের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি মাসিক-পত্রাদিতে আমার সচিত্র হুগলী জেলা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি দেখিয়া ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং একজন ঐতিহাসিক বলিয়া এই সকল মূল্যবান উপকরণ তিনি সত্বর মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন এবং বলা বাহুল্য যে, তিনি ভিন্ন জেলাবাসী হইলেও হুগলী জেলার ইতিহাস প্রকাশের সুব্যবস্থা না করিলে ইহা কখনই প্রকাশিত হইত না। হুগলী জেলাবাসী প্রত্যেকে তাঁহার নাম কৃতজ্ঞচিত্তে নিশ্চয়ই স্মরণ করিবেন। নিউ মদন প্রেসের শ্রীনিশাপতি সিংহরায় এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যবর্তা পুস্তকখানির মুদ্রণ ও পারিপাট্য বিষয়ে আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার কন্যা কুমারী পাপড়ী দেবী এবং পুত্র শ্রীমান পলাশকুমার মিত্র বহু পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দিয়া আমায় সহায়তা করে, তাই তাহাদিগকেও আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতেছি।

আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা যদি কাহারও বিবেচনায় অতি নগণ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তিনি যেন কাঠ-বিড়ালীর সেতু-বন্ধের বিষয় দয়া করিয়া স্মরণ করেন এবং ভারতের পূর্ণাঙ্গ ও বিরাট সৌধ নির্মাণের ইহা একটি সোপান বলিয়া মনে করেন। এই গ্রন্থমধ্যে যদি কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি কেহ দেখিতে পান, তাহা আমাকে জানাইলে ২য় সংস্করণে কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা আমি সংশোধন করিয়া দিব। আমার নিবেদনঃ

"যত দোষ ক্ষমা কর; কিছু গুণ যদি থাকে হাতে ধর;
সবারে জানাই নমস্কার—স্নেহ-প্রীতি প্রণাম আমার।"

আজ হুগলী জেলার ইতিহাস প্রকাশিত হইল বলিয়া আমি খুবই আনন্দিত। কিন্তু আমার পিতৃদেবের জন্য আমি বিশেষভাবে ব্যথিত ও শোকাক্রান্ত। তাঁহার উৎসাহেই আমার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে, এবং কলিকাতায় আজন্ম বসবাস করিলেও, তাঁহার হুগলী জেলার প্রতি গভীর অনুরাগের অংশ-বিশেষ মাত্র আমাকে বর্তাইয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর হইল তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথা স্মরণ হইলেই আমি শোকভারে ব্যথিত হইয়া যাই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তিনি পরপার হইতে আমাকে আশীর্বাদ না করিলে, এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য কখনই আমার দ্বারা সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইত না। পরিশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি কেবল এই কথাই সবিনয়ে নিবেদন করিবঃ

বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু,
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তার এক কোন।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয়-উৎসাহে
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

"বিশ্বম্ভর-ধাম"
জেজুর, হুগলী
১৫ই আগস্ট, ১৯৪৮

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
৩০ শ্রাবণ ১৩৫৫

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকবৃন্দকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। **হুগলী জেলার ইতিহাস**-এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। সংস্কৃতি-রসিক বাঙালী পাঠকের এই-আনুকূল্য বর্তমান লেখককে উৎসাহিত করেছে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছিলাম, হুগলী জেলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসঙ্গও আলোচনা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে হুগলী জেলার যোগাযোগ এতো গভীর, যার জন্য সঙ্গত কারণেই হুগলী জেলার কথা বলতে গিয়ে বাংলার কথা বহুল পরিমাণে বলতে হয়েছে। এই-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর 'দেশ' পত্রিকা বলেছিলেন, 'নামে একটি জেলার ইতিহাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা বাংলাদেশেরই ইতিহাস।'

এই-গ্রন্থে হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ইতিহাসের অনেক কিছুই আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের পটভূমিকায় হুগলী জেলার ঐতিহাসিক-মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে বাংলার কথা ও বাঙালীর রসরুচির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছি। বর্তমান সংস্করণে তাই গ্রন্থটি **'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ'** নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হল।

'মনীষার শ্রীক্ষেত্র' হুগলী জেলার মধ্যে অজস্র ঐতিহাসিক উপাদান। একক অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে যতোটা সম্ভব তা সংগ্রহ করেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে [illegible] বাসভবনে আশ্রয় নিয়েছি। এবং তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা, অনহংকারী ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। আপন জেলা তথা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি এঁদের শ্রদ্ধাশীল অনুরাগ আমাকে বিস্মিত করেছে। এঁদের সকলকে আমার নমস্কার।

হুগলী জেলার কাছে বাংলা তথা ভারতের ঋণের শেষ নেই। বাংলা হরপ মুদ্রাযন্ত্র, মুদ্রিত পুস্তক, [illegible]বিদ্যালয়, ইংরেজি-বাংলা অভিধান, সংবাদপত্র, বরফ কল, সাময়িক পত্র, কাগজের কল, চটকল, রেলওয়ে প্রভৃতির আবির্ভাব ভারতবর্ষের মধ্যে হুগলী জেলাতেই প্রথম। সমাজসংস্কার ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়। এই সমস্ত পুণ্যকীর্তি মহাপুরুষদের কথা যখন আলোচনা করেছি তখন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ বৃন্দাবন দাসঠাকুরের মতো আমারও সেই আক্ষেপ সেই আর্তি।

"হইলুঁ পাপিষ্ঠ—জন্ম না হইল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার মূল্য অপরিসীম।

রামমোহন-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বারবার মনে পড়েছে প্রমথ চৌধুরীর অবিস্মরণীয় উক্তি : 'রামমোহন রায়ের মনে বাঙালি জাতি ইচ্ছা করলে তার নিজের মনের ছবি দেখতে পারে। বাঙালি জাতির মনে যে-সকল শক্তি প্রচ্ছন্ন ও বিক্ষিপ্ত ছিল, রামমোহন রায়ের অন্তরে সেইসকল শক্তি সংহত ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ কথাটা আজ স্বজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ বাঙালি যদি তার স্বধর্ম হারায় তাতে যে শুধু বাংলার ক্ষতি, তাই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। আমরা যদি আমাদের মনের প্রদীপ জোর করে নেবাতে চেষ্টা করি, তাহলে যে ধুমের সৃষ্টি হবে তাতে সমস্ত ভারতবর্ষের মনের রাজ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে। একদল আত্মহারা বাঙালি আজকের দিনে স্বধর্ম বর্জন করতে উদ্যত হয়েছেন বলে রামমোহন রায়ের আত্মাকে স্বজাতির সুমুখে খাড়া করা অবশ্যকর্তব্য ব'লে মনে করি।'

বাঙালি-সংস্কৃতির মহত্তম প্রকাশ বাংলার গৌরবদীপ্ত সাহিত্যে। হুগলীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রঙ্গলাল-বিহারীলাল চক্রবর্তী-টেকচাঁদ ঠাকুর-ভূদেব-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-কালীপ্রসন্ন সিংহ-গিরিশচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-প্রমুখ সাহিত্য স্রষ্টার বাণীচর্চা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বর্তমানেও বিভিন্ন প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিকবৃন্দ বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করছেন। এককথায়, বাংলার ধর্মনীতিক, সামাজিক, [illegible] প্রভৃতি উচ্চতর সংস্কৃতি-চেতনার উন্মোধনে হুগলী জেলার দান অনেকখানি। এ-ছাড়াও অগণিত গ্রাম, জনপদ ও বিচিত্র ঐতিহাসিক উপাদান হুগলী জেলার বক্ষে আশ্রিত। এ-সম্পর্কে নানান ইতিহাস। নানান কাহিনী। নানান তথ্য। অনেক তথ্য সব ক্ষেত্রেই যে অতথ্য তা নয়, তবে সত্যের অপলাপী। এ-ব্যাপারে যতোটা প্রামাণ্য ঘটনা বিধৃত করার প্রয়াস পেয়েছি। অনেক সময় প্রচলিত মতের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিয়েছে। সর্বসামর্থ্য প্রয়োগ করে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি।

পুণ্যকীর্তি পুরুষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে সম্মান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না। হরপ্রসাদ জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে পেরেছিলেন।' বর্তমান গ্রন্থ রচনার সময় আমাকে এই-উপাদান শোধনের ব্যাপারে সতত সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই-শোধন সমস্যাই ইতিহাসের মূল সমস্যা। উপাদান সংগ্রহ, শোধন এবং উপস্থাপন—এগুলি যথোচিত শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গেই করেছি। এ-গ্রন্থের মতামত বা আলোচনা সকলেরই যে মনঃপূত হবে সে-আশা আমি করি না। পাঠক নির্বিবাদে আমার মতামত বা সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করুন এ-জাতীয় আদিম দুর্বলতা আমার নেই। আবার অন্যের সিদ্ধান্তকে (তা সে বহু প্রচলিত হোক) নির্বিচারে গ্রহণ করতেও আমার তেমনি সমান আপত্তি। এই সমস্ত প্রশ্নে যাঁদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটেছে, তাঁরা যদি ক্ষুন্ন হন, আমি নিরুপায়।

উদাহরণত নিবেদন করি বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রিত-গদ্য পুস্তকটির নাম। এতোদিন আমরা জ্ঞাত ছিলাম, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটিই প্রথম মুদ্রিত-পুস্তক। স্বনামসিদ্ধ অনেক ঐতিহাসিক-সমালোচক তা স্বীকার করেছেন এবং করছেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের জন্য গ্রাম-পরিক্রমাকালে শ্রীরামপুরে 'ধর্মপুস্তক' নামে এমন একটি গ্রন্থের দর্শন লাভ করি, যাকে বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রিত-গদ্য পুস্তক বলে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মায়। এই-সম্পর্কে ১৩৫৩ সালের ১৮ শ্রাবণের 'দেশ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখি। আজ ১৩৬৮ সাল। এই দীর্ঘ পনের বছরের মধ্যে বর্তমান লেখকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোনো উচ্চকিত স্বর শোনা যায় নি। বরং বর্তমান লেখকের সিদ্ধান্তের স্বচ্ছ সরলতার প্রতি অকপট সমর্থন জানিয়েছেন অনেকেই। প্রচলিত মতের সহজ পুনরুক্তি না করে যে-সমস্ত লেখক ঐতিহাসিক সমালোচক এবং পত্র-পত্রিকা বর্তমান লেখকের সিদ্ধান্তের প্রতি সুবিচার করেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সচিত্র বিবরণ ৪৭১—৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আরো একটি বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তের প্রতি বিদগ্ধ-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এটি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জাহানাবাদে বসবাস প্রসঙ্গে। এ-কথা আমাদের অজানা নয় যে, জাহানাবাদে মহাকুমা-শাসকরূপে কাজ করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তথাকার পৌর সংস্থার সভাপতির পদও অলংকৃত করেছিলেন। আদালতের মধ্যে যে-গৃহে তিনি বাস করতেন সেখানে একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছেঃ

Mandaran Fort is the scene of the story
"Durgesa Nandini"
By
BANKIM CHANDRA CHATTERJI
Who was Sub-Divisional Officer of Jahanabad (Arambagh)
about 1892.

এটা লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীগুলিতে জাহানাবাদে অবস্থিতির কোনো কথাই নেই। সঙ্গতকারণেই এ-সম্পর্কে দ্বিধা দেখা দিয়েছে। এই জটিলতাজনিত দুর্বোধ্যতা এবং তর্ককন্টকিত বিষয়টি যাতে সত্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়, সেই-আশায় আনন্দবাজার পত্রিকায় [২ আগস্ট ১৯৫৮] যে-আলোচনা করি এখানে তার অংশবিশেষ নিবেদন করিঃ

"...বঙ্কিমচন্দ্রের যতগুলি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, কোথাও তিনি যে জাহানাবাদে ছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। উহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্যের একটি তালিকা তাঁহার [illegible] শুরু হইতে (৭ আগস্ট ১৮৫৮) অবসর গ্রহণ (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১) পর্যন্ত লিখিত আছে (পৃষ্ঠা ২৭-৩২)। উহা হইতেও তিনি যে কখনও জাহানাবাদে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। বঙ্কিম জীবনী, বঙ্কিম প্রসঙ্গ বা বঙ্কিমচন্দ্র নামক গ্রন্থগুলিতেও জাহানাবাদের উল্লেখ নাই। কিন্তু পদাধিকারবলে বঙ্কিমচন্দ্র জাহানাবাদ পৌরসভার সভাপতি ছিলেন ইহা আরামবাগের কথা নামক পুস্তকে লিখিত আছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

"হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার" নামক পুস্তকে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধারযোগ্য:

This fort is the scene of the story "Durgesa Nandini" by the celebrated Bengali novelist, Bankim Chandra Chatterjee who wa Sub-divisional Officer of Jahanabad about 20 years ago."

কিন্তু আজও এ-সম্পর্কে কেউ কোনো-কথা উচ্চারণ করলেন না। তাহলে কি ধরে নেব, বঙ্কিমচন্দ্রের মাননীয় জীবনী-রচয়িতারা জাহানাবাদ-প্রসঙ্গ জ্ঞাত নন! দ্বিতীয় খণ্ডে এ-সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

রসিক-পাঠকের জানা আছে অনুমান করি, বিবেকানন্দ প্রমুখ নয় জন সংসার-ত্যাগেচ্ছুক অপরূপহৃদয় যুবক আঁটপুরে [২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬] বাবুরাম ঘোষের গৃহের উঠানে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। এই-গৃহের সামনে বর্তমানে একটি ফলক লাগানো আছে। এবং তাতে এই নয় জনের নামোল্লেখ আছে। লক্ষ্য করার বিষয়, এই-ফলকে 'সারদাচরণ মিত্র' নামে যাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে [যিনি পরবর্তীকালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নামে খ্যাত হন] আসলে তিনি 'সারদাচরণ' নন। তিনি সারদাপ্রসন্ন মিত্র। মধ্যের এই উপসর্গটির ভুলের জন্য দূরে এবং অদূরে ভবিষ্যতে যে-সংশয়ের কুয়াশা দেখা দেবে, এখন থেকেই সে-সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার বলে মনে করি।

এইরকম বিভিন্ন তথ্য বা অতথ্যের কুণ্ডলী অনেক সময়ে আমাকে বিহ্বল করেছে। বহু-দিনের বহুপ্রচলিত এই-সমস্ত ঘটনা এবং রটনাকে প্রত্যয়ের নতুন চশমা দিয়ে যখন দেখেছি, তখন বিস্মিত হয়েছি এই ভেবে যে, লেখার পিছনে তো থাকে দেখা, তবে কি এই-সব লেখা শুধু লেখা-ই! দেখা এখানে অনুপস্থিত! অথচ 'লেখার পেছনে যেমন দেখা থাকে, দেখার পেছনেও তেমনি লেখা।' তবে?

এই 'তবে'-র সমাধান করতে অনেক সময় ভয় পেয়েছি। কারণ, অভিজ্ঞতা-চোয়ানো-নির্যাস আমার মধ্যে আছে বললে সত্যভাষণ হয় কিনা সন্দেহ। অবশ্য, একজন সুধী সাহিত্যিকের কথায় 'অভিজ্ঞতা যে প্রত্যক্ষই হ'তে হবে এমন কোন কথা বোধহয় নেই। যাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলি তাও আমাদের মনের চোখে ধারণা ও প্রত্যয়ের—যে চশমা পরানো থাকে তার মধ্য দিয়েই দেখা। আর ধারণা প্রত্যয়ের এই চশমা আমাদের নিজেদের উদ্ভাবিত ও নির্মিত বেশিরভাগই নয়। এ চশমা যা শুনি বা পড়ি তা থেকেই অনেকখানি পাওয়া।'

এবারে ঋণ স্বীকারের পালা।

এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা। মূল্যবান সুখপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়ে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের জন্য এ'রা আর্থিক সাহায্য করেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি সরকারের এই আনুকূল্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

যিনি আমাকে এই দুরূহ কার্যে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন। বর্তমান গ্রন্থটি যে রাষ্ট্রীয়-সাহায্যের উপযোগী এই-সম্পর্কে তিনিই প্রথম ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতো বিদগ্ধ এবং সংস্কৃতি-নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেই এই-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সার্থকতা

হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অপেক্ষা না রেখেই তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করে বর্তমান লেখক এবং হুগলী জেলাবাসীদের ঋণী করে রাখলেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহায্য-সহযোগিতার কথা স-শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। হুগলী জেলা সম্পর্কে এঁর আন্তরিকতা বলার অপেক্ষা রাখে না। হুগলী জেলার উন্নতির পিছনে এঁর আপ্রাণ চেষ্টা হুগলী জেলাবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। হুগলী জেলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জেলার ইতিহাসকেও তিনি ভোলেন নি। তাই বর্তমান লেখককে ইনি নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এই সদালাপী অনহংকারী মানুষটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক আজ হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড়তা সকল আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে। 'প্রফুল্লদা'র প্রতি ঋণ স্বীকারের দায়িত্বকেও তাই অস্বীকার করব।

শ্রীহুমায়ুন কবীর ও শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়দ্বয়কেও এ-প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বর্তমান গ্রন্থের প্রতি তাঁদের প্রীতি ও আনুকূল্য ভোলবার নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। এঁদেরও সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আনন্দবাজার পত্রিকা ও 'দেশ'-এর সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীঅশোককুমার সরকার, 'যুগান্তরে'র বার্তা-সম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীরামপুর কলেজ কাউন্সিলের প্রচার বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী উইলমা ষ্টুয়ার্ট, শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ প্রীতিকুমার ঘোষ ও শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্লক প্রভৃতির ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন।

ডক্টর সুশীলকুমার দে, অধ্যক্ষ জীতেশচন্দ্র গুহ ও ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করে অনুগৃহীত করেছেন। কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীর সমস্ত থানার অধুনা দুষ্প্রাপ্য সার্ভে ম্যাপগুলি দেখবার সুযোগ দেন। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের শ্রীরমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীভীমধ্বজ শাহী ও শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় বহুভাবে সহায়তা করেছেন। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে অনেক মূল্যবান জিনিষ নকল করে দিয়ে শ্রীরমা দেবী আমায় সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া হরিশনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ধনিয়াখালি মহামায়া বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক শ্রীকানাইলাল দত্ত বহু গ্রামে আমার সঙ্গে পরিভ্রমণ করে আমার পথকষ্ট লাঘব করেছেন। এঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। লোক-সেবক প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসুধীরকুমার রায় মুদ্রণ-সংক্রান্ত কাজে ও শিল্পী শ্রীগৌর সুর এবং শ্রীঅশেষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির ব্যাপারে সহায়তা করেছেন।

আমার পুত্র তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান পলাশ মিত্র এবং তরুণ শিল্পী শ্রীমান অমল বিশ্বাস নানাভাবে সহায়তা করেছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর নানান মূল্যবান নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে অনেকেই প্রকৃত সাহিত্য-রসিকের কাজ করেছেন। প্রথম সংস্করণের অপূর্ণতা বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করার প্রয়াস পেয়েছি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করেছে। বর্তমান সংস্করণের যা-কিছু উন্নতি, তার মূলে রয়েছে এঁদের সকলের সহায়তা। ত্রুটির সব-কিছুর জন্য দায়ী কিন্তু আমার অক্ষমতা।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। এই-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত

হবার পর কেউ কেউ নিরুদ্বেগে তা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে নানান রচনা লিখে ঋণ স্বীকারের দায় বা দায়িত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার এই যে, যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং পদ্ধতির অনুসরণ করে আমার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে যে-বিচ্যুতি ছিল, এই সমস্ত লেখকবৃন্দ তাঁদের মৌলিক গবেষণাতেও সেইসব ভুলগুলি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বর্তমান সংস্করণে আমি আগের ভুলগুলি সংশোধন করেছি। তাঁরাও যদি সেই ভুলগুলি সংশোধন করে দেন তা'হলে ইতিহাসের শরীর অক্ষত থাকে।

পাঠকের সুবিধার জন্য সূচীপত্র বিস্তারিত করা হয়েছে। অনেকগুলি আর্টপ্লেট ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থের বেশিরভাগ আলোকচিত্র বর্তমান লেখকের তোলা। অ্যামেচরের অপটুতা এর মধ্যে থাকতে পারে। কিছু আলোকচিত্রের জন্য আমাকে পরনির্ভর হতে হয়েছে। কয়েকজন ছবি পাঠিয়েছেন। বেশিরভাগই 'দোব দোব' করে একবছর কাটিয়ে দিলেন। এঁরা ব্যস্ত মানুষ। তাই নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের ছবি পাঠাবার সময় পান নি।

বর্তমান সংস্করণটি নানাদিক থেকে পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হল। অনেক নতুন অধ্যায় এবারে সংযোজিত হয়েছে। শেষখণ্ডে বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দেওয়া হল।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় যাঁরা নিরত উৎসাহ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের স্নেহ-স্নিগ্ধ নির্দেশ-উপদেশ এবারে আর পাবার সৌভাগ্য হল না। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের এই মুহূর্তে সেইসব প্রিয়জনদের অভাব বারবার বোধ হচ্ছে। মনে পড়ছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর এই নগণ্য লেখককে যিনি বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মনে পড়ছে প্রবর্তক সংঘ-গুরু মতিলাল রায়ের কথা। হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলনে [৩১ আষাঢ়, ১৩৫৭] বর্তমান লেখককে যিনি 'নব-জাতীয়তার পুরোহিত' বলে ধন্য করেছেন। আর মনে পড়ছে সাংবাদিক-কুলচক্রবর্তী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কথা। মাত্র কয়েকদিন আগেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যিনি বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা লিখে দেবেন বলেছিলেন। অগ্রজ-তুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তিভাজন এইসব প্রিয়জনদের কাছে মনে মনে ঋণী হয়ে থাকতে পারার তৃপ্তি ও আনন্দ অপরিসীম। দুর্ভাগ্যহতচিত্তে এঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

আগেই উল্লেখ করেছি, হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করে বাংলার ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতির কথা বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি, 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র' হুগলী জেলা ও মহান বঙ্গসমাজের কথা আলোচনার জন্য যে-পরিমাণ বল ও পাথেয়-সম্পদের প্রয়োজন, তা আমার নেই। শুধুমাত্র ইতিহাস ও দেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির বশেই এই সারস্বত প্রাঙ্গণে প্রবেশের চেষ্টা করেছি। হুগলী জেলার ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে যে-বৈচিত্র্য, যে-বিস্ময়, যে-বৈশিষ্ট্য আমি দেখেছি, তা-ই অকপটে বলেছি এই-গ্রন্থে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে। এই-তৃপ্তিই আমার সানন্দপ্রসাদ।

বিশ্বম্ভর ধাম
জেজুর ॥ হুগলী
২১ মার্চ ১৯৬২ ॥ ৭ চৈত্র ১৩৬৮

আমার মা রাধারাণী দেবী, বাবা আশুতোষ মিত্রের

স্মৃতির উদ্দেশে

হুগলী জেলা

মাইল

০ ৫ ১০

সদর ◙ , মহকুমা ■

থানা ●

রেলপথ ▬ ▬ , পথ ═══
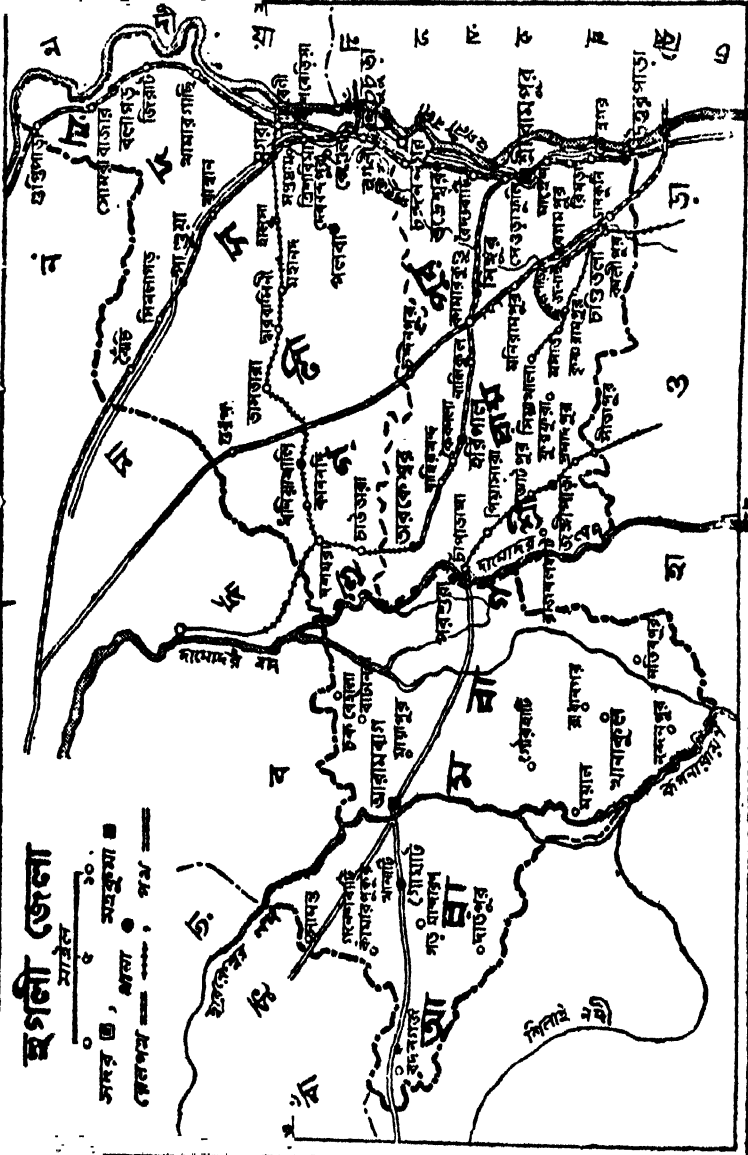
হুগলী জেলার মানচিত্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
(কামারপুকুর শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মর্মরমূর্তি)

উইলিয়াম কেরী

উইলিয়াম ওয়ার্ড

জশুয়া মার্শম্যান

স্যার চার্লস উইলকিন্স
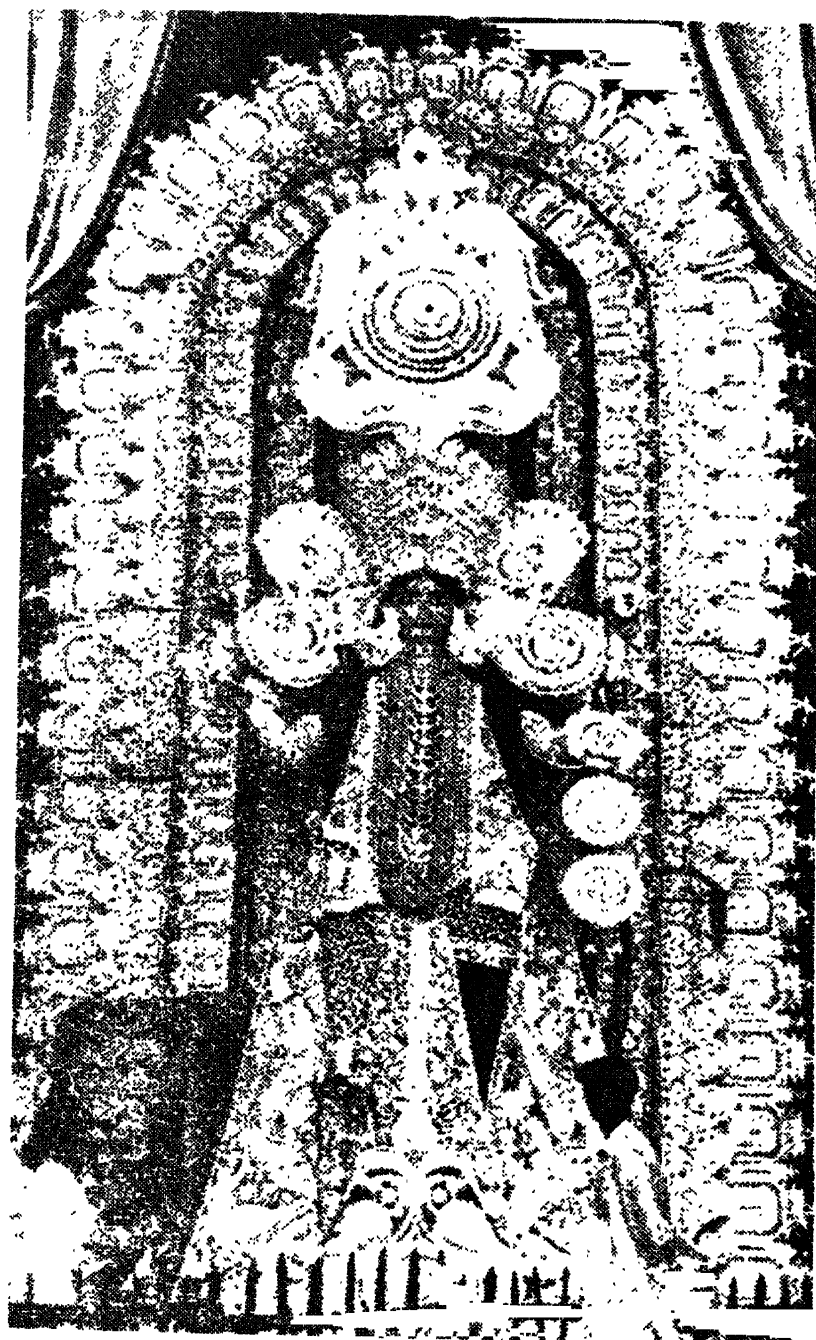
চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী
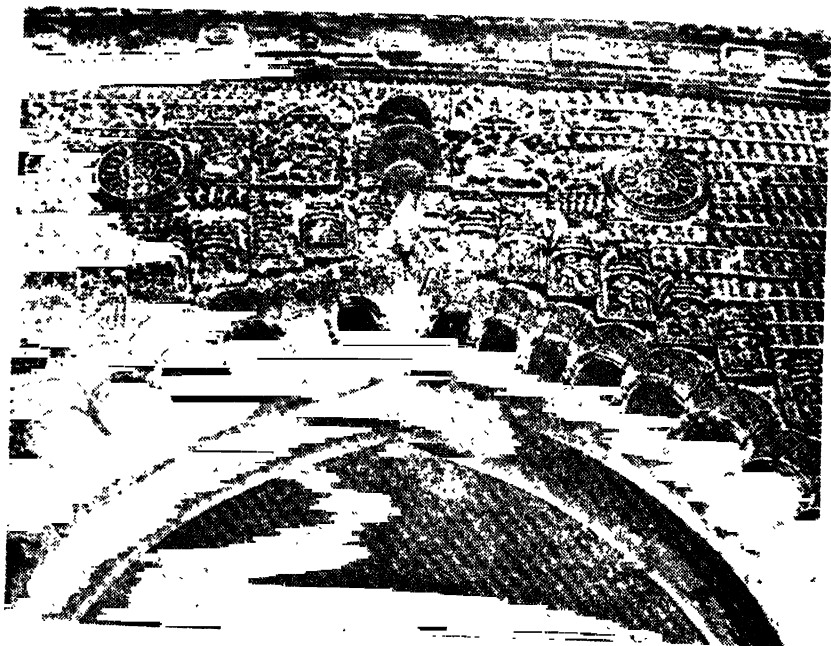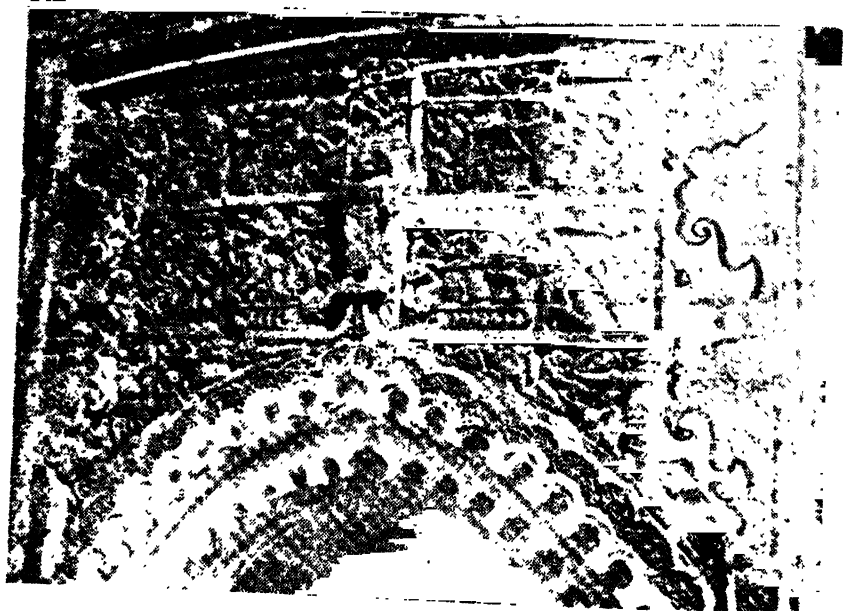
যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়

রামমোহনের হস্তাক্ষর

অরবিন্দ ঘোষ

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
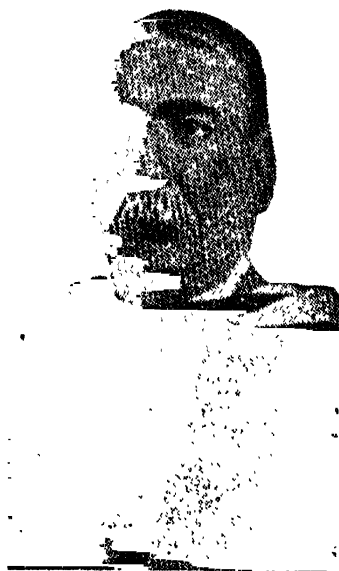
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
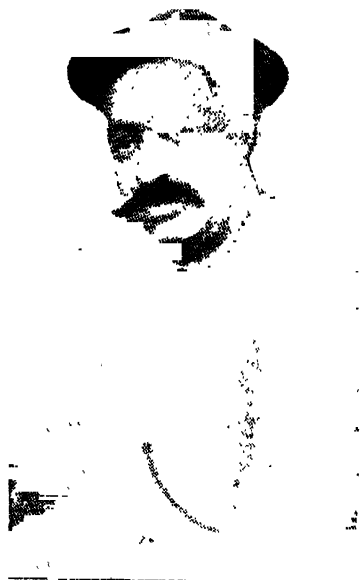
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক

হাজী মহম্মদ মহসীন

রাজা দিগম্বর মিত্র
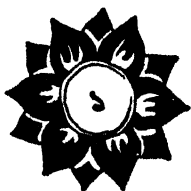
অতি প্রাচীনকালে আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে আর্যাবর্তে বাস করিয়াছিলেন উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে সিন্ধুসঙ্গম পর্যন্ত এবং পূর্বে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইতে পশ্চিমে সুলেমান পর্বত পর্যন্ত ভূমিখণ্ড তৎকালে আর্যাবর্ত নামে অভিহিত হইত। এই স্থান পূর্বে অনার্যদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল; কিন্তু আর্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার পর,—তাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া, এই স্থানের প্রাচীন অধিবাসী অনার্য-গণ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আর্যগণ প্রথমে যে স্থানে বসবাস করিলেন, তাহার বহির্ভূত অন্যান্য স্থানগুলিকে তাঁহারা নিষিদ্ধ ও পাপজনক বলিয়া মনে করিতেন।

বাঙ্গলাদেশ অতীতকালে সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, পরে মহাসমুদ্র দক্ষিণাভিমুখী হওয়ায় এই ভূমিখণ্ড সাগর হইতে উত্থিত হয়; ক্রমশঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিতে পুষ্ট হইয়া আধুনিক বাঙ্গলাদেশের কিয়দংশের পত্তন হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই বাঙ্গলাদেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে। আর্যাবর্তের উত্তর-সীমান্তে হিমালয়ের পাদমূলে ও পার্বত্য উপত্যকাসমূহে, আদিম মানবের বসবাসের কোন চিহ্ন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত মিঃ ভি, বল হুগলী জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামের এগার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কুণকুণে নামক গ্রামে প্রত্ন-প্রস্তরযুগের একটি হরিতাভ প্রস্তর নির্মিত কুঠারফলক (celt) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের ফলে হুগলী জেলায় আদিম কালে যে মানবের বসবাস ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ বয়সে নবীন হইলেও, হুগলী জেলায় প্রত্ন-প্রস্তরযুগের এই অস্ত্র আবিস্কৃত হওয়ায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিঃ জে, কগিন ব্রাউন অনুমান করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব পনের লক্ষ বৎসর পূর্বে ইউরোপে ও বাংলায় প্রত্ন-প্রস্তরযুগ একই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা নূতন দেশ নহে। যখন আর্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে পাঞ্জাবে উপনীত হন, তখনও বাঙ্গলা সভ্য ছিল। আর্যগণ যখন আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া এলাহাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যে কেহ মন দিয়া বাঙ্গলার কথা ভাবিয়াছে, বাঙ্গালীকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই বলিতে হইবে বাঙ্গলা একটি অতিপ্রাচীন সভ্যদেশ। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজের একটি ত্যাজ্যপুত্র শত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহলদ্বীপ কোথাও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লংকা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুদূর অতীতে সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন ছিল; পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয় পর্যন্ত তখন সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। কালক্রমে পৃথিবীর জল কমিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে উদ্ভিদ, তারপর বর্তমান সময়ের কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জীবের ক্রমশঃ ক্রমশঃ আবির্ভাব হয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সকল জীবের মধ্যে মানুষের আবির্ভাব হয় সর্ব শেষে। সেও যে কোন্ যুগে কত কোটি বৎসর পূর্বে, তাহা আজও জগতে অজ্ঞাত রহিয়াছে

ভূপৃষ্ঠে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন আদিম মানবের ব্যবহৃত বিভিন্ন তীক্ষ্ণধার পাষাণ খণ্ডের আবিষ্কারের ফলে সম্ভব হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম—প্রস্তর যুগ। দ্বিতীয়—তাম্রের যুগ। তৃতীয় লৌহের যুগ।

মানব জাতির শৈশবাবস্থায় আদিম মানবগণ প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন; কারণ তাহারা ধাতুর ব্যবহার তখন জানিতেন না। মানবজীবনের প্রারম্ভে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ নিরামিষাশী ছিলেন। পরবর্তীকালে ধাতু আবিস্কৃত হইলে আদিমমানব প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ধাতু নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে, বিভিন্ন সময়ে, মানবজাতির এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। আজও পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে, যাহারা এখনও ধাতুর ব্যবহার জানে না।

'বঙ্গ' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ সর্বপ্রথম ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।৩) দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যয় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যান্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥"

অর্থাৎ বঙ্গদেশ, মগধ এবং চের জনপদবাসিগণ—এই ত্রিবিধ প্রজাই, কি দুর্বলতা,

কি দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবত সদৃশ। বঙ্গজাতি অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া আর্যগণ ঈর্যাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন।

বর্তমান বাঙ্গলাদেশ পূর্বে 'বঙ্গ' ও 'রাঢ়' নামে অভিহিত হইত; জাতিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পন্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যাযাবর 'বঙ্গ' ও 'রাঢ়' নামক অনার্য জাতিদের নাম হইতেই দেশবাচক বঙ্গ ও রাঢ়/নামের উৎপত্তি হইয়াছে; প্রাচীনকালে বঙ্গ বলিলে কেবল পূর্ব-বঙ্গকে বুঝাইত; ইহার কারণ উক্ত যাযাবর বঙ্গ নামক জাতি আর্যদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া, হটিতে হটিতে ক্রমশঃ পূর্বদিকে যাইয়া বসবাস করেন। বঙ্গ জাতির ন্যায় রাঢ় নামক যাযাবর অনার্যজাতিও হটিতে হটিতে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করেন এবং সেইজন্য তাহাদের নামানুসারে পশ্চিম বঙ্গের নাম 'রাঢ়' হইয়াছিল।

'আইন-ই-আকবরী' প্রণেতা আবুল ফজল লিখিয়াছেনঃ

> "বাঙ্গলা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র; পুরাকালে এতদ্ অঞ্চলের রাজন্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশগজ ঊর্ধ ও বিশগজ আয়ত এক একটি 'আল' অর্থাৎ মৃত্তিকা-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ+আল এই দুই শব্দের যোগে বঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

'রাঢ়' শব্দ সংস্কৃত 'রাষ্ট্র' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে মতপ্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, রাঢ় শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' নামক একটি শব্দ আছে, এবং তাহার অর্থ নদী-গর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরিয়া জমি। এই সাঁওতালী বা দেশ্য শব্দ হইতে 'রাঢ়' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ১

বঙ্গ ও রাঢ় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুপ্রকারের মত প্রচলিত আছে; অদ্যাবধি এই আলোচনার কোন মীমাংসা হয় নাই বলিয়া, অন্যান্য মতামতগুলি উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। ত্রয়োবিংশ শতাব্দী হইতে বঙ্গ ও রাঢ় অর্থাৎ সমগ্র বাঙ্গলা দেশ 'বাঙ্গলা' নামে পরিচিত হইতে থাকে এবং মুসলমান রাজত্বকালে এই স্থান বাঙ্গলা নামে আখ্যাত হয়। ২

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মাগধী ভাষায় রচিত জৈনদিগের 'আচারাঙ্গ-সূত্রে' রাঢ় শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তীর্থঙ্কর বর্ধমান স্বামী ওরফে মহাবীর স্বামী রাঢ় দেশে দ্বাদশবর্ষ যাপন করিয়া বন্যজাতির মধ্যেও ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে 'লার' নামে, নবম শতাব্দীতে ধর্মপালের সংস্কৃত তাম্র শাসনে 'লাট' নামে এবং একাদশ শতাব্দীতে তামিল গ্রন্থভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোলের শৈললিপিতে 'লাঢ়' নামে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাঢ় নামে অভিহিত হইবার পূর্বে ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত ভূমিখন্ড 'সুহ্ম' নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে "সুহ্মা-রাঢ়া" অর্থাৎ সুহ্মই রাঢ় দেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশ অর্থাৎ যে স্থানে ভাগীরথী দক্ষিণ-মুখী হইয়াছেন—সেই স্থান হইতে বর্তমান হাওড়া জেলা পর্যন্ত সমুদয় পশ্চিমাংশ 'সুহ্ম' বা রাঢ়' নামে প্রখ্যাত ছিল।

রাঢ়দেশ
পদ্মা
কর্ণসুবর্ণ রাজ্য
বীরভূম
অজয় নদ
বর্দ্ধমান
দামোদর
সপ্তগ্রাম
রূপনারায়ণ
বিষ্ণুপুর
মন্দার রাজ্য
তাম্রলিপ্ত রাজ্য
সুবর্ণরেখা

রামায়ণ এবং মহাভারতে বঙ্গ ও সুহ্ম নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকির রামায়ণ খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে রচিত হইয়াছিল; ইহাতে বঙ্গ ও সুহ্মের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বঙ্গ ও সুহ্মকে ছোট জাতি বলিয়া মনে হয় না। কারণ ছোট জাতি হইলে বিদেহ, মলয় কাশী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির সহিত সুহ্ম ও বঙ্গের নাম কখনই উল্লিখিত হইত না। নিম্নে রামায়ণের শ্লোকটি উদ্ধৃত হইলঃ

"সুহ্মান মাল্যান বিদেহাংশ্চ মলয়ান কাশীকোশলান।
মগধান দন্ড-কুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈচ॥"

কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড, ৪০ অঃ ২৫ শ্লোক॥

মহাভারতের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং ইহার আদি, সভা, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রত্যেক পর্বেই বঙ্গ ও সুহ্মের উল্লেখ আছে। হরিবংশে ৩১ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে।

দৈত্যরাজ বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র এবং সুহ্ম নামে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের নামানুসারে পরবর্তীকালে অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, পুন্ড্রদেশ কলিঙ্গদেশ ও সুহ্মদেশ এই পাঁচটি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুন্ড্রঃ সুহ্মঃশ্চ তে সুতাঃ
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।"

মহাভারত, আদি পর্ব ১০৪।৫০

হুগলী জেলার খানাকুল নিবাসী প্রসিদ্ধ পন্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় দীর্ঘতমা-ঋষি খৃষ্ট-পূর্ব ১৬৯০ অব্দে বর্তমান ছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মহাভারত ব্যতীত বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, মার্কেন্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে উক্ত পাঁচটি রাজ্যের নাম একত্রে দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ উক্ত জনপদগুলির যে সীমা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্তমান রাজসাহী ও ভাগলপুর বিভাগের সন্নিহিত স্থান, প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উত্তরে ভাগীরথী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গের পূর্ব প্রদেশটি বঙ্গ-রাজ্য নামে প্রখ্যাত ছিল। কানিংহাম, উইলসন প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্তমান রাজসাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিমদিকের ভূমি-খন্ড অর্থাৎ অঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণাংশ পরবর্তীকালে পুন্ড্র রাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং কলিঙ্গ রাজ্যের উত্তর পূর্বাংশ লইয়া সুহ্মরাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে আধুনিক বাঙ্গালাদেশের সীমা কিরূপ নির্দিষ্ট ছিল, তাহা বর্তমানে সঠিক নির্ণয় করা অতীব দুরূহ কার্য বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না; তবে এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়াছে এবং উক্ত আলোচনা হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বর্তমান হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলাগুলি প্রাচীনকালে সুহ্মরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সুহ্মদেশের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ভিন্ন সুদূর অতীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস

পাওয়া না যাইলেও, খৃষ্টজন্মের বহু বৎসর পূর্বেও এই স্থানে যে আর্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। খৃষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য সমগ্র বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) তখন বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমা ছিল এবং সুহ্মদেশ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নন্দবংশীয় রাজাগণও বা অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ বঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব তিনশত ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাহার নিকট 'প্রাসি' এবং 'গঙ্গরিডয়' এই দুইটি রাজ্যের সংবাদ আসিয়াছিল। ইহার পর গ্রীকদূত মেগাস্থিনাস্ পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আসিয়াছিলেন।

তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী 'প্রাসি' অর্থাৎ মগধ এবং উহার পূর্বদিকে স্বাধীন 'গঙ্গরিডয়' রাজ্যের কথা ও উহার রাজধানী 'গাঙ্গি'র কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডিওডোরস্, মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, গঙ্গানদী 'গঙ্গরিডয়' দেশের পূর্ব সীমা অতিক্রম করিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে।

গঙ্গরিডয় রাজ্য হইতেছে বঙ্গদেশ এবং ইহার রাজধানী 'গাঙ্গী' হইতেছে সপ্তগ্রাম, ঐতিহাসিক টলেমী তৎকালে গঙ্গাতীরে ইহাই একমাত্র বাণিজ্য-প্রধান স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গঙ্গরিডয় বা বঙ্গদেশের রাজার অধীনে বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দুইলক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই সহস্র যুদ্ধযান এবং চারিসহস্র বৃহদাকার রণহস্তিসমূহ ছিল। সেইজন্য তাহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীর দ্বারা অধিকৃত হয় নাই। কারণ অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ দুর্জয় রণ-হস্তী দিগকে ভীষণ ভয় করিত। ৫ নিম্নে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল ঃ

Thus Alexander, the Macedonian, after conquering all Asia did not make war upon the Gangaridai, as he did on all others, for when he had arrived with all his troops at the river Ganges and had subdued all the other Indians, he abandoned as hopeless an invasion of the Gangaridai, when he learned that they possessed four thousand elephants well trained and equipped.

ঐতিহাসিকগণ গঙ্গরিডয় বঙ্গ-রাজ্য ৬ এবং উহার রাজধানীকে সপ্তগ্রাম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ৭ সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিবেণী তীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত এবং সুদূর অতীত কাল হইতে, এই স্থানটি ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একটি সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। লেঃ কর্ণেল ক্রফোর্ড এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন

Satgaon (Seven villages) was one of the oldest cities of India and the ancient royal port of Bengal.৮

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লীনী লিখিয়াছেন যে, জাহাজ সকল গোদাবরীর নিকট দিয়া কেপ-পালিমোরাস যাইত এবং ঐস্থান হইতে ফলতার আর পার টৌনিনগেল ও তথা

হইতে ত্রিবেণী দিয়া পাটনায় যাইত। মৌর্য সাম্রাজ্যের সভ্যতা এই স্থানে বিদ্যমান না থাকিলেও, তাহার প্রভাব যে কিছু এই স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। এই সময় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির সহিত বহু বৌদ্ধ ও জৈন এইস্থানে আসিয়া বসবাস করেন। ইহার কয়েক শতাব্দী পর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। দিল্লী নগরীর লৌহস্তম্ভের উপর খোদিত লিপিতে অঙ্কিত আছে যে, বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে যাইয়া সম্মিলিত শত্রুগণকে তিনি বিপর্যস্ত ও পরাভূত করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস ৪৮০ হইতে ৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'রঘুবংশ' রচনা করেন; তিনি রঘুর দিগ্বিজয় কাহিনীতে সুহ্ম-দেশের উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার ভাবার্থ প্রদত্ত হইল ঃ

বিজয়ী রঘু এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দেশ জয় করিতে করিতে পরিশেষে পূর্বমহা-সাগরের তালবন দ্বারা শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। নদীবেগ যেরূপ উচ্ছৃত বৃক্ষ সকল উন্মূলিত করে, রঘুর স্বভাবও সেইরূপ জানিতে পারিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতি-গণ বিনীতভাব অবলম্বন পূর্বক আত্মরক্ষা করিলেন।

গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের পর সুহ্মদেশ কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 'দশকুমার চরিতে' লিখিত আছে যে, সুহ্মদেশ সেই সময়ে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীতে সুহ্মদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন এবং উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে সুহ্মরাজ্য শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য-ভুক্ত হয়। এই সময় চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে তৎকালে বাঙ্গলাদেশ ছয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। তাহার সময়ে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া একটি রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তিনি তাম্রলিপ্ত হইতে কর্ণসুবর্ণ এবং কর্ণসুবর্ণ হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন। ছয়টি বিভাগে ছয়জন রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া তিনি তাহার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন: কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজাদের নাম তিনি উল্লেখ করেন নাই। তাহার সময়ে বঙ্গদেশ নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত ছিল ঃ

(১) চম্পা—ভাগলপুর জেলা

(২) কাজঙ্গলা—সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পূর্ব সীমা, রাজমহলের চারিদিকের অংশ লইয়া অবস্থিত।

(৩) পুণ্ড্রবর্দ্ধন—মালদহের কতকাংশ এবং রাজসাহী ও বগুড়া জেলা।

(৪) সমতট—যশোহরের কতকাংশ, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ ও ত্রিপুরা জেলা।

(৫) তাম্রলিপ্ত—চব্বিশ পরগণাও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ।

(৬) কর্ণ সুবর্ণ—হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার উত্তর ও মধ্যভাগ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা।

হুয়েন সিয়াংএর মতে, কাজঙ্গলের লোকেরা স্পষ্টচারী, গুণবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির

প্রতি শ্রদ্ধাবান; পুন্ড্রবর্ধনের লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান; কামরূপের লোকেরা সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও হিংস্র প্রকৃতির; তাম্রলিপ্তের লোকেদের ব্যবহার রূঢ় হইলেও তাহারা জ্ঞানবিজ্ঞানে অনুরাগী কর্মঠ ও সাহসী; সমতটের লোকেরা কর্মঠ, কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র, সচ্চরিত্র ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ মিশ্র রচিত 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকে রাঢ় দেশের নিম্নোক্তরূপ উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

"গৌড়ং রাষ্ট্রমুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাজপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমা ন পিতঃ।"

উক্ত নাটকে দক্ষিণ রাঢ় স্বাধীন রাজ্য এবং উহার রাজধানী ঐশ্বর্যশালিনী বলিয়া বর্ণিত আছে। তৎকালে রাঢ়দেশ বলিতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গকে বুঝাইত এবং রাঢ়দেশ আবার উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।৯

দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লিখিয়াছেন যে, গঙ্গার দুইধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি পক্ষ, গঙ্গার পশ্চিমদিকে 'রাল্' (অর্থাৎ রাঢ়) এই ধারেই লখনোর নগরী এবং পশ্চিম 'বরিন্দ' (অর্থাৎ বারেন্দ্র) নামে খ্যাত। এই ধারেই দেবকোটনগর অবস্থিত। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে, তৎকালে লক্ষ্মণাবতী ও তাহারা চতুর্দিকে যাজনগর (যাজপুর বা উৎকলের উত্তরাংশ) বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত (মিথিলা) এবং এই সকল দেশ একত্রে গৌড় নামে খ্যাত ছিল।১০ মিনহাজের বর্ণনা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় বর্তমান বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, সাওতাল পরগণা এবং হুগলী জেলা ও হাওড়া জেলা রাঢ় নামে প্রসিদ্ধ ছিল।১১

'শক্তিসঙ্গম-তন্ত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই রাঢ়ভূমি আবার 'অঙ্গ' নামে বর্ণিত হইয়াছে

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"

হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত 'পান্ডব-দিগ্বিজয়' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে রাঢ়ের বহু স্থানের নামোল্লেখ আছে কিন্তু হুগলী নামটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে হুগলী নামটি যে সুপ্রাচীন নয় তাহাই প্রমাণিত হয়। এই সম্বন্ধে রেভারেন্ড লং On the Banks of Bhagirathi নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—Hugly is a modern name given to it, since the town of Hugly rose into importance. ১২

ঠিক কোন সময়ে যে, হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাও বর্তমানে জানিতে পারা যায় না, কারণ হুগলীর যাবতীয় ব্যবসা বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে সপ্তগ্রাম নির্বাহ করিত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন—

The best account of the origin of Hooghly, which I have seen may be found in the Appendix to the Descriptive Catalogue of Tipoo Sultan's Library No. 37. but that account does not define the period, at which it was founded.১৩

হুগলী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ভাগীরথী তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং সেই হোগলা গাছ হইতেই হুগলী নামটি আসিয়াছে।

The name Hooghly is supposed to be derived from the word hoghla, the name of the coarse reeds which once abounded in the banks of the river.১৪

প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থাদিতে ও বিভিন্ন মানচিত্রে ১৫ হুগলী—ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গোলি প্রভৃতি বহু নামে উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

পূর্বে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাঙ্গালাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা উপায়ে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তৎকালে প্রাদেশিক বিভাগকে "ভুক্তি" বলিত; ভুক্তিকে বর্তমানে বিভাগ বলে। এতদ্ব্যতীত বর্তমান মহকুমাকে 'বিষয়' এবং জেলাকে 'মণ্ডল' বলা হইত। তৎকালে কতকগুলি 'বিষয়' লইয়া 'মণ্ডল' এবং কতকগুলি 'মণ্ডল' লইয়া 'ভুক্তি' হইত। কিন্তু বহু স্থানে আবার মণ্ডল ও বিষয় একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

মগধ সিংহাসনে যখন পাল রাজাগণ অধিরূঢ় ছিলেন, তখন শাসন সৌকর্যার্থে তাঁহারা সাম্রাজ্যকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—যথা শ্রীনগর ভুক্তি (বিহার প্রদেশ), তীর ভুক্তি (ত্রিহুত) ও পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি (বঙ্গদেশ)। পরবর্তীকালে অন্যান্য স্থানগুলি হারাইয়া যখন তাহারা কেবলমাত্র বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালা দেশকে তাহারা তিনটি 'ভুক্তিতে' অর্থাৎ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) **পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি**—ইহা চব্বিশটি মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। যথা—ব্যাঘ্রতটি মন্ডল, নাবা মণ্ডল, খাড়ি মণ্ডল, বরেন্দ্র মণ্ডল, সমতট মণ্ডল প্রভৃতি। খাড়িমণ্ডলের পূর্বভাগ 'পূর্ব খাড়িমণ্ডল' এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত 'পশ্চিম খাড়িমণ্ডল' বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

(২) **বর্দ্ধমানভুক্তি**—ইহা চারিটি মণ্ডলে বিভক্ত ছিল এবং ইহার সীমানা পূর্বে ভাগীরথীর দক্ষিণে সুবর্ণরেখা ও উত্তরে অজয় নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, পশ্চিম খাড়ি মণ্ডল ও দন্ডভুক্তি মণ্ডল এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার মধ্যে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দন্ডভুক্তি মণ্ডল বলিয়া কথিত ছিল।

(৩) **কঙ্কগ্রামভুক্তি**—মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা, রাজমহল, কাঁকজোল, এবং সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল।

এই ভুক্তিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী এবং আভ্যন্তরীন ব্যাপারে প্রায় স্বাধীন

ছিল। গ্রামের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, জনকল্যাণ-সাধন প্রভৃতি হিতকর কাজগুলি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি 'মোড়ল' দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। "বিষয়পতি," "মন্ডলেশ্বর," উপাধিধারী রাজকর্মচারীগণ পূর্বোক্ত 'বিভাগগুলি' শাসন করিতেন। বিচারবিভাগ 'মহাধর্মাধ্যক্ষ' নামক সুবিধার্থে, বর্ধমান জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং উত্তরাংশ বর্ধমান ও দক্ষিণাংশ করিতেন।

হিন্দুসমাজে নারী জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়া আসিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাণী, সেনানায়িকা, প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্রী প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদেও যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া গিয়াছেন। পরে স্মৃতিকারদের কঠোর বিধি নিষেধের ফলে, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা ক্রমশঃ ক্ষুন্ন হইতে থাকে। সমাজের অর্ধাঙ্গিনী নারী জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতি ক্রমশঃ দুর্বল ও পরপদানত হইয়া পড়েন।

ইহাই সংক্ষেপে বাঙ্গলা তথা রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস।

॥ ভৌমিক বিবরণ ॥

হুগলী জেলা প্রথমে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শাসন কার্যের সুবিধার্থে, বর্ধমান জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং উত্তরাংশ বর্ধমান ও দক্ষিণাংশ হুগলী বলিয়া দুইটি পৃথক জেলায় ভাগ করা হয়।

Under Regulation XXXVI of 1795, Zilla Burdwan was divided into two parts, each under a separate officer.

মাননীয় মিঃ সি, এ, ব্রুস এই জেলায় প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৫ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই জেলায় যাবতীয় শাসন কার্য পরিচালনা করেন

হুগলী নামটি পোর্তুগীসদের দেওয়া নাম; তৎকালে ভাগীরথী তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। হুগলী নামের উৎপত্তি এবং বর্তমান হুগলী শহরের সৃষ্টি পোর্তুগীসদের দ্বারা হইয়াছে, ইহার পূর্বে কেবল হুগলী জেলার নয়, সমগ্র বঙ্গদেশের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য একমাত্র সপ্তগ্রাম নির্বাহ করিত। সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলী পোর্তুগীসদের যত্নে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

হুগলী জেলার আধুনিক সীমাবেষ্টিত স্থানের পরিমাণের মধ্যে প্রাচীনকালে যে কত জন-সংখ্যা ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার বর্তমানে কোন উপায় নাই; কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে
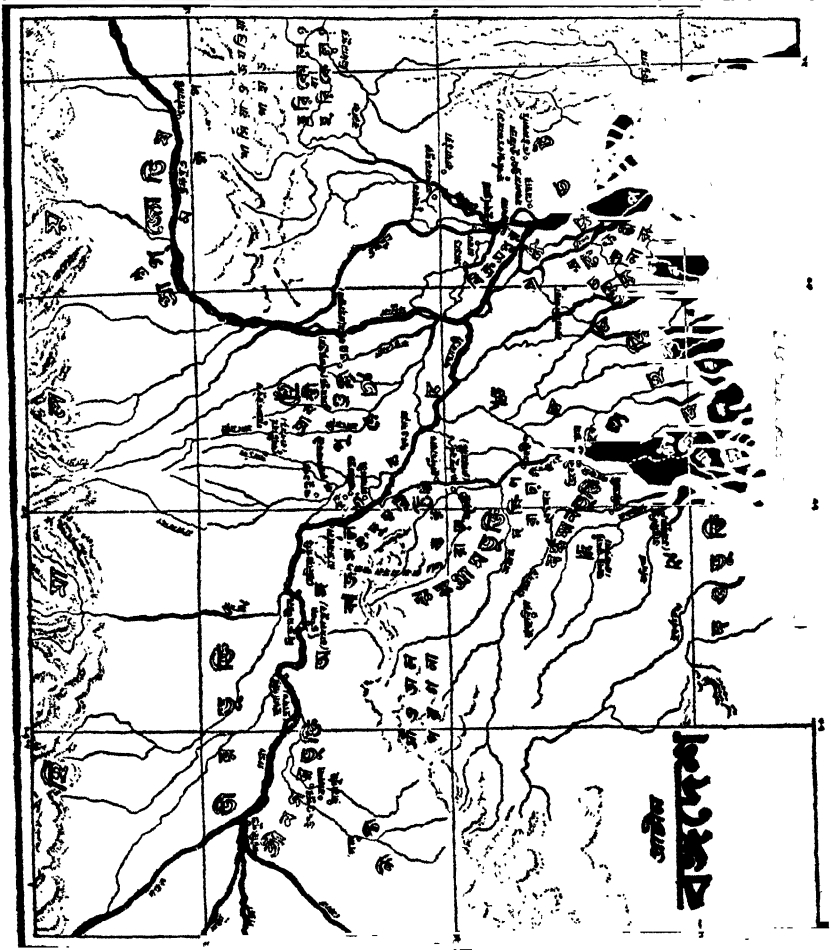
লোকগণনা প্রাচীনকালে কোন রাজার ইচ্ছানুসারে, কোন বিশেষ অংশের কখনও করা হইলেও, বর্ত্তমানে যেরূপ সুন্দর ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই কার্য সমাধা করা হয়, সেইরূপ ভাবে কখনও পূর্বে লোকগণনা করা হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী-ভারত সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম জন সংখ্যা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি আদম-সুমারি বা সেন্‌সাস করা হয়। তৎপরে প্রতি দশ বৎসর অন্তর বিশুদ্ধ প্রণালীতে এই কার্য সরকার কর্তৃক নির্বাহ হইতেছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোকগণনা করা হইলেও, ইহার পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে একবার হুগলী জেলার সমগ্র লোক-সংখ্যা গণনা করিয়াছিলেন।

The earliest attempt to count the inhabitants of Hughly by the then Magistrate Mr. E. A. Samuells in 1837.

তাঁহার মতে তৎকালে হুগলী জেলার লোক সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ৪৩ জন নির্ধারিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৭০ হাজার ২৫ জন শহরের অধিবাসী ছিল কিন্তু তখন সমগ্র হাওড়া জেলা এবং মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোনা ও ঘাঁটাল হুগলী জেলার মধ্যে ছিল বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে ঠিক কত জন লোক যে, আধুনিক হুগলীর অধিবাসী ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। তবে 'আধুনিক হুগলীর অধিবাসী' বলিয়া নির্ণীত ৭০ হাজার ২৫ জন লোক হাওড়া শহরের তৎকালীন জনসংখ্যা ছিল বলিয়া ডাক্তার ক্রফোর্ড সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সরকারীভাবে দেশের জনসংখ্যা নিরূপণ এবং তৎসহ প্রতিটি মানুষের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাকে জনগণনা বা আদমসুমারি বলে। জনগণনার দ্বারা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে কত লোক আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন স্ত্রীলোক, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেদের সংখ্যা কত, কতজন স্বাক্ষর করিতে পারেন, কাহার কত বয়স, কে কি কাজ করেন ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানা যায়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের প্রথম লোকগণনার পর হইতে এই কার্যপদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র বৃত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগৃহীত হইত। পরে 'জীবনধারণের উপায়' সম্পর্কে তথ্যাদি চাওয়া হইত। কিন্তু ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের জনগণনায় অর্থনীতিক তথ্যাদির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে কারণ স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যসূচী ইহার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। এবারের জনগণনায় পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হইয়াছিল। আপনি চাষী না কৃষি-শ্রমিক? আপনি শিল্প কিম্বা অন্য কোন কাজে নিযুক্ত আছেন? আপনি বেকার কি না? কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত না থাকিলে আপনি কি কাজ করেন? পূর্বে জাতি সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিত, এবারে তাহা নাই।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লোকগণনা সঠিক ভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয় নাই সুতরাং উক্ত গণনা যে ভ্রমাত্মক তাহা সুনিশ্চিত, অধিকন্তু ঘাঁটাল চন্দ্রকোনা ও উলুবেড়িয়া তৎকালে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সীমাবেষ্টিত স্থানের পরিমাণ ২ হাজার ৫ শত ৯ বর্গ

মাইল ছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বলাগড়, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর ও গোঘাটে কোন থানা ছিল না; উক্ত স্থানগুলির পরিবর্তে বেনিয়াপুর রাজাপুর (বর্তমান জগৎবল্লভপুর) রাজবলহাট, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যথাক্রমে একটি করিয়া থানা ছিল। এতদ্ভিন্ন চুচুড়া এবং হুগলী এই দুইটি নিকটবর্তী স্থানেও তখন দুইটি থানা ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যার তালিকাটি এইরূপঃ

	থানা	লোকসংখ্যা
১।	হুগলী	৭০,৫২৫
২।	বাঁশবেড়িয়া	৩০,০৫৭
৩।	বেনিয়াপুর (ক)	৬০,৮১০
৪।	পাণ্ডুয়া	১,০৬,৩২৪
৫।	ধনিয়াখালি	১,৩৫,৮৫৭
৬।	শ্রীরামপুর	১,৩৫,২৫২
৭।	হরিপাল	৭২,৬৭৩
৮।	বৈদ্যবাটী (খ)	১,৩১,৯০৯
৯।	কৃষ্ণনগর (গ)	১,৫৭,৭০৮
১০।	জাহানাবাদ (ঘ)	১,২০,৪৯৪
১১।	গোঘাট	৮৮,৬০৪
১২।	চুঁচুড়া	১০,০৭০

(ক) বর্তমানে বলাগড় (খ) বর্তমানে সিঙ্গুর
(গ) বর্তমানে জাঙ্গিপাড়া (ঘ) বর্তমানে আরামবাগ

প্রাচীনকালে হুগলী জেলা যে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল এবং এই জেলার অধিবাসীগণ যে খুব কর্মঠ ছিল, তাহা টয়েনবি সাহেব, ভারত সরকারের রেকর্ডে রক্ষিত একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া (২০ এপ্রিল ১৮৩৮, ১৭৭ ভলিউম) তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত পত্র হইতে জানা যায়—"প্রতি গ্রামে অসংখ্য বড় বড় ইষ্টক-নির্মিত পাকা বাড়ী এবং বাড়ীর মালিকদিগের গৃহে, বিবিধ বিদেশী সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র-সমূহ, তাঁহারা যে বিশেষ ধনশালী এবং কর্মঠ, তাহাই নিসংশয়ে প্রমাণ করে।" পত্রখানি এইস্থানে উল্লেখ্যঃ

The number of brick buildings in every village, the comfortable appearance of the dwellings, and the many articles of foreign manufacture which the inhabitants possess are sufficient evidence of their being a prosperous and industrious race. (Toynbee's A Sketch of the Administration of the Hooghly District. Page 63.)

বিভিন্ন জাতি

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম লোকগণনা করা হয়; উক্ত গণনানুসারে হুগলী জেলার মধ্যে কৈবর্ত ও বাগদি জাতির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক এবং কায়স্থ ও তেলী জাতির সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে কৈবর্ত ও বাগদি জাতির সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারিতে "কৈবর্ত" জাতির মধ্যে আদি কৈবর্ত ও চাষীকৈবর্তগণ 'মাহিষ্য' বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, রিপোর্টে দুইটি ভিন্ন জাতি বলিয়া দেখান হইয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আদি কৈবর্তের সংখ্যা ১৩ হাজার ৭ শত ৪০ জন এবং মাহিষ্যের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭ হাজার ৪ শত ১৬ জন। অনুরূপভাবে প্রথম আদমসুমারিতে তেলী ও কলু একত্রে ছিল, কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তেলী ও কলু ভিন্ন জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, তালিকাটির সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ২২ হাজার ৬৬ জন তেলী ও ১৪ হাজার ৩ শত ১১ জন কলু একত্রিত করিয়া বর্তমানে লিখিত হইয়াছে। জাতি হিসাবে কোন তালিকা প্রস্তুত হয় না বলিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির তালিকায় যে সকল জাতির সংখ্যা পঁচিশ হাজারের অধিক, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

তুলনামূলক হিসাব

জাতি	১৮৭২ খৃঃ	১৮৮১ খৃঃ	১৮৯১ খৃঃ	১৯৩১ খৃঃ
কৈবর্ত	২,৮৮,৬২১	১,৪২,৫২৬	১,৪৩,৭৮০	১,৮৮,১৫৬
বাগদি	১,৫২,৬১৮	১,৩৪,১১৫	১,৫৭,৩০৪	১,৫৬,২৪০
ব্রাহ্মণ	১,০৭,৫৩৪	৭৬,২৭১	৭৪,৯৯৯	৮৪,১৭২
সদগোপ	৬৩,৭৭৪	৬১,০২১	৫৬,২৮৩	৫৪,৫২৪
গোয়ালা	৬৫,৩৬৬	৪৬,১৩৪	৩৮,৬০২	৪৩,২৮৯
কায়স্থ	৩৮,৭২২	২৫,৪৮৪	২৯,১৭৭	২৮,১৯৫
তেলী	২৯,১১২	৪৭,০৩৮	৫৪,৬০৩	৩৬,৩৭৭

কৈবর্ত ও বাগদি

কৈবর্ত ও বাগদি জাতির হুগলী জেলায় বাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাহাদিগকে আদিতে অনার্য জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে তাহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করায় হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছে। জনশ্রুতি যে, মাহিষ্যগণ ৮২২ শকাব্দতে মেদিনীপুর জেলায় প্রথম আসিয়া উক্ত জেলার অন্তর্গত তমলুক, বালিসীতা, তুরকা, সুজামুটা ও কুতবপুর নামক স্থানে, পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করে এবং পরে মেদিনীপুর জেলা হইতে তাহারা বঙ্গের অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কামিং সাহেব সেন্সাস রিপোর্টে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, ইহাদিগকে হাণ্টার সাহেবের ন্যায় অনার্য-বংশ-সম্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে এক মত নহি।

বাগদি হুগলী জেলার আদিম অধিবাসী এবং ইহারাও মূলে অনার্য জাতি ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বর্কডিহি পরগণাতে আদি নিবাস ছিল বলিয়া ইহাদের 'বাগদি' এই নামাকরণ হয়। মেগাস্থিনাস যে 'গঙ্গরডয়' দেশের কথা খৃষ্ট-পূর্ব ৩২৬ অব্দে উল্লেখ করিয়াছিলেন; এই বাগদিগণই সেই গঙ্গারিডয় রাজ্যের আদিম অধিবাসী ছিল।

The Gungaridae were undoubtedly Hindus and they were mainly composed of Bagdis, who can still be identified as the original stratum of the population in the deltaic portion of the district, and who are allowed by the Hindus of pure Aryan race to represent the great aboriginal section which was admitted with the pale of Hinduism in distinction from all the rest who are classified as chuars.১৫

ভাগবতে সূহ্মবাসীকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে; এই পাষণ্ড আমাদের মনে হয় বৌদ্ধগণকে না বলিয়া যাহারা 'রাঢ়' বা 'চুয়াড়' নামে অভিহিত হইত, সেই আদিম অধিবাসীগণকে বলা হইয়াছে। খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ধমানস্বামী বা মহাবীরস্বামী এই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়া 'চুয়াড়'গণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহার নামানুসারে 'বর্ধমান' নামাকরণ হইয়াছে। হুগলী জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অদ্যাপি 'রাঢ়-চুয়াড়' বলা হয় এবং কোন ভদ্রলোক অসভ্যতা করিলে, তাহাদিগকে 'চুয়াড়ের' মত ব্যবহার করিতেছে বলিয়া অভিহিত করা হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহার চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেনঃ

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলা দুইটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল, যথা হুগলী সদর এবং শ্রীরামপুর। **হুগলী সদর**—হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া ও ধনিয়াখালি এই পাঁচটি থানায় বিভক্ত ছিল এবং **শ্রীরামপুর মহকুমা**—সেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, হরিপাল, কৃষ্ণনগর ও চণ্ডীতলা এই পাঁচটি থানায় বিভক্ত ছিল। জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) এবং গোঘাট থানা তৎকালে বর্ধমান জেলায় এবং খানাকুল থানা হাওড়া জেলার মধ্যে ছিল। সেইজন্য উক্ত থানাগুলির ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, পূর্বোক্ত তালিকায় যোগ করিয়া দেখান হইয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার সীমা পরিবর্তিত হয় এবং খানাকুল, জাহানাবাদ ও গোঘাট এই তিনটি থানা লইয়া 'জাহানাবাদ' বলিয়া একটি নূতন মহকুমার সৃষ্টি হয়। বাঁশবেড়িয়া হইতে থানা উঠিয়া যায় এবং পোলবা নামক স্থানে একটি নূতন থানা গঠিত হয়। বৈদ্যবাটীর থানা সিঙ্গুরে স্থানান্তরিত হয়। গয়া জেলায় জাহানাবাদ বলিয়া একটি স্থান থাকায়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত "কলিকাতা গেজেটের" এক বিজ্ঞপ্তিতে, জাহানাবাদ মহকুমা "আরামবাগ" নামে অভিহিত হয়। ১৮৭২

খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় দশটি থানা ছিল: বর্তমানে এই স্থানে ঊনিশটি থানা স্থাপিত হইয়াছে।

বর্ধমান জ্বর

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "বর্ধমানের জ্বর" নামক ম্যালেরিয়া. মারাত্মক মূর্তি ধারণ করিয়া মহামারীরূপে জেলার বহু প্রাচীন জনবহুল স্থান জনশূন্য করিয়া দেয়। তাহার ফলে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজারের অধিক লোক কমিয়া গিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। ওম্যালি সাহেব এই সম্বন্ধে হুগলী ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেনঃ

In the nine years following the census of 1872, the population declined by no less than 13 per cent. owing mainly to the terrible epidemic of malaria fever known as 'Burdwan fever.'

সমগ্র বর্ধমান বিভাগে এই মহামারীর প্রকোপ বেশী হয় বলিয়া ইহা 'বর্ধমানের জ্বর' বলিয়া খ্যাত। হুগলী জেলার মধ্যে মহামারীর প্রকোপ সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন

'Hugly being one of the tracts which suffered most.' (Imperial Gazetteer of India Vol V Page 492)

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 'বর্ধমানজ্বরের' মহামারী রূপ শেষ হয়। এই রোগের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার সিসিল বিডন কর্তৃক ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক 'কমিশন' নিয়োজিত হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্টে বর্ধমান বিভাগের এক-তৃতীয়াংশ লোক, এই জ্বরে দেহরক্ষা করে বলিয়া কোন কোন সভ্য মত প্রকাশ করেন। নিম্নে উক্ত রিপোর্টের অংশ বিশেষ উল্লেখ্যঃ

Dr. French who made a special enquiry into the outbreak, estimated the total mortality at about one third of the population in the tracts attacked by the epidemic. The instance given by him show that this was no exaggeration

Still more significant proof of the enormous mortality is to be found in the fact that the population in 1872 was not much in excess of the estimate formed by Mr. Bayley nearly 60 years before.

ইংরাজী ১৮৭৪ সালে বর্ধমান বিভাগে এই রোগের মহামারী রূপ শেষ হয়। ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের সেন্সাস রিপোর্ট পাঠে আমরা যাহা অবগত হই, তাহা নিম্নের কয়েকটি লাইন হইতে বুঝা যাইবে।

The year 1874 may be taken as the last year of the epidemic in this Division (Burdwan) ; from all quarters reports came that

the fever was less fatal and less prevalent than in previous years. In 1875 the same facts were observed again, and the fever lacked the virulence of the epidemic and had all the characteristics of the ordinary seasonal malarious fever of the country.

ইংরাজী ১৮৭২ হইতে ১৮৮১এর মধ্যে বর্ধমান জেলার লোকসংখ্যা শতকরা ৬ জন এবং হুগলী জেলার লোকসংখ্যা শতকরা ১৩ জন করিয়া কমিয়া গেল। আর এই 'বর্ধমান জ্বরে'র লক্ষণ উদর-জোড়া প্লীহা ও সংক্রামক জ্বর। জ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে হুগলী জেলার সিভিল সার্জেন ক্রফোর্ড সাহেব বলিয়াছেন :

> In its worst phases the fever assumed a tendency to congestion of some vital organs, most commonly the brain or lungs; and among the commonest sequence were enlargement of the liver and spleen. Its chief peculiarity was the tendency to a relapse or a succession of relapses; and in some cases, sudden and great depression of vital energy followed.

ডাক্তার জে, এলিয়ট ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে এই মহামারীর কারণ কি, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন এবং এই ব্যাধির গতি যেরূপ পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করিয়াছেন সেরূপ আর কেহ করেন নাই। তাঁহার রিপোর্টে হুগলী জেলার কোন স্থান হইতে এই ব্যাধি কি ভাবে সংক্রামিত হয় তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল:

"১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বর্ষারম্ভে এই মড়ক হালিসহর হইতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া, শিবপুর, ও ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইল।

ত্রিবেণী হইতে ক্রমে ইহা সরস্বতী নদীর দুই তীর দিয়া পশ্চিম দিকে মগরা, সপ্তগ্রাম ও হোসেনাবাদ পর্যন্ত আক্রমণ করিল।

তারপর ১৮৬১ ও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাধি ত্রিবেণীর উত্তর দিকে অবস্থিত জয়পুর, বাগাটী, ও নয়াসরাই হইয়া ডুমুরদহ, সীজে জিরেট ও বলাগড়ে দেখা দিল এবং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বলাগড় হইতে পাণ্ডুয়ায় উপস্থিত হইল ও ছয় মাসের মধ্যে বার শত লোকের জীবননাশ করিল।"

কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য রাজা দিগম্বর মিত্র ব্যাধির একটি নূতন কারণ আবিষ্কার করিয়া বলেন যে, সরকার যত্রতত্র রাস্তা, বাঁধ ও রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করায়, জল-নিকাশের বিঘ্ন উৎপাদিত হয় এবং তাহার ফলে যে সমস্ত ভূ-ভাগ অধিকতর আর্দ্র হইয়াছিল, সেই সকল স্থানেই এই মহামারী প্রথম আরম্ভ হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর (২০ আশ্বিন ১২৭১) বঙ্গদেশে এক প্রবল সর্ববিধ্বংসী ঝড় হয়; ইহা 'আশ্বিনে ঝড়' বলিয়া খ্যাত। এইরূপ ঝড় পূর্বে কখনও হয় নাই; প্রতি বর্গফুটে এই ঝড়ের চাপ আড়াই সের হইতে ষোল সের পর্যন্ত ছিল। ইহার বেগ হুগলী, শ্রীরামপুর কালনা কৃষ্ণনগর রামপুর-বোয়ালিয়া পাবনা ও বগুড়া অঞ্চলে সর্বাধিক অনুভূত হইয়াছিল। বাকল্যান্ড সাহেব এই ঝড়ে ৪৭ হাজার ৮শত লোক ও ১ লক্ষ ৩৬ হাজার পশু এবং এত সম্পত্তি ও অর্থহানি হইয়াছিল যে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়াছেন।

লোকক্ষয় ও দেশত্যাগ

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'বর্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীর জন্য হুগলী জেলার লোকসংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ১৩জন কমিয়া যায়, যাঁহারা কোনক্রমে মহামারীর হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের জীবনীশক্তি ও সন্তান-প্রজননের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরে হুগলী জেলা হইতে লোক বাসত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন।

The fever reduced the vitality of the survivors thus diminishing the birth rate and also forced a number of its inhabitants to leave the district for healthier locality.

এই মহামারীর পর উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং যাঁহাদের অবস্থা একটু সচ্ছল, তাঁহারা অধিকাংশই কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ওম্যালি সাহেব এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

The most noticeable feature of immigration from Bengal is the large proportion contributed by West Bengal. Nearly one half of the Bengali immigrants come from the Burdwan Division, Hooghly sending 48,000, Midnapore 29,000, Burdwan 21,000, and Howrah 15,000.—Census of India, 1911, Vol VI, Part I.

বর্তমানে খাস কলিকাতার সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা চল্লিশ জন অ-বাঙ্গালী; কলিকাতায় মফঃস্বলবাসী বাঙ্গালী অপেক্ষা অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে আগত মফঃস্বলবাসীদের মধ্যে হুগলী জেলা অদ্যাপি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলার জনসংখ্যা এবং এক বর্গ মাইলের জনসংখ্যা নিম্নোক্তরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল:

বৎসর	লোকসংখ্যা	এক বর্গ মাইলের গড়ে জনসংখ্যা
১৮৭২	১১,৫৭,৯০৬	৯৫৩
১৮৮১	১০,১২,৭৬৮	৮২৮
১৮৯১	১০,৭৬,৭১০	৮৮০
১৯০১	১০,৫০,৩৬৫	৮৮৩
১৯১১	১০,৯০,০৯৭	৮৮৭
১৯২১	১০,৮০,১৪২	৯০৯
১৯৩১	৯,১০,৬৬২	৮৫৯
১৯৪১	১০,৯৪,৮২০	৯৪৩
১৯৫১	১৬,০৪,২২৯	১,২৮৬
১৯৬১	২২,৩৩,৭৯৮	১,৫৮৮

হুগলী জেলার জনবসতির ঘনতা প্রতি বর্গ মাইলে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে ১,২৮৬ জন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রতি বর্গমাইলে ৯৫৩ জন লোক বাস করিত। বর্তমানে এই জেলার মোট আয়তন ১৪০৬·৯ বর্গ মাইল। আয়তনে মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে; হুগলী জেলার আয়তন ক্ষুদ্র জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহাকে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায় মনে হয় এবং ইহার আয়তন ইংলণ্ডের চুয়াল্লিশ ভাগের একভাগ। ওম্যালি সাহেব 'গেজেটিয়ারে' লিখিয়াছেন যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী হুগলী জেলার আয়তন ১১৮৯ বর্গ মাইল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী; ইহার আয়তন 'গ্লোচেষ্টারসায়ারের' অপেক্ষা কিছু ছোট, কিন্তু ইহার জনসংখ্যা 'সরের' দ্বিগুণ।

* It extends over 1189 Sq. miles and at the Census of 1911 its pop·ılation 10 90,097. In area it is slightly smaller than Gloucestershire, while its population is double that of Surrey.

বর্তমান হুগলী জেলায় বারটি শহর এবং লোকজন বাস করে এইরূপ গ্রামের সংখ্যা ১৯১৭টি; পূর্বে গ্রামের সংখ্যা ছিল ২,৫৬৩টি। শহরের ও গ্রামের লোকসংখ্যা ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক তালিকানুযায়ী ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭ শত ৯৮ জন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারির হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের হিসাব অনুপাতে হুগলী জেলার শতকরা ৩৬·১টি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হুগলীর বারটি শহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে; হুগলী সদর মহকুমায় দুইটি শহর, চন্দননগর মহকুমায় তিনটি শহর, শ্রীরামপুর মহকুমায় ছয়টি শহর এবং আরামবাগ মহকুমায় একটি শহর আছে। এই জেলার মধ্যে ফরাসী অধিকৃত 'চন্দননগর' নামে একটি স্বতন্ত্র শহর ছিল। ইহা চুঁচুড়ার দক্ষিণদিকে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এবং ইহার আয়তন মাত্র চার বর্গ মাইল হইলেও, এইরূপ সুন্দর শহর বঙ্গদেশে অন্য কোন জেলার মধ্যে নাই।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর শ্রীরামপুর মহকুমার ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর এই চারটি থানা সহ চন্দননগরকে লইয়া নূতন চন্দননগর মহকুমা গঠিত হয়। হুগলী জেলার অধীনে এই নবগঠিত মহকুমায় বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত আইন চন্দননগরে প্রযোজ্য হয়। ভারত ভুক্তির পর চন্দননগরে পূর্বে ফরাসীদের আমলে যে সকল আইন বলবৎ ছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

চন্দননগর শহরে নূতন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী কলিকাতার ন্যায় কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে এবং ইহার পৌরপ্রধান 'মেয়র' নামে অভিহিত হন। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও চন্দননগর ঐতিহ্যে মুখর। ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের ইতিহাসে চন্দননগর এক স্বয়ংপূর্ণ পৃথক অধ্যায়।

সারা বাঙ্গলাদেশ যখন বৃটিশ-শাসিত ভারতের একটি প্রদেশরূপে ইংরেজ-রাজত্বের অধীন ছিল, তখন তারই অন্তর্ভুক্ত চন্দননগর ফরাসী-শাসনের অধীনে থাকিয়া এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য রচনা করিয়াছিল। পৃথক সত্তার দরুন আয়তনের ক্ষুদ্রতা লইয়াও চন্দননগর কলিকাতার সহিত পাল্লা দিয়া আপনাতে আপনি বিকশিত ও পরিপূর্ণ হইয়া ছিল।

প্রাকৃতিক বিন্যাসে বাঙ্গলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া সাহিত্যে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে

—এক কথায় সকল দিক দিয়া বাঙ্গলার সঙ্গে তার অন্তরসংযোগ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া এই স্থান হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হুগলী জেলার মনীষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়তনের দিক দিয়া হুগলী অন্যতর ক্ষুদ্র জেলা হইলেও, এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন শহর বিদ্যমান থাকায়, শহরের জনসংখ্যায় এই জেলা পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম কলিকাতা, দ্বিতীয় হাওড়া এবং তৃতীয় হুগলী। এই সম্বন্ধে সেনসাস রিপোর্টে লিখিত আছে :

Calcutta, which is all urban, comes first followed by Howrah, which takes so high a place because its area is small and it has a large urban population. The districts which follow are Eastern Bengal districts except Hooghly, which has a large urban population.—Census of India, 1921. Vol. V.

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কোন শহরে কত জনসংখ্যা ছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল; তালিকাটি হান্টার সাহেবের গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা

শহরের নাম	কোন্ থানার অন্তর্গত	জনসংখ্যা
১। হুগলী	হুগলী	৩৪,৭৬১
২। বলাগড়	বলাগড়	১৫,৬৩০
৩। জাহানাবাদ	জাহানাবাদ	১৩,৪০৯
৪। খানাকুল	খানাকুল	১৪,৫০৭
৫। শ্যামবাজার	গোঘাট	১৯,৬৩৫
৬। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	২৪,৪৪০
৭। বৈদ্যবাটী	বৈদ্যবাটী	১৩,০০২
৮। উত্তরপাড়া	চণ্ডীতলা	৪,০৮৯

হুগলী জেলা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়, ইহা অক্ষাংশ ২২° ৩৬´ ও ২৩° ১৪´ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭° ৩০´ ও ৮৮° ৩০´ পূর্বে অবস্থিত। এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য সর্বত্র একরূপ নহে; হুগলীর উত্তরে বর্ধমান জেলা, দক্ষিণে হাওড়া জেলা, পূর্বে ভাগীরথী এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশ। গঙ্গাতীরবর্তী স্থানগুলিতে সুন্দর সুন্দর ইষ্টকনির্মিত সুরম্য ভবন, গঙ্গার তটদেশ হইতে ইষ্টক বা প্রস্তর-নির্মিত শত শত সুন্দর স্নানের ঘাট, ফল-ফুল শোভিত অসংখ্য উদ্যান, বহুসংখ্যক দেব-মন্দির, এবং পাট বা কাপড়ের কলগুলি আধুনিক সভ্যতা ও বর্তমান ব্যবসায়াদির পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও বা তালবৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান, কোথাও বা বাঁশঝাড় নদীর জলের উপরে হেলিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা প্রাচীন অশথ বা বট বৃক্ষগুলি শাখা-বিস্তার করিয়া সুদূর অতীতের পুরাতন দিনগুলির সাক্ষ্য দান করিতেছে। ছোট বড় নৌকাগুলি যাত্রী লইয়া গঙ্গার এ পার হইতে অন্য পারে গমনাগমন করিতেছে, ঘাটে নর-নারী, বালক-বালিকা স্নান পূজাহ্নিক করিতেছে

এবং গঙ্গাতীরস্থ কল-কারখানাগুলি হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া, মাল-বাহী ষ্টীমারগুলি গঙ্গাবক্ষে প্রতিনিয়ত বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি হুগলী জেলার গঙ্গাতীরস্থ একটি গ্রামের সুন্দর চিত্র তাঁহার জার্নালে অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। গ্রামের চিত্রখানি কাঠের খোদাই করা ব্লকে বিলাতে ছাপা হইয়াছিল। হুগলী জেলার গ্রামের প্রাচীন প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে উহা একটি মূল্যবান জিনিষ। তাই এই স্থানে উক্ত চিত্রটি পুনঃ মুদ্রিত হইল।

গঙ্গাতীরবর্তী স্থান হইতে একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, গ্রাম্যজীবন যাপনের দৃশ্য নয়নগোচর হয়। বিবিধ ফল ও ফুলের গাছ, ধান্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং ছোট বড় পুষ্করিণী জেলার সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ওম্যালি সাহেব "হুগলী গেজেটিয়ার" নামক সরকারী গ্রন্থে হুগলী জেলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কয়েক লাইন এইরূপঃ

The district may be divided into three tracts—urban, semi-urban and rural. Broadly speaking, the urban tract consists of the narrow ripairian strip between the Hooghly on the east and the railway on the west. The French town of Chandernagore and all the municipal towns, except Arambagh, lie in one continuous line in this strip, viz, from Tribeni southwards Bansberia, Hooghly (including Chinsura), Bhadreswar, Baidyabati, Serampore, Kotrong, Uttarpara. The eighth municipality, Arambagh, is really a congeries of village and has been constituted a municipality, as being the headquarters of a sub-division rather than a place with urban characteristics.

হুগলী জেলাকে ওম্যালী সাহেব তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা শহর, আধা-শহর এবং গ্রাম। গঙ্গাতীরস্থ স্থানগুলি ব্যবসায়ের জন্য বহু প্রাচীন কাল হইতে শ্বেতাঙ্গ বণিকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং তাহাদের ঐকান্তিক যত্নেই নদীতীরবর্তী স্থানগুলি ক্রমশঃ শহরে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতে পারা যায় যে, তৎকালে ইংরাজদের প্রাধান্য ছিল হুগলীতে, ওলন্দাজদিগের প্রাধান্য ছিল চুঁচুড়াতে, চন্দননগরে প্রাধান্য ছিল ফরাসীদের, ব্যাণ্ডেলে প্রাধান্য ছিল পোত্তুগীসদের, শ্রীরামপুরে প্রাধান্য ছিল দিনেমারদের, রিষড়াতে প্রাধান্য ছিল গ্রীকদের, এবং ভদ্রেশ্বরে প্রাধান্য ছিল জার্মান ও অষ্ট্রিয়ানদের। ভাগীরথী হইতে বর্তমান মেল লাইনের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল এবং এই রেল লাইনের নিকট দিয়া প্রাচীন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তাটি গিয়াছে। রেলওয়ে লাইন হইবার বহু পূর্বে, গঙ্গা এবং এই সুন্দর রাস্তাটি—এই দুইটির সমন্বয় যে হুগলী জেলার এতগুলি শহর-নির্মাণে শ্বেতাঙ্গ বণিকগণকে সহায়তা করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈদেশিক আক্রমণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু

হুগলীর গঙ্গাতীরে একটি প্রাচীন গ্রাম
(হেবারস্ জার্নাল হইতে)

উ
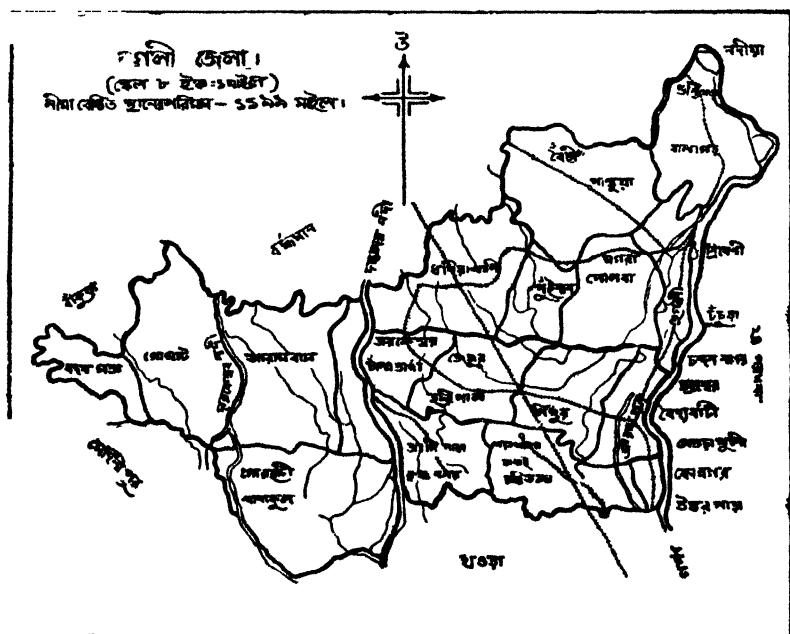
গলী জেলা।

বৈদেশিক সম্পদ ও সভ্যতা যে জলপথে আসিয়াছিল, তাহা কে না জানে? সেই জন্যই এই জেলার অধিবাসিগণ সর্বাগ্রে নিজস্ব চিন্তাধারার সহিত বিদেশী ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ 'আধা-শহর' হুগলী জেলার মধ্যে যেরূপ আছে, সেইরূপ অন্যত্র আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সামান্য একটি গ্রামে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সুবৃহৎ দুর্গা-পূজার দালান, সান বাঁধান বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী এবং পুরাতন সুউচ্চ দেব-মন্দিরগুলি দেখিয়াই ইংরাজ বণিকগণ বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন যে, ইহারা কত উন্নত, কর্ম্মঠ ও সৌভাগ্যবান্ তাহা দেখিলেই প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ সিঙ্গুর, শিয়াখালা, চন্ডীতলা, জনাই, বাকসা, বেগমপুর, ঝাপড়দহ, মাকড়দহ প্রভৃতি আধা-শহরের নাম করিতে পারা যায়। এই গ্রামগুলির মধ্য দিয়া সরস্বতী নদী প্রবাহিতা; বর্তমানে ইহা ক্ষীণাঙ্গী হইলেও, পূর্বোক্ত গ্রামগুলি যে উক্ত নদীর দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ গ্রাম, ইহার মধ্যে আছে সবুজ ধানের ক্ষেত, পুষ্করিণীতে মাছ, ময়রার দোকানে কেবল মুড়ি-বাতাসা ও পণ্ডিত মহাশয়ের ছোট্ট পাঠশালা আর চণ্ডীমণ্ডপে পূজা-পার্বণে উৎসব। এক কথায় বাহিরের সাহায্য ব্যতীত যেন ইহাদের দিন অবাধে চলিয়া যায়। পূর্বে গ্রামের প্রতি সকলেরই আন্তরিক মমতা ছিল, ভালবাসা ছিল, তাই গ্রামগুলি ছিল তখন আপনাতে আপনি বিকশিত স্বয়ংসম্পূর্ণ। শহরের চাকচিক্যে বিমোহিত গ্রাম-বাসিগণের গ্রামের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া গ্রামগুলি আজ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের প্রতি প্রাচীনকালে প্রত্যেকেরই যে কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নিম্নের লাইন কয়টি হইতেই জানা যায়।

ফিরে যদি জন্মাতে হয় এই করুণা চাই,
এই গ্রামেতেই দিও দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই।
দেবালয়ের এ অঙ্গনে
আসব আবার শুভক্ষণে
তুচ্ছ করি ইন্দ্রপুরী নন্দনকানন।

পৃথক্ অধ্যায়ে যথাস্থানে বিস্তারিত ভাবে শহর, আধা-শহর ও গ্রামের বিষয় আলোচিত হইবে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে হুগলী জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও থানার আয়তন এবং লোকসংখ্যা এইরূপ :

মহকুমা—

	আয়তন	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
(১) হুগলী সদর	৪৪৬·১	৪,৫৪,৫৭৩	২,৩৭,৯২৭	২,১৬,৬৪৬
(২) চন্দননগর	৩৮৮·৩	৩,৭২,০৯৩	২,০২,১০২	১,৬৯,৯৯১

	আয়তন	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
(৩) শ্রীরামপুর	১৬০·০	৪,০৭,১৪৭	২,২৬,১১৯	১,৮১,০২৮
(৪) আরামবাগ	৪১২·৫	৩,৭০,৪১৬	১,৮৫,৯৯৫	১,৮৪,৪২১
মোট	১৪০৬·৯	১৬,০৪,২২৯	৮,৫২,১৪৩	৭,৫২,০৮৬

থানা—

হুগলী সদর মহকুমা

(১) চুঁচুড়া	১৪·৫	৭০,৬০১	৩৮,৪৯৮	৩২,১০৩
(২) ধনেখালি	১০৬·২	৯৪,৭৮৫	৪৭,৪৪১	৪৭,৩৪৪
(৩) পোলবা	১১০·৩	৮৩,৫৯৪	৪২,৫৩৩	৪১,০৬১
(৪) মগরা	২৫·০	৫২,১০৮	৩০,৩৫৪	২১,৭৫৪
(৫) বলাগড়	৭৯·৫	৬৭,৬১৩	৩৪,৯৩৮	৩২,৬৭৫
(৬) পাণ্ডুয়া	১১০·৬	৮৫,৮৭২	৪৪,১৬৩	৪১৭০৯
মোট	৪৪৬·১	৪,৫৪,৫৭৩	২,৩৭,৯২৭	২,১৬,৬৪৬

চন্দননগর মহকুমা

(১) চন্দননগর	১৯৮·৫	৪৯,৯০৯	২৮,২২০	২১,৬৮৯
(২) ভদ্রেশ্বর	১৫·৪	৮০,৭৫৩	৪৯,২১২	৩১,৫৪১
(৩) হরিপাল	৭১·২	৮৪,৩১২	৪৩,১২৭	৪১,১৮৫
(৪) তারকেশ্বর	৪৬·৩	৬১,৩৬৬	৩২,১৮২	২৯,১৮৪
(৫) সিঙ্গুর	৫৬·৯	৯৫,৭৫৩	৪৯,৩৬১	৪৬,৩৯২
মোট	৩৮৮·৩	৩,৭২,০৯৩	২,০২,১০২	১,৬৯,৯৯১

শ্রীরামপুর মহকুমা

(১) শ্রীরামপুর	২২·৪	১,৪১,০৭১	৮৪,৯২২	৫৬,১৪৯
(২) উত্তরপাড়া	১১·২	৬৫,৭২৬	৩৮,২৫০	২৭,৪৭৬
(৩) চণ্ডীতলা	৬৩·১	১,২৮,৯১২	৬৬,৯৭৫	৬১,৯৩৭
(৪) জাঙ্গীপাড়া	৬৩·৩	৭১,৪৩৮	৩৫,৯৭২	৩৫,৪৬৬
মোট	১৬০·০	৪,০৭,১৪৭	২,২৬,১১৯	১,৮১,০২৮

আরামবাগ মহকুমা

(১) আরামবাগ	১১৫·০	৯৫,১৭২	৪৭,৯৭৪	৪৭,১৯৮
(২) পুরসুড়া	৩৮·৮	৫৮,৫০৮	২৯,৭৫০	২৮,৭৫৮
(৩) গোঘাট	১৪৫·৩	৮৬,৬০৯	৪৩,৪০৩	৪৩,২০৬
(৪) খানাকুল	১১৩·৪	১,৩০,০৯৭	৬৪,৮৬৮	৬৫,২২৯
মোট	৪১২·৫	৩,৭০,৪১৬	১,৮৫,৯৯৫	১,৮৪,৪২১

[হুগলী জেলার (চন্দননগর শহর বাদে) জনবসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে—১,২৮৬ জন চন্দননগর মহকুমার জনবসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে—১,৬২২ জন।]

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা

১৯৬১ খৃষ্টাব্দের লোক গণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যা নিম্নোক্তরূপে নির্ধারিত হইয়াছে :

জেলা		মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
২৪ পরগণা	...	৬২,৯৩,৭৫৮	৩৩,৬৮,৯৩১	২৯,২৪,৮২৭
মেদিনীপুর	...	৪৩,৪৯,০৬৯	২২.২৭,৩০৮	২১,২১,৭৬১
বর্ধমান	..	৩০,৮৩,৫৬৪	১৬.৫৯,৭৭৭	১৪,২৩,৭৮৭
কলিকাতা	..	২৯,২৬,৪৯৮	১৮.১৪,১৩১	১১,১২,৩৬৭
মুর্শিদাবাদ	..	২২,৯৩,০৭৪	১১,৬২,১৭৭	১১,৩০,৮৯৭
হুগলী	..	২২,৩৩,৭৯৮	১১,৮৩,১২৮	১০,৫৩,৬৭০
হাওড়া	..	২০,৪৩,২২৫	১১,২৮,৮৩৩	৯,১৪,৩৯২
নদীয়া	..	১৭,১৫,০৬৪	৮.৮০,৪০৯	৮,৩৪,৬৫৫
বাঁকুড়া	..	১৬,৬৭,৫২৭	৮,৪১,৯১২	৮,২৫,৬১৫
বীরভূম	..	১৪,৪৭,৬৩৮	৭,৩৪,০৯৯	৭,১৩,২৩৯
জলপাইগুড়ি	..	১৩,৬০,১১০	৭.৩২,৫৯০	৬,২৭,৫২০
পুরুলিয়া	...	১৩,৫৮,৮৪২	৬,৮৭,২৯২	৬,৭১,৫৫০
পশ্চিম দিনাজপুর	..	১৩,৩০,৩৪৬	৬.৯৬,৭৫৯	৬,৩৩,৫৮৭
মালদহ	..	১২,২০,৪৯১	৬,২২,০৯২	৫,৯৮,৩৯৯
কোচবিহার	..	১০,১৯,৭৪৭	৫,৩৯,৭৯৪	৪,৭৯,৯৫৩
দার্জিলিং	..	৬,২৪,৮৭০	৩.৩৪,৫৫৩	২,৯৩,৩১৭

মিউনিসিপ্যালিটি

হুগলি জেলায় ১২টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এই বারটি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কলের জল ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। আরামবাগ দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত। আরামবাগ ছাড়া অন্যান্য শহরগুলি ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। এগুলির নামঃ (১) উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, (২) কোতরং মিউনিসিপ্যালিটি, (৩) কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি, (৪) রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটি, (৫) শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি, (৬) বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটি, (৭) চাঁপদানী মিউনিসিপ্যালিটি, (৮) ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি, (৮) চন্দননগর করপোরেশন, (১০) হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি, (১১) বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি এবং (১২) আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটি।

উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ৬ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ৪·৯ বর্গমাইল

কোতরং মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ৯ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ... ২ বর্গমাইল

কোন্নগর মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ৮ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ... ২·১ বর্গমাইল

রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ১২ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ... ২·৪ বর্গমাইল

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ১৬ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ... ১·৩ বর্গমাইল

বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ১৮ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ... ৩·৫ বর্গমাইল

চাঁপদানী মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ১০ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ... ২·৫ বর্গমাইল

ভদ্রেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন

কমিশনার ... ৯ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)

আয়তন ... ২·৫ বর্গমাইল

প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

চন্দননগর করপোরেশন

মেয়র ... ১ জন
ডেপ্যুটি মেয়র ১ জন
আয়তন ... ৩·৭৩ বর্গমাইল
কাডান্সলার ২২ জন (মেয়র ও ডেপ্যুটি মেয়র সহ) ৩ জন অল্ডারম্যান

চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন
কমিশনার ... ২৮ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)
আয়তন .. ৬ বর্গমাইল

বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান . ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যান ... ১ জন
কমিশনার ৯ জন (চেয়ারম্যান ও ভাইস-[illegible]
আয়তন ... ৩·৫ বর্গমাইল

আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যান ... ১ জন; ভাইস-চেয়ারম্যা[illegible] ১ জন
কমিশনার .. ৯ জন (চেয়া[illegible] ও ভাইস-চেয়ারম্যান সহ)
আয়তন ... ৭·৫ বর্গমাইল

মিউনিসিপ্যালিটির লোকসংখ্যা (১৯০১—১৯৬১)

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
উত্তরপাড়া			
১৯০১	৭,০৩৬	৪,২০৩	২,৮৩৩
১৯১১	৭,৩৭৩	৪,৪১২	২,৯৬১
১৯২১	৮,৬৫৭	৫,১৪৯	৩,৫০৮
১৯৩১	৯,৩৫০	৫,৪৮০	৩,৮৭০
১৯৪১	১৩,৬১০	৭,৯৩৮	৫,৬৭২
১৯৫১	১৭,১২৬	৯,০৪১	৮,০৮৫
১৯৬১	২১,১১৮	১১,৪৯৭	৯,৬২১
কোতরং			
১৯০১	৫,৯৪৪	৩,৫০০	২,৪৪৪
১৯১১	৬,৫৭৪	৪,১০৩	২,৪৭১
১৯২১	৬,৮৪৬	৪,৩৩০	২,৫১৬
১৯৩১	৭,১৬০	৪,১৫৮	৩,০০২
১৯৪১	৯,৪০১	৫,৫৯০	৩,৮১১
১৯৫১	১৪,১৭৭	৮,৪৩৬	৫,৭৪১
১৯৬১	৩০,৯৭৭	১৭,০৪৯	১৩,৯২৮

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
কোন্নগর			
১৯৫১	২০,২২৩	১২,৫৪৯	৭,৬৮৪
১৯৬১	২৯,৬০০	১৭,৬৬৩	১১,৯৪০
রিষড়া			
১৯৫১	২৭,৪৬৫	১৭,৫৯৮	৯,৮৬৭
১৯৬১	৩৮,৫৮০	২৪,৭৮৪	১৩,৭৯৬
শ্রীরামপুর			
১৯০১	৪৪,৪৫১	২৬,৯২১	১৭,৫৩০
১৯১১	৪৯,৫৯৪	৩০,৩৬৩	১৯,২৩১
১৯২১	৩৩,১৯৭	২০,২১০	১২,৯৮৭
১৯৩১	৩৯,০৫৬	২৩,৯৮৫	১৫,০৭১
১৯৪১	৫৫,৩৪৯	৩৪,৪৩৪	২০,৯১৫
১৯৫১	৭৪,৩২৪	৪৫,৩০৬	২৯,০১৮
১৯৬১	৯১,৫৮০	৫৩,৪২২	৩৮,১৫৮
বৈদ্যবাটী			
১৯০১	১৭,১৭৪	৯,৮৫৯	৭,৩১৫
১৯১১	২০,৫১৬	১১,৭৯২	৮,৭২৪
১৯২১	১৬,৪৭১	৯,১৭৪	৭,২৯৭
১৯৩১	১৮,৪৮৬	১০,৩৬৯	৮,১১৭
১৯৪১	২৫,৮২৫	১৪,৯০৮	১০,৯১৭
১৯৫১	২৪,৮৮৩	১৪,২৯৩	১০,৫৯০
১৯৬১	৪৪,২৭৩	২৪,০৫১	২০,২২২
চাঁপদানী			
১৯২১	২৪,৬৫২	১৭,১৯৩	৭,৪৫৯
১৯৩১	২৫,০৬৫	১৭ ৪৯৭	৭,৮৬৮
১৯৪১	৩১,৮৩৩	২১,৩১১	১০,৫২২
১৯৫১	৩১,৫৪৩	১৮,৫৩৭	১৩,০০৬
১৯৬১	৪২,২০১	২৬,৩৫২	১৫,৮৪৯
ভদ্রেশ্বর			
১৯০১	১৫,১৫০	৮,৩৭৬	৬,৭৭৪
১৯১১	২৪,০৫৩	১৫,৮৬২	৮.৪১১
১৯২১	২২,০৮১	১৪,৪৮৭	৭,৫৯৪

	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
১৯৩১	২২,৯৯২	১৪,৯৩৮	৮,০৫৪
১৯৪১	২৭,৬৭০	১৭,৫৫৬	১০,১১৪
১৯৫১	৩৬,২৯২	২৩,৮৬৫	১২,৪২৭
১৯৬১	৩৫,৫৭৬	২১,২৫১	১৪,৩২৫
চন্দননগর			
১৯৬১	৬৭,৫৩৪	৩৬,৫৬২	৩০,৯৭২
হুগলী-চুঁচুড়া			
১৯০১	২৯,৩৮৩	১৫,৩৭৭	১৪,০০৬
১৯১১	২৮,৯১৬	১৫,৮১৭	১৩,০৯৯
১৯২১	২৯,৯৩৮	১৬,৭২৩	১৩,২১৫
১৯৩১	৩২,৬৩৪	১৮,৭৯৯	১৩,৮৩৫
১৯৪১	৪৯,০৮১	২৭,৬১৫	২১,৩৮৬
১৯৫১	৫৬,৮০৫	৩০.৬৮৩	২৬,১২২
১৯৬১	৮৩,৪৬৮	৪৪.৬৮২	৩৮,৭৮৬
বাঁশবেড়িয়া			
১৯০১	৬৪৭৩	৩,৩৬৫	৩,১০৮
১৯১১	৬,১০৮	৩,৪৪৩	২,৬৬৫
১৯২১	৬,৩৮২	৪,০৩২	২,৩৫০
১৯৩১	১৪,২২১	৯,৭৯৭	৪,৪২৪
১৯৪১	২৩,৭১৬	১৬,৩৫০	৭,৩৬৬
১৯৫১	৩০,৬২২	১৮,৯৮৯	১১,৬৩৩
১৯৬১	৪৫,৫১০	২৬,৯২২	১৮,৫৮৮
আরামবাগ			
১৯০১	৮,২৮১	৪,১৯৪	৪,০৮৭
১৯১১	৮,০৪৮	৪,০৬১	৩,৯৮৭
১৯২১	৭,৮৫৭	৪,১১১	৩,৭৪৬
১৯৩১	৭,৪৬১	৩,৯১৩	৩,৫৪৮
১৯৪১	৮,৯৯২	৪,৭৬৬	৪,২২৬
১৯৫১	১১,৪৬০	৬,১৩৯	৫,৩২১
১৯৬১	১৬,৫৬০	৯,০৪২	৭,৫১৮

পঞ্চাশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় মাত্র আটটি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। এগুলির নাম আরামবাগ, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী-চুঁচুড়া, কোতরং, শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া।

মেট্রোপলিটান কলিকাতা ও গঙ্গা তীরবর্তী পৌর সংস্থাসমূহ

মেট্রোপলিটান কলিকাতা

কলিকাতার উন্নয়নকল্পে দুইশত কোটি টাকা ব্যয়ে বর্তমান কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে নূতন কলিকাতার পত্তন করিবার এক পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে মেট্রোপলিটান কলিকাতা অর্থাৎ কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার দুইকূলে হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার যতগুলি পৌর এলাকা আছে সমস্ত পৌর এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ, জল প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সহজেই পাওয়া যাইবে।

মেট্রোপলিটান কলিকাতার মধ্যে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া, কোতরং, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, চুঁচুড়া-হুগলী এবং বাঁশবেড়িয়া এই এগারটি মিউনিসিপ্যাল শহর আছে।

হুগলী জেলায় যতগুলি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ১ হাজার ৮২টি গ্রামের লোকসংখ্যা পাঁচশতের কম এবং ৭ শত ৩৮টি গ্রামের লোকসংখ্যা পাঁচশতের উপর, কিন্তু দুই হাজারের কম। ৮৩টি গ্রামের জনসংখ্যা ২ হাজার আটশত এবং মাত্র ৩টি গ্রামের জনসংখ্যা ৫ হাজার ৮শত। এতদ্ব্যতীত হুগলী জেলায় ৪৫টি বসতিহীন গ্রাম আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'বর্দ্ধমানের জ্বর' নামক মহামারীতে এই গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপ বসতিহীন গ্রাম হুগলী জেলার কোন্ মহকুমায় কতগুলি আছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

হুগলী সদর মহকুমা

থানার নাম	গ্রামের নাম	আয়তন (একর)
পোলবা	নন্দীপুর	১২১
পোলবা	সোঁয়া	১৪৮
মগরা	হোঁদিয়াপোঁতা	৯৮
বলাগড়	রসুলপুর	১০০৩
বলাগড়	আশিতপুর	১৫০
বলাগড়	নওসরাই	৬০
বলাগড়	রামনগর	৬০
বলাগড়	ডুমুরদহচর	১২
বলাগড়	রামনগরচর	৮৭
বলাগড়	নওসরাইচর	১৩১
বলাগড়	রঘুনাথপুরচর	১৯৫
বলাগড়	রাজবল্লভপুর	৪
পাণ্ডুয়া	শ্যামসুন্দরপুর	১৪১
পাণ্ডুয়া	বলরামপুর	৩০৮
পাণ্ডুয়া	উত্তর দশদারুন	২৪৪

চন্দননগর মহকুমা

হরিপাল	ভূপতিপ্‌র	১২১
হরিপাল	কুমীরগড়	১২২
সিংগ্‌র	গোহেলপোঁতা	১৩২

শ্রীরামপ্‌র মহকুমা

চণ্ডীতলা	ডানকুনী	৪৮৮
চণ্ডীতলা	মাকালপাড়া	২৪২
জাংগীপাড়া	বিনোদবাটী	১০৮
জাংগীপাড়া	বীরচক্‌	২৫৬
জাংগীপাড়া	চক্‌বরদা	২৮৬

আরামবাগ মহকুমা

আরামবাগ	তিলীপাড়া	২৮৮
আরামবাগ	চামর্‌ল	১৩৬
আরামবাগ	পশ্চিম শিবপ্‌র	২৪৮
আরামবাগ	পাহাড়চক্‌	২০৮
আরামবাগ	কাশীগড়	২৫৫
আরামবাগ	বড় গড়িয়া	১৫৫
আরামবাগ	লালারচক্‌	১১৬
আরামবাগ	শিকিল মোবারকপ্‌র	৩৫০
গোঘাট	বলিভাকুণ্ডা	১৫৫
গোঘাট	নরহরবাটী	১৬২
গোঘাট	বালিরচক্‌	১০০
গোঘাট	জানকীবল্লভপ্‌র	১৩৩
গোঘাট	বাব্‌ইমারি	১৪২
গোঘাট	শিকিল বেলডিহা	১৮৫
গোঘাট	বড়সোলা বেলতলা	৫২৩
গোঘাট	উত্তর অর্জ্‌নগড়িয়া	৪১৮
খানাকুল	মাণিকদ্বীপ	২০২
খানাকুল	মহিষনালা-দামকুণ্ডু	১৩৪
খানাকুল	পারকাজাহর	১০৫
খানাকুল	হায়াৎপ্‌রচক্‌	১২৯
খানাকুল	মনস্‌কা	১৬২
খানাকুল	দক্ষিণ স্‌দামচক্‌	২৯২
খানাকুল	চকসোনাটিকি	৪৭০

এই গ্রামগুলি এক সময় সমৃদ্ধিশালী ও শস্যশ্যামলা ছিল। বর্তমানে রাস্তাঘাট ও জলাশয়ের ব্যবস্থা করিলে এই গ্রামগুলিকে জনাকীর্ণ করা যায় কিনা, তাহা হুগলী জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগে জানান কর্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়।

কোন স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া থাকিলে তাহা মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়। যে-সকল স্থানগুলির বিষয় এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে,—সরকার চেষ্টা করিলে এই বসতিহীন গ্রামগুলিতে অনেক কিছু করিতে পারেন, তাহাতে কেবল হুগলী জেলার নয় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের উপকার হইবে। হুগলী জেলার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আমি এই জেলার বসতিশূন্য গ্রামগুলির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।*

॥ পাঁচসালা পরিকল্পনা ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে হুগলী জেলার মধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম্য রাস্তা নির্মাণ নলকূপ স্থাপন পুষ্করিণী সংস্কার ও জঙ্গলাদি পরিষ্কার করায় ম্যালেরিয়া এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্য হইতে ম্যালেরিয়া রোগের পূর্ণ বিলুপ্তি সাধনের জন্য এক পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য পাঁচ

* আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গবাসী পূর্ববঙ্গ হইতে গৃহহারা যাহাদের ভারস্বরূপ মনে করিতেছেন, তাহাদিগের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া, পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী-বসবাস করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, তাঁহারা দেখিবেন যে, আমাদের পূর্ববঙ্গবাসী ভ্রাতাদের পুনর্বাসন দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ, শ্রী, সম্মান প্রভৃতি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গকেই গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

"হুগলী জেলার ইতিহাস"এর যশস্বী লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র মহাশয়ের—"হুগলী জেলার বসতিহীন গ্রাম" শীর্ষক যে প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহার প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকারের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীমিত্র দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক—সুতরাং তাঁহার বক্তব্যের উপর নির্ভর করা চলে বলিয়া মনে করি। তাঁহার প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র হুগলী জেলারই বিভিন্ন থানায় ৪৫ খানি বসতিশূন্য গ্রাম ৯৫৮৫ একর জমি ক্রমশঃ অরণ্যে পরিণত হইতেছে। হতভাগ্য গৃহহারা বাঙ্গালীকে 'আন্দামান,' 'দণ্ডকারণ্যে' আর যেখানে তাহারা অবাঞ্ছিত সেই বিহার ও আসামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা অপেক্ষা, এই সকল বসতিহীন গ্রামের সংস্কারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া, সেখানে ইহাদের বসবাস করাইতে পারিলে মনে হয় শ্রীরায়ের ভবিষ্যদ্বাণীরও সাফল্য ঘটিবে এবং ব্যয়ও বর্তমান সমুদয় পরিকল্পনার তুলনায় অনেক কম হইতে পারে। (বার্তাবহ, সম্পাদকীয়, ১৭ই ভাদ্র ১৩৬৫)

বৎসরে মোট ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা এবং বাকি অর্থ রাজ্য সরকার ব্যয় করিবেন।

পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার, ১৯৬২-৬৩ সালে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৬২ হাজার, ১৯৬৩-৬৪ সালে ৯৫ লক্ষ ৯২ হাজার, ১৯৬৪-৬৫ সালে ৪৯ লক্ষ ১ হাজার এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ৫১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

॥ নদনদী ॥

নদীমাতৃক বাঙগলাদেশের ছোট বড় অসংখ্য নদনদী বাঙগলাকে গড়িয়াছে বাঙগলার আকৃতি প্রকৃতি গঠন করিয়াছে। এক কথায় এই নদনদীই বাঙগলার আশীর্বাদ—বলা বাহুল্য ইহারাই একদিন বাঙগলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে। বাঙগলার সমস্ত নদনদী উচ্চভূমি হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পলিমাটি বহন করিয়া আনিয়া নীচু জায়গাগুলি গড়িয়াছে বলিয়া বাঙগলার মাটি এত কোমল ও কমনীয়। এই নরম মাটি লইয়া বাঙগলার নদীগুলি কত নগর, কত গ্রাম, কত মঠ-মন্দির, কত দেব-দেউল, কত শস্যশ্যামল প্রান্তর যে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই সব নদী পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, বিপুল জলধারাকে প্রবাহিত করিয়া নব নব ভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। তাই নদনদীগুলি এককথায় বাঙগলার প্রাণ।

অতীতকালে এই নদনদীগুলির প্রবাহপথের সঠিক ইতিহাস আজ আর জানা যায় না। বর্তমান নদনদীগুলির প্রবাহপথের যে চেহারা এখন আমরা দেখিতে পাই, পূর্বে কিন্তু তাহাদের অনেকেরই সে চেহারা ছিল না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ ও নকসার সাহায্যে বাঙগলার নদনদীগুলির গতিপথ কিরূপ ছিল, তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। এই সব নদীর তীরে মানুষের বসতি, গ্রাম, নগর, বাজার সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য কৃষি-বাণিজ্য, ধর্মাধর্ম সব কিছুরই বিকাশ হইয়াছিল। শস্যশ্যামলা বাঙগলা নদীগুলির দান; তাই বাঙ্গালী ভালবাসিয়া নদীগুলির নাম দিয়াছে সরস্বতী, কৌশিকী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, দামোদর, আমোদর, সুবর্ণরেখা, কুন্তী, বেহুলা। এইরূপ ব্যঞ্জনাময় অর্থমূলক নাম নদী ছাড়া আর কাহারও নাই।

হুগলীর ভূপ্রকৃতিতে প্রধান অপ্রধান ছোট বড় নদনদীর খাত পরিবর্তনের কথা, নূতন নদীর সৃষ্টি হওয়া ও কত নদী মজিয়া যাওয়ার হিসাব নিকাশ বাঙগলার প্রাচীন ভূমি-নকসায় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে আমাদের দেশের নদনদী ও জনপদগুলির আকৃতি, পুরাতন নদীর মৃত্যু এবং নূতন নদীর সৃষ্টি এই সমস্ত নকসাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে জাও-ডি ব্যারোসের, ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে গ্যাসটাল্ডির, ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে হনডিভসের, ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টেলি-ডা-ভিগনোলা, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ফান ডেন ব্রোকের ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ডোলসলি, ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে এফ, ডি, উইট, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইজাক

টিরিওন. ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে দ্য-অভিলি, ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে থর্নটন এবং ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে রেনেলের নক্সায় নদনদীর পরিবর্তনগুলি ধরিতে পারা যায়।*

এই সমস্ত নকসা ছাড়া বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্য, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতি জাতীয় সাহিত্য-গ্রন্থ ও মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাস এবং ইবন বতুতা (১৩২৮-৫৪), বারনি (১৫০০), রালফ ফিচ্ (১৫৮৩-৯১), ফারনাণ্ডেজ (১৫৯৮), ফনসেকা (১৫৯৯) প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী হইতে বাঙ্গলার নদনদীগুলির সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীন জনপদগুলির পরিবর্তনের চেহারা ধরিতে পারা যায়।

সাম্প্রতিক কালে শ্রীএন. কে, বসু ও শ্রীনীহাররঞ্জন রায় বহু প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে নদনদীর প্রাচীন প্রবাহের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। গঙ্গা-ভাগীরথী ও দামোদর প্রকৃতপক্ষে হুগলী জেলার আকৃতি গঠন করিয়াছে। ভাগীরথী রাজমহলের সোজা উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার তীর প্রায় ঘেঁসিয়া তেলিগড় ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম—বাঙ্গলার প্রবেশপথ। এই গিরিবর্ত্ম দুইটি ছাড়িয়া রাজমহলকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা বাঙ্গলার সমতল ভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীরায় লিখিয়াছেন, পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী সংকীর্নতোয়া সন্দেহ নাই কিন্তু তখন তাহার প্রবাহ আজিকার মত ক্ষীণ নয়। সাগর মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত সমানে বড় বড় বানিজ্যতরীর চলাচল তখনও অব্যাহত। ফান্ ডেন্ ব্রোকের (১৬৬০) দেড়শত বৎসর আগে বিপ্রদাস তাঁহার 'মনসামঙ্গলে' এই প্রবাহপথের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সুপরিচিত নয়। কাজেই. এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিপ্রদাসের চাঁদ সওদাগরের বানিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হইয়া সাগর মুখের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। যাইবার পথে তাহার পড়িতেছে অজয় নদী, উজানী, শিবানদী (বর্তমান শিয়ালনালা), কাটোয়া, ইন্দ্রানী নদী. ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, ফুলিয়া. গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম (সপ্তগ্রাম যে গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনা সংগমে. বিপ্রদাস তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই), কুমারহাট ডাইনে হুগলী. বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো. পূর্বে কাকিনাড়া. তারপর মুলাজোড়া, গাড়ুলিয়া. পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডাইনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর. বাঁকিবাজার, নিমাইতীর্থ (বর্তমান বৈদ্যবাটি). চানক. মাহেশ. খড়দহ, শ্রীপাট, ডাইনে রিষিড়া, বামে সুখচর. পশ্চিমে কোন্নগর, ডাইনে কোতরং. বামে কামারহাটি. তারপর ঘুষুড়ি, চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড়, কালীঘাট এবং সর্বশেষ সাগরসংগম তীর্থ যেখানে 'তীর্থ কার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ।'

* Jao de Barros (1550), Gastaldi (1561) Hondivs (1614), Thornton (1675), Cantelli da Vignolla (1683), Van den Broucke (1660), G Delisle (1720), Izzak Tirion (1730 , F de Witt (1726), de I' Auville (1752), Rennel (1764.)

বিপ্রদাসের বর্ণনার সঙ্গে ফান্-ডেন- ব্রোকের নকসায় লিখিত স্থানগুলির বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই এক। নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী, কোটগ্যাম্ অর্থাৎ সপ্তগ্রাম (Coatgam) ওগলি অর্থাৎ হুগলী (Oegli) কলিকাতা প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। লক্ষ্যণীয় এই, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রদাস হুগলী ও কলিকাতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাই হুগলী ও কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ। বারোসের নক্সায় সপ্তগ্রামের (সাতগাঁও —Satigam) সঙ্গে অগ্রপাড়া ও বরাহনগরের উল্লেখ আছে।

পঞ্চদশ শতকের আগে ভাগীরথী সরস্বতী খাত দিয়াই সমুদ্রে প্রবাহিত হইত বলিয়া শ্রীনীহাররঞ্জন রায় প্রমাণ সহযোগে যাহা লিখিয়াছেন আমরাও এই বিষয়ে তাহার সহিত একমত। ষোড়শ শতকে জাও ডি বারোসের নক্সায় সরস্বতীর প্রবাহপথ একেবারে ভিন্নতর। সপ্তগ্রামের নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি, কিন্তু সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী সোজা পশ্চিম-বাহিনী হইয়া যুক্ত হইতেছে দামোদর-প্রবাহের সঙ্গে বাঁকা-দামোদর সংগমের নিকটে। শ্রীরায়ের অনুমান যে, এই প্রবাহপথই গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রাচীনতর প্রবাহপথ, এবং সরস্বতীর পথ ইহার নিম্ন অংশ মাত্র।

দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথেই যে এক সময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল, তাহা জাও ডি বারোসের নক্সা এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মেজর হার্স্টের রিপোর্ট হইতে অনুমান করা যায়। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া সোজা দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া রূপনারায়ণ-পত্রঘাটার প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হইত। সেই সময় রূপনারায়ণের নিম্নপ্রবাহ সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল। অষ্টম শতকের পরেই সরস্বতী-ভাগীরথীর এই প্রাচীনতর প্রবাহপথের মুখ এবং নিম্নতর প্রবাহ শুকাইয়া যায় এবং তাহার ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দর শুকাইয়া যায়।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিক সাহেব স্পষ্ট বলিতেছেন, ব্যাতোড়ের উত্তরে সরস্বতীর প্রবাহ অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য ছোট ছোট জাহাজ সপ্তগ্রাম পর্যন্ত যাওয়া আসা করিতে পারে না।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে এই অঞ্চলের ছোট বড় ছত্রিশটি প্রাচীন নদ-নদীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার উল্লিখিত অনেকগুলি নদী বর্তমানে ভরাট হইয়া যাইলেও নদীমাতৃক বাঙ্গলার ক্রমপরিবর্তমান চেহারা ধরিবার জন্য উহা উল্লেখ্যঃ

প্রবলতরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা,
ভৈরবী কর্মনাশা।
ধাইল দ্রুতপদ, ষোড়শ মহানদ,
ধাইল বাহুদা বিপাশী॥
আমোদর দামোদর, ধাইল দারকেশ্বর
শিলাই চন্দ্রভাগা।
কেদাই দেবাই, ধাইল দুই ভাই,
বগরীর থানা ধাইল বগা॥

ধাইল ঝুমঝুমি, কামরা দামামা।
মিরাই মুণ্ডাই সঙ্গে।
ধাইল [illegible]ুলী, গুসকরা বু[illegible]নী,
রম্না চলিল সঙ্গে॥
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
ধায় কাণা দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, ধাইল রঙ্গে,
আর বুড়া মন্তেশ্বর॥
ধাইল বরুণা, গঙ্গা যমুনা,
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, কাণা ধায় গোমতী,
সরযু কংশাবতী
ধাইল কাঁসাই, মহানন্দা বিড়াই
খরস্রোত বামুনের খানা।
চারিদিকে জল, ধাইল ধবল,
মগরা জুড়িয়া ফেনা॥
বাজায়ে দণ্ডী, কাঁসাই চণ্ডী,
নড়িলা সত্বর হয়্যা।
চণ্ডীর আদেশে, শিলা শিল বরিষে,
কান্দে সাধু মাথায় হাত দিয়া॥

বাঙ্গলা দেশ নদীমাতৃক; বাঙ্গলার হিন্দু সভ্যতা তাই 'গাঙ্গেয় সভ্যতা'। স্মরণাতীত কাল হইতে পশ্চিম-বঙ্গে বহু বড় বড় হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্থান সেই জন্য হিন্দুদের আবাসভূমি ও হিন্দু-সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। এই জেলার মধ্য দিয়া চারিটি প্রধান নদী প্রবাহিত হইয়াছে; তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের নাম ভাগীরথী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর এবং রূপনারায়ণ। এই নদীগুলির অবস্থান সংক্ষেপে লিখিত হইল।

হুগলী জেলার পূর্বদিকে ভাগীরথী নদীর পঞ্চাশ মাইল এই জেলার মধ্যে আছে। এই সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব 'হুগলী গেজেটিয়ারে' লিখিয়াছেন:

The Ganges has three distinct divisions, the upper section from the point of bifurcation to its confluence with the Jalangi at Nadia, the central section from Nadia to its confluence with the Rupnarain at Hooghly point and the lower section from Hooghly point to the sea. The central section is a little more than 120 miles long of which 50 miles lie along the eastern boundary of Hooghly district.

গঙ্গা-ভাগীরথীকে বৈদেশিক বণিকগণ হুগলীর পার্শ্বে বলিয়া ইহাকে হুগলী নদী বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' লিখিতেছেন :

"হুগলী শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই। পূর্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়দের বাণিজ্যের স্থানি সেই স্থানে ছিল, পরে সেখান হইতে কলিকাতা হইল। ইংলণ্ডীয়েরা এ দেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না, তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলী নদী কহিতেন।" (আগষ্ট ১৮১৮)

ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পোর্তুগীস ও ওলন্দাজ নাবিকগণের দ্বারা অঙ্কিত বঙ্গদেশের কয়েকখানি পুরাতন মানচিত্র আছে; উক্ত মানচিত্রগুলি দেখিলে, গঙ্গার গতির কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের গাশতাল্ডির মানচিত্র এবং ১৫৫৩ হইতে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত ডি-ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে, তৎকালীন গঙ্গার সহিত বর্তমান গঙ্গার যে কত প্রভেদ, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় হুগলী জেলার নৈসর্গিক সীমার বহু পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ বলিতে পারা যায়। উইলিয়মে ব্রুটন বলেন যে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহর গঙ্গা নদীর একটি দ্বীপ ছিল। 'বার্ণিয়ার ট্রাভেলে' প্রদত্ত একখানি মানচিত্রেও হুগলীকে একটি দ্বীপ বলিয়া দেখান আছে। ষ্টুয়ার্টের 'ডেসক্রেপটিভ-ক্যাটলগে' লিখিত আছে যে, পোর্তুগীজগণ গঙ্গার দিক ব্যতীত অপর তিন দিকে গড়-খাত কাটিয়া, তাহা জলে পূর্ণ করিয়া রাখিত; যাহাতে অন্য কোন ব্যবসায়ীবৃন্দ তাঁহাদের সীমানার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতে না পারে।

রেনেল সাহেবের ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত **The Hoogly River from Nuddeah to the sea with Balasore Road** শীর্ষক প্রামাণিক মানচিত্রের সহিত বর্তমান ভাগীরথীর তুলনা করিলে, এই নদীর গতি যে কত পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র 'পুরন্দর খাঁ' নামক গ্রন্থে ভাগীরথী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অংশবিশেষ এই স্থানে উল্লেখ্য :

"যে নদীপথ দ্বারা কবিকঙ্কন চণ্ডীর শ্রীমন্ত সওদাগর পোতে গমন করিয়া মগরার মহা ঝড় ও বৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে সমুদ্রপথ দ্বারা সিংহলে গিয়াছিলেন, সে নদীর এক্ষণে চিহ্ন মাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান ভাগীরথী কালীঘাট উত্তীর্ণ অনতিদূরে টালির নালায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সরস্বতী ও রূপনারায়ণের খাঁড়ী এক্ষণে ভাগীরথীর পরিদৃশ্যমান মুখ এবং তাহা ইংরাজ বাহাদুর কর্তৃক হুগলী নামে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভাগীরথীর মুখ নহে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে খিদিরপুর হইতে সাঁখরাল পর্যন্ত নদীর চিহ্নমাত্র ছিল না। ভাগীরথীর সহিত সরস্বতীর যোগ প্রথমতঃ একটি খাল কাটিয়া সম্পাদিত হয়। জলপ্রবাহে ঐ খাল ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে 'কাটি গঙ্গা' হইয়াছে; 'কাটি গঙ্গা' এক্ষণে হুগলীর একাংশ।"

১৬৫৮-১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ শাসনকার্তা ম্যাথুস ফান ডেন ব্রোক গঙ্গা নদী

জাও-ডি ব্যারোজের প্রাচীন নকশা (১৫৫০ খৃঃ)
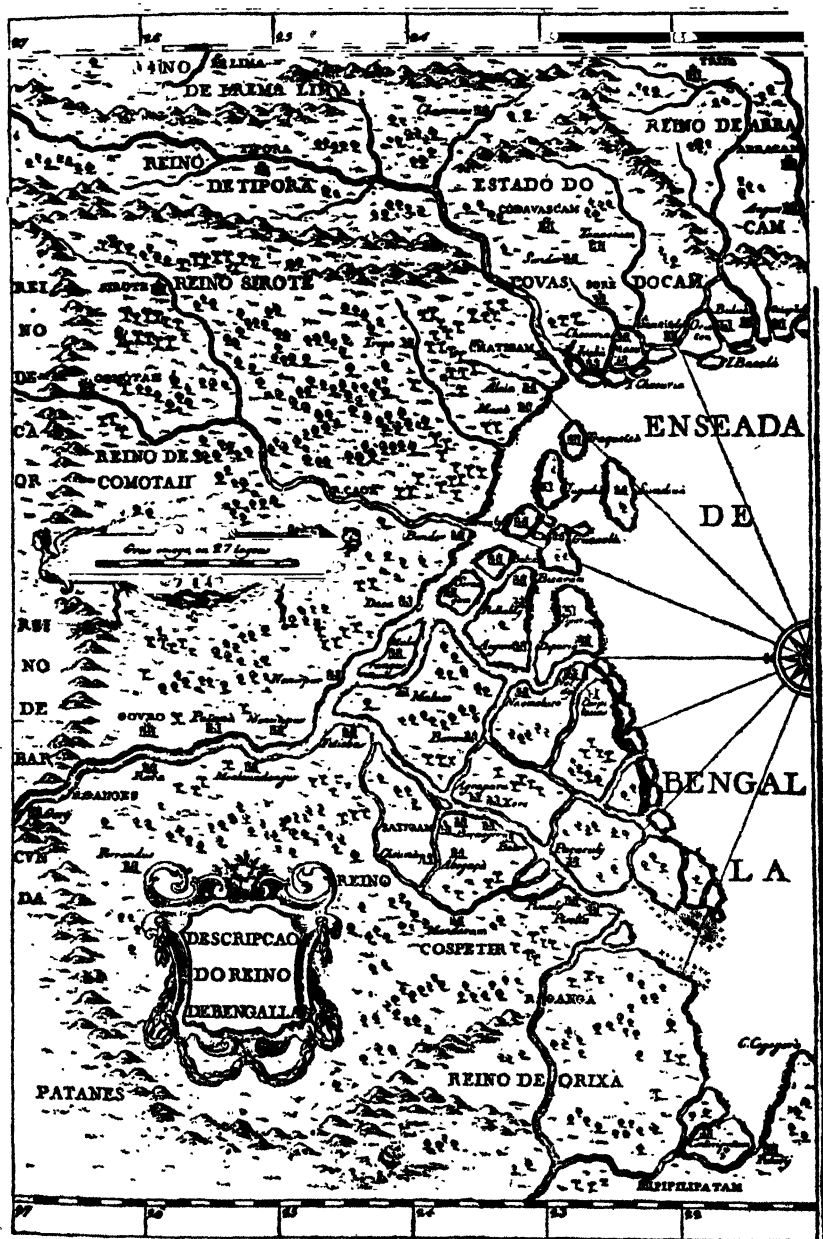
জরিপ করেন এবং প্রথম পাইলট চার্ট প্রস্তুত করেন। তাহার পর ব্রেকের সময় ইংরাজগণ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা জরিপ করেন এবং ইহা হইতে 'পাইলট সার্ভিসে'র সূত্রপাত হয়। বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপিতে গঙ্গাকে বলা হইয়াছে "সুরসরিৎ" অর্থাৎ স্বর্গনদী বা দেব নদী।

শ্রীমন্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গঙ্গার মহিমা যে ভাবে স্তব করিয়াছিলেন, শ্রীমদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাহা "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে মহাপ্রভুর 'স্তব' কয়েকলাইন উদ্ধৃত হইল:

সবে এক নিত্যানন্দ সিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি বহু করিলা ক্রন্দন॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুন স্তুতি করি করেন প্রণাম॥
"প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুন ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী শৃগাল কুক্কুর যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের উপমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাই আর॥"

দামোদর—এই নদ ছোট নাগপুর পাহাড় হইতে বাহির হইয়া উত্তরে বর্ধমান জেলার হবিবপুর ও সাহাপুর গ্রামের মধ্য দিয়া হুগলী জেলায় প্রবেশ করিয়া, দক্ষিণে আমতার পার্শ্ব দিয়া সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই নদ সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমাকে আরামবাগ মহকুমার সহত পৃথক করিয়া দিয়াছে। দামোদর নদের আঠাশ মাইল এই জেলার ভিতর আছে এবং ইহা দৈর্ঘ্যে অর্ধ মাইলের উপর। দামোদরের স্বাভাবিক গতি বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়ায় হুগলীর জেলার বহু নদী মজিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলেই এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার জন্য বহু গ্রাম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য অম্বিকাচরণ গুপ্ত "পরিত্যক্ত পল্লী" নামক একখানি কবিতার পুস্তক রচনা করেন। ১২৭৯ সালের পৌষ মাসের বঙ্গদর্শন উক্ত পুস্তিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন "আমরা ভরসা করি নদ আর

দামোদরের প্রাচীন খাত

মেজর হাণ্টের নক্‌সা
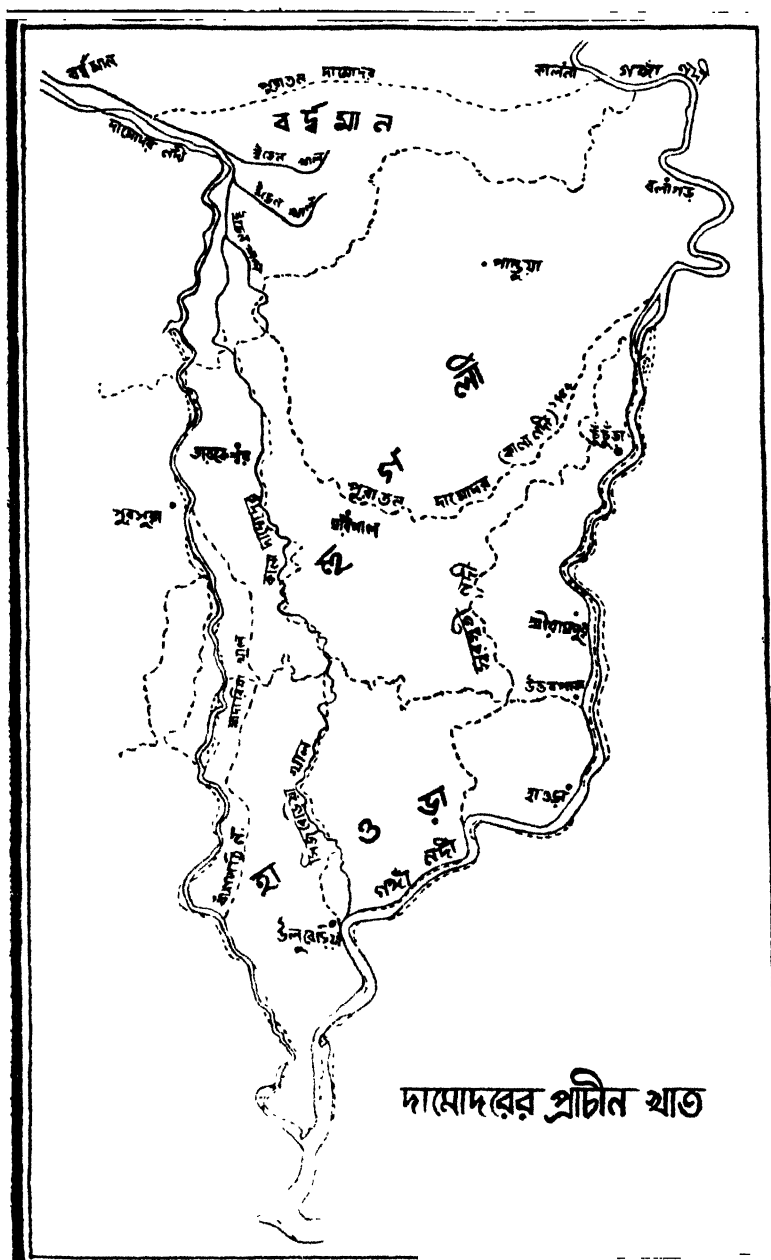
এমন দুষ্কর্ম করিবেন না।” দামোদরের বাঁধের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া ডাঃ বেন্টলি প্রমুখ বহু মনীষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাথ সাহা দামোদরের বাঁধকে ‘সয়তানী বাঁধ’ আখ্যা দিয়াছেন এবং পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গের ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ যে, এই ‘সয়তানী বাঁধ’ তাহাও তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। হুগলী সদর চন্দননগর এবং শ্রীরামপুর মহকুমায় দমোদরের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে; বর্তমান খাতে প্রবাহিত হইবার পূর্বে যে স্থান দিয়া দামোদর প্রবাহিত হইত, তাহাই বর্তমানে ‘কাণানদী’ বলিয়া খ্যাত। মেজর হার্স্টের অংকিত দামোদরের প্রাচীন খাতের নক্সা হইতে উহা পূর্বে কোন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা জানা যায়।

দামোদর নদের উৎপত্তি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে রাঁচি সহরের পঞ্চাশ মাইল উত্তর পূর্ব, লোহারডাগার কাছাকাছি কোনও জায়গায়; সেখানকার উচ্চতা দু’হাজার ফুট। দামোদর দৈর্ঘে ৩৩৭ মাইল। উহার একটি শাখা কলিকাতার তিরিশ মাইল দক্ষিণে জেমস ও মেরি স্যান্ডস্ বা গাঙ্গদাড়া নামক বিখ্যাত চোরাবালি কেন্দ্রের কাছে মিলিত হইয়াছে। অপর একটি শাখা কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণ নদের সংগে মিলিত হইয়াছে। যে শাখাটি ভাগীরথীতে পড়িয়াছে, তাহার নাম কাণা-দামোদর; নামেতেই প্রকাশ যে নদীর তেজ এখন কতখানি।

ছোট নাগপুরে দামোদরের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব। রাঁচি অথবা হাজারীবাগ হইতে অনেকেই দামোদর ও ভেড়ানদীর সংগমস্থান রাজরূপার অপরূপ দৃশ্য দেখিয়াছেন; শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বর্ধমান সহরের কাছে উচ্ছৃংখল দামোদরের শোভা অনেকে দেখিয়াছেন, আবার কাণানদীর বিগত যৌবনের শোভাও অনেকে দেখিয়াছেন। যে কয়টি নদী দামোদরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইল নুনিয়া ও বরাকর। কথায় আছে—

“ক্ষুদে, নুনে, বরাকর
তিন নিয়ে দামোদর।”

বরাকরের সঙ্গে আবার উশ্রী মিশিয়াছে। দুইশত মাইল অর্থাৎ রাণীগঞ্জ পর্যন্ত দামোদর পাহাড়ী নদী, পাড় পাথুরে, নদীর গতিপথ গভীর ও স্রোতরেখার কোন পরিবর্তন হয় নাই। উৎস-মুখ হইতে কিছুদূর পর্যন্ত নদীর নিম্নগামী ঢাল প্রতি মাইলে আট ফিট, কিন্তু রাণীগঞ্জের কাছে ঢাল প্রতি মাইলে তিন ফিট, তারপর হইতে ঢাল আরও কম। বর্ষাকালে নদী যখন ফুলিয়া যায় তখন স্রোতের সংগে আসে বালি আর পলি। নদীর ঢাল খুব কম অথবা নাই বলিলেই চলে, সেইজন্য এই বালি আর পলি ক্রমশঃ তলায় পড়ায় নদীর গতিপথকে উঁচু করিয়া দিতেছে। বেশীর ভাগ তলানি পড়ে দামোদর যেখানে ভাগীরথী অথবা রূপনারায়ণের সংগে মিশিয়াছে, সেখানে এই দুইটি নদীর প্রবল স্রোতে প্রতিহত হইয়া এই বালি আর পলি প্রচুর পরিমাণে জমে। ফলে এই অঞ্চলে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে, আর নদী কেবলই তাহার গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করিতেছে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের আগে দামোদরের প্রধান স্রোত ছিল অন্য রকম তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, তখন নদী বর্ধমান সহরের কিছু দক্ষিণ হইতে বাঁ-দিকে বাঁকিয়া একেবারে ভাগীরথীতে পড়িত, কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে কালনার কাছে। নদীর ঢাল কম

বলিয়া হুগলী ও বর্ধমান জেলায় ইহার গতি মন্দ, তদুপরি আবার নীচে তলানি পড়ায়, স্রোত আরও কমিতেছে। সেইজন্য বর্ষাকালে জল যখন বেশী হয়, নদী তখন তাহার গতিপথ, পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করে। গত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৎসর দামোদরে বন্যা হয়। একথা অনেকেরই স্মরণ আছে, কারণ রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য অনেককে ঘোরাপথে উত্তর ভারতে যাইতে হইত। সেবার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল শক্তিগড় রেল ষ্টেশনের কিছু দূরে মাণিকহাটী নামক গ্রামের সন্নিকটে। এই বন্যার জল যে পথে বহিয়া ভাগীরথীর সঙ্গে কালনার কাছে মিশিয়াছিল, অনেকের মতে তাহাই হইতেছে দামোদর নদের প্রাচীন গতিপথ। বাস্তবিক এই বন্যার স্রোত এমনই ছিল যে, মনে হইত ঠিক যেন একটি নদী এইখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে। বন্যার জল যখন সরিল তখন দেখা গেল যে, বন্যার গতিপথ বালিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে আর উভয় পার্শ্বে জমি অপেক্ষা এই গতিপথটাই নীচু; হঠাৎ যেন নদীর সমস্ত জল শুকাইয়া গিয়াছে। যাই হোক ইহার ফলে রেল কোম্পানীকে বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় এবং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের জমি প্রচুর বালিতে চাপা পড়ায় চাষের অযোগ্য হইয়া যায়। সেখানে এখন প্রচুর কাশগাছ জন্মায়। শরৎকালে ফুল ফুটিলে মনে হয় নদী যেন কাশ ফুলের নদী। বিমান হইতে হয়ত সত্যিকারের নদী বলিয়া মনে হইতে পারে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে নদী, হঠাৎ হয়ত কোনো গভীর বন্যার ফলে, একেবারে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া যায়। কিন্তু পুরানো দামোদরের একটি ক্ষীণধারা রহিয়া গেল, যা কুন্তী নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, ভাগীরথীতে মিশিত। এই ক্ষীণ ধারাটিকে লোকে কানাসোণার খাল বলিত; সম্ভবতঃ কলিকাতার বন্দর বাঁচাইবার জন্য ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কাণাসোণার উৎসমুখ বাঁধ দিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে মরিল ঐ অঞ্চলে প্রবাহিত কয়েকটি নদীর সঙ্গে বেহুলা ও গাঙ্গুর; আর মরিতে বসিয়াছে বাঁকা নদী। এই কাণাসোণা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে হুগলী জেলা আজ অন্ধ হইতে বসিয়াছে।

জনৈক তরুণ বয়স্ক ধর্মোপাসক ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে "দামোদরের বন্যা" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন; উহাতে বন্যায় বিধ্বস্ত অধিবাসীদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহার একটি সুন্দর চিত্র আছে, নিম্নে উহার অংশ বিশেষ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়" হইতে উদ্ধৃত হইল। কবিতাটি ২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

অবধান কর ভাই শুন সর্বজন।
মন দিয়া শুন সভে করি এ বিবরণ॥
সন হাজার বায়াত্তর (১০৭২) সালে প্রথম আশ্বিনে।
দামোদরে আইল বান শুন সর্বজনে॥
আড়া চারি জল হইল পর্বত-উপর।
মনুষ্য ডুবাতে মন কৈল দামোদর॥
পর্বত হইতে জল পড়ে মহাতেজে।
হুড় হুড় দুড় দুড় জলের শব্দ বাজে॥
যোজন যুড়িয়া জল হইল পরিসর।

উপাড়িয়া ফেলিল যত গাছ পাথর॥
তৃণ আদি কাষ্ঠ খড় হইল একার্নব।
পর্বত-প্রমাণ হয়্যা পড়ে ঢেউ সব॥
পক্ষ আদি জলে ভাসে ইকুড়া ইন্দুর।
নকুল সজারু ভাসে শৃগাল কুকুর॥
শজারু কুম্ভীর ভাসে পিঁপিড়া অপার।
শার্দ্দুল মহিষ গণ্ডা জুড়িল সাঁতার॥
ভল্লুক ভাসিল জলে বিধির বিপাকে।
পড়িঞা বানর সব পরিত্রাহি ডাকে॥
নিশিযোগে ভাস্যা গেল কত শত বালা।
এখন শুনহ সবে মনুষ্যের খেলা॥
ব্রাহ্মণ বলেন বাম হৈলে ভগবান।
খুংগী পুথি ভাস্যা গেল ভারত পুরাণ॥
আছিল বিড়াল সব আম্বারিয়া কোনে।
উবু ডুবু করি সব মরিল পরানে॥
গোযালা সহিত কত ভাসে গাভী পাল।
হিম জল খায়্যা কত মরিল রাখাল॥
ভাসিল চাষের ধান্য মাথাইল লাঙ্গল।
গন্ধবাণ্যার ভাসে গেল লবঙ্গ জায়ফল॥
ছুতারের চিড়া গেল তামিলীর (ক) লুন।
তিলির ভাসিল তেল তাঁতীর বসন॥
বাজন্দারের বাজনা গেল সোণারিয়া কাণ।
ডোমের চুপড়ি গেল মৎস্যের দোকান॥
কুমারের চাক গেল রজকের পাটা।
মোদকের দোকান গেল কয়ালের কাঁটা॥
কায়স্থের কাগজ গেল দৈবজ্ঞের পাঁজি।
মিঞা সাহেবের ভেসে গেল পুরাতন কাঁজি॥
মুচির চামড়া গেল বারুইএর পান।
বাগদীর খালুই গেল মালীর বাগান॥
শিরে করাঘাত মারি কান্দয়ে কামার।
দোকান ভাসিয়া গেল কি হবে আমার॥
বাইতির মৃদঙ্গ গেল বৈষ্ণবের মালা।
অক্ষটীর (খ) ভাস্যা গেল হাতের সাতলা॥

(ক) তাম্বুলীর। (খ) শিকারীর।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী 'সমাচার দর্পণ' পত্রে দামোদর নদ সম্বন্ধে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

দামোদর নদ।—দামোদর নদের জল বৃদ্ধিপ্রযুক্ত যে ক্ষতি নিয়ত হয় তন্নিবারণার্থ এক খাল কাটনের বিষয়ে সংপ্রতি অনেক আন্দোলন হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব আমরা রিফার্ম্মর পত্র হইতে গ্রহণ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

দামোদর নদ রামগড় ও বর্দ্ধমান দিয়া পূর্বদিগ্‌বাহী হইয়া চেচাই ও সিধাপুর পর্যন্ত গিয়াছে। ঐ স্থানে গবর্ণমেন্ট অতি দৃঢ়রূপে এক পুলবন্দি করিয়াছেন তৎপরে দক্ষিণ দিগে বহিয়া সেলামাবাদে দুই স্রোতে বিভক্ত হয়। প্রধান ভাগ শ্রীকৃষ্ণপুর ও রাজবলহাট দিয়া ১৮ ক্রোশ পর্যন্ত বহিয়া ফলতার কিঞ্চিৎ ভাটিয়ানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলে। ঐ নদের উভয় দিগেই অতিশক্তরূপে পুলবন্দি আছে। অপর স্রোতের নাম কানা নদী দক্ষিণ দিগ বাহিনী হইয়া বন্দিপুর পর্যন্ত চলে। তৎপরগতা নদীর অনেক বাঁক আছে কিন্তু ঠিক দক্ষিণে গোপালনগর পর্যন্ত যায় তৎপরে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশ বহিয়া চন্দননগর ও হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিমে নয়াসরায়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলে। এই খালের মোহানা সেলামাবাদের নিকটে বালিতে এমত পুরিয়া গিয়াছে যে প্রধান নদে যদি অধিকতর জল বৃদ্ধি না হয় তবে ঐ বালির উপর দিয়া জল চলিতে পারে না জল বৃদ্ধি হইলেও অত্যল্প চলিবে এই নিমিত্ত তাহার নাম কানা নদী। এতদ্রূপে দামোদরের জল বৃদ্ধি হইলে তাহার বেগ যাহাতে কোন বাধা নাই এমত দুই খোলাসা মুখে না বহিয়া এক প্রণালীতে পুলবন্দিতে প্রতিবন্ধকতা অপর প্রণালীতে বালিতে প্রতিবন্ধকতা সুতরাং তৎপ্রযুক্ত বন্যা হয় এবং বর্ষাকালে ঐ বন্যা অতিপ্রবল ভয়ানক দৃষ্ট হয় জলের কল্লোল কোলাহল অনেক ক্রোশ পর্যন্ত শুনা যায় ঐ জল হয় সলালপুরের নিকটস্থ পুলবন্দির উপর দিয়া আইসে নতুবা পুল ভাঙ্গিয়াই বাহির হয়। কখন ২ উভয় প্রকার দুর্ঘটনাই ঘটে। পুলের যে দিগে ভাঙ্গে সেই দিগেই মহানিষ্ঠ জন্মে পুলের উপর দিয়া জল গেলে চৌমুহা বাহির গড়া আড়সা এবং বেলিয়ার কিয়দংশ ও পাঁড়ুয়া পরগণা ভাসিয়া যায় পুল ভাঙ্গিয়া চলিলে মঙ্গলঘাট ভুরসুট বেলিয়া বোরো ও বাহির গড়া পরগণার তদ্রূপ দুরবস্থা হয়। আমি স্থূলেই কহিতে পারি যে প্রত্যেক বারের বন্যাতে ফসল ও বলদ গৃহ বাটি ইত্যাদিতে দেড় লক্ষ টাকব ন্যূন নহে সম্পত্তি ক্ষতি। এইক্ষণে এই বন্যা বারণার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। প্রথম এই যে সলালপুর হইতে বক্রভাবে এক খাল কাটিয়া হরিণগ্রামে কানা নদীর সঙ্গে দামোদরকে মিলান যায় ঐ খাল দুই ক্রোশ যাইতে পারে ইহা হইলে বালি পড়িয়া যে চড়া হয় তাহা হইতে পারে না। ঐ স্থান হইতে দুই তিনবার বালি উঠাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু তাহা উঠাইলেও পুনর্বার পড়ে পরে বন্দিপুর অবধি নদীর অনেক বাঁক আছে অতএব বন্দিপুর হইতে দক্ষিণ পূর্বাংশে বালির খাল পর্যন্ত এক খাল কাটনের প্রস্তাব হইয়াছে। বন্দিপুর হইতে বালির খাল ৮ ক্রোশ অন্তর। প্রথম পাণ্ডুলেখ্য এই। দ্বিতীয় পাণ্ডুলেখ্যতে এইমাত্র বৈলক্ষণ্য আছে যে বন্দিপুর হইতে বালির খাল পর্যন্ত খাল না কাটাইয়া গোপালনগর হইতে বৈদ্যবাটী

পর্যন্ত এক খাল কাটা যায় এই স্থান সাড়ে চারি ক্রোশ অন্তরিত মাত্র ইহাতে কিঞ্চিৎ কম খরচ পড়ে বটে কিন্তু তাহা হইলে গোপালনগরের উজানের নদীর যে কৌটিল্য ভাব আছে তাহা থাকে তাহার প্রতিকার প্রথমোক্ত পাণ্ডুলেখ্যতে হইতে পারে।

তৃতীয় পাণ্ডুলেখ্য এই যে একেবারে কানা নদী স্পর্শ না করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিগে সলালপুর হইতে বিজলি জলার নিকট গুয়ানদী পর্যন্ত এক খাল কাটা যায় এই খাল সাড়ে তিন ক্রোশ পর্যন্ত কাটিতে হয়। ঐ ক্ষুদ্র গুয়া নদী ঐ জলা অবধি আরম্ভ হইয়া গোপালনগরের নীচে কানা নদীর সঙ্গে মিলে তথা হইতে হয় বৈদ্যবাটী নতুবা বালির খাল পর্যন্ত উচিত মতে মিলাইতে হয়। এই শেষ পাণ্ডুলেখ্যে এই উপকার দর্শে যে পূর্বোক্ত দুই পাণ্ডুলেখ্যাপেক্ষা ইহাতে পথ সোজা ও খর্ব হয় কিন্তু খরচ অধিক পড়ে।

রূপনারায়ণ নদী হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা দিয়া বহু মাইল ব্যাপিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ডি-ব্যারোর মানচিত্রে রূপনারায়ণ গঙ্গা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্যানডেন ব্রোকের মানচিত্রে ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত কোন নদীর নাম লিখিত নাই; উক্ত নদীগুলি ১ম, ২য়, ৩য় প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নির্দেশমত রূপনারায়ণ ৩য় নামে উল্লিখিত আছে। রেনেল সাহেব সর্বপ্রথম ইহাকে রূপনারায়ণ বলিয়া তাহার মানচিত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। নাবিকগণ ভ্রমক্রমে ইহাকে "পুরাতন গঙ্গা" বলিয়া লিখিয়াছেন, ইহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। রূপনারায়ণ হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত; এই জেলার দ্বারকেশ্বর নদী ও মেদিনীপুর জেলার শিলাই নদী একসঙ্গে মিশিয়া খানাকুল থানার অন্তর্গত বন্দর নামক স্থানে রূপনারায়ণ নাম ধরিয়াছে ও জেলার পশ্চিম দিক দিয়া বহিয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে।

দ্বারকেশ্বর নদী মানভূম জেলা হইতে বহির্গত হইয়া বর্ধমান জেলার রায়না থানার মধ্য দিয়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আরামবাগ থানা ও গোঘাট থানার মধ্য দিয়া ইহা মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় রূপনারায়ণ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাও বহু স্থানে সীমা পরিবর্তন করিয়াছে এবং ইহারও পূর্ব খাত 'কাণানদী' বা কাণা দ্বারকেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে আরামবাগ শহর অবস্থিত।

দ্বারকেশ্বরের আর একটি নাম ধলকিশোর। বাঁকুড়া জেলা পার হইয়া দ্বারকেশ্বর দক্ষিণ দিকে হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার ভিতরে ঘুরিবার পূর্বে ইহা বর্ধমান ও হুগলী জেলার সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আরামবাগের মধ্যে নৈসরাই গ্রামের নিকট বলরামপুর, মুথাডাঙ্গা দিয়া সারাবাটি গ্রামের পশ্চিম দিকে পূর্বে প্রবাহিত ছিল। গতিপথ পরিবর্তন হইবার পর দ্বারকেশ্বর আরামবাগ শহরকে পূর্বদিকে রাখিয়া মেদিনীপুর জেলায় এবং আরামবাগ মহকুমার বন্দর নামক স্থানে শিলাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। বড়ডোঙ্গল গ্রামের কাছে ইহার একটি শাখা **ঝুমঝুমি** বলিয়া খ্যাত।

হুগলী জেলার ছোট নদীগুলির মধ্যে **সরস্বতী** নদীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহা ত্রিবেণী হইতে সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া আদমজুড়, আমতা, তমলুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত

হইত। শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেনের কিছু নিচে সাঁকরাইল গ্রামের নিকট ইহা ভাগীরথীর সহিত পুনঃমিলিত হইয়াছে। চারিশত বৎসর পূর্বেও ইহার বিশাল বক্ষে বাণিজ্যতরীগুলি দেশবিদেশের রত্ন-রাজি, সপ্তগ্রামে বহন করিয়া আনিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ ইহাকে 'সাতগা রিভার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তৎকালে গঙ্গার ন্যায় গভীর ছিল বলিয়া ডি-ব্যারোসের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

The maps also agree with Abul Fazel's statement in the Ain, that at Tribeny there are three branches, one of the Saraswati, on which Satgaon lies, the other the Ganga, now called the Hugly and the third the Jam or Jabuna (Jamuna). De-Barros and Balev's map show the three branches of almost equal thickness, the Saraswati passing Satgaon and Chowna (Chaumuhi in Hugly district north) and the Jamuna flowing westward to Borhan in the 24 Parganas. J. A. S. Bengal, Vol XLII, 1873.

পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান স্রোত সরস্বতী নদী দিয়া প্রবাহিত হইত, সেই জন্য এই নদী খুব বিপুলকায়া ও বেগবতী ছিল। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের পর ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, সরস্বতীর জলপ্রবাহ ভাগীরথীকে আশ্রয় করিল এবং তাহার ফল স্বরূপ এই নদী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল। এই নদী মজিয়া যাওয়ায়, ইহার শাখা-প্রশাখা গুলিও মজিয়া, পশ্চিম বঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চল জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, আজ তাহা জনশূন্য এবং ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত সামান্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এই নদীটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কার করিয়া, ডাঃ বেন্টলীর মতানুযায়ী ম্যালেরিয়া, কৃষির অবনতি ও দারিদ্র বিতাড়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় সরকার তখন অর্থের অজুহাতে এই অঞ্চলকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

মহাভারতে বনপর্বে লিখিত আছে যে সরস্বতী-সঙ্গমে চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশীর দিনে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোবনের মহর্ষিগণ আগমন করেন। সরস্বতী নদীতে স্নান করিলে বহুতর সুবর্ণ লাভ হয় এবং তীর্থ সেবী সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেইজন্য বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্নান করা, এক মহা পুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত।

'দেশাবলি বিবৃতি' নামক প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে সরস্বতী সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিত আছে—

"সরস্বতী নদী তত্র যাতি দক্ষিণ বাহিনী।
সূক্ষ্মরূপা তোয়হীনা বর্ষাজল প্রপূরিতা॥

প্রাচীন কালে গঙ্গা সরস্বতীর একাংশ ছিল বলিয়া রেনেল সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই স্থানে উদ্ধারযোগ্যঃ

I suspect that its then course after passing Satgong was by way of Adampore, Oompta and Tamlook and the river called the old Ganges was a part of its course, and received that name, while the circumstance of the change was fresh in the memory of the people. The appearance of the country between Satgong and Tamlook countenances such an opinion. Renell's Memoir.

সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় কৃষকদের জলাভাবে কিরূপ কষ্ট পাইতে হয় তাহার একটি সংবাদ ২১ জানুয়ারি ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই স্থানে সেই সংবাদটি ও তার পর দিনের সম্পাদকীয় মন্তব্য নিম্নে দেওয়া হইল:

প্রাচীন স্রোতস্বিনী সরস্বতী আজ সংস্কারের অভাবে মজিয়া গিয়াছে। শীর্ণা সরস্বতী বর্তমানে আর কৃষকের ক্ষেতে ক্ষেতে জল সিঞ্চন করে না, অনেক ক্ষেত্রে তাহা উভয় তীরস্থ পথের সঙ্গে সমান হইয়া গিয়াছে। ডি ভি সি চণ্ডীতলা থানায় নদীর উভয় পার্শ্বে বহু জমি ক্রয় করিয়াও এই নদীতে চাষের জল সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। ফলে সিঙ্গুর ও চণ্ডীতলা থানার ৪২খানি গ্রামের প্রায় চার হাজার একর জমির রবিশস্য১৩৬৭ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই বিস্তীর্ণ এলাকার বিপুল সংখ্যক অধিবাসী তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হইয়া ডি ভি সি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে তাঁহাদের নাকি জানান হয় যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ডি ভি সির নাই এবং সরস্বতী নদীতে চাষের জল সরবরাহ করা হইবে না, ঐ নদীকে বাড়্তি জল নিষ্কাষণের খাল (নিকাশী খাল) হিসাবেই ব্যবহার করা হইবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

হুগলী জেলার সিঙ্গুর এবং চণ্ডীতলা থানার বিয়াল্লিশটি গ্রামের প্রায় চার হাজার একর জমিতে রবিশস্যের ফলন নির্বিঘ্ন হইতে পারে; যদি মজানদী সরস্বতীর খাত দিয়া সেচের জল প্রবাহিত করা হয়। এই বৎসর রাজ্য সরকারের অনুরোধে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ সরস্বতীর খাতে সেচের জল ছাড়িয়াছিলেন বলিয়া উক্ত অঞ্চলের রবিশস্য রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় জনসমাজের উদ্বেগ দূরীভূত হয় নাই। কারণ, অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মজানদী সরস্বতীর খাতে নিয়মিতভাবে প্রতিবৎসর সেচের জল ছাড়িতে ডি ভি সি সম্মত নহে। ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ সরস্বতীর খাত দিয়া শুধু বাড়তি জল নিকাশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেচের জল সরবরাহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ডি ভি সি রাজী নহেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, সরস্বতীর খাতে সেচের জল ছাড়িতে ডি ভি সি'র পক্ষে অসম্মত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে। মজানদী সরস্বতীর সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে সুসলিলা করিতে পারিলে স্থানীয় কৃষির পক্ষে নিশ্চিন্ত হইবার মত অবস্থা অবশ্যই সম্ভব হইত। কিন্তু অচিরে অথবা নিকট ভবিষ্যতে তাহা যখন সম্ভব হইতেছে না, তখন ডি ভি সি'র পক্ষে এই খাতে কিছু জল ছাড়িবার ব্যবস্থা করাই উচিত বলিয়া

মনে করি। ডি ভি সি'র পক্ষে জলের অভাব ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না। বরং ইহাই জানি যে, ডি ভি সি'র বাঁধ সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করিবার যোগ্যতা লইয়া নির্মিত হইয়াছে। সিঙ্গুর এবং চন্ডীতলা থানার চার হাজার একর জমিতে রবিশস্যের আবাদে সাহায্য করিতে ডি ভি সি'র পক্ষে জলের অভাবের দোহাই দিবারও কোন যুক্তি নাই। বরং এইরূপ সাহায্য সম্ভব করাই ডি ভি সি'র সার্থকতা।

কানা-নদী বর্তমানে ঠিক সরস্বতী নদীর দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কালে কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে রত্নাকর (বর্তমান নাম রড়া-নদী) নামে একটি বড় নদী ছিল; উহার তীরে ঘন্টেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। "ঘন্টেশ্বরশ্চ দেবেশী রত্নাকর নদীতটে' বলিয়া 'মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে' লিখিত আছে। কিংবদন্তী যে, অভিরাম গোস্বামীর অভিশাপে রত্নাকর নদীর তেজ কমিয়া গিয়া কানানদী নামে খ্যাত হয়। এই সম্বন্ধে 'শ্রীঅভিরাম লীলামৃত' নামক গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধার করি :

"এতেক লাগিয়া শীঘ্র করেন গমন।
স্নান লাগি নদীতে গেলেন তখন॥
রত্নাকর নদী সেই সদা প্রবাহিত।
গোঁসাই এর কৌপীন সেই হরে আচম্বিত॥
ক্রোধেতে গোঁসাই তারে দিল অভিশাপ।
করপুটে রত্নাকর করে যে বিলাপ॥
না জানি করিনু দোষ ক্ষমহ আমারে।
সাধ্য আছে কার তব বাক্য খণ্ডিবারে॥
স্তব-স্তুতি করি বহু করিলা বিনয়।
তবে অভিরাম পুন বলেন তাহায়॥
অন্ধ হয়া থাক তিন শত বৎসর।
পরে এক চক্ষু পাবে তুমি রত্নাকর॥"

প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ প্রত্যেক নদীগুলির অবস্থা বর্তমানে প্রায় একপ্রকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হুগলী জেলার বিশেষ করিয়া সদর চন্দননগর ও শ্রীরামপুর মহকুমার মজা নদীগুলির আশু সংস্কার না করিলে এই স্থানের কল্যাণ কখনও হইতে পারে না।

ছোট ছোট নদীগুলি জেলার পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া গঙ্গাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় ছোট নদীগুলির প্রবাহ বহুস্থানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বেহুলা, কানা নদী, কুন্তী এবং বৈদ্যবাটীর খাল, শ্রীরামপুরের খাল, বালী খাল, প্রভৃতির জল-প্রবাহ গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জেলার মধ্যে আরো কয়েকটি খাল আছে; কিন্তু তাহাও মজিয়া গিয়াছে, বর্ষা ব্যতীত এইগুলিতে আজ আর জল দেখিতে পাওয়া যায় না এবং স্থানে স্থানে খালের গর্তের মধ্যে বেশ চাষ আবাদ হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাগীরথীর বহু স্থানে দুই তিন মাইল ব্যাপী চড়া পড়িয়াছে; তার মধ্যে ত্রিবেণী, নয়াসরাই, জিরাট, বলাগড়, গুপ্তিপাড়া ও চাকদার নিকটবর্তী চড়াগুলি দ্বীপের মতো
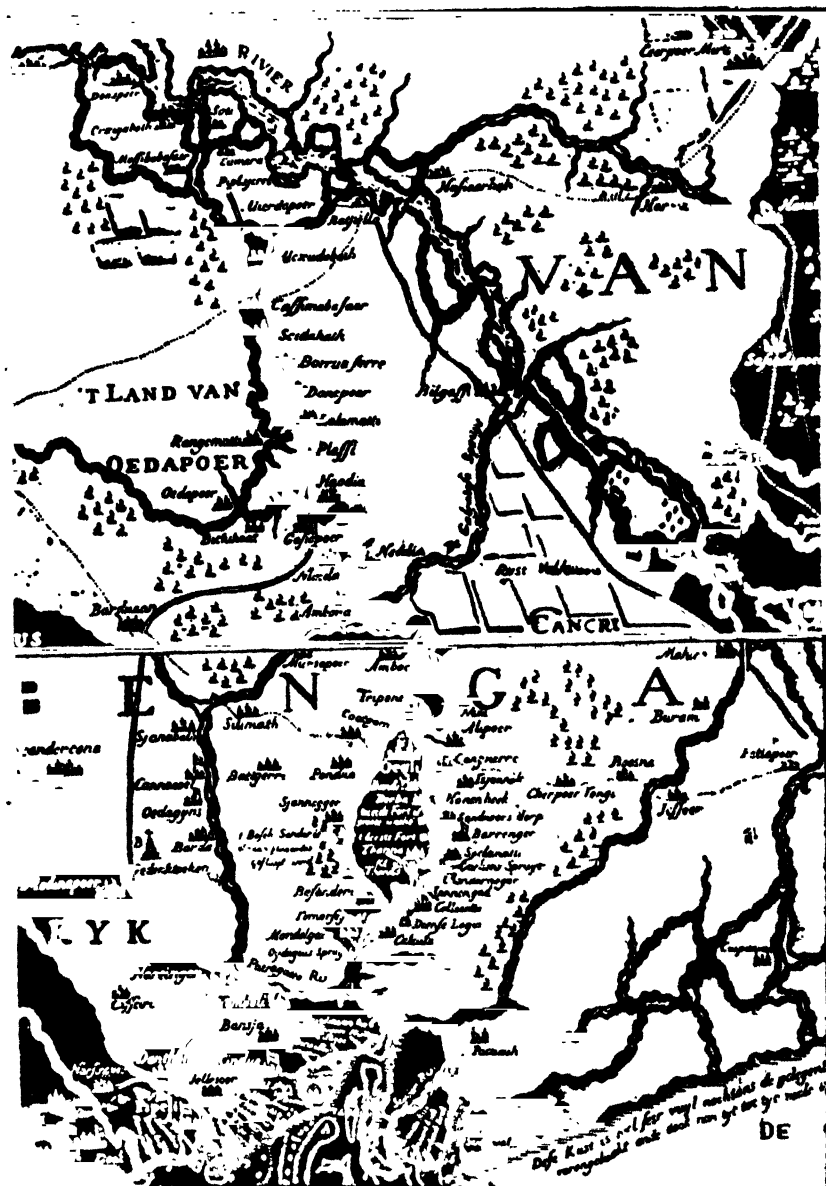
ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্সা (১৬৬০ খৃঃ)

হইয়া গিয়াছে। এই চড়াতে বর্তমানে বসতি হইয়াছে এবং প্রচুর ধান, পটল, তরমুজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ১২৬২ সালে স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ভারতের সমস্ত তীর্থগুলি পর্যটন করেন; তিনি 'তীর্থ ভ্রমণ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"অনেক ধনাঢ্য মনুষ্য শান্তিপুরে গুপ্তিপাড়াতে আছে। সকল সুভদ্রগ্রাম। প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে, এক ক্রোশ এক চড়া হইয়াছে। দুই দিকে দুই গঙ্গার প্রবাহ। শান্তিপুরের নীচের গঙ্গা হইয়া মাথাভাঙ্গার মোহনা দিয়া যাইতে হয়। এই গুপ্তিপাড়ার নীচে চড়াতে আহারাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া গুপ্তিপাড়ার বাজারের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্বে লাগান করিয়া থাকা গেল।"

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নবেম্বর 'সমাচার দর্পণ' পত্রে 'ভাগীরথী নদী' সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল; উক্ত সংবাদটি এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

ভাগীরথী নদী।—সকল লোক জ্ঞাত আছেন যে ভাগীরথী নদীর জল ষাটি বৎসরের মধ্যে অনেক শুষ্ক হইয়াছে। ষাটি বৎসর হইল চৌষট্টী বন্দুকের দুই জাহাজ চন্দননগর পর্যন্ত গিয়াছিল এবং বিশ বন্দুকের এক জাহাজ মোং হুগলী পর্যন্ত গিয়াছিল এখন স্থানে ২ এমত চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়াছে যে কোনো প্রকারে কোনো সময়ে বড় জাহাজ সে মত চলিতে পারে না। এই সকল চড়া পড়িবার কারণ এই যে বর্ষা গত হইলে মৎসধারকেরা স্থানে ২ বাঁশ পোতে ও তাহার নিকটে মৃত্তিকা আটক হয় পরে বাঁশ তুলিয়া লইলেও সেই মৃত্তিকাতে ক্রমে মৃত্তিকা আটক হইয়া বড় চড়া হয়। এবং ভাগ্যবান লোকেরা স্থানে ২ ঘাট বন্ধন করেন তাহাতে মৃত্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে এই ২ কারণে ভাগীরথীর ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতির জল চৈত্র, বৈশাখ মাসে এমন শুষ্ক হয় যে তাহাতে নৌকা গমনের পথও থাকে না ইহার উপায় কারণ পূর্বে করনল কোলবুরুক সাহেব শ্রীশ্রীগবরনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে একটা লৌহযন্ত্র নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। এই ক্ষণে এই উপায় আছে যে এখন ঘাট বান্ধিতে হইলে জলের মধ্যে কেহ না বান্ধেন এবং জালিয়ারাও জলের মধ্যে বাঁস না পোতে ইহা হইলেও যে আছে যে বজায় থাকে এই সমাচার ইংগ্লণ্ডীয় নিউষপেপরে ছাপা গিয়াছে।

আমোদর—এই নদী বাঁকুড়া জেলা হইতে আসিয়া হুগলী জেলার প্রবেশ করিয়াছে। ইহা গড়মান্দারণ দিয়া বহিয়া মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দ্বারকেশ্বরে মিলিত হইয়াছে।

বেহুলা নদী—বর্ধমান জেলা হইতে বাহির হইয়া বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যপুরের নিম্নে এই জেলার ঢুকিয়াছে। ওখানে বেহুলার প্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরভাগ সোমড়ার নিকটে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে এবং দক্ষিণভাগ এই জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া মগরা খালে পড়িয়াছে।

কুন্তী নদী—বর্ধমান জেলায় দামোদর নদ হইতে বহির্গত হইয়া হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ প্রায় ৫০ মাইল।

মুণ্ডেশ্বরী—ইহা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানায় অবস্থিত বেগুয়া হানা হইতে
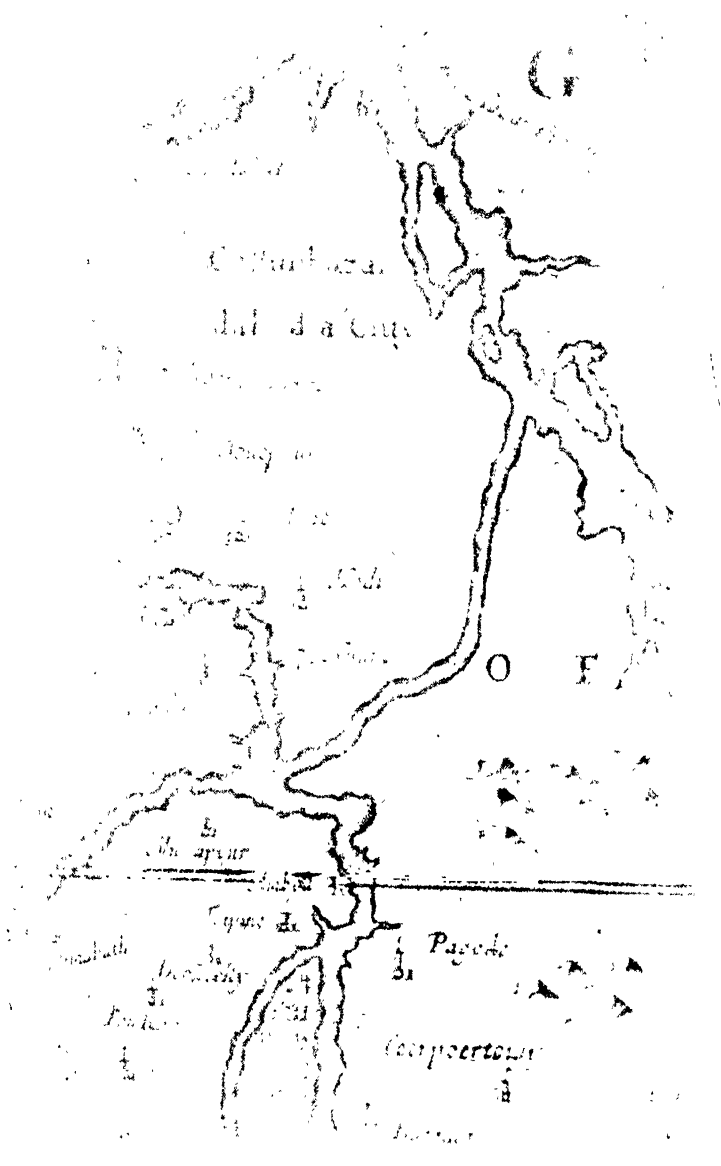
জন্ থর্নটনের নক্সা (১৬৭৫ খৃঃ)

বাহির হইয়াছে এবং খানাকুল থানার অন্তর্গত পানসিউলীতে রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়াছে।

মুণ্ডেশ্বরী নদী প্রকৃতপক্ষে বেগোর হানা; আসনপুর গ্রামের নিকট বেগোর হানায় মুণ্ডেশ্বরী খাল মিলিত হইবার পর হইতে ইহা মুণ্ডেশ্বরী নদী বলিয়া খ্যাত হয়। এখন সব সময়েই এই নদীতে জল থাকে। বর্ধমান হইতে দামোদর নদের প্রধান জলপ্রবাহ এই নদী দিয়া প্রবাহিত হয়। এই নদীর আসনপুর গ্রামের পর হইতে মুণ্ডেশ্বরী নাম হইয়াছে।

মুণ্ডেশ্বরী নাম সম্বন্ধে প্রবাদ যে, বর্ধমান জেলার কাইতি গ্রামের জমিদারের কন্যার নাম ছিল মুণ্ডেশ্বরী এবং তাঁহার নাম হইতেই বেগোর হানার এই খাল মুণ্ডেশ্বরী নাম ধারণ করে। কাহিনীটি এইরূপ একদিন জমিদার যখন কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার কন্যা 'বাবা আমি বেড়াতে যাবো' বলিয়া তাহাকে বিরক্ত করিলে, তিনি রাগ করিয়া 'যাবি তো যা না' বলিলে, কন্যা দীঘির মধ্য দিয়া চলিয়া যান। পরে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই দিন হইতে মুসলধারে প্রবল বৃষ্টি হয় এবং দীঘি প্লাবিত হইয়া খাল রূপে বহু গ্রাম ও মাঠের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই খালই পরে মুণ্ডেশ্বরী নাম ধারণ করে।

জেলার চারিটি প্রধান নদী ব্যতীত বহু ছোট ছোট নদী বা খাল এই স্থানে আছে। সাধারণতঃ ছোট নদীগুলি উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া ভাগীরথীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ছোট নদীর মধ্যে কৌশিকী, কান্তুল, কাণা দামোদর মাদারিয়া, বাঁশিয়া বা সাঙ্কভাঙ্গা, কাণা দ্বারকেশ্বর, সাকরা, ঝুমঝুমি, তারাজুলি প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

এই সমস্ত ছোট ছোট নদীগুলি অধিকাংশই হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় হুগলী জেলার বহু স্থান অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়ার দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া বসবাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। বাঁধ, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি নির্বোধের মত নির্মাণ করিয়া এই ছোট ছোট নদীগুলির স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের পথ রুদ্ধ করিবার জন্যই নদী নালাগুলি নষ্ট হইয়া বহু স্থান লোক বসতির অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা ছোট নদী ও খালগুলির সংস্কার এবং জল-সেচের দ্বারা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে কেবল হুগলী জেলা নয় সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইবে। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে বহু উন্নত লোক-সমাজ ও তাহাদের সভ্যতা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য স্থানের কথা ছাড়িয়া দিলাম, এই জেলার মধ্যে সপ্তগ্রাম যাহা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও অন্যতম শহর বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ সেই শহরে মাত্র পনের খানির বেশী কুটির দৃষ্ট হয় না। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

হুগলী সদর মহকুমার পাণ্ডুয়া ও পোলবা থানায়, শ্রীরামপুরের অন্তর্গত চণ্ডীতলা ও কৃষ্ণনগর থানায় এবং আরামবাগের অন্তর্গত খানাকুল থানায় বহু **জলাভূমি** আছে।

দামোদর ও কানা দ্বারকেশ্বরের মধ্যবর্তী জলায় প্রচুর মাদুর-কাটি উৎপন্ন হয়। হুগলী জেলায় কোন হ্রদ বা অরণ্য নাই।

॥ হুগলী জেলার খাল ॥

শ্রীরামপুর খাল—এই খাল শ্রীরামপুর মহকুমা ও হুগলী সদর মহকুমার পশ্চিম দিক দিয়া বহিয়া ভাগীরথী নদীতে আসিয়াছে।

বৈদ্যবাটী খাল—শ্রীরামপুর মহকুমার পশ্চিম অংশ দিয়া আসিয়া ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে।

বালী খাল—বালী ও উত্তরপাড়ার মধ্য দিয়া বহিয়া আসিয়া ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। ইহা প্রায় ৮ মাইল।

বলরামপুর খাল—ইহা দ্বারকেশ্বর নদী হইতে বাহির হইয়া কাণা নদীতে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ প্রায় ৪ মাইল।

অরোরা খাল—রামচন্দ্রপুর হইতে বহির্গত হইয়া লাঙ্গুলেপাড়া পর্যন্ত আসিয়াছে। ইহা প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ।

মাদারিয়া খাল—এই খাল চাঁপাডাঙ্গার উত্তর হইতে বাহির হইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার কিছু দূরে দামোদরে পতিত হইয়াছে।

রণ খাল—খানাকুল থানার এলাকায় রাজহাটি গ্রামে রণ নামে বহু পুরাতন ও অতি গভীর জলবিশিষ্ট একটি খাল আছে।

ইহা ছাড়া আরামবাগ মহকুমায় ভূতির খাল তারাজুলির খাল ভুক্রেড়ার খাল হরিণাখালি খাল, সুজন খাল, নিমতলার খাল, মুচিহানার খাল, ঘুগির খাল, হোজ্জাপাড়া খাল, হিয়াৎপুরের খাল, কাকলের খাল, কৌদলের খাল, বেসের খাল, ভোমরা খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডানকুনী বিল

হুগলী জেলার ডানকুনী বিল বিখ্যাত। ইহা ছাড়া খানাকুল থানার অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপুরের হাঁসাই বিল, নন্দনপুরের বিল প্রভৃতি কয়েকটি বিলও উল্লেখযোগ্য।

ডানকুনীর বিল হুগলী জেলার সুবিখ্যাত বিল; ইহা হুগলী জেলার ছয়টি থানার সীমা দিয়া প্রবাহিত। নয় মাইল ব্যাপী দীর্ঘ খালটির একটি মুখ বৈদ্যবাটীর গঙ্গায় ও অপর একটি মুখ বালীর গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ইহা বৃহত্তর বিল এবং ইহার পার্শ্বে ১৩৫টি গ্রাম অবস্থিত। এই বিলের জলই গ্রামবাসীদের একমাত্র ভরসা। গঙ্গার মুখে একটি বৈদ্যবাটী গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডে ও বোদের বিল এই দুইটি লক্‌গেট দ্বারা ইহার জল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বৈদ্যবাটী লক্‌গেট হইতে এক মাইল পশ্চিমে চৌমাহানীর নিকট এই ড্রেনেজ খালের আধ মাইলের একটি শাখা দিয়াড়া অভিমুখে অপর একটি আড়াই মাইল ব্যাপী শাখা দক্ষিণে চাপদানী অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বিলের মধ্যে শতাধিক ছোট ছোট শাখা খাল আছে। ইহাতে মাছের চাষ হয়। সরকার কর্তৃক সম্প্রতি এই বিলটি সংস্কার করা হইয়াছে বলিয়া

ইহার পার্শ্বে অবস্থিত স্থানগুলিতে চাষ আবাদের খুব সুবিধা হইয়াছে। লকগেটের পরিবর্তে উভয় গঙ্গার মুখে স্লুইস গেট স্থাপন করা হইলে চাষের আরো সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ডানকুনীর খাল খননের আয়োজন করা হয় বলিয়া একটি সংবাদ 'সাধারণী' (২৪ ফাল্গুন ১২৮১) পত্রে প্রকাশিত হয়। উক্ত খাল খনন কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য ছিলেন।

মিঃ পি. এস. লাউডন. এ্যাসিস্টেণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার হুগলী, শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন সিংহ, শিবপুর, শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে, শ্রীরামপুর, শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামপুর, ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া।

॥ সেচ ॥

পশ্চিমবঙ্গের জমি সাধারণত বেশ উঁচু। হুগলী জেলায় বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্য সময় নদীগুলিতে প্রায়ক্ষেত্রেই জল খুব কম থাকে এবং বহু নদীতে জল থাকে না। জলাভাবের জন্যই এখানকার বহু জায়গায় এতদিন পর্যন্ত খাদ্যশস্যের ফলন আশানুরূপ হইত না। এই অভাব পূরণের জন্য দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার যেসব কৃত্রিম জলসেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে হুগলী জেলার খাদ্যশস্যের ফলন বাড়াবার দিকে যত্নবান হয়েছেন নিচে তার একটা মোটামুটি বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ প্রচার অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত 'হুগলী' পুস্তিকা হইতে দেওয়া হইল।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে এই জেলার বিস্তৃত এলাকা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই বহু খাল কাটা হইয়াছে এবং সেইসব খালের জল দিয়ে জমিতে সেচের কাজও চলেছে ভালভাবে। যেসব এলাকা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে তাহার মধ্যে ধনেখালি, পাণ্ডুয়া, পলতা, তারকেশ্বর, হরিপাল, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা, জাঙ্গীপাড়া প্রভৃতি থানা এবং আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সেচ-খালের বিবরণ

পাণ্ডুয়া : ৬৪টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ৫৬ মাইলব্যাপী খাল।

পলতা : ৩৬টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ৩২ মাইলব্যাপী খাল।

ধনেখালি : ৬১টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ৫২ মাইলব্যাপী খাল।

তারকেশ্বর : ২৪টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ২১ মাইলব্যাপী খাল।

হরিপাল : ৫১টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ৪৮ মাইলব্যাপী খাল।

জাঙ্গীপাড়া : ৩৯টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ৪৮ মাইলব্যাপী খাল।

চণ্ডীতলা : ২৩টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ১৯ মাইলব্যাপী খাল।

সিঙ্গুর : ২৭টি মৌজার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ২৯ মাইলব্যাপী খাল।

আরামবাগ : ৯০ মাইলব্যাপী খাল।

তা ছাড়া, যে সব বাঁধ ও খালের সংস্কারসাধন ক'রে জলনিকাশের ব্যবস্থা হয়েছে তা

রেনেলের প্রাচীন নক্‌সা (১৭৬৪-৭৬ খৃঃ)

হ'ল ধনেখালির অন্তর্গত ঘিয়া, ইংস্‌রা ও ডাকাতিয়া খাল; তারকেশ্বরের অন্তর্গত ডাকাতিয়া, কৌশিকী ও কানা দামোদর খাল ও জাঙ্গীপাড়ার অন্তর্গত বাণের খাল ও ডাকাতিয়া খাল।

বিভিন্ন পুষ্করিণীর সংস্কার ক'রে জলসেচের ব্যবস্থা

থানা	পুষ্করিণীর সংখ্যা	উপকৃত জমির আয়তন (একর)
পাণ্ডুয়া	২১	৭৫৩·৭৬
পলতা	৪	২৪৯·১৯
বলাগড়	২১	৭৮৫·৮০
মগরা	১	২৮·৮২
ধনেখালি	৬	১৪২·৩২
চণ্ডীতলা	১	৭·৫৮
সিঙ্গুর	১	১৭·২০
গোঘাট	৬০	২,৪৬৪·৩০
আরামবাগ	২৩	৮২২·৭৪
খানাকুল	১১	৩৬১·৩৬

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা

মহকুমা	পরিকল্পনার সংখ্যা	উপকৃত জমির পরিমাণ (একর)	অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন	(টন)
হুগলী ...	৪৯	২৬,৮৩৬	ধান ..	৭,৫৪৮
			রবিশস্য ...	১৫০
আরামবাগ	২৯	১২,০৯৬	ধান ..	৯০৩
			গম ...	১৮,৩৫০
			অন্যান্য রবিশস্য ...	২,০১৬
শ্রীরামপুর ..	৬৬	১৮,৭৮২	ধান ...	৩,৪৭৩
			গম ...	১০
			রবিশস্য ...	২২০

॥ হুগলী জেলার পথ ॥

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি ভাল রাস্তা ছিল বলিয়া টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেন। (১) বালী হইতে কালনা, তৎপরে মুর্শিদাবাদ, (২) গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, (৩) বেনারস রোড, (৪) গৌরহাটির ঘাট হইতে হরিপাল দিয়া দ্বারহাটা, (৫) বর্ধমান হইতে মেদিনীপুর, (৬) সিঙ্গুর হইতে হুগলী, (৭) হুগলী হইতে ভাস্তাড়া (পোলবা

দিয়া)। পূর্বে জেলের কয়েদী দিয়া রাস্তা মেরামত করা হইত; ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কয়েদী দিয়া কাজ করান একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট লিখিয়াছিলেন:

There is not a single road in the district which a European vehicle could traverse, while number assable for hackeriees in the rains are lamentably few.

৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার-দর্পণে' হুগলী হইতে ধনিয়াখালি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রাস্তা নির্মাণে অমরপুরের কালীকিঙ্কর পালিত (স্যার তারকনাথ পালিতের পিতা) ছয় হাজার টাকা দান করেন। সংবাদটি এইরূপ:

নূতন রাস্তা। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে হুগলী হইতে ধন্যাখালি পর্যন্ত নূতন এক রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে জিলাস্থ লোকেরদের মহোপকার হইবে। ঐ রাস্তা ছয় ক্রোশ দীর্ঘ হইবে তাহাতে প্রায় ১৫০ বন্দুয়ানেরা [কয়েদীরা] প্রত্যহ রাস্তাতে কর্ম করিতেছে আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চুঁচুড়া নিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিঙ্কর পালিত] উক্ত রাস্তা নির্মাণার্থ অন্যূন ৬০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

নিম্নে হুগলী জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাস্তার নাম উল্লিখিত হইল:

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ভারতের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ পথ পাঠান বাদশাহ শের সাহ কর্তৃক নির্মিত। এই রাস্তা হাওড়া হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দেড় হাজার মাইল লম্বা। ইহা সরকারী রাস্তা। এই রাস্তার ৩৩ মাইল হুগলী জেলার মধ্যে আছে।

ওল্ড বেনারস রোড—প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক নির্মিত। ইহা হাওড়া হইতে আসিয়া চন্ডীতলা, শিয়াখালা, হরিপাল, চাঁপাডাঙ্গা ও আরামবাগ ছাড়িয়া কাশী পর্যন্ত গিয়াছে। ইহাও সরকারী রাস্তা। এই রাস্তায় তিনি পথিকগণের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বৃক্ষ রোপন এবং জল পান করিবার জন্য কূপ খনন করাইয়া দেন।

ত্রিবেণী মহানাদ রোড—উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব কর্তৃক বাঁধ হিসাবে নির্মিত হয়; ইহা জামাই জাঙ্গাল বলিয়া কথিত।

রাজা রামমোহন রায় রোড; মায়াপুর হইতে জগৎপুর পর্যন্ত গিয়াছে।

হুগলী সপ্তগ্রাম রোডের বেঁনিয়াপুকুর হইতে দেবানন্দপুর ভারতচন্দ্র রোড

হুগলী সপ্তগ্রাম রোডের ৩য় মাইল হইতে ভারতচন্দ্র রোড

মন্দারণ হইতে মহানাদ ছোট সর্সা হইয়া মগরা খানপুর রোড

মগরাখানপুর হইতে ভৈরবপুর গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড সপ্তগ্রাম হইতে হুগলী মাজিনান রোড

হুগলী মাজিনান রোড রাজহাটি হইতে ধুলুলিয়া হইয়া ঝাঁপা

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে সপ্তগ্রাম ভায়া নারায়ণপুর

হুগলী সপ্তগ্রাম ঝাপানতলা হইতে চন্দনপুর খাল

হুগলী মাজিনান রোড কোরোলা হইতে পাঁচয়োকি

ইটাচোনা হইতে তালান্ডু স্টেশন ভায়া মালিপাড়া

পান্ডুয়া কল্যাণপুর রোড জগন্নাথপুর পর্যন্ত

আরামবাগ বর্ধমান রোড

আরামবাগ হইতে তেঁতুলমারি

উচালন হইতে মেদিনীপুর

হাজীপুর হইতে রাজজীবনপুর

আরামবাগ হইতে বন্দর

আরামবাগ হইতে আরান্ডী

সোমড়া হইতে ডুমুরদহ

বৈদ্যবাটী হইতে তারকেশ্বর

নবগ্রাম হইতে চাড়পুর

ভদ্রেশ্বর হইতে নসিবপুর হইয়া জনাই

উত্তরপাড়া হইতে কালীপুর

গঙ্গা হইতে দ্বারহাটা হইয়া রাজবলহাট

সিঙ্গুর হইতে মশাট

তারকেশ্বর হইতে চাঁপাডাঙ্গা

আঁটপুর হইতে সীতাপুর

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে আরবাহা

হুগলী সপ্তগ্রাম রোড হইতে কানাগোড়

হুগলী সপ্তগ্রাম হইতে বহিরনলডাঙ্গা

হুগলী সপ্তগ্রাম হইতে চন্দনপুর

হুগলী সপ্তগ্রাম হইতে কেষ্টপুর

হুগলী সপ্তগ্রাম হইতে বাগকৃষ্টপুর

হুগলী স্টেশন হইতে শ্যামাতলা

হুগলী সপ্তগ্রাম হইতে কাজীডাঙ্গা

কাজীডাঙ্গা হইতে ভোটো

হুগলী সপ্তগ্রাম হইতে ব্যান্ডেল স্টেশন

মনসাপুর হইতে ব্যান্ডেল স্টেশন

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক হইতে গোয়া

দিগসুই হইতে পাকাড়ি

সিঙ্গুর হইতে বড়শান্তি

আরামবাগ হইতে নৈসরাই

আরামবাগ হইতে উদরাজপুর

ভিকদাস হইতে বালি

হুগলী হইতে মাজিনান

পান্ডুয়া হইতে কালনা

ত্রিবেণী হইতে গুপ্তিপাড়া

গোঘাট হইতে কুমারগঞ্জ

কামারপুকুর হইতে ভাগবতখালের দীঘি

সুবিরচক হইতে বদনগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ হইতে বদনগঞ্জ

বেলাডিহা হইতে শান্তিপুর

মদিনা হইতে বাজুয়া

আরামবাগ হইতে ষষ্ঠীপুর

চাঁপাডাঙ্গা হইতে কৃষ্ণপুর

অতুলদত্ত মুন্সী রোড, দেবানন্দপুর

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে ভরতপুর

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে তারাগাঁও

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে খন্যান

হোয়েড়া হইতে মাতব্বরপুর

ইটাচোনা-মারসিং হইতে রুদ্রসন্ধ্যা

খন্যান হইতে ধামাসিন ভায়া মুন্টি

মন্দারন হইতে কালিসন্ধ্যা

রামেশ্বরপুর—চন্দনপুর রোড

রমানাথপুর—হড়াল হইতে নন্দীগ্রাম

মগরাখানপুর রোড হইতে আকনা

মগরাখানপুর রোড হইতে সুলতানগাছা

মগরাখানপুর রোড হইতে ননীপুর

মগরাখানপুর রোড হইতে কাপাসটিক্রি

হুগলী মাজিনান রোড হইতে কোরোলা

রিষড়া হইতে বামুনাড়ি
কান্দীপুর হইতে নপাড়া
ইলিপুর হইতে নালিকুল
পাতুল রোড
শান্তিপুর হইতে দক্ষিণ ডিহি
কল্যাণবাটি হরানন্দ শা রোড
শেয়াখালা হইতে গোপালপুর
মশাট হইতে নবাবপুর
ওল্ড বেনারস রোড হইতে রামনাথপুর
মনিরামপুর হইতে হোজাঘাটা
বেগমপুব হইতে মনিরামপুর
বেগমপুর হইতে খরসরাই
কাপাসরাই হইতে মনিরামপুর
হরিপাল থানা হইতে নিলারপুর
নিলারপুর হইতে কাশীপুর
চক্ ইলিপুর রোড
ইলিপুর হইতে হরিরাম বাটি
ভগবতীপুর হইতে ভেদুয়া
জঙ্গলপাড়া রোড
খরিয়াল হইতে বনার বিল
আদান জয়কৃষ্ণপুর রোড
বেগমপুর হইতে পাঁচঘরা
বন্দীপুর হইতে ভগবতীপুর
খড়িয়াল হইতে বনারবিল
আমড়াগাছি হইতে কাকড়াজোল
বৈদ্যপুর হইতে মির্জাপুর
বাহিরখন্ড হইতে বাগবাড়ি
চৌতাড়া হইতে কৈকালা
দ্বারহাটা হইতে রামহাতিতলা
জগজীবনপুর হইতে দলপতিপুর
কৈকালা হইতে রাধানগর
কলাপুকুর হইতে গোপডাঙ্গা
বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র রোড
বাতানল হইতে মলয়পুর
অমরপুর ওল্ড বেনারস রোড
বেলেঘাটা হইতে বাগান্ডা
দ্বারহাটা হইতে জগৎগৌরী
হরিপাল হইতে খেজুরদহ
কাশীপুর হইতে কৃষ্ণনগর
আকুটি হইতে দিলাকাশ
আকুটি হইতে হরিহরপুর
কৃষ্ণনগর এইচ. এন, সাহা রোড
দিলাকাশ হইতে কুলাকাশ
রামহাতিতলা হইতে রসপুর
রাজবলহাট হইতে জনদা
রাজবলহাট বাজার হইতে কুলোড়া
বালি-আঁটপুর-সীতাপুর রোড
মুন্ডালিকা হইতে সীতাপুর
তারকেশ্বর কানারিয়াঘাট রোড
জেজুর হইতে সাতঘরা
আরান্ডি হইতে বহুখেদাল
গৌরহাট হইতে খানাকুল
মোবারকপুর হইতে রায়পুর হইয়া হালাইচক
বন্দীপুর হইতে বসন্তবাটি
খানাকুল হইতে ধরমপুর
ঠাকুরাণীচক হইতে মাইনান
রাধানগর হইতে সোনাটিক্রি হইয়া বালিগড়ি
রাজহাটি হইতে বন্দর
ওল্ড বেনারস হইতে রাগপুর
রাধানগর হইতে জগন্নাথপুর হইয়া ধামলা
দিঘি হইতে গরবার
আরান্ডি রোড
ভক্তপুর হইতে কৃষ্ণবল্লভপুর
বাতানল রোড
ভাঙ্গামোড়া হইতে বনগ্রাম
ধরমপুর হইতে পশ্চিমপাড়া

মাধবপুর হইতে জয়সিংহচক্
মায়াপুর হইতে মুথাডাঙ্গা
নৈসরাই হইতে বাঘারপাড়
ওল্ড বেনারস রোড হইতে বসন্তপুর
রসুলপুর হইতে শেখপুর
তিরোল গ্রামের রাস্তা
ভৈরবপুর গ্রামের রাস্তা
বীরলোক হইতে রামনগর
চুয়াডাঙ্গা হইতে রাংতাখালি
কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ুয্যেপাড়া
নন্দপুর গ্রামের রাস্তা
নতিবপুর গ্রামের রাস্তা
রাজহাটি গ্রামের রাস্তা
শোনাপুর হইতে রাধানগর
ভেলুয়া হইতে মাইনান
তিরোল হইতে যাদপুর
বড়ডোঙ্গল হইতে গৌরহাটি
চক্রপুর হইতে নতিবপুর
রাজহাটি হইতে সাবলসিংহপুর
আনুড় বাজার হইতে বেঙ্গাই
আনুড় হইতে তাজপুর
অমরনাথ রোড
বদনগঞ্জ হইতে পণখালি
বদনগঞ্জ হাট হইতে আশুতোষ রোড
বদনগঞ্জ হইতে ফুলুই
বলরামপুর ঘাট রোড
ভাদুর হইতে ভিকদাস
ভিকদাস হইতে সানবান্ধি
বাজনান হইতে সীতানগর
তিজলকোনা হইতে খাটুলগ্রাম
চাঁদপুর হইতে কুমারগঞ্জ
চাতরা হইতে মির্জা
ধরমপোতা হইতে দেবখণ্ড
গোঘাট হইতে বড়কান্তপুকুর
গোঘাট হইতে উদরাজপুর
গোঘাট হইতে কামচা
হাজীপুর হইতে পাবা
খাটুল হইতে সামন্তখণ্ড
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে তোনাটিয়া
কামারপুকুর হইতে উদয়পুর
মান্দারন হইতে পাঁচখালি
মথুরা হইতে হরিহরপুর
নকুণ্ডা হইতে পাবা
নারায়ণপুর হইতে নবাসন
নবাসন হইতে গোলপুর
ওল্ড বেনারস রোড হইতে সেনাই
ওল্ড বেনারস রোড হইতে সান্তা
ওল্ড বেনারস রোড হইতে আগাই
ওল্ড বেনারস রোড হইতে গনেশবাটী
পাণ্ডাহিত আশাপুর রোড
পাণ্ডাহিত হইতে ভুরকুণ্ডা
পাতুলসাড়া হইতে হরিহরপুর
রাঙ্গামাটি হইতে পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটি হইতে ভিকদাস
সুবিরচক বদনগঞ্জ রোড
সালঝাড় গ্রামের রাস্তা
সান্তা সালিগ্তা রোড
সানবান্ধি হইতে নাকুণ্ডা
শ্যামবাটি গ্রামের রাস্তা
সুলতানদীঘি তিউরানি রোড
সানবান্ধি হইতে সুনিয়া
শ্যামবাজার গ্রামের রাস্তা
সানবান্ধি হইতে আশালহরি

হুগলী মাজিনান রোড ভাতুয়া হইতে নলবোনা
হুগলী মাজিনান রোড হইতে ভোয়াগাছি হইয়া জগৎপুর
হুগলী মাজিনান রোড হইতে বালিগড়ি পোলবা হইতে হালুসাই, সংগ্রামপুর ও পাটনা হইয়া
হুগলী মাজিনান রোড হইতে সুদর্শন ভুসুল হইতে বনগোপাল
হুগলী মাজিনান রোড হইতে প্রাণ্ডাপুর পাটনা হইতে কোটালপুর হইয়া মহানাদ
পাটনা হইতে মেরা ভায়া খিয়া
মগরা-পোলবা রোড সোনাটিকি
ননীপুর রোড হইতে নাবলগ্রাম হইয়া সম্বটোলা হইতে সিমলা
বোরোলো হইতে সোনাজুলি
বিদ্যুৎপুর হইতে দশঘরা
বৈঁচী-দশঘরা হইতে পীরতলা
বৈঁচী-দশঘরা রোড ভাস্তাড়া হইয়া
বৈঁচী-দশঘরা রোড হইতে শিবতলা হইয়া সুরো
বৈঁচী-দশঘরা রোড হইতে নারায়ণপুর
বৈঁচী-দশঘরা রোড হইতে গোপালপুর
মগরা-খানপুর রোড হইতে চোপা ও তথা হইতে গুড়বাড়ি হইয়া সর্দারপুর
মগরাখানপুর রোড হইতে গুড়ুপ
মগরাখানপুর রোড হইতে বলদা (গুড়ুপ ষ্টেশন)
মগরাখানপুর রোড ভাস্তাড়া হইতে ঘোষিরা
মগরাখানপুর রোড সোনাপাড়া হইতে ভাস্তাড়া
চুঁচুড়াখানপুর রোড হইতে তালচিনান
চুঁচুড়াখানপুর রোড হইতে গোবরহাড়া
চুঁচুড়াখানপুর রোড হইতে রোহিয়া
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে সুদর্শন, ভায়া ঘোষপুর ও পাউনাম
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে হারিট সেওলাগুড়ি হইতে চোরবাগান
পাউনান হইতে সাঁকো
ভুসুল হইতে সেরপুর
হয়াল হইতে ধলারবাগান
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে আমনান
কুমরুল হইতে চৌতাড়া
খোড়ো হইতে বেলগেছিয়া হইয়া রোহিয়া
হাঁদিলপুর হইতে টোপালা
মাকালপুর হইতে পোড়াবাজার
তালবোনা হইতে রামেশ্বর বাটি
কেদার রায় রোড
নাগবল-কুচপাল রোড
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে পলাসী
বাঁকিপুর হইতে আবদুলপুর
গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে বাকুলিয়া
কুলিয়াপাড়া হইতে নিশ্চিন্তপুর
দিগড়া হইতে বাকুলিয়া
বোগা হইতে পাঁচপাড়া
চন্দ্র হইতে কাকুরা
চাঁপতা হইতে দাসপুর
কামালপুর হইতে দাদপুর
খামারগাছি হইতে বানেশ্বরপুর
খামারগাছি হইতে মুক্তারপুর
ইশুড়া হইতে শ্বারপাড়া
বৈঁচী-বৈদ্যপুর রোড ভায়া ভোপুর
বৈঁচী-বৈদ্যপুর হইতে ইশুড়া
বৈঁচী-বৈদ্যপুর হইতে ভুইমোহান
বৈঁচী-বৈদ্যপুর হইতে জামনা
গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে বারোল
গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে গোয়াড়া
গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে সিমলাগোড়ি

খানপুর হইতে গড়বাড়ি
দশঘরা নারায়ণপুর রোড হইতে মির্জাপুর
দুলোপাড়া হইতে পলাসী
গড়ুপ লোকাল বোর্ড রাস্তা হইতে মল্লিকপুর
ভাণ্ডারহাটি হইতে মান্দারণ
ভাণ্ডারহাটি হাটতলা হইতে ভাণ্ডারহাটি
হুগলী মাজিনান রোড হইতে কানাজুলি
হুগলী মাজিনান রোড কামরাই হইতে হরাল হইয়া শ্রীরামপুর
হুগলী মাজিনান রোড হইতে মেলকি
হুগলী মাজিনান রোড হইতে গোয়াই-আমড়া
কানানদী হইতে খানপুর হাটতলা
কানানদী হইতে পলাসী হইয়া কাঁকড়াকুলি
কালিকাপুর হইতে কাঁকড়াকুলি
বাণ্ডালিপোতা হইতে দাড়পুর
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে দাদপুর
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে হাসনান
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে বেলমুড়ী
কুমরুল হইতে কালিকাপুর হইয়া দামোদর বাঁধ
কুমরুল হইতে নিশ্চিন্তপুর
ঢেরাগ্রাম হইতে বেলডিহা
স্বারবাসিনী হইতে সেয়া আলাসিন রোড
স্বারবাসিনী নাবস্তাপুর হইতে দীঘা
বাবনান লোকাল বোর্ড রোড হইতে মুসুরী
সি কে রোড হইতে ধুমঘাট
সি কে রোড হইতে অমরপুর
সি কে রোড হইতে নারাণপাড়া
সি কে রোড হইতে সুগন্ধা
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে রামনগর
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে রাজহাট
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে বালিকুকারি হইয়া ধনিজপুর
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে সেনেট

চাঁপতা হইতে ভিটাসিন
হরাল হইতে বিলসোরা
রামনাথপুর-হরাল হইতে দাদপুর
রামনাথপুর-হরাল হইতে হরাল গ্রাম
রামনাথপুর-হরাল হইতে আলাসিন
বাচকা হইতে দমদম
পাণ্ডুয়া-কুলটি হইতে দোমড়াগড়ি
পাণ্ডুয়া-কুলটি হইতে কানুর
রুকিনী হইতে মণ্ডলাই
পাণ্ডুয়া কালনা রোড হইতে দেপাড়া
সরগোড়িয়া হইতে গোহামি
পাকড়ি হইতে মহীপালপুর
পাণ্ডুয়া হইতে পোঁটবা
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে চম্পারুই
হরাল হইতে রারুল
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে হোয়েড়া
পাণ্ডুয়া হইতে রাজ্যধরপুর
পাণ্ডুয়া হইতে বেলুন
মল্লিকপুর হইতে রাজ্যধরপুর
অপূর্বপুর হইতে দলুইগাছি
নবগ্রাম হইতে সিমলা
বন্দীপুর হইতে ভগবতীপুর
হড়া হইতে ময়নাপোতা
বলরামবাটি হইতে গঙ্গাধরপুর
বিঘাটি হইতে ধোবাপুকুর
বিঘাটি হইতে গরজি
বিঘাটি হইতে চুটিপুর
ভদ্রেশ্বর হইতে দিগড়া
দিয়াড়া ষ্টেশন হইতে পোহালামপুর
গোপালনগর বাংলো হইতে বাবুরভেড়ি
গোপালনগর হইতে বেড়াবেড়ি
রাজারবাথান হইতে শেঠপুর
খলাসিনি হইতে ন'পাড়া
নসিবপুর রোড

কামদেবপুর হইতে যাদরো
ডুমুরপুর হইতে কুচপাল
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে ধোবিরভেড়ি
চুঁচুড়া খানপুর রোড হইতে আমনান
নসিবপুর হইতে নন্দা
নসিবপুর হইতে রাজারবাথান
সিঙ্গুর হইতে জগৎনগর
সিঙ্গুর হইতে বড়া

জেলা পর্ষদের রাস্তা

	পাকা	কাঁচা	মোট
হুগলী সদর	১৮ মাইল	৩৮৪ মাইল	৪০২ মাইল
চন্দননগর	৩ মাইল	১৪১ মাইল	১৪৪ মাইল
শ্রীরামপুর	৭ মাইল	১৪৪ মাইল	১৫১ মাইল
আরামবাগ	২ মাইল	৩২১ মাইল	৩২৩ মাইল
মোট	৩০ মাইল	৯৯০ মাইল	১০২০ মাইল

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হুগলী জেলায় যে সব রাস্তা সম্প্রতি তৈয়ারী হইয়াছে বা পিচ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :

রাস্তার নাম		মাইল
বৈদ্যবাটী-তারকেশ্বর-চাঁপাডাঙ্গা	...	২৫
চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি-তারকেশ্বর	..	৩০
তারকেশ্বর-চকদীঘি	...	৮
নলডুবি-মধুবাটী-সাতবেড়িয়া	...	৫
মধুবাটী-বেঙ্গাই-খাচল	...	৮
জগৎপুর-খানাকুল-ধরমপোতা	..	১৫
চাঁপাডাঙ্গা-পুরসুড়া-আরামবাগ	..	১৪
উত্তরপাড়া-কালীপুর	...	৪॥
আঁটপুর-রাজবলহাট	..	৩॥
মগরা-খানপুর	..	৩॥
বেলমুড়ি-ভান্ডারহাটি	...	৪॥
বৈঁচী-জামনা	..	৪॥
ব্যান্ডেল-রাজহাট-পোলবা	...	১০
বেলমুড়ি-ভান্ডারহাটি	...	১০॥
পুরসুড়া-রাধানগর	...	৩॥
হরিপাল-জগজীবনপুর	..	৩॥
পান্ডুয়া-কালনা	...	১৫
সপ্তগ্রাম-গুপ্তিপাড়া	...	১৯
শ্রীরামপুর-চন্ডীতলা	...	১০
মশাট-ধিৎপুর	...	৭

রাস্তার নাম		মাইল
কোটালপুর-কামারপুকুর	...	১০॥
জগজীবনপুর-আটপুর	...	৫
কাঁঠালপুর-আরামবাগ	...	৪
বৈদ্যবাটী চাঁপাডাঙ্গা রোড হইতে তারকেশ্বর মন্দির		১

১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলায় পূর্ত বিভাগ পরিচালিত পাকা রাস্তা ছিল ৪৮ মাইল ও কাঁচা রাস্তা ছিল ৮ মাইল। জেলা পর্ষদ পরিচালিত পাকা রাস্তা ১৩০ মাইল ও কাঁচা রাস্তা ১,১৪৪ মাইল। ইহার মধ্যে ৬৭ মাইল পাকা রাস্তা ও ৫২ মাইল কাঁচা রাস্তা পর্ষদ সরকারকে উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং উহার সংস্কারের কাজও শেষ হইয়া গিয়াছে। হুগলী জেলায় মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত পাকা রাস্তা ১৬৫ মাইল এবং কাঁচা রাস্তা হইতেছে ১১০ মাইল। এই সব রাস্তা ছাড়া আরও ১৭০ মাইল রাস্তার নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে।

দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে হুগলী জেলায় গুটিকয়েক রাস্তা বাদ দিলে, প্রকৃতপক্ষে কোন ভাল রাস্তা ছিল না। সেইজন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করা তখন খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। বিশেষ করিয়া আরামবাগ মহকুমার অধিকাংশ রাস্তাই খারাপ ছিল। আরামবাগের কোন কোন রাস্তার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, স্থানে স্থানে রাস্তার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইয়া রাস্তা মাঠের সঙ্গে মিশিয়া যাইত। বর্ষাকালে সেইজন্য নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও স্থানীয় অধিবাসীরা গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিত না। তাই আরাম-বাগের সর্বত্র এই প্রবাদটি প্রচলিত ছিল :

'বর্ষাকালে কর্দমাক্ত অন্যকালে ধূলিসিক্ত।'

বর্তমানে সমগ্র জেলায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আপ্রাণ চেষ্টায় বিশেষ করিয়া আরামবাগ মহকুমায় রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় পূর্বের অসুবিধা বহুলাংশে কমিয়াছে। সম্প্রতি চাঁপাডাঙ্গার নিকট দামোদর নদের উপর একটি পুলের নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হইয়াছে; সুতরাং বর্ষাকালে খেয়া নৌকায় আর দামোদর পার হইতে হইবে না। এখন মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর একটি পুল হইলে আরামবাগ শহরে বা খানাকুলে যাইবার আর কোন অসুবিধা হইবে না।

আরামবাগ মহকুমার অভ্যন্তরে রেলপথে যাইবার কোন উপায় এখন নাই। তারকেশ্বর হইতে রেল লাইন আর পনের মাইল সম্প্রসারিত করিলে হুগলী জেলার সর্বত্র যাতায়াত ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

॥ সংকেত সূত্র ॥

(১) বিশ্বকোষ (১৬শ ভাগ) নগেন্দ্রনাথ বসু

(২) The Vangas (Indian Culture, July 1934) Dr. B. C. Law.

(৩) গৌড়ের ইতিহাস—[illegible] চক্রবর্তী

(৪) বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫) McCrindles Magasthenes.

(৬) Political History of Ancient India.

(৭) Portugeese in Bengal—J. A. Compose.

(৮) Bengal Past and Present (1909).

(৯) বিশ্বকোষ (২২শ ভাগ) নগেন্দ্রনাথ বসু

(১০) তকবাৎ-ই-নাসরি

(১১) বিশ্বকোষ (১৬শ ভাগ) নগেন্দ্রনাথ বসু

(১২) Calcutta Review, 1846.

(১৩) Stewarts History of Bengal.

(১৪) Hooghly Medical Gazetteer.

(১৫) Valentin's Memoirs to Van Den Brocke's Map.

(১৫ক) Some Historical and Ethical Aspects. W. B. Oldham.

প্রকৃতি

পরিচয়
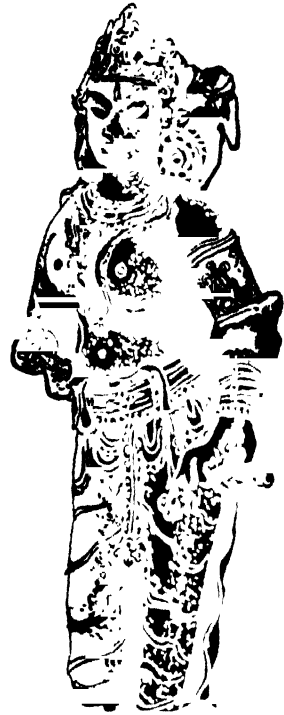
হুগলী জেলা নদী-মাতৃক হইলেও ইহার ভূভাগ সর্বত্র সমতল নহে। হুগলী জেলায় ষড়ঋতু বর্তমান। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম এবং শীতকালে সর্বত্র খুব শীত অনুভূত হয় না। গোঘাট থানায় শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য অনুভূত হয়, কারণ এই স্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। হুগলী জেলার উত্তর ও পূর্ব অংশে শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য একটু বেশী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে শীত ও গ্রীষ্ম অল্প অনুভূত হয়। বায়ু আর্দ্র। গঙ্গার তীরবর্তী স্থানগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকর, কিন্তু বর্তমানে ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গার তীরে বড় বড় মিল ও কারখানা স্থাপিত হওয়ায় এই অঞ্চলের আবহাওয়া পূর্বাপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়াছে। প্রাচীন কালে এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া বঙ্গের রাজা-রাজড়াগণের সপ্তগ্রামেই বাসস্থান ছিল। উইলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন—সপ্তগ্রাম পুণ্যস্থান হিসাবে বিখ্যাত বলিয়া পূর্বে ইহা রাজন্যবর্গের বাসস্থান ছিল। কিন্তু প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব হইতে এই অঞ্চলের জলবায়ু ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরম্ভ হয় এবং প্রাক্-স্বাধীনতা পর্যন্ত হুগলী জেলা ম্যালেরিয়ার প্রধান আকর বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া জলের সুব্যবস্থা হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলা কি বরাবরই ম্যালেরিয়ার দ্বারা অধ্যুষিত ছিল? না হুগলীবাসী চিরকালই এইরূপ দুর্বল ও রোগগ্রস্ত ছিল? হিন্দু রাজত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও মুসলমানদের

আমলেও দেখিতে পাই যে, সারা ভারতে বাঙলার বায়ু ও বাঙলার জল অতুলনীয় ছিল। এমন কি বঙ্গদেশে সেই সময় বর্ষা ঋতুও স্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর ছিল। এই সম্বন্ধে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে লিখিয়াছেন ঃ

সমস্ত সাম্রাজ্য জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতা ও নাতিশীতোষ্ণতা এবং অধিবাসীদের সুগঠিত দেহের জন্য অতুলনীয় ছিল। প্রতিটি স্থান (সাম্রাজ্যের) জনবহুল ও কর্ষিত ছিল, সেইজন্য এক ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম বা নগরে সুপেয় জল নাই—এইরূপ বড় একটা দেখা যাইত না। গভীর জলমধ্যেও বৃক্ষ ও মাটি সবুজে আচ্ছাদিত ছিল এবং বর্ষাকালে—যাহা অনেক স্থানে জুন মাসে আরম্ভ হইয়া সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলিত—তখনও জল-হাওয়া এরূপ মনোমুগ্ধকর হইত যে বৃদ্ধও যুবজনোচিত শক্তি লাভ করিত।

ভাগীরথী তীরবর্তী স্থানসমূহ, যাহা বর্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রধান আকর তাহা বাঙলার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অংশ ও সর্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল বলিয়া বেণ্টলী সাহেবও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।(১) বেশী দিনের কথা নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও বর্তমান ম্যালেরিয়া জর্জরিত ব্যাণ্ডেল তখন 'মধুর ব্যাণ্ডেল' বলিয়া অভিহিত হইত এবং সাহেবগণ উক্ত স্থানে স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য যাইতেন। এই সম্বন্ধে "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত একটি কবিতা উদ্ধারযোগ্য,

Each other place is hot as hell,
When breezes fan you at Bandel,
Had I ten houses all I'd sell
And live entirely at Bandel.

বর্তমানে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্থানগুলি দেখিয়া হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না যে, তদানীন্তন ইউরোপীয় কর্মচারীদের অসুখ করিলে, তাহারা বর্ধমানে হাওয়া বদলাইতে যাইতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও স্বাস্থ্যলাভার্থে বর্ধমানে যাইতেন। পরে সেখানে ম্যালেরিয়া দেখা দেওয়ায় তিনি কার্মাটারে যাইতে আরম্ভ করেন।

Before 1862 the district was noted for its healthiness, and the town of Burdwan particularly was regarded as a sanitarium. Burdwan District Gazetteer.

হুগলী জেলার জলবায়ু পয়ষট্টি বৎসর পূর্বেও সুন্দর ছিল তাহা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের এই সংবাদটি হইতে জানা যায়।

Hooghly, May 10

The climate is now excellent. Plenty of rain has made Hooghly very cold and plesant. (The Statesman May 12. 1885).

শত বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালীর শরীরে বল ছিল স্বাস্থ্য ভাল ছিল এখনকার মত তখন কেহ রোগগ্রস্ত ছিল না। ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো সেই সময়ের বাঙ্গালীদের দেখিয়া লিখিয়াছেন ঃ

"এইরূপ সুশ্রী জাত আর দেখি নাই। মাদ্রাজের অধিবাসীদের দেহগঠন পছন্দ করি—কিন্তু বাঙালীরা তাহাদের অপেক্ষাও সুন্দর। মান্দ্রাজীরা শীর্ণ দেহ, কিন্তু ইহারা দীর্ঘকায় ও পেশীবহুল। ইহাদের দেহের গঠন ব্যায়ামবীরের ন্যায় এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও সুন্দর।"

সার উইলিয়াম উইলকক্স বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার নদী-বিজ্ঞান তিনি খুব ভাল বোঝেন। মিশর সরকারের সেচ-বিভাগে তিনি অনেক দিন চাকুরি করিয়াছেন। নীল নদের বুকের উপর বিখ্যাত আসুয়ান বাঁধের পরিকল্পনা ও নির্মাণকার্য উভয়েরই তদারক তিনি সম্পন্ন করেন। এই বাঁধের জন্যই নীল নদকে আজ শাসনে রাখা সম্ভব হইয়াছে ও সেই অঞ্চলের তুলার চাষ ও উৎপাদন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নদী-বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সার উইলিয়াম উইলকক্সকে ১৯২৮ সালে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ১৮৫০ সালের পূর্বে অর্থাৎ ঐ সময় হইতে মাত্র আশী বৎসর পূর্বের বর্ধমান ও হুগলী জেলার এক সুন্দর চিত্র. তাহার শ্রোতাদের সামনে তুলিয়া ধরেন। সেই সময়কার বিভিন্ন ভ্রমণকারীর লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলার এই অঞ্চল ছিল কৃষিতে প্রথম, আর ইহার পরেই স্থান হইল মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোরের।

তখন নদীতে বাঁধ ছিল না, একটা সুবিধা এই ছিল যে. এখনকার ন্যায় তখনকার বন্যা কোনো নির্দিষ্ট স্থানের বাঁধ ভাঙিয়া সমস্ত বন্যার জল সেইস্থান দিয়া বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ পূর্বক উদ্দাম স্রোতে নির্গত হইয়া, সমস্ত কিছু খড়কুটার মতো ভাসাইয়া লইয়া যাইত না তখন বন্যা আসিত বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া বহু দেশে সেই বন্যার জল ছড়াইয়া পড়িত ও সমস্ত জমিতে পলি পড়িত আর বন্যার জল কোনো এক জায়গায় আবদ্ধ থাকিয়া অহেতুক জলা ভূমির সৃষ্টি করিত না। আর এই বানের জল ছোটখাটো নদীগুলিকে পুষ্ট করিত যার অভাবে এখন সে সমস্ত নদী অদৃশ্য হইয়াছে। যেবার বর্ষায় নদীতে আশানুরূপ জল আসিত না অথবা বৃষ্টি কম হইত, সেখানে চাষীরা নদীর তীর কাটিয়া নিজেদের জমিতে জল লইয়া আসিত। তাহারা নদীর সঙ্গে সুখে দুঃখে বাস করিত, কিন্তু লাভের ভাগটা তখন ছিল কেবল মানুষের প্রাপ্য।

তারপর তৈয়ারী হইল রেল লাইন। এই রেল লাইন রক্ষা করিবার জন্য নদীর ধারে পড়িল উঁচু রেলপথ ও একটা বাঁধ, আর মাঝে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তো ছিলই। অতএব পর পর তিনটি বাঁধ পড়িল। দামোদর উপত্যকার অধিবাসীরা এতদিন যে জলের সুবিধা ভোগ করিতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল। তথাপি লোকে বাঁধ কাটিয়া জমিতে জল আনিত। কিন্তু ১৮৫৫ সাল হইতে সরকার নিজে বাঁধের কর্তৃত্বভার লইয়া এই রকম বাঁধ কাটিয়া জল আনা আইনানুসারে অপরাধমূলক ও দণ্ডনীয় বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। দামোদর উপত্যকার অধিবাসীদের যত কিছু দুর্দশা এই সময় হইতেই আরম্ভ হইল। প্রথম প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিল ম্যালেরিয়া। গ্রামের পর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। ম্যালেরিয়ার জন্য যতই ভাল ঔষধ থাকুক এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া

অপ্রতিহতভাবেই রাজত্ব করিতেছে। দরিদ্র চাষী ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে। একে অন্নাভাব তাহার উপর ঔষধ কিনিবার পয়সাই বা কোথা হইতে আসিবে?

হুগলী জেলায় জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এই স্থানের চরম দুরবস্থা হয় বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। শীতকালে এই জেলার অবস্থা সর্বাপেক্ষা সুন্দর থাকে। অতি বৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টির জন্য প্রায়ই শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৮৯·১৩" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হওয়ায় জেলার শস্যাদি ভাল হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ৫৫·৩' ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ৬৩·৮৫" ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ায় জেলার শস্য একপ্রকার বিনষ্ট হইয়া যায়। বর্তমানে বর্ষার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমেরিকা জাপান ও রাশিয়ার ন্যায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচের বন্দোবস্ত করিয়া চাষের উন্নতি না করিলে আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। প্রতিবৎসর যে ঠিক সময়ে বৃষ্টি হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, অধিকন্তু গড়পড়তা বৃষ্টিপাত দেখিয়া চাষের ভালমন্দ বিচার করা যায় না। কারণ এমন বৎসর গিয়াছে, যে আবাদের সময় বৃষ্টি ঠিক হইল না। কিন্তু একদিনে এত বৃষ্টি হইল যে রাস্তাঘাট ডুবিয়া গেল। সেরূপ বৃষ্টিতে চাষের কোন সুবিধা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের একদিন ২০' ৫০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং একদিনের বারিপাত হিসাবে ইহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক (বা রেকর্ড) বলা যাইতে পারে; কিন্তু উক্ত বৎসর শস্য আদৌ ভাল হয় নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলায় বৃষ্টিপাতের তালিকা (ইঞ্চি হিসাবে) এইরূপ ঃ

হুগলী জেলার বৃষ্টিপাতের তালিকা

খৃষ্টাব্দ	বৃষ্টিপাত	খৃষ্টাব্দ	বৃষ্টিপাত	খৃষ্টাব্দ	বৃষ্টিপাত
১৮৭০	৫৮·০২	১৮৮০	৫৪·৮৭	১৮৯০	৫৫·০৭
১৮৭১	৭৬·৭৯	১৮৮১	৬২·৭৭	১৮৯১	৪৫·৮৫
১৮৭২	৫১·০০	১৮৮২	৫৬·৯০	১৮৯২	৪১·৩১
১৮৭৩	৩৯·৬৩	১৮৮৩	৫৬·২৬	১৮৯৩	৬৯·৪৭
১৮৭৪	৩৯·৩৭	১৮৮৪	৪৬·৫২	১৮৯৪	৪৩·৮২
১৮৭৫	৫২·৯৯	১৮৮৫	৭২·৭৯	১৮৯৫	৪৩·১৮
১৮৭৬	৪০·৭২	১৮৮৬	৫৯·৮৯	১৮৯৬	৪৩·৬১
১৮৭৭	৫৬·৩৭	১৮৮৭	৪৮·৬০	১৮৯৭	৬৮·৮২
১৮৭৮	৮৯·০০	১৮৮৮	৭২·৪৭	১৮৯৮	৫২·৮৭
১৮৭৯	৪২·৫৩	১৮৮৯	৪০·২৭	১৮৯৯	৭২·৩১
				১৯০০	৭১·৮৭

শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের আবহাওয়ার বহু পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা বর্তমান কালের হাওয়া অনেক শুষ্ক হইয়াছে। সেইজন্য পূর্বের ন্যায় আর বৃষ্টি হয় না। অধিকন্তু জলকষ্ট পশ্চিমবঙ্গে একপ্রকার দেশব্যাপী আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্বের ন্যায় কালবৈশাখীর ঝড় আর হয় না।(২) বনজঙ্গল ধ্বংস করিবার ফলেই যে পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব ও তজ্জনিত কৃষি ও স্বাস্থ্যহানি প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা বোধ হয় কেহই আজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

In the early part of British rule, forests were rapidly destroyed. Production in India.

এই সম্বন্ধে ডাঃ ভোয়েলকার যাহা লিখিয়াছেন তাহাও জানাইঃ

"ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে জলবায়ু এখন যেরূপ পূর্বে সেরূপ ছিল না—বনভূমি ও বনপথের উচ্ছেদের (যাহার ফলে পশুচারণের ভূমির অভাব পরিলক্ষিত হয়) সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-কর্মের প্রসারের ফলে বর্তমান জলবায়ু এইরূপ হইয়াছে।" (৩)

তারপর ভাগীরথী তীরবর্তী স্থানসমূহ, যাহা একসময়ে সর্বপ্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল সেগুলিও কলকারখানা বৃদ্ধি হওয়ায় অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় জলের আধার 'গঙ্গাজল' বর্তমানে আর "মনোহারী মুরারী চরণচ্যুতম্" নহে; হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কানপুর এলাহাবাদ কাশী পাটনা প্রভৃতি বড় বড় সহরের মল মূত্র আবর্জনা এবং উভয়তীরস্থ শত শত কারখানার 'সেপটিকট্যাঙ্ক' হইতে আগত ময়লা জল গঙ্গাস্রোতে বঙ্গবাসীর জন্য নামিয়া আসিতেছে আর গঙ্গাতীরস্থ অধিবাসিগণ উক্ত জল পান করিয়া পীড়া মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শমন-সদনে চলিয়া যাইতেছেন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে এই ধরণের অত্যাচার গঙ্গাতীরবর্তী স্থানের অধিবাসিগণকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

অস্বাস্থ্যকর জলাশয় বিল দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতি বহুদিনের অযত্নে মজিয়া যাওয়ায় তাহাতে নানাপ্রকার দাম শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হইত এবং গ্রীষ্মকালে পূর্বোক্ত জলাশয়ের জল একবারে শুকাইয়া যাইলে দাম শৈবাল প্রভৃতি পচিয়া অস্বাস্থ্যকর গন্ধের সৃষ্টির দ্বারা হুগলী জেলার আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর করিয়া দিয়াছে। পূর্বে নদীগুলি দিয়া সারা বৎসর জল প্রবাহিত হইত বলিয়া গ্রামের ছোট ছোট পুষ্করিণীগুলি একেবারে শুকাইয়া যাইত না কিন্তু বর্তমানে তাহার ব্যতিক্রম হওয়ায় স্থানীয় জল ও বায়ু উভয়ই বিদূষিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ সরকার তাঁহাদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য যত্রতত্র রাস্তা বাঁধ ও রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করার এবং জেলার জমিদারবর্গ মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য ও ধানের ক্ষেত্রগুলিতে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বাঁধ দিয়া ছোট নদী ও খালের মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় হুগলী জেলার আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই স্থান ম্যালেরিয়া প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়াছে।

রাজা দিগম্বর মিত্র ফিভার কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

The mischief has been chiefly committed by roads, railways and embankments, not because as such but becuase they happened to cross the drainage levels of villages. In many instances the mischief has been likewise done by khals or other natural channels of drainage having been dammed up by zamindars or their Raiyots for purpose of fishery or for retaining monsoon water on their elevated rice lands. The Hindu Patriot, 1872-73.

হুগলী জেলায় ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পুষ্করিণী শুকাইয়া যাওয়ায় পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসিগণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। যে স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে সেখানে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই কিন্তু গ্রামে জলাভাবে গ্রামবাসিগণের অশেষ কষ্ট অনুভূত হয়। সম্প্রতি হুগলী জেলা বোর্ড, জেলার বিভিন্ন স্থানে দশহাজারের উপর নলকূপ নির্মাণ করিয়া অধিবাসীদিগের কষ্টের খানিকটা লাঘব করিয়াছেন। নলকূপ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিরও প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে বলিতে পারা যায়।

॥ পশুপক্ষী সরীসৃপ ॥

হুগলী জেলায় নানারূপ পশুপক্ষী সরীসৃপ ও মৎস্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এই জেলার বহুস্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া বিবিধ বন্য জন্তু এইস্থানে বসবাস করিত। ষ্ট্যাভারিনাস ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলা পরিভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ব্যাঘ্র এই অঞ্চলে যথেষ্ট দৃষ্ট হয় এবং তাহারা সময় সময় বহির্গত হইয়া অধিবাসীদের আক্রমণ করে। বন্য মহিষও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন:

"অরণ্যাগুলিতে বহু ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা লোকালয়ে বিচরণ করিতে আসে এবং অরণ্যে বন্যমহিষও বহু দেখা যায়।"

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" চুঁচুড়ার নিকটে চারিটি ব্যাঘ্রকে শিকার করিয়া মারা হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পর এই স্থানে আর কোন ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। হুগলী জেলায় ব্যাঘ্র শিকার সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ দৈনিক বসুমতী (২৪শে পৌষ ১৩৫৪) এবং যুগান্তর (২৩শে নভেম্বর ১৯৫৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা এইস্থানে উদ্ধারযোগ্য:

গত ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার হুগলী জেলার অন্তর্গত পাঁচপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় অসীম সাহসের সহিত এক নরঘাতক বাঘ শিকার করিয়াছেন। বাঘটি এক চাষীকে আক্রমণ করিয়াছিল। শৈলেন বাবু সেই অবস্থায় একাকী বাঘটিকে গুলি করিয়া লোকটির প্রাণরক্ষা করেন। বাঘটি দৈর্ঘ্যে ৭ হাত। আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে। শৈলেন বাবু বলেন যে, সরকার অথবা জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষ যদি ঐ ব্যক্তিকে মাসিক কিছু অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহা নিজ কার্যের পুরস্কার বলিয়া মনে করিবেন।

গত দুই সপ্তাহ যাবৎ সিঙ্গুর থানা এলাকায় বাঘের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিমধ্যে নিকটস্থ জঙ্গলে কয়েকটি ছাগল ও বাছুর মারা পড়িয়াছে। গত ১৯শে নভেম্বর [১৯৫৪] কয়েকজন গ্রামবাসী একটি ছোট আকারের বাঘের বাচ্চা মারিয়াছেন। এরূপ ধারণা করা যাইতেছে যে, এখনও একটি বাঘ, একটি বাঘিনী ও কয়েকটি বাচ্চা এতদঞ্চলে রহিয়াছে। স্থানীয় গ্রাম্য- রক্ষীবাহিনীর সহযোগিতায় বাঘগুলিকে মারিবার সর্বপ্রকার আয়োজন চলিতেছে। বাচ্চাটির দৈর্ঘ লেজ সমেত প্রায় তিন ফুট।

বন্য মহিষ ও বন্য শূকর এই স্থানে যথেষ্ট ছিল। সেই জন্য গ্রামবাসিগণ বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথে ভ্রমণ করিবার সময় লাঠি, বল্লম, খোঁচ প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইত। হিংস্র জন্তু ব্যতীত শৃগাল, বানর, হনুমান খরগোস ভোঁদড় খেঁকশিয়াল ইন্দুর বেঁজি ভাম ছুঁচো বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মহিষ ভেড়া ঘোড়া কুকুর শূকর বিড়াল মুরগী হাঁস পায়রা প্রভৃতি প্রধান। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কচ্ছপ কাঁকড়া এবং গঙ্গায় কুম্ভীর হাঙ্গর ও শিশুকও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শালিক টিয়া বুলবুল চন্দনা ময়না প্রভৃতি বহু পক্ষী এই স্থানে আছে এবং বহু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ময়ূর, হরিণ প্রভৃতি যত্ন করিয়া পুষিয়া থাকেন।

হুগলী জেলায় নানাজাতীয় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোকিল, বউ-কথা-কও, কাক দাঁড়কাক ঘুঘু বক বাবুই বুল বুল বাজ চিল পেঁচা বাবুই মাছরাঙ্গা পায়রা শকুনি গৃধিনী দাঁড়কাক ডাকপাখি হাড়গিলা পানকৌড়ি কুক্কুট পাতিহাঁস টুনটুনি শালিক পাপিয়া বাদুড় চড়াই কাদাখোঁচা দোয়েল টিয়া ময়না চন্দনা তিতির পায়রা ফিঙে চাতক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ময়না, টিয়া, শালিক, কোকিল, চন্দনা প্রভৃতি বুলিদার পাখি লোকে সখ করিয়া পুষিয়া থাকে বলিয়া, ইহা বেশ উচ্চ দরে হাটে বাজারে বিক্রয় হয় এবং কলিকাতায় চালান যায়। পাতিহাঁস, রাজহাঁস ও কুক্কুট গৃপালিত এবং পায়রাও লোকের বাড়িতে আশ্রয় করিয়া বাস করে দেখিতে পাওয়া যায়।

॥ মাছ ॥

হুগলী জেলার তিনটি প্রধান নদনদী ভাগীরথী দামোদর ও রূপনারায়ণের মাছ মিষ্ট ও সুস্বাদু বলিয়া প্রখ্যাত। সেই জন্য পুকুরে মাছের চাষ করিবার জন্য দামোদরের ছোট পোনা ও ডিম লোকে বিশেষ আগ্রহের সহিত কিনিয়া থাকে। রাজবলহাট, চাপাডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের মৎসব্যবসায়ীগণ পোনা মাছের ডিম ধরিয়া বিক্রয়ার্থে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে গমন করে। বর্ষার শেষে দামোদরে যে গলদা চিংড়ি হয়, সেইরূপ সুস্বাদু ও মিষ্ট গলদা চিংড়ি বাংলাদেশের আর কোথাও পাওয়া যায় না।

হুগলী জেলায় সাধারণতঃ রুই কাতলা মৃগেল কালবংশী খয়রা মৌরলা পুটি বেলে চেলা ভোলা চিতোল সিঙ্গি মাগুর কই ফলই পাবদা টেঙরা বান শোল বাটা বোউল ল্যাটা চাঁদা খলসে তপসে ফ্যাসা পাঁকাল গাঙ্গদাড়া বাওয়াধি গুঁতে প্রভৃতি মাছ যথেষ্ট

পরিমাণে পাওয়া যায়। গঙ্গা ও দামোদরে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ জন্মায়। দামোদরের ইলিশমাছ অতিশয় সুস্বাদু বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুস্করিণীতে রুই কাতলা মৃগেল প্রভৃতি মাছের ডিম হইতে মাছের চাষ করা যায় না। সেইজন্য নদীর ছোট পোনা সাধারণতঃ পুকুরে ফেলিতে হয়। হুগলী জেলায় মৎস্যের আধিক্য না থাকিলেও অল্পতা নাই।

হুগলী জেলায় সময় সময় অনেক অদ্ভুত রকমের মৎস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে ২৯ আষাঢ় ১৩৬৫ সালের 'যুগান্তরে' একটি অদ্ভুত আকৃতির কাতলা মাছের বিষয় যে সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধারযোগ্য:

অদ্ভুত আকৃতির কাতলা। সম্প্রতি হুগলী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়ার একটি পুকুর হইতে এক অদ্ভুত আকৃতির 'কাতলা' মাছ ধরা পড়ে। মাছটি ওজনে দশ সের, লম্বা ও চওড়ায় ১৬ ইঞ্চি। খাইতেও অতি সুস্বাদু। শিরের লম্বা একটি কাঁটা ছাড়া কোন ছোট কাঁটা মাছটিতে ছিল না। মাছটি বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনিলে কয়েক শত লোকের ভিড় জমিয়া যায়। অনেকে মাছটিকে 'লক্ষ্মী মাছ' বলিয়া অভিহিত করে।

গঙ্গায় হাঙ্গরও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় এবং বহু লোককে খাইয়া ফেলিয়াছে এরূপ সংবাদও শোনা যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুনের 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রে গঙ্গায় হাঙ্গরের আবির্ভাবের একটি সংবাদে বৈদ্যবাটি পর্যন্ত সমস্ত স্নানার্থীদের সাবধান করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদটি উল্লেখ্য:

SHARKS IN THE HOOGHLY.—Sharks have made their appearance in the river, says a local paper, and accounts continue pouring in upon us of their ravages. River bathers should beware. The range of their depredations extends as far up as Bydabatty.

দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়ণে খুব বড় বড় কুমীর বাস করে। ছোট ছোট নদনদী ও খালেও অনেক সময় কুমীর দেখা যায়। বহু পুকুরেও মেছো কুমীর আছে। ইহারা মানুষ কিম্বা জন্তুর কোন অনিষ্ট করে না।

এই স্থানে মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পুষ্করিণী ও খাল-বিলেতে রুই কাতলা মৃগেল ভেটকী মাগুর বোয়াল চিংড়ি পুঁটি প্রভৃতি অসংখ্য মৎস্য কলিকাতায় চালান হইয়া থাকে।

অন্নদামঙ্গল রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্থানের মৎস্যের যে তালিকা তাঁহার কাব্যে দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল:

কাতলা ভেকুট কই ঝাল তাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।

চিংগড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈল রান্ধে তৈল-শাক।
মাছের ডিমের বড়া ঘৃতে দেয় ডাক॥
বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গংগাফল তার নাম অমৃত অসীম॥

১২ই অগস্ট ১৯৬০, যুগান্তরে একটি অতিকায় করাত মাছের যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা এইরূপ ঃ

গতকল্য শ্রীরামপুরের গংগায় দুই ব্যক্তির দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় একটি অতিকায় করাত মাছ ধরা পড়িয়াছে। মাছটির ওজন প্রায় দেড় মণ এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে চার ফুট বলিয়া জানা গিয়াছে। এই করাত মাছটির সম্মুখভাগে দুই পাটি অতি তীক্ষ্ন দাঁত আছে এবং এই দাঁত দিয়া অতি সুচারুভাবে মানুষকে কাটিয়া ফেলিতে পারে। এই অতিকায় জীবটিকে কেহ কেহ মকর বলিয়াও অভিহিত করিতেছে। অদ্ভুত জীবটিকে শ্রীরামপুর কলেজের জীববিজ্ঞান পরীক্ষাগারে রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দুই ব্যক্তি স্নান করিতে আসিয়া অকস্মাৎ দেখিতে পান যে একটি অদ্ভুত অতিকায় জীব জেটির মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। গত বৎসর শ্রীরামপুরের গংগায় একটি হাংগর ধরা পড়িয়াছিল।

সর্প॥ সর্পদংশনে ভারতবর্ষে যত লোকের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে দশহাজার লোক একমাত্র বংগদেশে মারা যায়। বর্ধমান ও হুগলী জেলায় সর্পদংশনে মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা অধিক। কেউটে গোখুরা শংখচূড় প্রভৃতি বিষধর সর্প এই স্থানে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। গোখরো সাপ নানা জাতীয় আছে—তন্মধ্যে জাতসাপ কালসাপ কেউটে সাপ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ ধানের ক্ষেতের আলের পার্শ্বে এবং জলের ধারে ইহারা থাকে। সাপুড়ে ও বেদেরা এই ভীষণ সাপগুলিকে ধরিয়া সর্বত্র বহু প্রকারের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়। পূর্বে গো-সাপের দ্বারা সর্পভয় অনেক নিবারিত হইত, কারণ গো-সাপ পূর্বোক্ত সাপগুলিকে মারিয়া ফেলিত। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ চামড়ার ব্যবসায়িবৃন্দ গোসাপের চামড়া দিয়া সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিবার জন্য ইহাদিগকে মারিয়া ফেলায়, সাপের উৎপাত বর্তমানে বৃদ্ধি পইয়াছে। প্রাচীন বংগসাহিত্যে বহুপ্রকার সাপের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের "মনসার পাঁচালী" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করি ঃ

ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্বাঙ্গ ঢাকিল পদ্মা অজগর সাপে॥
আড়রিয়া বেঁকা নাগে করিল আসন।
পাটেশ্বরী নাগে পদ্মা করিল বসন॥
খাইয়া জাতি নাগে পদ্মার হাতে বড় শোভা।
বিঘতিয়া নাগে পদ্মা বাঁধে খোঁপা॥
কুন্ডলিয়া নাগে পদ্মার কর্ণের কুন্ডলী।
জাতি সর্প দিয়া বাঁধে মাথার পুটলি॥
শিশরিয়া নাগে পদ্মার ললাটে সিন্দুর।
বিঘতিয়া বোড়া নাগে চরণে নূপুর
সূর্যমণি নাগে পদ্মার শাড়ীর আঁচলী।
ধামু নাগেতে পদ্মার কোমরে কাঁচলী॥

কৃষিজ দ্রব্য॥ বঙ্গদেশে শস্যের মধ্যে ধান্যই সর্বপ্রধান। হুগলী জেলাতেও ধান্য প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এই জেলায় বহু প্রাচীন কাল হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন তন্মধ্যে আমন ধান্যই প্রধান। সমগ্র ভারতবর্ষে দশ হাজার রকমের আমন ধান্যের চাষ হয়। হুগলী জেলায় প্রায় একশত বিভিন্ন রকমের ধান্য উৎপন্ন হয়—যথা, দাদখানি হাতিশাল ঝিঙেশাল বাঁক তুলসী কাটারীভোগ নাগরা ইন্দ্রশাল কার্তিকশাল রামশাল বাঁশফুলি সিতাহার, পিঙ্গাশোল কর্ণশাল কাশিফুল রূপশাল মেটে আকড়া ভূতাশোল গয়াবালি হলুদগুঁড়ি সোনাতার কলমকাঠি বকুলকুঞ্জ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন আউশ ধান্যও এই স্থানে উৎপন্ন হয়। আউশ ধান্য যে কত প্রকারের আছে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। প্রায় তিরিশ প্রকারের আউশ ধান্য হুগলী জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দুর্গাভোগ তুলসী মঞ্জুরী চন্দ্রমণি রাজসাই সূর্যমুখী কাজলা কালামাণিক, মধুমালতী পিঁপড়ে সার দলকচু সূর্যমণি প্রভৃতি প্রধান। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ অন্যান্য জেলায় যে প্রকারের ধান্য জন্মে, হুগলী জেলায় তাহার অনেকটা জন্মিয়া থাকে বলা যায়। পূর্বাপেক্ষা এই স্থানের শস্যোৎপাদিনী শক্তি কমিয়া গিয়াছে, বর্তমানে এই জেলায় ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত একার জমিতে মাত্র ধান চাষ হইয়া থাকে।

॥ ধান চাষ ॥

"নহি ধান্য-সমোঅর্থঃ" নীতিশাস্ত্রকার চাণক্যের সূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে এই অমূল্য বাক্যটি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা অনেকে একথাটি ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার অর্থ ধান্যের সমান অন্য কোন অর্থই নয়। যতপ্রকার ধন আছে তন্মধ্যে ধান্য-ধনই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রীহি জাতীয় দ্রব্যাবলীর মধ্যে ধান্যের শ্রেষ্ঠত্ব কে অস্বীকার করিবে? মণিকাঞ্চন ধারণে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। অন্নদ্বারা তাহা সম্ভবপর। ধান্য যব গোধূম কঙ্গু নীবার কোদ্রবাদি নানাপ্রকার ব্রীহি বা শস্য দেখা যায়। পঞ্চ, সপ্ত ও সপ্তদশ প্রকার শস্য আছে যথা—ব্রীহি যব মসুর গোধূম মুদগ মাষ তিল চণক অণু প্রিয়ঙ্গু কোদ্রব মকুঠ কলায়

কুলথ যব সর্ষপ তাতসী। এই সপ্তদশ প্রকার শস্য ধান্যবর্গের মধ্যে গণনীয়। এতন্মধ্যে ধান্য দ্বারা প্রাণ ধারণ করা যায় বলিয়াই তাহার প্রাধান্য বহু প্রাচীন কাল হইতে সর্বজন-সম্মত।

হুগলী জেলার মাটি প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা—(১) এ'টেল, (২) দো-আঁশ ও (৩) বেলে। এ'টেল মাটিতে তুলা, পাট, আক প্রভৃতি খুব ভাল জন্মায় এবং এ'টেল মাটির জমি যদি নীচু হয়, তাহা হইলে বর্ষাকালে উহাতে জল জমে বলিয়া ধানও ভাল হয়। দোআঁশ মাটিতে আলু, কপি, মূলা, ওল, কচু প্রভৃতি খুব ভাল হয়। যে মাটিতে বালির আধিক্য থাকে, তাহাতে তরমুজ, কাঁকুড়, কুমড়া প্রভৃতি ভাল উৎপন্ন হয়। দামোদর নদের চরভূমিতে এই সকল ফসল অতি উত্তমরূপে সেই জন্য উৎপন্ন হয়। তারকেশ্বরের নিকট দামোদরের তীরোৎপন্ন তরমুজ সুস্বাদের জন্য এবং আকারে বৃহত্তম বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদের মধ্যবর্তী অধিকাংশ জমিই বর্ষার সময় বন্যার জলে ডুবিয়া যায়। বন্যার পর জল চলিয়া গেলে, জমির উপরে যে পলি পড়ে, তাহাতে জমির উর্বরতা খুব বাড়িয়া যায়। সেই জমিতে ধান না হইলেও রবিশস্য এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে চাষীগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া বরং লাভবানই হইয়া থাকে। শীতকাল পর্যন্ত যে সকল জমিতে বন্যার জল থাকে, সেই সকল জমিতে বোরো ধান উৎপন্ন হয়।

ভারতে যে পরিমাণ জমিতে ধান চাষ করা হয়, তাহা পৃথিবীর মোট ধানী জমীর এক-তৃতীয়াংশ। পৃথিবীতে মোট যে পরিমান ধান উৎপাদিত হইতেছে, তাহার এক-চতুর্থাংশ ভারতেই উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রতি হেক্টর জমির গড় উৎপাদন ১২২০ কিলোগ্রাম। কিন্তু পৃথিবীর প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন ১৫৫০ কিলোগ্রাম।

সমগ্র পৃথিবীর ধান উৎপাদনক্ষম দেশসমূহের মধ্যে চীনে সর্বাপেক্ষা অধিক ধান উৎপাদিত হয়। তাহার পরেই ভারতের স্থান। ১৯৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে ২ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন চাউল উৎপাদন হইয়াছিল। পাকিস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন, থাইল্যাণ্ডে ৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও ব্রহ্মে ৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

ভারতে চাউলের ব্যবহারও বেশী। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে চাউলের যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিয়াছিল, তাহার প্রায় এক-অষ্টমাংশ ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী এদেশে মাথাপিছু প্রতি বৎসর প্রায় ৬৮ কিলোগ্রাম চাউল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্রহ্মে ব্যবহৃত হয় ১৬৪ কিলোগ্রাম, ইন্দোনেশিয়ায় ১২১ কিলোগ্রাম ও জাপানে ১০২ কিলোগ্রাম।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে চাউলের মূল্য ছিল প্রতি মণ ১৬ টাকা ১২ আনা, ইন্দোনেশিয়ায় ছিল ৩৮ টাকা ৩ আনা, মালয়ে ছিল ২৭ টাকা ৬ আনা, মিশরে ছিল ১৪ টাকা ১৫ আনা, পাকিস্থানে ছিল ১৪ টাকা ১৪ আনা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ৩৭ টাকা ২ আনা।

ভারতে যে পরিমাণ জমিতে ধান উৎপাদিত হয়, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে। বাকি জমিতে বৃষ্টির জলে আবাদ হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে

এদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ একর জমিতে জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হয়। তাহার ফলে প্রায় ৬ লক্ষ টন ফসল পাওয়া যায়।

ভারতের উৎপাদিত মোট ধানের এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয়ের জন্য উদ্বৃত্ত থাকে। বাকিটা গ্রামাঞ্চলের লোকে নিজেদের জীবনধারণ ও বীজের জন্য ব্যবহার করে।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'ভারতের চাউল' শীর্ষক এক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সমগ্র বিশ্বে সাত হাজার রকমের চাউল উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে চার হাজার রকম উৎপন্ন হয় ভারতে। বৎসরে মোট যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ উৎপাদকগণ নিজেদের ব্যবহারের জন্য বিনিময় বিক্রয়ের জন্য, বীজের জন্য, চাউল দিয়া অপরের পাওনা শোধের জন্য রাখে। মাত্র এক-তৃতীয়াংশ তাহারা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য ছাড়িয়া দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু সর্বাধিক পরিমাণ চাউল ব্যবহারের পরিমাণ বৎসরে ৩১৪ পাউন্ড। তৎপর আসাম, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের স্থান। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে চাউলের ব্যবহার খুব কম—যথাক্রমে ৭৪ ও ২০ পাউন্ড।

ঐ বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, ভারতের চাউল উৎপাদনের পরিমাণ কম। ভারতে সাড়ে সাত কোটি একর জমিতে ধান চাষ হয়, ইহা বিশ্বের ধান চাষের এক-তৃতীয়াংশ। বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সব চেয়ে বেশী জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে বিহারে ধান চাষের পরিমাণ বেশী—শতকরা ১৭'৪ ভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যা—এই সকল রাজ্যের প্রত্যেকটিতে ধান চাষের পরিমাণ শতকরা ১২'১৩ ভাগ। আসাম ও অন্ধের প্রত্যেকটিতে শতকরা ৫ ভাগ।

ভারতে প্রতি একরে গড়পড়তা ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৭২২ পাউন্ড, স্পেনে ৩'২০৪ পাউন্ড, ইতালীতে ৩'১০৫ পাউন্ড ও জাপানে ২'২৫১ পাউন্ড। বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া আবাদ করার জন্যই উৎপাদনের পরিমাণ এতই কম হয়। মাত্র ২৫ ভাগ ধান্য উৎপাদনক্ষম জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থ ও পরিসংখ্যান বিভাগের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০-১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ৮ কোটি ৩৫ হাজার একর জমিতে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর ৮ কোটি ২৮ লক্ষ ২৯ হাজার একর জমিতে ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৬০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর চাষের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ০'৬ ও ৮'৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দেশে একর প্রতি গড়ে ৯০৬ পাউন্ড অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৮'২ শতাংশ চাউল অধিক উৎপন্ন হয়।

যথা সময়ে জমি আবাদের উপযোগী করিলে, উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করিলে, জমিতে গোময়, খইল ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে এবং শস্যের যত্ন লইলে উৎপাদন যথেষ্ট

পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। জাপানী পদ্ধতিতে চাষ করিলে ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে পারে।

কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে বহু স্থানে ধান্যোৎপাদন যাহাতে বাড়ান যায় তাহার জন্য প[illegible] ভাবে এখন চাষ করা হইতেছে। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ব্লকের এলাকায় আমন ধানের ফলন জাপানী প্রথার চাষের ফলে প্রভূত বৃদ্ধি হইয়াছে। এক পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫৭-৫৮ সালে যেখানে ধানের ফলন প্রতি একরে গড়ে ১৮ মণ ছিল, সেখানে ১৯৬০-৬১ সালে ২৫ মণ হইয়াছে।

উক্ত ব্লকের অন্তর্গত এডপুর গ্রামের একটি প্লকে ১৬৫ একর জমিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষ করার ফলে গড়ে প্রতি একরে ৫১ মণ ধান উৎপাদন হইয়াছে। বিমাগা গ্রামের একটি ব্লকে ২০০ একর জমিতে উক্ত প্রথায় চাষ করার ফলে গড়ে প্রতি একরে ৪৮ মণ ধান ফলিয়াছে।

এডপুর গ্রামে একর প্রতি ৮১ মণ এবং অন্য একটি ক্ষেত্রে ৭২ মণ ধান পাওয়া গিয়াছে। এই এডপুর গ্রামটি ধান্য রোপন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহা এই ব্লকে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব এবং অজৈব সার, উন্নততর বীজ ব্যবহার এবং চারাগাছগুলিকে ভালভাবে রক্ষা করার ফলেই এইরূপ ফলন হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ খনার বচনের মধ্যে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় কৃষকদের ইহাই প্রাচীনতম ছড়া। দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ে" এই ছড়াগুলি ৮০০-১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

খনা ও তাহার স্বামী মিহির চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রয়ে চন্দ্রপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। রাজা চন্দ্রকেতুর গড় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসাত হইতে ৭ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। কিন্তু মহানাদেও চন্দ্রকেতুর গড় ও পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার জন্মস্থান বঙ্গের যে কোন পল্লীতেই হউক, তাঁহার রচিত কৃষকদের সম্বন্ধে একটি উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

কৃষি তত্ত্ব

খনা ডেকে বলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান॥ (ক)
দাতার নারিকেল বাখিলের বাঁশ।
কমে না বাড়ে না বার মাস॥ (খ)
দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥
কার্তিকের ঊন ডালে।
খনা বলে দুন ফলে॥ (গ)
শুন বাপু চাষার বেটা।

বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা॥ (ঘ)
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে।
দুই কুড়া (ঙ) ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে॥
শুনয়ে বাপু চাষার বেটা।
মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥
তাতে যদি বুনিস পটল।
তাতেই তোর আশার সফল॥
খনা বলে শুন শুন।
শরতের শেষে মুলা বুন॥
যদি হয় অগ্রানে বৃষ্টি।
তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি॥
আগে বেঁধে দিবে আলি।
তাতে রুইয়ে দিবে শালি॥ (চ)
তাতে যদি না হয় শালি।
খনা বলে পাড় গালি॥

অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে একমাত্র ধান দিয়া সমস্ত জিনিষপত্রের আদান প্রদান হইত। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে একদিন একজন ফলবিক্রয়িনী চণ্ডালিনী নানাবিধ ফলের পসার মাথায় করিয়া গোপরাজ নন্দের বাড়ির পার্শ্ববর্তী পথ দিয়া 'ফল নেবে গো' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে যাইতেছিল তখন তিনি ফল কিনিতে ইচ্ছুক হইয়া এক অঞ্জলি ধান গ্রহণ পূর্বক তাড়াতাড়ি ফলবিক্রয়িনীর নিকট গমন করিলেন।

ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ॥

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁহার দত্তা পুস্তকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষবাসের নির্দেশ দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেনঃ—"চাষ করা পৈত্রিক পেশা; তাই সময়, অসময়ে জমিতে দুবার লাঙ্গল

(ক) রৌদ্রে ধান এবং ছায়ায় পান বেশী হয়

(খ) দাতার নারিকেল কমে না; অর্থাৎ একটি নারিকেল পাড়িলে তাহার স্থলে আর একটি হয়। বখিলের (কৃপণের) বাঁশ বাড়ে না; কারণ বাঁশ যতই কাটা যায়, ততই বৃদ্ধি পায়।

(গ) কার্তিক মাসে অল্প বৃষ্টি হইলে দ্বিগুণ ফসল হয়।

(ঘ) চাউলহীন ধান

(ঙ) কাঠা বা কানী

(চ) পূর্বে আল বাঁধিয়া তৎপরে শালিধান রোপন করিলে ভাল হয়।

দিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, আকাশের পানে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারী-খেলা বলে। কোন্ জমিতে কখন সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকার চাষ করা বলে—এসব জানে না।"

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত "শিবায়নে" অনেক প্রকার ধানের নাম আছে। উহার কয়েক লাইন বঙ্গসাহিত্য পরিচয় হইতে উদ্ধৃত হইলঃ—

"হরিশঙ্কর হইল ধান্য হাতিপাঞ্জর হুড়া।
হরকুলি হাতিনাদ হিঙ্গি হলুদগুঁড়া॥
কেলেকানু কেলেজীরা কালিয়াকার্তিকা।
কয়াকচ্চা কাশীফুল কপোতকণ্ঠিকা॥
কালিন্দী কটকী কুসুমশালি কনকচূড়।
দুধরাজ দুর্গাভোগ পর্দেশী ধুস্তুর॥
কৃষ্ণশালি কোঙরভোগ কোঙরপূর্ণিমা।
কল্মীলতা কনকলতা কামোদগরিমা॥
খেজুরথুপী খয়েরশালি ক্ষেমগঙ্গাজল।
গয়াবালি গোপালভোগ গৌরীকাজল॥
গন্ধমালতী গুয়াথুপী গুণাকর।
চামরঢালি চন্দনশালি কৈল তার পর॥
ছত্রশালি জটাশালি জগন্নাথভোগ।
জামাইলাড়ু জলারাঙ্গী জীবনসংযোগ॥
ঝিঙ্গাশালি বলাইভোগ ধুন্যা বিলক্ষণ।
নিমুই নন্দনশালি রূপনারায়ণ॥
পাতসাভোগ পায়রারস পরম সুন্দর।
পিপীড়াবাঁক্ তিলসাগরী কৈল তারপর॥
বাঁকশালি বাকইবুয়ালি দাড়বঙ্গী।
বাঁকচুর বুড়ামাত্রা রামশালি রাঙ্গী॥
রাঙ্গামেটে রামগড় রঞ্জয় করি।
পুণ্যবতী ধান্য রাখে নাম ধরি ধরি॥
লক্ষ্মীপ্রিয় লাউশালি লক্ষ্মীকাজল।
ভোজনা ভবানীভোগ ভুবন উজ্জ্বল॥
সীতাশালি শঙ্করশালি শঙ্করজটা।
এই মত আর কত হৈল ধান্য ঘটা॥
লক্ষ নাম লক্ষ্মী হয়ে কৈল লোকহিত।
কত নাম কব তার কহিল কিঞ্চিৎ॥

পাংশুধারী পশ্চাৎ পার্বতী কন কি।
প্রকাশিলা পূর্ণ কলা পর্বতের ঝি॥"

প্রসিদ্ধ বাগ্মী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী তাঁহার 'দেশের ডাক' নামক পুস্তকে ধান্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

ভূলক্ষ্মী দয়া করে প্রতিবৎসর কেবল বৃটিশ ভারতেই গড়ে ৮০ কোটী মণ ধান দেন। ২৫ বৎসর পূর্বে ৮৬ কোটী মণ হতো—চীনদেশে হয় ৬৪ কোটী মণ। ৮০ কোটী মণে ২৬ কোটী ভারতবাসীর পেট ভরে খেয়ে দিন কাটে না, অথচ ৬৪ কোটী মণ দিয়ে প্রায় ৪০ কোটী চীনবাসী সুখে আছে কি করে? জাপানে ৬ কোটী লোকের ১৫ কোটী মণে চলে, আর আমাদের?

ভারতবর্ষ ৮০ কোটী চীন ৬৪ কোটী জাপান ১৫ কোটী

ইংরাজের খাতায় লেখা আছে, ১০ কোটী ভারতবাসী পেটভরে খেতে পায় না; ৪ কোটী লোক এক বেলা খেয়ে ঘুমায়—আর প্রায় এককোটী লোক তিনমাস ধরে নাকি আমের আঁটী, কদম-পাতা, আম-পাতা সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটায়। কোন্ দেশে ও ভাই কোন্ দেশে? যে দেশে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী চাল হয় সেই দেশে, যে দেশেতে যত বড় চালের ছালা—সেই দেশেতে তত বেশী পেটের জ্বালা! তাই আমাদের যুঝবার লড়বার শক্তি কমে গেছে!

কালাজ্বর ম্যালেরিয়া কলেরা যক্ষ্মা জ্বর-জ্বাড়ি হবে না? পেটে ভাত নাই রক্তে জোর আসবে কোথা থেকে? রক্তে জোর না থাক্‌লে রোগ এসে তো কাবু করবেই! ১৯১৮ সালে ৫ মাসের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ৬০ লক্ষ লোক কেবল ভারতে মারা গেল—আর সারা দুনিয়ার ৩৫ লক্ষ। ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া এত যে শুনি, ওর যে আর একটা নাম হাঙ্গার ডিজিজ্ খেতে না পেয়ে, না পেয়ে, শক্তিহীন হ'লে যে জ্বর দেখা যায়। কুইনাইনে কি খিদে মেটে? না কুইনাইনে জীবনী শক্তি আছে? জীবনীশক্তি আছে খাবারে সেই খাবার হচ্ছে যে সাগর-পারে।

বিগত ৫০ বৎসরে ভারতবর্ষে ২৫টি দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৩ কোটি লোক মারা গেছে। ভারতের দুর্ভিক্ষে কালা আদমী মরে—সাদা তো নয়। তাই ১৯০৩ সালে ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের সময় মিঃ জ্যাক্‌সন্ বাংলার বুকে বসে লিখেছিলেন, 'গাছে এখনও পাতা আছে এবং এ অঞ্চলের মেয়েদের এখনও বেশ্যা হতে হয় নি—অতএব এদিকে দুর্ভিক্ষ আছে বলা যায় না।' কি নির্মম!

There are still leaves on the trees and the women are not yet prostitutes, therefore there is no famine in this part of the country.

হুগলী জেলা হইতে ধান্য বিদেশে ইউরোপীয় বণিকগণ রপ্তানি করিত, দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কাশীমবাজার কুঠীর কর্তা মিঃ জন কার, হুগলী হইতে কোন্ মাসে, কোন্ জিনিষ সুবিধা দরে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার একটি তালিকা প্রেরণ

করেন। উক্ত তালিকা হইতে বণিকগণ জুলাই ও আগষ্ট মাসে এবং ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ধান্য সংগ্রহ করিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

"In July and August—Rice, Hemp, Flax.

In December and January—Long Pepper, Oyle and Rice of the second growth." (৩)

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানে এক টাকায় দেড় মণ চাউল বিক্রয় হইত। ইউরোপীয় বণিকগণ কোন্ কোন্ জিনিষ হুগলী হইতে লইয়া যাইত, তাহা পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। নিম্নে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলায় এক টাকায় চাউল গম ছোলা ও লবণ কত পাওয়া যাইত তাহা প্রদত্ত হইল :

চাউল প্রভৃতির দর

গড় বৎসর	(সের হিসাব) চাউল	(সের) গম	(সের) ছোলা	(সের) লবণ
১৭৯৩—১৮১৩	৪০	৫০·৫০	৫০·৫০	....
১৮৬১—১৮৬৫	২১	২১·৪০	২২·৭১	১০·৬০
১৮৬৬—১৮৭০	২০·৮৪	২১·৮৬	১৭·১৪	৯·৩২
১৮৭১—১৮৭৫	১৬·৯৪	১৪·৬৪	১৮·৭৪	৮·৭৩
১৮৭৬—১৮৮০	১৪·৪০	১৩·৮৯	১৫·৪৩	৯·০০
১৮৮১—১৮৮৫	১৬·৫৯	১৫·৫৭	১৮·৩৭	১২·৪৩
১৮৮৬—১৮৯০	১৪·৮৬	১৩·৯৫	১৭·১৬	১০·৭৬
১৮৯১—১৮৯৫	১১·৮৬	১২·৯৫	১৫·০৩	১০·৫৯
১৮৯৬—১৯০০	১০·৯৫	১০·৯৭	১২·৫৯	৯·৯৭
১৯০১—১৯০৫	৯·৯৮	১০·৩৪	১২·৬৪	১২·১৬
১৯০৫—১৯০৭	৭·৪০	৮·৪০	৯·৪৬	১৬·১৭

হুগলী জেলায় চাউল ও অন্যান্য জিনিষের দর বিশেষভাবে সস্তা দেখিয়া, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিক সভা "হুগলীকে বাঙ্গলার চাবিকাঠি" বলিয়া (Key of Bengal) বর্ণনা করেন। পলাশীর রণে লর্ড ক্লাইভও লক্ষ্মীগঞ্জের ধানের আড়তগুলি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উক্ত স্থানকে "ভারতের শস্যাগার" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। (The Granary of the islands) চন্দননগরের বাণিজ্য তখন সুদূর প্রসারিত ছিল। কেবল ভারতবর্ষ নয়, ভারতের বাহিরে চীন তিব্বত পারস্য পেগু প্রভৃতি স্থান সকলের ইহার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীনকালে কলিকাতা যখন একটি সামান্য পল্লী তখন চন্দননগর শ্রীরামপুর চুঁচুড়া হুগলীর স্বর্ণযুগ—ব্যবসায়ে বাণিজ্যে ইহাদের প্রতিষ্ঠা তখন কলিকাতার চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

হুগলী জেলার ভূমি সমস্ত কর্ষণযোগ্য এবং এক 'একারে' বৎসরে আঠার মণ ধান হুগলীতে বর্তমানে উৎপন্ন হয়। জনসংখ্যার অনুপাতে যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর ১ মণ ৩৪ সের ৬ ছটাক চাউল জেলার প্রত্যেকের ঘাটতি পড়ে।

বিদেশী পর্যটকের প্রদত্ত দর

বিদেশী পর্যটকেরা আসিয়া বাঙ্গলা দেশের অবস্থা কিরূপ দেখিয়াছিলেন তাহার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লিখিত হইলঃ

১৩৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে শীতকালে বিখ্যাত ভূপর্যটক ইবন বটুটা বাঙ্গলায় আসেন। তিনি বাজার দর নিম্নলিখিতরূপ দেখিতে পানঃ

দুগ্ধবতী গাভী	১টি ৫ টাকা	চাউল	মণ ✓১৫ পয়সা
মুরগী বড়	১টি ৴৫ পয়সা	ঘি	মণ ১৷৵০ আনা
ভেড়া বড়	১টি ।০ আনা	তিল তৈল	মণ ‖৵১০ আনা
চিনি	মণ ১৵০ আনা	উৎকৃষ্ট সুতী কাপড়	১৫ গজ ২ টাকা

মানরিক ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বাজার দরের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন ঃ

চাউল ১৫ মণ মোট মূল্য (সরু মোটা হিসাবে)	৩ টাকা হইতে ৪ টাকা
মাখন ১ মণ	২ টাকা
২০ হইতে ২৫টি মুরগী	২ টাকা
গাভী একটি	১ টাকা
চিনি ২॥ মণ	৭ আনা হইতে ৮আনা

চল্লিশ বৎসর পর বার্ডার বাঙ্গলাদেশে আসেন। তিনি যে মূল্য তালিকা দিয়াছেন তাহা এইরূপঃ

উৎকৃষ্ট গাভী একটি	মূল্য ২ টাকা
উৎকৃষ্ট শূকর একটি	মূল্য ⅟০ আনা
৪০ হইতে ৫০টি মুরগী	মূল্য ১ টাকা

টাকায় আট মণ চাউল

সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে বাঙ্গলার সুবেদার। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-হ্রাসের জন্য তিনি খুব বেশী চেষ্টা করেন এবং উহা সাফল্যমণ্ডিত হয়। খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য-হ্রাস এবং জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নতি-বিধানের জন্য শাসকদের মধ্যে তখন রীতিমত প্রতিযোগিতা হইত। চাউলের মূল্য টাকায় আট মণে নামাইয়া সায়েস্তা খাঁ এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ঢাকা সহরের পশ্চিম তোরণের উপর এই কথাগুলি খোদাই করিয়া দেনঃ

"যাঁহার আমলে চাউলের দর এত সস্তা হইবে, তিনি ভিন্ন আর কেহ যেন এই তোরণ না খোলেন।"

সায়েস্তা খাঁর শাসনকালের পর মাত্র দুইবার অল্প সময়ের জন্য তোরণটা খোলা হইয়াছিল, একবার নবাব সুজাউদ্দিন এবং দ্বিতীয়বার নবাব সরফরাজ খাঁর আমলে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দলিলপত্র হইতে জানা যায় যে, সায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর অর্ধ-শতাব্দী পর পর্যন্তও বাঙলায় খাদ্য-দ্রব্যের দর খুব সস্তা ছিল। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট বাঁশফুল চাউলের দর টাকায় ১ মণ ১০ সের এবং মোটা কর্কশালি চাউলের দর টাকায় ৭ মণ ২০ সের ছিল। মাঝারি রকমের দেশনা, পুর্বা, মণসরা প্রভৃতি চাউল টাকায় সাড়ে চার মণ হইতে সাড়ে পাঁচ মণ পর্যন্ত পাওয়া যাইত। উৎকৃষ্ট সরিষার তেলের দর ছিল টাকায় ২১ সের এবং প্রথম শ্রেণীর ঘৃত টাকায় সাড়ে দশ সের পাওয়া যাইত।

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বুকানন হ্যামিলটন আসিয়া পণ্য মূল্যের অবস্থা দেখিলেন এইরূপঃ

সরু চাউল	১।০ মণ	ঘি	।√০ সের
মোটা চাউল	১৲ মণ	ময়দা	২৲ মণ
অড়হর ও মুগের ডাইল	১৷৷ মণ	সরিষার তেল	√০ সের

মন্টগোমারী মার্টিন মূল্য তালিকা দিতেছেন এইরূপঃ

খেসারি ও মশুর ডাইল	৷৷০ মণ	মোটা শাড়ী প্রতিটি	/০ আনা
মোটা চউল	৷৷√০ মণ	উৎকৃষ্ট ধুতি প্রতিটি	১৲ টাকা
লবণ	/১৫ সের	মোটা ধুতি	টাকায় ৩ খানা
তেল	৪৲ মণ	গামছা প্রতিটি	/০ আনা
উৎকৃষ্ট শাড়ী প্রতিটি	১৷৷ আনা	গোলাপী চাদর প্রতিটি	৷৷√০ আনা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত ধানের স্বাভাবিক বাজার দর মোটামুটি দুই হইতে আড়াই টাকার মধ্যে ওঠানামা করিত। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে কি ভীষণ অবস্থা হইয়াছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ধানের দর কি ভাবে উঠা-নামা করিয়া ক্রমশঃ বাড়তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহার একটি তালিকা ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে প্রদত্ত হইয়াছে। উহা হইতে কয়েকটি দর এই স্থানে প্রদত্ত হইল ঃ

বৎসর		প্রতি মণ
১৬৭০	...	/৪ পাই
১৭৬৮	...	।০ হইতে ।/৩ পাই
১৭৯০	...	/০ হইতে ৷৷০ আনা
১৮০৪	...	/৩ পাই
১৮৩৪	...	৷৷√০ আনা

বৎসর	প্রতি মণ
১৮৬০	১I০ আনা
১৮৮০	১I২ পাই
১৮৯৮	১৸০ আনা
১৯০০	২৲ টাকা
১৯১০	৩৲ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দর: ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর পশ্চিম বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে প্রতি টাকায় নিম্নলিখিত মত চাউল পাওয়া যাইত বলিয়া ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৮ "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছে:—

২৪ পরগণা: সদর ২ সের ৭ ছটাক, ডায়মণ্ডহারবার ২ সের, ৪ ছটাক, বারাকপুর ২ সের ৭ ছটাক, বসিরহাট ২ সের ২ ছটাক।

নবদ্বীপ: সদর ২ সের ১১ ছটাক, রাণাঘাট ২ সের ৫ ছটাক।

মুর্শিদাবাদ: সদর ২ সের ৮ ছটাক, লালবাগ ২ সের ৮ ছটাক, জঙ্গীপুর ৪ সের ১০ ছটাক, কান্দি ২ সের ১১ ছটাক।

বর্ধমান: সদর ২ সের ৯ ছটাক, আসানসোল ২ সের ১১ ছটাক, কাটোয়া ২ সের ১৪ ছটাক, কালনা ২ সের ৬ ছটাক।

হুগলী: সদর ২ সের ৭ ছটাক, শ্রীরামপুর ২ সের ৭ ছটাক, আরামবাগ ২ সের ৪ ছটাক।

হাওড়া: সদর ২ সের ৭ ছটাক, উলুবেড়িয়া ১ সের ১২ ছটাক।

বীরভূম:সদর ২ সের ৯ ছটাক, রামপুরহাট ২ সের ১১ ছটাক।

বাঁকুড়া: সদর ২ সের, বিষ্ণুপুর ২ সের ৮ ছটাক।

মেদিনীপুর: সদর ২ সের ৯ ছটাক, কাঁথি ২ সের ৮ ছটাক, ঘাটাল ২ সের ১১ ছটাক, ঝাড়গ্রাম ২ সের ১ ছটাক।

জলপাইগুড়ি: সদর ২ সের ১০ ছটাক, আলীপুরদুয়ার ২ সের ৩ ছটাক।

দার্জিলিং: সদর ২ সের ১১ ছটাক, কারশিয়াং ২ সের ১১ ছটাক, শিলিগুড়ি ১ সের ১২ ছটাক, কালিম্পং ২ সের ১১ ছটাক।

মালদহ: ২ সের ৪ ছটাক।

পশ্চিম দিনাজপুর: ২ সের ১২ ছটাক।

আইন-ই-আকবরীতে লিখিত দ্রব্য মূল্যের তালিকাটিও উল্লেখযোগ্য:

দ্রব্য	হার	মূল্য
গম	প্রতিমণ	I১৬
খুব সরেশ চাউল	মণ	২৸০
মাঝারি চাউল	মণ	২৲
নিরেশ চাউল	মণ	১৲

দ্রব্য	হার	মূল্য
চাউল অতি নিকৃষ্ট	মণ	।৶৮
ডাল নানা রকম	মণ	।১৬ হইতে ।৶৪
যবের ছাতু	মণ	॥ ৮
কপি শাক	মণ	॥ ৪
ঘৃত	মণ	২॥৵
দুগ্ধ	মণ	॥৵
লবণ	মণ	।৵৮
বিশুদ্ধ চিনি	মণ	৵৮
পিয়াজ	মণ	॥৶
রসুন	মণ	। ৪
বাঁশ	২০ খানি	।৵ হইতে ॥/
পাল্কী বাঁটের বাঁশ	১ টা	১৲
মাদুর চারিদিকে	১ গজ	৲১২
ঘর ছাইবার উলুখড়	১০ সের তাড়া	৲৮
মজুদদাড়	মণ	॥০
ছাগমাংস	মণ	১।/১২
হলুদ	প্রতি সের	৲১৬
লবঙ্গ	সের	১॥
এলাইচ	সের	১॥ ১৬
খেজুর	সের	/১২
গোলমরিচ	সের	।৵১৬
যোয়ান	সের	৲১৬
দারুচিনি	সের	।০
সুপারি	সের	৶ ৪
লঙ্কা	সের	৵ ৮
ধনে	সের	/৮
মৌরী	সের	৲৮
তেঁতুল	সের	৲১৬
আম	শতকরা	॥৶
আনারস	১টা	/১২
কমলালেবু	১টা	/১২

দ্রব্য	হার	মূল্য
লেবু	৪টা	৴১২
কাঁঠাল	১টা	৻২
কলা	১টা	৻২
নারিকেল	১টা	৴১২
সস্তার মলমল	প্রতি থান	৪ হইতে ৫ মোহর
বনাত	থান	১॥. হইতে ৫ মোহর
সালু	থান	৩ হইতে ২ মোহর
ছিট	একহাত	৻১৬ হইতে ১৲
পশমী বনাত বিলাতী	একহাত	২॥. হইতে ৪ মোহর
লাহোরী বনাত	১ থান	২৲ টাকা হইতে ১ মোহর
শাল	থান	২ টাকা হইতে ৮ মোহর
শালের ফতুয়া	১টা	॥. হইতে ৩ মোহর
শালের টুকরা জামার জন্য	১টা	॥০ হইতে ৪ মোহর
পট্টু	১ থান	১ টাকা হইতে ১০ টাকা
লুই	১ থান	।৴১২ হইতে ৪ টাকা
বিলাতী মখমল	১ হাত	১ হইতে ৪ মোহর
কাশীর রেশমী মখমল	১ থান	২ হইতে ৭ মোহর
কম্বল	১ থান	।· হইতে ২ টাকা
লাহোরী মখমল	১ থান	২ হইতে ৪ মোহর
হিরাচী মখমল	১ থান	২ হইতে ৪ মোহর
বিলাতী ছালচী	হাত	॥০ হইতে ১ টাকা
রেশমী তাফতা	হাত	।· হইতে ২ টাকা
সাদা সার্টিন	হাত	॥০ হইতে ১ টাকা
বিলাতী সার্টিন	হাত	১ হইতে ২ মোহর
হিরাটী সার্টিন	থান	২ হইতে ৫ মোহর

॥ নীলের চাষ ॥

নীল : নীলের চাষ এই জেলায় বহুল পরিমাণে হইত এবং জেলার বহু স্থানে ভগ্ন নীল-কুঠি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তৎকালে নীলকর সাহেবগণের অত্যাচারে বঙ্গদেশের কৃষক-কুল উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়ে। নীলকর সাহেবরা চাষীকে দিয়া জোর করিয়া নীল চাষ করাইয়া লইত এবং নীলের ব্যবসা করিয়া বণিকগণ কোটী কোটী টাকা উপার্জন করিত। প্রজার সহিত সাহেবদের সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইত। কিন্তু নীলকর সাহেবগণ ১ম বীজের মূল্য, ২য় দাদনের টাকা, ৩য় চুক্তি-পত্রের স্ট্যাম্পের মূল্য প্রভৃতির

দাম ধরিয়া, এইরূপ ভাবে কৌশলে হিসাব করিত, যে কৃষকের ভাগ্যে কিছু জুটিত না, উপরন্তু বাকী বকেয়া শোধ করিবার জন্য পুনরায় চুক্তি-বন্ধ হইত। হুগলী জেলার নীল-চাষ ও নীলকরদরে অবস্থা দেখিয়া দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ নাটক "নীল-দর্পণ" রচিত হয়। উহাতে এক স্থানে লিখিত আছে—

"নীল দাদন ধোপার ভ্যালা,
একবার লাগলে আর উঠে না।"

ওম্যালি সাহেব গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন যে, বাঁশবেড়িয়া নীলকুঠির অত্যাচার হইতেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের উপাদান সংগৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন নদীর পশ্চিম দিকে কালীপুর এবং দক্ষিণ-পূর্বে পারুল নামক দুইটি গ্রামে অদ্যাপি নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

The ruins of the indigo factories can still be seen one at Kalipur west of the river and another at Parul in the south east......The scene of Nildarpan (Mirror of Indigo), a Bengali drama of the late Dinabandhu Mitra, is said to have been laid in an Indigo factory of Bansberia. (৪)

এই গ্রন্থ তৎকালীন অত্যাচার নিবারণে প্রধান সহায় হইয়াছিল এবং ইহার সহিত তৎকালীন সাময়িক পত্র সংবাদ-প্রভাকর ভাস্কর সোম-প্রকাশ বঙ্গদর্শন হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতিও উহাতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। নীল-চাষ উপলক্ষ্য করিয়া যে জন-আন্দোলন বঙ্গদেশে আরম্ভ হয় তাহাই পরবর্তী কালে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়।

স্যার জন পিটার গ্রান্ট, লর্ড ক্যানিং, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেভারেন্ড লং প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে নীল-চাষ অন্তর্হিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পণ নাটকের বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং লং সাহেব উহার ভূমিকা লেখায়, তাহার এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার জরিমানার টাকা দিয়া দেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার স্মৃতি-কথায় লিখিয়াছেনঃ

"যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকখানি বঙ্গ-সমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম, ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে অভিনয়—ভূমিকম্পের ন্যায় এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্যন্ত বঙ্গদেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলেই নীলকরের অত্যাচার বঙ্গদেশ হইতে জন্মের মত অন্তর্হিত হইল।"

টয়েনবি সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে হুগলী জেলায় নীলের চাষ হয় বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তখন ভাল করিয়া কারবার আরম্ভ হয় নাই। মিঃ প্রিনসেপ্ নামক একজন সাহেব সর্বপ্রথম এই স্থানে নীলের কারবার সুরু করেন। পরে কোম্পানী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের

তেইশ আইন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ছয় আইন এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের দশ আইনের দ্বারা সরকার নীলকর ও কৃষকদের যথাক্রমে পরিচালনা করেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে মিসেস স্টেপেলটন নামক একজন ইংরাজ মহিলা ও তাহার সাতজন কর্মচারীকে কৃষকগণ আহত করে, পরে দুইজন কর্মচারী মারা যায়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ চার্লস বেনেট নামক একজন সাহেবও আক্রান্ত হন, কিন্তু তিনি অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীতলার নীলকুঠিতে মিঃ ক্যাসেল নিহত হয়। এই জেলার বাঁশবেড়িয়া হোসেনাবাদ তালদা বলাগড় মায়াপুর দ্বারবাসিনী গোপীগঞ্জ দুর্গাপুর কালিকাপুর মেলিয়া পাইগাছি মদুৎপুর রাজপুর সীতাপুর শিবরাম-বাটী জেজুর খন্যান প্রভৃতি স্থানে নীলকুঠি ছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ তারিখে "কলিকাতা গেজেটে" হুগলী নদীর তীরে চুঁচুড়া-চন্দননগরের মধ্যে 'মুন্সিগঞ্জ' নামক স্থানের নীলকুঠি, উহার মালিক মিঃ ব্রুম পরলোকগমন করায় বিক্রয় করা হইবে বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। ১৬ই পৌষ ১২৬৬ **"দৈনিক প্রভাকর"** পত্রে নীলকর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশিত হয়—নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় কতবার এই প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। ঐ সাহেবেরা আপনাপন কুঠির মধ্যে রাজা বলিলেই হয়। যখন যাহা মনে করেন, তাহাই করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অধীনে যে সকল যষ্টিধারি লোক আছে, তাহাদিগের বাহুবলেই সমুদায় শোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ঐ লেখাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যিনি ঐ অহিতাচরণ নিবারণ করিবেন, তিনি বিবিধ বিষয়েই নীলকরদিগের বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা নীলকরের অত্যাচার অত্যাচারই বিবেচনা করেন না। সম্প্রতি আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নবদ্বীপ অঞ্চল পরিভ্রমণার্থ গমন করিয়া আপনার চক্ষে নীলকর-দিগের গুরুতর অত্যাচার সন্দর্শন করিয়াছেন এবং অনুসন্ধান দ্বারা সবিশেষ অবগত হইয়াছেন, গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি মেংলসিংটন সাহেব ঐ বিষয়ে নদীয়া বিভাগের কমিশনার সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব আমা-দিগের পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা যে সকল সংবাদ লিখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সত্যরূপেই সপ্রমাণ হইল।......

বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের শেষে কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাত হয় এবং সেই সময় বহু প্রাচীন জমিদার তাহাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন ও নূতন ভুঁইফোড় জমিদারের আবির্ভাব হয়। কোম্পানী কেবল জমির বন্দোবস্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই অধিকন্তু তাহাদের অধিকৃত বড় বড় শহরে কুঠি খুলিয়া বাঙ্গলার বস্ত্র ও রেশম শিল্পের জোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ইংরাজ-বণিকগণের ধনাগমের পথ সুগম করিয়া দেন। কালক্রমে বাঙ্গলার উর্বর ক্ষেত্রগুলির উপর নীলকর সাহেবদিগের দৃষ্টি পড়িল। যে জমিতে ভাল ধান হয় সেই জমিতেই ভাল নীল জন্মিত এবং নীল ও ধান একই সময়ে হইত। ধান বঙ্গের *গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পুঁজি কিন্তু নীলকর সাহেব কৃষককুলকে ধানের পরিবর্তে নীলচাষ* করাইতে বাধ্য করিত। এই সম্বন্ধে ১২৯৩ সালের 'নবজীবন' মাসিক পত্রে 'নীলচাষ'

সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে, 'সাহেবেরা যত কম মূল্যে প্রজার দ্বারা নীল জন্মাইয়া লইতে পারিতেন তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন। ধানের ন্যায় নীলের বাজার-দর ছিল না; সাহেবেরা যে একদর স্থির করিয়া রাখিয়া দিলেন, সেই হারে চিরকাল ধরিয়া জন্মা-অজন্মার তারতম্য বিচার না করিয়া প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইতেন এবং সেই হারও প্রজাদিগের ইচ্ছামত স্থির হইয়াছিল এবং ইহাতে কৃষকদের কখনও লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবদের নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমিসকল নীলকররা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নীল এবং ধান একই সময় কর্তন করিতে হয়; কিন্তু অগ্রে নীল কর্তন করিয়া তাহা কুঠিতে দাখিল না করিলে কুঠির লোক প্রজাদিগের তাহাদের স্বীয় ধানে হস্তক্ষেপ করিতে দিত না। ইহাতে প্রজারা অনেকে বিরক্তিবোধ করিত ও তাহাদের ক্ষতি হইত।'

নদীয়ার মিঃ লার্মার নামে একজন নীলকর 'শ্যামচাঁদ' বা 'রামকান্ত' নামে এক অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা কৃষককুলকে নীলকুঠির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া প্রহার করা হইত। চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকার নবজীবনে লিখিয়াছিলেন যে, "এই অস্ত্রটির গঠন সকল কুঠিতে এক রকম হইত না। কুঠি বিশেষে এবং নীলকর কিম্বা দেওয়ানজীর দয়ার উপর তারতম্য অনুসারে তাহা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিত। কোনও স্থানে একটা লাঠির অগ্রভাগে এক হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধহাত প্রস্থ খুব শক্ত এবং মোটা চর্মের একখানা হাতা এবং কোনও স্থানে হাতার পরিবর্তে অগ্রভাগে গ্রন্থিযুক্ত কয়েকছড়া চর্মের রজ্জু বাঁধা থাকিত। ......শ্যামচাঁদ নামক এইরূপ এক অস্ত্র ইণ্ডিগো কমিশনে সাহেবদিগের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল।"

সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন। পরে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সবল লেখনী ধারণ করেন। সেই সময় নীলচাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা আমেরিকার নিগ্রো দাসদের মত ছিল।

স্বর্গীয় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়* সেই সময় পুলিশ বিভাগে দারোগার কার্য করিতেন। তিনি নিজের চোখে নীলকর সাহেবদের যে সব অত্যাচার দেখিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ "তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী" নামক আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

"প্রজাদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে নীলের দাদন দেওয়ার যে কতরূপ উপায় ছিল, তাহার সমস্ত বর্ণন করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রির মধ্যে কাহারও ঘরে ধূধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে

*প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নদীয়া জেলার দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত জয়রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং পুলিশ বিভাগে চাকুরী করায় সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন।

দেখিতে তাহার যথা সর্বস্ব দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল। কাহারও ঘর হইতে সুন্দরী স্ত্রীলোকগণ হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু কোথায় যে তাহারা গমন করিল তাহা কেহই বলিতে পারিল না। কিন্তু নীলের সাটা গ্রহণ করিবার পরই কোথা হইতে আসিয়া তাহারা পুনরায় উপনীত হইল।............

এই সকল কারণ ব্যতীত আরও যে কতরূপ উপায় বাহির করিয়া নীলকরগণ প্রজা-গণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইতেন, তাহার সমস্ত অবস্থা বর্ণন করা আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীর কার্য নহে। কেবল মাত্র আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই সকল বিষয় বর্ণন করিতে আমি বিরত হইব।............

এক দিবস দেখিলাম, তিনটি লোক আমাদিগের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছে ও ৮।১০ জন লাঠিয়াল উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ লোক তিনটিকে দেখিয়া আমাদিগের মনে কৌতুহল আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ, দেখিলাম উহাদিগের মস্তক প্রায় ৪ আঙ্গুল মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। তাহার উপর দুই তিন আঙ্গুলে লম্বা নীলের চারা সকল বাহির হইয়া মস্তককে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমরা তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর দেখিলাম, তাহারা একস্থানে উপনীত হইয়াছে। ঐ স্থানে পাড়ার যাবতীয় ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশন করিতেন। যখন যাঁহার অবকাশ হইত তখনই তিনি ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কোনরূপ প্রস্তাব, পরামর্শ, তর্ক বিতর্ক, ভালমন্দ বিচার প্রভৃতি সকলই সেইস্থানে উপস্থিত থাকিতেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ সেইস্থানে উপস্থিত হইলে ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে মণ্ডল, তোমরা এত দিবস কোথায় ছিলে, তোমাদিগের নিমিত্ত অনুসন্ধান করা না হইয়াছে এমন স্থানই নাই। কিন্তু কোন স্থানে তোমাদিগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমাদিগের মাথার উপর কি? এই কথার উত্তরে মণ্ডল কহিল আব কি বলিব; মহাশয়, নীল বুনিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া আমাদিগের এই দশা ঘটিয়াছে। জমিতে নীল বুনানী করিবার পরিবর্তে পরিশেষে আপনাপন মস্তকের উপর নীল বপন করিতে হইয়াছে।

ভদ্রলোক। কোথায় তোমাদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছে!

মণ্ডল। কুঠিতে।

ভদ্রলোক। সেইস্থানে তোমরা গমন করিলে কেন?

মণ্ডল। আমরা কি ইচ্ছা করিয়া সেইস্থানে গমন করিয়াছিলাম? আমাদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ভদ্রলোক। কিরূপে তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাতো আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। তোমরা কোথায় চলিয়া গিয়াছ, অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইতেছে না, কেবল মাত্র ইহাই শুনিয়াছিলাম।

মণ্ডল। আজ প্রায় দশ দিবস হইল, এক দিবস সন্ধ্যার পর আমরা এই দিকে আসিতেছিলাম, এইরূপ সময় প্রায় ২০।২৫ জন লাঠিয়াল কোথা হইতে আসিয়া আমাদিগের উপর পতিত হইল ও বলপূর্বক আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া কুঠিতে গিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব আমাদিগকে দেখিয়াই গালি গালাজ করিলেন ও পরিশেষে দারোয়ানদিগের জমাদারকে ডাকিয়া তাহাকে বলিলেন যে পর্যন্ত ইহারা নীল বুনানী করিতে সম্মত না হইবে, সেই পর্যন্ত ইহারা গুদামে আবদ্ধ থাকিবে ও ইহাদিগের মস্তকের উপর নীল বপন করা হইবে। যে পর্যন্ত ইহারা নীলের সাটা গ্রহণ করিয়া উহা রেজেষ্টারী করিয়া না দিবে, সেই পর্যন্ত ইহারা গুদামে আবদ্ধ থাকিবে ও ইহাদিগের মস্তকের উপর সেই পর্যন্ত নীলের চারা বর্ধিত হইতে থাকিবে। সাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হইল। আমাদিগের মস্তকের উপর উত্তমরূপে কাদা লাগাইয়া, তাহার উপর নীলের বীজ বপন করা হইল।

আমাদিগের সাধ্য নাই যে, উহাতে আমরা অসম্মত হই, বা মস্তক হইতে উহা বিচ্যুত করিয়া ফেলি। কারণ, প্রত্যেক আদেশ লঙ্ঘনের নিমিত্ত সাহেব ২৫।২৫ হাতার (প্রায় তিন হস্ত পরিমিত লম্বা চামড়ার দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার দ্রব্য বেত্রের কার্য করিত, উহাকেই হাতা কহিত) ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার উপর অনাহারে আমাদিগকে এই কয় দিবস অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সমস্ত দিবসের মধ্যে আহারের ব্যবস্থা ছিল, ধান্যমিশ্রিত এক পোয়া কাঁচা চাউল। এরূপ অবস্থায় নীল বুনিতে সম্মত না হইয়া আর কত দিবস আমরা থাকিতে পারি? সুতরাং আমরা নীলের সাটা গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছি; দলিলও লেখা পড়া করিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছি; তথাপি আমরা এখনও অব্যাহতি পাই নাই। এই দারোয়ানগণের উপর আদেশ হইয়াছে যে, এই অবস্থায় গ্রামের মধ্যে আমাদিগকে ঘুরাইয়া, আমাদিগের অবস্থা প্রজা-মাত্রকেই দেখাইবে। তাহার পর আমাদিগকে পুনরায় কুঠিতে লইয়া যাইবে। যখন আমরা নীলের সাটা গ্রহণ করিয়া দলিল লেখাপড়া ও রেজেষ্টারী করিয়া দিব, তখন আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। মণ্ডলগণের এই কথা শুনিয়া, সেই স্থানে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদিগের চক্ষুতে জল আসিল।

নীলকর সাহেবগণ ব্যবসা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বঙ্গদেশে তাহাদের 'শিখণ্ডী' রূপে খাড়া করিয়া যে সমস্ত 'দেওয়ান' 'গোমস্তা' প্রভৃতি দেশীয়গণ তাহাদের স্ব-স্ব আধিপত্য বিস্তারকল্পে কৃষককুলের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়াছিলেন নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে সাহেবদিগের অপেক্ষা দেশীয়গণের কার্য যে অধিকতর ঘৃণিত তাহা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাহেবদের নামে অত্যাচারের জন্য দায়ী 'দেওয়ান' ও 'গোমস্তা'; কারণ নীলকরগণ এই দেশের সমাজ ও এতদ্দেশীয় লোকের চরিত্র সম্বন্ধে সেই সময় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। সেই সুযোগে আমাদের দেওয়ান গোমস্তা প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি, ও অর্থাগমের জন্য

প্রজাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত এবং সাহেবকে বুঝাইত যে, কুঠির মর্যাদা ও সুনাম অটুট ভাবে রক্ষা করিতে হইলে রায়তদের উপর এইরূপ কড়া শাসন ও অমানুষিক অত্যাচার একান্ত আবশ্যক, নচেৎ এই শ্রেণীর লোকদিগকে কখনই বশে, রাখা যাইবে না। নীলকরদিগের অত্যাচার কিরূপ চরমে উঠিয়াছিল তাহা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হিল সাহেব কর্তৃক ইণ্ডিকো কমিশনে প্রদত্ত সাক্ষ্য ও নিম্নোক্ত ছড়াটি হইতে প্রতীয়মান হইবে।

জমিনের শত্রু নীল,
কর্মের শত্রু ঢিল,
জগতের শত্রু পাদ্রি হিল।

টয়েনবি সাহেব তাঁহার পুস্তকে হুগলী জেলায় বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত নীলকুঠি ছিল, তাহার একটি তালিকা এবং উক্ত কুঠির মালিকগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইলঃ

বৎসর	স্থান	মালিকের নাম
১৮২২	বাঁশবেড়িয়া	জে, বি, ব্লিচ
১৮২৭	বাঁশবেড়িয়া	টেম্পল
১৮২৯	হোসনাবাদ	সিরকোর
১৮২৯	তালদা	এ, বার্জ
১৮৩০	গোপীগঞ্জ	টাইরী
১৮৩৮	দুর্গাপুর	ম্যাকলিন
১৮৩৯	কালকাপুর	ওয়ার্ণার
১৮৩৯	মেলিয়া	জেমস স্মিথ
১৮৪২	পায়গাছি	জি, গর্ডন

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকার, শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন "পিপীলিকাও পদদলিত হইলে শত্রুকে দংশন করে। বাঙালী আত্মরক্ষার্থ দংশনার্থ দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উপযুক্ত নেতার অভাব হইল না। নেতার অভাব বাংলায় কখনও হয় না। সেদিনও তাহা দেখিয়াছি। কত ওয়াটাটাইলার, হ্যামডেন, ওয়াশিংটন নিরন্তর বাংলায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ক্ষুদ্র বনফুলের মত মনুষ্য নয়নান্তরালে ফুটিয়া ঝটিকা-ঘাতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে। আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না। আমরা তাহার চিত্র তুলিয়া রাখি না। কেননা আমরা ইতিহাস লিখিতে জানি না; চিত্র আঁকিতে সবে শিখিতেছি। বাঙালী মার খাইয়া অবশেষে মরিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রজা নীলকরদের চাকুরী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীয়মান করিল। এই দুই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ, বাংলার নিঃস্ব, সহায়শূন্য প্রজাদের একপ্রাণে বাঁধিল— সিপাহী বিদ্রোহের সদ্যোনির্বাপিত অনলের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল। বরিশালের বিখ্যাত লাঠিয়াল আসিয়া যোগ দিল—ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জেলা হইতে জেলান্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইল।"

রেশম সিল্ক॥ রেশম, তসর সিল্ক ও মসলিন এই জেলার হরিপাল খিরপাই সোনামুখী মগরা (পূর্ব নাম গোলাঘর) বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জেলার বিভিন্ন 'আড়ং'এ (কারখানা) ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত কা আগ্রম দিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

কারখানা	টাকা	রেসিডেন্ট
হরিপাল-	৮৫,৪৪৩	টমাস হিউয়েট (১৭৬৫ খৃঃ)
ধনিয়াখালি-	৩৫,৫৩৩	... ...
গোলাঘর-	৩৮,৫১৮	রজার লেন ওরিকার্ড (১৭৯৫ খৃঃ)
খিরপাই	১৬২,৫৭০	পিটস মিডলটন (১৭৯৬ খৃঃ)

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত কারখানাগুলি দেখিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী তথায় কার্য ভাল ভাবে চলিতেছে বলিয়া রিপোর্ট দেন; কিন্তু দ্বারহাটার কার্য খুব খারাপ এবং "গত বৎসরের পঞ্চাশ হাজার টাকা তখনও বাকী পড়িয়া আছে" বলিয়া তিনি উক্ত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন।

At Doorhatta the company's affairs in a distressed situation and proceeded to Keerpye where he found the invsetment in a very backward state. (৫)

ধনিয়াখালিতে বহু মুসলমান অদ্যাপি চিকনের কার্য করিয়া থাকে এবং আমেরিকায় পর্যন্ত তাহা রপ্তানি হয়।

ডাঃ ক্রফোর্ড সাহেব হুগলী জেলার সিল্ক ব্যবসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

রেশম চাষ হুগলী জেলার প্রধান ব্যবসায় পণ্য ছিল। রেশম চাষ হরিপাল, ক্ষীরপাই ও রাধানগরে কমার্শিয়াল রেসিডেন্টদের একচেটিয়া ছিল। ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ও কুঠিগুলি বিক্রয় হওয়ায়—রেশম ব্যবসা রবার্ট ওয়াটসন এণ্ড কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত হয়। ক্ষীরপাইতে ১৭৯৫ ও তৎপূর্বে (যখন কোম্পানী বাঙলার দেওয়ানী লাভ করেন) ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠি ছিল। ইহার পূর্বে গোঘাট থানার দ্বারকেশ্বর নদীর পশ্চিম তীরে দেওয়ানগঞ্জে রেশম ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল—যাহা উত্তর ভারতের স্থাপিত অধিবাসীদের অর্থানুকূল্যে চালিত হইয়া ঐ স্থানে উষ্ট্র দ্বারা উহা সরবরাহ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠি স্থাপনের ও নদীপথে ঘাটাল হইতে কলিকাতা ও ইউরোপে ঐ রেশম রপ্তানীর ফলে এই ব্যবসায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়।

কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট বস্তুটা যে ঠিক কি তাহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙলা মুল্লুকে তখন যে সব আড়ং-এর কারখানা ছিল, তাহা পরিচালন করিবার জন্য একজন করিয়া কমার্শিয়ল রেসিডেন্ট থাকিত। ইংরাজেরা প্রথম যখন বাঙলা দেশে ব্যবসা সুরু করেন, তখন তাহারা কাজের সুবিধার জন্য একজন বড় দালাল রাখিতেন, তাহার নীচে অনেকগুলি ছোট দালাল থাকিত। এই দালালগণ ইংরাজদের

হইয়া এই দেশে বিলাতী মাল কাটাইতেন, আবার বিদেশে পাঠাইবার জন্য এ দেশের মাল সংগ্রহ করিয়া দিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত দালালদের কারচুপির মাত্রাটা এত বাড়িয়া গেল যে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা আদেশ দিয়া দালালীর পর্দাটি উঠাইয়া দিলেন। দালালের স্থানে নিজেদের মাইনে করা গোমস্তা রাখিয়া তখন তাহারা কারবার চালাইতে লাগিলেন।

কিন্তু গোমস্তা রাখিয়া কাজের সুবিধা বেশি কিছু হইল না। শুধু তাহাই নয়, নিরীহ স্বদেশবাসীদের উপর এই গোমস্তাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না। ইতিহাসের পুঁথির পাতায় পাতায় সে সবের খবর পরিস্কার করিয়া দেওয়া আছে। সেই অত্যাচারের বদনামের ভাগী ইংরেজদেরও হইতে হইয়াছিল। এখনো সেই বদনাম বোধহয় যায় নাই। শেষ পর্যন্ত গোমস্তাও উঠাইয়া দিতে হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশা শা-আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। বাংলা মুল্লুক (পোলিটিকালি ঐ তিন প্রদেশ এক দেশই ছিল।) ইংরেজদের হাতে আসিয়া গেল। ছোকরা ইংরেজ কেরাণীদের তখন থেকেই মফঃস্বলে কোম্পানীর ব্যবসার তদ্বিরতদারকের কাজে লাগিতে হইয়াছিল।

দেওয়ানী পাইয়াও ইংরেজরা অনেকদিন দেওয়ানীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন নাই। একজন ডেপুটি রাখিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ চালাইতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ইংরেজদের নায়েব দেওয়ান হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি যে কি ভাবে প্রজা পালন করিয়া গিয়াছিলেন সে কথা সকলেরই জানা আছে। তারপর হঠাৎ একদিন কোম্পানীর ডিরেক্টররা লিখিয়া পাঠাইলেন যে এখন হইতে দেওয়ানীটা আমরা নিজেদেরই হাতে চালাইব। এই বলিয়া রেজা খাঁকে তাহারা বরখাস্ত করিলেন আর ওয়ারেন হেষ্টিংসকে পাইয়া কোম্পানীর স্বহস্তে দেওয়ানীগিরি করিবার যথেষ্ট সুবিধাও হইল। কারণ হেষ্টিংস এদেশে অনেকদিন ধরিয়া আছেন। এদেশের নাড়িনক্ষত্র সেইজন্য তাহার নখ-দর্পণে ছিল।

হেস্টিংস জেলায় জেলায় এক একজন করিয়া কালেক্টর বসাইয়া দিলেন। কালেক্টর তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট দুই-ই। ব্যবসার উন্নতির দিকেও হেস্টিংসের বেশ মনযোগ ছিল। কোম্পানীর ব্যবসা ভালভাবে চালু রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে তিনি কমার্শিয়াল রেসিডেন্সী খুলিয়া ফেলিলেন। রেসিডেন্সীতে প্রধান হইয়া বসিতেন এক-একজন কমার্শিয়ল রেসিডেন্ট। তাঁহারাই কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া নিজেদের কারখানায় চালানীমাল তৈয়ারী করাইয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। কলিকাতা থেকে সেসব মাল জাহাজে করিয়া বিদেশে পাঠানো হইত। রেসিডেন্টের সাহায্যার্থে সরকারী এক অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট দেওয়া হইত। বাকি লোকজন, কর্মী কারিগর সব রেসিডেন্ট সাহেব নিজেই জোগাড় করিয়া লইতেন।

একে একে বাংলা দেশের এই সব জায়গায় কমার্শিয়ল রেসিডেন্সী বসিল ঃ পাটনা, মালদহ, বোয়ালিয়া, লক্ষীপুর (নোয়াখালি), কুমারখালি (কুষ্টিয়া), শান্তিপুর (নদীয়া),

সোনামুখী (এখন বাঁকুড়া জেলায়), রাধানগর (হুগলী), ক্ষীরপাই (মেদিনীপুর), হরিপাল (হুগলী), জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ), সুরদা (রাজসাহী)। অনেক আগে থেকেই এইসব জায়গায় আড়ং বা ফ্যাক্টরী ছিল। এখন কমার্শিয়ল রেসিডেন্টরা সেই সব জায়গায় সর্বেসর্বা হইয়া বসিলেন।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ব্রুকহ্যাভেনকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজ হইতে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করিতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে হুগলী হইতে সিল্ক এবং চিনি রপ্তানী করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে "হেজেস্ ডায়েরী'তে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধৃত হইল:

Capt. Broakhaven who was sent from Madras to establish the factory at Hughli, gave instructions that silk and sugar were to be brought here.

বর্তমানে একমাত্র বদনগঞ্জ ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও সিল্কের কাপড় তৈয়ারী হয় না। কাপড় চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা বলিয়া বিখ্যাত) হরিপাল খানাকুল বেগমপুর কৈকালা রাজবলহাট দ্বারহাটা প্রভৃতি গ্রামে এখনও তাঁতীগণ বুনিয়া থাকে। সিল্কের উপর ছাপার কাজ শ্রীরামপুর এবং চুঁচুড়ায় খুব সুন্দর ভাবে এখনও হইয়া থাকে।

॥ লবণ ॥

লবণ ॥ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসী তাহার প্রয়োজনীয় লবণ নিজেই তৈয়ার করিয়া লইত। রাজসরকারের হিন্দু রাজত্বকালে কোনরূপ কর সেইজন্য দিতে হইত না। 'নুন-ভাতে'র জন্য কোন কালেই ভারতবাসী পরমুখাপেক্ষী ছিল না, সকলেই স্বাবলম্বী ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে সম্রাট্ সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে সর্বপ্রথম 'নিমক-মহালে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ে ভারতের যাবতীয় লবণের কারবার জমিদারদিগের দ্বারা নবাবের কর্তৃত্বাধীনেই পরিচালিত হইত। (৬)

ভারতের মধ্যে মেদিনীপুরে হিজলী নামক স্থানে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইত এবং মুসলমান রাজত্বের পূর্বেও হিজলী লবণ-প্রস্তুতের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। যে সকল স্থানে ভাল লবণ উৎপন্ন হইত না, সেই সকল স্থানে ভাল লবণ প্রেরণের জন্য কাশ্মীরী শিখ ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়িবৃন্দ বঙ্গদেশে আগমন করিতেন এবং এই প্রদেশের লোকেরা তাঁহাদিগের নিকট লবণ বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিতেন। শালতি (ছোট নৌকা) করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হিজলী হইতে সাকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্যন্ত তৎকালে একটি খাল খনন করা হইয়াছিল। উহা "নিমকীর খাল" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত।

হিজলী ৯৭৫ হিজরি বা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া 'আকবর-নামায়' লিখিত আছে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। বঙ্গদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয়। সেকালের প্রাচীন কাগজপত্রে হিজলী প্রদেশ

হুগলী কালেক্টরীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মেদিনীপুর ইংরেজদিগের অধিকারে আসে এবং ইংরেজগণ মীরকাশিমকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। মীরকাশিম সৈন্যব্যয় নির্বাহের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা প্রদান করেন। আধুনিক হুগলী ও হাওড়া জেলা তৎকালে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে রাজস্ব কমিটির নির্দেশানুসারে হিজলী প্রদেশকে হুগলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একটি নূতন কালেক্টরী গঠন করা হয় এবং ইহার সাতাশ বৎসর পর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে পুনর্বার হিজলীকে হুগলী কালেক্টরীর অধীন করা হয়। পরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইহাকে হুগলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তদবধি ইহা মেদিনী-পুরের মধ্যেই আছে।

সমুদ্র কূলবর্তী স্থানগুলিতেই যে কেবলমাত্র লবণ উৎপন্ন হইত তাহা নহে লবণাক্ত ভূমি হইতেও তৎকালে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' এই সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিলঃ

কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকাও কূপ হইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণযুক্ত হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলী পরিমিত লবণ জমে সে প্রদেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এইরূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ লোকসান কোম্পানী বাহাদুরের অধীন। অতএব এইরূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংলণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানীর লোকসান হয়।

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ কার্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত লবণের উৎপাদন-কার্য চলিত এবং যে সমস্ত জমি জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যাইত, সেই সকল জমিতেই ভাল লবণ প্রস্তুত হইত। উক্ত জমিগুলিকে 'চর' বলিত। 'চর'গুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। উহাকে 'খালাড়ী' বলিত। যাহারা 'খালাড়ী'তে লবণের কার্য করিত, তাহা-দিগকে জনসাধারণ 'মলঙ্গী' বলিয়া অভিহিত করিত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন যে, হিজলীর প্রত্যেক 'খালাড়ী'তে সাতজন করিয়া লোক নিযুক্ত থাকিয়া গড়ে দুই শত তেত্রিশ মণ করিয়া লবণ উৎপন্ন করিত। লবণ ইজারদারগণ এই 'মলঙ্গী'দের কিছু টাকা দাদন দিয়া পরে তাহাদিগকে বেগার খাটাইয়া লইত। নীলকরদিগের অত্যাচারের ন্যায়, এই লবণ ইজারদারদের অত্যাচারে উৎপীড়িত মলঙ্গীগণ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের নিকট আবেদন করে। তিনি লবণের চুক্তির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেন, ফলে হিজলী ও তমলুকের নিমকমহলে ১৩,৩৮৮ জন মলঙ্গী যাহারা তিন শত বর্ষ ধরিয়া এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে, তাহারা বাঁচিয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত একখানি সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার

করেন। উক্ত পুঁথিতেও লবণ ব্যবসায় এবং 'মলঙ্গী' নামটির উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোচদামলকে দেশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ।
লবনানামাকরশ্চ যত্র তিষ্ঠন্তি ভূরিশঃ॥ ৪৮
প্রণালী দ্বি একা তত্র সদা বহিত ভূমিপ।
মালংগণা মনুষ্যাণাং নিবাসং বহিত কিল॥ ৫০

মুসলমান রাজত্বকালে লবণের ব্যবসায় জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত হইত এবং সরকার হইতে 'মঙ্গলী'গণের বেতনস্বরূপ প্রতি এক শত মণ উৎপন্ন লবণের উপর ২২ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক ধার্য ছিল। জমিদারগণ উক্ত "মলঙ্গী"দের ছয় মাসের বেতন দিতেন এবং বাকী ছয় মাসের বেতন তাঁহারা নিজেরা গ্রহণ করিতেন ও তাহাদিগকে কিছু আবাদী জমি দিয়া অর্ধেক ফসল আবার তাঁহারা লইতেন। এক শত মণ লবণ, সেই সময় ষাট টাকা মূল্যে মহাজনদিগকে বিক্রয় করা হইত এবং খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা জমিদার ও নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ গ্রহণ করিতেন। 'মলঙ্গীগণ কেবল খাটিয়াই যাইত (৭) সেই সময় প্রধান লবণ ব্যবসায়ীগণ "মালীক-উল-তজ্জুব" অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের রাজা উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্যের ফরমান প্রাপ্ত হইয়া কয়েকটি কুঠি স্থাপন করেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন সেই সময় খুবই অল্প ছিল বলিয়া তাঁহারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত লাভার্থে ব্যবসা করিতেন। জমিদারগণ লবণের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হন দেখিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া এই দেশের লবণ তামাক ও সুপারির সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রচার করেন এবং ক্লাইভ ও কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের ডিরেক্টরগণের নিষেধ সত্ত্বেও, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ট্রেডিং এসোসিয়েশন নামে একটি বণিক-সভা কলিকাতায় স্থাপন করেন। কোম্পানীর সমুদয় ইংরাজ কর্মচারী উক্ত সভার সভ্য হইলেন এবং নিয়ম হইল যে, এই দেশে যত লবণ উৎপন্ন হইবে তাহা প্রতি ৫ শত মণ ৫ টাকা হিসাবে ইংরেজ বণিকগণকে বিক্রয় করিতে হইবে। পরে বণিকসভা উহা পাঁচ শত টাকা মূল্যে দেশীয় মহাজনদের বিক্রয় করিবেন; তাঁহারা উহার উপর লাভ রাখিয়া দেশবাসীকে বিক্রয় করিবেন। মহাজনগণ বণিক-সভা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন না বলিয়াও তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সম্বন্ধে উইলিয়াম বোল্ট Consideration on Indian Affairs নামক পুস্তকে লিখিলেন :

The first was the private monopoly in partnership which commenced in the beginning of June 1765, between Lord Clive, Messieurs Summers, Sykes and Verelst, each one quarter part for purchasing large quantities of salt that was in the hands of private

merchants and in August 1765, the monopoly of inland trade in salt betelnut and tobacco was established.

সর্বপ্রথমে ১৭৬৫ সালের জুন হইতে লর্ড ক্লাইভ, সামার্স, সাইকস্ ও ভেরলেস্‌ট্ মহোদয়গণ নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে একচেটিয়া সমান অংশীদার হিসাবে দেশের ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে সমস্ত লবণ ক্রয় করিয়া ব্যবসায় শুরু করেন এবং এইরূপে অগষ্ট মাসে লবণ, সুপারী ও তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায়ের শুরু করেন।

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার জমিদারগণের নিকট নবাব এক পরোয়ানা বাহির করিয়া হুকুম দেন যে, যত লবণ প্রস্তুত হইবে তাহা ইংরেজ বণিকসভাকে (The English Society of Merchants for buying and selling all the salts, Betelnut and Tobacco in the Provinces of Bengal Bihar and Orissa) বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া মুচলেকা দিতে হইবে। নবাবের পরোয়ানার অংশ-বিশেষের ইংরেজী অনুবাদ এই রকমঃ

Until the contracts for salt are settled, no salt shall be made, or got ready in any District......having given a bond, he may then proceed to his business and make salt ; but till the bond be given to the Governor and the gentlemen of the Committee and Council, they should make none. Therefore, give your bond and settle your business ; and then proceed to the making of salt.

লবণ ব্যবসায় সংক্রান্ত সর্তাদি সম্পূর্ণ না হওয়ায় পূর্বে—কেহই এই জেলায় লবণ তৈয়ারী করিতে পারিবে না—এইরূপ মুচলেকা লিখিয়া দিলে ঐ ব্যক্তি লবণ তৈয়ারী ব্যবসায় অগ্রসর হইতে পারে—কিন্তু গভর্ণরের বা কমিটি বা কাউন্সিলের কোনো ভদ্রমহোদয়ের নিকট এইরূপ মুচলেকা লিখিয়া না দেওয়া পর্যন্ত কেহই ঐ ব্যবসায় করিতে পারিবে না।

চন্ডীচরণ সেন 'মহারাজ নন্দকুমার' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, ইংরেজ বণিকগণ এই নিয়মানুসারে ব্যবসা করায় দেশের সর্বনাশ আরম্ভ হয়; চতুর্দিক হইতে প্রজাদের হাহাকার উত্থিত হয় এবং দেশীয় প্রজাগণের কষ্টের লাঘব করিবার তখন কোন উপায় ছিল না। বোল্ট সাহেব লিখিয়াছেনঃ

We now come to consider a monopoly the most cruel of its nature, and most destructive in its consequences, to the Company's affairs in Bengal, of all that have of late been established here. Perhaps it stands unparalled in the history of any government, that ever existed on earth, considered as a public act...

নবাবের পরোয়ানা অনুযায়ী দেশের জমিদারগণ কলিকাতার ইংরেজ বণিক-সভায় লবণ প্রস্তুতের জন্য যথারীতি মুচলেখা দেন। উক্ত মুচলেখায় লিখিত ছিল যে, বণিক-সভা ভিন্ন আমি কাহাকেও লবণ বিক্রয় করিব না। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইংরেজ বণিক-সভা

ব্যতীত অন্য কাহাকেও লবণ বিক্রয় করিয়াছি, তাহা হইলে প্রতি মণে পাঁচ টাকা হিসাবে জরিমানা দিব। উক্ত মুচলেকার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধার করিঃ

I will on no acconnt trade with any person for the salt to be made; and without their order I will not otherwise make away with, dispose of a single grain of salt, but whatever salt shall be made within the dependencies of my zamindary, I will faithfully deliver it all, without delay, to the said society and I will receive the money according to the agreement which I shall make in writing and I will deliver the whole and entire quantity of salt produced and without the leave of the said Committee, I will not carry to any other place, nor sell to any other person a single measure of salt. If such a thing should be proved against me, I will pay to the Sarcar of the said society a penalty of five Rupees per every maund.

কাহারও সহিত লবণ তৈয়ারীর ব্যবসায় করিব না, তাহাদের আদেশ ব্যতীত এক কণা লবণ তৈয়ারী বা বিক্রয় করিব না, আমার জমিদারীতে তৈয়ারী যাবতীয় লবণ আমি সোসাইটীকে দিব এবং লিখিত সর্তাদি অনুযায়ী দাম লইব এবং তৈয়ারী সমস্ত লবণ তাহাদিগকে সরবরাহ করিব এবং কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো স্থানে ইহা সরবরাহ করিব না বা কাহাকেও এক রতি লবণ বিক্রয় করিব না। আমার বিরুদ্ধে ইহার কোন একটি প্রমাণিত হইলে—আমি উক্ত সোসাইটীর সরকারকে মন প্রতি পাঁচ টাকা শাস্তিস্বরূপ দিব।

ক্লাইভের প্রতিষ্ঠিত বণিক-সভার কার্যপ্রণালী ও লবণের একচেটিয়া অধিকার বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করিলেন না, বরং বিরক্ত হইয়া তাঁহারা কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে উক্ত কার্যে ব্রতী হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন হইতেছে দেখিয়া কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর এবং কাউন্সিলের সভাবৃন্দ কিছুতেই লবণ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন না।

বিলাত হইতে বারংবার লেখা সত্ত্বেও যখন তাহারা এই লাভজনক ব্যবসা পরিত্যাগ করাইতে পারিলেন না তখন তাঁহারা প্রতি মণ লবণ পাঁচ টাকা হিসাবে বিক্রয়ের পরিবর্তে দুই টাকা করিয়া বিক্রয়ের নির্দেশ দেন। কলিকাতার বণিক-সভা অধিকন্তু বিলাতের কর্তাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য যত লবণ বিক্রয় হইবে তাহার উপর শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে মাশুল দেওয়া হইবে বলিয়া নিয়ম করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে একমাত্র লবণের মাশুল হইতে ১৩ লক্ষ টাকা কোম্পানীর আয় হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন আইনদ্বারা দেশের জনসাধারণের পক্ষে লবণ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হয়। কোন্ বৎসরে কোম্পানীর ও সরকারের কত রাজস্ব একমাত্র লবণ হইতে পাওয়া গিয়াছিল তাহার তালিকা এই রকমঃ

লবণ শুল্ক হইতে রাজস্ব

বৎসর	টাকা	বৎসর	টাকা
১৭৮০	৪০০০০০০৲	১৯২১-২২	৬৪৪৭৯৮০০৲
১৮১০	১১৭২৫৭০০৲	১৯২২-২৩	৭৩১৪৬৫১২৲
১৮১২	১২০০০০০০৲	১৯২৩-২৪	০১২৩৮৫০৫৲
১৮২১	১২৮৪০৮০০৲	১৯২৪-২৫	৭৮৫৭৭৫৭৩৲
১৮২৬	১৫৮৮৬০০০৲	১৯২৫-২৬	৬৩৭০০৫৬০৲
১৮২৯	২৫৮২০০০০৲	১৯২৬-২৭	৬৭২৮৬২২৩৲
১৯০৭	৪৬০৪৬৫৭০৲	১৯৪০-৪১	৮৭৫৯৪০০৮৲
১৯১৬	৬৮৪৩২৪৬০৲		

১৮০১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট আইন করেন যে, যদি কোন জমিদারের এলাকায় কেহ গোপনে লবণের কারখানা স্থাপন করে এবং জমিদার গভর্ণমেন্টকে তাহার কোন সংবাদ না দেন তবে তাঁহার ৫০০৲ টাকা জরিমানা হইবে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্টের লবণ বিভাগের কর্মচারীগণ ইচ্ছামত যে কোন লোককে লবণ তৈয়ারীর অপরাধে ৫০৲ টাকা জরিমানা করিতে পারিতেন।

জেমস্ হিকি নামক এক সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' কলিকাতা হইতে বাহির করেন। তিনি সাধারণ শ্রেণীর লোক হইলেও, নির্ভীকভাবে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন। তিনি লবণ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও দরিদ্র প্রজাদের হইয়া লিখিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। উক্ত কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকিতঃ 'A weekly political and commercial paper open to al parties but influenced by none.'

হেষ্টিংস লবণের ব্যবসায়ে কোটি টাকা অর্জন করেন। তিনি হেষ্টিংসকেও আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। হিকির 'বেঙ্গল গেজেটে'র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে 'ইন্ডিয়া গেজেট' বাহির হয়। উহার পরিচালক মিঃ পিটার রীডকে হেষ্টিংস সহায়তা করিতেন এবং রীড সাহবও হেষ্টিংসের সহিত লবণের ব্যবসা করিতেন, বলিয়া হিকি সাহেব তাহাকে 'বেঙ্গল গেজেটে' পিটার রীডের পরিবর্তে "পিটার নিমক" আখ্যা দেন।

প্রথম শহীদ মহারাজ নন্দকুমারের জাল মোকদ্দমায় অন্যতম প্রধান সাক্ষী কমলউদ্দীন হিজলীর লবণের ইজারাদার ছিলেন। হিকি এবং নন্দকুমারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রেই যে জাল মোকদ্দমা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত হয় এবং যাহার জন্য তাঁহার ফাঁসি হয়, ইতিহাস পাঠকগণ তাহার ইতিবৃত্ত সবিশেষ অবগত আছেন। হিকি সাহেব নন্দকুমারের ফাঁসির পর 'বেঙ্গল গেজেটে' লেখেন যে, জাল করিবার জন্য ক্লাইভকে

'লর্ড' উপাধি দেওয়া হয়, কিন্তু অদৃষ্টচক্রে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। হিকির কথাগুলি 'বেঙ্গল গেজেট' হইতে উদ্ধৃত হইল:

Clive was made a peer in England though he committed in Bengal the same crime for which we hanged Maharaja Nanda Coomar.

যে অপরাধ করায় মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী হইয়াছিল সেই একই অপরাধ করা সত্ত্বেও ক্লাইভ ইংলণ্ডে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া কাউন্সিলের প্রত্যেক সভ্যকে আক্রমণ ও তাহাদের কার্যাদি সমালোচনা করিবার জন্য হেষ্টিংস হিকি সাহেবকে ছাড়িলেন না। তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কলিকাতার জেলের মধ্যেই সত্যনিষ্ঠ হিকি সাহেব পরলোকগমন করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। হিকির প্রতি হেষ্টিংসের নিগ্রহের কারণ সম্বন্ধে 'ওরিজিনাল এনকোয়ারী' নামক গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধারযোগ্য:

It cannot be doubted that the files of Hickey's Bengal Gazettee must throw singular light on the nature of the contentions which then agitated the public mind and the character of the man who then held the highest stations ; not without access to such can a a just view of that period ever be obtained.

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে হিকির বেঙ্গল গেজেটের কাগজপত্র সেই সময় সাধারণের মনের গতিপ্রকৃতির উপর এবং যিনি সর্বোচ্চপদসকল অধিকার করিয়াছিলেন তাহার চরিত্রের উপর আলোকপাত করিয়াছিল। এই সকলের পাঠ ব্যতিরেকে সেই সময়ের সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে না।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের জমিদারগণ বণিক-সভাকে মুচলেকা দিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেন এবং একটি নির্দিষ্ট হারে তাহারা কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে লবণ সরবরাহ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় জমিদারগণই লবণের ইজারাদার ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিক্রীত লবণের উপর শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে কমিশন পাইত। উক্ত বৎসর লবণের কমিশন হইতেই কোম্পানী চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। লবণ ব্যবসায়ের এইরূপ লাভ দেখিয়া ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি লবণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদারদিগকে লবণ প্রস্তুতের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজ হস্তে ইংরেজ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে লবণ-প্রস্তুতের কার্য আরম্ভ করেন।

হুগলী তমলুক হিজলী ও চট্টগ্রামে কোম্পানীর লবণের এজেন্সী ছিল এবং প্রত্যেক স্থানে লবণ-এজেন্ট উপাধিধারী ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা কোম্পানীর লবণ ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত উক্ত স্থানের ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার ও রাজস্ববিষয়ক কার্যাদিও নির্বাহ করিতেন। এজেন্টগণ কোম্পানীর লাভের উপর শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিশন পাইতেন। পরে তাহা কমিয়া তিন টাকা, শেষে আড়াই টাকা করিয়া

নির্ধারিত হয়। লবণ-এজেন্টদিগের অধীনে কর্ম করিয়া তৎকালে বহু শিক্ষিত বাঙালী প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন; তাঁহারা সাধারণতঃ সেরেস্তাদারী দেওয়ানী, কেরানী প্রভৃতির কার্য করিতেন। এই সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল আর একাল', নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—'ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিলেন না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিল।'

রিকার্ড লিখিয়াছেনঃ 'আমরা দরিদ্রতার একটি প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর একাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—হিংস্রজন্তুসমাকুল ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে লবণের কারখানাতে লোককে জোর করিয়া খাটাইয়াছি এবং দরিদ্রের কাছে উহা ৪ গুণ এমন কি ৫ গুণের বেশী দরে বিক্রয় করিতেছি।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে গভর্ণমেণ্ট প্রতি মণ লবণের দাম ৩৮৫ টাকা হইতে ৪৬৯ টাকা করেন—যাহাতে সহজেই বিলাতী লবণ বাঙ্গলার বাজারে অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় হইতে পারে। ফ্রেডারিক হ্যালিডে বলেন : যদি গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ থাকিতেন এবং দেশী বিদেশী কোন লবণের উপর ট্যাক্স না বসাইতেন তাহা হইলে বাঙ্গলার বাজারে এক গ্রেণও বিলাতী লবণ বিক্রয় হইত না।

রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী স্যার বিডেনের সাক্ষ্য হইতে ইহা জানিতে পারা যায় যে, নবাবের আমলে যে দরে লবণ তৈয়ার হইত, তাহার উপর শতকরা আড়াই টাকা হইতে পাঁচ টাকা ট্যাক্স বসান হইত। কিন্তু কোম্পানীর আমলে এই ট্যাক্স ৫০০ হইতে ৫৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

কোম্পানীর আমলে লবণের দর এত চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, বাঙ্গলায় কোন কোন জেলার লোক লবণ ব্যবহার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

জমিদারগণকে লবণ প্রস্তুত করিতে বঞ্চিত করা হয় বলিয়া, কোম্পানী ক্ষতিপূরণস্বরূপ উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের একটি মাসোহারা দিবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর উক্ত মাসোহারার টাকা পরিবর্তিত হইতে থাকায় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি নির্দ্দিষ্ট জমা ধার্য করিয়া সমস্ত 'খালাড়ী' জমি বন্দোবস্ত করিয়া লন। কোম্পানীর দেয় 'খালাড়ী' খাজনা জমিদারদিগের রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া হইত।

এই সম্বন্ধে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখের সমাচার দর্পণ হইতে কিছু উদ্ধার করি :

'১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দপ্তরের কার্য বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগের তাঁবে হইল কিন্তু ইউরোপীয় এজেন্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের সরবরাহকারী কর্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ট্রেডের সাহেবরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের তদারক করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে নিমকপোক্তানীর কার্য দুই প্রকারে চলিতেছিল। প্রথমতঃ আজোরা * নামক মণ্ডলীদের দ্বারা জবরদস্তিতে নিমক

প্রস্তুত করা যাইতেছিল, দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীদের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ হইতেছিল। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরা লবণের নিমিত্ত যে মূল্য পাইতেছে তাহার কেবল অর্ধেক মূল্য আজ্জোরারা পাইতেছিল এবং এই অল্প বেতনে তাহাদের অতিশয় কষ্টে প্রাণধারণ হইতেছিল। ঐ সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল যে হিজলী ও তমলুকের নিমক মহালে ১৩৩৮৮ পরিজনসমেত আজ্জোরা মলঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন শত বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে। বিবেচনাকরণানন্তর বোর্ডের সাহেবেরা ইহা ঠাহরাইলেন যে ইহার পূর্বে অল্পমূল্যে নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে ঐ আজ্জোরারা স্বকীয় ভূমি নিষ্কররূপে অথবা অতিশয় ন্যূন খাজনায় ভোগ করিল কিন্তু কালক্রমে জমিদারেরা নানা ছলে লবণের মূল্যের কিছু বৃদ্ধি না করিয়া সেই সেই ভূমির খাজনা সম্পূর্ণরূপে ঐ বেচারা মলঙ্গীদের স্থানে লইতে লাগিলেন।

বোর্ডত্রেডের সাহেবরা ইহা অবগত হইবামাত্র আজ্জোরারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীদের তুল্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিলেন এবং অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেণ্ট সাহেবরা গবর্ণমেণ্টকে আরও এই নিবেদন করিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীদের স্থানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহাদের উপযুক্তরূপে গুজরাণ হয় না। ঐ সাহেবদের পরামর্শক্রমে নিমকের চুক্তির মূল্য শতকরা ৫৫ টাকা হইতে ৭৭ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা গেল। নিমকের মূল্য এইরূপে বৃদ্ধি হইলে এজেণ্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার এবং সরকারেরও লাভ হইল।

বঙ্গদেশে যে লবণ ব্যবহৃত হয় তাহা বিদেশ হইতে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হয়। সমুদ্রকুলবর্তী জেলাসমূহে লবণ প্রস্তুত নিষিদ্ধ, কারণ বে-আইনি লবণ প্রস্তুত বন্ধ করা কষ্টসাধ্য। ১৯১০—১১ খৃষ্টাব্দে ১১৮৭৯৫৭৪/মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল। এই বৎসর লবণের মণ প্রতি দর ছিল শুল্কসহ ১৮৶৫পাই খুচরা দর ছিল প্রতি সের তিন পয়সা হইতে পাঁচ পয়সা। এ বৎসর এই প্রদেশে ৮১৪৩১০০/মণ লবণ কাটতি হইয়াছে; ১৯০৯--১০ অব্দে হইয়াছিল ৮১৭২৮২০/মণ। উক্ত বৎসর লবণ আইন অমান্যের অপরাধে ২৫ জন লোক দণ্ডিত হইয়াছিল, পূর্ব বৎসর হইয়াছিল ৯৫ জন। ১৯১০ অব্দের শেষ ভাগে জামিন রাখিয়া ধারে লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়; তাহাতে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড জামিন পাওয়া গিয়াছিল।

ডাক্তারদের মতে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে প্রত্যেক মানবের মাথাপিছু বৎসরে ২২।২৩ পাউণ্ড (অন্ততঃ ১১ সের) লবণ ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু সরকারী একচেটিয়ার ফলে লবণের দাম প্রতি মণ ১০৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। সুতরাং দরিদ্র জনসাধারণ লবণ ব্যবহার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। (৮)

---

* 'আজ্জোরা' অর্থাৎ যে সব কুলীকে বিনা পারিশ্রমিকে লবণের কার্যে বেগার খাটাইয়া লওয়া হইত।

লবণ সম্বন্ধে জন ক্রফোর্ড লিখিয়াছেন ঃ 'আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বাঙলার দরিদ্র কৃষকগণের অধিকাংশ জনসাধারণের পরিবার প্রতিপালন করিতে লবণ কিনিতেই তার দুই মাসের মজুরী অর্থাৎ বাৎসরিক আয়ের ১।৬ অংশ ব্যয় হইয়া যায়।'

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের লবণ ব্যবহারের পরিমাণ দেখান হইল ঃ

দেশের নাম	জন প্রতি ব্যবহৃত লবণের পরিমাণ
ইংলণ্ড	৪০ পাউণ্ড
পর্তুগাল	৩৫ "
ইটালি	২০ "
ফ্রান্স	২৮ "
বেলজিয়াম	১৬৸৹ "
অষ্ট্রিয়া	১৬ "
পারস্য	১৪ "
ভারতবর্ষ	৮ "

১৮৪৮—৪৯ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় যত লবণ ব্যবহার হইত, তাহার শতকরা ৭৩ ভাগ ভারতে প্রস্তুত হইত, বাকী ২৭ ভাগ বিদেশ হইতে আসিত। কিন্তু ১৮৬৯—৭০ খৃষ্টাব্দে এই বাঙলা দেশেই শতকরা ৫ ভাগ লবণ ভারতে প্রস্তুত আর ৯৫ ভাগ বিদেশ হইতে আমদানী। ১৯২৭—২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙলা দেশে দেড় কোটী টাকার লবণ আমদানী হইয়াছে। অথচ ভারতের তিনদিকেই সমুদ্র!

ইহার পরিণাম এই দাঁড়াইয়াছে যে. হয় একেবারেই লোকের নুন জোটে না; আর না হয় নুনের বদলে অস্বাস্থ্যকর লবণাক্ত মাটি তুলিয়া আনিয়া খায়। তাহাও আবার সংগ্রহ করিবার সময় জেলের ভয় আছে। (১)

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সরকারের 'পার্লামেন্টারী-কমিটি' ভারতে লবণ প্রস্তুতের কারবারগুলি তুলিয়া দিয়া লিভারপুল হইতে বিলাতী লবণ আমদানী করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার সাতাশ বৎসর পর, ১৮৬২—৬৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট স্যার সিসিল বিডনের সময়ে ইংরেজ সরকার এই দেশে লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, বিলাতী লবণ ভারতের সর্বত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজদের লবণের একচেটিয়া ব্যবসা উঠিয়া গেলে কতিপয় দেশীয় ব্যক্তি সরকারকে লবণ-কর দিয়া কিছুদিন এই ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার এই দেশে প্রস্তুত লবণের উপর অধিক কর গ্রহণ করায় বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় কেহই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। পরিশেষে আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত রহিত করিয়া দেওয়া হয়। হান্টার সাহেব তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে লবণের ব্যবসায় এই দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়ায় এই প্রদেশের অধিবাসীদের শ্রী সৌভাগ্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

উইলিয়ম রস লিখিয়াছেন যে. কেবল ভারতবর্ষে নুনের উপর শুল্ক আদায় করা

হয়। পৃথিবীর আর-কোন দেশে এ-প্রথা নাই। সেই জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রত্যেক গ্রাসে গ্রাসে ট্যাক্স দিয়া তাহাদের ক্ষুধার্ত লবণ অভাবগ্রস্ত গবাদি পশুগুলির সহিত নিজেদের কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া কঙ্কালসার হইয়া আসিয়াছে।

বৃটিশ ভারতে লবণ আমদানি

১৮৪৭	৭২১১১২ মণ
১৮৫১	১৭২৭১০৮ মণ
১৯০৯	১০৯৫৬৫৪৪ মণ
১৯২৫	১৭২৩৯৫৪৪ মণ

এই সম্বন্ধে বাকল্যান্ড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল :

One of the most important administrative changes of the year 1862-63 was the abandonment by Government of its salt manufacture and its final disconnection with the so-called monopoly...... With this object in view, in deciding upon the course to be adopted in the manufacturing season of 1862-63, it was determined that the Chittagong salt agency should be closed ; the Hooghly and Tamluk aegncies were united under one officer ; the manufacture of *karkoch* or solar evaported salt was stopped ; and of boiled salt, the manufacture was limited to 9,00,000 manunds. The manufacture of the season was ordered to be closed as speedily as possible, and it was announced that it would not be re-opend in the current year......Government thus definitely abandoned a system which, from its first establishment by Lord Clive, in the shape of a pure monopoly, had lasted various modifications almost a century.........

১৮৬২-৬৩ সালের সবচেয়ে বড় শাসননৈতিক সংস্কার—সরকার কর্তৃক লবণ তৈয়ারী বর্জন ও একচেটিয়া অধিকার রদ। ১৮৬২-৬৩ সালের লবণ তৈয়ারীর সময়—(উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়—চাটগাঁ লবণ এজেন্সী বন্ধ করা হইবে, হুগলী ও তমলুক এজেন্সী একজন অফিসারের অধীনস্থ করা হইবে, করকচ লবণ তৈয়ারী বন্ধ করা হইবে এবং সিদ্ধ লবণের তৈয়ারী পরিমাণ হইবে ৯০০০০০ মণ, এতদ্‌কারণে লবণ তৈয়ারী যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয় তাহার চেষ্টা করা হয় এবং ইহা প্রচারিত করা হয় যে ইহা আর বর্তমান বৎসরে চালু করা হইবে না, এইরূপে গভর্ণমেন্ট প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া নানারূপ পরিবর্তন সত্ত্বেও টিকিয়া ছিল এবং যাহা লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক প্রথম প্রচলিত এইরূপ একটি ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লবণ-কর রহিতকল্পে ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া কারাবরণ করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন হয় এবং আইন অমান্যপূর্বক লবণ প্রস্তুত করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি কারাবরণ করেন। লবণ প্রস্তুত করিতে খরচ কিছুই নাই বলিলে চলে, অথচ ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত বা লবণের কারবার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। লবণের পাইকারী দর প্রতি মণ পাঁচ টাকা এবং গবর্ণমেণ্ট প্রতি মণে দেড় টাকা হিসাবে ট্যাক্স আদায় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রায় আট কোটি টাকা রাজস্ব লাভ করিতেন।

মহাত্মা গান্ধী এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—ভারতে লবণকর বসাইবার ইতিহাসই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটা মস্ত বড় দুর্নীতির ইতিহাস। বাতাস এবং জলের পরই সম্ভবতঃ লবণ জীবন ধারণের পক্ষে সব পেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, দরিদ্রের উহাই একমাত্র ব্যঞ্জন। গো-মহিষাদি পশুও লবণ ছাড়া জীবনধারণ করিতে পারে না; অনেক শিল্পকার্যেও লবণ প্রয়োজনীয়। উহা ভাল সারও বটে। যে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের লবণ চুরি করে এবং এই চোরাই মালের জন্য জনসাধারণকে অত্যধিক ট্যাক্স দিতে বাধ্য করে সেই গবর্ণমেণ্টই বে-আইনী। জনসাধারণ যখন আত্মশক্তিতে আস্থাসম্পন্ন হইবে, সেই সময়ে যাহা তাহাদের নিজস্ব তাহার দখল পাইবার জন্য তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

কিন্তু আপনি যদি ঐ প্রতিকার সাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত বোধ না করেন এবং আমার এই চিঠি আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে, তাহা হইলে এই মাসের একাদশ দিবসে, আমি আশ্রমের যে সব সহকর্মীকে আমার সংগে লইতে পারিব, তাহাদিগকে সংগে লইয়া লবণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অমান্য করিতে অগ্রসর হইব। দরিদ্রের দৃষ্টি হইতে আমি ঐ করকে সর্বাপেক্ষা অন্যায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন প্রধানতঃ এতদ্দেশের দরিদ্রদের স্বার্থেরই জন্য, সুতরাং ঐ অন্যায়কে আক্রমণ করিয়াই ঐ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। আশ্চর্য এই যে, আমরা এতকাল পর্যন্ত এই হৃদয়হীন একচেটিয়া কারবার মানিয়া লইয়া আসিয়াছি।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের নির্দেশানুযায়ী প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালের মত লবণ-কর ভারতবর্ষ হইতে রহিত হইয়াছে। লবণ-কর রহিত হইলেও লবণ-শিল্প পূর্বে যেরূপ সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল ছিল, সেইরূপ এই শিল্পকে সমৃদ্ধশালী করিতে ভারতবাসীকে সচেষ্ট হইতে হইবে, তবেই ভারতের আর্থিক উন্নতি হইবে এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা হইবে।

কৃষিকার্যে অনভিজ্ঞতা—বর্তমানে বাঙ্গলার শতকরা ৯০ জন লোকই কৃষক। কৃষির দ্বারা বা কৃষিজাত আয় হইতে তাহারা সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা বস্তুগত লাভ কৃষকদের না থাকায় কৃষির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। পূর্বে কিন্তু বাঙ্গলার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষি

কার্য করিত না অপরাপর শিল্পকার্যে ব্যাপৃত থাকিত—বর্তমানে সেই সমস্ত শিল্পাদি বিনষ্ট হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাদের কৃষক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই তাহা বেশ প্রমাণিত হয়ঃ "পূর্বে যে সম্প্রদায়গুলি শিল্পকার্যসমূহে নিযুক্ত থাকিত, এখন সেই সমস্ত শিল্পগুলি ধ্বংস হওয়ায়—তাহারাই কৃষক পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।"

আজকাল বাঙলার অবস্থা দেখিয়া কেবল মনে হয় যে—আমাদের এই বাঙলাদেশ কাহার? এ দেশ সত্য সত্য বাঙালীর, না অন্য কাহারও? ব্যবসা বাণিজ্য বলুন, আর কৃষি শিল্প বলুন যে কোন কার্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক না কেন, বাঙালী দেখা যাইবে না, অ-বাঙালীতে সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা বাঙালীর মত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই, অর্থ উপার্জন করিতে তাহারা আসিয়াছে এবং অর্থ শোষণই তাহাদের কাজ। ফলে বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্র হইতে হটিয়া যাইতেছে। পূর্বে কিন্তু বাঙলার অবস্থা এরূপ ছিল না। ইংরাজ রাজত্বের ফলে বাঙলার প্রধান কুটীরশিল্পগুলিকে বিনষ্ট করায়—আজ এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে এবং বর্তমানে প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদের নিশ্চিত বিলুপ্ত হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে কৃষির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

সর্বপ্রধান কৃষি॥ বাঙলার কৃষি সম্পদের মধ্যে সর্বপ্রধান কৃষি—পাট এবং কাপড়। এই সর্বপ্রধান কৃষি দুইটি বাঙালীর হাত ছাড়া হওয়ায় আজ বাঙলার এই দুরবস্থা? তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য হারাইয়া আজ পথের ভিখারী—বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে দুঃখ, দৈন্যের আবির্ভাবে বাংলার প্রতি গৃহে অভাবের সংসার সৃষ্টি করিতেছে। আজ বাঙলা আর সোনার বাঙলা নাই, আজ বাঙলা ফিকির জানে না বলিয়া ফকির; আজ বাঙলা এক কথায় 'দুঃখের আগার।'

পাট শিল্প॥ বহু শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে পাটের আবাদ চলিয়া আসিতেছে—পাট উৎপন্ন করিয়া, সেই পাট হইতে দড়ি দড়া, দুলো রশি কাছি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত, নৌকা এবং জাহাজের পালও পাটের সুতায় প্রস্তুত হইত এবং দেশ-বিদেশে এই সকল দ্রব্য চালান দিয়া, বাঙলার জাতীয় ধন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুলোক পাটের থলিয়া প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য বাঙলায় আসিত, পাটের ব্যবসায় বাঙলায় কিরূপ প্রসার ছিল তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিবরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—১৮৪৯-১৮৫০ সালে ২২৯৬১৪৪৪৯ খন্ড থলিয়া এবং ২৩৮০১৯৯ খানি চট কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছিল এবং তাহার মূল্য প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা ছিল।

পাট হইতে যাবতীয় কারবার বাঙলার জোলা যুগী কাপালী তাঁতী প্রভৃতি জাতিগণ করিত এবং তজ্জন্য বাঙলার ঐ সমস্ত ব্যবসা তাহাদের একচেটিয়া ছিল—টাকাও সমস্ত বাঙলার ব্যবসায়ীগণ পাইত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রকস্‌বার্গ ঐ শিল্পের পরিচয় পাইয়া বিলাতের ব্যবসায়ীগণকে আকৃষ্ট করান এবং বাঙলার এই উন্নতিশীল শিল্পটীকে বাঙলার

হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহারা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় প্রথম পাটকল স্থাপিত করেন।

The Jute Mill at Champdani is one of the oldest in the Province having been built in 1872.

প্রথমে শিল্পীদিগকে নানা রকমে প্রলুব্ধ করিয়া খাদ্য শস্যের আবাদ হ্রাস করিয়া তৎপরিবর্তে পাটের চাষ বৃদ্ধি করায়, এই অমূল্য শিল্পটী লুপ্ত হয়, ফলে অসংখ্য পাট বয়নকারীর রোজগারের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়।

বস্ত্র-শিল্প ॥ তারপর বস্ত্র-শিল্পের কথা—প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও আমাদের এইস্থানে কাপড়ের প্রচলন ছিল। বাঙ্গলা চিরকাল তার মসলিনের জন্য বিখ্যাত। বাঙ্গলার মসলিন সেকালের গ্রীস এবং রোমের অধিবাসীগণও ব্যবহার করিত এমন কি ঐ দেশের রাণীরা মসলিন পরিয়া খুব গৌরব অনুভব করিতেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ২৪২ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানি হয়, আর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ৭০ কোটী টাকার কাপড় আমাদের বিলাত হইতে কিনিতে হয়। এই দেশের শিল্পটীকে ধ্বংস করিতে কিরূপ অত্যাচার এবং অনাচার করিতে হইয়াছিল তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের বিবৃতি হইতেই বেশ বুঝা যায়। "আমরা যে অতুল ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছি, উহা অত্যন্ত নৃশংস এবং ইতিহাসে বিরল—অত্যাচার ও অনাচার করিয়া এবং ভারতের বুকে বসিয়া জোর করিয়া উহা আদায় করিয়াছি।" নানাপ্রকার অন্যায় আইন সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গলার বুকে তাঁতিদের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, পিতা মাতার সম্মুখে পুত্রকে হত্যা করা হইত এবং তাঁতিদের মায়েদের মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করিত।

The Children were scourged almost to death in the presence of their parents...and these virgins were publicly violated by the lowest and wickedest of the human race. Burke 1788

যাহা হউক এইরূপ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া তাঁতীগণ জাত ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হয় এবং ফলে বাঙ্গলার এই অমূল্য শিল্পটি একেবারে ধ্বংস হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে পরিষদের সভায় মিঃ লার্পেণ্ট বলেন—আমরাই ভারতের শিল্প সমূহ ধ্বংস করিয়াছি। উত্তরে তদন্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট বলেন, ভারতের বস্ত্রশিল্প ইতিপূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে —সুতরাং যাহা ধ্বংস হইয়াছে, তাহা লইয়া আর প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্প এইভাবে ধ্বংস হইল এবং তাহার ফলে বহু তাঁতীর রোজগারের পথও চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যে সাক্ষ্য গৃহীত হয় তাহাতে জানা যায় যে, ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্য এবং সিল্ক বস্ত্র অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ বা ষাট ভাগ কম দামে বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিলেও লাভ পাওয়া যাইত। সুতরাং ভারতীয় বস্ত্রের যথার্থ মূল্যের উপর শতকরা সত্তর আশী ভাগ শুল্ক বসাইয়া অথবা সাক্ষাৎভাবে বিলাতের বাজার বন্ধ করিয়া দিয়া বিলাতি শিল্প রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

এইরূপ না করিলে—শুল্কদ্বারা ভারতীয় বস্ত্র বিলাতের বাজারে প্রবেশের পথ বন্ধ না করিলে, ষ্টিমার আবিষ্কার সত্বেও প্যাইলি ও ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের চাকা ঘুরিত না। ভারতের শিল্প বলি দিয়াই ইংলণ্ডের কার্পাস শিল্প উৎপন্ন হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ তখন স্বাধীন দেশ হইত, তবে এই ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে পারিত; শুল্ক বসাইয়া বিলাতি বস্ত্র ভারতে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার পথ ভারতবর্ষকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বলিয়াই ইংলণ্ডের অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে পারে নাই। ইংলণ্ড রাজশক্তির অবৈধ প্রয়োগদ্বারা বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখিয়া এবং পরিশেষে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়াছিল—যে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট সমান সর্তে টিকিয়া থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব ছিল। (১০)

লর্ড সভায় হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কালে এডমাণ্ড বার্ক বলেন যে, কোম্পানীর লোকেরা ভারতীয় শিল্পীদের হাতের আঙ্গুলগুলি এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে দড়ি জড়াইয়া বাঁধিত যে, প্রত্যেকের হাতের মাংসগুলি একত্রিত হইয়া দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ও সংবদ্ধ হইয়া যাইত। তৎপর উহারা কাষ্ঠের বা লোহার গোঁজ হাতুড়ি দ্বারা ঐ সংবদ্ধ অঙ্গুলীগুলির মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিত। নিষ্পেষিত হইয়া হাতগুলি এরূপ বিকলত্ব প্রাপ্ত হইত যে হতভাগ্য নিরীহ এবং শ্রমশীল তাঁতীরা আর ইহজীবনে ঐ হাতদ্বারা কোন কিছু ধরিয়া মুখে তুলিতে সমর্থ হইত না।

১৭৯৬ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ অবধি সুরাটে ইংরাজের ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানে মিঃ রিচার্ডস নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দৈনিক-লিপিতে এইরূপ লেখা পাওয়া যায়—তাঁতিদের প্রতি অত্যন্ত নৃশংস অত্যাচার করা হইত। অত্যাচার ও জবরদস্তি এমন নির্মম হইয়াছিল যে, বহু তাঁতি এই অত্যাচার সহিতে না পারিয়া, তাহাদের জাত ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। (১১)

বঙ্গদেশের বস্ত্রশিল্প মসলিন নির্মাণে চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; মসলিন বাংলার গৌরব—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য।

তুলার চাষ॥ বাঙ্গলার মাটি ও জলবায়ু তুলার চাষের অতিশয় উপযোগী। এই স্থানে শিরজ, ফোটী বা দেবকার্পাস উৎপন্ন হয়; ইহাকে বামনীতুলাও বলা হইত। এই তুলার সুতায় উপবীত বা পৈতা অতি উত্তম হইত। এক একটি পৈতা এলাচির খোসার ভিতর রাখা যাইত। ইহা শিরজ তুলা ব্যতীত আদৌ সম্ভবপর হইত না।

শিরজ তুলার আঁশ দীর্ঘ, শক্ত ও সুশুভ্র। হিন্দুর ঘরের মেয়েরা শিরজ তুলা হইতে অসীম ধৈর্যের সহিত টাকুতে সুতা কাটিত। তাহাই মসলিন বস্ত্রের সুতা। এই সুতা দিয়া সুদক্ষ তাঁতিরা মসলিন তৈয়ারী করিত। মসলিন পৃথিবীর সর্বত্র গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল। গাছের ফলে তুলা উৎপন্ন হয়। সেই তুলায় মানুষের হাতে সুতা প্রস্তুত হয়; আর সেই সুতায় মাকড়সার জালের মত কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিত না। অতি পুরাতন সভ্যদেশ গ্রীস এবং মিশরের লোকেরাও মসলিন মানুষের তৈরি কি না সন্দেহ করিত।

মস্‌লিন ঘাসের উপর বিছাইয়া রাখিলে ঘাসই দেখা যাইত—কাপড় দেখা যাইত না। প্রবাদ আছে, কোন তাঁতি তাহার মস্‌লিনখানা ঘাসের উপর বিছাইয়া দিয়াছিল—একটি গাভী ঘাসের সঙ্গে সেই কাপড়খানাও খাইয়া ফেলে।

পারস্যের শাহ চ্যাসেফিকে তাঁহার দূত মহম্মদ আলি বেগ একখানি পাগড়ীর কাপড় পাঠাইয়া ছিলেন। কাপড়খানি ৬০ হাত লম্বা। ডিমের মত ছোট একটি নারিকেলের খোলা বিবিধ মণিমুক্তায় মনোহর করিয়া তাহার ভিতর ঐ মস্‌লিনখানি পাঠাইয়া ছিলেন। পারস্যের শাহ সেই বস্ত্রের সুক্ষ্মতা, শুভ্রতা ও বয়ন-নৈপুণ্য দর্শনে সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, এ সকল বস্তু মানুষে কি করিয়া তৈয়ার করিতে পারিবে! এটা আদৌ সম্ভবপর নহে। হয় কোন কীট (মাকড়সা শ্রেণীর) বা বেহেস্তের হুরীরা এই সকল তৈয়ার করিতে পারে!

কিন্তু সত্যসত্যই বাংলার মানুষ সেই বস্ত্র প্রস্তুত করিত। আমাদের দিদিমা ঠাকুরমা প্রভৃতি প্রাচীনারা একদিন ঐ মাকড়শার সুতার মত সুতা হাতের আঙ্গুলের ক্ষমতায় কাটিতেন। সেই সুতায় যে কাপড় হইত, তাহা দেখিয়া জগৎ সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইত।

ভারতবর্ষে প্রাচীন সভ্যতার অতি বড় সাক্ষী—কার্পাস বস্ত্র। কোন্ সুদূর অতীত কালে রচিত ঋগ্বেদ সংহিতা নামক গ্রন্থেও কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুদিগেব প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থেও সুক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কথা রহিয়াছে। প্রাচীনকালে সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র গ্রীসদেশে ভারতীয় বস্ত্রের প্রশংসা ছিল। ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন।

১৩৪০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবন বটুটা সপ্তগ্রামে আগমণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "সুক্ষ্ম কার্পাস সূত্রে প্রস্তুত অতি উত্তম বস্ত্র, লম্বা ত্রিশ হাত, মাত্র দুই 'দিরামে' (এক দিরামে ষোল নয় পয়সা হইত) আমার সম্মুখে বিক্রয় হইয়াছে।" (১২) ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ সপ্তগ্রামের তিন মাইল দূরে পর্তুগীজদের হুগলী শহর দেখিয়াছিলেন। তাহারা ইহাকে পোর্ট পিকানো বলিত। তখন এদেশে ধান, চিনি, ঘৃত পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যাইত। পশুলোমজ ও কার্পাস সুতার সুন্দর সুন্দর বস্ত্র এখান হইতে ভারতের নানা স্থানে এবং সুমাত্রা মলক্কশকাদি দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। ঘাস হইতে বোরুয়া নামে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা দেখিতে অতি সুশ্রী এবং সুন্দর রেশমের মত মসৃণ ও চাকচিক্যবিশিষ্ট।

অনেকের ধারণা যে, মসলিন কেবলমাত্র ঢাকা জেলাতেই প্রস্তুত হইত; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বাঙ্গলার সর্বত্র মসলিন প্রস্তুত হইত এবং তাহা বহু প্রকারের হইত। তবে ঢাকার মসলিন সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। নিম্নে কয়েক রকম মসলিনের পরিচয় প্রদত্ত হইল :

১। মল্‌মল্ খাস—ইহাই শ্রেষ্ঠতম মসলিন; শিরজ-তুলাতে সূতা কাটিয়া এই মস্‌লিন তৈয়ারী করা হইত। কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, আবদুল্লাপুর, সোনারগাঁও কাপাসিয়া, তেজগাঁও, সপ্তগ্রাম, ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থানেই প্রধানতঃ মলমল খাস প্রস্তুত হইত। একমাত্র দিল্লীর সম্রাট ও বেগমগণই মলমল খাস ব্যবহার করিতেন। অন্যত্র ইহার বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল।

এই মস্‌লিনের টানায় ১৮০০—২০০০ সূতা থাকে। এক-অর্ধ (আধি) থানের ওজন ৮ তোলা ৵৹ আনা মাত্র। এই থান একটি অঙ্গুরীয়ের ভিতর দিয়া টানিয়া বাহির করা যাইত।

২। 'সরকার আলি'ও ঐ শ্রেণীর বস্ত্র। ইহার টানায়ও ১৯০০ সূতা থাকিত। ইহাও দিল্লীর সম্রাটের একচেটিয়া ছিল। একবার সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব অন্দরের নায়েবন্বেগম মহলে তাঁহার কন্যা জেবউন্নিসার কক্ষে উপনীত হইয়া পর্দা সরাইতে লক্ষ্য করিলেন যে, কন্যার গায়ে কাপড় নাই। সম্রাট্ পর্দার বাহিরে থাকিয়া কন্যাকে গায়ে কাপড় দিতে বলিলেন। কন্যা উত্তর করিলেন—বাবা, আমার গায়ে সাত খানি মস্‌লিন জড়ান আছে।

৩। ঝিনা বা ঝুনা বা ঝিন্নি—ইহাও মলমল খাসের সমকক্ষ। ২০ গজ×১॥ গজ কাপড়ের ওজন ৮॥ আউন্স। সেকালে সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা ও নর্তকীরা এই মূল্যবান ঝিনা ব্যবহার করিত।

৪। রঙ্গ বা রঙ—ঝিলাতে পাকা রং করা হইলে তাহার নাম হইত 'রঙ্গ্ ঝিনা'।

৫। আব্‌রোঁয়া—(আব্—জল, রোঁয়া—প্রবাহ) অর্থাৎ নির্মল জল-প্রবাহ। ইহা জলে ভিজাইলে জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, পৃথক অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না; ২০×১॥ গজ কাপড়ের ওজন ১০॥ আউন্স। টানায় ৭০০ সূতা।

৬। 'জঙ্গল খাসা'—(খোসা—উত্তম) ইহা জঙ্গল বাড়ীতে তৈয়ারী হইত। কেহ কেহ বলেন, জঙ্গল খাসা সোনারগাঁ আড়ং হইতে প্রচারিত হইত। শতায়ু গোবিন্দ বসাক বলিয়াছেন যে, ইহা একমাত্র জঙ্গল বাড়ীতেই প্রস্তুত হইত।

৭। 'তরন্দম'—ইহার প্রধান অর্থ, আঙ্গুরাখা বা অঙ্গরক্ষা। ইহা প্রায় জামার জন্যই ব্যবহৃত হইত। ২০×১ গজ কাপড়ের ওজন ১৫।১৭ আউন্স।

৮। (ক) 'সুবনাম' (ঊষার নীহার) ও (খ) 'সবনাম' (সান্ধ্য-শিশির) এই উভয় মস্‌লিনই অতি সূক্ষ্ম। নব দূর্বাদলের উপর বিছাইয়া দিলে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। ২০×১॥ গজ কাপড়ের ওজন ১০ আউন্স।

৯। 'আলবাল্লা'—অর্থ, শৌখিন সৈনিকের পোশাকের উপর দামী উড়ানী। সূতাগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট।

১০। তঞ্জাব—ইহা দেহের অলঙ্কার স্বরূপ। এই বস্ত্র পরিধান করিলে লোকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। ২০×১॥ হাত কাপড়ের ওজন ১০—১৮ আউন্স।

১১। নয়নসুখ বা নয়নসুখ—আবুল ফজল বলেন, ইহার নাম 'তন্‌সুখ'। ইহা একটু মোটা; ১০ হইতে ২৪ গজ দীর্ঘ, প্রস্থ ১॥ গজ। দাম ৮০্ টাকা।

১২। সুরবতী—ইহা মাথার পাগড়ীর কাজে ব্যবহার কবা হইত। দৈর্ঘে ২০—২৫ গজ, প্রস্থে আধ গজ। ওজন প্রায় ১২ আউন্স।

১৩। সর্‌বতী—ইহার অর্থ মোচড়ান। ইহাও পাগড়ীর জন্য ব্যবহার হইত।

১৪। কুমীস্—শৌখিন জামার কাপড়। ২০×১ গজ, ওজন ১০ আউন্স।

১৫। জামদানী—ইহা শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন। বিবিধ চিত্র ও ফুলকাটা সুসূক্ষ্ম

মস্‌লিন। তাঁতের সাহায্যে শিল্পীদের দক্ষতায় ইহা কারুকার্য খচিত হইয়া উঠিত। জামদানীর কয়েকটি শ্রেণীভেদ ছিল, তাহা এইরূপ ঃ

(ক) কেবলমাত্র শুভ্র মস্‌লিনের সাহায্যে ফুল ও চিত্র কাটা।

(খ) সুসূক্ষ্ম রেশমের সাহায্যে ফুল ও চিত্র কাটা।

(গ) বিবিধ বর্ণসংযোগ উর্ণার সুতায় ফুল কাটা।

এই সমুদয় শিল্পকার্য হিন্দুর ঘরের বৌ-ঝিরা সূচীর সাহায্যে সম্পাদন করিত। ইহাতে তাহাদের যশঃ ও অর্থ উভয়ই লাভ হইত।

জামদানীর নানা প্রকার বুনন ছিল, এইজন্য ইহাদের বিভিন্ন নামও হইত। যথাঃ— পান্নাহাজার, ডুবিয়া, তোড়দার, করেলা, গেদা, সবুরশা, গুল্‌বদন বা গোলবাতান, আনার দানা, মেল, জলবার, দুবলীজাল, আনারকলি ইত্যাদি।

১৬। কাশিদা—ইহা অতি সূক্ষ্ম ও শৌখিন বস্ত্র। আসাম জাত সর্বোৎকৃষ্ট মুগা সুতায় উত্তম কাশিদা প্রস্তুত হয়। মুগা ও রেশম মিশ্রিত করিয়াও কাশিদা প্রস্তুত করা যায়। কেবল রেশম দ্বারাও কাশিদা প্রস্তুত হইত। কুঠা ও রুমী, নৌবুটি, আজিজুল্লা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন কাশিদা পরিচিত।

ফরাসডাঙ্গার তাঁতের কাপড়ের খ্যাতি এখনও লুপ্ত হয় নাই। পূর্বে এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বিলাসিসমাজে বিশেষ আদরণীয় ছিল। চন্দননগরের মসলিনের কথা বিখ্যাত ফরাসিস্‌ উপন্যাসে লিখিত আছে।

সকল প্রকার মস্‌লিনের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সকল মসলিনই অল্পাধিক সূক্ষ্ম ও মনোহর। এই অঞ্চলের চল্‌তি মস্‌লিনগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইলঃ

১। মলমল খাস ২। আব-রোঁয়া ৩। ঝুনো বা ঝিনা ৪। সবনাম ও সুবনাম ৫। খাসা ৬। রঙ বা রঙ্গ ৭। সরকার আলি ৮। আল্‌-বাল্লা ৯। তঞ্জাব ১০। নয়ানসুখ ১১। বদনখাস ১২। জঙ্গলখাস ১৩। উর্ণ ১৪। সরবতী ১৫। সাঙ্গাতী ১৬। তরন্দম ১৭। জল-বার ১৮। জামদানী ১৯। কাশিদা ২০। হাম্মাম ২১। কাগজসাহী ২২। বুলবুল চশম ২৩। আধি ২৪। গুল্‌বদন ২৫। আনারকলি ২৬। কপোতের খোপ ২৭। আনার দানা ২৮। নন্দনসাহী ২৯। কুন্ডীদার ৩০। সক্‌তা ৩১। পাছাদার ৩২। বদন খাসা ৩৩। কারেলা প্রভৃতি।

ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার Art Manufactures of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন মিসর তাহার পিরামিড্‌ সকল নির্মাণ করিতেছিল, সলোমন যখন জেরুজালেমে রাজত্ব করিতেছিলেন, রোমিউলাস যখন রোম নগরীর স্থাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন, হারুণ-উর-রসিদ যে সময়ে বাগদাদের জনপদে ছদ্মবেশে নৈশ ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলেন, বর্তমান হইতে সেই অতিদূর অতীতের বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় তন্তুবায়গণ এই মসলিন নির্মাণে নিয়োজিত থাকিত। সূক্ষ্মতা ও নির্মাণ-পারিপাট্যই মসলিনের মূল্যবত্তার কারণ। এই পারিপাট্য সাধনকল্পে কষ্ট সহিষ্ণু ভারতীয় সূত্রকার ও তন্তুবায়গণ যেরূপ শ্রমশীলতা ও

নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কার্য সুখ্যাতি লাভ করিবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

আধুনিক বাষ্পীয় শক্তি দ্বারা চালিত তাঁত ও টাকুর সাহায্যে বস্ত্র ও সুতা প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবিত হইবার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী তীরে বাউড়িয়া কটন মিল নামে ভারতের প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়।

ফলবান বৃক্ষ ও ফুল॥ পূর্বে এই অঞ্চলে কফি উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু জেলার জলবায়ু কফির পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া, এই চাষ বর্তমানে হয় না। হুগলী জেলায় আম, কাঁটাল, নারিকেল, তাল, পেঁপে, খেজুর, বাতাবী লেবু, বেল, পাতিলেবু, সুপারি, পিয়ারা, আনারস, ডালিম, তেঁতুল, নোনা, কালোজাম, গোলাপজাম, তরমুজ, টেপারী, কামরাঙ্গা, বিলাতী-বেগুন, জামরুল, কলা, মিষ্ট কুমড়া, জোবির (Roselle) প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে উপন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র হুগলী জেলায় নারিকেল গাছ ভাল জন্মায়। এই গাছ তালজাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদ। তালগাছের মত ইহার কোন ডালপালা হয় না। ইহা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাত পর্যন্ত মাটির উপর শক্ত হইয়া সোজা আকাশের দিকে উঠিয়া যায়; ইহার মাথায় অনেক লম্বা লম্বা পাতা থাকে এবং মাথার কাছে নারিকেল জন্মে। নারিকেল গাছের সমস্ত জিনিষ আমাদের বিশেষ কাজে লাগে। নারিকেল গাছের পরমায়ু প্রায় সত্তর-আশী বৎসর পর্যন্ত হয়। প্রাচীনকালে নারিকেল হইতে অনেক ভাল ভাল খাবার তৈয়ারী হইত। নারিকেল হইতে তেল, নারিকেল ছোবড়ায় দড়ি, ইহার মালায় হুঁকা, উহার পাতায় জ্বালানী ও কাটি দিয়া ঝাটা তৈয়ারী হয়।

নারিকেল একটি জাতীয় সম্পদ। ঝুনা নারিকেল হইতে শাঁস, ছোবড়া ও মালা কিছুই ফেলা যায় না তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কুটির শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা দেশে গরম পাড়বার সঙ্গে সঙ্গে **কচি ডাব** কাটিয়া অযথা **এই জাতীয় সম্পদের অপব্যয়** করা হয়। গৃহস্থরা নগদ পয়সার প্রয়োজনে ডাব বিক্রয় করে, আবার তাহারাই পূজার সময় শরৎকালে বেশী দাম দিয়া ঝুনা নারিকেল খরিদ করে। দক্ষিণ ভারতে ডাবের জল কেউ খায়না বলিয়া ঝুনা নারিকেলের ব্যবহার তাহাদের সম্পদ দিয়াছে। জাতীয় স্বার্থে কাঁচ ডাব বিক্রয় বন্ধ করা উচিত এবং আরও অধিক পরিমাণে নারিকেল গাছ যাহাতে জন্মায় তাহার চেষ্টা করা সরকারের কর্তব্য।

অন্নদামঙ্গল রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ

"আম আমসত্ত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥"

এতদ্ভিন্ন আমলকি, হরীতকি, বহেড়া, শিরীষ, ঘৃতকুমারী, ধুতুরা, শতমূল, অনন্তমূল, পিপুল, চিরতা, গুলঞ্চ, কালকাসান্দ, আবাদা প্রভৃতি ভেষজ উদ্ভিদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

॥ হুগলী জেলায় খুব ভাল ভাল আম জন্মায় বলিয়া এই স্থানের একটু প্রসিদ্ধি আছে। 'হিমসাগর' নামে অতি উৎকৃষ্ট আমের আদিস্থান হইতেছে গরুটি এবং 'বিশ্বনাথ চাটুয্যে' নামক আমের উৎপত্তি হইতেছে চন্দননগর। হরিপাল থানার অন্তর্গত জোমাই-বাড়িতে উত্তরপাড়া রাজবংশের পূর্বে খুব বড় একটি আমের বাগান ছিল। এখনও এই জেলার প্রায় সমস্ত গ্রামে প্রচুর আম উৎপন্ন হয়।

বাঁশ, বেত, শর, প্রভৃতি গৃহনির্মাণের জিনিষও এইস্থানে যথেষ্ট জন্মে। এতদ্ব্যতীত দেবদারু, সেওড়া, বট, অশ্বত্থ, চালতা, ফলসা, নিম, জেয়োল, আমড়া, সজিনা, বাবুল, শিরিষ, কদম, ছাতিম প্রভৃতি গাছ অপর্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

হুগলী জেলায় নানা জাতীয় ফুল জন্মে; পর্তুগীজগণ বিভিন্ন স্থান হইতে বহুপ্রকারের ফুল এবং ফলের গাছ এই জেলায় প্রথম লইয়া আসে এবং তাহাদের ফুলের শখ ছিল বলিয়া, ভারতের মধ্যে বহু বিদেশী ফুলের গাছ এইস্থানে সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়।

গোলাপ, গাঁদা, যুঁই, চামেলী, চাঁপা, অপরাজিতা, পদ্ম, রজনীগন্ধা, কামিনী, শেফালী, বকুল, কেতকী, বেল, ডালিয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার ফুল এইস্থানে পাওয়া যায়।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী মিঃ ম্যাটিও রিপা (Mr. Matteo Ripa) নামে একজন ইটালিয়ান ভ্রমণকারী কলিকাতায় আসেন। কলিকাতা হইতে তিনি নৌকা করিয়া চন্দননগরে Sciantangor) যান; তথায় ফরাসী কোম্পানীর ডিরেক্টরের আমন্ত্রণে তিনি চন্দননগরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তথায় কাঁটাল আনারস ও পেঁপে খাইয়াছিলেন। তিনি কাঁটালের এক সুন্দর বর্ণনা তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে দিয়াছেন। তাহার বর্ণনার অংশবিশেষ এইরূপঃ

The tree of the size of a moderate oak and the fruit is of the size of a bag of middling size, about four palms long and proportionately thick. To eat the fruit, you take away the rind and eat the inner pulp together with some tender small black seeds, the taste being very good.

পোর্তুগীজদের দ্বারা আনীত ফল ও ফুলের গাছের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

সফেদা—ইহার আদিস্থান আমেরিকা।

বাঁশকেওড়া, বিলাতী আনারস্—ইহার আদিস্থানও আমেরিকা।

হিজলি বা কাজুবাদাম—ইহা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রথম আসে। চট্টগ্রাম ও ভারতের এবং লঙ্কার সমুদ্র-কূলবর্তী জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

আনারস—ইহা ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল হইতে বঙ্গদেশে আনীত হয়।

আতা ও নোনা—কানিংহামের মতে এই ফল দুটি এদেশের; কিন্তু ওয়াট্ এবং হব্‌সন্ বলিয়াছেন, ইহা পোর্তুগীজদের দ্বারা এদেশে আসে।

মাঠকলাই বা চিনেবাদাম—আফরিকা ও আমেরিকা হইতে ইহা আনীত হয়।

শেয়ালকাঁটা—ইহা সম্ভবতঃ আফ্রিকা হইতে আনীত হয়।

বিলম্বি—সম্ভবতঃ মালাক্কা হইতে ভারতে আনীত হয়। ব্যাণ্ডেলের পোর্তুগীজ গির্জায় অনেকগুলি এই গাছ এখনও দেখা যায়

কামরাংগা।

লাল বা গাচ মরিচ—পারনামবুকো হইতে আনীত হয়।

পেঁপে।

মনসা।

কমলালেবু, নরেঙ্গি বা নারেংগা—ইহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা এদেশেরই গাছ। ইহা পূর্ব হইতে যদিও ভারতে থাকে, পোর্তুগীজদের দ্বারাই বিশেষরূপে এদেশের সর্বত্র ইহার বিস্তার হয়।

জামরুল—ইহা মালাক্কা হইতে ভারতে আনীত হয়।

নীলও পোর্তুগীজদের দ্বারা আনীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

রাংগা আলু ও আলু (সাদা)—আফরিকা বা ব্রেজিল হইতে আসে এবং পোর্তুগীজরাই সম্ভবতঃ এদেশে আনয়ন করেন।

গাবভেরেণ্ডা—কথিত আছে ইহাও পোর্তুগীজদের দ্বারা আনীত হয়।

কৃষ্ণকেলী—১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে ইহা পোর্তুগীজদের দ্বারা আনীত হয়।

তামাক—১৫১৮ অব্দে প্রথম ডেকানে আনীত হয় এবং আনুমানিক ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান জেলালুদ্দিন আকবরের রাজত্বের শেষাংশ হইতে তামাকু সেবন এদেশে আরম্ভ হয়।

পেয়ারা—আমেরিকা হইতে আনীত।

কুঁচিলা—পোর্তুগীজ জেসুইট পাদ্রিদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়।

গাঁদাফুল।

ভুট্টা বা জনার—ইহাও উহাদের দ্বারাই আনীত। (পুরাতনী)

সম্প্রতি ভদ্রেশ্বরের নিকট সারদাপল্লীতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার ছয় বৎসর অক্লান্ত পরীক্ষার দ্বারা ডালিয়া ফুলের দুই রকম রং করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বাগানে যে ডালিয়া হয়, উহার অর্ধেক লাল ও অর্ধেক জাফরাণ রংয়ের। তিনি ঐ দোরংয়া ফুলের 'শ্রীসারদামা' নাম দিয়াছেন। তাহার এই ফুলের সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ

After six years' of intensive experiment the efforts of a florist in this district to grow a bi-coloured Daliah has been crowned with success. The flower, which now adorn the garden of Shri Debendra Nath Sarkar at Saradapalli, in Hooghly district, is half red and half saffron. Shri Sarker has named it "Shri Sarada Ma."

॥ আলু ॥

পূর্বে ভারতবর্ষে আলুর চাষ হইত না; পোর্তুগীজগণ ব্রেজিল হইতে সাদা আলু ও রাংগা আলু আনিয়া হুগলীতে উহাদের প্রথম চাষ করে তাই হুগলী জেলার একটি বড়

চাষ 'আলু'। বড় বড় ধনীরা এই জেলার নানা স্থানে 'ঠাণ্ডাঘর' নির্মাণ করিয়াছেন এবং তথায় বৎসরে কয়েক লক্ষ মণ আলু বীজ হিসাবে রাখিয়া অত্যধিক মাত্রায় মুনাফা করিতেছেন। কিন্তু এই ঘরে বীজ রাখিয়া বিপুল সংখ্যক কৃষক সর্বশ্রান্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন কারণেই হউক উক্ত ঘরগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যর্থতা বা কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে আলু বীজগুলি বাহির করার কয়েক দিনের মধ্যেই উহা পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। যাহার ফলে কৃষকদের অধিক মূল্যে বর্মা, রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশ হইতে আগত বীজ ক্রয় করিয়া এবং তদুপরি অত্যধিক মাত্রায় খইল, সার প্রভৃতি ক্রয় করিয়া চাষ করিতে হয়।

অপরদিকে যখন আলুর মূল্য নিম্নগামী সেই সময় চাষীদের কম দরে আলু বিক্রয় করিলে কোনমতেই লাভ হইবে না। অথচ দরিদ্র, কৃষককুলকে উৎপাদিত আলু বিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। বড় বড় ধনী ব্যবসাদারগণ যাঁহারা কোনদিন জমির ধারে যান না, তাঁহারা এই সস্তাদরের আলু খরিদ করিয়া গুদামজাত করিয়া এবং উহার দর বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ চাষীদের ঘর হইতে সমস্ত আলু নিঃশেষিত হইলে, তখন উক্ত গুদামজাত আলু বাজারে বাহির করে এবং উহারা মোটা টাকা মুনাফা পায়। আর যাহারা রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করিয়া এই শস্য উৎপাদন করিল, তাহারা ঋণ শোধ করিতেই সর্বস্বান্ত হয়। ইহার প্রতিকার না হইলে কৃষককুলের উন্নতি হইবে না।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশবাসী আশা করিয়াছিল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, অন্যায়, অনাচার দূর হইবে, দেশবাসী সুখে ও শান্তিতে দিন যাপন করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অবহেলায়, অবজ্ঞায় এই কৃষককুলের অবস্থা ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। অথচ ভারতবর্ষের এক বিরাট জনসমুদ্র হয় কৃষিজীবি নতুবা কৃষিশ্রমিক। এই সমস্ত সাধারণ, দরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে আজ দেখিবার কেহ নাই। ফলে সমাজের বৃহৎ একটা অংশ ক্রমশঃ পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। কৃষিকার্য করিয়া যে দেশের বিপুল অধিবাসী জীবনধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের কথা চিন্তা করা সকলেরই কর্তব্য। দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মঙ্গলার্থে সরকার নানা আইন-কানুন প্রণয়ন করিতেছে, বিভিন্ন গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু এই কৃষকশ্রেণীর উন্নতিকল্পে, কৃষির উন্নতিকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা অত্যন্ত নগণ্য। বড় বড় শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে. কিন্তু দেশে উপযুক্ত খাদ্যোৎপাদন না হইলে, শিল্প সংস্থার জন্য কাঁচা মালের উৎপাদন না হইলে, কোন পরিকল্পনাই সার্থক হয় না।

হুগলী জেলার কৃষকদের প্রসঙ্গে বলা যায় এখানকার প্রধান চাষ—ধান ও আলু। এই চাষের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত জল সরবরাহ, উন্নত ধরণের সার ও বীজ সরবরাহ ও দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া চাষের পূর্বে কিছু ঋণদান।

এক একরে ৮২·২৬ মণ ধান্য উৎপাদন—১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে চুঁচুড়া রাষ্ট্রীয় কৃষি বিদ্যালয়ে হুগলী জেলা শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায়, ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের ধান্য উৎপাদন প্রতিযোগিতায় আরামবাগ মহকুমার ইয়াদপুর গ্রামের শ্রীদুর্গাপদ কোনার এক একরে ৮২·২৬ মণ ধান্য উৎপাদন করিয়া প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

আলুচাষীদের পুরস্কার

গত ২৪শে জানুয়ারী ১৯৫৩ শ্রীরামপুর টাউন হলে ১৯৫১-১৯৫২ সালের জন্য হুগলী জেলার আলু উৎপাদনে কৃতী চাষীদিগকে সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়। হরিপাল থানায় দ্বীপা গ্রামের শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা একরে ৫৬৩/৪ সের আলু উৎপাদন করিয়া প্রথম পুস্কার ৪০০৲ টাকা, চণ্ডীতলা থানার বনমালীপুরের শ্রীদুকড়ি ঘোষ একরে ৫১১/ মণ উৎপাদন করিয়া দ্বিতীয় পুরস্কার ২৫০৲ টাকা এবং সিংগুর থানার শ্রীরামপুর গ্রামের শ্রীসুবলচন্দ্র পাড়ুই একরে ৪৯১/১ সের উৎপাদন করিয়া তৃতীয় পুরস্কার ১৫০৲ টাকা পান। ইহা ব্যতীত, উহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউনিয়নের প্রথম পুরস্কার ৬০৲ টাকা হিসাবে পান। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীযুত সাহা ও শ্রীযুত ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দের শস্যোৎপাদনে আলু উৎপাদন প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রতি একর জমিতে ৫৮৯ মণ ২৫ সের ১৩ ছটাক আলু উৎপাদনে প্রথম পুরস্কার ২৫০০৲ টাকা ও ৫৫৪ মণ ৮ ছটাক আলু উৎপাদনে ২০০০৲ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীসুবল পাড়ুই প্রতি একরে ৫৫৪ মণ আলু ফলাইবার জন্য ১০০০৲ টাকা তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

আলুচাষের সুব্যবস্থা যাহাতে হয়, সেইদিকে প্রত্যেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম হুগলীতে এই চাষ হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। হেবারস্ জার্ণালে হেবার সাহেব লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে এখন আলু প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। অন্যান্য দেশের মত সাধারণের নিকট ইহা প্রথমে গ্রহণীয় হয় নাই, কিন্তু এখন আলু দেশের মধ্যে সর্বজনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে এবং ইউরোপীয় মণিবদের নিকট হইতে এই দেশ যে সকল ভাল জিনিষ পাইয়াছে, আলু তাহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। হেবার সাহেবের বর্ণনা এইরূপঃ

> Potatoes are becoming gradually abundant in Bengal ; at first they were here, as elsewhere, unpopular. Now they are much liked, and are spoken of as the best thing which the country has ever received from its European master.—Hebers Journal, Vol I, Page 13.

হুগলী জেলার কৃতি আলুচাষীগণের তালিকা

১৩৫৮ সালে হুগলী জেলায় আলুচাষ প্রতিযোগিতা হয়। যে সব আলুচাষী প্রতিযোগিতায় নাম দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় উৎপাদকের তালিকা দেওয়া হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা। হুগলী জেলার ১২৮টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪০টি ইউনিয়নের আলুচাষীগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিযোগিতা ইংরেজ রাজত্বে কখনও হয় নাই।

ইউনিয়ন	চাষীর নাম	গ্রাম	একর প্রতি উৎপাদন (মণ সের ছটাক)
সালেপুর	(১) রাধানাথ পাঁজা	ডহরকুণ্ডু	২৮৫ ২৮ ০
	(২) নরেন্দ্রনাথ বেরা	ঐ	২৮১ ০ ০

ইউনিয়ন	চাষীর নাম	গ্রাম	একর প্রতি উৎপাদন (মণ সের ছটাক)		
কিশোরপুর	(১) নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	মদনবাটী	২৬৪	২৪	০
	(২) চন্দ্রচূড় সামন্ত	গুজরাট	২৬৪	১২	০
বন্দীপুর	(১) ভদ্রেশ্বর দাস	নবাসন	২৭৫	৫	০
	(২) যোগীন্দ্রনাথ দাস	বন্দীপুর	২৫১	২	০
সিঙ্গুর	(১) সত্যসাধন বাগ	অপূর্বপুর	৩৬৩	২৬	০
	(২) সুরেন্দ্রনাথ দাস	আজবনগর	৩৪৪	২৬	০
বলরামবাটী	(১) সুবলচন্দ্র পাড়ুই	শ্রীরামপুর	৪৯১	১	৯
	(২) আশুতোষ বাঁদুড়ী	ভোলা	৪০৭	৩৫	৩
আনন্দনগর	(১) কানাই মল্লিক	দেওয়ানভেড়ি	৩৪৫	২৪	০
	(২) গোকুলচন্দ্র কোলে	ঐ	৩০৭	৩২	০
গোপালনগর	(১) নীলমণি ধোঁক	গোপালনগর	৬১৯	১৮	০
	(২) অনুকুলচন্দ্র পাল	মধ্যাহিজলা	৩৮০	৪	০
চাঁপাডাঙ্গা	(১) কালীপদ মণ্ডল	পিয়াসাড়া	২৬২	১০	০
	(২) মুক্তারাম মান্না	বীনগ্রাম	২৪৪	১০	০
বালীগোড়ী	(১) কৃষ্ণচন্দ্র সাহা	গোপভাঙ্গা	৩৩০	২০	০
	(২) ওসমান গণি	কুলুট	৩২০	২০	০
রামনগর	(১) সতীশচন্দ্র ঘোষ	রামনগর	২৫৬	৩৬	০
তালপুর	(১) গণেশচন্দ্র কোঙার	নছিপুর	৩২৩	২৮	০
	(২) মহম্মদ তাফিক	তালপুর	২৪৯	০	০
নালিকুল	(১) প্রহ্লাদচন্দ্র পাকিরা	দক্ষিণকুল	৪০৬	২	০
	(২) দাশরথি সাঁতরা	ন'পাড়া	৩৮৮	০	০
দ্বারহাটা-	(১) গিরীন্দ্রনাথ সাহা	দ্বীপা	৫৬৩	৪	০
গোপীনাথপুর	(২) রাসবিহারী সিংহ	ন'পাড়া	৩৩৫	২৪	০
জেজুর	(১) শেখ আব্দুল আদুদ	জীনপুর	৩৫৫	৮	০
	(২) শিবনাথ দাস	মান্নাপাড়া	৩২৮	৬	০
হরিপাল	(১) অন্নদাপ্রসাদ দাস	আমিনপুর	৩৭৬	০	০
	(২) বলাইচাঁদ দাস	মোহনবাটী	৩৭২	০	০
চণ্ডীতলা	(১) ভবানীচরণ পাল	পায়রাগাছা	২৫৬	৩৪	০
	(২) সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়	গরলগাছা	২৫৩	৩২	০
আকুনি-ইছাপুর	(১) ললিতমোহন বেলুন	...	৩১১	২৪	০
শিয়াখালা	(১) দুকড়ি ঘোষ	বনমালীপুর	৫১১	০	০
	(২) উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়	চকতাজপুর	৩০৩	১৬	০

ইউনিয়ন	চাষীর নাম	গ্রাম	একর প্রতি উৎপাদন (মণ সের ছটাক)		
জনাই	(১) লক্ষ্মীকান্ত কোলে	খোঁড়াগড়	৩৬১	৮	০
	(২) সাধনচন্দ্র কোলে	ঐ	২৬৬	০	০
রাধানগর	(১) বলরাম কোঙার	রাধানগর	৩৮৮	০	০
	(২) হারাধন ঘোষাল	মহেশপুর	৩৪৪	০	০
মাখলা-ন'পাড়া	(১) জিতেন্দ্রনাথ নস্কর	রঘুনাথপুর	৩৫০	৮	০
	(২) গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	কোন্নগর	২৭৭	১৬	০
প্যড়াম্বুয়া-সাহাবাজার	(১) গৌরমোহন পাঁজা	জগন্নাথপুর	২৯৫	১২	০
	(২) আব্দুল হাকি	শ্রীরামপুর	২৭০	৮	০
বেলমুড়ি	(১) শেখ আয়ুব আলি মণ্ডল	বলরামবাটী	৩১৬	৮	০
	(২) এককড়ি পাকিড়া	রামচন্দ্রপুর	২১৭	৭	০
ভাণ্ডারহাটী	(১) পতিত কোলে	চীনাগাড়ি	৩৭৮	০	০
	(২) শরৎচন্দ্র পাল	কবিলপুর	২৭০	০	০
মান্দাড়া	(১) যদুপতি সিংহ রায়	মান্দাড়া	৩৯৬	০	০
	(২) শেখ হিরু	ঐ	৩২৩	০	০
দশঘরা	(১) নিতাইচন্দ্র দে	দিধন	৩৩২	২০	০
	(২) খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	দশঘরা	৩০৭	৮	০
হরাল-দাসপুর	(১) শেখ আব্দুল জব্বার	কুলুপুকুর	২৮০	০	০
	(২) জনাব সোরাব আলি মণ্ডল	বাসুদেবপুর	২৫৬	৩০	০
সিমলাগড়-ভিটাসীন	(১) কার্তিকচন্দ্র দাস	আরতি	৩৩৬	০	০
	(২) শেখ আব্দুল করিম	ভিটাসীন	৩০০	০	০
আকনা	(১) ব্যোমকেশ ঘোষ	মেড়িয়া	২৫৮	৩	০
	(২) শ্যামাচরণ দাস	ঐ	২৪৮	১৬	০
মাকালপুর	(১) তারকচন্দ্র খাঁ	হাসনান	৩২৪	১২	০
	(২) অমূল্যচরণ সাহা	ধলরবাগারী	২৮৬	২৮	০
দাদপুর	(১) কালীপদ ঘোষ	তামিলা	২৭৯	১২	০
	(২) দুলালচন্দ্র ঘোষ	আইসা	২৬০	৪	০
পোলবা	(১) অক্ষয়কুমার পাল	ওঁচাই	৩২০	৮	০
	(২) বিষ্ণুপদ পাল	ঐ	২৮৮	৩২	০
আমনান	(১) পঞ্চানন বাউর	কাঁচারভেড়ি	২৫১	২৪	০
	(২) ফকিরচন্দ্র সান্যাল	ধীরেন্দ্রনগর	২৪০	২০	০
সুগন্ধা	(১) মৃত্যুঞ্জয় কোলে	কামদেবপুর	২৪৯	১২	০
	(২) পঞ্চানন আদক	মহেশপুর	২৪০	৩২	০

ইউনিয়ন	চাষীর নাম	গ্রাম	একর প্রতি উৎপাদন (মণ সের ছটাক)		
বাকুলিয়া-ধোবাপাড়া	(১) তিনকড়ি দাস	গোপালবাটী	২৪২	২০	০
গড়বাড়ী	(১) বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ	কাঠগড়া	৩৮২	০	০
	(২) হরিশরঞ্জন রায়চৌধুরী	গড়বাড়ী	৩০০	০	০
ধনিয়াখালি	(১) নারায়ণ পাল	তালবোনা	৩৪৬	৩২	০
	(২) গৌরমোহন পাত্র	মণিদেপুর	৩১৭	২০	০
সমসপুর	(১) তিনকড়ি মল্লিক	হাজিপুর	৩০৮	১২	০
	(২) আশুতোষ চক্রবর্তী	সমসপুর	২৯৩	০	০
ভাস্তাড়া	(১) পঞ্চানন ঘোষ	বোড়াল	৩০৮	৪	০
	(২) জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	৩৫৬	৮	০
গুড়াপ	(১) সুবলচন্দ্র আশ	গুড়াপ	৩২৬	৩২	০
	(২) গুইরাম হালদার	ঐ	৩১৭	১২	০

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের নিকটবর্তী দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যের বর্ণনা আছে, তাহা তাঁহার সময়ে যে বিনিময় হইত এই কথা অসংকোচে বলা যায়। উক্ত কাব্যে শ্রীমন্ত সওদাগর যে সকল দ্রব্য লইয়া বিনিময়ার্থে সিংহলে গিয়াছিলেন, তাহার একটি সুন্দর বিবরণ আছে। উহা হইতে আমাদের এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে তখনকার দিনে এই সকল দ্রব্যাদির ব্যবসা বাণিজ্য হইত; তাই উহার অংশবিশেষ এই স্থানে উল্লেখ্যঃ

"কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব,
শুণ্ঠীর বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল পাব,
বহেড়া বদলে গুয়া॥
সিন্দুর বদলে, হিঙ্গুল পাব,
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শোন বদলে, ধবল চামর,
কাঁচের বদলে নীলা॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব,
যোয়ানী বদলে জীরা।

আকন্দ বদলে, মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা॥
চৈয়ের বদলে, চন্দন পাব,
পাগের বদলে গড়া।
শুকতার বদলে, মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
হরিতাল বদলে গোরচনা পাব,
শুলফার বদলে মেথী।
আফিঙ্গ বদলে, হিঙ্গ পাব
জোড়ের বদলে ধুতি॥
চিনির বদলে, দানা কর্পূর,
আলতার বদলে মাটি।
সগন্নথে পঙ্গার, কম্বল পরি
বদল করিব পাটী॥
যব খড়িয়া, সার্ষপ-মসুর,
তিল মুগ লইয়া ছোলা।
কিনিয়া বহুতর, অন্যান্য সফর,
বদল পাত্যাছি গোলা॥
মাস মসুরী, তণ্ডুল বরবটী
আর বাটুলা চিনা।
বলদ শকটে, তৈল ঘৃত ঘটে,
সদাগর আনিল কিন্যা॥
গোধুম কিনে যব, খুজিয়া সর্ষপ,
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর, পুরিল বহুতর,
লবণের পাতিয়া গোলা॥

বদলে--পূর্বে বদল করিয়া জিনিসপত্র খরিদ করা হইত। **বিড়ঙ্গ**—গোলমরিচের মত এক প্রকার ফল; ক্রিমিঘ্ন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। **টঙ্ক**—সোহাগা। **প্লবঙ্গ**—বানর। **গাছফল**—কুঁচ। **পলা**—প্রবাল। **নীলা**—নীলবর্ণ একপ্রকার মূল্যবান পাথর। **মাকন্দ**—আম। **চৈ**—চইপাতা মসলারূপে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হইত। **পাগ**—পাগড়ী। **গড়া**—একপ্রকার মোটা কাপড়। **শুকুতা**—ঝিনুক অথবা শংখ। **বাটুলা**—গোলাকার। **চীনা**—একপ্রকার খাদ্য। **মাড়ুয়া**—একপ্রকার মারুয়া নামে ঘাস; মহীশূরে দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রধান খাদ্য।

॥ সংকেত সূত্র ॥

১ Report of Malaria in Bengal—Dr. Bentley.
২ The Climate, National & Economic Influence of Forests—J. Nisbet.
৩ Report on the Improvement of Indian Agriculture and Wilson's Early Annals.
৪ Hooghly District Gazetteers—L. S. S. O' Malley.
৫ The Minutes of Consultations of Fort William.
৬,৭ Firminger's Fifth Report, Vol. II.
৮ Observation on the Law and Constitution of India.
৯ Economic Condition of British India.
১০ Indian Industrial Commission's Report 1916-18.
১১ Ruin of Indian Trade—Major Bose.
১২ Sanguinetti's Ibn Batautah.
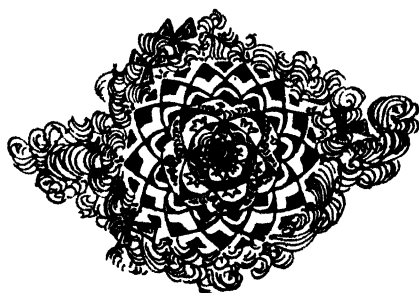
ভৌগোলিক
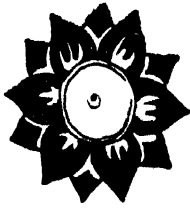
অবস্থান

বর্খতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে বঙ্গদেশ—রাঢ়, বগড়ি, বঙ্গ, বরেন্দ্র ও মিথিলা এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্যে বঙ্গ আবার লক্ষণাবতী, সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম এই তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত ছিল। এই তিন বিভাগের প্রধান শহর পূর্বোক্ত তিনটি নামেই অভিহিত হইত এবং এই শহরগুলি অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল।

In 1330 Muhammad Tughluk conqured Eastern Bengal also and divided into three provinces—Lakhnwati, Santgaon and Sonargaon including Dacca. (১)

প্রাচীন তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, পূর্বে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—পৌণ্ড্রবর্ধন এবং বর্ধমান।

From the records of the early Sena Kings, we know of only two Bhuktis in Bengal viz Paundra-Vardhana and Vardhamana. (২)

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে সের শাহের পূর্বে আর কোন নবাব বঙ্গরাজ্য নানা ভাগে নানা জেলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই।

কেবল গিয়াসুদ্দিন তোগলক্ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ

After this, Shere proceeded to Gour and subdivided the kingdom of Bengal into several provinces to each of which he nominated a District-Governor. (৩)

মুসলমান শাসনকর্তা সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, তাহার রাজস্বসচিব তোডরমল্ল রাজস্ব নির্ধারণ কল্পে, প্রাগুক্ত পাঁচটি বিভাগকে চতুঃবিংশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া "সরকার" নামকরণ করেন। কিন্তু তাহার সময়ে সুবা বাঙ্গলা সুরমা তীরবর্তী শ্রীহট্ট হইতে কৌশিকী ধৌত পূর্ণিয়া ও গঙ্গার দক্ষিণস্থিত কাঁকজল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর, হিজলী চটগ্রাম এবং কোচবিহার তখনও এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। মেদিনীপুর ও হিজলী উড়িষ্যার এবং চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; কোচবিহার সীমান্তবর্তী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট সাজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই সকল ভূখণ্ড বাঙ্গলায় আসে। হুগলী জেলা তৎকালে **'সরকার সাতগাঁও' 'সরকার সেলিমানাবাদ'** এবং **'সরকার মান্দারণ'** এই তিন বিভাগে বিভক্ত ছিল।

সাতগাঁও ॥ সরকার সাতগাঁও বর্তমান ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম একটি দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে রূপান্তরিত হইয়া, তাঁহার ইতিহাস বিখ্যাত অতুল বৈভবসম্পন্ন মহানগরীর সাক্ষ্য বহন করিতেছে; পৃথক অধ্যায়ে সপ্তগ্রামের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, এইস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'সরকার সাতগাঁও, তিপান্নটি মহালে বিভক্ত ছিল ও ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৪ হাজার, ৭ শত ২০ 'দাম' রাজস্ব দিতে হইত। নিম্নে 'আইন-আকবরী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উক্ত মহালের সমস্ত নামগুলি উদ্ধৃত হইল।(৪) এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, বহু স্থানের নাম বর্তমানে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

(১) বেনওয়া (২) কাতাউলি (৩) ফেরাসিংগড় (৪) ওকেরা (৫) আনওয়ারপুর (৬) এরসাদটুলি (৭) সাতগাঁও (৮) আকবরপুর (৯) বৌধেন (১০) বেউয়ান (১১) সেলিমপুর (১২) পুড়া (১৩) বারমওড়া (১৪) মাণিকহাটী (১৫) বীলগং (১৬) বালিন্দা (১৭) বাগওয়ান (১৮) বঙ্গবাড়ি (১৯) বালীয়া (২০) ফেলগাঁ (২১) বারমুধুতি (২২) তুরসরায় (২৩) হাভেলী সের (২৪) হোসেনপুর (২৫) হাজিপুর (২৬) বারবাকপুর (২৭) ধলগাপুর (২৮) রাণীহাট (২৯) সাগহাটী (৩০) সাকোটা (৩১) শ্রীরাজপুর (৩২) বন্দর (৩৩) শাগহাট (৩৪) কাসফল (৩৫) ফতেপুর (৩৬) কলিকাতা (৩৭) ব্যারাকপুর (৩৯) খরাড় (৪০) খুস্তাল (৪১) গিলারওয়া (৪২) মুকোরা (৪৩) মেটারী (৪৪) মেদনীমল (৪৫) মজাফারপুর (৪৬) মুন্ডাগাছা (৪৭) মাহিহাটী (৪৮) নদীয়া (৪৯) সাতেনপুর (৫০) সালকিয়া (৫১) হাতীকুন্দ (৫২) হায়াগড় এবং (৫৩) সরকার সাতগাঁও।

বাঙলার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের নামানুসারে পলাশী পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া মণ্ডলঘাট পর্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীর বিশেষতঃ পূর্ব তীরের অধিকাংশ ভূভাগ ব্যাপিয়া সরকার সাঁতগাঁর সৃষ্টি হয়। বন্দর সপ্তগ্রামও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাতগাঁ ৫৩ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ১ শত ১৮ টাকা জমা দৃষ্ট হয়।

এই মহালের একজন 'ফৌজদার' ছিলেন এবং তিনিই বিচার ও শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কোন প্রকার যুদ্ধের সময়, প্রয়োজন হইলে এই সরকার হইতে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতিক সৈন্য নবাবকে পাঠাইতে হইত। ফৌজদারের অধীনে 'কোতোয়াল' এবং তাহার অধীনে 'নাজিম' থাকিত।

The Fouzdar was the chief Police officer and judge of all crimes not capital ; Kotwal the head constable of the town was subordinate to him. The Nazim as surpreme Magistrate presided at the trial of capital offenders. (Field's Regulations)

সোলিমানাবাদ ॥ সরকার সোলিমানাবাদের অন্তর্ভুক্ত একত্রিশটি মহাল ছিল এবং নবাবকে পাঁচহাজার পদাতিক সৈন্য পাঠাইতে হইত। সরকার সোলিমানাবাদ হইতে ১ কোটী ৭৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯ শত ৬৪ 'দাম' রাজস্ব আদায় হইত বলিয়া লিখিত আছে। তৎকালে তাম্রনির্মিত স্থূল ও অসমান পয়সাকে 'দাম' বলিত এবং সম্ভবতঃ 'দাম' হইতে 'দামড়ি' কথার উদ্ভব হইয়াছে। ৪০ হইতে ৪৮ দাম এক টাকার সমান ছিল।(৫) হুগলী জেলার বর্তমান সমুদয় উত্তরভাগ এবং বর্ধমান ও নদীয়া জেলার দক্ষিণ ভাগের কয়েকটি পরগণা লইয়া এই সরকার গঠিত হইয়াছিল। সুলেমান সাহ সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন এবং পঁচিশ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন। বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দামোদর নদের তীরে এই সরকারের প্রধান শহর সোলিমানাবাদ (৬) অবস্থিত ছিল। নিম্নে সোলিমানাবাদের মহালগুলির নাম উল্লিখিত হইল :

(১) ইন্দ্রায়িন (২) ইসমাইলপুর (৩) আনুল্যা (৪) উলা (৫) বসুন্ধরী (৬) ভুরশুটা (৭) পাণ্ডুয়া (৮) বাজেমুর (৯) বালীচুঙ্গা (১০) চুটীপুর (১১) জুমহা (১২) জয়পুর (১৩) হোসেনপুর (১৪) ধরসা (১৫) রায়সক (১৬) হাভেলী সোলিমানাবাদ (১৭) সংসুঙ্গা (১৮) সবুশপুর (১৯) সুনগোলী (২০) ওমরপুর (২১) সুলতানপুর (২২) আলামপুরে (২৩) কবুজপুর (২৪) গোবিন্দ (২৫) মোহাম্মদপুর (২৬) মুলখার (২৭) মুকিল (২৮) নায়েবা (২৯) নেসাঙ্গ (৩০) নীপা (৩১) তালুকদার।

সরীফাবাদ হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দক্ষিণে প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত ভূভাগ লইয়া সরকার সোলিমানাবাদ গঠিত হইয়াছিল ইহাকে সাধারণতঃ সোলিমাবাদ বলিত। সোলিমানাবাদে ৩১ পরগণা ও ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৭ শত ৪৯ টাকা জমা দৃষ্ট হয়।

মাদারুণ ॥ সরকার মাদারুণ বা মান্দারের অন্তর্গত ষোলটি মহাল ছিল এবং ৯৪ লক্ষ৩ হাজার ৪ শত 'দাম' এই সরকার হইতে রাজস্ব দিতে হইত। সরকার মাদারুণ অর্ধ

বৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার আরামবাগ (তৎকালে জাহানাবাদ) ও হাওড়া জেলার পশ্চিমাংশ হইয়া মেদিনীপুর জেলার চিতুয়া ও মহিষাদল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যুদ্ধের সময় এই সরকারের ফৌজদারকে আড়াই শত অশ্বারোহী এবং সাত হাজার পদাতিক সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। নিম্নে মহালগুলির নাম উদ্ধৃত হইলঃ

(১) উনহুটি (২) বলগড়ন (৩) বীরভূম (৪) ভেওলভূম (৫) চিতুয়া (৬) চম্পানগরী (৭) হাভেলী মাদারুণ (৮) সায়ীভূম (৯) সুকেরভূম (১০) সাহাপুর (১১) কেইট (১২) মন্ডল ঘাট (১৩) নাগর (১৪) মিনাবাগ (১৫) হুসৌলী (১৬) সামার সনহুল।

সরীফাবাদ ও সোলিমানাবাদের পশ্চিম সীমায় বীরভূম হইতে রূপনারায়ণ ও দামোদরের সংগমস্থলের নিকট মন্ডলঘাট পর্যন্ত পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট বা পাচেট ও দক্ষিণে সুন্দরবনের ভাটি অবধি সরকার মাদারুণ বিস্তৃত ছিল। মাদারুণ পরগণার সংখ্যা ১৬ ও জমার পরিমাণ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৫ টাকা দৃষ্ট হয়।

১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের রাজত্বকালে তাহার দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা দ্বিতীয় বার বংগ, বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইয়া পুনরায় রাজস্ব বিভাগের সুবিধার্থে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি মহাল উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বংগদেশের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময় পোর্তুগীস দস্যুগণ পশ্চিম ও দক্ষিণ বংগে ভয়ানক উপদ্রব করিতে আরম্ভ করায় হুগলী ও হিজলীতে 'নওয়ার মহল' অর্থাৎ নৌ-সৈন্যের ব্যবস্থা করা হয়।

সুজার রাজস্ব বিভাগ ॥ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা সুবা বাংগলার এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন এবং তোডরমল্লের সময়ের ১৯টি সরকারের পরিবর্তে ৩৪টি সরকার ও ৬৮২টি মহালের পরিবর্তে ১৩৫০টি মহালে বিভক্ত করিয়াছিল। (৭) তখন পুরাতন সরকারের সীমার কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। এই সময় সপ্তগ্রাম হইতে সরকারের যাবতীয় অফিসাদি হুগলী শহরে স্থানান্তরিত করা হয়। হুগলী শহর পূর্বে পোর্তুগীসদের অধিকারে ছিল; কাশীম খাঁ পর্তুগীসদের বিতাড়িত করিয়া হুগলী অধিকার করেন।

Hughly having came into possession of the Moghuls, was established as the royal port of Bengal. All the public offices were withdrawn from Satgaon which soon declined into a mean village. (৮)

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হ্যামিলটন সাহেব বংগদেশে মোগলদের প্রধান বন্দর হুগলী পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হুগলী খুব বড় শহর হইলেও সুসংবদ্ধ নহে; মোগল সম্রাটের 'ফুরজা' বা **কাষ্টম হাউস** এইস্থানে অবস্থিত এবং বংগদেশের যাবতীয় দ্রব্য আমদানী বা রপ্তানী হুগলী বন্দর হইতেই হয়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

Hooghly is a town of a large extent, but illbuilt. It reaches about two miles along the river's side from the Chinchura before mentioned. The Bandel, a colony formerly settled by the Portuguese but the Moghul's Fouzdar govern both at present. This town of

Hughly drives a great trade because all foreign goods are brought thither for import and all goods of the product of Bengal are brought hither for exportation, and the Moghuls Furza or Custom House is at this place.

পর্যটক বারবোসা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ঃ

গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা বঙ্গরাজ্যে উপনীত হই। রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং উপকূলে অনেক নগর আছে। বন্দরে মুসলমান ও হিন্দু বাস করে। ইহারা নানারূপ পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে। প্রান্তদেশে 'বেঙ্গল' বলিয়া একটি নগর আছে। ইহার অধিবাসীরা শ্বেতকায় এবং বলশালী। নানাদেশীয় বৈদেশিকগণ এই নগরে বাস করে। এই দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও দেশ উর্বরা বলিয়া আরব, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বণিকগণও এই স্থানে সমবেত হয়। ইহারা সমৃদ্ধিশালী এবং মক্কাদেশীয় নৌকার ন্যায় অনেকগুলি নৌকার অধিকারী। এই সকল নৌকায় করিয়া বণিকগণ করমণ্ডল, মালাবার, কাম্বে, পেগু, সুমাত্রা, সিংহল ও মালাক্কায় গমনাগমন করে। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস, ইক্ষুদণ্ড, উত্তম আদা, ও লঙ্কা মরিচ উৎপন্ন হয়। এবং সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হয়। অধিবাসীরা এই সকল বস্ত্র পরিধান করে এবং ইহা অন্যত্র রপ্তানী হয়। এই স্থানে ময়দাও প্রস্তুত হয়; কিন্তু কেহ পাঁউরুটী প্রস্তুতে সক্ষম নহে। ইহা চামড়ার থলির ভিতরে পুরিয়া জাহাজে করিয়া অন্যত্র প্রেরিত হয়। বঙ্গদেশে নানাপ্রকার ফলও রক্ষিত হয়। এই স্থানে বহু পরিমাণে অশ্ব, গাভী, মেষ, এবং বড় বড় কুক্কুট পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় মুসলমান বণিকগণ হিন্দু মাতা-পিতার নিকট হইতে সন্তান ক্রয় বা অপহরণ করিয়া আনে। এই স্থানের রাজা মুসলমান ও ধনী এবং হিন্দু প্রজাগণ তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

১৬১২ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পর্যটক সিবাষ্টিয়ান মানরিক্ তিনজন ধর্মযাজকের সহিত খৃষ্টধর্ম প্রচার করিবার জন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তিনি হুগলীতে বহুদিন অবস্থান করেন এবং সেই সময় বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে সুবাদারের অত্যাচারের জন্য ঐ প্রদেশের সমধিক উন্নতি হইত না। যদি কোন ভূম্যধিকারী সরকারী খাজনা দিতে অসমর্থ হইতেন, তবে সুবাদার তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে পর্যন্ত কারারুদ্ধ করিতেন।

মানরিক্ এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের প্রজাগণ বেত্রাঘাত ভিন্ন কিছুতেই রাজস্ব প্রদান করিত না। যদি কেহ বিনা বেত্রাঘাতে রাজস্ব প্রদান করিত, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী তাহাকে কিছুদিন অনশনে বা অর্ধাসনে কাটাইতে বাধ্য করিত। বাঙ্গলার অধিবাসীরা মনে করিত—যে, আঘাত করে, সেই প্রভু; যে আঘাত করে না সে কুকুর। He who gives blows is a master ; he who gives none is a dog.

কুলি খাঁর রাজস্ব বিভাগ

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশের রাজস্বের তৃতীয় হিসাব প্রস্তুত করেন। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য সুজার ৩৪টি সরকারের পরিবর্তে বঙ্গদেশকে ১৩টি 'চাকলায়' ও ১৬৬০টি পরগণায় বিভক্ত করেন। (৯) উক্ত সময় হইতেই মহালগুলি 'পরগণা' নামে অভিহিত হইতেছে; তিনি হিন্দু জমিদারদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া, তাহাদিগকে নিজের অধীন করিয়াছিলেন এবং কোন হিন্দু জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়িলে, তিনি যেরূপ অত্যাচার করিতেন ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। তিনি মলমূত্রাদিপূর্ণ একটি পুষ্করিণীকে 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং কোন হিন্দু জমিদার সময়মত রাজস্ব দিতে না পারিলে, তাহাকে উক্ত কুলিখাঁর 'বৈকুণ্ঠ' দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত।

The imprisonment of Hindu zamindars who defaulted in payment of revenue was aggravated by torture and insults to their religion. For instance if, after the usual punishment revenue was not forthcoming, they were dragged through a cesspool of filth which is derision of Hinduism he called Baikunth the Hindu's paradise. The usual punishments included the bastinado, hanging up by the feet and the wearing of loose trousers inside which live cats were put. Embezzlement by Hindu collectors of revenue was punished by forcible conversion to Islam. (১০)

মুসলমান শাসনকর্তাদের এই ধরণের অত্যাচার তৎকালে প্রায়ই হইত এবং তৎকালীন গ্রন্থাদিতেও এইরূপ বিবরণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে বিজয়গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' হইতে দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইল :

"ব্রাহ্মণে পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে॥"

হিন্দু প্রজা যথা সময়ে কর দিতে অপারগ হইলে, মুসলমান শাসনকর্তা ইচ্ছা করিলে প্রজার মুখের মধ্যে থুতু দিতে পারিবেন; এবং হিন্দু প্রজা ইসলাম ধর্মের সমুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য, মুখে থুতু লইতে বাধ্য থাকিবেন, এইরূপ ধর্ম-বিরুদ্ধ আইনও তৎকালে প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি আকবরের সময় এই বর্বরোচিত হিন্দু-বিদ্বেষমূলক আইন রহিত হয়।

When the Collector or the Dewan asks them (i.e. the Hindus) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission. If the collector wishes to spit into their mouth, they should open their mouth without the slightest fear of contamination so that the collector may do so. The object of such humiliation and spitting

into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam the true religion and to show contempt to false religions. (১১)

মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গদেশ এক প্রকার হিন্দুদের দ্বারাই শাসিত হইত; আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, তৎকালে বঙ্গদেশ চব্বিশটি 'সরকার' এবং সাতশত সাতাশীটি মহালে বিভক্ত ছিল। এই স্থানের ভূস্বামী সকলেই কায়স্থ ছিলেন এবং রাজস্ব উনষাট কোটী চুরাশী লক্ষ উনষাট হাজার তিন শত উনিশ 'দাম' (অর্থাৎ ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৪ শত ৮২ টাকা) আদায় হইত। তাহাদের সৈন্য সংখ্যা তেইশ হাজার তিন শত ত্রিশ জন অশ্বারোহী এবং আশী হাজার, এগার শত পঞ্চাশ পদাতিক ও এগার শত সত্তর হস্তি এবং চারি হাজার চারি শত নৌকা ছিল বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে :

The Subah of Bengal consists of twenty four Sarkars and seven hundred eighty seven Mahals. The revenue is fifty nine crores eighty four lacs and fifty nine thousand three hundred nineteen dams in money. The Zeminders were all Kayasthas. The troops number twenty three thousand three hundred and thirty cavalry and eighty thousand eleven hundred fifty infantry and eleven hundred seventy elephants and four thousand four hundred boats.

রাজা তোডরমল্ল ॥ ভারত সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম রাজা তোডরমল্লের নাম ভারতবিখ্যাত, তিনি আকবরের অর্থনীতিবিদ্ মন্ত্রী ছিলেন এবং ভারতবর্ষে রাজস্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরকে সভাপতি করিয়া এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন।

তোডরমল্লের পিতার নাম ভগবতী দাস ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। কিন্তু বাল্যে তোডরমল্লের পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে তাঁহার মাতা বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া লালন পালন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি রাজদরবারে একটি লিপিকারের কাজ প্রাপ্ত হন এবং কিছুকাল পরে তোডরমল্ল সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতেই তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইতে সুরু হয়।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট আকবরের অধীন থাকিয়া খনেজামানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং স্বীয় বীরত্ব দেখাইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। আকবর তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হন এবং ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য তথায় যান এবং রাজস্বের এরূপ ব্যবস্থা করেন যে গুজরাটের আয় বহু বাড়িয়া যায়।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে পাঠান নরপতি দাউদ খাঁকে দমন করিবার জন্য আকবর

কর্তৃক যে সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়, তিনি তাহার সঙ্গে গমন করেন এবং মুনিম খাঁ সেই সময় তাঁহার সহযোগী ছিলেন। দাউদখাঁর সঙ্গে নানা স্থানে যে সকল খণ্ডযুদ্ধ হয়, তিনি তাহাদের প্রত্যেকটি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ বীরত্বপ্রকাশ করিয়া দাউদখাঁকে নানা স্থানে পরাস্ত করেন। বাংলার কররাণী বংশীয় পাঠান নরপতি দাউদখাঁ ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করিবা মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করেন এবং সেই চার বৎসর তাহার যুদ্ধ করিয়াই সময় অতিবাহিত হয়। দাউদ খাঁর পিতা সুলেমান কররাণী সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দাউদ খাঁ সিংহাসন অধিকার করিয়া সর্বপ্রকারে স্বাধীন ভূপতির ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিয়া আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করিবার জন্যই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দাউদ খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে পাঠান আধিপত্য বিনষ্ট হয় এবং মুঘল প্রাধান্য বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

দাউদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে তিনি বাংলাদেশে রাজস্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যাহার ফলে রাজস্ব ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ১ শত ৫২ টাকা, ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে তাহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুকাল লাহোরে শাসনকর্তা ছিলেন আকবরের রাজত্বের সপ্তবিংশ বৎসর (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) তিনি দেওয়ান এবং তৎপূর্বে গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি রাজস্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সুব্যবস্থার জন্য চারি প্রকারের সোনার মোহর ও তিন প্রকারের রূপার টাকা প্রচলন করেন। পূর্বে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব পত্র হিন্দীতে রক্ষিত হইত তিনি তাহার পরিবর্তে ফারসী ভাষার প্রবর্তন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় "টোডরানন্দ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন. উহা একধারে ধর্মশাস্ত্র ও জোতিষ গ্রন্থ বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। শেষ জীবনে তিনি হরিদ্বারে ধর্মচর্চা করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

সম্রাট আকবর রাজা তোডরমল্লকে তাহার প্রতিভার জন্য ভালবাসিতেন, তাহার কথায় সমস্ত কার্য করিতেন ইহা ব্রাহ্মণগণ পছন্দ করিতেন না। তজ্জন্য তোডরমল্লকে শূদ্র বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় বীর কিভাবে সম্রাট আকবরের অধ্যক্ষতায় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণ তাহা তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের সম্মেলনে স্থির সিদ্ধান্ত করাইয়া লন, তাহার সুন্দর বিবরণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ট পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত "অদ্বৈত্য সিদ্ধি" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। উহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য বেদান্ততীর্থ পরিশোভিত ও পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ সম্পাদিত 'অদ্বৈত্যসিদ্ধি' নামক পুস্তকের ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠায় "আকবরের সময় কায়স্থ তোডরমল্লের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন" সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা হুবহু উদ্ধৃত হইল।

॥ আকবরের সভায় কায়স্থ তোডরমল্লের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ॥

কায়স্থকুলসম্ভূত তোডরমল্ল সম্রাট আকবরের অর্থ সচিব ছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ম করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তোডরমল্লের অধীনতা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতেন যে "কর্মস্থানে আসিয়া প্রথমেই একজন শূদ্রের মুখ দর্শন করিতে হয়—ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? বাদশাহ ম্লেচ্ছ হইলেও রাজা বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশস্বরূপ জ্ঞান করিতে শাস্ত্রের আদেশ আছে। কিন্তু শূদ্রের নিকট মস্তক অবনত করিবার কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই" ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্য তোডরমল্ল ইহা শুনিয়া যদি বিরক্ত হইয়া কর্মান্তর গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের উন্নতির পথও উন্মুক্ত হয়।

তোডরমল্ল কায়স্থ হইলেও কায়স্থকে ক্ষত্রিয় জ্ঞানই করিতেন। তিনি ইহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং মনের দুঃখে কয়েক দিন রাজ সভায় আগমন স্থগিত রাখিলেন। বাদশাহ তোডরমল্লের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিলেন এবং তোডরমল্লকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তোডরমল্ল বাদসাহ সমীপে আসিয়া নিজ মনোভাব প্রকাশ কবিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন—"আমি ভারতের সমুদায় গণ্যমাণ্য পণ্ডিতবর্গকে নিমন্ত্রণ করিতেছি আপনার অধ্যক্ষতায় সভা হউক, তাঁহারা বিচার করিয়া আমার বর্ণ নির্ণয় করিয়া দিন। আমি যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া সব্যস্ত হই, তবে আমি আমার বর্তমান কর্ম করিব, নচেৎ আপনি আমায় অপর যে কর্ম করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব। আমি কায়স্থ, কায়স্থ শূদ্র নহে। ইহারা অতি পূর্বকালে ব্রাহ্মণবীর পরশুরামের অত্যাচারে "অসি" জীবীর কর্ম ত্যাগ করিয়া "মসি" জীবীর কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমি সেই কুলসম্ভূত শূদ্র নহি।"

বাদসাহ সহাস্যে সম্মত হইলেন। তোডরমল্লের যত্নে যথাসময়ে ভারতের সমুদায় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের এক মহতী সভা হইল, এবং আকবর বাদসাহ তাহার সভাপতি হইলেন। এই সভায় কাশী হইতে কাশীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত মহামতি মধুসূদনকেও *আহ্বান করা হইয়াছিল। বিচারে স্থির হয়—কাযস্থ শূদ্র নহে, ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। "কায়স্থবয়ান" নামক একখানি ফারসি পুস্তকে এই কথা বর্ণিত আছে। পণ্ডিত মধুসূদন কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে নিজ সাক্ষর প্রদানও করিয়াছিলেন।

॥ ইংরাজ অধিকার ॥

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মিরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চাকলা বর্ধমান, চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা ইসলামাবাদ (বর্তমান নাম চট্টগ্রাম) প্রদেশের সকল অধিকার ছাড়িয়া দিলে, এই স্থানত্রয়ে সর্বপ্রথম ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। (১২)

---

*আকবরের সভায় পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া খ্যাত। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা আজও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়ার অধিবাসী ছিলেন এবং কাশীধামে বসবাস করিতেন।

কোম্পানীর সহিত নবাব মিরকাশিমের যে সন্ধিবন্ধন ১৭ সফর ১১৭৪ হিজরা (২৭ সেপ্টেম্বর ১৭৬০) তারিখে হয় তাহার দুইটি ধারা (৪র্থ ও ৫ম) এই স্থানে উল্লেখ্য :

4. The Europeans and Telingas of the English Army shall be ready to assist the Nobab Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur in the management of all affairs, and in all affairs dependent on him, they shall exert themselves to the utmost of their abilities.

5. For all charges of the company and of the said Army and provisions for the field etc., the lands Burdwan, Midnapur and Chittagong shall be assigned and Sunnad for that purpose shall be written and granted. The company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries and will demand no more than the three assignments aforesaid. (১৩)

কুলি খাঁর সময়ে বঙ্গদেশের কেবল যে যথেষ্ট রাজস্ব-বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা নহে, বহু হিন্দুও তাহার অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া হিন্দু সমাজে আর স্থান না পাওয়ায়, দায়ে পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। কুলি খাঁ স্বয়ং ব্রাহ্মণ- সন্তান হইয়া, হিন্দুদের যে অনিষ্ট-সাধন করিয়া ছিলেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যাহা হউক মুর্শিদকুলি খাঁর আমলের 'চাকলা' বিভাগগুলিকে, বর্তমান বঙ্গদেশের জেলা বিভাগগুলির মূল ভিত্তি স্বরূপ এক প্রকার বলা যাইতে পারে।

ইংরাজ অধিকারের প্রথম হইতেই হুগলী জেলা সেই জন্য বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ছত্রিশ বিধানানুযায়ী বর্ধমানকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া, উত্তর বিভাগ বর্ধমান এবং দক্ষিণ বিভাগ হুগলী বলিয়া দুইটি পৃথক জেলা গঠিত হয় তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। বর্ধমান পৃথক জেলা হইলেও, বর্ধমান বিভাগের প্রধান নগর অদ্যাপি চুঁচুড়ায় অবস্থিত আছে এবং বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এই স্থানে বাস করেন। বর্ধমান বিভাগ বাঙ্গলার পশ্চিম প্রান্তে; এবং ইহার পরই বিহার প্রদেশ আরম্ভ হইয়াছে। বর্ধমান বিভাগের মধ্যে বর্তমানে (১) বর্ধমান, (২) হুগলী, (৩) হাওড়া, (৪) মেদিনীপুর (৫) বাঁকুড়া (৬) বীরভূম এবং (৭) পুরুলিয়া এই সাতটি জেলা আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শতবর্ষ রাজত্ব করিবার পর এ দেশের প্রজাবৃন্দের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা ১২৬৩ সালের আষাঢ় মাসের 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধের অংশবিশেষ এই স্থানে উল্লেখ্য :

ইংরাজ রাজ্যে প্রজার অবস্থা

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে এদেশীয় লোকেরা কি প্রকার অবস্থায় আছে? তাহা সকলেই মনে মনে বুঝিতেছেন. হিন্দু সাম্রাজ্য লোপ পরে হিন্দু নাম একদা হিন্দুস্থান হইতে লোপ হইয়াছিল, হিন্দুদিগের ধন ধর্ম স্বাধীনতা মানসম্ভ্রম সকলি ক্ষয়পথে গিয়াছিল, ধনসত্বেও লোক সুখভোগে বঞ্চিত থাকিত, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা একদা তিরোহিত

হইয়াছিল, অতি ভদ্রলোকেরাও শুদ্ধ বাঙ্গলায় পাঁচটি কথা কহিতে পারিতেন না, রাজ্য মধ্যে এত বিচারক ও বিচারালয় ছিল না এবং যে দুই চারিজন কাজি ও ফৌজদার ছিল তাহারাই প্রজাদিগের ধন-প্রাণের উপর কর্তৃত্ব করিত, এক্ষণে ইংরাজদিগের রাজত্বে দেশ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই পরিশ্রমার্জিত ধন নির্বিঘ্নে স্বাধীনতার সহিত ভোগ করিতেছে, সর্বত্রে বিদ্যার চর্চা হইয়াছে, লুপ্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা ভারতভূমিতে পুনদর্শন দিয়াছে, দেশীয় অনেক লোক সুবিদ্বান হইয়া উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম সম্পাদন করিতেছেন, বাণিজ্য ব্যবসায়ের অতীব উন্নতি হইয়াছে, আমরা একস্থানে বসিয়া অল্পমূল্যে বহুদেশীয় দ্রব্যাদি ভোগ করিতেছি, দেশমধ্যে বহুতর দেওয়ানি ফৌজদারি বিচারালয় স্থাপিত হইয়া প্রজাদিগের সত্বারক্ষা ও রাজ্যের শান্তি রক্ষা হইতেছে, সর্বত্র গমনাগমনের উত্তম পথ ও নদীর উপর সংক্রম হইয়াছে, একঘণ্টার মধ্যে তিনমাস পথ ব্যবহিত স্থানের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, এক মাসের পথ একদিনে গমনাগমনের উপায় হইয়াছে, অনেক বিষয়ে প্রজারা স্বাধীনতা পাইয়াছে। (কল্পতরু কর্তৃক সংকলিত)

॥ সিংহ ও সেন বংশ ॥

ভগবান বুদ্ধদেব অশীতিবর্ষ বয়সে ৪৮৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে কুশীনগরে যে বৎসর দেহত্যাগ করেন সেই বৎসরই বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপ অধিকার করেন। এই সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেনঃ

"আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিয়া জয়।
সিংহল নাম রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়॥"

সিংহপুর॥ রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশান্তর্গত শত যোজন ব্যাপী এক জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার 'সিংহপুর' নামকরণ করেন। রাঢ়ের সিংহপুর বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত 'সিঙ্গুর' বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ইহার সম্বন্ধে পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

সেন-রাজ বিজয় সেন বিক্রমপুর অধিকারের পূর্বে বর্মরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন "যে সময়ে বরেন্দ্র বা গৌড়ে পাল বংশ, বঙ্গে চন্দ্র বংশ ও রাঢ়ে শূর বংশ আধিপত্য করিয়াছিল, সেই সময়েই প্রথিত বর্ম বংশের অভ্যুদয় হয়।" এই বর্ম বংশের সম্বন্ধে সম্প্রতি ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার বেলাব গ্রামে যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্ম রাজ বংশ সিংহপুর হইতে আসিয়া বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন।

এই তাম্রশাসন খানি ভোজ-বর্মদেবের 'বেলাব-লিপি' বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহা হইতে ভোজ বর্ম পশ্চিম বঙ্গের সিংহপুর হইতে বিক্রমপুরে যাইয়া রাজত্ব করেন, তাহাই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

About this time probably occurred a migration of people from West to East Bengal and in the Belaava Plate we find Jatavarma's grandson Bhojavarma ruling at Vikrampur. (১৪)

এই তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সর্বপ্রথম সম্পাদন করেন এবং তিনি সিংহপুরের অবস্থান সম্বন্ধে মহাবংশে উল্লিখিত 'সিংহপুর' (Sinhapur) বা 'সিংহপুরকে' রাঢ়ের অন্তর্গত স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানিতে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম পৃষ্ঠায় ২৬ পঙক্তি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৩৫ পঙক্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহার আয়তন ১০১/২×৯১/২ ইঞ্চি; "ওঁ সিদ্ধি" বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং অক্ষর-গুলি একাদশ শতাব্দীর 'বঙ্গাক্ষর' বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিম্নে নবম পঙক্তিতে যাহা উৎকীর্ণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল:

"৯—শ্লাঘ্যো ভূজো বিভ্রতো
ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরে বান্ধবাঃ॥"

অর্থাৎ বর্মা উপাধিধারী অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া তাহারা সিংহ-বিবর-তুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ডক্টর নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয় বর্ম-রাজবংশের যেরূপ বংশ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইল।

১। বজ্রবর্ম
|
২। জাতবর্ম
|
৩। সামল বর্ম
|
৪। ভোজবর্ম
|
৫। জ্যোতিবর্ম
|
৬। হরি বর্ম
|
৭। তাঁহার অনামক পুত্র

The dynasty perhaps came to an end with the son of Hariburman and the sovereignty of Vikrampura passed into the hands of the Sena Kings. (১৫)

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে পাল রাজ বংশের প্রভাব হ্রাস হয়, এবং বর্ম নৃপতিরা, কাম্বোজ নৃপতিরা ও সেন নৃপতিরা যে সর্বপ্রথম রাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ 'সিংহপুরকে' রাঢ়ের অন্তর্গত স্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে একমত। সিংহপুর যে বর্তমান সিঙ্গুর তাহাই

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো প্রমাণ আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি। সিঙ্গুরের অন্যান্য বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

॥ বিজয় সেন ॥

বাঙ্গলার সেন রাজ-বংশ কোন সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিজয় সেনই সেন-রাজ-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি প্রথমে রাঢ় দেশের অংশ বিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল-রাজ অনন্ত বর্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন বিজয় সেন পাল-বংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম হেমন্ত সেন; বিজয় সেন ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাল বংশীয় রাজাগণের সহিত সেন বংশীয় রাজাগণের সদ্ভাব ছিল না; কারণ রামপাল যখন দুর্দশাগ্রস্থ হইয়া সাহায্যার্থে সেন রাজগণের নিকট আসিয়াছিলেন, তখন ইহারা তাহাদিগকে সাহায্য করেন নাই। বিজয় সেনই সেন-রাজ বংশের প্রধান নৃপতি এবং তাহার সময় হইতেই সেন-রাজ্য বিস্তৃত হয়। দেবপাড়া লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি বরেন্দ্রভূমি স্বীয় করতলগত করিয়া গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন, অতঃপর কামরূপাধিপতিকে এবং কলিঙ্গ নৃপতিকেও দমন করিয়া, পরে মিথিলার রাজাকে দমন করেন।

The real founder of the Sena Kingdom was Hemanta Sen's son Vijayasena who reigned from about 1100 to 1165. His wife was a members of the Sura family, and this alliance may have increased his prestige. He defeated Navya and Vira, attacked the lord of Gauda, humbled the King of Kamrupa, protected the King of Kalinga, made many lessor rulers captive and sailed his fleet up the Ganges. Vijayasena found Pala territory divided up among a number of petty dynasties of which till his time the Sens had themselves been one. (১৬)

বিজয়পুর॥ বিজয়সেনের বহু নৌবিতান ছিল এবং 'সেকশুভোদয়ে' লিখিত আছে যে, প্রত্যহ তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি নিজ নামানুসারে "বিজয়পুর" নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে "বিজয় সেন ভূরসুটে বিজয়পুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করেন" কিন্তু "বাঙ্গলার ইতিহাস" লেখক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার "বিজয়পুর ত্রিবেণীর নিকটে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন" এবং 'পবনদূতে'ও ইহা ত্রিবেণীর সন্নিকটে বলিয়া লিখিত আছে। কেহ কেহ রাজসাহীর নিকটবর্তী 'বিজয়নগর' গ্রামকেও

প্রাচীন বিজয়পুর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (১৭) কিন্তু বিজয়পুর নগর যে রাঢ়ে ছিল, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন এবং শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী ত্রিবেণীর নিকট বিজয়পুর ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সামন্তসেনের পৌত্র বিজয় সেন শূর বংশের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌড়ের পালরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি একে একে তীরভুক্তি (উত্তর বিহার) কামরূপ (আসাম) ও কলিঙ্গের অর্থাৎ উড়িষ্যা ও উত্তর মাদ্রাজ প্রদেশের রাজগণকে পরাভূত করেন এবং ত্রিবেণীর সন্নিকটে বা উত্তরে 'বিজয়পুর' নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

This city Vijayapura stood on the banks of the Ganges in or near the world sanctfiying country (Desam—Jajati Pavanam) where the Jamuna (Tapan Tanaya) stands off from the Bhagirathi. This undoubtedly points to the region of Triveni in the northern part of the Hoogly district. (১৮)

ত্রিবেণী এবং সপ্তগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সপ্তগ্রামই উক্ত সময়ে বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একমাত্র স্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ নগর ছিল। সপ্তগ্রামের একাংশই যে বিজয়সেনের 'বিজয়নগর' ছিল তাহা সুনিশ্চিত কারণ 'দেবপাড়া লিপি' হইতে তাঁহার বহু নৌবহর ছিল জানিতে পারা যায় এবং তৎকালে সপ্তগ্রাম ব্যতীত বঙ্গের আর কোন স্থানেই রাজকীয় বন্দর ছিল না। এই সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লংসাহেব ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিয়ুঃ পত্রে লিখিয়াছেনঃ

"Many years ago Satgaon the Royal Emporium of Bengal from the time of Pliny down to the arrival of the Portuguese in this country......"

নিম্নে বিজয় সেনের 'দেবপাড়া লিপি' হইতে দ্বাবিংশতি শ্লোকটি উদ্ধৃত হইলঃ

"পাশ্চাত্ত্য জয়চক্র কেলিষু যস্য যাবদ্
গঙ্গা প্রবাহ মনুধাবতি নৌ বিতানে
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥ ২২ ॥"

অর্থাৎ যাহার নৌবহর পাশ্চাত্য রাজচক্রের জয়রূপ কেলিক্রিয়াতে গঙ্গা-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করিলে পর শিবের মস্তকস্থিত নদী গঙ্গার জলে ভস্ম-পঙ্কে লগ্ন পরিত্যক্ত ইন্দুকলার ন্যায় তরীসমূহ শোভা পাইতেছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি পরলোকগমন করেন এবং বিলাস দেবী গর্ভজাত পুত্র বল্লাল সেন, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বর্তমানে সেন রাজগণের বংশলতা যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছিঃ

॥ সেন রাজবংশের তালিকা ॥

॥ বল্লাল সেন ॥

বিজয় সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন রাজা হন; তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করায় ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। বল্লাল সেন শাসন-দক্ষ নৃপতি ছিলেন এবং বাঙ্গলার কোন নৃপতি তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ হন নাই। কথিত আছে, শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য তিনি বঙ্গ-দেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি, মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে এক একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ সেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব-বঙ্গের ভার পান। পূর্ব হইতে গৌড়-রাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও উপবঙ্গ এই কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। (১১) তুর্কিগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বল্লাল সেন কর্তৃক পূর্বোক্ত বিভাগ যে অব্যাহত ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। এই বিভাগ সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে হ্যামিলটন সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইলঃ

1. Barendra—bounded by the Mahanda on the west ; by Padma or great branch of the Ganges on the south ; by the Korotoya on the East by the adjacent Governments on the north.

2. Banga—or the territory east from Korotoya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before etc afterwards...... the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

3. Bagri—or the Delta called also Dwipa or the island bounded on the one side by the Padma or the great branch of the Ganges : on another by sea and other bounded by the Hughli river or Bhagirathi.

4. Rarhi—bounded by the Hugli and Padma on the north and east and by adjacent Kingdoms on the west and South.

5. Mithila—bounded by the Mahanada and Gaur on the east, the Hugly or Bhagarathi on the south and on the west.

Hamilton's Hindusthan. Vol I.

বল্লাল সেন প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর কুলীনদের নিবাচন হইবে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন; তাহাতে অকুলীন সদাচারী ব্যক্তি পুনরায় কৌলিন্যের অধিকারী হইতে পারিবেন এবং কৌলিন্যপ্রাপ্ত দুঃশীল ব্যক্তিও কৌলিন্যভ্রষ্ট হইতে পারিবেন এইরূপ নিধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে নির্বাচনের সময়ে কৌলিন্য লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় নির্বাচন-প্রথা রদ হয় এবং কৌলিন্য বংশানুগত হইবে ইহা স্থির হয়। কৌলিন্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। নিম্নোক্ত গুণের উপর তখন কৌলিন্য মর্যাদা প্রদত্ত হয়ঃ

আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষ্মণম॥

বল্লাল সেন প্রদত্ত 'কৌলিন্য' ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে প্রায় সাতশত বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে অপ্রতিহত ছিল; বর্তমানে এই প্রথার কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটিয়াছে। কৌলিন্য-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যে সকল গ্রামে বসবাস করেন, পরবর্তীকালে সেই সকল ব্রাহ্মণদের নামানুসারে 'গাঞী' সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে; এই গ্রামগুলির বর্তমান নাম কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও, প্রায় সমস্তগুলিই রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত থাকায় 'বিজয়পুর' যে রাঢ়ের মধ্যে ছিল, তাহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

"ঘোষ বসু দত্ত মিত্র এই চরিজন।
ম্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন॥"

ঘোষ বংশ আকনা গ্রামে, বসু বংশ মাহীনগরে, দত্ত বংশ বালী গ্রামে এবং মিত্র বংশ বড়িশায় বসবাস করেন; এই গুলি সমস্তই সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল।

বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন এবং পৌত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন তাঁহাদিগের তাম্রশাসনসমূহে নব প্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখকালেও তাঁহাদের নূতন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলিন্যপ্রথা বল্লাল সেন কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাসে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

বল্লাল সেনের রাজত্বকালের একখানি তাম্রশাসন ১৩১৭ সালে কাটোয়ার নিকট সীতা-

হাটি গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লাল সেনদেব তাঁহার একাদশ রাজ্যাঙ্কে রাজমাতা বিলাসদেবীর সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে হেমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণা স্বরূপ বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত উত্তর রাঢ় মণ্ডলে বাল্লহিট্ঠ গ্রাম বরাহ দেবশর্মার প্রপৌত্র ভদ্রেশ্বর দেবশর্মার পৌত্র লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী শ্রীশ্রীবাসুদেব শর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনখানি কলিকাতা মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। বল্লাল সেনের রাজত্বকালে **কায়স্থ হরি ঘোষ** তাঁহার সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহামাণ্ডলিক উপাধিধারী কায়স্থ জাতীয় সামন্ত রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বল্লাল সেন প্রতিভাশালী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন: তল্লিখিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। "সেন রাজাগণ ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী ছিলেন; এই বংশটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে বাঙলায় আগমন করিয়াছিল। সামন্ত সেন নামক এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ইহারা পশ্চিম-বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিজয় সেনের "দেওপাড়া লিপি" হইতে এই রাজ বংশ "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" অর্থাৎ **কায়স্থ** ছিল বলিয়া জানা যায়।* নিম্নে পঞ্চম শ্লোকটি উদ্ধৃত হইলঃ

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতি সুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুল শিরোদাম সামন্ত সেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্ললশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষ্বপ্ সরোভি র্দশরথতনয় স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ॥"

অর্থাৎ শত শত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোদ্ধার উন্মূলন করিয়া পারদর্শী ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের কুলশেখর, সামন্ত সেন নামক ব্যক্তি সেই সেন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের তুলনায় যাঁহার যুদ্ধগাথা, সেতুবন্ধের স্খলদ জলধিজলের উত্তাল তরঙ্গ সম্পর্কে শীতল কচ্ছ প্রদেশ সমূহে অপসরোগণ কর্তৃক উচ্চৈস্বরে গীত হইত।

"আদৌ ব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় ইতি—ব্রহ্মক্ষত্রিয়" (২০) স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গের সেন রাজগণের জাতি' নামক প্রবন্ধে ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি নিম্নোক্ত তিন রকমে হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

(১) ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় দ্বারা

(২) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান এবং

(৩) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ধর্ম গ্রহণ করা।

ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি মূলতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে বঙ্গদেশে আসিয়া তাহারা চিত্রগুপ্ত বংশীয় লিপি-ব্যবসায়ী কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গের রাজবংশগুলি যে তাহাদের রাজ্য-লোপের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করা সুকঠিন। পাল বংশ ও বর্ম বংশ খুব সম্ভবতঃ কায়স্থ জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছে এবং সেন বংশ কায়স্থ ও বৈদ্য এই উভয় জাতির মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা।

অধুনা সেন বংশের জাতি লইয়া কেহ কেহ বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা সেন রাজগণকে কায়স্থ বলিয়া দাবী করেন, তাহাদের কথাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই উভয় জাতি এক বৃক্ষের দুইটি শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং এই উভয় জাতির অধিকাংশই যে ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উৎপন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

হুগলী জেলার ত্রিবেণী তীর্থ পর্যন্ত বল্লাল সেনের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়া ধোয়ী কবি রচিত 'পবনদূত' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

বল্লাল সেন প্রথমে শৈব ছিলেন কারণ তাঁহার আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ" বলিয়া তিনি সর্বাগ্রে মহাদেবের বন্দনা করিয়াছেন।

The record opens with the auspicious formula *Om Om Naman Sivaya* followed by an invocation to Siva as Ardha-Nariswara. (২১) সেন রাজাগণের সময়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির অর্চনা বঙ্গদেশে নানাস্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তিনি হিন্দু, ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন; এবং মগধ, ভুটান চট্টগ্রাম আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে হিন্দুধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি সিংহগিরি নামক এক ব্যক্তির প্ররোচনায় তান্ত্রিক মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের লোকান্তর হয়; তাহার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সেন রাজা হন।

The Hinduism of Ballal Sen was of Tantric kind. The Brahman genealogists assert that he sent numerous missionaries to Magadha, Bhotan, Chittagong, Arakan, Orissa and Nepal. (২২)

॥ লক্ষ্মণ সেন ॥

লক্ষ্মণ সেন ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে ষাট বৎসর বয়সে গৌড় সিংহাসনে বসেন। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড়-কলিঙ্গ-কামরূপ সেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা ছাড়া তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি গাহড়বালদের পরাস্ত করিয়া মগধ অধিকার করেন এবং প্রয়াগ পর্যন্ত অভিযান চালান। এই অভিযানের ফলে গাহড়বাল রাজা দুর্বল হইয়া পড়ে বলিয়া পরবর্তীকালে তাহাদের মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা একেবারে সম্ভব হয় নাই।

লক্ষ্মণ সেন যে রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন, সেই রাজ্য ও রাষ্ট্র ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ আত্মকর্তৃত্বের জন্য ক্ষীণ ও দুর্বল হইতে আরম্ভ হয়। স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের যে ব্যাধি পাল রাজ্যের কাল হইয়াছিল লক্ষ্মণ সেনের আমলে সেন রাজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিল। সেই সময় সুন্দরবনে ডোম্মনপাল, ত্রিপুরায় হরিকাল দেব এবং মেঘনার পূর্ব তীরে পুরুষোত্তম দেবের পুত্র মধুসূদন দেব প্রত্যেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা ছাড়া মুঙ্গের অঞ্চলে সেন বংশের সামন্ত এক গুপ্ত বংশের রাজা কৃষ্ণ গুপ্ত এবং তাঁহার পুত্র সংগ্রাম গুপ্ত তাঁহার রাজত্বকালেই স্বাতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের আমলে রাষ্ট্রের মধ্যে যখন এই অবস্থা সেই সময় পূর্ব দিক হইতে ভাগ্যান্বেষীদের মত বক্তিয়ার খিলজী বিহার ও বাঙ্গলায় আসেন এবং বিহার, গৌড় ও বরেন্দ্রী জয় করেন। কুতবুদ্দীন তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় উত্তর ভারতের সমস্ত হিন্দু রাষ্ট্রশক্তি ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় রাষ্ট্রীয় শান্তি শৃঙ্খলা এক-প্রকার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বক্তিয়ার ঠিক সেই সুযোগটি সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া বিহার ও বাঙ্গলা দেশ জয় করেন।

বক্তিয়ারের বঙ্গ-বিহার জয়ের কাহিনী (নিজামউদ্দীন ও সমাসসউদ্দীনের মুখে) শুনিয়া দিল্লীর ভূতপূর্ব প্রধান কাজী মৌলানা মিনহাজ-ই সিরাজউদ্দীন এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর যে বিবরণ 'তকবাৎ-ই-নাসেরী' গ্রন্থে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সমস্ত বিবরণ অতিরঞ্জিত এবং ঐতিহাসিক সত্য না হইলেও পরাজয়ের মনোভাব রাষ্ট্রকে যে সেই সময় পাইয়া বসিয়াছিল এবং আতঙ্কগ্রস্ত দেশের লোক যে দলে দলে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং লক্ষ্মণ সেন বিহারে, বাঙ্গলার পথে ও নবদ্বীপে শত্রুকে যে বাধা দিয়াছিলেন তাহা আদৌ কার্যকরী হয় নাই। সেই সময়-কার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে রাজা মন্ত্রী সেনাপতি বণিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই সেই সময় জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব বিশ্বাসী হইয়াছিল। জনসাধারণ যেখানে পলায়মান, উপদেষ্টা ও মন্ত্রীমণ্ডলী যেখানে পরাজয়ের মনোভাবে আচ্ছন্ন, জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রের নিয়ামক, সেইখানে কোন প্রতিরোধই যে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয় তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং লক্ষ্মণ সেন রাজা বলিয়া তাঁহার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

সেনরাজগণের রাজ্যাভিষেকের আনুমানিক কাল নিম্নোক্তরূপে রাখালবাবু কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে :

রাজা	রাজ্যাভিষেকের কাল
বিজয় সেন	১০৯৫ খৃষ্টাব্দ
বল্লাল সেন	১১৫৯ খৃষ্টাব্দ
লক্ষ্মণ সেন	১১৭৮ খৃষ্টাব্দ

বক্তিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেনরাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঠিক, কিন্তু যে ভাবে উহা বিবৃত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া আমার বিশ্বাস। গৌড় জয়ের প্রকৃত ঘটনা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। বক্তিয়ারের নদীয়া-বিজয় কাহিনী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নদীয়া পুনরায় হিন্দু-রাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বক্তিয়ারের অর্দ্ধ-শতাব্দী পর বাঙ্গলার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দীন য়ুজবক্ নদীয়া জয় করিয়া বিজয় কাহিনী স্মরণার্থে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ করাইয়া ছিলেন। সেই মুদ্রা কলিকাতা মিউ-জিয়মে সংরক্ষিত আছে।

গৌড় রাজ্য বিজয়ের পর লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বাঙ্গলা দেশে স্বাধীনতা যে অক্ষুণ্ণ

রাখিয়াছিলেন তাহা তকবাৎ-ই-নাসেরী গ্রন্থে মিনহাজ-ই-সিরাজউদ্দীন (রার্ভের্টি কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৫৫৮) লিখিয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মণ সেন দানশীল ও মহৎ রাজা ছিলেন; তাঁহার রাজত্ব কালের তপনদীঘি, সুন্দরবন, আনুলিয়া, মাধাইনগর, শক্তিপুর এবং গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত তাম্রশাসনগুলি হইতে তিনি প্রথম বয়সে শৈব এবং শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এইগুলিতে তিনি "পরম বৈষ্ণব", "পরম নরসিংহ" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। মাধাইনগর তাম্রশাসনখানি 'বীর্যগ্রাম পরিসর সমাবাসিত' স্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহাতে তিনি "গৌড়েশ্বর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। অন্যান্য শাসনগুলি বিক্রমপুরের 'জয়স্কন্ধাবার' হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

লক্ষ্মণ সেন পরাক্রমশালী নৃপতি, কবি, পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। হলায়ুধ তাঁহার ধর্মাধিকারী ছিলেন এবং তিনি "ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সভায় গোবর্ধনাচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী কবিরাজ এই পঞ্চ-রত্ন বিরাজ করিত।

"গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতি।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষণস্যচ ॥"

তাঁহার অমাত্য বটুদাসের পুত্র, শ্রীধর দাস কর্তৃক সংগৃহীত "সদুক্তি কর্ণামৃতে" লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে রচিত বহু কবির শ্লোক দৃষ্ট হয়। শিল্পকলায় গৌড় তৎকালে শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ধনুর্বিদ্যায় লক্ষণ সেনের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল এবং তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর অপর তীরে যাইয়া পড়িত বলিয়া 'সেকশুভোদয়ে' লিখিত আছে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং ধোয়ী কবির 'পবনদূত' বিরচিত হইয়াছিল। তিনি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনুকরণে 'পবনদূত' রচনা করেন। উহার আখ্যানভাগে, লক্ষ্মণ সেন দিগ্বিজয় করিতে যাইয়া ভারতের দক্ষিণ ভাগে মলয় পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হন, তথায় কুলয়াবতী নামক এক গন্ধর্ব কন্যা লক্ষ্মণ সেনের অপরূপ লাবণ্য ও শৌর্যে মুগ্ধ হইয়া, তিনি পবনকে দূত করিয়া লক্ষ্মণ সেনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও পথের নির্দেশ করিয়া দিতেছেন।

পবনদেব এই দৌত্য স্বীকার করিয়া মলয় পর্বত হইতে বহির্গত হইয়া বহু পথ অতিক্রম পূর্বক বৈদ্যবাটীর নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত হন; তথা হইতে গঙ্গার তীর দিয়া উত্তরমুখে অগ্রসর হইয়া ত্রিবেণী পশ্চাতে রাখিয়া বিজয়পুর নগরে উপস্থিত হন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ ত্রিবেণীর নিকটে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

'পবনদূতে' সুহ্মের একটি বর্ণনা আছে, নিম্নে তাহার কিয়দংশ বঙ্গানুবাদ করিয়া উল্লিখিত হইল:

গৌড় দেশ মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকা বলিতে কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভাবান; সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্ধগৌরীশ্বর মূর্তি বিরাজমান। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্প দূরস্থ। (২৩)

The literature seems to have flourished at his court, the most notable names being those of Jayadeva, author of the Gitagovindo, Halayudha and Dhoyi, author of the Pavanduta, an imitation of the celebrated Meghduta. (২৪)

লক্ষ্মণসেন পিতৃ প্রবর্তিত কুলবিধির উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে তিনি খলিফাদিগের ন্যায় ধর্মজগতের নেতা ছিলেন এবং তাঁহার বিচারে কেহ কোন দিন অবিচার লাভ করেন নাই। এই সম্বন্ধে ভিনসেন্ট স্মিথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

His (Lakshman Sena) family, we are told, was respected by all the Rais or Chiefs of Hindusthan and he was considered to hold the rank of hereditary Khalif or spiritual head of the country. Trustworthy persons affirmed that no one, great or small ever suffered injustice at his hands, and his generosity was proverbial. (২৫)

লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে যাইয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের সমীকরণ করেন এবং ১২০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে, তাঁহার পুত্র মাধব সেন রাজা হন এবং সম্ভবতঃ তিনি উক্ত স্থানে দশ বৎসর রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কাহিনী, মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ কর্তৃক রচিত "তকবাৎ-ই-নাসেরী" গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া যাঁহারা এই বীরকে এবং হিন্দুগণের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্তৃক গবেষণা দ্বারা বর্তমানে অমূলক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই আমার ধারণা; তথাপি যদি কেহ এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের কথায় বলিতে হয়—"সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বক্তিয়ার খিলজী বাঙ্গলা জয় করিয়াছেন, এ কথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে—সে কুলাঙ্গার।" "বঙ্গদর্শন" ১২৮৭ সাল,

তাঁহার রাজত্বকালে "লক্ষ্মণাব্দ" বা "লক্ষ্মণ সংবৎ" বলিয়া একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহা তাহার রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তৎকালে বঙ্গদেশ কিরূপ বিলাসে মগ্ন ছিল, তাহা প্রমাণার্থ 'পবনদূত' এবং কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন হইতে নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

লক্ষ্মণসেনের সময় বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর নিক্কণে চমকিত হইত। নিশীথে স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে দেশ মুখরিত হইত; প্রেমলিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্ভ্রান্ত হইত।"

॥ মুরারি শর্মা ॥

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সুহ্মদেশ মুরারি শর্মা কর্তৃক শাসিত হইত এবং সপ্তগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, তল্লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' নামক প্রবন্ধে "গঙ্গা বীচি বিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংশো" দেখিয়া উক্ত স্থানকে তিনি সপ্তগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন; কারণ তৎকালে রাঢ়ে গঙ্গাতীরে সপ্তগ্রাম ব্যতীত আর কোন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না।

মুরারিশর্মা লক্ষ্মণসেনের অভীষ্টদেব ছিলেন। এই সম্বন্ধে তৎস্থাপিত লক্ষ্মীদেবীর প্রণয়ী বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে 'পবনদূতে' যাহা লিখিত আছে, তাহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"তস্মিন সেনান্বয়ন পতিনা দেবরাজ্যা ভিষক্তো।
দেবঃ সুহ্মাদ বসতি কমলা কেলী কারো মুরারিঃ॥
পানৌ লীলাকমল সুকৃদ সৎসমীপে বহন্ত্যো।
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতি সমগাঃ কুর্বন্তে বাররামাং॥

অর্থাৎ সেখানে সেনবংশীয় নরপতির ইষ্টদেবতা মুরারি শর্মা দেবরাজ্যে অভিষিক্ত এবং তিনি সুহ্মদেশেই বসবাস করেন। সেখানকার বারবামাগণের হস্তে সকল সময়েই লালকমল বিরাজ করে এবং তাঁহাদিগকে দেখিলে নারায়ণের লক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাধিকার শেষ হয় এবং তাহার পর শত বৎসর সপ্তগ্রামে হিন্দুগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন এনং তুমুল যুদ্ধের পর সপ্তগ্রামের হিন্দু দুর্গে তিনি আপনার বিজয় পতাকা উড়াইয়া সপ্তগ্রাম দখল করেন ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সপ্তগ্রাম শাসন করেন, পরে ভুদিয়ার রাজার সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

In the early period of the Mahomedan rule Satgaon was the seat of the Governors of lower Bengal and a mint town. It was also a place of great commercial importance. (২৬)

সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পৃথক্ অধ্যায়ে যথাস্থানে করা হইবে; বঙ্গে মুসলমান অধিকার সম্বন্ধে ডডয়েল সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

Although the progress of the Mohammedans was slower in Eastern than in Western Bengal, by the middle of the thirteenth century all trace of Hindu rule has disappeared. (২৭)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ হইতে হিন্দুশাসন অদৃশ্য হয় বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। সপ্তগ্রাম ও পাণ্ডুয়া শীর্ষক অধ্যায়ে প্রমাণ সহকারে, তাঁহার উক্তি খণ্ডন করা হইবে।

লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুরে আবিস্কৃত তাম্রশাসন মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত ইহার দূতক। এই তাম্রশাসন দ্বারা লক্ষ্মণ সেনদেব বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম খাটিকায় বেতড্ড চতুরস্কে ৬০ দ্রোন ১৭ উন্মান ভূমি বাৎস্য গোত্রীয় শ্রীব্যাসদেব শর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বেতড্ড হাওড়ার অন্তর্গত বেতড় গ্রাম; পূর্বে ইহা একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল।

বড় বড় জাহাজ সপ্তগ্রাম যাইতে পারিত না বলিয়া বেতড়ে নঙ্গর করিত।

নিম্নে রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক প্রদত্ত মাধাইনগর তাম্রশাসনের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল ঃ

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন

সুহ্ম নামক দেশে অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীধল্ল সেন নামে, নৃপতিগণের ভূষণ-স্বরূপ, পঞ্চানন সদৃশ পূজ্য এক রাজা ছিলেন, যাঁহার শরীর ও অঙ্গুলি সকল সুন্দর শ্বেতপদ্মের মত কমল এবং তাঁহার ধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং যাঁহার সুযশঃ অতিথি-রূপে দুগ্ধসমুদ্রের অপর তীরে উপনীত হইত, যিনি নানা রত্নে বিভূষিত, মহা মহা ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্বেদবেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন এবং যিনি যজুর্বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তাঁহার বংশে নরপতি মন্মথ সেনের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার ও সুহ্ম দেশের মণিস্বরূপ ছিলেন। মন্মথ সেন মত্তবৃষের ন্যায় একাকী ঝম্ ঝম্ শব্দে প্রীতির সহিত ক্ষীর সমুদ্রে পতিত হইতেন এবং তিনি একান্ত সৎকার্যাভিলাষী রাজা ছিলেন। মন্মথ সেনের বংশে প্রদ্যুম্ন সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সৎকার্যের সমুদ্র, বিশুদ্ধধর্মা ও একান্ত নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, ক্ষমা ও ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেন, স্বীয় সম্পত্তির পুষ্টি-সাধন ও যজ্ঞাদি সৎকর্মের দ্বারা নিতান্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্ন সেনের পুত্র নৃপতিশ্রেষ্ঠ বীর সেন, অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্বদা জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার গুণরাশি পৃথিবীর সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি একান্ত শত্রুহন্তা ছিলেন। বীর সেনের অপর নাম ধৃতি ও ধীর সেন। তাঁহার পুত্র সামন্ত সেন, তিনি নিতান্ত জ্ঞানবান, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সৎক্রিয়াশীল ও কলঙ্কবিহীন রাজা ছিলেন। সামন্ত সেন পৃথিবীকে বীরশূন্য করত শান্তিরূপ জলের দ্বারা ধৌত করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্যাস্তের পরেও অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ (শিকার) করিতেন। তিনি রাত্রিতে রুধিরকণাকীর্ণ ধারবিশিষ্ট তরবারি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করত বীরগণের অন্বেষণ করিতেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন শত্রুগণের ঊর্ধ্ব-বিক্ষিপ্ত শল্যাস্ত্র দ্বারা বিনিষ্ট করত আপনাকে এবং সেনাগণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেন। হেমন্ত সেন মগধে বাস করিয়া বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন।

হেমন্ত সেনের ঔরসে নরপতি বিজয় সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিজয় সেন চন্দ্রের ন্যায় যশোবান্ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে মণি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইত। সংগ্রাম-সমুদ্রে তিনি ভীষণধ্বনি, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধি, ইন্দ্র-তুল্য অস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি অশেষ প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান এবং সৎলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। বিজয় সেন বিধি-পোষণ-বর্শাদিগের ঈশ্বর। সুকৃতি ও সুধীগণের সত্যস্বরূপ ছিলেন। শিক্ষা, সন্ধ্যা ও ক্ষমাশীল বিজয় সেন সর্বদা সত্য কথা বলিতেন ও তদীয় পূর্ব পুরুষ নিতান্ত ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেনের অক্ষৌণীনাম যশঃ-সমুদয়কে সর্বদা স্মরণ করিতেন।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন। তিনি লব্ধলক্ষ্য, তীক্ষ্ম দৃষ্টি বিশিষ্ট ও সকলের জ্ঞানদাতা ছিলেন। বল্লাল সেন স্বীয় রাজধানীতে থাকিয়া সর্বদা যজ্ঞাদি সৎকার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অম্বরতুল্য বীরত্ব যশঃ ক্ষীরসমুদ্র তীরবর্তী যোদ্ধৃগণেরও বীরত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ধর্মকার্যের অধীন তীর্থ-বিশ্বাসিব্যক্তিগণের তিনি ভূষণতুল্য ছিলেন। নরপতি বল্লালের শরীর অসুর বিনাশের একান্ত উপযুক্ত ছিল। তিনি নীচ জাতি, ক্ষুব্ধ পাপীগণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও বল নূতন।

তিনি যজ্ঞবৃত্তিতে সুরাসুর বিষ্ণুতুল্য ও উচ্চাধর্ম ছিলেন এবং নিশ্চয় জয়লাভ করিতেন। শুদ্ধ, শান্ত, সুশীল, ক্ষমা, দক্ষতা, যুদ্ধক্ষমতা, যুদ্ধবিধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিঘর্ষণের দ্বারা তিনি সর্বদা পৃথিবীর হিত ও উজ্জ্বল কুল সাধনে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ নিতান্ত যুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা দূরস্থ শত্রু সৈন্যগণও তাঁহার স্বীকার করিত এবং যজ্ঞাদি ক্ষমাবল ও ক্ষাত্রিয়োচিত বিচক্ষণতা হইতে কাপালিক মূর্তি মল্ল (এক প্রকার-শৈব ধর্মাবলম্বীয় শ্রেণীবিশেষগণও) তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। রাজা বল্লাল সেন নিতান্ত সুশীল ও ব্রহ্মণ্যষট্‌কর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার লক্ষ! বিদ্বান্ মত্ত! সম যম তুল্য যুদ্ধ-ধর্মে প্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। গৌড়েশ্বর বল্লাল, স্বীয় রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, সুবিধানস্থাপন ও সুন্দর ভবনাদি নির্মাণ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অসীম চক্রে কলঙ্কবিহীন নৃপতিগণও ক্ষণকালের মধ্যে প্রীতির সহিত করপ্রদানপূর্বক তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতেন। তাঁহার লক্ষ্য দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত গমন করিতেন। তিনি ভীম সংগ্রাম ও তীক্ষ্ম অনুসন্ধান দ্বারা কাশীরাজের সমরসাধ এবং রাজ্য শাসনাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্যে বীর, জ্ঞানবান, ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বিক্রমপুরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সংগে ক্ষত্রিয় ধর্মে অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বীয় মন্ত্র, ধর্ম দ্বারা প্রাণতুল্য জ্ঞানে প্রাণিগণকে ধর্মে রক্ষা করিতেন। তিনি এক মাত্র অসিকেই তাঁহার ঐশ্বর্য, দুর্বৃত্তদিগকে বধ করাকেই সম্পত্তি, ধর্মতে উন্নতি সত্যকে ক্ষুধা মনে করিতেন। তাঁহার শঙ্খদেশ (কপাল) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্তিবিশিষ্ট ছিল। গুণসাগর ক্রিয়াশীল বল্লাল সেন বিজ্ঞ, ধীর সুব্রাহ্মণ সুশিষ্যগণের সহিত মিলিত ও ক্ষত্রিয়-বলাভিষিক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ আরাধনা করিতেন। তিনি বন্ধু ও ব্রাহ্মণগণের শত্রুদিগকে সর্বদা বধ করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম আচার, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এবং দান প্রভৃতি নবগুণসম্পন্ন কলাচারের আদি নিয়ন্তা।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনও লক্ষ্যকার্যে নিতান্ত সুখী হন। বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত জন্তু দূরে থাকিতেও তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বধ করেন। তিনি বীর এবং ঔষধিজ্ঞ (চিকিৎসক)। তিনি সহজেই লক্ষ্য কার্য ও ক্ষত্রিয়দিগের সমুদয় কার্য বুঝিতে সক্ষম। রাজা লক্ষ্মণ সেন সুশাসকে, সুক্ষ্মধী, সুশীল, বিজ্ঞ, সুযশস্বী ও ধর্মের নিতান্ত অধীন; ব্রহ্ম ধর্মোন্নতি, ক্ষমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান্। তিনি পরম সুধীর, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্মকবচ, ব্রহ্মগায়ত্রী আরাধনা করেন। ধৃতি সম্পন্ন অতিশয় ধার্মিক, অসংখ্য

সুধী ব্রাহ্মণ সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করেন। তিনি সর্বদা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল যে কুল, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহারই উৎকর্ষসাধন করিতেন।

তাঁহার সুখ্যাতি ঘনদ্যুতিবিশিষ্ট। একমাত্র ক্ষমাই তাঁহাব বৃত্তি। তিনি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণধর্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতু স্বরূপ। রাজা লক্ষণ সেন শুদ্ধপ্রতিজ্ঞ, একমাত্র বীরত্বই তাঁহার ব্রত। রক্ষক সৈন্যাদিগের রক্ষা-কার্যের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার নিজের কার্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুনাম ও যশের সহিত তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞ বসু* ও ব্রহ্মজ্ঞ। ধর্মকার্যাদিতে তিনি বিলক্ষণ সুখী হন। লক্ষ্মণ সেন সকল কার্যেই সুবিজ্ঞ। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের হইতে শ্রেষ্ঠ সাধু কেলিবিহ্বল ও কৃতকর্মা। তিনি নির্লিপ্ত বুদ্ধি, একমাত্র ব্রাহ্মণধর্মের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম ব্রহ্ম প্রভৃতি সমুদয় বিদিত। গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্তিস্বরূপ। মহাবীর ব্রাহ্মণ রঘুবংশীয় ব্রহ্মণের ন্যায় সম্প্রতি ভূতলে বিরাজমান। তিনি রসজ্ঞদিগের ক্ষুধাস্বরূপ, পৃথিবীতে রামচন্দ্র তুল্য। তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) সকল বাণ প্রযুক্ত অর্থাৎ তীরের ন্যায়। তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও সুধী-শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রাহ্মণ ধর্মের অধ্যক্ষ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি বিক্রমপুরে গমন করত, মত্ত পরাক্রমশালী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় পিতৃরাজধানীকে অধিকার করিয়া মহাসমারোহের সহিত যজুর্বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ধর্মজ্ঞ নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিতের নিবাস মৎস্যবনে। দ্বারপালগণের দোষে সেই বনের একজন তস্কর পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া উঠে। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নৃশংস রাবণগুণসম্পন্ন বিষয়-প্রয়াসী, দক্ষ, সুযোদ্ধা ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠ সৈন্যগণ নিযুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই বীরশ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শাসনের উপযুক্ত শরীরবিশিষ্ট। জপ, যজ্ঞ, ন্যাস লক্ষণাদিতে ব্রাহ্মণ শীঘ্রহস্ত ও সুবিজ্ঞ। ইষ্টবান ব্রাহ্মণেরা জপশ্রম দ্বারা দুর্বৃত্তদিগকে হত, ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান স্বভাব দ্বারা দয়া বশতঃ কোন কোন সময়ে দুর্বৃত্তগণকে ক্ষমা করেন। বপুজ্ঞ ব্রাহ্মণ জপ ও আশীর্বাদ দ্বারা সকলেরই গুরু। সেই চৌর রাজ পুরোহিতের জপশ্রম দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হইয়া তৎপর যুদ্ধে আবদ্ধ ও হত হয়, ইহা যুদ্ধস্থানের পশ্চিমসীমান্তবাসী সমুদয় যোদ্ধা ও জাতকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অতএব চন্দ্রকোণ বিরাটনগর যাহার উত্তর সীমা, যে ভূভাগের পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা, বান্ধুক, চন্দ্রকোণ ও বিরাট নগরই যাহার পূর্ব সীমা তারাস, অম্লসর যে ভূমির দক্ষিণ সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কানন, অশেষবিধসজল স্থল ভূমি শ্রীমাধবা ব্রাহ্মণের পাল্যভূমি হইল। মহারাজের ঋককর্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য কার্য সম্পাদনার্থ সকল প্রকার পৌরোহিত্য কার্যের

---

*ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাত ইহাদিগকে বসু বলে।

+এই মাধব ব্রাহ্মণ হইতে বোধ হয় দত্ত ভূমির নাম মাধবনগর হইয়াছিল এবং তাহা হইতে কালে মাধাইনগর হইয়াছে।

দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক ঋষির সম্বন্ধে রিত্বিগার্থিক ভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইল। বড়াকা পাবাণিকা, ষাসুক, ভূষা, উদিষুষ চাঙ্গুধুপিল, ভূশ্বর, ক্ষযব, সাধুবাকলা, বেতিল ও ভূশর প্রভৃতি গ্রাম, ধৈর্যশীল বিজ্ঞ, ধর্ম ও ক্ষমাদিতে তুষ্ট, কুশলী, প্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধ, ক্ষিতিজ্ঞ, সুশ্রাদ্ধতর্পণ ও শ্রুতিজ্ঞ বিষয়মোহান্ধকারের ক্ষয়কারক, বিষয় কার্যে বিজ্ঞ, প্রধান, জপ যজ্ঞাদি যুক্ত, অধ্যাত্মসিদ্ধ শ্রীসর্বেশ্বর দেব শর্মার পুত্র, কৌশিকগোত্র, কৌথুম শাখানুধ্যায়ী, বিশ্বামিত্র, আপ্নুবৎ ও যমদাগ্নি প্রবর শ্রীমান্ মাধব দেব শর্মাকে ধর্ম নির্বন্ধ দ্বারা বর্ষ শক ও স্বস্তি (অর্থাৎ স্বীকৃত বাক্য) উচ্চারণপূর্বক প্রদত্ত হইল।

ধৈর্যশীল, পুণ্যবান্ সৎলোকের দ্বারা বির্বর্ধিত অর্ণব সদৃশ, অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শরীর, বলাদিযুক্ত, কর্মলব্ধ, মহাপ্রাজ্ঞ বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের এবং ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণেরবিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য ত্রৈলোক্যবিমুগ্ধকারণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির হিংসকের প্রতিহিংসক, যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাগণের মঙ্গলকারক যশের রেখাস্বরূপ লক্ষণাবতী নাম্নী নগরীর নির্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনরত্নের আবিষ্কারকর্তা; ধর্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরবর্ধন-কারী, পৃথিবীতে অর্জুনতুল্য। অর্জুনের ন্যায় যোদ্ধামেঘের ন্যায় শীঘ্রকর্মা, বিক্রমদক্ষ অমৃতভাষী, .শ্রীসম্পন্নভাবে বিজয়ী, সুব্রহ্মদেশের মণি, সুবঙ্গের অধিপতি বীরতেজাবিশিষ্ট বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সুবুদ্ধিযুক্ত, শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবশর্মা সুব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ ও স্বস্তি স্মরণ করতঃ, সূর্যদেবের পূজাপূর্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন ওঁ হ্রীঁব্রহ্মকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ তাম্রশাসনের শীর্ষস্থ বিশ্বমূর্তি ত্রিমূর্তি বিষ্ণু, যিনি সহস্র মস্তক, সহস্রচক্ষু, সহস্র-বাহু, সহস্রপদবিশিষ্ট, যিনি আকাশ পৃথিবী প্রভৃতি সর্বত্র শান্তি, সাক্ষী ও শাস্তারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শান্তি সাক্ষী ও শাস্তাস্বরূপ।

সুকর্মা, ব্রহ্মশক্তিযুক্ত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৈদ্যবৃত্তি দ্বারা বৈদ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও ধর্মের সাক্ষী, ব্রহ্মদেশের ঈশ্বর স্বমিত্র ও ব্রাহ্মবিদগণের আশ্রয়, স্বধর্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্মজ্ঞ, ব্রহ্মসন্ন্যাস ধর্ম ও ঔষধ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্তমান, ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মীযুক্ত, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্রের তুল্য, অশেষবিজয়ীলক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ কুলীন বন্ধুগণের ও স্বধর্ম, দেবতা, বেদজ্ঞগণের আশ্রয় এই লক্ষ্ম ব্রাহ্মণ। (২৮)
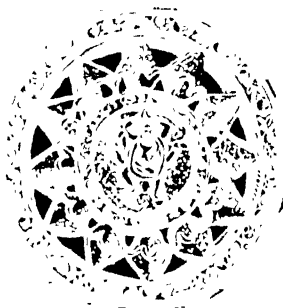
॥ সংকেত সূত্র ॥

১ Saktipur Copper Plate of Lakshman Sena—Dr B. C. Law—(Epigraphica Indica).
২ Hunter's Statistical Account of Bengal.
৩ Stewart's History of Bengal.
৪ Gladwin's Ayeen Akbari.
৫ Seir Mutaqherin translated by M. Raymond.
৬ Contribution to the Geography and History of Bengal—H. Blochman.
৭ Grant's Analysis. Vol I
৮ Stewart's History of Bengal.
৯ Verselst's A view of the English Government in Bengal Vol I.
১০ History of Bengal Bihar & Orissa under British Rule—L.S.S. O' Malley.
১১ Akbar—Von Noha
১২ Verselsts A view of the English Government in Bengal. Vol II
১৩ Grants Analysis. Vol II.
১৪ The Indian Historical Quarterly, Sep. 1931
১৫ The Dacca Review, July 1912.
১৬ Cambridge Shorter History of India—H. H. Dodwell.
১৭ ভারতবর্ষের ইতিহাস—সেন ও রায় চৌধুরী
১৮ The History of Bengal, Vol I—Dr. R. C. Mazumdar.
১৯ গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী
২০ Indian Antiquary, 1911.
২১ Inscruıption in Bengal—Nanigopal Mazumdar
২২ Early History of India—V. A. Smith
২৩ হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার
২৪ Cambridge Shorter History of India—H. H. Dodwell.
২৫ Early History of India—V. A. Smith
২৬ Encyclopaedia Britannica (9th Edition). Vol XII
২৭ Cambridge Shorter History of India—H. H. Dodwell.
২৮ হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়—অম্বিকাচরণ গুপ্ত

সামাজিক
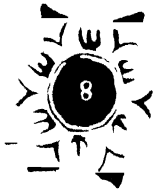
বিবরণ
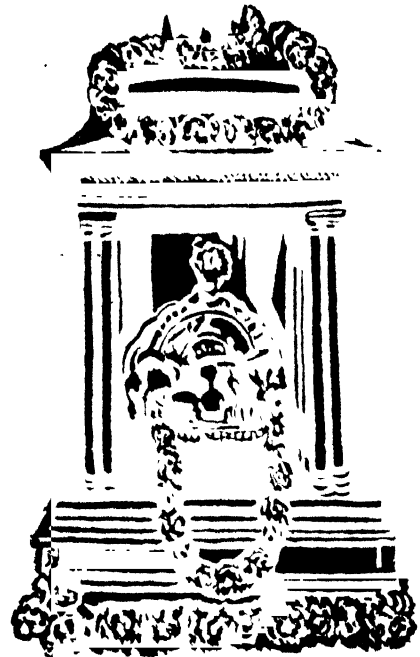
আর্যগণ অতীতে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত সমস্তই মায়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ইহা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যন্তং মায়য়াং কল্পিতং জগৎ।" তাই ইহলোকে সৎকর্ম করিয়া ভক্তিপূর্বক ভগবানের ভাবনা দ্বারা মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে সর্বদা তাঁহারা ব্যগ্র হইতেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্য লাভ করিলে মানবের আর পুনঃ জন্ম হয় না।

হিন্দুশাস্ত্রে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ এই চারটি যুগ আছে। বর্তমানে পৃথিবীতে কলিযুগ চলিতেছে। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বর্ষ, ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বর্ষ, দ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বর্ষ এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষ। প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিকযুগে অর্থাৎ সত্যযুগে মনুষ্যজাতির বাল্য ও কৈশোরে আর্য ও অনার্যদের চিন্তার বিষয় ছিল বলিয়া এবং যাহা ছিল তাহাও নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইত বলিয়া তাঁহারা তখন সুখী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং অতি সহজেই শাস্ত্রের পরমতত্ত্বে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইতেন। ঔপনিষদিক যুগে অর্থাৎ ত্রেতাযুগে, মনুষ্যজাতির যৌবনে, আর্যদের চিন্তার রাজ্যও বিস্তৃত হয়। মহাভারতীয় যুগে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে মনুষ্যজাতির প্রৌঢ়ত্বে আর্যদের চিন্তারাজ্য আরও অধিক বিস্তৃত হয় এবং ত্রেতাযুগ অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় সুনির্দিষ্ট পথের বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগ এবং ত্রেতাযুগ হইতে দ্বাপরযুগ যথাক্রমে

সুদীর্ঘতর ছিল; কিন্তু কলিযুগ-সহ চার যুগের মোট কালের আট ভাগের সাত ভাগ ঐ যুগত্রয় অধিকার করিয়াছিল।

These three Yugas cover more than about seven eights of the life of the four yugas—Satya, Treta, Dwapar and Kali. Discourses—Pandit Brahm Sankar Misra.

এই চার যুগ হাজারবার অতিক্রান্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং এইরূপ হাজারবার চতুর্যুগপরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। এইরূপ পনের দিনে ব্রহ্মার এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস এবং বারমাসে এক বৎসর হয়। এই পরিমাণে একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। তাহার পর ব্রহ্মাও বিনষ্ট হন। ব্রহ্মার দিবাগমে সমস্ত বস্তুরই অভিব্যক্তি বা প্রাদর্ভাব এবং রাত্রি সমাগমে সমস্ত জিনিষের তিরোভাব বা লয়প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ পৃথিবীতে নূতন কোন জীবের সৃষ্টি হয় না। যাহা পূর্বে ছিল, তাহাই কল্পান্তে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। ফলিত রসায়নেও বলে যে, কোন বস্তুই প্রকৃতপক্ষে কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, (matter is indestructible) কেবল তাহাদের আকারের পরিবর্তন হয়।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, সূর্য চন্দ্র পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ যাহা যেরূপ পূর্বকল্পে ছিল, বিধাতা উত্তরকল্পেও ঠিক সেইরূপভাবে তাহা রচনা করেন।

সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বকল্পয়ৎ।
দিব্যং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

হিন্দু রাজত্বে এই দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বর্তমানে অধিক জানিবার উপায় না থাকিলেও তৎকালে সকল ব্যক্তিই যে স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তির দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত এবং দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিকল্পে সহায়তা করিত তাহা সুনিশ্চিত। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ সকলেই ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিত এবং সকলেই তখন যে খুব ধর্মভীরু ছিল একথা নিঃসংশয়ে মেগাস্থিনিশের বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন— Theft is of very rare occurrence and their houses and property leave unguarded.

চুরী তখন কদাচিৎ ঘটিত এবং দেশবাসিগণ সকলে ঘরের দরজা খুলিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইত। সকল গৃহস্থই সাধ্যানুসারে অতিথি-সেবা করিত এবং দেশে দারিদ্র্য বলিয়া তখন কোন জিনিষ ছিল না। রাজাকে দেশবাসী দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত এবং তিনিও প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য সর্বদা মুক্তহস্ত থাকিতেন।

হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহারা কেবল মাত্র নিজ উদর ভরণার্থে অন্ন পাক করিয়া থাকে তাঁহারা পাপ মাত্র ভোজন করে (অঘং ভুঞ্জতে)' গৃহস্থগণ প্রত্যহ পঞ্চসূনাদি পাপ নিজেদের অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকে এবং সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সেকালে প্রতি গৃহস্থই অতিথি-সংকার করিত।

কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥

গৃহস্থগণের উদূখল, যাঁতা, উনুন, জলকুম্ভী ও ঝাঁটা এই পাঁচ প্রকার জীবহিংসার স্থান। ইহাদিগকে 'সুনা' বলে। 'সুনা' শব্দের অর্থ বধস্থান। গৃহস্থগণের এই হিংসার জন্য স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চপাপের নিবৃত্তি হয়। "পঞ্চসুনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি"। মনু ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করিলে অন্ন পাপে পরিণত হয় বলিয়াছেন। বেদ অধ্যয়ন ও সন্ধ্যাদির নাম ঋষিযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদির নাম দেবযজ্ঞ। বলি বৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ। অন্নাদির দ্বারা অতিথি-সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ। সেইজন্য হিন্দুগণ পঞ্চ-সুনাদি পাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য অতিথি সৎকার না করিয়া কখনও ভোজন করিত না।

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥

যাঁহার নাম গোত্র অথবা বাসস্থান কেহ জানে না এবং যিনি আহারের জন্য বিনা আহ্বানে অকস্মাৎ গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হন, তাঁহাকে অতিথি বলা হয়। "যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতি। অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সো অতিথি প্রোচ্যতে বুধৈ। গৃহে অতিথি আসিলে হিন্দুগণ প্রাচীনকালে কখনও বঞ্চিত করিতেন না। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে অতিথি কাহারও বাটী হইতে ফিরিয়া গেলে, সে অতিথি আপনার পাপ দিয়া, গৃহস্থের পুণ্য লইয়া চলিয়া যায়। "স তস্মৈ দুস্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

সেকালের বাঙ্গালী সমাজ—সেকালের বাঙ্গালী সমাজ কিরূপ ছিল তাহা তৎকালীন কাব্য গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মানিকচাঁদের গীতে বাঙ্গলার অবস্থাপন্ন লোক তখন আটচালায় বাস করিত এবং পালঙ্ক ব্যবহার কেবল ধনীদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল সর্বসাধারণে শীতলপাটি পাতিয়া বালিসে হেলান দিয়া বসিতেন। অগুরু-চন্দনের ব্যবহার তখন আদরণীয় ছিল। চাষীরা মোটা কাপড় পরিধান করিত। পিতৃকার্য্য ও গয়ায় পিন্ডদান, ব্রাহ্মণ-সেবা পুণ্য কার্য বলিয়া গণ্য হইত। জ্যোতিষীরা পাঁজি লইয়া ভ্রমণ করিতেন, পাঁজির বচন না শুনিয়া কেহ কোন ক্রিয়া-কর্ম করিতেন না।

ধনী গৃহিণীরা হার, কেয়ূর কঙ্কণ, বেসর, নূপুর ব্যবহার করিতেন। মানিকচাঁদের রাজত্বে সকলের দুয়ারেই ঘোড়া বাঁধা থাকিত। দেড় কুড়িতে কৃষাণ একমাস চালাইত এবং ঐ দেড়কুড়ি খাজনা দিয়া একমাস পাল চড়াইতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা পাশা খেলিতেন। ঢাক ঢোল বাজাইয়া উৎসব করা হইত। চতুর্দোলায় বরকে বিবাহ-বাসরে লইয়া যাওয়ার রীতি ছিল। সাধারণ গৃহস্থ চৌপালা ব্যবহার করিতেন।

স্ত্রীলোকেরা সীমন্তে সিন্দুর ও কেশে সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। পুরুষদের বাবরী চুল রাখা সৌখিনতার পরিচায়ক ছিল। বাবরী চুল রাখা এখনও রাঢ় অঞ্চলের দুলে বাগ্দীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিজয় গুপ্তের 'একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখানা মাথায় বাঁধিয়া আর একখানা দিলা সর্ব গায়' হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালী পাগড়ি বাঁধিত ও উত্তরীয় ব্যবহার করিত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনা হইতে প্রমাণ হয়, সমাজে তখন বিধবা-বিবাহ ছিল না। শিশুদের কটীতে কিঙ্কিনী বাঁধিয়া দেওয়া হইত। 'কটীতে কিঙ্কিনী বাজে অতি মনোহর।' ওই অলঙ্কার লোভে বালক বালিকা চুরি হইত। টোলের পড়ুয়ার কেশ বেশ সুন্দর ছিল; 'শিরে চাঁচড় কেশ অতি মনোহর।' তখনকার লোক ভোজন-পটু ছিল। মহোৎসবে চিঁড়া দধি খাওয়ানো হইত এবং বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকায় (নাদায়) চিঁড়া ভিজানো হইত। সেইজন্য দুধ কলা প্রচুর সংগৃহীত হইত।

দূর তীর্থে যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার. বোম্বাই অঞ্চলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত দুইজন বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর সাক্ষাৎ হয়। প্রয়াগ স্নান সেকালে সর্মাধক প্রচলিত ছিল। অহিন্দুর অন্ন খাইলে জাত যাইত। "ছয়মাস অন্ন যদি করয়ে গ্রহণ। প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেইজন॥" (অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ)। কায়স্থ এবং বৈদ্যের সেকালে বিশেষ সম্মান ছিল। হোসেনসার চিকিৎসক ছিলেন. বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামবাসী মুকুন্দরাম বৈদ্য। কায়স্থরাও সেকালে সংস্কৃত চর্চা করিতেন: সেকালে হিন্দু সমাজের সকলেই সরল ও ধর্মভীরু ছিলেন।

মুকুন্দরামের পুঁথি হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণরা পূজা করিতেন; কায়স্থেরা লেখাপড়া করিতেন এবং নাপিত কাংশ নির্মিত দর্পণ লইয়া কামাইয়া বেড়াইত। কলুরা ঘানি বসাইত; তাঁতী ধুতি ও গড়া বুনিত। গড়া এখনকার খাদি। সরাক তাঁতী নেত ও পাট সাড়ী বয়ন করিত, ছুতার চিঁড়া কুটিত এবং কৈবর্তেরা মাছ ধরিত।

সেকালে নগরের মধ্যে থাকিত শিব-মন্দির। পথিকদের জন্য থাকিত—অতিথিশালা। গন্ধবণিকেরা গন্ধেশ্বরীর পূজা করিত। পূজায় বলিদান ব্যবস্থা ছিল। "আশ্বিনে অম্বিকা পূজার পর" দেবীর প্রসাদ-মাংস ঘরে ঘরে ব্যবহার হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে সেকালের বাঙ্গালীরা ছিল শাক্ত ধর্মাবলম্বী। চড়ক পূজার প্রচলন সেই সময়ের। মুকুন্দরামের রচনা হইতে জানা যায়, সমুদ্র-যাত্রা সেকালে গর্হিত ছিল না। রাঢ় অঞ্চলে নানা প্রকারের নৌকা নির্মিত হইত। বর্তমান বাঙ্গালীর সহিত সেকালের বাঙ্গালীর এক সুদূরতম ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন. কিন্তু ঐ সময় হইতে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে এবং বাঙ্গলা লোক-সাহিত্যে দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহাদের আয়ের উপায়, পণ্যমূল্য প্রভৃতির ইতিহাস পাওয়া যায়। হিন্দু আমলে প্রজা সাধারণের বৈষয়িক জীবনযাত্রা ও নাগরিক অধিকারের উপর ব্যাপক হস্তক্ষেপ কখনও করা হয় নাই; রাজা তাঁহার ফসলের ষষ্ঠাংশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। গ্রামগুলি ছিল এক একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য কৃষক, তাঁতি. কুমার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আবশ্যক সেই সবগুলি লইয়া এক একটি গ্রাম গঠিত হইত এবং যথাসম্ভব নিজেদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান এবং গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে স্কুল বসাইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিয়া লইত। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান আমলে মাঝে মাঝে সাময়িক

দুঃখ ঘটিলেও, মোটামুটিভাবে বাঙ্গলার বৈষয়িক সমৃদ্ধি অটুট ছিল এবং পাদ্রী লং হিসাব দিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজ আগমনের পর বাঙ্গলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক।

নবাবেরা অর্থ-সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রভূত বিত্ত-সঞ্চয়ও করিয়াছেন, কিন্তু উহা ব্যয় করিয়াছেন এ দেশেই। লুণ্ঠন তাঁহারা বড় কম করেন নাই, কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-শক্তি হস্তক্ষেপ করে নাই বলিয়া আপামর জনসাধারণের উৎপাদনের উৎস বন্ধ হয় নাই—কৃষি ও শিল্পে তাহার প্রেরণা ও উৎসাহ স্তব্ধ হয় নাই। মুসলমান আমলের শেষের দিকেও বাঙ্গলায় এমন বহু পরিবার ছিল যাহারা সোনার থালায় ভাত খাইত— এ-কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার ইতিহাস রচয়িতা গোলাম হোসেন তাঁহার রিয়াছল সালাতিন গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। মোগলেরা সোনার থালাগুলি লুঠ করিয়াছে, কিন্তু দেশের লোকের উপার্জনের পথ বন্ধ করে নাই। ইংরেজ আসিয়া থালাও লইয়াছে, বিলাতী পণ্য আমদানি করিয়া এবং তরবারির জোরে উহা দেশে ঢুকাইয়া আয়ের পথটাও শেষ করিয়াছে। ইংরেজ আমলেই ভারতবর্ষে শোষণ-নীতির প্রথম সূত্রপাত হয়।

সোনার বাঙ্গলার মাটিতে সাত শত বৎসরের মুসলমান শাসন ভারতবাসীর যে ক্ষতি করিতে পারে নাই, ইংরেজ তাহাই সাধন করিয়াছে। ইহার জের দেশে আজও বহিয়া চলিয়াছে। ইংরেজ গিয়াছে, কিন্তু রাখিয়া গিয়াছে এমন একদল আত্মকেন্দ্রিক লোক, যাহারা এ দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিযাও মনে প্রাণে বিদেশী, মাটির সহিত বা দেশের সহিত যে সব লোকের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই, আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা বিবেক বিসর্জন দিয়া ইংরেজের দাসত্ব করিয়াছে, জননী-জন্মভূমির শৃঙ্খল-মোচনের সকল শুভ-প্রচেষ্টায় উৎসাহের সহিত বাধা দিয়া বিদেশীর নিকট পুরস্কার ও বাহবা লাভ করিয়াছে। ইহাদের হাতে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সংস্থানের ভার পড়িয়া দেশের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু তৎপূর্বে যে কি ছিল তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে।

শ্রমিকের মজুরী

জিনিষপত্র যখন এত সস্তা, মজুরি প্রভৃতি তখন কম থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সি আর উইলসন ১৭০৩ হইতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত বেতনের নিম্নোক্তরূপ তালিকা দিয়াছেন :

কেরানী		৪।৵০ আনা।
পুলিশ দারোগা		৪৲ টাকা।
খাজনা আদায়কারী		১৸/০ আনা।
কনেষ্টবল		১৷৷০ আনা।
তাঁতী	”	৫৲ টাকা।

পাদ্রী লং ১৭৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত মজুরের নিম্নোক্ত তালিকা দিয়াছেন :

সাধারণ কুলী দৈনিক এক পণ ১২ গণ্ডা কড়ি, অর্থাৎ দুই পয়সা।

রাজমিস্ত্রী দৈনিক এক গণ্ডা কড়ি অর্থাৎ, এক পয়সারও কম।

দক্ষ মিস্ত্রী দৈনিক দশ পয়সা।

বুকানন হ্যামিলটন ১৮০০—১০ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত মজুরির তালিকা এইরূপ দিয়াছেন:

সাধারণ শ্রমিক দৈনিক	৵০ আনা।
দক্ষ শ্রমিক "	৶০ আনা।
ছুতার মিস্ত্রী মাসিক	৬৲ টাকা
পিয়ন	৫৲ টাকা।
কাঁসারি "	৪৸৵০ আনা।

আইন-ই-আকবরীতে শ্রমিকের মজুরির যে তালিকা আছে তাহা এই স্থানে উল্লেখ্য:

ইটকর	১ম শ্রেণী	রোজ	৵১৬
ইটকর	২য় শ্রেণী	রোজ	৵ ৮
ইটকর	৩য় শ্রেণী	রোজ	৵০
ইটকর	৪র্থ শ্রেণী	রোজ	⁄১২
ছুতার মিস্ত্রী	১ম শ্রেণী	রোজ	৵১৬
ছুতার মিস্ত্রী	২য় শ্রেণী	রোজ	৵৮
ছুতার মিস্ত্রী	৩য় শ্রেণী	রোজ	⁄১২
ছুতার মিস্ত্রী	৪র্থ শ্রেণী	রোজ	⁄৮
ছুতার মিস্ত্রী	৫ম শ্রেণী	রোজ	৻১৬

॥ গৃহ ॥

শাস্ত্রে গৃহ নির্মাণ সম্বন্ধে যে সকল বিধান আছে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া হুগলী জেলায় পূর্বে বাটী নির্মাণ করা হইত। কারণ যে স্থানে বাস করা হয়, তাহার শুভাশুভের প্রতি দেখা সর্বোতভাবে বিধেয়। সেই জন্য প্রথমে বাটীর স্থান নিরূপন করিয়া শল্যোদ্ধার প্রণালী অনুসারে শল্যোদ্ধার না করিয়া কেহ কখনও গৃহ নির্মাণ করিত না। দৈবজ্ঞ যথা নিয়মে মাটি খুঁড়িয়া শল্যের অনুসন্ধান করিতেন এবং তথায় মানুষসমান ভূমি খনন করিয়া যদি শল্য না পাওয়া যাইত তাহা হইলে সেই জমিতে মাটির ঘর নির্মিত হইত। মানুষ পরিমিত ভূমির তলায় শল্য থাকিলে দোষাবহ হইত না। কিন্তু যে স্থানে প্রাসাদ নির্মিত হইত, সেই জমিতে যতক্ষণ জল না পাওয়া যায়, ততক্ষণ শল্য দেখিতে হইত, কিন্তু তাহাতেও শল্য না পাওয়া যাইলে তাহাতে দোষ হইত না।

পুরুষাধঃ স্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ।
প্রাসাদে দোষদং শল্যং ভবেৎ যাবজ্জলান্তকম্॥

প্রত্যেক গৃহে দেবাদি সকলেরই কিছু কিছু অধিকার আছে; তাহার মধ্যে অষ্টবিংশ প্রেত ভাগ, মানুষের হইতেছে বিংশভাগ, গন্ধর্বদিগের দ্বাদশভাগ এবং দেবতাদিগের চার

শল্যোদ্ধার—বাস্তুভূমি হইতে প্রোথিত অস্থি উত্তোলনকে শল্যোদ্ধার বলে।

ভাগ স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই সকল ভাগ স্থির করিয়া প্রেতের যে নির্দিষ্ট অংশ তাহাতে কখনও কেহ গৃহ নির্মাণ করিত না। নরের যে বিংশতি ভাগ তাহা শাস্ত্রানুসারে মঙ্গলজনক বলিয়া তাহাতে গৃহাদি নির্মিত হইত। বাটীর কোন, অন্ত ও মধ্যস্থলে কখনও কোন গৃহাদি হইত না, কারণ কোণে ধনহানি, অন্তে রিপুভয় এবং মধ্যে গৃহ নির্মাণ করিলে সর্বনাশ হয় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে।

ন কোণেষু গৃহং কুর্যাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ।
কোণে চ ধনহানি স্যাদন্তে রিপুভয়ং ভবেৎ।
মধ্যে চ সর্বনাশ স্যাত্ত[illegible]েৎ ॥

অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীগণের গৃহ হয় মাটির দেওয়াল, কাঠের খুঁটি ও খড়ের চাল। সাধারণতঃ তিনটি হইতে পাঁচটি একতালা ঘর থাকে ও সামনে বারান্দা থাকে অভ্যাগতদের বসিবার জন্য। বাড়ীর চারপাশ ঘেরা থাকে। একখানি মাটির ঘর করিতে খরচ হয় ৫০০্ টাকা হইতে ১০০০্ টাকা। আসবাব পত্রের মধ্যে রান্না খাওয়ার জন্য কিছু কাঁসা বা পিতলের বাসন, রান্নার জন্য কয়েকটি মাটির পাত্র, দুই একটি জলের কলসী, কয়েকটি মাদুর ও একটি তক্তপোষ।

সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী অনেক ছোট এবং কম পোক্ত। ইহা মাটি খড় ও বাঁশের তৈয়ারী। জিনিষ পত্রের মধ্যে কয়েকটি মাটির বাসন, শুইবার জন্য ২।১টি মাদুর। একটু ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে একটি বড় বাক্স থাকে তার মধ্যে তাহাদের দামী জিনিষপত্র রাখিয়া দেয়। সহরে ইষ্টক নির্মিত পাকা বাড়ী এবং টালির ঘর দেখা যায়। একতলা পাকা বাড়ীর দাম পূর্বে ২০০০্ হইতে ৩০০০্ টাকা ছিল এবং দোতলা বাড়ীর দাম মোটামুটি ৩০০০্ হইতে ৬০০০্ টাকা। এখন পল্লীগ্রামে পাকা বাড়ীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য সকল গ্রামেও বাড়ী ক্রমশঃ তৈয়ার হইতেছে। বর্তমান সময়ে জিনিষপত্রের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিহেতু পাকা বাড়ীর মূল্যও সেই অনুপাতে বাড়িয়াছে।

এদেশে দক্ষিণ দিক হইতে সমুদ্রের হাওয়া বয় বলিয়া দক্ষিণ দিকে বাড়ির দরজা করা হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে ঃ

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা
পূর্বদ্বারী তার প্রজা,
উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই।

মফঃস্বলে গ্রামবাসীগণ সাধারণতঃ ভাত ডাল ঘি, শাকসব্জী, মাছ, মিষ্টি ও দুধ প্রভৃতি আহার করে। সাধারণ কৃষক ভাত, তরকারী বা কখনও কখনও মাছ খায়। পূর্বে অবস্থাপন্ন লোকের খাইখরচ মাসে ২০্ হইতে ৫০্ টাকা পড়িত। বেশীর ভাগ লোকই বাগানের শাকসব্জী ও পুকুর বা খালের মাছ খায়। চাষীরা তাহাদের খাদ্য দ্রব্য বেশীর ভাগ নিজেরাই উৎপন্ন করে। সহরে শিল্পী ও কারিগর ভাল মজুরী পায় এবং জিনিষপত্রের দাম বেশী হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের মজুরদের চেয়ে ভাল থাকে। তবে সহরের চাইতে

গ্রামের ভরণপোষণের ব্যয় কম। লোকে গ্রামে এখনও খাঁটী জিনিষ পায়, সহরে তাহা প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

সচ্ছল জীবন॥ আয়ের স্বল্পতা যে দুর্দশার নিদর্শন নয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বাঙলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। বংশীদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে সনকার, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে খুল্লনার, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে সীতাদেবীর, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে সুরিক্ষার এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নপূর্ণার রন্ধন-প্রণালীর বিবরণ হইতে জানা যায়, সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল এবং ভোজন-বিলাসীও তাহারা বড় কম ছিলেন না। 'অন্নপূর্ণার রন্ধন' হইতে তেইশ পদ নিরামিশ রান্নার কয়েকটি মাত্র, পদের কথা এখানে উল্লেখ করা হইল:

হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শাড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ, মাষ বরবটি বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মুলা নারিকেল ভাজা।
নুনখোড়া আলনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥
কাঁঠালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমড়া॥

বাঙলা সাহিত্যে বাজার দর ॥ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙালার বৈষ্ণব এবং অন্যান্য সাহিত্যে দেশের বৈষয়িক অবস্থা ও [illegible] অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত কাব্যে উল্লিখিত আছে যে, চৈতন্য দেবের বিবাহ কয়েক কৌড়ি মাত্র ব্যয়ে সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং উহাকে রীতিমত জাঁক জমকপূর্ণ বিবাহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে দুর্বলার বেসাতির বিবরণে বাজার দরের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে:

দুর্বলা হাটেরে যায় পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়
কাহন-পঞ্চাশ লয়্যা কড়ি।
লাউ কিনে কাঁচ কুমড়া শতমূলে পলা কড়া
পাকা আম্র কিনি বুড়ি-মূলে।
বিশাদরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি
গণ্যে পণ মূলে পান নিলে॥
রন্ধন সন্ধান জানে চিতল বোয়ালি কিনে
শোল পনা কিনিল চিঙ্গড়ি।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি॥

দেশের সাধারণ বৈষয়িক অবস্থা এবং প্রজার অধিকার কিরূপ ছিল, চণ্ডীকাব্যে রাজা কালকেতুর নিম্নলিখিত কথায় তাহা প্রতীয়মান হইবেঃ

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর
কাণে দিব সোনার কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ,
তিন সন নাহি দিহ কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা,
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
পার্বণী পঞ্চক যত গুড়া লোন সনা ভাত
ধান কাটি বলেন কসুরে।
যত বেচ ভাল ধান, তার না লইব দান,
অশ্ব নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত প্রজা বৈসে ঘর, তার না লইব কর,
চাষী জনে বাড়ি দিব ধান॥

গত অর্ধ শতাব্দী যাবত লোকের অবস্থা মোটের উপর ভাল হইয়াছে। রেল পথের পত্তন, নূতন কলকারখানা স্থাপন, কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ইহাদের উপকণ্ঠে শিল্প-কার্য শুরু হওয়ায় বহু দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাতে ক্রমাগত মজুরী বৃদ্ধি ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্বে মজুর বা সাধারণ চাষীদের কোনমতে দু বেলা চলিত, আবার কোন কারণে শস্য না হইলে দুর্দশা চরমে উঠিত। কিন্তু এখন তার সমস্ত খরচার পরেও কিছু সঞ্চয় হয়। ইহা তাহাদের অসুখ বিসুখ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও ক্রিয়া কর্মের জন্য সঞ্চিত হয়। কিন্তু যে সব মধ্যবিত্ত বাঁধা মাহিনায় সহরে চাকুরী করে তাহাদের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। কারণ ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের লোকদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। কারণ তাহাদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য বজায় রাখিতেই হইবে। কায়িক পরিশ্রম ঘৃণা করার দরুণ, স্বল্প মূলধন ও অধ্যবসায় না থাকায়, তাহাদের অত্যন্ত কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক।

পোষাক পরিচ্ছদ

হুগলী জেলায় পুরুষের অধোবাস প্রাচীনকালে ছিল ধুতি আর নারীদের ছিল শাড়ী। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করিত। পূর্বে হাঁটুর উপর ধুতি পরিধান করার চলন ছিল, সুতরাং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ধুতি তখন খুব ছোট হইত।

স্ত্রীলোকদের শাড়ী ধুতির মত ছোট হইত না। বাঙ্গালী নারী আজ কাল যেমন কোমরে একাধিক বার জড়িয়ে অধোবাস রচনা করেন, প্রাচীন কালেও সেই পদ্ধতি ছিল। বর্তমানে শাড়ীর সাহায্যে যেমন উত্তরবাস রচনা করা হয়, পূর্বে কিন্তু সেরূপ ছিল না।

তখন উপরাঙ্গ নগ্ন রাখাই প্রথা ছিল। তবে উচ্চশ্রেণীর নারীগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের ন্যায় ওড়না ব্যবহার করিত। উপরের গা নগ্ন রাখার প্রথা কেবল প্রাচীন বাঙ্গলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তৎকালে সমস্ত প্রাচীন আদি অষ্ট্রেলীয়-পলিনেশিয়-মেলানেশিয় গোষ্ঠির মধ্যে ওপরের গা খালি রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই প্রাচীন অভ্যাস ও ঐতিহ্যের রেশ এখনও বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি রাজশেখর হাজার বছর পূর্বে গৌড়ের মেয়েদের বেশ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"বুকে তাহাদের চন্দনপঙ্ক, গলায় সূত্রহার, সীঁথি পর্যন্ত টানা ঘোমটা, অনাবৃত বাহুযুগল, গায়ে অগুরুর প্রসাধন, রং যেন নবদূর্বাদলের ন্যায় শ্যামল সুন্দর—এই হইতেছে গৌড়-দেশের নারীদের বেশ।"

পল্লীগ্রামের নারীদের সাজসজ্জার বর্ণনা কবি চন্দ্রচন্দ্র যাহা দিয়াছেন তাহাও উদ্ধার যোগ্য:

কপালে কাজলের টিপ, হাতে চাঁদের আলোর মত সাদা পদ্মডাঁটার বালা, কানে কাঁচ রীটাফুলের দুল, স্নিগ্ধ চুলের খোঁপায় তিলের পল্লব—পল্লীবাসী বধূদের এই বেশ মানুষের গতিবেগ মন্থর করিয়া দেয়।

এ দেশের লোকের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে নিয়ার্কাস ৩২৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল:

ভারতীয়গণ কার্পাস নির্মিত বস্ত্র ব্যবহার করে। এই কার্পাস অন্যত্র প্রাপ্য কার্পাস অপেক্ষা শুভ্র দেখায় অথবা ভারতীয়গণের কৃষ্ণবর্ণের জন্য তাহাদের পরিহিত বস্ত্র হয়ত অধিকতর শুভ্র বলিয়া বোধ হয়। তাহারা কার্পাস নির্মিত অঙ্গাবরণ পরিধান করে; ইহা জানু পর্যন্ত লম্ববান থাকে; ইহার উপরে তাহারা বহিরাবরণ ব্যবহার করে; ইহার কতকাংশ তাহাদের মস্তকের চতুর্দিকে জড়াইতে রাখে। ভারতীয়গণ হস্তীদন্ত নির্মিত কর্ণাভরণও ব্যবহার করে। তবে সকল ভারতবাসী ইহা ব্যবহার করে না। কেবল যাহারা অত্যন্ত ধনী তাহারাই ইহা ব্যবহার করে। (১)

একজন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর সাধারণ পোষাক হইতেছে একটি ধুতি ও একটি চাদর ও এক জোড়া দেশী জুতা। কোন কোন সময় তাহারা একটি পিরাণ অথবা ছোট কোট গায় দেয়। সাধারণ কৃষকেরা একটি মোটা ধুতি পরে ও একটি গামছা গায় দেয়; আবার ক্ষেতে কাজ করার সময় ঐ গামছা মাথায় বাঁধে। কেবল অবস্থাপন্ন চাষীরা জুতা পরে। অফিসে যাহারা কাজ করে, গত অর্ধ শতাব্দীতে তাহাদের বেশ ভূষার যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। সহরের লোক আজকাল সাধারণতঃ কোট প্যান্ট অথবা ধুতি পাঞ্জাবী বা সার্ট এবং জুতা বা স্যাণ্ডাল পরিধান করিয়াই চলাফেরা করে। শীতে শাল আলোয়ান প্রভৃতি ব্যবহার করে। গ্রাম হইতে যে সব কেরাণী আসে তাহারা ধুতিই বেশী পছন্দ করে, স্ত্রীলোকেরা সাধারণ ব্যবহারের জন্য মোটা শাড়ী পড়ে এবং ক্রিয়া কর্ম এবং উৎসবের সময় মিহি শাড়ী পড়ে। নিম্নশ্রেণীর ভিতর রূপার অলঙ্কারই বেশী দেখা যায়। তবে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সোণার প্রচলনই সর্বাধিক।

॥ বিবাহ ॥

সৃষ্টিপ্রবাহ সংরক্ষণ প্রকৃতির অতি প্রবীনতম নিয়ম। সেই নিয়ম হইতেই বিবাহের উৎপত্তি হইয়াছে। বিবাহের অর্থ 'বিশিষ্টং বহনম্' অর্থাৎ বিশেষভাবে যাহাকে বহন করা হয়। বংশপ্রবাহ সংরক্ষণের জন্য স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু ঠিক কোন সময় হিন্দুসমাজে সর্বপ্রথমে বিবাহ সংস্কার প্রবর্তিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। 'মন্ত্রব্রাহ্মণে' নারীর উপস্থদেশকে প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "প্রজাপতে র্মুখমেতদ্ দ্বিতীয়ম্।"

ঋগ্বেদ জগতের আদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে হিন্দু সমাজে বিবাহের যে সকল প্রথা দেখা যায়, তাহা সুসংস্কৃত সভ্যসমাজের বিবাহপ্রথা বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য। মহাভারতের যুগে ব্যভিচারদোষ মানবসমাজে দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। সেই সময় স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষে ইচ্ছামত উপগতা হইতে পারিত। সেই যুগে ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা কখনও গৃহে রুদ্ধা থাকিত না এবং রতিসুখার্থে কুমারী অবস্থায় তাহারা যে কোন পুরুষে উপগতা হইতে পারিত। উহা তখন অধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না, বরং উহাই ধর্ম বলিয়া গণ্য হইত। "নাধর্মোঽভূদ্ বরারোহে স হি ধর্মঃ পুরাভবৎ।"

স্ত্রীগণের এই স্বচ্ছন্দবিহার প্রথার সঙ্কোচ করিয়া সুদৃঢ় বিবাহ বন্ধন সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন উদ্দালকের পুত্র শ্বেত কেতু। তাঁহার দ্বারা প্রথমে স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দবিহার প্রথার বাধ্যকরী মর্য্যাদা স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধে মহাভারতে (আদিপর্ব ১২২ অধ্যায়, ৯-২০ শ্লোক) শ্বেতকেতুর যে আখ্যায়িকা পাণ্ডু কুন্তীর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য।

একদিন মহর্ষি উদ্দালক, শ্বেতকেতু ও তাঁহার মাতা বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হাত ধরিয়া "এস যাই" বলিয়া তাঁহাকে একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু তাঁহার মাতাকে অন্যপুরুষ হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন দেখিয়া বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক তখন পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "বৎস তুমি কুপিত হইও না, উহা সনাতন ধর্ম। এই জগতে সকল বর্ণের স্ত্রীগণই অরক্ষিতা। গোগণের মত মানুষেরাও স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দে বিহার করে।" কিন্তু শ্বেতকেতু পিতার কথায় প্রবোধ পাইলেন না। তিনি স্ত্রীপুরুষের এই ব্যভিচার প্রথা তিরোহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং বহু সাধনার দ্বারা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার এক নূতন নিয়ম স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে মানবজাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যে, স্বামী ব্যতীত স্ত্রীগণ অন্য পুরুষে উপগতা হইতে পারিবে না; যে স্ত্রী পতিকে অতিক্রম করিবে তাহার পক্ষে ভ্রূণহত্যার মতন ভীষণ অমঙ্গলজনক পাপ হইবে।

মহাভারতের এই সকল কথা হইতে কেবল যে ভারতবর্ষেই স্ত্রীলোকেরা যথেচ্ছভাবে পরপুরুষ সহবাস করিতে পারিত তাহা নহে। ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র তখন এই স্বচ্ছন্দবিহার প্রচলিত ছিল এবং সাধু সমাজে উহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হইত। প্রসিদ্ধ

সমাজতত্ত্ববিদ্ হার্বার্ট স্পেনসারের 'সমাজতত্ত্ব' নামক পুস্তক পাঠ করিলে অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকদের স্বচ্ছন্দবিহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইবে।

দীর্ঘতমা ঋষিও স্ত্রীলোকদের স্বচ্ছন্দবিহার প্রথার প্রতিষেধ করেন। তিনিও হিন্দু-সমাজে এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, একমাত্র পতিই নারীর চিরজীবনের আশ্রয় হইবে। স্বামী মরিলে বা স্বামী জীবিত থাকিতে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইতে পারিবে না। অন্য পুরুষে উপগতা হইলে তাহাকে পতিতা হইতে হইবে।

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
(মহাভারত ১।১০৪।৩৪-৩৫)

হিন্দুর অনুষ্ঠেয় দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটি প্রধান সংস্কার। প্রাক্‌বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত হিন্দুর বিবাহের আচার অনুষ্ঠান ও রূপের প্রকৃতি অনুধ্যান করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুবিবাহ বর্তমানে যে রূপে পর্যবসিত হইয়াছে তাহাতে নামটি ছাড়া ইহার মধ্যে হিন্দুত্ব আর বিশেষ কিছুই নাই। সমাজে স্বৈরাচারের প্রাবল্য দেখিয়া শ্বেতকেতু বৈদিকযুগের কিছুকাল পরে ভারতবর্ষে বিবাহ প্রথা কি ভাবে প্রবর্তন করেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালে স্মৃতিকারদের দ্বারা বিবিধ অনুষ্ঠানের বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বিবাহ একটি বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছিল।

মনু তাঁহার সংহিতায় আটপ্রকার বিবাহের নির্দেশ দিয়াছেন। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্য, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চারপ্রকার আর্যদের ও শেষ চারপ্রকার অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্মৃতিকাররা পরবর্তীকালে কোন বিবাহ কোন বর্ণের মধ্যে প্রশস্ত আর কোনটা অচল তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং স্বগোত্রে ও সমপ্রবরে বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ যাহা বৈদিকযুগে অচল ছিল না তাহাও নিষিদ্ধ করিয়া দেন। এইরূপ কড়া নিয়মের গণ্ডীতে বাঁধিয়া তাঁহারা বিবাহ প্রথাকে এক বিশিষ্টরূপে সমাজের সামনে এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন যে ইহা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। তাই হিন্দুর বিবাহসংস্কার গার্হস্থাশ্রমের ধর্মসাধনমূলক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যেখানে ভার্যা সেইখানেই গৃহ, ভার্যাহীন গৃহ বনসদৃশ্য "যত্র ভার্যা গৃহং তত্র ভার্যাহীনং গৃহং বনম" এইরূপ বচনও বৃহৎপরাশরসংহিতায় লিখিত আছে দেখা যায়।

ভার্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই, তাহার সকল ক্রিয়া নিস্ফল, তাহার দেবপূজা ও মহাযজ্ঞে অধিকার নাই,একচক্র রথ ও একপক্ষ পক্ষীর ন্যায় ভার্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্যে অযোগ্য। ভার্যাহীনের ক্রিয়ায় অধিকার নাই, ভার্যাহীনের সুখ নাই, ভার্যাহীনের গৃহ নাই, অতএব ভার্যা গ্রহণ করিবে, সর্বস্বান্ত হইয়াও বিবাহ করিবে।

স্ত্রীধর্মনিরূপনেও স্ত্রীলোকদের গার্হস্থ্য ধর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার বহু

উপদেশ শাস্ত্রে আছে। পতিপত্নীর একপ্রাণতা পতির প্রতি এবং পতির গার্হস্থ্য কার্যাবলীর প্রতি পত্নীর তীব্র মনঃসংযোগের বহু উপদেশ শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। মনু নারীজাতিকে পুত্র প্রদান করেন বলিয়া ইহারা মহাভাগা, পুজার্হা এবং গৃহের শোভা-স্বরূপা তাই গৃহস্থদের গৃহে গৃহিনী ও গৃহলক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রজানার্থং মহাভাগাঃ পুজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চনঃ॥

হিন্দুপতি সত্যস্বরূপ গ্রন্থিদ্বারা বিবাহের পবিত্র হোমানল সাক্ষী করিয়া, দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া তাহার সহধর্মিনীকে বলেন "হে দেবি, আজ হইতে তোমার ঐ হৃদয় আমার হউক, আর আমার যে এই হৃদয় ইহা তোমার হউক।"

যদেতদ্ধদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

হিন্দুবিবাহের এই অবিচ্ছেদ্য দৃঢ়তম বন্ধন যুগধর্মের অনিবার্য প্রয়োজনে আজ এমন একটি রূপ পাইয়াছে যাহাকে শুধু নামেই হিন্দুবিবাহ বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান স্মৃতিকার অর্থাৎ ভারতের বিধান সভার সদস্যদের অনুগ্রহে হিন্দুবিবাহ এখন কতকগুলি শুষ্ক আইনে (codified law) মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে। ইংরাজ আমলে হিন্দুবিবাহের শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধগুলির ভাঙ্গন ও পরিবর্তন প্রথম সুরু হয়। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমদিকে ও মুসলমান আমলে বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধগুলি ভারতের সর্বত্র ভাল ভাবে চালু ছিল এবং সকলেই তাহা সম্ভ্রমের সহিত পালন করিত। বৈদিকযুগে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু মধ্যযুগে ইহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ আইনানুসারে তাহা পাস করাইয়া লন। তাহার পর প্রচলিত হইল অসবর্ণ বিবাহ; ইহার হোতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনের দ্বারা ইহাকে সমাজসিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্যার হরিসিং গৌর ত্রিশ আইনের দ্বারা নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা না করিয়া অসবর্ণ বিবাহ করা যাইতে পারে বলিয়া আর একটি আইন পাস করান। কারণ পূর্বে অসবর্ণ বিবাহ করিতে হইলে, আমি হিন্দু নয় বলিয়া ঘোষণা করিতে হইত। ইহার পর আসিল ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শ আইন—যাহা 'সরদা অ্যাক্ট' বলিয়া প্রখ্যাত। এই আইনানুযায়ী পাত্রের বিবাহের বয়স কমপক্ষে আঠারো বৎসর এবং পাত্রীর বয়স কমপক্ষে পনেরো বৎসর হইবে নির্ধারিত হয়।

ইহার পর আবার আসিল ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের উনিশ ও আটাশ নম্বর আইন। এই আইনের বলে বিবাহবিচ্ছেদ ও স্বগোত্র ও সমপ্রবরে বিবাহ আইনসিদ্ধ হইল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পুনরায় হিন্দুবিবাহের আমূল সংস্কার সাধিত হইল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের একুশ নম্বর আইনের দ্বারা জাতিগত বর্ণগত শ্রেণীগত সম্প্রদায়গত যত কিছু বাধা বিপত্তি হিন্দু বিবাহের মধ্যে ছিল, তাহা আমূল সংস্কৃত হইয়া বিবাহ বিচ্ছেদের জমি হিসাবে

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের তেতাল্লিশ নম্বর আইনের দ্বারা আধাবিচ্ছেদের বিলাতী ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত হইল এবং ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের পঁচিশ নম্বর আইনটি 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে প্রবর্তিত হইয়া হিন্দুদের সিদ্ধ বিবাহ—শাস্ত্রীয় বা লৌকিক যাহাই হউক না কেন, তাহা ছেদনের জন্য এই আইনে এমন সুন্দর সুন্দর ধারা সন্নিবদ্ধ হইল, যাহা 'সর্বসিদ্ধ বটিকা'র ন্যায় একটি খাইলেই যেমন যে কোন অসুখ সারিয়া যায় তেমনি এই আইনের যে কোন ধারা প্রয়োগ করিলে বিবাহ বন্ধন ছেদন হইয়া যাইবে।

বর্তমান হিন্দুদম্পতির চিরজীবনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন **"বিবাহ"** পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজের সম্পত্তি হস্তান্তরের ন্যায় হিন্দুবিবাহ একটি চুক্তি পত্রে (marriage contract) মাত্র পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর প্রত্যেক কার্যে স্বার্থবিসর্জনের যে পবিত্র ছবি বিদ্যমান ছিল বিবাহে তাহা অধিকতর উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইত কিন্তু আজ হিন্দু বিবাহের প্রাচীন ধারা আমূল পরিবর্তিত হওয়ায় সেই পুণ্যতম পবিত্র চিত্র ক্রমশঃ সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

॥ সতী-দাহ ॥

"তিস্র কোট্যোহর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালঃ বসেৎ স্বর্গে ভর্তারং সানুগচ্ছতি"॥

এই দেশের নারীগণ পতিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন এবং পতিপরায়ণতাই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম ছিল। পতির সহিত সহমরণই সেই জন্য বঙ্গরমণীগণ তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং ইহাতে তাঁহারা জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। এই প্রথা কোন সুদূর অতীত কাল হইতে যে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। হিন্দু শাস্ত্রেও সতীর স্বামীর সহিত সহমরণ করিবার কথা লিখিত আছে। 'পরাশর সংহিতা'র এক বচন হইতে জানা যায় যে, মানবদেহে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে: যে নারী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন অর্থাৎ স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গে বাস করেন। তৎকালে সহমরণ দেখিবার জন্য ভীষণ জনসমাগম হইত, ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্য বাজিত এবং সতী তাঁহার শেষ বেশবিন্যাস করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিমুখে (অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায়) স্বামীর মৃতদেহ কোলে লইয়া দক্ষিণ হস্তে একটি আম্র-শাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভস্মীভূতা হইতেন। সতীর শেষ সিন্দুর ও শাঁখা পাইবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কারণ সতীর সিন্দুর মাথায় দিলে বা তাহার ব্যবহৃত শাঁখা পরিলে আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, এইরূপ একটা বিশ্বাস তৎকালীন মহিলাদের মধ্যে ছিল।

হিন্দুরাজত্বকালে কোন রাজা এই প্রথা রহিত করিবার কথা স্বপনেও চিন্তা করিতে পারিতেন না। বরং সতীরমণীর আত্মবিসর্জনের পবিত্র স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ 'সতীচোড়া ঘাটের' কথা উল্লেখ করিতে পারা

যায়। বেশী দিনের কথা নয়, ১৭৪২ খৃষ্টাব্দেও মুর্শিদাবাদে যে স্থানকে 'সতীচোড়া' বলে, তথায় জগৎ সেটের বাড়ীর কিছু উত্তরে কোন সতীর সহমরণ-স্মৃতি রক্ষা কল্পে, একটা মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এইরূপ সহমরণ-স্মৃতি তৎকালে বঙ্গদেশে বহুস্থানেই ছিল, কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

সতীদাহের উৎপত্তি ॥ হিন্দুশাস্ত্রে সতীদাহের কথা লিখিত থাকিলেও ঠিক কোন সময় হইতে সতীদাহ ভারতবর্ষে প্রচলিত তাহা বলা যায় না। সেলুকাস আলেকজান্দারের ভারত অভিযান বর্ণনা মধ্যে লিখিয়াছেন যে, রাজপুতনার এক অনার্য্য রমণী বিষপ্রয়োগে তাঁহার স্বামীকে হত্যা করে বলিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্য তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়; সেই সহমরণ হইতেই সতীদাহের উৎপত্তি হইয়াছে। (২)

সতী ॥ মহর্ষি বার্ষায়ণির মতে পদার্থমাত্রেরই ছয়টি অবস্থা আছে—উৎপত্তি, স্থিতি, পরিবৃত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ (ষড় ভাববিকার। ভবন্তীতি বার্ষায়ণিঃ—জায়তেহস্তি বিপরিণমতে বর্ধতেহপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি। নিরুক্ত)।ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাববিকার —অস্ ধাতুর উত্তর তিপের দ্বারা অর্থাৎ অস্তি দ্বারা নির্দিষ্ট—সত্তা। এই অস্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিলে সৎ বা সন্ত্ হয়, অর্থ বিদ্যমান। (সচ্চিদানন্দ শব্দে এই অর্থ আমরা দেখিতে পাই।) এই সৎ বা সন্ত্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হয়—সতী। আমরা মনে করি যাহা ভাল তাহারই সত্তা আছে, যাহা ভাল নহে তাহা উৎপন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার সত্তা নাই। এই জন্য সৎ-শব্দের অর্থ হইল—সত্য, উৎকৃষ্ট, প্রশস্ত, সম্মানিত, ধার্মিক (সত্যে সাধৌ বিদ্যমানে প্রশস্তেহভ্যাহিতে চ সৎ)। অসৎ শব্দের অর্থ হইল—মন্দ, নিকৃষ্ট।

পাশ্চাত্য দেশে অর্থের ধারা অন্য দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। সেখানে এই সৎ বা সন্ত্ শব্দের মূল হইতে ইংরেজীতে sin ও জার্মাণ ভাষায় suende আসিয়াছে, অর্থ—পাপ; লাটিন ভাষায় sons (sonteme) আসিয়াছে, অর্থ—দোষী; গ্রীক ভাষায় ate আসিয়াছে, অর্থ—মোহ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন, জগতে যাহা কিছু আছে সবেতেই কোন না কোন দোষ আছে। একদল বলেন—

In Adam's fall we sinn'd all.

অর্থাৎ অ্যাডামের পতনে আমাদের সকলেরই পাপ করা হইয়াছে। শব্দের অর্থ দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। সুতরাং সতী-শব্দের অর্থ—প্রকৃতপক্ষে যে নারীর অস্তিত্ব আছে, যিনি শুধু লোহকারের ভস্ত্রার মত শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলেন না, প্রকৃতপক্ষেই জীবিত আছেন, যিনি খাঁটি, উৎকৃষ্ট, ধার্মিক। এই জন্য অমরকোষে দেখিতে পাই—সতী সাধ্বী পতিব্রতা। নারীর পরম ধর্ম পাতিব্রত্য। এই পাতিব্রত্য যিনি কায়মনোবাক্যে পালন করেন, তাঁহাকে সতী বলা হয়। বাঙ্গালা প্রবাদে আছে—"পতির পায়ে যাহার মন তারে বলি সতী।" মা দুর্গা সতী শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নামই হইয়াছে সতী।

তৎকালে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে বহু নারীকে সহমৃতা হইতে হইত; কেহ সহমৃতা না হইলে সমাজের ব্যক্তিগণ তাহাকে 'অসতী' বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং সেইজন্য অপবাদের হাত হইতে নিস্তার কল্পে পুত্রও মাতাকে প্রজ্বলিত

চিতায় ফেলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাগনপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের একশত স্ত্রী ছিল; ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে, সাঁইত্রিশ জন স্ত্রী সহমৃতা হন এবং উপর্যুপরি তিন দিন ধরিয়া তাহার চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।

In 1798 at Baganpara 37 widows were burnt with their husbands, the fire was burning 3 days ; on the first day 3 were burnt, on the second 15, and on the third 19 ; the deceased had over 100 wives.

উলার মুক্তারাম নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার ত্রয়োদশজন ভার্যা সহমৃতা হন, কিন্তু শেষ দুইজন সূর্যাঘ্য দিবার সময় মন্ত্রপাঠকালে প্রাণভয়ে পলাইতে উদ্যত হইলে, তাহার পুত্র ধরিয়া আনিয়া মাতাকে চিতায় ফেলিয়া দেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রমানাথ এই ঘটনা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। (৩) সতীর স্বামীর সহিত সহমরণ হিন্দুগণ অনুমোদন করিত বলিয়া ইহা বোধ করা যাইত না। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লেডি আমহার্স্ট কলিকাতার নিকটবর্তী কোন একটি স্থানে সতীদাহ দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, একটি সতী প্রাণভয়ে জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিলে, ক্ষুব্ধ জনতা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর নৌকায় চড়াইয়া নদীর মধ্যে বলপূর্বক তাঁহাকে ফেলিয়া দেয়।

When the flame reached her, she lost courage, and amid a volume of smoke she contrived to slip down unperceived and gained a neighbouring Jungle, At first she was not missed, but when the smoke subsided it was discovered she was not on the pile. The mob became furious and ran into the Jungle to look for the unfortunate young creature, dragged her down to the river put her into a dingy and shoved off to the middle of the stream, where they forced her violently overboard and she sunk to rise no more, (৪)

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ সহমরণ সম্বন্ধে যে আদেশ 'সমাচার দর্পণে' বাহির হইয়াছিল তাহাও উল্লেখ্য :

সহমরণবিষয়।—সহমরণে গর্ভবতী ও বালিকার সহমরণ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে যেহেতুক ইহার বিধি নিষেধ শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে। গর্ভবতী ও বালিকার প্রতি সহমরণের বিধির লেশমাত্র নাই বরং পুনঃ পুনঃ নিষেধ লিখিয়াছেন গর্ভবতী ও বালাপত্যা ও বালিকাদিগের সহমরণ অকর্তব্য। এবং কোন কোন লোক স্ত্রীলোককে মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া অচৈতন্য করিয়া তাহাদিগের স্বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায় এ অতিশয় অনুচিত। এবং প্রাচীন ব্যবহারের বিপরীত। ইহাতে শ্রী শ্রীযুক্ত রাজশাসনকর্তার অনুমতিতে সকল থানাদারকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাহাদিগের স্বাধীন স্থান মধ্যে পূর্বোক্ত মন্দ রীতি অর্থাৎ অশাস্ত্র সহমরণ উপস্থিত হবামাত্র তাহারা দমন করিবে। এবং যে কেহ সহগমন করিবেক সম্বাদ প্রাপ্ত স্বয়ং কিম্বা আপন মুহুরির অথবা জমীদার এক জন হিন্দু বরকন্দাজ লইয়া সেখানে গিয়া বৃত্তান্তাবগত হইবেক। যে সে স্ত্রীর

সহমরণের ইচ্ছা বটে কিনা এবং পূর্বোক্ত বিষয়ের সন্ধানাদি করিবেক এবং যদ্যপি সে স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা না হইয়া থাকে কিম্বা গর্ভের লক্ষণ হইয়া থাকে অথবা মাদক দ্রব্যাহারে অজ্ঞান হইয়া থাকে তবে আনাদারাদি লোকেরা দৌরাত্ম্য বিষয় হইতে নিবর্ত করিবেক এবং সকলকে জানাইবে যে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া অযুক্ত অশাস্ত্র কর্ম পুনঃ ২ প্রচার হইলে দণ্ডার্হ হইবেক। যদি বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী সহগমনোদ্যতা হয় ও উপরের লিখিত প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাহার যাবৎ সহগমন বিধিবোধিতরূপে নির্বাহ না হয় তাবৎ হানাদারের লোক সেই স্থানে থাকিবেক। যদ্যপি কেহ বলাৎকারে ও মাদক দ্রব্যদ্বারা স্ত্রীলোককে দগ্ধ করণের চেষ্টা করে তবে তাহা বারণ করিবেক। এবং সকলকে জ্ঞাত করাইবে সে শ্রীযুত রাজ শাসন-কর্তার কখন এমত মনস্থ নহে যে এতদ্দেশীয় প্রজারাদিগের শাস্ত্রসম্মত কর্ম করণে প্রতি-বন্ধক হয়।

এই সহগমনের পূর্বে রাজাজ্ঞা লওনের আবশ্যক নাই পুলিসের দারোগারাদিগের উপরে এই আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা বিধিপূর্বক সহগমনের বারণ না করে ও কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। এবং মেজেষ্টর সাহেবেরাদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে ও শাস্ত্র সম্মত এই কর্ম নিষ্পন্ন হইলে আপনই প্রতিমাসিক রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেয়।

ফরাসী পরিব্রাজক বার্নিয়ার ॥ সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ডাক্তার বার্নিয়ার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণকালে কয়েকটি সতীদাহ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রথাকে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা বলিয়া অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সকল প্রসূতিই নিজ কন্যাকে বাল্যকাল হইতে স্বামীর সহিত সহমৃতা হওয়ার তুল্য পুণ্য ও প্রশংসার কাজ আর নাই, এই শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে বশীভূত রাখিবার, রোগে শুশ্রূষা পাইবার এবং বিষপ্রয়োগে স্বামী হত্যা না করে, এই সকল কারণে সহমরণের পোষকতা করিয়া থাকে।

বৈদেশিক ভ্রমণকারী কর্তৃক বিষ-প্রয়োগে স্বামী হত্যা হইতে সতীদাহের উদ্ভব হইয়াছে, এই বিবরণ পাঠ করিয়া বার্নিয়ার সাহেবও 'বিষপ্রয়োগ স্বামী হত্যার' কথা উল্লেখ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক লেখকগণ এই প্রথার উৎপত্তির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক ও ভুল। কারণ পূর্বে হিন্দু-নারী সর্ব ক্ষেত্রেই সাড়ে-তিন কোটি বৎসর স্বর্গে বাস করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় 'সতী' হইত। শেষে স্বেচ্ছায় সতী হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও, সামাজিক ব্যবস্থায় 'সতী' হইতে বাধ্য হইত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪১৯ হইতে ১৪৪৯ খৃঃ পর্যন্ত) নিকোলো ডি কন্টি (Mr. Nicolo-de'Conte) এক ইউরোপীয় পর্যটক ভারতবর্ষ পর্যটন করেন এবং তিনি কয়েকটি সতীদাহ দেখিয়াছিলেন। তিনি সতীদাহের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

ভারতে মৃতদেহকে দাহ করা হয় এবং তাহাদের স্ত্রীগণকেও প্রায় তাহাদের সহিত দাহ করা হয়। বিবাহের সময় যেরূপ নির্দ্ধারিত হয়, সেই হিসাবেই স্ত্রীকে সহমৃতা হইতে হয়। প্রথমা স্ত্রী আইনানুসারে সহমৃতা হইতে বাধ্য—এমন কি সে স্ত্রী একমাত্র পত্নী হইলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীগণকে এই সর্তে বিবাহ করা হয় যে,

স্বামীর মৃত্যুর পর তাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভা বৃদ্ধি করণার্থ সহমৃতা হইবে। এতদ্দেশে ইহা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

মৃত স্বামীকে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া খাটিয়ার উপর স্থাপন করা হয়। পিরামিডের আকারে শবের উপরে চিতা সজ্জিত করা হয়। এই চিতা সুগন্ধী কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়। চিতায় অগ্নি প্রদান করিলে, স্ত্রী বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করে। বহুসংখ্যক লোক সতীর সংগে সংগে চিতা প্রদক্ষিণ করে এবং নানারূপ বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। ইতিমধ্যে একজন পুরোহিত উচ্চস্থানারূঢ় হইয়া জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। চিতার চতুর্দিকে কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়া সতী শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অবগাহনান্তর চিতায় ঝম্প প্রদান করেন।

গঙ্গাচরণ সরকারের পিতা পরলোকগমন করিলে তাঁহার মাতা চুঁচুড়ায় সহমৃতা হন। গঙ্গাচরণ "ক্যাঁকশীয়ালী ঘাটের বটবৃক্ষ"কে সম্বোধন করিয়া সতীদাহ সম্বন্ধে একটি কবিতা ১৬ই বৈশাখ ১২৯১ সালের 'সাধারণী'তে প্রকাশ করেন। সতীদাহের চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল :

আরো তুমি এইস্থানে, দেখিয়াছ সন্নিধানে, কত সতী লয়ে মৃত পতি।
স্বামীভক্তি অনুবলে, চিতার জলন্তানলে, হাস্যমুখে হইয়াছে সতী॥
তবু তব জানা আছে, অনুত্যজে তব কাছে, পতি শ'য়ে যে সব রমণী।
তার মাঝে এক সতী, পতিরতা গুণবতী, এ দীনের ছিলেন জননী॥
বহুকাল হ'ল গত, বৎসর অর্ধেক শত তদুপরি আর পাঁচ ছয়।
গতাসু হলেন পিতা, মাতা হন সহমৃতা, শৈশবেতে আমি নিরাশ্রয়॥
এ ঘটনা বহুদিন, হয়েছে কালেতে লীন, পুরাকথা মাঝে প্রবেশিত।
আমি কিন্তু নাহি ভুলি, শ্মশানের সেই চুলী, মম হৃদে আছে জাগরিত॥
সেই কান্ড দরশন, করিবারে আগমন, নরনারী হল উপস্থিত।
তীর চর উপকুল, আবরিল নরকুল ঘাটে তরী কত উপনীত॥
আইল বিধর্মী কত, মুসলমান শত শত, আর কত ফিরিঙ্গী ইংরাজ।
দারোগা মুহুরী সনে, ইষ্ট বুঝি হৃষ্ট মনে, অগ্রসর হয় বর্কন্দাজ॥
জনতার পারাবার, নদীতটে সুবিস্তার, কোলাহলে উথলে কল্লোল।
বহুল বিকল ছাতা, উত্তাপে রাখিতে মাথা, জনার্ণবে তরঙ্গ হিল্লোল॥
হেথা হয়ে ভক্তিমতী, সাতপাক ফিরি সতী, লয়েছেন চিতায় আসন।
রক্ত চেলী পরিহিতা, সিন্দুরে শোভিছে সীতা, মুক্তকেশী অপূর্ব দর্শন॥
গলে দোলে পুষ্পমালা, প্রেতভূমি করি আলা, শবপাশে শোভিছে সুন্দরী।
শ্মশানে শঙ্কর যেন, ঘোরে ঘুমে অচেতন, বামে বসে আছেন শঙ্করী॥
নয়ন প্রফুল্ল অতি, ভাতিছে ভক্তির জ্যোতি, মুখপদ্মে হর্ষের উচ্ছ্বাস।
অটল বিশ্বাস মনে, লভিবে পতির সনে, অবিলম্বে স্বর্গে চিরবাস॥
পরে সতী এ জগতে, ঐহিক বান্ধব হতে, একে একে লইয়া বিদায়।

পুত্রে আশীর্বাদ করি, পতি শব বক্ষে ধরি, প্রেমানন্দে শুলেন চিতায়॥
মম হাতে নুড়া জ্বলে, মন্ত্র দ্বারা পূত হলে, মুখম্বয়ে দিলাম ফেলিয়া।
অনেক স্বজন আসি, দেয় তবে তৃণ রাশি, বাড়ে অগ্নি প্রবল হইয়া॥
পর্বত প্রমাণ হয়ে, শত শত শিখা লয়ে, ভীমাকারে জ্বলিল অনল।
হরিবোল দেয় লোকে, আমি ভয়ে কিম্বা শোকে, ফেলিলাম নয়নের জল॥

হুগলী জেলায় শেষ সতী-দাহ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়; জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিডে সাহেব ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বার্নিয়ার সাহেবের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহাই প্রমাণিত হইবে।

১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা হয়। সেই সময় আমি হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। আইন চালু হবার কিছুদিন আগে আমাকে জানান হল যে, আমার বাড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি সতীদাহ অনুষ্ঠিত হবে। হুগলীতে এই ধরণের ব্যাপার প্রায়ই ঘটিত। লোকের ধারণা ছিল, ভাগীরথীর পশ্চিম দিক এইরূপ পুণ্যের কাজের পক্ষে প্রশস্ত। "কারণ ভাগীরথীর পশ্চিমকূল—বারাণসী সমতুল"।

Such things were frequent in Hooghly as the banks of that side of the river were considered particularly propitious for such sacrifices.

খবরটা যখন আমার কাছে পৌঁছাল তখন চিকিৎসা বিভাগের ডাঃ ওয়াইজ এবং গবর্ণর-জেনারেলের (ভদ্রলোকের নামটা আমার মনে নেই) পুরোহিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই অনুসারে গাড়ী করে আমরা নির্দিষ্ট স্থান অভিমুখে যাত্রা করলাম। তখন নদীর তীরে দেশীয় লোকদের একটি ভিড় জড়ো হয়ে গেছে। চিতা জ্বালান হয়েছে। যিনি সতী হবেন তিনি সেই জ্বলন্ত চিতার সামনে মাটিতে বসে আছেন। আমাদের বসতে দেবার জন্যে চেয়ার আনানো হলো। আমরা মহিলাটির সন্নিকটে বসলাম। আমার সঙ্গীদ্বয় দেশীয় ভাষা না জানলেও মহিলাকে এই কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে যুক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। তাদের বক্তব্য আমি মহিলাকে তার ভাষায় তর্জমা করে শোনাতে লাগলাম। মহিলা সশ্রদ্ধ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিটি কথা শুনলেন। কিন্তু আমাদের যুক্তি তাঁর মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। পুরোহিত এবং সমবেত জনতাও মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছিল।

অবশেষে মহিলার মধ্যে একটু যেন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল। তিনি চিতায় প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমাদের করার আর কিছু নেই দেখে আমি মহিলাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু চিতায় আরোহণের পূর্বে পাদ্রী সাহেব মহিলাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করলেন : "মহিলা কি জানেন, কি নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হবে?" Did she know what pain she was about to suffer ?

ভদ্রমহিলা আমার পায়ের কাছে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলাম তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত-মুখে ঈষৎ

ব্যঙ্গের একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। প্রশ্নের জবাবে মহিলা বললেন—একটা প্রদীপ আনান।

প্রদীপ আনান হলো—নৌকো ধরণের যে প্রদীপ চাষীরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকে। সেই সঙ্গে এলো ঘি আর বেশ বড় একটা সল্‌তে।

প্রদীপটা মহিলা নিজেই যথারীতি সাজালেন। তারপর বল্‌লেনঃ এইবার জ্বালান।

প্রদীপটা জ্বালিয়ে মহিলার সামনে রাখা হলো। তারপর উপেক্ষার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে মহিলা মাটিতে কনুই রেখে একটা আঙুল প্রদীপের শিখার উপর ধরলেন। আঙুলটা পুড়ে ফোস্কা উঠলো তারপর কালো হয়ে ঝুলে পড়লো—পালকের কলম মোমবাতির উপর ধরলে যেমনটি হয়। মহিলা কিন্তু এক-মুহূর্তের জন্যও আঙুল সরালেন না। একটি শব্দ করলেন না বা তাঁর মুখের অভিব্যক্তি একটুও পরিবর্তিত হলো না। এই রকম কিছুক্ষণ চল্‌লো। তারপর ভদ্রমহিলা বললেন : এইবার আপনার সন্দেহভঞ্জন হয়েছে তো? She then said : "Are you satisfied ?"

আমি বল্‌লাম, হাঁ হয়েছে। I answered hastily "Quite satisfied."

মহিলা তখন আঙুল সরিয়ে দিয়ে দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে বল্‌লেন :

এইবার তা'হলে আমি চিতায় আরোহণ করতে পারি? Now, may I go

আমি সম্মতি দিলাম। To this I assented

ভদ্রমহিলা তখন ধীরে ধীরে চিতায় আরোহণ করলেন।

নদীর তীর ঘেঁষে চিতাটি রচনা করা হয়েছিল। চিতাটি ছিল প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু এবং প্রায় অতটাই লম্বা। চওড়া ছিল প্রায় তিন ফুট। মহিলাকে বার-তিনেক চিতাটি প্রদক্ষিণ করান হল। তারপর তিনি চিতায় আরোহণ করলেন। উপুড় হয়ে হাতের উপর মুখ রেখে মহিলা চিতার উপর শুলেন—যেন ঘুমুতে যাচ্ছেন। মহিলার উপর তারপর আর এক-পর্দা কাঠ চাপান হল। ইচ্ছা করলেও যাতে তিনি চিতা ছেড়ে বেরোতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে জনতা তাঁকে চিতার সঙ্গে বাঁধতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম। তারা অনিচ্ছার সঙ্গে আমার নিষেধ শুনলো। এইবার তার ছেলেকে ডাকা হলো চিতায় আগুন দিতে।

ভদ্রমহিলার স্বামী দূরদেশে মারা গিয়াছিলেন। তাঁর দেহ আনা সম্ভব হয় নি। তার বদলে তাঁর পরিধেয়ের কিছু অংশ মহিলার সঙ্গে চিতায় দেওয়া হল। তারপর ধূপের গুঁড়ো আর ঘি দিয়ে চিতা জেবলে দেওয়া হল। প্রথমে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠলো পাক-খেয়ে, তারপর দপ করে জ্বলে উঠলো চিতা। আগুনের তাপ অসহ্য না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমি চিতার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু কোনরূপ নড়াচড়া বা যন্ত্রণার আর্তনাদ শুনতে পাই নি।

যে পুত্র চিতায় অগ্নি-সংযোগ করেছিল, সেও চিতার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এইভাবে হুগলী জেলার এবং সম্ভবতঃ বাংলাদেশের শেষ আইনসম্মত সতীদাহ অনুষ্ঠিত হলো।

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গদেশের মধ্যে বর্তমান হ্‌গলী জেলার মধ্যেই সতীদাহ সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহার কারণ তৎকালে ত্রিবেণী ও "নিমাই তীর্থ" বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্‌ণ্যতীর্থ ছিল এবং কাশী-মৃত্যুর ন্যায় এই স্থানদ্বয়ে মৃত্যু হওয়া এক মহাপ্‌ণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। উচ্চশ্রেণীর হিন্দ্‌, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেই, সহমরণ বেশী হইত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর এই সহমরণ-প্রথা আইন-বির্‌দ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়; তাহার দশ বৎসর প্‌র্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ ও ৫ই জ্‌ন তারিখের সমাচার-দর্পণের দ্‌ইটি সংবাদ হইতে হ্‌গলী জেলায় সহমরণের আধিক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যাইবে। "অধিক সহমরণ বাঙ্গলা দেশে হয়, পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গলার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপিলের অধীন জিলাতে অধিক হয়। আরো হিন্দ্‌স্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হ্‌গলীতে হয়।"

"সহমরণ—তৃতীয় সন জেলা হ্‌গলীতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে, গত বৎসর ঐ জেলাতে দ্‌ই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছ্‌ নিশ্চয় হয় নাই। অন্য অন্য জেলা হইতে জেলা হ্‌গলীতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।"

বৈদেশিক লেখকগণ সহমরণকে বর্বর-প্রথা এবং প্‌র্‌ষগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহা সমর্থন করেন বলিয়া, ভারতবাসীকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্‌র্বে হ্যালিডে সাহেবের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি; নিম্নে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখের সমাচার-দর্পণের সংবাদটি হইতে প্রমাণিত হইবে, যে রমণীগণ 'সতী' হইবার জন্য আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন।

"১৪ই শ্রাবণ সোমবার চাতরা গ্রাম-নিবাসী ষটপঞ্চাশদ্বৎসর বয়স্ক রামধন বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন। তাঁহার প'য়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী তৎসহগামিনী হইতে উদ্যতা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গেরা ও রাজ সম্পর্কীয় লোকেরা নানা প্রকার নিবারণ করিল, কিন্তু ঐ স্ত্রী সে সকল কথা কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে মোং চাতরার ঘাটে সহমৃতা হইলেন।"

সম্রাট আকবর তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষের প্রতি জেলায় এবং শহরে বলপ্‌র্বক সতীদাহ যাহাতে না হয় তজ্জন্য ইন্সপেক্টর নিয্‌ক্ত করেন। আকবর আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় কোন সতী যাহাতে সহমৃতা না হন, তদ্বিষয়ে নজর রাখিতেন। এই সম্বন্ধে আব্‌ল ফজল "আকবর নামা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

In the interior of Hindusthan it is the custom, when a husband dies, for his widow willingly and cheerfully to cast herself into the flames (of the funeral pile), although she may not have lived happily with him. Occasionally love of life holds her back, and then the husband's relations assemble, light the pile, and place her upon it,

thinking that they thereby preserve the honour and character of the family. But since the country had come under the rule of his gracious Majesty, inspectors had been appointed in every city and district, who were to watch carefully over these two cases, to discriminate between them, and to prevent any woman being forcibly burnt. (৫)

মুসলমান রাজত্বকালে শাসন-কর্তারা সহমরণ প্রথা সমর্থন করিতেন না এবং কেহ কেহ বাধা দিতেন বলিয়া জানা যায়।(৬) আবার অন্য গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, গভর্নমেন্ট হইতে কোন বাধা দেওয়া হইত না, তবে উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের নিকট হইতে সহগামী হইবার পূর্বে অনুমতি লইতে হইত।(৭) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আমলে হুগলী জেলা হইতেই এই প্রথা রদ করিবার জন্য সর্বপ্রথম রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরী তৎকালীন গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলীকে পত্র দেন এবং ডাঃ বুকাননের সহযোগিতায় তাঁহারা এই প্রাণান্তকর প্রথা সংযমিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। The Serampore missionaries first moved in the matter in 1804, when Carey consulted Pandits who advised that Suttee was merely a virtue and not a duty.
ইহার পূর্বে একমাত্র সম্রাট আকবর এই প্রথা রহিত করিবার একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় বঙ্গদেশে সহমরণ লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তিনিও এই নৃশংস প্রথা রহিতের জন্য আঠার বৎসর যাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়া দেন যে, স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে হইবে, শাস্ত্রে এমন কোন নির্দেশ নাই।

ইংরেজ গভর্ণমেন্টও এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কি না, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না কারণ বহু হিন্দু ইহা সমর্থন করিয়া সভা করিতে লাগিলেন এবং ইহা রদ করিলে হিন্দুধর্মের গায়ে হাত দেওয়া হইবে বলিয়াও দরখাস্ত করিলেন। যাঁহারা ইহার রহিতের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাদিগকে "সতীদ্বেষী" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট সতীদাহ সম্বন্ধে কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন করেন। কিন্তু একেবারে এই প্রথা রহিত করিতে সাহসী হন নাই (রামতনু লাহিড়ী পৃঃ ৬৬)। রক্ষণশীলগণ যাহাতে সতীদাহ বন্ধ না হয় তজ্জন্য "ধর্মসভা" বলিয়া একটি সভারও প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই ধর্মসভার সভাপতি ছিলেন। যাহা হউক, কেরী সাহেব, তাহার বন্ধু জর্জ উদনে এবং রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক সতীদাহ আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া একটি ঘোষণা করেন। রাধাকান্ত দেব ১৭ই নভেম্বর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তারিণীচরণ মিত্রকে লেখেন—"I deeply regret to inform you that the Suttee petition was dismissed after a long argument for three days. The dismissal, however, was not unanimous and impartial as 4 Lords of the Privy Council were in favour of the Petition and 6 against it"

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে কর্তৃপক্ষ সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হন এবং সমস্ত থানার দারোগাগণকে কোন সতী সহমরণে যাইবেন শুনিলে, যেন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া, নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা হয়, এইরূপ নির্দেশ দেন। দারোগাগণ যথাসম্ভব নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিত এবং প্রতিমাসে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উহার একটি তালিকাও পাঠাইত। নিম্নে দারোগাদের বিবৃতি কিরূপ হইত প্রদত্ত হইল ঃ

"আমি (দারোগার নাম) উক্ত মহিলাকে শান্তভাবে কোন গোলমালের সৃষ্টি না করিয়া সহমরণে যাইতে নিবৃত্তি করি এবং তাঁহাকে পরে গ্রামের মণ্ডলের হস্তে অর্পণ করি। মহিলাটি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে বলে এবং দুই দিবস যাবৎ কোনরূপ আহার্যও গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তৃতীয় দিবসে তাঁহার দৃঢ়তা কিঞ্চিৎ শান্ত হয় এবং বর্তমানে তিনি বেশ সন্তুষ্ট আছেন।"

I (the name of the Darogah) effectually and without disturbance restrained the woman from her purpose and gave her into the charge of the Gomastha and Mandal. For two days she refused food and declared she would die by starvation. Her resolution failed her on the third day and she has since been perfectly contented.

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থে রামমোহনের পূর্বে সতীদাহ বিষয়ে সরকার কি করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে, গবর্ণমেণ্ট সতীদাহ নিবারণের জন্য সময় সময় চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালের শেষ ভাগে প্রথম সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী, তাঁহার আদেশানুসারে ডাওডেস্‌ওয়েল সাহেব নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গুড সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এইরূপ ঃ

"নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত গুড সাহেব মহাশয় সমীপেষু। মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত মাননীয় গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে অবগত করিতেছি যে, বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রেরিত পত্রের যে প্রতিলিপি আপনার নিকট পাইলাম, তাহা আপনি নিজামত আদালতের বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিবেন। দেখিতে পাইবেন যে উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃতদেহের সহিত নিজদেহ ভস্মীভূত করিতে চেষ্টা করিলে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। নিজামত আদালত জ্ঞাত আছেন যে, এদেশীয় লোকের ধর্মমত; আচার ব্যবহার এবং সংস্কার সকল জ্ঞাত হইয়া, নীতি, সুবিবেচনা ও দয়াধর্মের সহিত যতদূর সঙ্গত হইতে পারে, এবং সকল অবস্থায় কার্যতঃ যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্যন্ত তাঁহাদের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান নিয়ম। বেহারের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট, এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে সমুদয় ঘটনা লিখিয়াছেন,—ইহার কিশোর বয়স, ইহার নেসার অবস্থা State

of intoxication or stupefaction) তাহার স্বামীর শবদাহের সময়, তাহার এই প্রকার অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারেল ইহা নির্ণয় করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন যে, এই অস্বাভাবিক ও নৃশংস দেশাচার সম্পূর্ণরূপে রহিত করা যাইতে পারে কি না? অথবা উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইয়াছে, তদনুসারে যদি এই প্রার্থনীয় উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা এমন উপায় সকল অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, যদ্দ্বারা ভবিষ্যতে সহগমনে প্রবৃত্ত নারীদিগকে তাঁহাদের আত্মীয়েরা অন্যায় উপায়ে উত্তেজিত করিতে না পারে। যেমন, বেহারের ম্যাজিস্ট্রেট লিখিয়াছেন যে, ঐ স্ত্রীলোকের আত্মীয়েরা উহার নেসা করাইয়া উহার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া দিয়াছিল। এরূপ গর্হিত কার্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নিজামত আদালতকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আদালত যেন প্রথমে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন যে, এই প্রথা হিন্দু-ধর্মানুমোদিত কি না? যদি এই প্রথা হিন্দুধর্মের অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে গবর্ণরজেনারেল্ আশা করিতে পারেন যে, এক্ষণে না হইলেও, সহমরণ-প্রথা সময়ে রহিত হইতে পারিবে। নিজামত আদালত যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, উক্ত প্রথা হিন্দুধর্মানুমোদিত বলিয়া উহা রহিত করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে গবর্ণরজেনারেল সাহেব নিজামত আদালতকে অনুরোধ করেন যে, যাহাতে উপরি উক্ত নিন্দনীয় কার্য সমুদয় রহিত হয়, এরূপ সদুপায় অবলম্বন করা হয়। যে কোন প্রকারে হউক, যাহাতে সহমরণোদ্যতা স্ত্রীলোকগণকে মাদকদ্রব্য ও ঔষধ সেবন করান না হয়, এরূপ করা আবশ্যক। অল্প বয়স বা অন্য কোন কারণে, হিতাহিত নির্ধারণে অক্ষমা স্ত্রীলোকগণকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করা উচিত।

খৃষ্টাব্দ ১৮০৫ ভবদীয় ইত্যাদি
৫ই ফেব্রুয়ারী ডাওডেস্‌ওয়েল
বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ

১৮০৫ খৃষ্টাব্দ, ৪ঠা মার্চ দিবসে, নিজামত আদালতের পণ্ডিতগণের নিকট, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য একখানি পত্র প্রেরণ করা হয়। সেই কয়েকটি প্রশ্ন এই :

"হিন্দুদের মধ্যে, সময় সময় এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখা যায় যে কোন লোকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্ত্রী মৃতস্বামীর সহিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া থাকেন, সেইজন্য আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, ঐরূপ কার্যে শাস্ত্রের কিরূপ বিধি আছে? মৃতস্বামীর অনুগমন করা শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্র বিরুদ্ধ? শাস্ত্রে সহগমনের ব্যবস্থাই বা কি কি? আপনাদিগকে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে ইহার উত্তর দিতে হইবে।"

নিজামতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এই;—

"নিজামত আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্ন বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া আমি যথাজ্ঞান তাহার উত্তর দিতেছি।

"যাহারা পত্যানুগমনের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অত্যন্ত শিশু সন্তান থাকিলে, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা হইলে, ঋতুকাল হইলে, কিম্বা নাবালিকা অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমরণ হইবার যোগ্য নহেন; উপরি উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না থাকিলে, সহমৃতা হইতে কোন নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চাতুর্বর্ণের প্রতিই এই নিয়ম। যে স্ত্রীলোকের শিশুপুত্র বা কন্যা থাকে, তিনি যদি ঐ শিশুর প্রতিপালনের জন্য কোন স্ত্রীলোককে আপনার প্রতি-নিধিস্বরূপ রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহমৃতা হইতে কোন স্ত্রীলোককে সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। এইরূপে অজ্ঞান বা উন্মত্ত করাও অবৈধ্য। সহমরণের পূর্বে স্ত্রীলোকদিগের সংকল্প করিতে হয়, এবং অন্যান্য কোন কোন বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অঙ্গিরা, ব্যাস, ও বৃহস্পতি প্রভৃতি মহামুনিগণ ইহার প্রবর্তক।

"মানবদেহে সার্দ্ধত্রিকোটী লোম আছে। যাঁহারা সহমৃতা হন, তাঁহারা ততসংখ্যক বৎসর, অর্থাৎ সাড়েতিনকোটি বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস করেন। যেমন সর্পব্যবসায়ীরা গর্ত হইতে সর্পকে টানিয়া বাহির করে, সেইরূপ সহমৃতা স্ত্রীলোকেরা নরক হইতে নিজ নিজ স্বামীদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। পরিশেষে, স্বামীদিগের সহিত স্বর্গলোকে বিচরণ করেন। শিশুসন্তানবতী, গর্ভবতী, ঋতুমতী, ও অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী-লোকদের পক্ষে পূর্বে যে নিষেধের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সগর রাজার জননীকে ঔর্ব ও অন্যান্য ঋষিরা বলিয়াছিলেন।" শ্রীঘনশ্যাম শর্মা।

ঘনশ্যাম শর্মা নিজামত আদালতের বেতনভোগী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পত্র পাইয়া নিজামত আদালত হইতে তাঁহাকে আরও দু'একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সে প্রশ্ন এই;—

"যদি কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইতে উদ্যত হইয়া পুনর্বার তাহা হইতে নিবৃত হন, তাহাহইলে তাঁহার পরিণাম কি হয়? তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন?" ঘনশ্যাম শর্মা এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম এই ঃ—

যদি কোন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইবার জন্য সংকল্প ও অন্য সকল ক্রিয়া না করিয়া থাকেন তাহা হইলে, শাস্ত্রানুসারে; তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। এ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। শাস্ত্রে তাহার কোন বিধি কিম্বা নিষেধ নাই। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া সহমরণ হইতে নিবৃত্ত হন, তাহাহইলে তাঁহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর, তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে পারেন।

শাস্ত্রে আছে যে, যে স্ত্রীলোক সাংসারিক মায়াবশতঃ সহমরণ হইতে বিরত হন, তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত পাপমুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীঘনশ্যাম শর্মা।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেস্‌লী, লর্ড কার্ণওয়ালিস্‌, ও সার জর্জ বার্লো এই তিনজন গবর্ণর জেনারেল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উক্ত সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধিকারেরশেষে, সতীদাহ বিষয়ে যাহা কিছু কার্য হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিলাম। ঐ

সালেই লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দ্বিতীয়বার গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন তাঁহার সময়ে সতীদাহ বিষয়ে কোন কার্য হয় নাই। ১৮০৫ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সার্ জর্জ বার্লো গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তাঁহার সময়েও সতীদাহ বিষয়ে কোন কার্য হয় নাই।

সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টায় জনমত গঠন ও শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা সতীদাহ প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রকাশ্যে প্রতিপাদনের জন্য রামমোহনকে সতীদাহ নিবারণী আন্দোলনের জনক বলা যায়। সতীদাহ প্রথার বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সর্বপ্রথম খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় আন্দোলন করেন তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী প্রোভোষ্ট ডাঃ ক্লডিয়াস বুকানন এই বিষয়ে প্রথমে আন্দোলন করেন। বুকাননের চেষ্টায় উক্ত কলেজের ডাঃ কোলব্রুক ও বাঙলা ভাষার অধ্যাপক ডাঃ কেরী কলেজের দশজন পণ্ডিতকে লইয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ছয় মাস যাবৎ তাঁহারা শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া সতীহয়নেচ্ছু নারীদের শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন। শাস্ত্রবচনগুলি পরে তাঁহারা 'শুদ্ধিসংগ্রহ' নামক পুস্তকে প্রকাশ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বুকাননের প্রণীত Memoirs of the expediency of on eclesiastical establishment নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। উক্ত পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেনঃ

> The Hindoo directly violate the laws of their religion. All vows are optional, the committing of murder in consequence of a vow does not lesson the guilt.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে দশজন পণ্ডিত বুকানন সাহেবকে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া ও শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম (১) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (২) রামনাথ বাচস্পতি (৩) পদ্মলোচন চূড়ামণি (৪) শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় (৫) কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত (৬) শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার (৭) রামকুমার শিরোমণি (৮) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (৯) রামচন্দ্র রায় এবং (১০) নরোত্তম বসু।

ভারতবাসীর মধ্যে রামমোহন রায় এই আন্দোলনের প্রথম বাখ্যাতা ও আচার্য। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের পত্নী অলকমঞ্জরী দেবী সহমৃতা হইলে রামমোহন চিতাপার্শ্বে প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহার পর চিতাপার্শ্বে প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করিতে দীর্ঘ আঠার বৎসর যাবৎ তিনি নির্ভীক চিত্তে অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাধনায় **সতীদাহ** আইনের সাহায্যে রদ করিতে সমর্থ হন। শ্রীমতী মার্টিন এই সম্বন্ধে 'হরকরায়' বলিয়াছেনঃ

> The glowing sympathy intelligence and fearless energy displayed through a course of eighteen years by their great and at length successful advocate Rammohun Roy.

সহমরণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়। সংবাদগুলি এই ঃ

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয় কেহ কেহ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথাও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণবিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গলা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এইপুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে। (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮১৯)

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় পুনর্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক। (৪ঠা ডিসেম্বর ১৮১৯)

২৩ জানুয়ারী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে লর্ড বেন্টিক সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য আইন প্রনয়ণ করিলে কালীনাথ রায় চৌধুরী, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেন, তাহার বিবরণ এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিলঃ

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিএম কেবেণ্ডিশ বেন্টিক গবরনর জনরেল বাহাদুর ইন কৌনসেল মহামহিমেষু ফোর্ট উলিএম।

পরের নাম লিখিত কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারে প্রফুল্ল অন্তঃকরণ সহিত এবং প্রচুর সম্ভ্রম পূর্বক প্রার্থনা করিতেছে যে শ্রীলশ্রীযুত অনুমতিক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দু প্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত মহামহিম ইদানীন্তন যে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্বক স্ত্রীবধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় উৎসাহকারী রূপ ও দুর্নাম হইতে চিরকালজন্য এ শরণাগত প্রজারদিগুগে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত হইয়া যে সুসিদ্ধ যত্ন করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ২ স্বীকার নম্রতাপূর্বক শ্রীলশ্রীযুতের সাক্ষাতে করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হিন্দু প্রধানেরা আপন২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর নির্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লঙ্ঘন এবং অবলা জাতির রক্ষনা বেক্ষন যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান তন্নিমিত্ত আপনাদের অবাধিত ক্ষমতার উপর নির্ভরপূর্বক ধর্মছলে সজীব বিধবারা যে স্বামীর মরণের পরই শোকের ও নৈরাশ্যের প্রথম উন্মুখে আপন২ শরীর দগ্ধ করেন এই রীতি চলিত করিলেন। ওই পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরানুগামি ইতর লোকের ও অত্যন্ত মনোনীত হইবাতে তাহারাও তদনুরূপ ব্যবহারে ঝটিতি প্রবর্ত হইয়া আপনাদের অত্যন্ত মান্য শাস্ত্র উপনিষৎ ও ভগবদগীতাকে অবহেলন করিয়া এবং ভগবান মনু যিনি প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবক্তা হন তাঁহার সে আজ্ঞা অর্থাৎ ক্ষমাঅবলম্বন তপোরূপ ধর্মযাজন আর আপনাকে কায়িক সুখ হইতে রহিত করণইত্যাদি ধর্ম আমরনান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন ৫ অধ্যায় ১৫৮ শ্লোক, তাহাকেও তুচ্ছ করিলেন। বাস্তবিক ইহারা

স্ত্রী পরম্পরার প্রতি আপন ২ সন্দিগ্ধান্তঃকরণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু লোকেতে এমত গর্হিত কর্ম হইতে আপনাদিগ্গে নির্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ দুর্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন যাহাতে স্বেচ্ছাপূর্বক বিধবাকে স্বামীর জ্বলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেন যেন তাঁহারা এরূপ স্ত্রীদাহ ব্যবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতেছিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সন্দেহে মুগ্ধ হইয়া করেন নাই। বস্তুত ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীলশ্রীযুত ইংলণ্ডীয় এতদ্দেশাধিপতিরা যাঁহাদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রী পুরুষ তাবৎ প্রজাদের জীবন সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় রূপ জানিলেন যে ওই সকল দুর্বল শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগ্গে ইচ্ছাপূর্বক জ্বলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কার্যের দ্বারা অমান্য করিতেছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্যের সম্পূর্ণ মতি অন্যথা করিয়া পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের দাহকালীন তাহা-দিগ্গে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারেন এ নিমিত্ত তদ্যোগ্য রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্য স্বভাবের ও করুণার সর্বথা বিরুদ্ধ এই ব্যাপার ভূমি স্থানে পুলিসের সংক্রান্ত আমলা যাহারা প্রাণির রক্ষার ও লোকের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দতার নিমিত্তে ব্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের অস্পষ্ট অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছিল।

অনেকস্থলে যেখানে সক্ষম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিসের এতদ্দেশীয় আমলারা আপন আপন ইচ্ছানুরূপ আচরণে নিবারিত ছিল কেহ কেহ বিধবা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়া চিতা হইতে পলায়নপূর্বক আপন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেহ কেহ বা ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া চিতার নিকট হইতে নিবর্ত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাঁহাদের প্রবর্ত্তকদের মরণ তুল্য নৈরাশ্য জন্মিল। কোন স্থানে বিধবাদিগকে এরূপ মরণ উচিত নহে ইহা বিশেষ মতে বোধগম্য করাতে এবং তাঁহাদের রক্ষার ও যাবজ্জীবন প্রতিপালনের অঙ্গীকার করিবাতে তাঁহারা আপনারদের জ্ঞাতি ও আত্মীয় কর্তৃক ভর্ৎসন রাশিকে আপনাদের উপর স্বীকার করিয়াও সহমরণ হইতে নিবর্ত্তা হইয়াছেন। তাবৎ সহমরণ ঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতি দারুণ ও কুৎসিত এবং ইংলণ্ডীয় অধিকারের নীতির অতি বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধানপূর্বক শ্রীলশ্রীযুত কৌন্সলে বিচার ও করুণা উভয় প্রদর্শিত নীতির বিশেষানুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় নামের মহিমা সূচনার্থ আবশ্যক কর্তব্য বোধ এই এই নিয়মকে নির্দ্ধারিত করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুতের হিন্দু প্রজাদের স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা অধিক যত্ন পূর্বক করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোক প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অতিশয় পাতক পুনর্বার আর হইতে না পায় এবং হিন্দুদের অতি প্রাচীন পবিত্র ধর্মকে তাঁহারা নিজে যেন তুচ্ছ না করেন। সম্প্রতিক এ অধীনদের জ্ঞাতসার হইল যে ওই আজ্ঞানুসারে মেজেস্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্বোপায়ের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুতের আজ্ঞাকে প্রতিপালন করেন।

শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনাদের অন্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিহ্ন যাহা এমত স্থানে ব্যবহার্য্য হয় তদ্দ্বারা

দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু অধীনদের অন্তঃকরণ ও ধর্ম বারম্বার আজ্ঞা দিতেছেন যে এ শরণাগতরা অন্তঃকরণের ভাব যাহা তাবত হিন্দুর প্রতি পরমাণুগ্রাহক শ্রীলশ্রীযুতের এই চিরস্থায়ি মহোপকার কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সর্বসাধারণ বিজ্ঞপ্তি করা যায়; যদি এ সময় এ শরণাগতরা তাচ্ছল্যপূর্বক মৌনাবলম্বন করে তবে সর্বথা কৃতঘ্ন ও প্রবঞ্চক রূপে গণিত হইতে হইবেক এ নিমিত্ত এ অধীনেরা এ নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনা দ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে এ অধীনদের সর্বান্তঃকরণ সহিত শ্রীলশ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকাররূপ উপহার, যাহা যদ্যাপিও শ্রীলশ্রীযুতের মহোচ্চপদের যোগ্য হয় না তাহা কৃপাপূর্বক গ্রাহ্য করেন। ও যাঁহারা শ্রীলশ্রীযুতের এই পরম অনুগ্রহকে এ অধীনদের সহিত তুল্য রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ এই সর্বসাধারণ কর্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ঐক্য হইলেন নাই তাঁহাদের এই ঔদাস্যকে কৃপা পূর্বক ক্ষমা করেন সবিনয় নিবেদন মিতি।

কালীনাথ রায়চৌধুরী রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইত্যাদি।

বর্তমান বঙ্গসমাজে রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উৎসারিত করেন বলিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ

যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড়পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল। সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচন্ডবলে আঘাত করিলেন, তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্রধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোট বড়ো নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্ততঃ প্রতিদিন কন্টককীর্ণ গুল্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙ্গিলেন; সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপর আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতাসাগরের প্রচন্ড বন্যা বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্বের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

সতীদাহ প্রথা নিবারণে রামমোহনের অগ্রাধিকার খর্ব করিবার জন্য জর্জ স্মিথ উই-

লিয়ম কেরীর জীবনীতে রামমোহনের কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি সহগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অনুসন্ধান করিয়া জানাইবার জন্য কেরী সাহেবের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে অনুরোধ করেন। তিনি ব্রহ্মচর্য ও সহগমনের মধ্যে প্রথমটিই শ্রেয়ঃ এই অভিমত দেন।* রামমোহনের এই সম্বন্ধে প্রথম পুস্তিকা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুঞ্জয়কে সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টায় অগ্রণী বলিয়াছেন। একটি অভিমত জ্ঞাপন করিলে যদি অগ্রাধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে শুদ্ধি সংগ্রহের অভিমত প্রদানকারী পণ্ডিতগণ এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা সহগমন যে অবশ্যকর্তব্য নয়, এই অভিমত মৃত্যুঞ্জয়ের পূর্বেই প্রচার করিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি সমর্থনযোগ্য নয় বলিয়া প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করিলাম।

সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষ হইতে বর্তমানে উঠিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে বহু সত্যবাদী নিরপেক্ষ বিদেশীয় মনীষী ভারতীয়গণের নৈতিক চরিত্রবলের এবং নারীর সতীত্ব ও শালীনতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক স্যার জন, কে লিখিয়াছেন—"প্রাচীন খৃষ্টান সংস্কারদিগের মধ্যে অনেকে ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু সতীদের মত মৃত্যুকালে মহত্তর ধৈর্য দেখাইতে পারেন নাই। এই মহীয়সী মহিলাদের জগতে তুলনা নাই।" কর্ণেল টড তাঁহার 'রাজস্থানে' লিখিয়াছেন, "জগতের কোন জাতির ইতিহাসে হিন্দুনারীর মত গভীর পতি-প্রেম, হাসিমুখে আত্মত্যাগ এবং পতিপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।"

সতীদাহ সম্বন্ধে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন, আস্তে আস্তে বাহ্য বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামীচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতেছেন বা বলিতে সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি "

ভারতের বড়লাট লর্ড বেন্টিক কর্তৃক সতীদাহ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ষোল নম্বর রেগুলেশন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধরূপে ঘোষিত হইলে **মহানুভব ডিরোজিও সাহেব** উল্লসিত হইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে "ইণ্ডিয়া গেজেটে" সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুসমাজের তথা নারীজাতির যে মঙ্গল সাধন হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত কবিতাটির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ইণ্ডিয়া গেজেটের পুরাতন সংখ্যাগুলি সহজপ্রাপ্য নয় বলিয়া দরদী কবির সম্পূর্ণ কবিতাটি এই স্থানে হুবহু উদ্ধৃত হইল :

---

* ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর সংখ্যা মাসিক 'ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতের সারাংশ ইংরাজীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

ON THE ABOLITION OF SUTTEE

By Henry Louis Vivian Derozio

Red from his chamber came the morning Sun
And frowned, dark Ganges ! on thy fatal shore,
Journeying on high ; but when the day was done
He set in smiles, to rise in blood no more,
Hark ! heard ye not ? the widow's wail is o'er :
No more the flames from impious pyres ascend,
See Mercy now primeval peace restore,
While paeans glad the arch etherial rend,
For India hails, at last, her father and her friend.

Back to its cavern ebbs the tide of crime,
There fettered, locked, and powerless, it sleeps ;
And History bending o'er the page of Time,
Where many a mournful record still she keeps,
The widowed Hindu's fate no longer weeps :
The priestly tyrant's cruel chain is broken,
And to his den alarmed the monster creeps :
The charm that mars his mystic spell is spoken,
O'er all the land 'tis spread : he trembles at the token.

BENTINCK, be thine the everlasting meed !
The heart's full homage still is Virtue's claim,
And 'tis the good man's ever-honoured deed
Which gives an immortality to fame :
Transient and fierce though dazzling is the flame
That glory lights upon the wastes of war :
Nations unborn shall venerate THY name,
A triumph than the conqueror's mightier far ;
Thy memory shall be blest, as is the morning star.

He is the friend of man who breaks the seal
The despot Custom sets on deed and thought,
He labours generously for human weal
Who holds th' omnipotence of fear as nought ;
The winged mind to earth will not be brought.
'Twill sink to clay if it imprison'd be ;
For 'tis with high immortal longings fraught,
And these are dimmed or quenched eternally,

Until it feels the hand that sets its pinions free.
And woman hath endured, and still endures
Wrongs, which her weakness and her woes should shield,
The slave and victim of the treaeherous lures
Which wily arts to man, the tyrant, yield :
And here, the sight of star, or flower, or field,
Or bird that journeys through the sunny air,
Or social bliss from woman has been sealed :
To her the sky is dark, the earth is bare,
And Heaven's most hallowed breath pronounced "for-bidden fare"
Nurtured in darkness, born to many woes,
Words the mind's instruments, but ill supplied,
Delight, even as a name, she scarcely knows,
And while an infant sold to be a bride ;
To be a mother her exalted pride :
And yet not her's a mother's sigh or smile ;
Oft' doomed in youth to stem the icy tide
Of rude neglected, caused by some wanton's wile
And forced at last to grace her lord's funeral pile.
Daughters of Europe : by our Ganges' side
Which wept and murmured as it flowed along,
Have wides, yet virgins, nay, yet infants, died,
While priestly fiends have yelled a dismal song,
'Mid deafening clamours of the drum and gong :
And mothers on their pyres have seen the hands
Which clung around them, when those hands were young,
Lighting around them such unholy brands
As demons kindle when they rave through held in bands.
But with prophetic ken, dispelling fears
Which haunt the mind that dwells on nature's plan,
The bard beholds through mists of coming years
A rising spirit speaking peace to man.
The storm is passing, and the rainbow's span
Stretcheth from North to South : the ebon car
Of Darkness rolls away : the breezes fan
The infant dawn ; and morning's herald star
Comes trembling into day : O ! can the Sun be far ?

॥ বিধবা বিবাহ ॥

বহু বিবাহের ফলে বাঙ্গলা দেশে বাল বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইহাকে আইনে পরিণত করেন। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ লইয়া সেই জন্য তুমুল আন্দোলন হয়। হিন্দু সমাজের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বলেন যে হিন্দু রমণীর একবার বিবাহ হইলে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে পারে না—কারণ হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ ইহকালের ও পরকালের। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন পরিণামে তদনুরূপ ফল কিন্তু তিনি পান নাই।

বাল বিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যথিত ও মর্মাহত হইতেন বলিয়া বাল্যকাল হইতেই তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রবৃত্তি কেন হইল সেই সম্বন্ধে শ্রী বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্যসহচরী ছিল। এই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটি বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটী বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার বাল্য-সহচরী কিছু খায় নাই; সে দিন তাহার একাদশী, বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব। যদি বাঁচি, তবে যাহা হয় একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।

১২৬০ সালের ১০ই মাঘ তিনি "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কি না" সেই সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহা জানান। এই পুস্তিকায় তাঁহার ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা, লিপিচতুরতা ও তর্কপ্রখরতা দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইলেও পণ্ডিতসমাজ ও হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজ তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হন। ইহা ছাড়া আঁটপুর নিবাসি দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ "বিধবা বিবাহের নিষেধক বিচার" শ্রীরামপুরে নিবাসী কালীদাস মৈত্রের "পৌনর্ভবখণ্ডনম" এবং রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিৎ নহে" নামক পুস্তকে বিধবা বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় তাহা লিখিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও শতাধিক পুস্তিকা বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে প্রচারিত হইয়াছিল এবং তাহার অধিকাংশেই অকাট্য যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্যের সমাবেশ হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেড় শত বৎসর পূর্বে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ব্যর্থকাম হন। তাহার পর দানবীর মতিলাল শীল মহাশয়ও এই বিষয়ে উদ্যোগী হন কিন্তু তিনিও কৃতকার্য হন নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদ প্রভাকরে ইহা প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বঙ্গ যুবক ও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বরের সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"যুগল সেতু নিবাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা বিবাহ করিবেন। তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করিব।"

ভাটপাড়ার পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। পরাশর সংহিতার যে শ্লোকটি বিধবা বিবাহের অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা শাস্ত্র সম্মত বলিয়াছিলেন, তর্করত্ন মহাশয় সেই শ্লোকটির অনুবাদ অন্যভাবে করিয়া দেন। শ্লোকটি এই ঃ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চসাপৎসু নারীনাং পতিরন্য বিধীয়তে॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন "**স্বামী** যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।" কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় এই শ্লোকের অন্যরূপ বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদ হইতেছে "যে, পাত্রের সহিত বিবাহের কথা-বার্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তবে ঐ **ভাবী পতি** যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।"

বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইলে কাশীর খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এবং কলিকাতার তৎকালীন সমাজপতি শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং বিধবা বিবহের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিবাব জন্য তিনি বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রও সংগ্রহ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই দ্বিতীয় পুস্তক তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার নিদর্শন হিসাবে চিরদিন সমাদৃত হইবে।

প্রতিজ্ঞায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভীষ্মের মত অটল ছিলেন বলিয়া তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক তাড়না লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; অনেকে তাঁহার প্রাণনাশের পর্যন্ত সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহাতে দ্রূক্ষেপ না করিয়া একাকী বিশ্ববিজয়ী বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই (১৩ই শ্রাবণ ১২৬৩ সাল) বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন পাস করাইতে সমর্থ হন। এই আইনের বিরুদ্ধে ষাট হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত চল্লিশ খানির উপর আবেদনপত্র পেশ করা

হইয়াছিল আর ইহার পক্ষে ছিল পাঁচ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত মাত্র পঁচিশখানি আবেদনপত্র। হুগলী জেলার ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী ইহা শাস্ত্রসংগত নহে বলিয়া আপত্তি করিলেও হুগলী জেলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহা সমর্থন করেন।

ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইনের সমর্থনে গ্রান্ট সাহেব বলিয়াছিলেন

The Hindu practice of Brahmacharjya was an attempt to struggle against nature and like all other attempts to struggle against nature was entirely unsuccessful.

অর্থাৎ আধুনিক বিধবাদের ব্রহ্মচর্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ।

বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইবার পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত লক্ষ্মীমণি দেবীর বিবাহ হয়। ইহাই বাংলা দেশের প্রথম বিধবা বিবাহ। এই বিবাহে নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, দিগম্বর মিত্র, নৃসিংহচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। বিধবা বিবাহ করিয়া বা ইহার সম্পর্কে থাকিবার জন্য সামাজিক উৎপীড়ন হইতে রক্ষার্থে বিদ্যাসাগরমহাশয় বহু ব্যক্তিকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর ঋণ হয়।

বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বাংলা দেশে তৎকালে ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কত যে ছড়া গান ও নাটক রচিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। শান্তিপুরে 'বিদ্যাসাগর পেড়ে' বলিয়া একরকম কাপড় পর্যন্ত উঠিয়াছিল। উহার পাড়ে চন্দননগর-খলসিণীর বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে ধীরাজ রচিত যে গানটি লেখা ছিল তাহার দুই লাইন এই:

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা কবিতা সংগ্রহ, ২য় ভাগে লিখিত আছে। তাঁহার রচিত পদ্যের কয়েক লাইন উল্লেখযোগ্য:

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী, প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ি আদি করি, মাতিয়াছি সব॥

প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশরথি রায় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে অনেক ছড়া ও গান রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটি গানের কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:

তোমরা ঈশ্বরে দোষ ঘটাবে কি রূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত হয়েছে ঈশ্বর দূত।
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।

রাজ আজ্ঞায় দূতে আসি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রশি বেঁধে ফেলে ফেলে অন্ধকূপে।
তা বলে দূতে কখন দূষী হয় না সেই পাপে।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বাঙলা দেশে যে তুমুল বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহা নারায়ণ কেশব বৈদ্য সঙ্কলিত A collection containing the Proceedings which led to the passing of Act XV of 1856 নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। বিধবা বিবাহের প্রথম ধারাটি এইস্থানে উল্লেখ্য ঃ

No marriage contracted between Hindus shall be invalid and the issue of no such marriage shall be illegitimate by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindu Law to the contrary notwithstanding.

॥ শাসন প্রণালী ॥

হিন্দু রাজত্বে শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইত; প্রধানতঃ মনুর অনুশাসন এবং পরাশর, বশিষ্ঠ ও জিমুতবাহনের ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী রাজা প্রজাপালন করিতেন। ঋণ-গ্রহণ, ধন-দান, ব্যভিচার, পরস্ত্রীগমন, নরহত্যা, চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে অভিযোগ রাজার নিকট উপস্থিত করা হইত এবং তিনি তিনজন সুবিবেচক, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ অমাত্য লইয়া বিচার করিতেন। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে তৎকালীন শাসন ও বিচার প্রণালী দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

A person convicted of bearing false witness suffers mutilation of his extremeties. He who maimed any one, not only suffers in return the loss of the same limb, but his hair is also cut off. If any one causes an artisan to lose his hand or even he is put to death.

সেকালে যে সকল ধনরত্নের মালিক পাওয়া যাইত না, রাজা তাহা তিন বৎসর নিজের কাছে রাখিয়া তাহা বিক্রয় করিতেন। বিচারের সময় বাদী প্রতিবাদীর সাক্ষ্যও লওয়া হইত। তবে বন্ধু ভৃত্য শত্রু সন্ন্যাসী সুপকার নট কারুজীবী ও মহাপাতকের সাক্ষ্যবাক্য কখনও গ্রাহ্য হইত না। দেশে তখন শান্তি রক্ষার জন্য **পর্যবেক্ষক** থাকিতেন। তিনি গ্রামগুলিতে ঠিক শান্তি রক্ষা হইতেছে কিনা দেখিতেন এবং সৈন্যদের উপরও কর্তৃত্ব করিতেন। রাজ-কর্মচারিগণের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ ছিল।

মুসলমান রাজত্বে আকবরের আমলে **সুবেদারের** অধীনে বড় বড় সরকারগুলিতে এক একজন **ফৌজদার** থাকিতেন। ফৌজ মানে সৈন্য, ইহা হইতেই ফৌজদার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ফৌজদারের অধীনে প্রধানতঃ **কোতোয়াল** শান্তি রক্ষার কাজ করিতেন। পথঘাট

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার এবং সাধারণের পথ কেহ বন্ধ না করে, তাঁহাকে সর্বদা তাহা দেখিতে শুনিতে হইত। বেশী রাত্রে নগর হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে নগরের মধ্যে কেহ প্রবিষ্ট হইতে না পারে, সেই জন্য তাঁহাকে চৌকি পাহারা বন্দোবস্ত করিতে হইত। পল্লীগ্রামে জমিদার, থানাদার, ফাঁড়িদার ও চৌকিদারের সাহায্যে শান্তিরক্ষার কাজ চলিত। রাজস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য **আমিলগুজর** থাকিতেন। বিচার কার্যের জন্য **কাজি** থাকিতেন। ইনি রাজার প্রতিনিধিরূপে বিচার করিতেন আর দণ্ডের ব্যবস্থা যিনি করিতেন তাহাকে **আবুল** বলা হইত।

॥ ধর্ম ও জাতি ॥

প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর বাস ছিল না। আর্যেরা প্রথমতঃ বিজিত ও অনুন্নত অনার্যগণকে হিন্দু সমাজে শূদ্ররূপে স্থান দিয়া সমন্বয়ের চেষ্টা করিলেও, পরবর্তীকালে ভেদ ও অনৈক্যের জন্য জাতিভেদের এবং আর্য ও অনার্যগণের সংমিশ্রণের ফলে হিন্দু সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয়। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন যে পৌরাণিক যুগে **অস্পৃশ্যতা** হিন্দুসমাজে দৃঢ়বদ্ধ ছিল।(৮) প্রাচীনকালে হিন্দুগণ—শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর গাণপত্য এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। অষ্টম শতাব্দী হইতে জৈন্যধর্ম এবং তাহার পর খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতক হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী কাল ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল এবং সেই সময় বর্তমান হুগলী জেলার অঞ্চলসমূহেও যে বৌদ্ধ-ধর্মের অখণ্ড প্রতাপ-প্রতিপত্তি ছিল তাহা সুনিশ্চিত। বৌদ্ধধর্মের এই প্লাবনে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা শিথিল হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ গৌড়েশ্বরেরা কখনও কিন্তু হিন্দুধর্মের অনাদর করিতেন না। তাঁহারা অতি যত্নের সহিত রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতেন, কখনও হিন্দুর নিগ্রহ নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইতেন না।

অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস হইতে সুরু হয়। হিন্দু সমাজের শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি ধর্মাচার্যগণের আবির্ভাবে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হয়। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সেইরূপ হয় না। নবম শতাব্দীর মধ্যে অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু-ধর্মের নব জাগরণ হইলেও, বঙ্গদেশে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব ছিল বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। সেইজন্য অন্যানা প্রদেশের সনাতনী হিন্দুগণ বৌদ্ধাচারপ্লাবিত বঙ্গদেশকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং কান্যকুব্জ হইতে বৈদিক যজ্ঞ করিবার জন্য সেই কারণে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

॥ হিন্দু ॥

রাঢ়দেশে পূর্বে হিন্দু ছাড়া অন্য কোন জাতি ছিল না। মুসলমানগণ এদেশে নবাগত। ক্রমে তাহারা হুগলী জেলার কয়েকটি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই অঞ্চলের অধি-কাংশ মুসলমানই হিন্দুর সন্তান; ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছে। ক্রমশঃ

ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু আচারে ব্যবহারে ও কথাবার্তায় ইহারা হিন্দুর মত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই দেশের ধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

"প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে 'রিলিজন' নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র—তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে 'রিলিজন', 'পলিটিক্স' সমস্তই আছে। তাহাতে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির কোনো আশ্রয় নাই।"

প্রাচীন রাঢ়ে হিন্দু মাত্রেই স্বধর্মনিষ্ঠ ছিল। স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে হিন্দুর দায়ভাগ এবং দৈব ও পৈত্র কার্যের অনুষ্ঠানাদি হইলেও আরামবাগ মহকুমায় রঘুনন্দনের অনুশাসন চলে নাই। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত ঠাকুর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ভাগের মত খণ্ডন করিয়া 'স্মৃতিসর্বস্ব' নামে এক নূতন মত স্থাপন করেন। বিবাহ শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন ও অশৌচ পালন প্রভৃতি কার্যে রঘুনন্দনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অশৌচান্তে রঘুনন্দনের ব্যবস্থায় মস্তক মুণ্ডন করা বিধি, কিন্তু ঠাকুর নারায়ণের বিধান অনুসারে মস্তক মুণ্ডন না করাই নিয়ম ছিল। তাই খানাকুলের বসুসর্বাধিকারী বংশে অশৌচান্তে এখনও মস্তক মুণ্ডনের প্রথা নাই।

রঘুনন্দনের সময় হইতে প্রতিমাপূজার আধিক্য দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যে সেকালে একটি স্ত্রী গ্রহণ করাই সাধারণ নিয়ম ছিল। তবে রাজারাজড়া, অভিজাত সমাজ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সবর্ণে বিবাহ সাধারণ নিয়ম হইলেও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কৌলীন্য মর্যাদা পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল, সেইজন্য কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ চলিত।

প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদের কাছে **বৈধব্য** চরম অভিশাপ বলিয়া গণ্য হইত। বিধবা হইলে সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া যাইত এবং অলংকার প্রসাধন প্রভৃতি সব কিছু হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইত। সেকালে বিষয়-সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন বৈধ বা সামাজিক অধিকার ছিল না। বিধবাদের পক্ষে মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন শুভকার্যে তাহাদের উপস্থিতি অশুভ বলিয়া মনে করা হইত। সেইজন্য তাহারা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিত না।

মোগল শাসনকালে বঙ্গদেশে লোকের ধর্মভাব বিকৃত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই এই অঞ্চলে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় হয়। সেই সময় মদ্য মাংসাদি পঞ্চমকারে মানবগণ মত্ত হইয়া দেশকে রসাতলে নিমগ্ন করিতে বসিয়াছিল। বাঙ্গলায় হিন্দুদের সেই পরম অধোগতির সময় প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য পাপী তাপী কলুষকলঙ্কিত জীবগণের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের আরাধনা করেন। সেই সময় বাঙ্গলাদেশে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ মনন কি কীর্তন কেহই করিত না। শ্রীবৃন্দাবন দাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' বাঙ্গলাদেশের তৎকালের

একটি চিত্র তাহার গ্রন্থে দিয়াছেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পর্যন্ত মদ্য এবং গো-মাংস খাইতে একটুও দ্বিধাবোধ করিত না।

বাঙলা দেশে ধর্মভাব যখন এইভাবে বিকৃত হইয়াছিল ঠিক সেই সময় অদ্বৈতাচার্যের একনিষ্ঠ আরাধনার ফলে ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্মের পুনঃ স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে হরিনাম সংকীর্তন বিতরণ করিয়া ধর্মসংস্থাপন করেন। প্রেমের দ্বারা নামসুধা বিতরণ করিয়া তিনি কদাচারী, ধর্মভ্রষ্ট বিপথগামী ব্যক্তিগণকে সৎপথে ধর্মপথে আনয়ন করিতে সমর্থ হন এবং এককথায় কেবল বাঙলা দেশে নয় সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি অধোগতির হাত হইতে রক্ষা করেন।

ইংরেজ আমলে অবস্থাপন্ন বাঙালী সমাজের যে চিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ দেখাইয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজড়ারা বাহিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দীরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণা-বেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন? এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান্ স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন। তোপ পড়ে গেলে ফরসা হবার পূর্বে গাড়ি বা পালকি করে বিবিসাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবি হতে পরিত্রাণ পান। ছোক্‌রাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে একজন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান।... চাকর দরজার খিল দিয়ে ঘরের মেজেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন। মধ্যরাত্তির কেটে গেলে বাবু আমোদ লুটে ফেরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়। বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না।

॥ মুসলমান ॥

হুগলী জেলার মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের গৌরব। হুগলী শহরে যে সকল মুসলমান বাস করেন তাঁহারা বিনয়ী, ভদ্র এবং শিক্ষাদীক্ষা ও আচার ব্যবহারে খুব উন্নত এবং হিন্দু-গণের সহিত তাহাদের সদ্ভাব অন্যান্য স্থানের অনুকরণযোগ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। হাজী মহম্মদ মহসীনের ট্রাস্ট ফাণ্ড হইতে বহু দরিদ্র মেধাবী মুসলমান ছাত্র সুশিক্ষিত হইয়াছেন। হুগলী জেলায় বহু অবস্থাপন্ন মুসলমানের বাস আছে।

গ্রামের মুসলমানগণ সাধারণতঃ কৃষিজীবি হইলেও তাহাদের নম্র স্বভাব ও মেজাজ এককথায় 'শরীফ' বলা যায়। ইহারা হিন্দুদের আচার ব্যবহার প্রায়ই অনুকরণ করিয়া থাকে; এমন কি অনেকে পূর্বে লক্ষ্মীপূজা করিত এবং হিন্দুদের দেবীর পূজা পর্যন্ত দিত। হুগলী জেলার মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের কখনও কোন বিবাদ হয় নাই। এই স্থানের মুসলমানগণকে দেখিলে মুসলমান বলিয়া হঠাৎ চেনা যাইত না। এমন কি অনেকে হিন্দুদের নাম পর্যন্ত রাখিত।

পাকিস্তান হইবার পর এখন অনেকে ল্ঙ্গি বা আচকান ব্যবহার করেন দেখিতে পাওয়া যায়। ম্সলমানদের দ্ইটি দল আছে একটি স্ন্নী ও আর একটি মোহাম্মদী। স্ন্নী সম্প্রদায় হানেফি, মালেকি, সাফি ও হাম্বেলী এই চারি ভাগে বিভক্ত। হ্গলী শহরে ম্সলমানদের মহরম খ্ব সমারোহের সহিত অন্ষ্ঠিত হয়।

মহরম॥ হিজরী প্রথম মাসের নাম মহরম। বহ্ শতাব্দী প্র্বে মহরম পর্ব শ্র্ হইয়াছিল আরবের কুফা নগরীতে। তারপর যেমন স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছ্ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তেমনি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এ রকম ধর্ম অন্ষ্ঠানেরও অনেক কিছ্ পরিবর্তন হইয়াছে। ইসলামিক ধর্মান্ষ্ঠান সকল কোন না কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত। সেইজন্য আন্ষ্ঠানিক উৎসবের কিছ্ কিছ্ পরিবর্তন দেখা গেলেও ম্ল পর্ব অপরিবর্তিত আছে। মহরম পর্বের পিছনে একটি ইতিহাস আছে। এই পর্বটি সাধারণতঃ কারবালা প্রান্তরে এজিদের অন্চরগণ কর্তৃক হজরত ইমাম হোসেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি। হজরত ইমাম হোসেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর বৎসর হইতে এইর্প পর্ব অন্ষ্ঠিত হইতেছে কি-না সে সম্বন্ধে সঠিক কিছ্ জানা যায় না।

৬১ হিজরীতে হজরত ইমাম হোসেন শহীদ হন। তার কয়েক বৎসর পর হজরত আলীর ভক্তগণ যাঁরা বিশেব শিয়া সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত তাঁদের অন্যতম সর্দার মোখতার-বিন ও বাইদ্ল কজ্জাব কুফা প্রদেশে সাক্কাফ নামক স্থানে সর্বপ্রথম আন্ষ্ঠানিকভাবে এই পর্ব উদ্যাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে মহরম মাসের প্রথম ১০ দিন নানা প্রকার শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করিতে উপদেশ দেন। যার ফলে আজও শিয়া সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তেল মাখে না, ভাল খাবার খায় না, ভাল বিছানায় শোয় না এবং নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করেন ও ব্ক চাপড়াইয়া, মরসিয়া গাহিয়া শোক প্রকাশ করেন। এই সকল দেখিয়া উক্ত স্থানে আর একজন সর্দার হাজ্জাজবিন ইউস্ফ লোকদিগকে দ্ঃখ প্রকাশের বদলে সকলকে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিতে বলেন এবং তাঁহারই নির্দেশমত মহরমের ১০ই তারিখে সকলকে ভাল খাবার খাইতে, স্নান করিতে, আরও নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতে দেখা যায়। সাকাফের দ্বিতীয় নেতাই পরে মহম্মদ বিন কাশেমকে ৯৩ হিজরীতে ভারতবর্ষ জয়ের জন্য পাঠান এবং তিনি সিন্ধ্প্রদেশ জয় করিয়া ফিরিয়া যান।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এইর্প পর্ব অন্ষ্ঠানের উল্লেখ সত্যকার হাদিশ অর্থাৎ সহি হাদিশগ্লিতে লিপিবদ্ধ নাই। পরে ছোট ছোট হাদিশের মধ্যে কিভাবে পর্ব অন্ষ্ঠিত হইবে সে সম্বন্ধে নানাকথা লিপিবদ্ধ আছে এবং দেখা যায় যে এই সকল হাদিশে একের সহিত অপরের মিল নাই। তবে সহি হাদিশে হজরত মহম্মদ (দঃ) ভবিষ্যতবাণী করিয়াছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর সাকাফি বংশে, দ্ইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহাদের মধ্যে একজন হইবে মিথ্যাবাদী ও অন্য একজন হইবেন বিবাদকারী। অন্যদিকে হজরত মহম্মদ (দঃ) হজরত ম্সার (দঃ) ভক্তদিগকে আস্রার দিন রোজা রাখিতে দেখিয়া ম্সলমানদিগের প্রতি দ্ইদিন নফল রোজা রাখিতে নির্দেশ দেন। কারণ এই দিনই হজরত

মুসা (দঃ) তাঁর ভক্তদিগকে লইয়া সম্রাট ফেরাউনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার ও স্বাধীনতা দিবার জন্য মিশর ত্যাগ করেন। নীল নদ বিভক্ত হইয়া পথ করিয়া দেয় হজরত মুসার (দঃ) ভক্তদিগকে অপর পারে যাইবার জন্য। আর সেই পথ দিয়া যখন সম্রাট ফেরাউন তার বিরাট শক্তি সৈন্য লইয়া হজরত মুসার অনুচরদিগকে হত্যার উদ্দেশে অগ্রসর হন তখন বিভক্ত নীল নদ পুনঃর্মিলিত হয় এবং ফেরাউন সসৈন্যে জলে নিমজ্জিত হন ও প্রাণত্যাগ করেন। হজরত মুসার (দঃ) এই বিরাট কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য ও তাঁর ভক্তদিগকে স্বাধীনতা দানের জন্য পরম করুণাময় রব্বুল আলমিন আল্লার প্রতি শুকুর গুজারীর নিদর্শন স্বরূপ দুইদিন রোজা রাখা হয়।

ভারতবর্ষে মহরম উদ্‌যাপনের নানা গল্প ও কিংবদন্তী আছে। এখানে মুসলমান রাজত্ব শুরু হওয়ার আরও পূর্বে পারস্য ও আফগানিস্থানের কয়েকজন সম্রাট ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া ফিরিয়া যান। তাঁদের আমলে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। পরবর্তী যুগে পাঠানদের রাজত্বকালে এইরূপ পর্ব অনুষ্ঠানের কথা শোনা যায় না। মোগল যুগে সম্রাট হুমায়ুন যখন পারস্য ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন পারস্য সম্রাট ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য কয়েকজন শিল্পীর সহিত কয়েকজন শিয়া পণ্ডিতকে ভারতবর্ষে পাঠান। এই সকল ব্যক্তির দ্বারা ভারতে মহরম পর্ব প্রচলিত হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে মোগল যুগের শেষ দিকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হুগলীর ন্যায় ইমামবারা স্থাপনের চিহ্ন আজও বর্তমান এবং তাহার সহিত সংযুক্ত যে সকল ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা হইতে বোঝা যায় যে ভারতের মহরম পর্ব প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পুরান অনুষ্ঠান। সে যুগে যেরূপ জাঁক-জমকের সহিত বিষাদময় ঘটনার স্মৃতিতর্পন ব্যবস্থা ছিল, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর সে সকল স্তিমিত হইয়া যায় কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহেব পর দেখা যায় এই পর্ব অনুষ্ঠান এক শ্রেণীর মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। অনেকেই বলেন যে তখনকার দিনের যুদ্ধে মানুষের দৈহিক শক্তি নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত হইলেও লাঠি, তলোয়ারের দিন যায় নি। সেইজন্য ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ ধর্মানুষ্ঠানের আড়ালে, শক্তি সঞ্চয় করা খুবই সুবিধাজনক মনে করিয়া অনেকেই এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দেন। এইভাবে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে লাঠি ও তলোয়ার খেলার রেওয়াজ হইয়া দাঁড়ায়। বিপক্ষ বাদীদিগকে বলা হইল লাঠি, তলোয়ার ইত্যাদি খেলা বীর জাতীর স্বভাব। যাই হোক সেদিন এরূপ বীরত্ব প্রকাশের যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল তাহা কোন রকমেই অশোভনীয় মনে হইত না এবং শোক প্রকাশও ব্যাহত হইত না।

রমজান ॥ মুসলমানদের রোজা প্রথা কবে শুরু হয়েছে, তা সঠিক জানা যায় না। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্য আত্মশুদ্ধির যে প্রয়োজন সর্বাধিক তারই প্রথম ও প্রধান কর্তব্যের তাগিদে এই প্রথা সকল ধর্মই স্বীকৃতি দিয়েছে। সেজন্যই সকল সমাজে কম বেশী পরিবর্তনের মধ্যেও রোজা বা উপবাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রায় চৌদ্দ'শ বছর আগে হজরত মহম্মদ (দঃ) জুলাই মাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তায়ালার বাণী শুনতে পান এবং আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেকই মুসলমানদের জন্য এক মাস রোজা রাখার নিয়ম প্রবর্তন করেন।

সুর্যোদয় হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করাই রোজা রাখা নয়, এই এক মাসের প্রতি মুহূর্তই মুসলমানদের ইসলামী চরিত্র গঠনের উপযোগী আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি কর্মধারার অনুশীলন শিক্ষা করার জন্যই নির্দ্ধারিত।

সংযম শিক্ষা না হলে আত্মশুদ্ধি অসম্ভব। আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে পরোপকার ও আল্লাহ্ তায়ালার সান্নিধ্য লাভ সম্ভবপর নয়। এই শিক্ষাই রমজানের শিক্ষা।

রমজান সম্বন্ধে কোরানে লিখিত আছে—"হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ, তোমাদের উপর রোজা বিধিবদ্ধ হইল—যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছিল—যেন তোমরাও সংযত হও।"

॥ বৈষ্ণব ধর্ম ॥

শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মই এই অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মকে কুক্ষীগত করিয়া ফেলে। তাহার পর রঘুনন্দন নূতন করিয়া আবার সমাজবন্ধন করেন এবং তাঁহার মত বর্তমান হুগলী জেলার সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমায় প্রচলিত হইলেও, দামোদরের পশ্চিম দিকে তাঁহার অনুশাসন চলে নাই। প্রভাকর মতের শালিকনথী পুঁথি এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের পাঠ্য ছিল এবং তাঁহারা এই মতে দৈবকার্যের অনুষ্ঠানাদি করিতেন। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত ঠাকুরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনন্দনের 'দায়ভাগের' মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সংস্থাপন করেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার সঙ্কলিত স্মৃতির নাম "স্মৃতি-সর্বস্ব"।

বৈষ্ণব ধর্মে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য এই চারিটি সম্প্রদায় আছে; তাহার মধ্যে মাধ্বাচার্য সম্প্রদায়ই বাঙ্গলাদেশে দেখা যায়, কারণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা লইয়া ছিলেন বলিয়া বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর মতানুবর্তি। রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু বৈষ্ণবও এই অঞ্চলে আছে। বর্তমানে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম—যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করেন; মহাপ্রভুর মতামত মানেন না।

দ্বিতীয়—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ নিরুক্তমতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন।

তৃতীয়—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে একমাত্র উপাস্য জ্ঞানে তাঁহাকেই ভজনা করিয়া থাকেন। যথা "**ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।**"

চতুর্থ—যাঁহারা নামে বৈষ্ণব হইলেও আচার-ব্যবহারে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন।

মহাপ্রভু নিজে পুস্তকাদি লিখিয়া বৈষ্ণবধর্মের জন্য কোন পথ নির্দেশ করিয়া দেন নাই।

শহীদ—আরবী শব্দ, আরব দেশে প্রাচীনকালে নারী হরণ করিতে গিয়া যিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেন, তাহাকে শহীদ বলা হইত। বাঙ্গলা ভাষায় এই শব্দটির এখন অপ-প্রয়োগ হইতেছে।

তিনি স্বয়ং আচরণের দ্বারা এই লোকপাবন ধর্ম লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। **'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।'** তাঁহার মুখনিসৃত অমৃতময়ী উপদেশমালা তাঁহার ভক্তগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন. তাহাই ধর্মাচরণ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া ধরা হয়। ইহার মধ্যে যে আটটি শ্লোক বৈষ্ণবজগতে শিক্ষাষ্টক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাতে প্রকৃত বৈষ্ণবদের লক্ষণ ও কর্তব্যাদি নির্দিষ্ট আছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী সপ্তগ্রামের 'অধিকারী' বা রাজার একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধদেবের ন্যায় পিতা, মাতা, স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্যই হুগলী জেলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইয়া, গ্রামে গ্রামে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়। "শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ—শ্রীজীব গোপাল ভট্ট **দাস রঘুনাথ"**। বাঙ্গলা দেশের দ্বাদশ পাটের মধ্যে চারিটি পাট-ই হুগলী জেলায় অবস্থিত। **সাধকশ্রেষ্ঠ অভিরাম স্বামী খানাকুলে, কমলাকর পিপলাই মাহেশে, উদ্ধারণ দত্ত কৃষ্ণপুরে আদি সপ্তগ্রামে এবং পরমেশ্বর ঠাকুর বিষখালি (তড়া-আঁটপুর) গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া এই জেলাকে ধন্য ও পবিত্র করেন।**

"অভিরাম পূর্বে সুদাস খানাকুলে স্থিতি।
খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম নাম খ্যাতি॥
আকনা মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিতি।
কমলাকর পিপলাই এই যে নিশ্চিতি॥
কমলাকর মহাবল পূর্ব নাম হয়।
উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর কয়॥
হুগলীর নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম।
উদ্ধারণ সুবাহু জানিবা পূর্ব নাম॥
পরমেশ্বর দাস পূর্বে স্তোক কৃষ্ণ ছিল।
বোদখানাতে নাগর পুরুষোত্তম জন্মিল॥
**সাচড়াতে পরমেশ্বর দাসের বসতি।
পরমেশ্বর অর্জুন সখা পূর্বে এই খ্যাতি॥**

দ্বাদশ-পাট ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ বঙ্গদেশে আরো সতেরটী শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেন; উক্ত সতেরটি শ্রীপাটের নিম্নোক্ত পাটবাড়ী হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত।

"পঞ্চধাম দ্বাদশ পাট সপ্তদশ হয়।
ভক্তগণের সপ্তদশ সহ চৌত্রিশা পাট কয়॥
চারটী বল্লভপুরে সেবা অনুপাম।
ভক্তগণ যে যে ছিল কহি তার নাম॥
কাশীশ্বর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ আর।
শ্রীরুদ্র পণ্ডিত আদি বাস সবাকার॥
বেলুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর।

বগনপাড়াবাসী শ্রীরামাণ্ডী ঠাকুর॥
গোপতিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
বৃন্দাবন চন্দ্র সেবান করিয়া পিরীতি॥
জিরাটে মাধবাচার্য আর গঙ্গাদেবী।
যশড়াতে জগদীশ নিত্য বেনোদী॥
খানাকুল কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস।
কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ॥
ভঙ্গমোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্বান বিপ্র পন্ডিত আখ্যান॥
দ্বীপগ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গনকৃষ্ণ দাস নিশ্চিত॥
রাধানগরেতে বাস যদু হালদার।
হরিরামাধব দাস স্থিতি অনন্তনগর॥
মহেশ গ্রামেতে বাস গোপাল দাস নাম।
কোটরাতে বাস অচ্যুত পন্ডিত আখ্যান॥" (১)

॥ কৌলীন্য ও বহু-বিবাহ ॥

প্রাচীন কালে হিন্দুগণ ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন এবং **সকলেই ধার্মিক ছিলেন** বলিয়া জানিতে পারা যায়। **সম্রাট অশোকের সময় হইতে** বঙ্গদেশে **বৌদ্ধধর্ম প্রচার** হইতে আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মে প্লাবিত হইয়া যায়। **বৌদ্ধ-**ধর্মের প্রভাবে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তিরোহিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম **একপ্রকার বিলুপ্ত হয়।** পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হইয়া **নষ্টজ্ঞান** বলিয়া আখ্যাত হয়।

গৌড়েশ্বর আদিশূর দেশকে সামাজিক দুর্নীতির হস্ত হইতে **রক্ষা করিবার জন্য** কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামক **পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ** এবং মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালীদাস মিত্র, দশরথ গুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত নামক **পাঁচজন** ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ আনিয়া এই দেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্মের উন্নতিসাধনে **যত্নবান হন।**

"গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥"

কৌলীন্য॥ মহারাজা আদিশূর ও পালবংশীয় নৃপতিগণ এই **ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে** বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। ইহার পর সেনরাজাগণ এই দেশ অধিকার **করেন এবং সেন** বংশীয় নরপতি বল্লাল সেনের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। আদিশূর আনীত **ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের** বংশাবলী বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় এবং ইহাদের **পরস্পরের মধ্যে** বিদ্যালোপ ও **আচারভ্রংশ** হওয়ায় বল্লাল সেন বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের জন্য আচার, বিনয়, বিদ্যা, **প্রতিষ্ঠা,** তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নয়টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'কুলীন' আখ্যা প্রদান করেন। কৌলীন্য মর্যাদা স্থাপনের পর, তাঁহার আদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণ **'ঘটক'**

উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঘটকগণ কুলীনগণের স্তুতিবাদ ও বংশাবলী কীর্তন পূর্বক তাঁহাদের দোষ-গুণ ও কৌলীন্যমর্যাদা সংক্রান্ত নিয়ম বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

আদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের সন্তানগণ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের বংশধরগণ ছাপ্পান্নটি গ্রামে বসবাস করেন এবং সেই গ্রামের নাম অনুসারে 'গাঁই'য়ের সৃষ্টি হয়। বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বংশানুক্রমিক ছিল না। নবগুণের 'আবৃত্তি' শব্দের অর্থ পরিবর্তন। পরিবর্তন চারিপ্রকারের যথা আদান, প্রদান, কুশত্যাগ, ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা।

"আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথেব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্তশ্চতুর্বিধ॥"

আদান অর্থাৎ সমান বা উৎকৃষ্ট গৃহ হইতে কন্যাগ্রহণ; প্রদান অর্থাৎ সমান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গৃহে কন্যাদান; কুশত্যাগ অর্থাৎ কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যার দান, ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ উভয় পক্ষের কন্যার অভাব ঘটিলে, ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পরের কন্যাদান। সৎ কন্যার অভাবে আদান প্রদান সম্পন্ন হয় না। সুতরাং কন্যাহীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুললক্ষণাক্রান্ত হইতে পারেন না। এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত কুশময়ী কন্যার দান ও ঘটক সমক্ষে কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা পরস্পর কন্যাদানের ব্যবস্থা হয়।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কৌলীন্য লইয়া মহা গোলমাল হওয়ায় নির্বাচন প্রথা রদ হয় এবং কৌলীন্য বংশানুগত হইবে বলিয়া স্থির হয়। ইহার রাজত্বকালে কায়স্থ সমাজের ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কুলীনগণের 'পর্য্যায়' নির্দিষ্ট হয় এবং সমপর্যায় ব্যতীত আদান প্রদান হইবে না বলিয়া এক নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতেই কৌলীন্য প্রথাটিকে জটিল করিয়া তোলা হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বিবাহের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়া সমাজের যে কি অনিষ্ট হয় তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ কিরূপ বিলাসে মগ্ন ছিল তাহা পবনদূত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তৎকালীন সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচার-ব্যভিচারের জন্যই হিন্দুশাসন বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হয়।

লক্ষ্মণ সেন নিয়ম করিলেন যে, কুলীন কন্যা যে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার সেই ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার নাম বংশ পরিবর্তন। দ্বিতীয়তঃ কুলীনদের মধ্যে কে কিরূপ উচ্চনীচ কুলে আদান-প্রদান করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া কুলীনদের পদমর্যাদার সমতা স্থির করা হয়; ইহার নাম সমীকরণ। কৌলীন্য সংস্থাপিত হইলে গৌড়ের ব্রাহ্মণগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হন; প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় শ্রোত্রীয়; তৃতীয় বংশজ, চতুর্থ গৌণ-কুলীন, এবং পঞ্চম সপ্তশতী সম্প্রদায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে গৌড়দেশে মুসলমান প্রভাব আরম্ভ হয়; এই সময় হইতে মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে এবং কৌলীন্য প্রথার অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা শিথিল হইয়া গেল। কুলীনের কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য, অর্থ দিয়া কুলীন পাত্র সংগ্রহ করিতে হইত এবং এই সুযোগে

এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক বিবাহ করিয়া ‘বিবাহ-ব্যবসায়’ আরম্ভ করিয়া দিল; ইহার ফলে ব্রাহ্মণ সমাজে যে কিরূপ অনাচার প্রবেশ করিল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইবে।

“কোন কারণে কুলীন মহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত কন্যা-পক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া দুই একদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিত করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তাহার সহযোগে সম্ভব বলিয়া প্রচারিত ও পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতা আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচার সহচরী ভ্রূণহত্যা দেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এ ব্যতিরিক্ত আর কোন পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ ও অতিশয় কৌতুক-জনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনা করিতে হয় না। কন্যার জননী অথবা বাটির অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান; এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি নাই; তিনি কিছুতেই রহিলেন না। বলিলেন, আজ কোন মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে; সেখানেও যাইতে হইবেক; যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন; তারা জামাইর সঙ্গে খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবেক। একলা যেতে পারব না বলিয়া, ছুঁড়ি কিছুতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস ইত্যাদি। এইরূপ পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া, জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।” (১০)

হিন্দুর শীর্ষসমাজে কৌলীন্যের জন্য নানা রকম দোষ প্রবৃষ্ট হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের সাহায্যে বাঙলাদেশে যে আন্দোলন সৃষ্টি করেন, তাহাতে কৌলিন্য প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেনঃ

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদিবা হইল বিয়া কিছুদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥

কুলীনের নয়টি লক্ষণ পরবর্তীকালে লোপ পাইয়াছিল বলিয়া রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার নাটকে শ্লেষ করিয়া আধুনিক কুলীন ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে নিবাস শ্বশুর ঘরে
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আটকা বন্ধ
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর।

এই নাটকের এক স্থানে কুলীন অধর্মরুচি ও তাহার পিতা বিবাহ বণিকের কথোপকথন আছে। পিতা পুত্র উভয়েরই বিবাহ ব্যবসা। পিতার সহিত পুত্রের পরিচয় ছিল না। পুত্র বিবাহ বণিকের নিকট পরামর্শ চাহিতেছে যে, তাহার নকুলপুরের সম্বন্ধী অনুরোধ জানাইয়া চিঠি দিয়াছে যে তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে, সে যেন অবশ্য সেখানে যায়—।

বিবাহ বণিক (পিতা)—যাও অন্নপ্রাসন দাও গে—

অধর্মরুচি (পুত্র)—কি বল্‌বো বাবা, লজ্জা হয়, সে দেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই। তাই বলি—মেয়েটা হলো।

পিতা (উচ্চহাস্য করিয়া)—বাপুহে তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে আমাদের এ রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি?

কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে বিবাহ উৎসবে মেয়েদের সাজসজ্জার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে, উহাও এইস্থানে উল্লেখ্যঃ

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে। প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে॥
মনোমত সজ্জা করে বিভবানু সারে। এই প্রথা সর্বকালে সকলি সংসারে॥
মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা। কর্ণমূলে পরিল সুবর্ণ কাণবালা॥
কেহ কেরাপাত করে কেহবা চৌদানী। না ছিল পূর্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী॥
শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল। হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণশিঁতি। যাহা হেরি যুবজন গণের বিস্মৃতি॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা। বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা॥
কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়। তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয়॥
বাহুতে ধারণ করে কেহবা কেয়ূর। হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর॥
কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মোন কাটা চিক্। দেখিতে অপূর্ব যাহা করে চিক্‌চিক্॥
পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার। অম্বরে সম্বৃত তবু বহিরে বাহার॥
রত্নের অঙ্গরী কেহ যত্ন করে পরে। আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পারে॥
কোন নারী নিতম্বে ধরিল চন্দ্রহার। বিরহি যুবার মন করিতে সংহার॥
কাহার চরণে ঢেয়ুতরঙ্গের মল। রজত নির্মিত যাহা অতি সুনির্মল॥
কেহবা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ॥
করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন। বিবাহ বাটীতে দেখ করিছে গমন॥

এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া তৎকালীন কুলীনগণ সকলের সামনে তাঁহাদের পৈতা ছিঁড়িয়া তর্করত্ন মহাশয়কে অভিসম্পাত দিয়া তাঁহার দেহের উপর পর্যন্ত আক্রমণ করিয়া-

ছিলেন কিন্তু তিনি ইহাতে বিচলিত হন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

It was at such a time in 1854, that the first original dramatic composition Kulin-Kulasarvaswa held up the custom of Kulinism and polygamy to deserved rediculc and contempt.

Literature of Bengal—R. C. Dutt I. C. S.

সেকালের কুলীন স্ত্রীলোকদের ব্যবহার্য অলংকারের তালিকা কবি গংগাদাস যাহা দিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য:

চৌড়ি, চাঁপি, মার্কাড়ি, কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল॥
নাসিকাতে নথ কার মুক্তা চুনী ভাল। লবংগ বেশরে কার মুখ করে আল॥
কিবা গজমুক্তা কারও নাসিকায় ঝোলে। দোলে সে অপূর্বভাব হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দ কলিকার মত কার দন্তপাতি। দাড়িম্বের বীচ মুক্তা কার দন্ত ভাতি॥
মুখ শোভা করে কার মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পরিল গলায় কেহ তেনরী সোনার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ধুকধুকী জড়াও পদক পরে সুখে। সোনার কংকন কার শংখের সম্মুখে॥
পতির আয়ত চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরান বাঁধান লোহা সকলের হাতে॥
পাতামল পাসুলি আঙট বিছা পায়। গুঞ্জরীপঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥

কবি দ্বারকানাথ অধিকারী ১৩ বৎসর বয়সে কুলিনগণের বিবরণ নামক যে কবিতা রচনা করেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:—

"শুন শুন সর্বজন করি কিছু নিবেদন
কুলিনগণের বিবরণ।
হয় যবে প্রথমতঃ গাঁজা অহিফেনে রত
পরিশেষে মদে মত্ত হন॥
গেলে পরে ভিন্ন গ্রাম বিষ্ণু ঠাকুরের নাম
লোক মাঝে অগ্রে বলা আছে।
যেন নীচ লোকে বলে অন্য লোকে জিজ্ঞাসিলে
রাজবাড়ী আমার বাড়ীর পাছে॥
কুলভ্রমে হয়ে অন্ধ বিবাহের সম্বন্ধ
যদি কেহ করে উপস্থিত।
লোভ দেবীর আজ্ঞা মতে আরোহিয়া স্পৃহারথে
অগ্রে করে পণের বিহিত॥
না হইলে দক্ষিনান্ত কামিনী না পান কান্ত
শাশুড়ীর রাঁধা ভাত খান না।

পদব্রজে মক্কা যান্ যদি একটি পয়সা পান্
শবশুর বাড়ী যান ভিন্ন যান্ না॥ *

কৌলীন্য প্রবর্তিত হইবার পর, দশ পুরুষ গত হইলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দেবীবর ঘটক কুলীনদিগের মধ্যে 'মেলবন্ধন' করিয়া এই প্রথাকে জটিলতম করিলেন। মেল শব্দের অর্থ দোষ মেলন অর্থাৎ দোষ অনুসারে সম্প্রদায় বন্ধন। 'দোষান্ মেলয়তীতি মেলঃ।' দেবীবর সকল কুলীনকেই দোষাশ্রিত দেখিয়া এক এক প্রকারের দোষে দুষ্ট কুলীনদিগকে লইয়া এক একটি মেল সৃষ্টি করিলেন। যাঁহারা তাহার বিপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদিগকে নিষ্কুলীন করিয়া 'বংশজ' আখ্যা দিলেন। বিভিন্ন প্রকার দোষে দুষ্ট কুলীনগণকে ছত্রিশ ভাগে বা 'মেলে' বিভক্ত করা হয়। তিনি প্রতি মেলে দুই দুইজনকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহার হইতে মেলের উৎপত্তি হয় তিনি প্রকৃত এবং তাহার সহিত কুল করিয়া যিনি সমমর্যাদা সম্পন্ন হইলেন, তিনি 'পালটি'। এইরূপ মেলবন্ধনের পূর্বে কুলীনগণের আটঘরে পরস্পর আদান প্রদান চলিত কিন্তু দেবীবরের কৃপায় প্রত্যেক মেলের মধ্যে যে যাহার 'প্রকৃতি' ও যে যাহার "পালটি" তাহাদের মধ্যেই কেবলমাত্র আদান প্রদান চলিবে ইহাই স্থির হইল।

দেবীবর বিভিন্ন দোষে দুষ্ট কুলিনদের নিম্নলিখিত ছত্রিশভাগে বা মেলে বিভক্ত করেন। ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্বানন্দ, সুরাই, আচার্য, শেখরী, পণ্ডিতরত্নী, বাঙ্গালপাশ, গোপালঘটকী, ছায়ানরেন্দ্রী, বিজয়পণ্ডিতী, চান্দাই, মাধাই, বিদ্যাধরী, পাবয়াল, শ্রীরঙ্গভট্টি, মালাধর খান, কাকস্থী, হরি মজুমদারী, শ্রীমন্তখানী, প্রমোদিনী, দশরথ ঘটকী, শুভরাজখানী, নড়িয়া, রায়, চট্টরাঘবী, দোহাট্টাছয়ী, ভৈরব ঘটকী, আচম্বিতা, ধরাধরী, রাঘব ঘোষালী, সর্বানন্দী, শতানন্দখানী, চন্দ্রপতি ও বালি।

বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর ব্রাহ্মণগণ কুলীন, শ্রোত্রীয়, গৌনকুলীন, বংশজ ও সপ্তশতী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কুলীন কন্যার কুলীন ছাড়া অন্য শ্রেণীতে বিবাহ হইলে কুলক্ষয় হইত বলিয়া অনেক সময় আশী বৎসরের বৃদ্ধ বর একই লগ্নে দশ বৎসর হইতে ষাট বৎসরের কুড়ি পঁচিশটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করিত। বিবাহের কিছুদিন পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত আর তাহার সকল স্ত্রী বিধবা হইত। দেবীবর ঘটক আবার রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদের মেল বন্ধন করেন যেমন ফুলিয়া মেল, খড়দহ মেল প্রভৃতি। কবি কীর্তিবাসের পূর্বপুরুষ মুখুটী বংশোদ্ভব গঙ্গানন্দ হইতে

* "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে" প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী গদ্যে ও পদ্যে সাহিত্যিক লড়ায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু কবিতাযুদ্ধে দ্বারকানাথের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রতিভা স্ফুরণ হইবার পূর্বে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। ১৩ বৎসর বয়সে কুলিনগণের বিবরণ নামক তিনি যে কবিতা রচনা করেন, এই কবিতাটির কয়েকটি চরণ তাহার নিদর্শন। ৩০ কার্তিক ১২৩৭ সালে নদীয়া জেলার গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে তাহার জন্ম হয় এবং ৭ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ সালে তাহার দেহান্ত হয়।

ফুলিয়া মেল সৃষ্ট হয়। তখন ফুলিয়া মেল সরসকুল বলিয়া 'মেলপ্রকাশে' লিখিত থাকিলেও পরবর্তীকালে তাহাতে নানাদোষ প্রবেশ করে।

ফুলিয়া সরস কুল মেলের প্রধান।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য সূর্যের সমান॥
হিরণ্য উদয় মধ্যে মাধাই নন্দন।
গঙ্গানন্দ কুলে কৃতি ঘোষে সর্বজন॥

কোন কোন দোষে, কি কি মেল বন্ধন হইয়াছিল, তাহা 'দোষমালা' গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে; নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইলঃ

"অনূঢ়া শ্রীনাথ সুতা ধন্ধঘাটস্থলে গতা।
হাঁসাইথানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মিকা।
যবনেন চ সংসৃষ্ঠা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥"

অর্থাৎ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিত কন্যা ছিল; হাঁসাই নামক জনৈক মুসলমান, ধন্ধ নামক স্থানে বলাৎকার করিয়া তাহাদের সতীত্ব নষ্ট করে। পরে এক কন্যা কংসারিতনয় পরমানন্দ পতিতুন্ড ও আর এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ইহাদের সহিত যাহারা আদান প্রদান করেন তাহারা 'যবনদোষে দূষিত' হন। ইহা 'ধন্ধদোষ' বলিয়া খ্যাত। সুতরাং যবনদোষে দুষ্ট কুলীনগণ তাহাদের 'পালটি' ঘর ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিবে না। কারণ অন্য কুলীন, যাঁহাদের দোষ নাই, ইহাদের সহিত বিবাহাদি হইলে, তাহারাও যবনদোষ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া 'পালটি' ব্যতীত বিবাহ নিষিদ্ধ হয়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ; এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশের বহু পরিবর্তন সাধিত হইলেও, কৌলীন্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে "সুতা বেচা কড়ি" দিয়া কুলীনের ব্রাহ্মণীকে স্বামীর রুষ্ট মুখকে মিষ্ট করিতে হইত, দৃষ্ট হয়। সুতরাং কুলীনত্বের প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গদেশে পুরামাত্রায় বজায় ছিল।

কবি ভারতচন্দ্র স্বামীর রুষ্ট মুখ মিষ্ট করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ্যঃ

দুচারি বৎসরে যদি আসে একবার,
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়,
তবে মিষ্টিমুখ নহি রুষ্ট হয়ে যায়॥

রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে বলিয়াছেনঃ

আসিবেক করি আশ — তাহার বিবাহ চাষ
মাস মাস ফেরে নানা দেশ,
ব্যবহার দিতে নারি — তাই মোরে বিভা করি
স্বপনেও না করে উদ্দেশ।

বহু-বিবাহ॥ কৌলীন্যের এইরূপ মূঢ় ব্যবহার ফলে কুলীন-কন্যার বিবাহ দেওয়া যেমন দুঃসাধ্য হইল, বংশজদের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব হইল। একদিকে কুলীনগণ শত শত বিবাহ করিতেন, অন্যদিকে বংশজগণ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বিবাহ করিতে পারিতেন না, কারণ কন্যা সংগ্রহের জন্য পণ দিতে হইত। বংশজ ব্রাহ্মণগণের কন্যা সংগ্রহ করিবার জন্য একদল প্রতারকের দল ব্যবসায়ী, বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে নিম্নশ্রেণীর বালিকা আনিয়া, ব্রাহ্মণ-কন্যা বলিয়া পরিচয় পূর্বক মূল্য লইয়া বিবাহ দিয়া দিত। নৌকা বা 'ভরা' করিয়া এই সব মেয়েকে আনয়ন করা হইত বলিয়া ইহাদিগকে 'ভরার মেয়ে' বলিত। বলা বাহুল্য, এইরূপ দেশাচারের ফলে, কুলীন-কন্যাগণ অনূঢ়ার মত পিতৃগৃহেই থাকিত এবং বংশজ ছেলেরা কন্যাভাবে ও অর্থাভাবে চিরকাল অবিবাহিত রহিত। এই জন্য সমাজের মধ্যে কিরূপ ব্যভিচার চলিত, তাহা ভাষায় ব্যক্ত না করাই ভাল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নামক বঙ্গের প্রথমাভিনীত নাটকে ইহার যে জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলাদেশে সমাজ-সংস্কারের সর্ববিধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বহু বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য তখন বহু সামাজিক নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। ইহাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের **কুলীন কুলসর্বস্ব,** উমেশচন্দ্র মিত্রের **বিধবা-বিবাহ** ও উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের **বিধবোদ্বাহ নাটক** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার অভিনয়গুলি দেখিতে আসিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এইরূপ নিষ্ঠুর দেশাচারের ফলে হিন্দুনারীরা যে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে তাহাই এই সমস্ত নাটকগুলিতে যথার্থভাবে চিত্রিত করিবার ফলে কলিকাতায় ও হুগলীতে খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়িতে বঙ্গের প্রথম অভিনীত কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয় খুব উদ্দীপনার সহিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল। ...প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও ছিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল—'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?'

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু-বিবাহ প্রথা রদ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি লিখিয়াছেন "কুলীন ভগিনী ও কুলীন ভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাঁহাদিগকে, পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়। পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন কুলীন মহিলার নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে না। পিতার দেহত্যাগের পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্তা হইলে, তাহারা অতিশয় অপদস্থ হন। প্রখরা ও মুখরা ভাতৃভার্যারা তাহাদের উপর যার পর নাই, অত্যাচার করেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তবর্তী দীর্ঘ

কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভাতৃভার্যা-দের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ভাতৃভার্যারা সর্বদাই, তাহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিরাম নাই বলিলে, বোধহয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। অনেক সময় লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, তাহারা আপন অদৃষ্টের দোষকীর্তন ও কৌলীন্য প্রথার গুণকীর্তন করিয়া থাকেন এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে, চলিয়া যাইতাম, আর এ বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিলে অনেকানেক বয়স্থা কুলীন মহিলা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করেন। তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এবং যে হেতুতে তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে।"

বংশজগণ কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; নিম্নে ১২৪৪ সালের ৫ই আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত "সমাচার দর্পণের" একটি পত্র হইতে এক শতাব্দী পূর্বে হিন্দু সমাজের যে কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানা যাইবে।

"অন্যদেশীয় লোকদের বিদ্যা বুদ্ধি বল কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাঁহারা এই সকল নানাবিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেনা এতদ্দেশীয় লোকেদের উক্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইহাঁরদিগের অহঙ্কার কিন্তু বিবেচনা করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীনবংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন। বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায়। অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যাপর্যন্ত বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক প্রমাণ লিখিতেছি।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয়করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেনা পরে ঐ ধূর্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের ডাক আরম্ভ

হইল বিক্রেতারা প্রথমত পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারিশত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসর পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাস প্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদু ছে কেয়া ছালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্বাংশবাসি—মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাত পরে তাহার গর্ভে মুখুর্যোর এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাসী এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিয়া বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্যাতে অনেক বৎসর পর্যন্ত সহবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটি সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে।

৩। কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্যা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষ টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছে।

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীতা কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালির কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্রজ্ঞান করেন।"

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল মুসলমানদের সংস্পর্শে ও শিক্ষায় দেশ তত বিলাসিতার প্লাবনে মগ্ন হইয়া গেল। বহু বিবাহ এই সময় দেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচারও একপ্রকার উঠিয়া যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গোমাংস ও মদ্য পান করিতেছেন, ইহাও তৎকালীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য, গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পর গৃহ দাহ সর্বক্ষণ॥" (১১)

কৌলীন্য প্রথা, বহু-বিবাহ এবং তাঁহার আনুসঙ্গিক রীতিনীতিতে দেশ হইতে ভগবদভক্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের

শিরোভূষণ, তাহাদের জীবনের কার্যাবলী, প্রত্যক্ষ করিয়া অন্যান্য জাতিগণ তাহাদের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল, দেশ হইতে প্রেম-ভক্তি লুপ্ত হইল। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কবিতাটি, তৎকালীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিবে।

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্মকর্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিবাহে।
এই মত জগতের বার্থ কাল যায়ে॥
যে বা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারও না জানে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্ধিয়া মারে॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বহি কার গুণ না করে বাখন॥
যে বা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানি।
তা সবার মুখেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়।
ভক্তির বাহান নাই তাহার জিহ্বায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবস্থার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কার বাসে॥
বাসলি পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥"(১২)

বঙ্গদেশ যখন এইভাবে নীতিভ্রষ্ট হইয়া কদাচারে মগ্ন, হিন্দুগণও মুসলমান শাসন-কর্তাদের অত্যাচারে যখন দলে দলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, ঠিক সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেব নদীয়া নগরে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম ও ভক্তির প্লাবনে বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া বঙ্গবাসীর কলুষরাশি ধৌত পূর্বক 'ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামিচ যুগে যুগে' এই শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রচারিত সুমধুর বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশের কদাচারের মোড় ঘুরাইয়া দিল।

হুগলী হইতে বহু বিবাহ রোধ আন্দোলন

হুগলী জেলা হইতে কুলীনদের বহু বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায় আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই সম্বন্ধে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের নিম্নলিখিত সংবাদ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডাধিপতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ ২ সধবা থাকিয়াও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্যা হইতেছে। যদি ধর্মাবতার শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড অকলণ্ড গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর কৃপাবলোকন পূর্বক কোন নূতন চার্টার করেন তবে ভূরি ২ স্ত্রীলোকের জাতি ও ধর্মরক্ষা পাইয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিদিগের আশীর্বাদে নিযুক্ত থাকেন। বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্ত্র রাজার হইতে পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৺রামমোহন রায়ের একান্ত মানস ছিল তাঁহার ইউরোপে গমনেতে নিতান্ত ভরসা ছিল যে এ সকল বিষয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাদশাহের হুজুরে প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন!"

তৎকালীন 'সমাচার দর্পণ,' 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সংবাদ সুধাকর' প্রভৃতি পত্রগুলিতে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই আন্দোলন সুরু হয়, কিন্তু তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুগণ বহু বিবাহ বর্তমানে হয় না বলিয়া, এইরূপ আইন প্রণয়ণের বিরোধিতা করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জ্ঞানান্বেষণ পত্রে কোন কুলীন কত বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার নাম, নিবাস এবং বিবাহের সংখ্যা প্রকাশিত হয়, উহা হইতে বিরোধীগণের কথা যে ভ্রমাত্মক তাহাই প্রমাণিত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড লং সাহেব On the Banks of the Bhagirathi নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন

> A Kulin Chandra Bandopadhya was killed here 30 years ago. He was married to 100 wives and was murdered by the brothers of one of them on account of his profligate conduct towards his sister. 8 of his wives performed Suttee on his funeral pyre.
>
> Calcutta Review, 1846. Vol VI.

১৪ই মার্চ্চ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে শান্তিপুর নিবাসী স্ত্রীগণ, বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হয় অথচ কুলীন কন্যাদের সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না বলিয়া তদ্বিষয়ে একখানি করুণ পত্র প্রকাশিত হয়, নিম্নে পত্রখানির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

"কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়েগমনপূর্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না।......যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যাথা শমতা করণের কর্তা পতি অভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্মিক রাজা

ইঙ্গরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্মশাস্ত্রে এই যাতনা নির্ধারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্বক ও প্রধান ২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সম্বিচার করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরদিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম সংস্থাপন হয়।"

ইহার পর 'চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণস্য' কর্তৃক লিখিত পূর্বোক্ত পত্রের প্রত্যুত্তর ২১শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে প্রকাশিত হয়। নিম্নে চুঁচুড়ার মহিলাবৃন্দের পত্রখানি হুবহু উদ্ধৃত হইল:

"শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুর নিবাসী স্ত্রীগণ আপনাদের দুঃখ প্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমাদেরও বহুকাল যত্ন ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই এইক্ষণে সেই ভয় দূর হইল অতএব আপনাদের সঙ্গে দুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। প্রথমতঃ আমাদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু দেখা যাউক তাহাতে কি ফল হয়।

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভাদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগের তদ্রূপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলতঃ প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনা পূর্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন। আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪।৫।১০।১২ বর্ষবয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন। সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না। যে ব্যাপারেতে আমাদের সুখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্মেতে যদি আমারদিগের বিবেচনা করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ভ্রম ও আমারদের সুখের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্তৃত্ব করেন আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমাদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই। তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্তা এই ঘৃণ্যব্যাপারে সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কত কাল সহিবেন তাহা কহা যায় না। তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জনা করুন।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্যা তিনি প্রত্যেক ভার্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি কর্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃগণ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।...১৫ মার্চ ১৮৩৫।

হুগলী জেলার স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র সর্বপ্রথম 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠাপূর্বক উহার পক্ষ হইতে বহু বিবাহ অশাস্ত্রীয়, সুতরাং ইহা রহিত করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বর্ধমানের মহারাজাব নেতৃত্বে এক আবেদন প্রেরণ করেন, কিন্তু বিপক্ষ দল কতৃক বহু বিবাহ রোধ করিলে হিন্দুধর্ম লোপ পাইবে বলিয়া আর একটি দরখাস্ত প্রেরিত হইলে, দুইটি আবেদনই কিছুকালের জন্য চাপা পড়িয়া থাকে। ইহার দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায় বহু বিবাহ রোধ করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হন এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৪৩শ ধারানুসারে ব্যবস্থাপক সভা হইতে আইন দ্বারা এই কুপ্রথা রদ করিবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের জন্য কেহ এই দিকে মনোযোগ দেন নাই বলিয়া আইন প্রণয়ন পিছাইয়া যায়। তারপর বারাণসী নিবাসী স্বর্গীয় রাজা দেবনারায়ণ সিংহও এই বিষয়ে উদ্যোগী হন।

এই দিকে পশ্চিম বঙ্গে প্রধানতঃ পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পূর্ব-বঙ্গে স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। রাসবিহারী বাবু নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ এবং বহু বিবাহ করিয়া তাহার বিষময় ফল ভোগ করেন বলিয়া ইহা রহিত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন এবং গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রচার কার্য করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি স্বয়ং হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হুগলী জেলার প্রতি গ্রামে যাইয়া বহুবিবাহের সন্ধান লইয়া তাহা

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিয়া দেন যে, বহু বিবাহ বর্তমানে বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা দাবী করিতেছেন, তাহারা নির্জলা মিথ্যাকথা বলিতেছেন। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার পক্ষ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বিশ সহস্রের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি বহু বিবাহ রদ করিবার জন্য পুনরায় রাজদরবারে এক আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে হুগলী জেলার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সেওরাফুলীর রাজা পূর্ণচন্দ্র রায়, ভান্ডাড়ার যজ্ঞেশ্বর সিংহ, বাগাটির রামগোপাল ঘোষ, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), দুর্গাচরণ লাহা, কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব, ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাক্ষর করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানের সাক্ষরকারীদের মধ্যে বর্ধমানাধিপতি মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুর, নবদ্বীপাধিপতি সতীশচন্দ্র রায়, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ সিংহ, বারুইপুরের রাজকুমার রায়চৌধুরী, চকদিঘির সারদাপ্রসাদ রায়, টাকীর প্রিয়নাথ চৌধুরী, জাড়ার শিবনারায়ণ রায়, কলিকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, শ্যামাচরণ মল্লিক, রামচন্দ্র ঘোষাল, দ্বারকানাথ মল্লিক, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, দয়ালচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্র দত্ত, নৃসিংহ দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকার হইতে, বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট স্যার সিসিল বিডনকে, বহু বিবাহ আইন করিয়া নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে, এই বিষয়ে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী ছোটলাট বাহাদুর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মিঃ সি, হবহাউস, মিঃ এইচ, প্রিন্সেপ এবং কলিকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন হিন্দুকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া দেন, এবং উক্ত কমিটিকে এই গুরুতর বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদের মতামত জানাইতে অনুরোধ করা হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটি আইন প্রণয়নের পক্ষে মত না দেওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মতামত পৃথক ভাবে দেন। কমিটির হিন্দু সভ্যের অধিকাংশই বহু বিবাহের সপক্ষে থাকায় এইরূপ মতামত গৃহীত হইয়াছিল। নিম্নে কমিটির মতামত উদ্ধৃত হইলঃ

The report of the the committee was submitted in February 1867. The Kulin Brahmins being the class to whom the excesses complained of were almost exclusively confined (and chiefly to the Bhongho Kulins) the committee gave a sketeh of the origin of this denomination of Brahmins and of the various classes of Kulins existing at the time. They also enumerated the customs prevalent, from which the alleged abuses (which they believed to be exaggerated and on the decline) took their rise. They further proved very clearly that these customs had for the most part no warrant among

the approved authorities of Hindu Theology. Thus far, in the opinion of committee, the path for legislation was smooth enough, as a declaratory act might be passed setting forth the law on the subject of polygamy and making any infraction of it penal. But the report further showed that, although the chief abuses of polygamy would be condemned by a reference to the authorized Hindu law, this law at the same time warrnted the suppression of one wife and the contraction of subsequent marriages on many grounds which in the eye of English law were firivolous and untenable. They, therefore pointed out that, owing to the restriction imposed upon them that legal sanction to polygamy was not to be conveyed, they were unable to recommed even the passing of a declaratory Act of the kind related above." (১৩)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া বহু-বিবাহকারী কুলীনদিগের সন্ধান করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম এবং জলের ন্যায় অর্থব্যয় করেন। আজ তাঁহার চেষ্টায় বহু-বিবাহ প্রথার প্রাবল্য বিনা আইনে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাঁচটির কম যাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি তদসংগৃহীত তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম বাদ দিয়া ছিলেন। পূর্বে এই জেলায় কতজন বিবাহব্যবসায়ী ছিলেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ' ১ম পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

॥ বহু বিবাহকারীর তালিকা ॥

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখ
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালী
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	চিত্রশালী
তিতুরাম গাঙ্গুলী	৫৫	৭০	ঐ
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৭০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়ি শ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালী
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোন্নগর
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দাঁন্ডপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটি
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছি
শশীশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়প
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাঙ্গাই
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছি
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছি
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুন্ডিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	ভৈটে
পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ
কৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাটি
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রশালী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোয়াড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছি
অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৬	ভুঁইপাড়া
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধায়	১৫	২৫	বেলেসিকরে

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলী	১৫	৪৫	পশপুর
সূর্যকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	ক্ষীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিয়াখালা
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৫০	চুঁচুড়া
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈঁচী
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কাত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল
মোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোণা
কৈলাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২	৩৬	গজা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভগ্নপুর
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিসাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১০	১৫	বিদ্যাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈঁচী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭	৪৫	ধসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আনুড়
প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেঙ্গাই

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	যদুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩০	নপাড়া
সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	বৈঁচী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোল্লাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া
দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলী	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পাতুল
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৭	৪৫	জয়রামপুর
হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	শ্যামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঞ্জপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রত্নপুর
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুর
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মথুরা
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভুরসুরা
রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুর
বেণীমাধব গাঙ্গুলি	৭	৫০	চিত্রশালি
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোণা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাখরচক
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধীয়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬	২৬	নন্দনপুর

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুর
কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারামচট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	টেকরা
হরশম্ভূ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মাজু
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরাঙ্গপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোণা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	ঐ
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	নারীট
সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বলিখিত ধর্মাচার লোকাচার সামাজিক প্রথা ঘটনা বিপর্যয়ের ফলে পুরাতন ধারা আজ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙ্গলা দেশে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের যুগ, এবং ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের বিবর্তনের যুগ। এই যুগকে 'রেনেসাঁস' বা নবজীবন বলা যাইতে পারে।

ইংরাজ যখন এই দেশ দখল করে, তখন এই দেশের রাজ্যগুলির যে কেবল ভগ্নাবস্থা ছিল তাহা নহে—এই দেশের সমাজ ও সভ্যতা ছিল তখন মৃতপ্রায় ও জীর্ণ। পুরাতন সমাজ তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নূতন সমাজ তখনও গড়িয়া উঠে নাই। এই ভাবে কিছুকাল চলিয়া গেলে, তাহার পর রাজা রামমোহন রায় পলাশীর যুদ্ধের পঁচাত্তর বৎসর পর এই দেশে বিপ্লবের যে প্রথম সূচনা করেন—সেই চিন্তারাজ্যের বিপ্লব ক্রমশ ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করিয়া দেশে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিল। বাঙ্গলা দেশে নূতন সমাজ নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, বাঙ্গালী জাতি ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইল। সেই পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালা দেশে নূতন সাহিত্য, সমাজের নূতন গঠন মনের নূতন

বিশ্বাস, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন জীবনের আবির্ভাব হইল—এক কথায় মধ্যযুগের মৃত সভ্যতার উপর ভারতের আধুনিক সভ্যতার পত্তন হইল।

॥ প্রাণান্তকর প্রথা ॥

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে বহু প্রাণান্তকর সংস্কার প্রচলিত ছিল। এই সকল প্রথা বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সংগে এক একটি করিয়া এদেশ হইতে তিরোহিত হয়। এই সকল নিষ্ঠুর প্রথা কোন সময়ে কিরূপে প্রথম প্রচলিত হয় তাহা অজ্ঞাত।

ভারতে যে সকল প্রাণান্তকর প্রথা প্রচলিত ছিল, হুগলী জেলাতেও সেই সব প্রথা বিদ্যমান ছিল। সতীদাহ, নরবলি, চড়কে বান-ফোঁড়া, তপ্তমুক্তি, গঙ্গাযাত্রা, নবজাত কন্যা হত্যা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, সাগরে বা গঙ্গায় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ প্রভৃতি নানা রকম সংস্কার নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতায় বড় কম ছিল না। এই সকল প্রথার মধ্যে শিশুকন্যা বধ ভিন্ন অন্যগুলি সমস্তই হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। নরবলি ও সতীদাহ উভয়ই শাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও সতীদাহ স্বেচ্ছাকৃত অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু নরবলি কখনও স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। সতীদাহ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে এইবার হুগলী জেলায় প্রচলিত অন্যান্য প্রথাগুলির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

নরবলি ॥ ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় হুগলী জেলায় বহু প্রাচীনকাল হইতে নরবলি হইতে বলিয়া জানা যায়। সাধারণতঃ বালকদিগকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইত। (১৪) প্রাচীনকালে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নরবলি দিয়া, উক্ত দেহ ক্ষেত্রমধ্যে প্রোথিত করা হইত। লংসাহেব শান্তিপুর, নদীয়া ও বিষ্ণুপুরের নিকট ব্রাহ্মনিতলার দুর্গা-মন্দিরে বহু প্রাচীনকাল হইতে নরবলি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। (১৫) এতদ্ব্যতীত ডাকাতি করিবার পূর্বে ডাকাতগণ কালির নিকটে নরবলি দিত। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, দেবী প্রসন্না হইলে ডাকাতি করিয়া তাহারা বহু ধন রত্ন পাইবে। এই জেলার বহু স্থানে অদ্যাপি 'ডাকাতেকালি' বর্তমান আছেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্বপ্রথম লেফটেন্ট্যান্ট হিকস্ নামক এক ব্যক্তি এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিলেও, তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের বহু স্থানে নরবলি হইতে দেখা যায়।

জেমস লং নরবলির কথা তাঁর Annals of Tripura -তে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। 'চতুর্দশ দেবতার' পূজা সম্পর্কে 'রাজর্ষি'তেও বিস্তৃত উল্লেখ আছে। কৈলাস-চন্দ্র রায় 'চতুর্দশ দেবতা' সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ

> "গৃহদেব চতুর্দশ-দেবতা ঈশ্বর,
> সভয় প্রভাবে তাঁর সশংকিত নর।
> অর্চনা বর্ণনা তার কার সাধ্য করে,
> এমন দেবতা কভু না শুনি সংসারে।
> আষাঢ়ে কেয়ার খার্চি পূজার বিধান,

পশুপাখী কীট আদি নরবলি দান।
কেয়ারে তিথি-স্থিতি আড়াই দিবস,
ভয়ে অধিবাসী করে অন্তঃপুরে বাস।
কেয়ার্চি পুজন এক অদ্ভুত বিকট,
নিশাকাল **নরবলি** বিষম সংকট।"

এ-প্রসঙ্গে পাদ-টীকাতে মন্তব্য, "পূর্বাধিকারী রাজাগণ কর্তৃক সমর পরাভব ব্যক্তিদের চতুর্দশ দেবতার স্থানে বলি সমাধান হইত। ইহা ব্যতিরেকে বৎসরে বৎসরে নিয়মিতরূপে চৌদ্দটি নরবলি বিধান ছিল। এই সকল নর পর্বত-শিখর প্রদেশ হইতে নরদেব সেবায় আত্মবলি করনার্থ স্বয়ং আনন্দের সহিত উৎসাহ প্রকাশ করিত। এই কথা লোকমুখে অবগত হওয়া যায়, কি আশ্চর্য।" পূজার বিধান আজও প্রচলিত, অবশ্য নরবলির এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। রেভারেণ্ড লং সাহেব কলিকাতা রিভিয়ু পত্রিকায় লিখিয়াছেন ঃ

Human sacrifices were also frequent even as late 1832. A Hindu at Kalighat sent for a Musalman barber to shave him. He asked him afterwards to hold a goat while he cut off its head as a offering to Kali. The barber did so but the Hindu cut off the barber's head and offered it to Kali. He was sentenced by the Nizamut to be hung.

নরবলি তৎকালে শাস্ত্র-সম্মত ও ধর্মমূলক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়াই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যেরূপ ছাগবলি দেওয়া হয়, নরবলিও সেইভাবে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সম্পন্ন হইত। প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইলে বহু নরবলির সংবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে নিম্নে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল ঃ

"সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই কিন্তু পরদিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারী ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারি খান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্ত তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিতলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান হইয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান হইয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ কেহ অনুমান করে যে নরবলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাঁচটি টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।"

যাহা হউক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ছয় বৎসর যাবৎ ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল ও মেজর

ম্যাকফারসনের (১৬) ঐকান্তিক চেষ্টায় এই প্রথা বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত হইলেও, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, মধ্যে মধ্যে হুগলী জেলায় নরবলির সংবাদ পাওয়া যাইত। এই সম্বন্ধে ৪ঠা জুলাই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সমাচার দর্পণের আর একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল ঃ

নরবলি—কিয়দ্দিবস হইল জেলা হুগলীর অন্তবর্তী কালীপুর গ্রামে এক সিদ্ধেশ্বরী আছেন তাঁহাকে পূজা করিয়া একদিবস পূজারীরা দ্বারবন্ধ করণানন্তর গমন করিয়াছিল পরদিবস তথায় আসিয়া ঐ পূজারীরা দেখিলেক যে কতকগুলিন ছাগ ও এক মহিষ ও এক নর ঐ সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ছেদিত হইয়া পড়িয়া আছে ইহাতে তাহারা অনুমান করিলেক যে পূর্ব রজনীতে কেহ পূজা দিয়া থাকিবেক, ইহাতে পূজারীরা নরবলি দেখিয়া রিপোর্ট করাতে তত্রস্থ রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলোক সমভিব্যবহারে তথায় আসিয়া অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু তাহাতে কিছু অবধারিত হয় নাই আমরা অনুমান করি যে দস্যুরদিগের কর্তৃক এরূপ কর্ম হইয়া থাকিবেক।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও এই অঞ্চলে পুত্রার্থে দেবপূজা করিবার জন্য নারী বলির একটি সংবাদ ১২ জুলাই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের 'আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটি এই ঃ

দেবমন্দিরে নারী বলি ॥ বিষ্ণুপুর থানার এলাকায় কাশীবাটি নিবাসী ফুলমণি নামে এক হিন্দু রমণী ভূষণ দাসী নামে এক প্রতিবেশিনীকে হত্যা করিবার অপরাধে আলিপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। সন্তান হয় না বলিয়া ভূষণের মনে বড় কষ্ট ছিল, একথা জানিতে পারিয়া ফুলমণি তাহাকে পুত্রার্থে দেবপূজা করিবার জন্য সমস্ত অলঙ্কারাদি পরাইয়া গভীর জঙ্গলে এক ভগ্ন দেবমন্দিরে লইয়া যায়। পূজার পর ভূষণ ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিতেছে এমন সময় ফুলমণি নিজ বস্ত্র হইতে একখানি দা বাহির করিয়া শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু পথে তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়া অনেকের খুব সন্দেহ হয় এবং অনুসন্ধানের ফলে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে। পুলিস ফুলমণিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহার গৃহে সমস্ত অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ফুলমণি পুলিসের নিকট সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছে। তাহাকে এখন হাজতে রাখা হইয়াছে।

গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন ॥ প্রাচীনকাল হইতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বক্ষে হিন্দুগণ ধর্মার্থে জীবন বলি দিত দেখিতে পাওয়া যায়। নর নারী উভয়েই স্বর্গে যাইবার জন্য এই ভাবে জীবন দান করিত। পুরুষেরা গোঁফ-দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং রমণীগণ স্নান করিয়া গঙ্গায় জীবন বিসর্জন দিত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বহু হিন্দু ত্রিবেণীতে নিজের গলা কাটিয়া বা কুমিরের মুখে আত্মদান করিয়া জীবন দান করিত। শিশু ও বৃদ্ধ-গণ আত্মবিসর্জন দিতে ভয় পাইত বলিয়া তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করা হইত।

রেভারেণ্ড লং সাহেব গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন সম্বন্ধে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন—

Chogdah as well as Bansberia and Gangasagar were formrely noted for human sacrifices by drowing, the aged and children were thrown into the river ; In November 1801 some pilots saw 11 persons at Sagar throw themselves to sharks and that month 29 persons were devoured by them.

এতদ্ব্যতীত শিশু সন্তানকে গঙ্গায় উৎসর্গ করা আর একটি নৃশংস প্রথা ছিল। এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী যে, স্ত্রীলোকগণ বিবাহের পর বহু দিন অপুত্রক থাকিলে, গঙ্গার নিকট মানত করিত যে, সন্তান হইলে প্রথম সন্তানটিকে তাহারা গঙ্গায় উৎসর্গ করিবে। মৃতবৎসা দোষ কাটাইবার জন্যও অনেকে গঙ্গার নিকট সন্তান উৎসর্গের মানত করিত। ঢাকা এবং যশোহর হইতে নরনারী সন্তান-বির্জনের জন্য ভাগীরথী সমীপে উপস্থিত হইত। এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিয়ু পত্রে লং সাহেবের কথা উদ্ধারযোগ্য :

In 1813 two women cast their children into the river, but the fathers took them out again and paid a certain sum of money to the Brahmins for their ransom. People from Dacca and Jessore used to throw their children to the Ganges here. Calcutta Review, 1846,

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবংকার্যে যাঁহারা সাহায্য করিবে, তাহাদিগকে হত্যাকারী হিসাবে গণ্য করা হইবে বলিয়া স্থির হয়; বর্তমানে এই প্রথা ভারতবর্ষে আর প্রচলিত নাই।

চড়কে বান-ফোঁড়া ॥ বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সর্বত্র আর একটি প্রাণান্তকর প্রথা প্রচলিত ছিল—তাহা চড়কের সময় ঝুলিবার জন্য পৃষ্ঠদেশে বান-ফোঁড়া বলিয়া কথিত। চড়কগাছে ঝুলিবার জন্য জনসাধারণকে পুণ্যসঞ্চয়ের লোভ দেখাইয়া, সাধারণতঃ মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া, উক্ত কার্যে প্রলুব্ধ করা হইত। চড়কের সময় চড়কগাছে ঘোরা একটি প্রধান উৎসব ছিল। চড়ক দেখিবার জন্য দেশদেশান্তর হইতে জন-সমাগম হইত এবং যাহারা চড়কগাছে ঝুলিত, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িত ততক্ষণ তাহাদিগকে ঘুরান হইত। বহু বৈদেশিক ভ্রমণকারীর বর্ণনার মধ্যে এই নিষ্ঠুর প্রথার উল্লেখ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে তৎকালীন সংবাদপত্রে চড়ক পূজা সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রাদি প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে দুইটি সংবাদ উদ্ধারযোগ্য :

চরক পূজা—চরক পূজার অতি ঘৃণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। ঐ দিবসীয় অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময়ে ইটালির রাস্তার পশ্চিম দিগবর্তী প্রথম গলির মধ্যে রাধাকান্ত মুন্সী নামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে ঐ স্থান সমূহ সর্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব একব্যক্তিকে পাক খাইতে দেখিতেছিল এবং তৎকালে ঐ মুন্সীর চাকর বাকর ও অন্যান্য অত্যন্ত কলবর করিতেছিল কিন্তু যে রজ্জুতে সন্ন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহা দৈবাৎ ছিঁড়ে যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি বেগে গিয়া ৬০ হাত দূরে পড়িল পরে উঠাইয়া দেখা গেল যে শরীরটা তাহার একেবারে

চূর্ণ হইয়া গিয়াছে মুখখানা পিণ্ডাকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। [২২ এপ্রিল ১৮৩৭]

আমি এইবার কোন স্থানে দুই মোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সন্ন্যাসীকে ঘুরিতে দেখিলাম তাহার মধ্যে একজন মহাদেবের ন্যায় বেশভূষা করতঃ পদদ্বয়ে বাণ ফুঁড়িয়া উর্দ্ধপদে অধঃশিরে নির্নিমেষাক্ষ হইয়া ঘুরিতেছে। দে পাক্ দে পাক্ তাহাতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ঐ চারিজন সন্ন্যাসীকে নামাইয়া দেখা গেল যে তাহারা সকলেই মুমূর্ষপ্রায় বিশেষতঃ উক্ত শিববেশধারী দীর্ঘ জটাজুটযুক্ত ফণিফণাম্বির ভক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবং তাহার যে স্থানে ঐ বাণ ভেদিত হইয়াছিল তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিঁড়িয়াছিল। আর কিঞ্চিৎকাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধকরি ঐ সন্ন্যাসী ছিঁড়িয়া পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষুগণ সহিত নিধন হইত। অস্মদাদির মানস যে ঐ প্রব্রজ্যা এককালীন প্রশমন না করিয়া তাহার আর আর তামাসা ও পূজা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া কেবল বাণ ফোঁড়া ও চড়ক ঘোরা মাত্র রহিত আজ্ঞা করেন। স্বম্বীয় শ্রীচুঁচুড়া নিবাসিনঃ। [১২ মে ১৮৩৮]

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রাণহারী প্রথা চিরতরে রদ করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয় এবং বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে ক্রমশঃ ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট বিডন সাহেব বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত পরামর্শ করিয়া, চড়কের সময় পৃষ্ঠে বাণ-ফোঁড়া বে-আইনী কার্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

বাণ-ফোঁড়া-বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর, ইহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু হুগলী জেলায় উক্ত বৎসরে তিনজন বাণ-ফোঁড়ার জন্য গ্রেপ্তার হয়। ছোটলাট বিডন সাহেব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে এই প্রথা সমূলে রহিত করিবার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি করিয়াছিলেন।

চড়কপূজা উপলক্ষে বাণ-ফোঁড়া ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে; বর্তমানে স্বেচ্ছায় বা সরকারী নিষেধাজ্ঞায় অন্যান্য প্রদেশে এই প্রথা বন্ধ হইলেও, নিম্ন-বঙ্গের বহু জেলায় অদ্যাপি ইহা ধর্মের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নির্মম প্রথা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর; কারণ এইরূপ প্রাণান্তকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ হৃদয়হীন হইয়া যায় এবং তাঁহাদের স্বজনগণ তাহারা এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে দেখিয়াও নীরব থাকে। এই প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য সরকার বাহাদুর এবং বঙ্গের বিশিষ্ট হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কয়েকজন শক্তিশালী হিন্দু, ইহা উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এমন কি বঙ্গের ছোটলাটের কাউন্সিলের জনৈক সদস্য আইনের সাহায্যে ইহাকে রহিত করিবার বিশেষ পক্ষপাতী।

ধর্মের নামে কুপ্রথা প্রচলিত হইলেও, সরকার হইতে কোনপ্রকার উৎসাহ এযাবৎ দেওয়া হয় নাই বরং ইহা রদ করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রথা রহিত না হওয়ায় মহামান্যা মহোদয়ার ভারতীয় সেক্রেটারী ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের 'ডেসপ্যাচে' এই কুপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করিবার চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়াছেন।

সেইজন্য নিম্নবঙ্গের জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, যখন এই প্রথার দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হইয়া কেহ নিজের জীবন বা স্বাস্থ্য বিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইবেন, তখন যেন তাঁহারা তাহাদের হস্তে রক্ষিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে আইনানুসারে দন্ড দেন।

প্রত্যেক বিভাগের কমিশনার ও জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণকে আরও জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাহাদের এলাকার যাবতীয় জমিদারবৃন্দকে জানাইয়া দেন, যে যদি তাহারা বাণ-ফোঁড়ার প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে তাহারাও আইনানুসারে দন্ডনীয় হইবেন। চড়ক-পূজার সময় ধর্মানুষ্ঠান করিবার কোন বাধা নাই; কিন্তু ধর্মের নাম দিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্মম অত্যাচার এবং তাহা দেখিয়া জনসাধারণের আমোদ-প্রমোদ করিবার যে প্রথা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহাই এতদ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যাহা হউক, সরকার হইতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায়, মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলা ব্যতীত বঙ্গের সর্বত্র ইহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে সরকারী-কর্মচারীগণ মেদিনীপুর ও ঢাকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

The reports of the local officers showed that in the cases alleged to have occurred in Midnapore the swingers had not used hooks. As the interference of Governmen t with native customs extends only so for as is necessary in the interests of humanity, the practice of swinging during the Charak Puja without the infliction of bodily torture had never been prohibitcd. In the cases, however in the Dacca districts, hook-piercing had been practised. The Commisi-soner reported that the parties immediately concerned had been punished but that no steps had been taken against the Zamindars in whose estates the cases were discovered. (১৪)

গাজন ॥ চড়ক বাংগলা দেশের শেষ উৎসব; ইহার সহিত সারা বাংগলাদেশে গাজন মহাসমারোহে পালিত হইয়া থাকে। কেবল হুগলী জেলায় নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে এই উৎসব ঢাকঢোলের বাদ্য সহকারে হিন্দুর গৃহে এক নব ধর্ম-ভাবের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ কারিগর ও নীচ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই সন্ন্যাস অবলম্বন করে দেখা যায়। তাহারা প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিয়া গাজন ব্রত পালন করিয়া থাকে। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে ব্রতীগণ, পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, ফলমূল আহার, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান এবং এক সন্ধ্যায় নিরামিষ আহার করিয়া থাকে। এই ব্রত-পালন করা দেখিলে প্রথমেই ইহাকে শাস্ত্রীয় ব্রত বলিয়া মনে হয়। এক এক স্থানে গাজন এক একটি ভাবে উদযাপিত হয়। স্থান, পাত্র ও কালভেদে কেহ শিবের গাজন আর কেহ বা নীলের গাজন বলিয়া থাকে। গাজনে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি এক পায়ে নৃত্য করিতে করিতে মাথার উপর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শিবের সম্মুখে গাজনতলায় আগমন করে। তারপর মণ্ডল শিবের বন্দনা পাঠ করিয়া মাথার চুল দিয়া শিবালয় মার্জনা করে।

হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমান জেলায় গাজনে যে "শিবের বন্দনা" গাওয়া হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। শিবের গাজন মুসলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

॥ শিবের বন্দনা ॥

হাতে ত্রিশূল রাঙ্গা লাটি, পরিধানে বাঘের ছাল,
বৃষভ বাহনে শিব, ত্রিদশের নাথ।
জাগরে জাগরে ভাই, সত্যের কোটাল॥
মুক্ত হইল ঠাকুরের পূর্বদ্বার॥
প্রভু যোগ নিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ,
পরিহর তোমার চরণে।
কার্তিক গণেশ কোলে, শয়ন আছ নিদ্রা ভোলে,
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে॥
নিদ্রা ত্যেজ দেবরাজ বহু মা খট্টার মাঝ
নিরন্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে।
প্রভু তুমি দেব অধিপতি, হরি ব্রহ্ম কর স্তুতি,
অন্য দেব কোন খানে লাগে॥
প্রভু ত্যেজহ নিদ্রার মায়া, সেবকের কর দয়া,
পুরা মর্ত দেব ত্রিপুরারী॥
শিঙ্গা ডম্বুর হাতে, বৃষভ রাখহ বাম ভাগে
বাসুকি রহুক ফনা
শিরে ধরি স্নিগ্ধ গঙ্গা, কপালে চাঁদ বেরি।
তথি মধ্যে শোভে ফোঁটা, হাড় মালা যোগ পাটা,
গায়ে শোভে বিভূতি ভূষণ॥
প্রভু দেব ত্রিলোচন, বিঘ্ন কর বিমোচন,
নরের শকতি।
আমরা তোমার আস্তাকরি শাল খুলে ভর করি (ক)
আগম নিগম কয়।
প্রভু দেব গঙ্গাধর, দেবতার ঈশ্বর
অপরাধ ক্ষমহ মৃত্যুঞ্জয়॥
বৃষভ বাহনে শিব, ত্যেজহ কৈলাশ গিরি,
পুরা অর্থ দেব ত্রিপুরারি।
গম্ভীরে করহ অধিষ্ঠান। তোমার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥

(ক) এই সমগ্র পদ্যটির অর্থ আমরা 'শালে ভর' দিই।

দেউল বন্দন, দেহারা বন্দন, শাঠ, পাঠ, লাঠি বন্দন,
আদ্যের তুলসী বন্দন, আর বন্দ সরস্বতীর গান।
ডাইনে বন্দ রাম লক্ষণ, সীতা বামে বীর হনুমান।
পূর্বে আছেন ভানু ভাস্কর, তার চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥

প্রত্যেক বন্দনার দেউল বন্দন হইতে বীর হনুমান পর্যন্ত পঠিত হইবার পর

উত্তরে আছেন ভীম কেদার।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥
গ্রামে আছেন বাস্তু দেবতা।
তাঁহার চরণে পঞ্চ প্রণাম॥
গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেশ্বর।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥
গাজনে আছেন ধর্ম অধিকারী।
তাঁর চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥
গাজনে আছেন ছত্তির (শ) সাই।
বাহাত্তর ভক্তা
তাঁদের চরণে করি পঞ্চ প্রণাম॥

সকল স্থানে গাজনে সাত দিন ব্যাপিয়া আনুষ্ঠানিক পর্বের মধ্য দিয়া চড়ক, ঝাঁপ, পূজা ইত্যাদি পালিত হয়। এই উৎসবে নিম্নশ্রেণী সন্ন্যাসী হইলে, ব্রাহ্মণও তাহাদিগকে প্রণাম করে এবং এই সময়ে সন্ন্যাসীদের নীলকে পূজা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। আমি দেখিয়াছি, যখন সন্ন্যাসীরা প্রতি গৃহে আসিয়া নীলের গান করিয়া ভিক্ষা করিতে আসে তখন পুরনারীরা তাহাদের ফল উপহার দিয়া, পা ধুয়াইয়া ও চন্দন দূর্বা এবং পাখার বাতাস করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। তাহারা মূল সন্ন্যাসীকে ঢাকীর বাদ্যসহকারে ছোট শিশুদিগকে লইয়া নৃত্য করিতে অনুরোধ করে। নারীদের বিশ্বাস যে, যদি শিশুদের উপর নজর অর্থাৎ কু-দৃষ্টি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে উহা কাটিয়া যাইবে। তাহা ছাড়া চড়কে অন্যান্য লৌকিক আচার দৃষ্ট হয়। বহুদিন অতিবাহিত হইল, বাণ ফোঁড়া নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চন্দননগরে এবং হুগলী জেলার বহু স্থানে এখনও একজন ঢুলিকে চড়ক-গাছে বাঁধিয়া ঘুরান হয়। শতাধিক বৎসরের পূর্বেকার ক্ষীণ আভাস এই গাজন অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে দেখা যায়। বাঙলার এই গাজন পর্বে কুম্ভীর তৈয়ার করাকে ইহা নীলের প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। এই উৎসবের মধ্যে লোকনৃত্য, গীত, চিত্রকলা ও ব্রতের একসঙ্গে সমাবেশ দেখা যায়। বাঙলার মেলা হইতে যে, শিল্প ও সাহিত্য উদ্ভব হইয়াছে, তাহা গাজনের মধ্যে আজও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙলায় 'বারমতী' ও 'গৃহভরণ' গাজনই সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। বারমতী অর্থাৎ গাজনের বারটি অধ্যায় ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব প্রচলিত আছে। গৃহভরণ গাজন ধর্মপুরাণ মতে চলিয়া আসিতেছে। মানসিক থাকিলে এই ব্রত করে। একটি কাল ছাগলকে

সংস্কার করিয়া থাকে; এই ছাগলের এক বৎসর সংস্কারের পর চার বা পাঁচ বৎসর পর গাজন হয়। ইহাকে কোল লুইয়া বলে। একজন দলপতি নিযুক্ত হয়, তাহার কথায় মানসিক শোধ এবং গাজন অনষ্ঠান হয়। তিনি অসমর্থ হইলে একজন প্রতিনিধি অর্থাৎ পটভক্তা নিযুক্ত হয়। গাজন বেদীতে লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা করা হয়। পূজায় চণ্ডীপাঠ এবং রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ পাঠ কোন কোন স্থানে বিধি আছে। ধর্ম পণ্ডিত ভক্ত্যা কামিনীগণ (মেয়ে ভক্ত্যা) দ্বারায় ধর্মের পূজা করান হয়। এই উৎসবে ধর্মমঙ্গলের গান হয়। নিম্নে ধর্ম-পুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইলঃ

"ধর্ম গৃহাভরণে যে ফল পায় সবে।
শুনিলে সাংজাত খণ্ড সেখ ফল লভে॥
পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে শত ধেনু দান।
ততোধিক ফল পায় শুনিলে পুরাণ॥
দ্বিতীয় চরিত্র খণ্ড অতি সুললিত।
তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত॥
পিতামহ তোমার লাউসেন গুণধর।
তাহার চরিত্র যত অতি মনোহর॥
বারমতী নামে ব্যক্ত শ্রীধর্মপুরাণ।
কহিব তোমারে সেই অপূর্ব আখ্যান॥
লাউসেন চরিত্র খণ্ড নাম বারমতী।
সকল মঙ্গলদ ধর্মের প্রিয় অতি॥" (১৮)

বারমতী ও সংজাত এই দুইটি গাজন একসময় বাঙ্গলায় খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। সংজাত বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বারমতী পুঁথি চব্বিশ পালায় সমাপ্ত হয়। গায়কেরা প্রথম দিন বৈকাল বেলা ও দ্বিতীয় দিন সম্পূর্ণ গীত করিয়া থাকে। পঞ্চমী হইতে একাদশীর মধ্যে কমিন্য সন্ধ্যার কার্য শেষ করিয়া রাত্রের গান করে।

সাধারণতঃ গাজনের প্রথম দিনের উৎসবে, মূল সন্ন্যাসীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঢাক পিটাইয়া নরনারী এবং শিশু সকলের প্রাণে ভক্তির ভাব আনয়ন করে। দ্বিতীয় দিনে সন্ন্যাসীরা শিবের মন্দিরে এক সঙ্গে সমবেত হইয়া নৃত্য করে; ইহাকে 'নিজহর কামান' বলে। তৃতীয় দিন গঙ্গা বা অন্য কোন নদী হইতে মাটির কলস করিয়া জল আনয়ন করিয়া তাহা গাজন মণ্ডপে রাখিয়া দেয়। চতুর্থ দিনে তাহারা 'মহাহবিষান্ন' করিয়া থাকে। সন্ধ্যায় সুসজ্জিত চতুর্দোলায় ধর্মের বা শিবের পাদুকাকে সংস্থাপিত করিয়া আবাল-বৃদ্ধবণিতা বাদ্য ও গীত সহকারে অন্য একটি গ্রামে মুক্তি আনয়ন করিতে যায়। সেই স্থানের ব্যক্তিগণ ধর্মের পত্নীরূপে মুক্তি দেবীকে দান করে। সেই স্থানে পুরোহিত মুক্তি 'অধিবাস' ও 'ধান্যের জন্মবিবরণ' বলে। তৎপরে ধর্ম ও মুক্তিদেবীকে চতুর্দোলায় লইয়া গাজন মণ্ডপে সংস্থাপিত করিয়া পূজা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার করা হয়। পঞ্চম দিন অর্থাৎ গাজনের শেষ দিনে চড়ক পূজা হয়। শোনা যায়, চড়কগাছটি মাছের মত

জলে সাঁতার কাটে, যতক্ষণ না তাহারা উহাকে ধরিতে পারে, ততক্ষণ সন্ন্যাসীরা জলস্পর্শ করে না। চড়ক-গাছটিকে পূজা করিয়া তারপর উহাকে পুনরায় জলে বিসর্জন দেয়। এই দিনে তাহারা সন্ন্যাস ব্রতের নিয়ম ভঙ্গ করে।

"ধর্মভক্ত লাউসেন হাকন্দ তীরে নিজ দেহ নব খণ্ড সেবা করিয়াছিলেন। এই জন্য কৃত্রিম হাকন্দ প্রস্তুত করিতে হয়। এই সময় ভক্ত্যারা স্নান করিয়া নূতন, অভাবে পুরাতন, শালবাণ, বাণ, জিহ্বাণ, ঝাঁপকন্টক ইত্যাদি লইয়া ছাঁওলায় উপস্থিত থাকে। ব্রাহ্মণ গাজনের ঝাঁপ কন্টক, সূচীমুখ, খড়্গ, অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরধার ইত্যাদি অস্ত্রের যথাবিধি পূজা সমাপ্ত করিলে, পাটভক্ত্যা বা নব খণ্ডকারী ভক্ত্যা বাণ বিদ্ধ করে। সংজাত এই নয়টি বাণ বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, কেবল মাত্র জিহ্বাবাণ দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করা হয়।" অধুনা সর্বত্র এই সকল নির্মম আনুষ্ঠানিক পর্ব নিষিদ্ধ হইয়া যাওয়াতে কেবল ধর্মানুষ্ঠানকারিগণ পাঠ, গান, পূজা ও ব্রত উদযাপন সংযম ও সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়া জাগতিক ও পরমার্থিক সাধনা করে।

বাঙ্গলার নব বাসন্তিকা যে নৃত্য-গীতের ছাপ নরনারীর প্রাণে রাখিয়া যায়, তাহার ভাবে বিহ্বল হইয়া বঙ্গবাসী প্রতিটি দিন আনন্দরস অনুভব করিতে থাকে। ফাল্গুনের সকল আনন্দ শুধু যৌবন উপভোগ করিবার জন্য, ইহার ভিতর কোন পবিত্র ভাব থাকে না। চৈত্রের সন্ন্যাস ভূষণ ভোগীকে ত্যাগী হইবার নির্দেশ দেয়: ইহা যেন বাণপ্রস্থের পূর্বাভাস। জগৎটিকে ভোগ করিতে হইলে, ত্যাগ না করিলে তাহার কোন রস আস্বাদন করা যায় না। এই ত্যাগের ভাব দ্বারা চরিত্রে দৃঢ়তা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায়, বাঙ্গালী ফাল্গুনে কৃষ্ণ-রাধার দোলযাত্রা করিয়া চৈত্রে সন্ন্যাসী শিবের সাধনা করে। বাঙ্গলার কৃষক কুলের মাঝে এই ধর্মজাগরণ কিরূপে আসিল, তাহার প্রধান কারণ নির্ণয় করিবার উপায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, ঋতুর পরিবর্তন ও প্রকৃতির প্রভাব। গ্রাম্য সঙ্গীতে চৈত্রের বর্ণনায় দেখা যায়—'হইত গাছে পাকা বেল,' কবি বার মাসের পর্ব বর্ণনা করিতে যাইয়া গাহিয়াছেন—'চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস গাজনে বাধে ভরা।'

তপ্ত মুক্তি ॥ পশ্চিম বঙ্গে 'তপ্তমুক্তি' বলিয়া দোষী ব্যক্তিকে সাজা দিবার একপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তপ্তমুক্তি অর্থাৎ গরম ঘৃত মুখে প্রয়োগ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলা হইত। ইংরাজ রাজত্বে সামাজিক শাসন শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাণান্তকর প্রথা দূরীভূত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনৈক যুবতী তাঁহার স্বামী কর্তৃক অসতী বলিয়া প্রমাণিত হইলে গ্রাম্য সামাজিক বিধানে তাহার 'তপ্তমুক্তি'তে মৃত্যু হয় এবং সাতহাজার নরনারী উহা দর্শন করেন। বর্তমানে এই প্রকার সামাজিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। রেভারেন্ড লং সাহেব এই সম্বন্ধে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিয়ু' পত্রে লিখিয়াছেন:

In 1807 the Topta-Mukti or ordeal by hot clarified butter was tried before 7000 spectators on a young woman accused by her husband of adultery. Calcutta Review. 1846,

গঙ্গাযাত্রা॥ বহু প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ, জরাতুর এবং মৃতকল্প ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করা হইত; কারণ গঙ্গাতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা, হিন্দুগণের নিকট এক মহাপুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। হুগলী জেলার মধ্যে নিমাই তীর্থের ঘাট ও ত্রিবেণীতে বহু দূর দেশ হইতে সেই জন্য 'গঙ্গাযাত্রী' আগমন করিত এবং তাঁহাদের জন্য নির্মিত গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ ঘরগুলি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যু ধীরে ধীরে আসিয়া ঐ সকল অন্তিম শয্যাশায়ী পুণ্যার্থী নরনারীর ভব-যন্ত্রনা দূর করিয়া দিত। যাহাদের মৃত্যু হইতে দেরী হইত, তাহাদের আত্মীয়বর্গ মহা বিপদে পড়িতেন; পরিশেষে মুমূর্ষু রোগীকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান এবং ঠান্ডা দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া তাহার মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া দিতেন। কারণ, হিন্দুগণের তৎকালে এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, কোন গঙ্গাযাত্রী যদি রোগমুক্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে সংসারের অমঙ্গল হয়। সেই জন্য কিংবদন্তী এইরূপ যে, যাহারা গঙ্গাযাত্রার পর দৈবক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া যাইত, তাহারা আর দেশে ফিরিয়া যাইত না; শান্তিপুরে যাইয়া ভাগীরথীর তীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিত। এইরূপ আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত গঙ্গাযাত্রী নরনারীর জন্যই শান্তিপুরের জন-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া হনিবার্জার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

When a patient thus situated, happens to recover, he considers that he has, as it was, acquired a new life and thenceforth all his former relations and friends are treated as stranger ; he never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the Ganges until he arrives at Santipore, where he settles himself and it is a curious fact, that the whole populations of Santipur is composed of such person.

সোমড়ার স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় ত্রিবেণীতে এক গঙ্গাযাত্রীর যে বিবরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ

"এক বৃদ্ধাকে গঙ্গাযাত্রার জন্য আনিয়াছে; প্রাচীনের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট। কথা কহিবার ক্ষমতা নাই—অতি কষ্টে দুই একটি কথা বাহির হইতেছে। শীতকাল, কিন্তু তাহাকে অতি প্রত্যুষে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইয়াছে। ডাবের জল, দধি, মর্তমান রম্ভা এবং চিনির জল ঘন ঘন খাওয়ান হইতেছে। টক দই খেয়ে রোগীর দাঁত টকিয়া যাওয়ায় কহিতেছে—ওঁরে আঁর দ'ই দেসনে ব'ড় দাঁত টঁক গিয়েছে, কিন্তু "যাবে বৈ কি" বলিয়া তথাপি তাহার মুখে দধি প্রদান করা হইতেছে।

উঃ কি নিষ্ঠুর! কি পাষণ্ড ! যখন মৃত্যুকালে রোগীর মুখে বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল দিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়, তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রা করাইবার আবশ্যকতা কি? আর এই প্রকার হত্যাসাধন করা কি মানুষের উচিৎ?" (১৯)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রে এই কুপ্রথার নিন্দা করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বঙ্গের শিক্ষিত জনসাধারণ এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য ছোট লাট বিডন সাহেবের

নিকট আবেদন করেন। এই বিষয়টি লইয়া অনুসন্ধান করা হয় এবং গঙ্গাযাত্রা শাস্ত্র-সম্মত হইলেও "অন্তর্জলি" অর্থাৎ মৃতপ্রায় বা অসুস্থ ব্যক্তির অর্ধাংশ গঙ্গায় ডুবাইয়া রাখা অশাস্ত্রীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। আইনের সাহায্য না লইয়া যাহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হইবে, তাহার নিকট আত্মীয়, রোগীর বাঁচিবার আশা নাই, এই মর্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ পুলিশে দরখাস্ত করিলে তবে গঙ্গাযাত্রা করিতে দেওয়া হইবে এইরূপ স্থির হয়। ক্রমশঃ এই প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

॥ বার মাসে তের পার্বণ ॥

বাঙ্গলাদেশের 'বার মাসের তের পার্বণে'র সবগুলিই হুগলী জেলায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ কার্তিক ও মাঘ মাসে নিত্যনৈমিত্তিকরূপে বহু গৃহে ভাগবতপাঠ ও তাহার সঙ্গে দরিদ্রনারায়ণের সেবা, জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দনা যাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসা পূজো ও ঝুলনযাত্রা, ফাল্গুন মাসে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজো ও গাজন উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বারমাসের উৎসব সম্বন্ধীয় হুগলী জেলায় প্রচলিত একটি প্রাচীন ছড়া এই স্থানে উল্লিখিত হইলঃ

অঘ্রাণ মাসে নবান্নেতে নতুন ধান কেটে,
পৌষ মাসে বাস্তু পূজো আর ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি,
ফাল্গুন মাসে দোল পূজো, ফাগ ছড়াছড়ি।
চোত্তির মাসে দেল পূজো, সন্ন্যেসীর মেলা,
বোশেখ মাসে ভগবতী পূজো, গরুর গলায় মালা।
জষ্টি মাসে ষষ্ঠি পূজো, জামাইর হাতে বাটা,
আষাঢ় মাসের রথযাত্রা ঠাকুর কাটেন ফোঁটা।
শ্রাবণ মাসে মনসা পূজো, পথে পাতা ঘট,
ভাদ্দোর মাসে বিশকরম পূজো, অপর জাতির হাট।
আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব, লোকে কেনে পাঁঠা,
কার্তিক মাসে দ্বিতীয়াতে, ভায়ের কপালে ফোঁটা।

হুগলী জেলায় বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানগুলি যেমন সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তেমন ষোড়শোপচারে শক্তিপূজাও খুব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শক্তিপূজায় ছাগল, মহিষ, ভেড়া বলি দেওয়া হইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্যে লিখিত আছেঃ

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরষে।
ষোল উপচারে দিয়া ছাগল মহিষে॥

এখন প্রাচীন সেই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হইলেও আজও দুর্গা পূজার সময় "দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে" না হইলেও বহু ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। মাংস খাইবার লোভে শাক্তদের ভক্তি এখন কেবল হুগলী জেলায় নয় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলায় বড় বড় উৎসবাদি ছাড়া বহু গৃহস্থবাড়িতে ব্যাপকভাবে এমন কতকগুলি পূজা হয়, যাহার জন্য পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। গৃহকর্ত্রীগণই এই সমস্ত পূজাপার্বণের ব্যবস্থাপক ও পূজক। ছোট ছোট ব্রতকথা এই সকল পূজার মন্ত্র। মন্ত্রের দ্বারা শিব, সূর্য, লক্ষ্মী, চণ্ডী, ষষ্ঠী প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবী পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এই সকল পূজার মধ্যে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে অনুষ্ঠিত **ইতুপূজা** (মিত্র পূজা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুগলী জেলার প্রতি গৃহে ইহা খুব সম্ভ্রমের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

বারব্রত কুমারী, সধবা ও বিধবা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবস্থা আছে। ব্রতকথার মূল বিষয় হইতেছে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উন্নতি হউক, প্রচুর ধান হউক, স্বামী খুব ভালবাসুক, স্বপত্নী মরুক, গোলাভরা ধান ও গোয়ালভরা গরু হউক। আর কুমারীগণ বৈশাখ মাসে শিব মন্দিরে যাইয়া শিবের মাথায় প্রত্যহ জল দিয়া প্রার্থনা করে যে শিবের মতন স্বামী হউক। কেহ বা প্রার্থনা করে, রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেবর ও দশরথের মত শ্বশুর হউক।

হুগলী জেলায় গাছের পূজাও বহু স্থানে প্রচলিত আছে। প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, নিম, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষ বহুকাল হইতে কোন কোন মহাপুরুষের অধিষ্ঠানক্ষেত্ররূপে পূজা পাইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গলাদেশের বালিকারা পূর্বে শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের আগে পর্যন্ত পিত্রালয়ে এবং বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যে সকল বারব্রতের অনুষ্ঠানাদি করিত তাহার অধিকাংশ পুরাণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে না হইলেও, উহাদের মধ্যে পুরাণের ভাব গুপ্তভাবে সংমিশ্রিত আছে। বৎসরের কোন কোন মাসে হুগলী জেলায় কোন কোন ব্রতের অনুষ্ঠান হইত, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

ব্রত	মাস	বিষয়
গোকাল	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত	গাভীপূজা
দশপুত্তলী	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত	দশরথ রাম
হরির চরণ	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত	শ্রীহরি
অশ্বত্থপত্র	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত	অশ্বত্থ মহিমা
পুণ্য পুষ্করিণী	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত	জলাশয় উৎসব
অক্ষয় ফল	বৈশাখ মাস, অক্ষয় তৃতীয়া	নারায়ণের উৎসৃষ্ট জিনিষ ব্রাহ্মণকে দান
অক্ষয় ধন	বৈশাখ মাস, অক্ষয় তৃতীয়া	ঐ
অক্ষয় সিন্দুর	বৈশাখ মাস, অক্ষয় তৃতীয়া	ব্রাহ্মণকন্যা
বৈশাখ চাপা	বৈশাখ মাস	শিবপূজা
সন্ধ্যামণি	বৈশাখ মাস	নক্ষত্র পূজা

ব্রত	মাস	বিষয়
এয়োসংক্রান্ত	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তি	ব্রাহ্মণ কন্যা
ফল গছান	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি	ব্রাহ্মণকে ফলদান
ধন গছান	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তে	ব্রাহ্মণকে ধনদান
জ্যৈষ্ঠচাঁপা	বৈশাখ সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শিবপূজা
জয় মঙ্গলবার	জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচণ্ডী
কুলুইচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চণ্ডিকা
যমপুকুর	কার্তিক মাস	যমরাজ
তুষ তুষলী	অগ্রহায়ণ মাস	তুষ ও গোবর
মধু সংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	পাত্রে মিষ্টান্ন দান
কলা ছড়া	চার বৎসর প্রতি সংক্রান্তি	কলা দান
ঘৃত সংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	প্রস্তর পাত্রে ঘৃতদান
একাদুধে পঞ্চামৃত	সারা বৈশাখ	নারায়ণ পূজা
তেজপত্র সংক্রান্তি	সারা বৈশাখ	নারায়ণ পূজা
আদা সিংহাসন	সারা বৈশাখ	ভগবতীভাবে ব্রাহ্মণ-কন্যার পূজা
হরিষ মঙ্গলচণ্ডী	বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচণ্ডিকা
জয় মঙ্গলচণ্ডী	বৎসরের যে কোন মঙ্গলবার	চণ্ডিকাদেবী
রাই-আরাধনা	বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি	শ্রীরাধিকা
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চণ্ডী (শঙ্কটা)
নাগ পঞ্চমী	শ্রাবণ মাস	মনসা পূজা
নীলষষ্ঠী	চৈত্র মাস	দুর্গাদেবী
গাড়শী	আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি	লক্ষ্মীপূজা
পাষাণ চতুর্দশী	পৌষ মাসের শুক্লা চতুর্দশী	দুর্গাদেবী
লক্ষ্মীপূর্ণিমা	কোজাগরী পূর্ণিমা	লক্ষ্মীদেবী
কুলই ব্রত	অগ্রহায়ণ মাসের রবিবার বা বৃহস্পতিবার	কুলদেবতা

বাঁকুড়া রায়ের পূজা॥ সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি দেবতার পূজা করা হয়। ব্যাঘ্রের দেবতা যেমন দক্ষিণা রায়, কালু রায়, বাঁকুড়া রায়। এই দেবতাকে জলঘটে বা প্রস্তর মূর্তিকে আত্মারূপে পূজা করা হয়। ব্যাঘ্রের উপর সশস্ত্র নরমূর্তির আকারে ইহা অঙ্কন করা হয় এবং কোন মন্দির কুঠির বা বৃক্ষতলে এই দেবতারূপ ঘটকে স্থাপন করা হয়। এই পূজার বিশেষ কোন সময় নাই। পূজায় ছাগল বলি দেওয়া হয়। চাল ও মিষ্টান্ন বাঁকুড়া রায়ের পূজার প্রধান উপকরণ। কোন নিম্ন-শ্রেণীর পূজারী অথবা পুরোহিত ব্রাহ্মণ এই পূজার ভার গ্রহণ করেন। শিবের পুত্র বলিয়া এই দেবতাদের বলা হয়। বাঁকুড়া রায় সম্বন্ধে বাংলা গীতিকাব্যে বহু উল্লেখ আছে।

কায়স্থকবি কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজীর যুদ্ধের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। কবি কৃষ্ণরাম সর্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। রায়মঙ্গলের শেষে কবি লিখিয়াছেন "সরস কবিতা কবি কৃষ্ণরাম গায়। বাঘের বিক্রম শুনি হাসিলেন রায়॥" এই রায়ের অর্থ দক্ষিণরায়—ব্যাঘ্রের দেবতা।

মনসা পূজা॥ সর্পের দেবী মনসা সর্বত্র পূজিত হয়। ইহা মনসা গাছ, সর্পের উপর উপবিষ্ট স্ত্রীমূর্তি বা এক টুকরা সিন্দুর চর্চিত পাথর দ্বারা পূজা করা হয়। সাধারণতঃ গাছের নীচে বা মন্দিরে দেবীকে স্থাপন করা হয়। চাল ও দুধ পূজার প্রধান উপকরণ, তবে বিশেষ উপলক্ষে ছাগ বলি দেওয়া হয়। রক্তজবা ও দূর্বা ঘাস দেবী খুব ভাল বাসেন। শ্রাবণ বা ভাদ্র সংক্রান্তিতে বিশেষ ভাবে এই পূজা করা হয়, কারণ এই সময় সাপের ভয় সব চেয়ে বেশী। গোয়ালারা পৌষ মাসে রাখাল মনসার পূজা করে। রাখাল বালকেরা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া পূজার যোগাড় করে ও ব্রাহ্মণ পূজারী হয়। প্রচলিত মত অনুসারে মনসা বাসুকীর ভগ্নী, জরৎকারু মুণির স্ত্রী ও ঋষি আস্তিকের মা। মহাভারতের আদিপর্বে ইহার উল্লেখ আছে। মনসা পূজার প্রসারের জন্য অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেওয়ার কথা বহু প্রাচীন বাংলা কবিতায় উল্লেখ আছে। চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনী কবি বিপ্রদাস, কবি ক্ষেমানন্দ, কবি ষষ্ঠীবর, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীবদন প্রভৃতি অনেকে কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

॥ ঝাপান ॥

একদা রাঢ়ভূমির সর্বত্র বিশেষ করিয়া হুগলী জেলায় নাগপঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত মনসা পূজার প্রধান অঙ্গই ছিল ঝাপান উৎসব। আসল উৎসবের এখন বিলুপ্তি ঘটিয়াছে, তবে কোন কোন স্থানে এই উৎসব রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া এখনও টিকিয়া আছে। পূর্বে ঝাপান উৎসব মনসাপূজার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না; কালক্রমে ইহা মনসাপূজার বিশেষ অঙ্গ-রূপে স্বীকৃতি লাভ করে বলিয়া মনে হয়। বিপ্রদাস 'মনসা-বিজয়' কাব্যে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

> "এক শত শিষ্য সদা সংকের যোগান।
> বান্ধিয়া ছত্রিশ বানা নাগের ঝাঁপ্যান
> তাঁথির উপরে চড়ে নাগ আভরণ।
> বিষম শবদ আর ঢাকের বাজন॥"

ঝাপান শব্দের অর্থ নরবাহিত যান। বন্দ্যঘাটীয় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থে যে সব প্রাচীন শব্দের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে ঝম্পন শব্দটি অন্যতম। ঝম্পনের সংস্কৃত রূপ ঝাপ্যাযানের কথাও সেখানে আছে, যাহার অর্থ নরবাহিত যান। বিষবিদ্যায় পারদর্শী গুণি তাঁহার শিষ্যদের স্কন্ধে বাহিত হইয়া যে যানে বিজয়-যাত্রায় যাইতেন সেই যানের নামেই উৎসবের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঝাপানের যে চিত্র মনসা-বিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে, সেই চিত্র একজন বিদেশী ফরাসী চিত্রশিল্পী তাঁহার LES HINDOUS নামক

চিত্রগ্রন্থে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে বংশনির্মিত একটি মঞ্চকে কয়েকজন লোক বহন করিয়া চলিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্চের উপর বহু সর্প বিভূষিত একটি বালক উপবিষ্ট আছে। শোভাযাত্রায় আরো বহুলোক সাপের ঝাঁপি লইয়া চলিতেছে এবং ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে দেখা যায়। শিল্পীর নাম Par F. Battazard Solvyns চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত চিত্র, LES HINDOUS নামক চিত্রগ্রন্থে আছে। গ্রন্থটি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (Vol. II) JAUPAN বা Munsah Poojah একটি চিত্র আছে। এই খণ্ডটি, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, প্যারী নগরী থেকে প্রকাশিত হয়। চিত্র পরিচিতিতে Solvyns বলেছেন :

"Jaupaun is the feast of serpents……when the Jaupan or Munsah poojah is to be celebrated several Mauls are hired for the purpose and one of their children is dressed up in the best manner possible , after which they seat him upon bamboos and the other Mauls carry him in procession, escorted by an immense concourse of people and many musicians……To shew that it was the feast of serpents, every member of the procession carries one in his hand ; the child whom they escort has then even round his neck, his arms and his body as may be remarked in the prints."

এই চিত্র-গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় একশো বছর পরে, বাঙলা-সাহিত্যে যে ঝাঁপান-চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ঝাঁপান শব্দটির অভিধা বিড়ম্বিত। Solvyns -এর আঁকা ছবির সঙ্গে এর কোন মিল নেই। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" নামক উপন্যাসে ঝাঁপানের বর্ণনা এইরূপ :

"আমাদের দেশে বিশেষতঃ হুগলী-বর্ধমান বাঁকুড়া জেলায় আগে ঝাঁপান হইত। এখনও কোথাও কোথাও হয়। বহু দূর দেশ হইতে বহু মাল-বৈদ্য-ওঝা একত্র হইত। বড় বড় ধুরন্ধর সর্প ওস্তাদ আসিত। অসংখ্য শিষ্যের সংখ্যা গণনা করে কে? শিব-মন্দির সমক্ষে, বাঁশের বা কাঠের উচ্চ উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হইত। এইরূপ বহুসংখ্যক বড় বড় মঞ্চ শিব-প্রাঙ্গণে সুশোভিত হইত। কাঠের দ্বারা সংলগ্ন থাকিত। ইচ্ছা করিলে এক মঞ্চের লোক বাঁশ বা এক মঞ্চের সহিত অপর মঞ্চ—বাঁশ বা কাঠের উপর দিয়া অপর মঞ্চে যাইতে পারিত। ওস্তাদগণ শিষ্যসহ সাপের বহুসংখ্যক ঝাঁপি বা পেটারি লইয়া সেই উচ্চ মঞ্চের উপর উঠিত এবং সর্পের বিষম খেলা আরম্ভ করিত।" এই প্রসঙ্গে সর্প ক্রীড়া বর্ণনায় যোগীন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন :

"প্রথমতঃ এই কার্য......শেষ হওয়ার পর সর্পের অন্যরূপ প্রদর্শন আরম্ভ হইল। কোন ওস্তাদ তাহার শিষ্যের সর্বাঙ্গ সর্প দ্বারা ভূষিত করিল, সর্পের উষ্ণীষ মাথায় পরিল; কোন সর্প বলয় হইল, কোন সর্প মেখলার ন্যায় শোভিত হইল; এইরূপে যে ওস্তাদ যত দূর পারিল, আপন আপন শিষ্যকে সাধ্যানুসারে তত দূর সাজাইল।"

ওলাইচণ্ডী ॥ ওলাইবিবি বা ওলাইচণ্ডী, কলেরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যাহার পুরোহিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা মুসলমান। নিমগাছের নিচে ভাল ঘট রাখিয়া যাহার পূজা রাখা হয়। পূজার পদ্ধতি শীতলার অনুরূপ। পূজার 'পর ঢোল বাজাইয়া গান করা হয়। মুসলমান পুরোহিতই সবচেয়ে অদ্ভূত কারণ, পূজা নিশ্চয়ই প্রাগমুসলমান যুগের।

ঘন্টাকর্ণ ॥ ফাল্গুন মাসে ইহার পূজা হয় একটি গোবর রাখিয়া ঘন্টাকর্ণ তৈয়ার করা হয় ও কিছু সিন্দুর লিপ্ত কড়ি উপরে রাখা হয়। একটি বৃদ্ধা রমণী মন্ত্র পড়ে; চাল, ডাল ফল ঘেটুফুল ও দুর্বা পূজার উপকরণ। পূজার পরে ছেলেরা পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। কিংবদন্তী অনুসারে ঘন্টাকর্ণ শিবের বিশ্বস্ত সেবক ছিল, সেইজন্য চর্মরোগ সারাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

ম্যালেরিয়া বা অন্য জ্বর হইতে রক্ষা করিবার জন্য **জ্বরাসুরের** পূজা করা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ। চাল, মিষ্টি ফল ও অনেক সময় ছাগল বলি দেওয়া হয়।

সত্যনারায়ণ ॥ পরিবারের উন্নতির জন্য সর্বশ্রেণীর হিন্দুই সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া থাকে। এই পূজা পূর্ণিমায় মাসের যে কোন সময় হয়, ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকে। একটি পিড়ির উপর বৃত্ত আঁকিয়া ও চারিপাশে খুটি গাড়িয়া ঠাকুর বসান হয়। ময়দা, গুড়, চিনি, দুধ, পান সুপারী ও কলা পূজায় লাগে। ইহার নাম কাঁচা সিন্নি। পাকা সিন্নিতে মিষ্টি, সন্দেশ, বাতাসা প্রভৃতি প্রত্যেকটি পাঁচপোয়া লাগে। পুরোহিত নারায়ণের অর্চনা করেন ও পরে ঈশ্বরের কাহিনী বলেন। দ্রব্যগুলি গুলাইয়া জেলি প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত সকলকে দেওয়া হয় এবং বাকীটা প্রতিবেশীদের বাড়ীতে যায়।

এই পূজায় মুসলমান ধর্মের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। মূর্তি না থাকা, সিন্নি বৃত্ত, তীর সবই মুসলমানী প্রভাবের চিহ্ন। প্রবাদ আছে যে নারায়ণ একজন ফকিরের বেশে আসিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা যে সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকে সত্য নারায়ণ তাহারই অপভ্রংশ মাত্র।

সুবচনী ॥ সুবচনী আর একটি রোগের দেবী। ইহার পূজা পদ্ধতি অন্যান্যের অনুরূপ। তবে এই পূজার ২১টি পাতিহাস লাগে তার মধ্যে একটি আবার খোঁড়া হওয়া চাই। গল্প এইযে একজন লোক উক্ত সংখ্যক হাস খাইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু সুবচনীর পূজা করিয়া মুক্তিলাভ করে। কোন কোন স্থানে মুসলমানদের অংশ দেওয়া হয়।

মঙ্গলচণ্ডী ॥ মঙ্গলচণ্ডীর কোন মূর্তি নাই তবে ভাল ঘটে পূজা করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোন মঙ্গলবার তাহার পূজা হয়। কথিত আছে যে নিঃসন্তান অঙ্গরাজা ইহার পূজা করিয়া পুত্রলাভ করে। কার্তিক মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবারে পূজা করা হয়। প্রবাদ এই যে একজন গরীব ব্রাহ্মণ তাহার দুই কন্যা ইহার পূজা ক য় ধনবান হইয়াছিল। কেহ বলেন ইনি সূর্য দেবতা, আবার কাহারও মতে ইনি মা দুর্গা; কিন্তু নামটি আশ্চর্য নাম বলিয়াই মনে হয়।

ষষ্ঠী পূজা ॥ ষষ্ঠী শিশুদের স্বাস্থ্যের দেবী। শিশু জন্মাইবার ছয় দিন, একুশ দিন

ও একত্রিশ দিন পরে দেবীর পূজা করা হয়। বট গাছের নীচে একটি পাথর সিন্দুর চর্চিত করিয়া চাল, ফল, মিষ্টান্ন, দধি পুষ্প ইত্যাদি দিয়া ব্রাহ্মণ পূজারী পূজা করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীর দিন ইহার প্রধান উৎসব। হলদে সুতার সহিত বাঁশের পাতা বাঁধিয়া স্ত্রী-লোকেরা এই পূজায় উপস্থিত হয়। পরে এই সুতা সন্তানের কব্জিতে বাঁধা হয়। ষষ্ঠী সম্ভবতঃ পুরাতন বেদে প্রেত পূজার চিহ্ন। প্রবাদ অনুসারে ইনি ব্রহ্মার কন্যা ও দেবতাদের সেনাপতি স্কন্ধের স্ত্রী। রাজা প্রিয়বন্তের মৃতপুত্রের প্রাণ সঞ্চার করায় রাজা তাঁহার পূজা ভূলোকে প্রচার করিতে সম্মত হন।

ষষ্ঠী দেবীর অনেক রকম ব্রত হুগলী জেলায় প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে বৈশাখ মাসে দাই ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে চাওড়া ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে লুণ্ঠন ষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে অক্ষয়া ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে বোধন বা দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিক মাসে শ্মশান ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে মূল্যে ষষ্ঠী, পৌষ মাসে লোটন ষষ্ঠী,, মাঘ মাসে শীতল ষষ্ঠী, ফাল্গুন মাসে গুণো ষষ্ঠী এবং চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী নীল ষষ্ঠী ও দুর্বা ষষ্ঠী উল্লেখযোগ্য।

অরণ্য ষষ্ঠী ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর নাম অরণ্য ষষ্ঠী। এই দিন স্ত্রীলোকেরা একটি চামর হাতে লইয়া বনে যায় এবং তথায় বিন্ধাচলবাসিনী ষষ্ঠীর আরাধনা করে। এই ষষ্ঠীতে ওল, ফলমূল আহার করিয়া থাকিলে শুভসন্তান লাভ হয়।

"কন্দমূলফলাহার লভন্তে সন্ততীং শুভাম্।"

শুক্ল ষষ্ঠী ছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁটা ষষ্ঠী ও জামাই ষষ্ঠী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মহিষমর্দিনী পূজা ॥ অরণ্য ষষ্ঠীর দিন চুঁচুড়া ধরমপুরে প্রতি বৎসর মহিষমর্দিনী দুর্গা মাতার মৃন্ময়ী প্রতিমা স্থাপন করিয়া সপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত সমারোহের সহিত পূজা হয়। ধরমপুরে দেবীর একটি স্থায়ী মন্দির আছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণের সর্বাঙ্গীন আনুকূল্যে ১২২৭ সাল হইতে এই পূজা চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। হুগলী জেলায় আর কোথাও এই পূজা হয় না। পূজার কয়দিন হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি চুঁচুড়ায় আসিয়া থাকেন। বিচিত্র আলোকসজ্জায় সজ্জিত পূজামণ্ডপ পূজার কয়দিন দর্শনার্থীদের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠে।

অরন্ধন ॥ ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে হুগলী জেলার সর্বত্র অরন্ধনের ব্যবস্থা আছে; অরন্ধনের অর্থ রন্ধনের অভাব। চলিত কথায় ইহাকে 'আরন্দ' বলে। অরন্ধনের আগের দিন স্ত্রীলোকেরা অন্ন ব্যঞ্জন রান্না করিয়া রাখেন। অন্ন বাসী হইলে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহাতে জল দিয়া পান্তাভাত করিয়া রাখিতে হয়। ইলিশ মাছ ও ব্যঞ্জনের মধ্যে মুসুর ডাল এবং কচুশাকই প্রসিদ্ধ। পরদিন আরন্দ। সে দিন উনুন জ্বালিতে নাই। গৃহিণীরা উনুনের উপরে ও ভিতরে আলপনা দেন এবং ঘরে ঘরে মনসা পূজা করেন। লোকের সংস্কার এই যে আরন্দের দিন রান্না করিলে সর্পাঘাত হয়। আরন্দের দিন পল্লীর মধ্যে পরস্পর সকলেই সকলকে নিমন্ত্রণ করেন এবং বালক বালিকারা সকলের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়ায়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে যে আরন্দ হয়, তাহার নাম 'বুড়ি আরন্দ'। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতেও আরন্দের ব্যবস্থা আছে, তাহার নাম 'ইচ্ছেরান্না' বা ইচ্ছারন্ধন।

॥ নারায়ণ পূজা ॥

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের প্রায় প্রত্যেকের গৃহেই **নারায়ণ শিলা** আছেন। প্রত্যহ পুরোহিত আসিয়া গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য তুলসী দিয়া শ্রীশ্রীনারায়ণের পূজা করেন। বিষ্ণুপুরাণে নারায়ণ শিলার বহু নাম আছে দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডক পর্বতে বজ্র কীটের দ্বারা শিলার মধ্যে যে চিহ্ন প্রকাশ পায়, সেই চিহ্ন অনুযায়ী নারায়ণ শিলার নামকরণ হয়। যেমন গোস্পদ চিহ্ন যে শালগ্রাম শিলাতে থাকে তাহার নাম হয় **রঘুনাথ**। দুইটি চক্রচিহ্ন যে শালগ্রাম শিলাতে থাকে তাহার নাম হয় **শ্রীধর** ইত্যাদি। শালগ্রামচক্রের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন হিসাবে নারায়ণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে।

হুগলী জেলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলদেবতা হিসাবে শ্রীশ্রীশ্রীধরজীউ বিরাজিত আছেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (জনাই বাকসা), রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক (কাঠাগোড়), জয়মিত্র (জেজুর), মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ (হরিপাল) যজ্ঞেশ্বর সিংহ (ভাস্তাড়া) প্রভৃতির বংশের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে **শ্রীধরজীউর** যে মনোরম ধ্যান আছে তাহা এইরূপ ঃ

শ্রীধরজীউর ধ্যান

অতি ক্ষুদ্রং দ্বিচক্রন্তু বনমালাবিভূষিতম।
শ্রীধরং দেবি বিজ্ঞেয়ং শ্রীপদং গৃহিণাং সদা॥

অর্থাৎ শ্রীধর অতিক্ষুদ্র দ্বিচক্রবিশিষ্ট, বনমালাবিভূষিত এবং গৃহীদিগের সম্পদ্‌দাতা। শ্রীশ্রীনারায়ণের শিলা হওয়া সম্বধে যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, শঙ্খচূড় নামক অসুরের স্ত্রী তুলসী দেবীর শাপে বিষ্ণু শিলায় রূপান্তরিত হন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শঙ্খচূড় কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেন এবং মহা-পুণ্যফলে তুলসীদেবীকে পত্নীভাবে লাভ করেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর শঙ্খচূড়ের সহিত দেবতাদের বিবাদ উপস্থিত হইল। দেবতারা তাহার নিকট পরাজিত হইলেন। কোপনস্বভাব মহাসংহারক রুদ্রদেব স্বয়ং তখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তুলসী দেবী পতির মঙ্গল কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা ছিলেন বলিয়া শঙ্খচূড়কে বিনাশ করা স্বয়ং শিবের পক্ষেও অসাধ্য হইল। কারণ তুলসী দেবী দ্বিচারিণী না হইলে শঙ্খ-চূড়ের কখনও মৃত্যু হইবে না এইরূপ তাঁহার বর ছিল এবং অন্যদিকে তুলসীর পিতার আবার অভিশাপ ছিল যে তুলসীকে দ্বিচারিণী হইতে হইবে।

অসুর বিনাশ করা অসম্ভব দেখিয়া তখন দেবগণ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য শঙ্খচূড়ের রূপ ধরিয়া বিষ্ণুকে তুলসী দেবীর নিকট যাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ইন্দ্র যে ভাবে গৌতমের বেশ ধরিয়া অহল্যার নিকট গিয়া-ছিলেন, বিষ্ণু ঠিক সেই ভাবে তুলসী দেবীর স্বামী সাজিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তুলসী দেবী দ্বিচারিণী হইলেন এবং শঙ্খচূড় শিবের হাতে নিহত হইল।

তুলসী দেবীর তপোভঙ্গ হইলে তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দেন যে আপনি আমার সতীধর্ম নষ্ট করিয়া আমার স্বামীকে অন্যায়ভাবে নিহত করায় আপনি

চিরদিন শিলা হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তখন বলিলেন যে আমার কৃতকর্মের জন্য আমি শিলা হইয়া থাকিব, কিন্তু চিরদিন তুমিও বৃক্ষ হইয়া থাকিবে এবং তোমার পাতা আমার বক্ষে ধারণ ব্যতীত আমার পূজা হইবে না। সেই জন্য আজও তুলসীপাতা ভিন্ন নারায়ণের পূজা হয় না।

গ' ˉ পর্বত হইতেছে বিষ্ণুর শিলামূর্তি। ভগবান শনির দৃষ্টিতে বজ্রকিটের রূপ ধারণ করিয়া গণ্ডক পর্বত কাটিতে লাগিলেন এবং উহা শালগ্রাম শিলা হইয়া গণ্ডকী নদীতে পড়িতে লাগিল। চক্র হিসাবে শিলার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। শিলার চৌষট্টি রকমের নাম আছে। যথা বাসুদেব, গোপাল, শ্রীধর, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামচন্দ্র, রাধাবল্লভ, লক্ষ্মী-জনার্দন, শ্রীধর প্রভৃতি। [illegible] শিলা যে গৃহে থাকে সে গৃহে কখনও কোন কষ্ট হয় না। বর্ধমান মহারাজার গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ আছেন।

গণ্ডকী নদী নেপাল হইতে উৎপন্ন হইয়া গণ্ডক নদের পূর্বদিক্ দিয়া সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইয়া মুঙ্গেরের অপর পারে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। ইহারই একদেশে শালগ্রাম স্থল, তথাকার শিলাই শালগ্রাম শিলা বলিয়া কথিত। এইজন্য ইহার আর এক নাম 'শালগ্রামী' বা 'নারায়ণী'। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কানুর গ্রামে কণকশিব নামক পুস্করিণীর পাড়ে শ্রীদুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি অভগ্ন ও একটি ভগ্ন শ্রীধর-জীউর অনুরূপ বিষ্ণুমূর্তি আবিস্কার করিয়াছেন। মূর্তিগুলি ষোল ইঞ্চি লম্বা এবং সেন রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব শিলাকে 'কৃষ্ণকলেবর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ইহার সেবা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ

জল-তুলসী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥

শাস্ত্রে বিষ্ণুর যে স্তোত্র আছে, তাহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে পাঠ করিলে মানুষ সর্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায়। শ্রীবিষ্ণুর ষোড়শনাম স্তোত্র এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ঃ

শ্রীবিষ্ণোঃ স্তোত্রম্

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥ ১
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥ ২
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্॥ ৩
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্বকার্য্যেষু মাধবম্॥ ৪
ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৫

॥ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ॥

বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন সম্পর্কে দুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি গুরুর আজ্ঞায় বা স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সর্বপ্রথম মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করাইয়া শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা করেন। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্রের সময়ে চন্দননগরে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি নামক এক নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীমাতার মূর্তি পূজা প্রথম প্রচলিত ও পূজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশের চেষ্টায় ইহা ক্রমে বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হয়।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার আরম্ভকাল ও প্রতিষ্ঠার আদি কথা সম্বন্ধে কোন বিবরণ জানিতে পারা যায় না। তবে কথিত আছে যে. কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দননগরে তৎকালীন ফরাসী বণিকদের দেওয়ান শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট প্রায়ই চন্দননগরে আসিতেন। অনেকে মনে করেন যে. এই সংযোগসূত্র হইতে ক্রমে ক্রমে চন্দননগরে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয় এবং তথাকার লক্ষ্মীগঞ্জের চাউল ব্যবসায়ীরা কৃষ্ণনগরের অনুকরণে এই পূজা করিতে আরম্ভ করেন।

সর্বপ্রথম যে স্থানে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা আরম্ভ হয়, সেই স্থানটি 'চাউলপটি' বা 'নীচেপটি' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানের পূজাটি যে কত বৎসরের পুরাতন. সে সম্বন্ধে কেহ নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, লক্ষ্মীগঞ্জ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার অল্প পরে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই পূজা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে এবং পুরুষানুক্রমে নাকি দেওয়ান শ্রীযুত চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণের নামে এই পূজার সঙ্কল্পাদি হইয়া আসিতেছে। এই পূজার জন্য খরিদ্দারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বৃত্তির অর্থেই পূজার ব্যয়নির্বাহ হইয়া থাকে।

প্রাচীনত্বের দিক হইতে বিচার করিলে 'কাপড়েপটি' বা 'উপরপটির' শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শুনা যায়. 'কাপড়েপটি' ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া শতাধিক বর্ষ পূর্বে তিনিই প্রথম এই পূজাটি আরম্ভ করেন।

'উড়েপাড়া' বা বর্তমান বাগবাজারে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মাতার যে পূজা হয়, ১২৪২ বঙ্গাব্দে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় এবং লক্ষ্মীগঞ্জে যে পূজা চলিয়া আসিতেছে. বর্তমানে তাহা ৬৪ বৎসরে পদার্পণ করিল।

উপরিউক্ত স্থানের প্রতিমাগুলি ভিন্ন—লিচুতলা, পালপাড়া, খলিসানী. ফটকগোড়া, হালদারপাড়া. নাড়ুয়া. বোড়ো, মনসাতলা, চারমন্দিরতলা, কোলেপুকুর, বেশোহাটা, তেমাথা, বারাসাত, গোস্বামীঘাট, ভুবনেশ্বরীতলা প্রভৃতি স্থানেও জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে। কালের বিবর্তনে জগদ্ধাত্রী পূজার সংখ্যা ক্রমশঃই বর্ধিত হইতেছে এবং চন্দননগরের সীমানা ছাড়াইয়া তেলিনীপাড়া ও ভদ্রেশ্বর অঞ্চলেও বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে. বর্তমানে পূজা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া যে কৃত্রিমতা ও বাহ্যাড়ম্বর সৃষ্টি হইতেছে. তাহার প্রভাব আজও এই জগদ্ধাত্রী

প্রতিমার ক্ষেত্রে স্পর্শ করে নাই। চন্দননগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বসমেত প্রায় ২৬ খানি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা পূজা বর্তমানে অনুষ্ঠিত হয়।

চন্দননগরে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। প্রতিটি প্রতিমা উচ্চতায় প্রায় ১৪।১৫ ফুট, চালচিত্র সমেত উচ্চতায় প্রায় ২৬।২৭ ফুট পর্যন্ত এবং প্রস্থে প্রায় ১৩।১৪ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই পূজাগুলির বিশেষত্ব এই যে, গৃহস্থ সাধারণের পূজার ন্যায় এক দিনের পরিবর্তে দুর্গোৎসবের ন্যায় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই চারিদিন ধরিয়া পূজা হয়। এই চারিদিন বিভিন্ন পূজামণ্ডপে পূর্বে যাত্রা, পুতুল নাচ, সার্কাস, তরজা, খেমটা নাচ ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইত, রাস্তার উভয় পার্শ্বে মেলা বসিত এবং দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হইত।

দশমী পূজা সমাপনের পর প্রতিমা বিসর্জনের পর্বও বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে যখন লরী ছিল না, তখন এই প্রকাণ্ড প্রতিমাগুলিকে এই স্থানের অধুনালুপ্ত ইটের পাঁজার সাঁওতাল কর্মিগণ বহিয়া লইয়া যাইত। এক একটি প্রতিমা বহনার্থ ১০।১২ খানি বাঁশ ও প্রায় ৮০।৯০ জন বাহকের প্রয়োজন হইত। সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় সজ্জিত হইয়া প্রতিমাগুলি স্ট্রান্ড রোডের বারদোয়ারীতলায় সমবেত হইত এবং বাহকেরা নিজ নিজ প্রতিমাগুলি ঘুরাইত ও নাচাইত। বর্তমানে বাহক ও গ্যাসের আলোর পরিবর্তে লরীতে উঠাইয়া ও বৈদ্যুতিক আলোকে সুসজ্জিত করিয়া প্রতিমাগুলিকে ঘুরান হয় এবং ঐদিন রাস্তায় বিশেষতঃ গঙ্গার ধারে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। এতদুপলক্ষে বাজি পোড়ান এবং মেলা বসিয়া থাকে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার খ্যাতি দীর্ঘদিনের। এরূপ প্রকাণ্ড ও নানা মনোহর সাজে সজ্জিত প্রতিমা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। পূজার আনন্দ উপভোগের জন্য চারিদিন কলিকাতা ও বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্যক্তি চন্দননগরে আসিয়া থাকেন। ইহা শুধু হুগলী জেলার বা চন্দননগরের নয়, সমগ্র বাঙলা দেশের এক বিশেষ উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাই প্রতি বৎসর দূর ও নিকটের আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়া এই বিশেষ পূজা উৎসবের জন্য চন্দননগরবাসী আকুল প্রতীক্ষায় দিন গুণিতে থাকে এবং মাতা জগদ্ধাত্রীর নিকট ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই প্রার্থনা জানায়—"পুনরাগমনায় চ"।

কার্তিক ও রাজরাজেশ্বরী পূজা

জগদ্ধাত্রী পূজা ব্যতীত চন্দননগরে কার্তিক পূজা ও রাজরাজেশ্বরী পূজা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিকের প্রতিমা ২০।২৫ ফুট পর্যন্ত উচু হয়। চিরাচারিত সোলার সাজ প্রতিমার অঙ্গের শোভা বর্ধন করে।

সার্বজনীন ভিত্তিতে রাজরাজেশ্বরী মাতার পূজা হুগলী জেলার মধ্যে একমাত্র চন্দননগরে হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রচুর জনসমাবেশ হয়। দুর্গাপূজার ন্যায় সপ্তমী তিথিতে পূজা আরম্ভ হইয়া দশমী পর্যন্ত পূজা চলে। জগদ্ধাত্রী পূজা চন্দননগরের প্রধানতম পূজা হইলেও এই দুইটি পূজাতেও চন্দননগরের

বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিচিত্র আলোকমালায় ভূষিত পূজামণ্ডবগুলি আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দ উচ্ছ্বাসে ও কলরবে সেই সময় মুখরিত হইয়া উঠে।

পঞ্চাননের পূজা॥ ছোট ছেলেদের অসুখের জন্য পঞ্চাননের পূজা করা হয়। ইহা ভূতের উপর উপবিষ্ট পাথরের মূর্তিতে পূজা করা হয়। পঞ্চাননের সাধারণতঃ পুরোহিত নীচু শ্রেণীর লোক হয়। চাল, মিষ্টি ও ফুল এই পূজার উপকরণ। গ্রামবাসী যদি মনে করে যে দেবতা কুপিত হইয়াছেন তখন কখনও কখনও ছাগল বলি দেওয়া হয়। অনেকের পুত্র কন্যা মারা গেলে শেষ জন্মটির নাম পাঁচু বা পাঁচি রাখা হয়। বনপঞ্চাননের পাঁচ সংখ্যাটি সকলের নিকট পবিত্র। তাহার পূজা করিলে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুর শরীর ভাল থাকে ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি শিবের ঔরসে এক কোচ রমণীর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং আটটি কঠিন অসুখের দেবতা হইবার আগে কেহ তাঁহাকে সম্মান করিতে রাজী হয় নাই।

শীতলা পূজা॥ শীতলা দেবীর বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। এজন্য শীতলাদেবীকে বসন্তচণ্ডীও বলা হয়। উচ্চ শ্রেণীর জন্য ব্রাহ্মণই পূজা করে নিম্ন শ্রেণীতে উক্ত সম শ্রেণীর কেহ পূজা করে। জলঘট বা সিন্দুর চর্চিত পাথর বকুল অথবা বটগাছ তলে রাখিয়া ইহার পূজা করা হয়। একটি উলঙ্গ স্ত্রী মূর্তি মুখে অসংখ্য বসন্তের দাগ গাধার পৃষ্ঠে উপবিষ্টা মাথায় একটি ছাতা, এক হাতে একটি পাত্র ও অন্য হাতে ঝাঁটা এইরূপে মূর্তি লওয়া হয়। চাল, ফল, মিষ্টি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাগল ও ভেড়া ভোগ দেওয়া হয়। বাতাসা নাকি দেবীর খুব প্রিয়। মন্দিরে গিয়া যখন কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। মেয়েরা দেবীর বৃক্ষমূলে বা বারান্দায় জলদান করে শঙ্খ ধ্বনি করে। অনেক লোক তিন দিন ধরিয়া দেবীর বন্দনা করিয়া গান করে পরে পূজা দেওয়া হয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা একটি ছোট মাটির শীতলা মূর্তি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। ইনি ব্রহ্মা ও সাবিত্রীর কন্যা।

বাংলার শক্তিপীঠ॥ বাংলাদেশ শক্তি উপাসনার দেশ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গলা দেশে বৈষ্ণবের সংখ্যা ছিল অতি কম। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাংলায় বৈষ্ণব-ধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটিলেও এখনও বাংলায় শাক্তের সংখ্যা বৈষ্ণব অপেক্ষা অনেক বেশী।

ভারতের একান্ন শক্তি মহাপীঠের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সতেরটি বাংলায় অবস্থিত। পূর্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে নলহাটী (বীরভূম), উত্তরে জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণে সুন্দরবন, এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এই শক্তিপীঠগুলি বিরাজিত। ভারতের আর কোন প্রদেশে এতগুলি শক্তি পূজার কেন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের সতেরটি শক্তিপীঠের মধ্যে বীরভূম জেলায় পাঁচটি, বর্ধমানে চারটি এবং ২৪ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি, বগুড়া এবং মুর্শিদাবাদ এই আটটি জেলার প্রতি জেলায় একটি করিয়া পীঠস্থান আছে। হুগলী জেলায় কোন পীঠস্থান নাই।

বীরভূম জেলার পীঠস্থানগুলি কোপাই, নলহাটী, লাভপুর, সাঁইথিয়া ও বক্রেশর বা

বক্রনাথে অবস্থিত। তন্ত্র অনুসারে কোপাই-এর নাম কাঞ্চী দেশ। মাদ্রাজ প্রদেশের কাঞ্চীপুর বা কনজীভরম্ খুব প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানে কিন্তু কোন শক্তিপীঠ নাই, আছে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামে দুইটি বিভিন্ন নগর। বাংলার কাঞ্চীদেশ বা কোপাই-এর চলিত নাম কঙ্কালীতলা বোলপুরের নিকট অবস্থিত। এখানে কোপাই নামক একটি ছোট নদী আছে। নদীর নিকটবর্তী একটি কুণ্ড বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে দেবীর নাম বেদগর্ভা ভৈরবের নাম রুরু। নলহাটী বীরভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। শহর হইতে সামান্য কিছু দূরে একটি টিলার উপর ললাটেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। তন্ত্রমতে দেবীর নাম কিন্তু কালিকা। ভৈরব বা শিব এখানে যোগীশ নামে পরিচিত। এখানে দেবীর নলা পড়িয়াছিল। লাভপুরে অট্টহাস মহাপীঠ দৃষ্ট হয়। এখানে দেবীর অধঃ ওষ্ঠ পড়িয়াছিল। দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। দেবীর কোন মূর্তি নাই; একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দেবীর ওষ্ঠের প্রতীকরূপে পূজিত হয়। এখানকার নিকটবর্তী জঙ্গলে কতকগুলি শৃগাল বাস করে। পুরোহিতের আহ্বানে তাহারা গৃহপালিত পশুর ন্যায় নিকটে আসিয়া মন্দির হইতে প্রদত্ত শিবাভোগ ভক্ষণ করে। মতান্তরে অট্টহাস মহাপীঠ বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কেতুগ্রামের নিকটে অবস্থিত। বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ার নিকটে রেল লাইনের পাশে এক প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় একটি পীঠস্থান আছে। ইহা তন্ত্রোক্ত নন্দীপুরপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে দেবীর হার পড়িয়াছিল। দেবীর নাম নন্দিনী ও ভৈরব নন্দিকেশ্বর। হার অলঙ্কার মাত্র, উহা দেবীদেহের কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গ নহে। সুতরাং এই স্থানটি উপপীঠ না হইয়া মহাপীঠরূপে কেন গণ্য হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। বক্রনাথ বীরভূমের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। ইহা মহামুনি অষ্টাবক্রের সাধন স্থান বলিয়া সুপরিচিত। ইহা একটি পীঠস্থানও বটে। এখানে দেবীর ভ্রূমধ্য (মনঃ) পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম মহিষমর্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। মহাশ্মশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে সাতটি উষ্ণ কুণ্ড আছে। বক্রনাথ শিব একটি গহ্বরের মধ্যে স্থাপিত। কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া সিঁড়ি দিয়া শিবকে দর্শন করিতে হয়। মহিষমর্দিনীর মন্দিরের নিকটেও একটি উষ্ণ কুণ্ড আছে, উহার নাম শ্বেত সরোবর। বক্রেশ্বর তীর্থ দুবরাজপুর হইতে পাঁচ মাইল উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত।

বর্ধমান জেলার চারটি শক্তিপীঠ ক্ষীরগ্রাম, উজানি, কেতুগ্রাম ও জুড়নপুরে অবস্থিত। ক্ষীরগ্রাম মধ্যরাঢ়ের একটি অতি প্রাচীন পল্লী। এখানে দেবীর নাম যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। এইস্থানে দেবীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। যোগাদ্যা সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এই দেবী একবার নাকি বালিকার বেশ ধারণ করিয়া জনৈক শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা পরিয়াছিলেন এবং পরে পুষ্করিণীর মধ্য হইতে শাঁখাপরা হাত তুলিয়া তাহাকে ও সেবাইতকে দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। যোগাদ্যার প্রতিমূর্তি সারা বৎসর ধরিয়া পুকুরের জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়, কেবলমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তির দিনে উহা জল হইতে তুলিয়া পূজা করা হয়। প্রাচীনকালে যোগাদ্যার পূজায় নরবলি দেওয়া হইত এইপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায়। উজানি উত্তর-

হ্লাঢ়ের একটি প্রাচীন জনপদ। প্রবাদ, এইস্থান চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক শ্রীমন্ত সদাগরের জন্মস্থান। এখানকার শ্রীমন্তডাঙ্গা, ভ্রমরার দহ প্রভৃতি শ্রীমন্ত সদাগরের স্মৃতি বহন করিতেছে। উজানিতে দেবীর দক্ষিণ কনুই পড়িয়াছিল; দেবীর নাম সর্বমঙ্গলা, ভৈরব কপিলাম্বর। সর্বমঙ্গলার মূর্তি দশভূজা ও সিংহবাহিনী এবং পিত্তলের দ্বারা নির্মিত। ভৈরব কপিলাম্বরের লিঙ্গমূর্তি পলতোলা কষ্টিপাথর দিয়া নির্মিত। উজানির মহা-শ্মশানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্মৃতি-বিজড়িত খঙ্গ-মোক্ষণ নামে একটি তীর্থ আছে। কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম তন্ত্রোক্ত বহুলাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে দেবীর বাম বাহু পড়িয়াছিল, দেবীর নাম বহুলা, ভৈরব ভীরুক। কেতুগ্রামের নিকটবর্তী জুড়নপুরকেও যে অট্টহাস মহাপীঠ বলা হয়, সে কথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। জুড়নপুরের পীঠস্থানটি বনের মধ্যে অবস্থিত—ইহার নিকট দিয়া একটি নদী প্রবাহিতা। প্রাণ-তোষণী তন্ত্রের মতানুসারে জুড়নপুর তন্ত্রোক্ত কালীঘাট হইতে অভিন্ন: এখানে দেবীর মুণ্ড পড়িয়াছিল, দেবীর নাম জয়দুর্গা, ভৈরব ক্রোধীশ।

মুর্শিদাবাদ জেলার পীঠস্থানের নাম কিরীটকণা। এখানে দেবীর কিরীট পড়িয়াছিল, দেবীর নাম কিরীটেশ্বরী, ভৈরব সম্বর্ত। দেবীর কোন মূর্তি নাই; মন্দির মধ্যে একটি বড় বেদীর উপর আর একটি ছোট বেদী আছে, উহাই দেবীর কিরীট বলিয়া পূজিত হয়। মুর্শিদাবাদের উন্নতির দিনে কিরীটেশ্বরীর খুব জাঁকজমক ছিল। তৎকালিক বহু খ্যাতনামা রাজপুরুষ ও ধনীলোক এখানে মন্দির নির্মাণ, দীঘি খনন ও শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখানে বঙ্গাধিপতি দর্পনারায়ণ রায়, রাজা রাজবল্লভ ও রাণী ভবানীর কীর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরব সম্বর্ত লিঙ্গমূর্তি নহেন, পূর্ণাবয়ব মূর্তি। প্রকৃতপক্ষে উহা একটি বুদ্ধমূর্তি। বাংলার বহুস্থানে বুদ্ধমূর্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিরীটেশ্বরীর মন্দির কাল প্রভাবে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইলে লালগোলার বদান্য মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর উহা আমূল সংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

২৪ পরগণা জেলার পীঠস্থান কলিকাতার অন্তঃপাতী মহাতীর্থ কালীঘাট। এখানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল, দেবীর নাম কালিকা, ভৈরব নকুলেশ। আদি গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই মহাতীর্থ প্রায় সকলেরই সুপরিচিত, ইহার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক।

পুরাতন যশোর জেলার অন্তর্গত যশোরেশ্বরী মহাপীঠ আধুনিক খুলনা জেলার সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চল ঈশ্বরীপুর নামক গ্রামে অবস্থিত। এই শক্তিপীঠের সহিত বংলার শক্তিমান সন্তান কায়স্থ-কুলগৌরব মহারাজা প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বিজড়িত।

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দারস্থ॥

"দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে পুরাকালে অনরি নামক একজন

ভক্ত যশোরেশ্বরী দেবীর একশত দ্বারযুক্ত এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ধ্বংস হইয়া গেলে ধেনুকর্ণ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা আর একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন; কিন্তু কালপ্রভাবে সেই মন্দিরও ধ্বংস হইয়া যায় এবং যশোরেশ্বরী বিগ্রহ মৃত্তিকা ও জঙ্গলের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া পড়ে। প্রতাপাদিত্য যখন ধূমঘাটে নূতন রাজধানী নির্মাণ আরম্ভ করেন, তখন খোজা কামাল নামে তাঁহার একজন সেনাপতি রাত্রিকালে জঙ্গলের একস্থানে অগ্নিশিখা উঠিতে দেখেন। পর পর কয়দিন এই দৃশ্য দেখিবার পর তিনি প্রতাপকে উহা জানান। অতঃপর জঙ্গল ও মৃত্তিকা-স্তূপ অপসারিত করিয়া দেবীমূর্তির দর্শনলাভ ঘটে। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রদৃষ্টে নির্ণয় করেন যে ইহাই তন্ত্রোক্ত যশোরেশ্বরী পীঠ। "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবী চ যশোরেশ্বরী"। যশোরেশ্বরী ভৈরবের নাম চণ্ড। পূর্বে চণ্ড ভৈরবের একটি ত্রিকোণ মন্দির ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহার ভগ্নদশা বলিয়া ভৈরবকে এখন যশোরেশ্বরীর মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

তন্ত্রোক্ত সুগন্ধাপীঠ বাখরগঞ্জ জেলার শিকারপুর নামক গ্রামে অবস্থিত। এই স্থানটি বরিশাল সহর হইতে ১৩ মাইল উত্তরে। এখানে দেবীর নাসিকা পড়িয়াছিল, দেবীর নাম সুগন্ধা, ভৈরব ত্র্যম্বকেশ্বর। এই দেবী উগ্রতারা নামেও প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধতন্ত্রে উগ্রতারা নামে এক দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাকালে খুলনা, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি জেলার দক্ষিণ ভাগ সমতট নামে অভিহিত হইত। সমতটে যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষভাবেই ছিল বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক আলোচনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল পীঠ-স্থানের সহিত বৌদ্ধধর্মের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়। শিকারপুর পল্লীটি সুগন্ধা বা সুনন্দা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। ভৈরব ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির কিন্তু এই স্থান হইতে দূরে ঝালকাঠির নিকটবর্তী পোনাবালিয়া গ্রামে অবস্থিত।

তন্ত্রশাস্ত্রে চট্টগ্রামের নাম চট্টল বলিয়া উক্ত আছে। চট্টলে দেবীর বাহু পড়িয়াছিল। দেবীর নাম ভবানী, ভৈরব চন্দ্রশেখর। সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ তীর্থে এই মহাপীঠ অবস্থিত। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিছুদূরে উঠিবার পর ভবানী দেবীর মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরে একটি দশভুজা মূর্তিও আছে।

ত্রিপুরায় দেবীর দক্ষিণ পদ পড়িয়াছিল। এখানে দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরব ত্রিপুরেশ। ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর নামক গ্রামে একটি টিলার উপর পীঠস্থান অবস্থিত প্রবাদ অনুসারে ত্রিপুরাসুন্দরী পূর্বে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে ছিলেন এবং তখন তাঁহার নাম ছিল মহামায়া। ত্রিপুরা রাজ এই দেবীকে লইয়া রাত্রিকালে পার্বত্য পথে নিজের রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন এবং যেস্থানে রাত্রি প্রভাত হয় দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী সেই স্থানেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানটির নাম রাখেন উদয়পুর।

তন্ত্র অনুসারে ত্রিস্রোতা নদী তীরে দেবীর বামপদ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম ভ্রামরী,

ভৈরবের নাম ঈশ্বর। ত্রিস্রোতার বর্তমান নাম তিস্তা। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া এই নদী প্রবাহিত। এই জেলার শালবাড়ী নামক গ্রামে ভ্রামরী দেবীর পীঠ অবস্থিত।

বগুড়া জেলার পীঠস্থানটি ভবানীপুর নামক গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্ব নাম ছিল ভাবতা এবং ইহার পার্শ্ব দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত হইত। এখানে দেবীর তল্প পড়িয়াছিল। দেবীর নাম অপর্ণা, ভৈরব বামন। এখন করতোয়া নদী এই স্থান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। যশোরেশ্বরী পীঠের ন্যায় এই মহাপীঠও জঙ্গলের মধ্যে লুপ্ত অবস্থায় ছিল। মনোহর নামক একজন উদাসীন এই পীঠের আবিষ্কার করেন এবং জনৈক মোগল রাজপুরুষ এখানকার দেবী মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ ও নাটোরের রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির এখানে আছে। প্রত্যহ দেবীর ভোগে বোয়াল মাছ দেওয়া এই মহাপীঠের একটি বিশেষত্ব। এই পীঠস্থান সম্বন্ধেও কপিলা গাভীর দুগ্ধদান ও দেবীর শাঁখা পরার কাহিনী প্রচলিত আছে। তন্ত্রমতে দেবীর নাম অপর্ণা হইলেও সাধারণে এই দেবীকে ভবানী নামে অভিহিত করে।

তন্ত্রোক্ত এই সকল মহাপীঠ ছাড়া বাংলা দেশে আরও বহু প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ আছে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটি উপপীঠ আবার কোন কোনটি সিদ্ধপীঠ নামে পরিচিত। ইহাদের সকলগুলির বিশদ পরিচয় দেওয়া এই স্থানে সম্ভব নহে। ইহাদের কয়েকটির নাম মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। মেদিনীপুর জেলার তমলুকের বর্গভীমা, হাওয়া আমতার মেলাইচণ্ডী, হুগলী জেলার বলাগড়ের বলয়োপপীঠ ও ২৪ পরগণা ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরী উপপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। বীরভূম জেলার তারাপীঠ মহামুনি বশিষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ সাধক বামা-ক্ষেপার সাধন স্থান। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধপীঠ। ঢাকা রমণার কালীবাড়ী ব্রহ্মানন্দ গিরি নামক জনৈক সাধকের সিদ্ধ ক্ষেত্র।

বস্তুতঃ বাংলা দেশকে ভারতের শক্তি উপাসনার কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলার প্রায় প্রতি প্রাচীন পল্লীতে কালীবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহাদের মধ্যে অনেক—গুলির সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীও শোনা যায়। বাংলা নরম মাটির দেশ; দেশের মাটির ন্যায় এদেশের নরনারীর চিত্তও কোমল বলিয়া খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে। অথচ এই কোমল-মৃত্তিকার দেশে শক্তিপূজার এত প্রাধান্য কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

॥ বাংলা সন ও পঞ্জিকা ॥

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে এক একটি দিনে বর্ষ আরম্ভ হয়। সৌর পঞ্জিকা মতে কোন কোন প্রদেশে সৌর বৈশাখ বা আশ্বিনে বৎসর আরম্ভ হয়। আর চান্দ্রপঞ্জিকা মতে কোন কোন স্থানে চান্দ্রচৈত্রে, আষাঢ়ে বা কার্তিকে বৎসর সুরু হয়। বৎসর সুরু হবার দিনটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম উৎসব। সূর্য আজ আকাশের যেখান থেকে যাত্রা সুরু করিলেন, আবার সেই জায়গায় ফিরিয়া আসিতে তাহার ৩৬৫ দিনের দরকার হয়। এই ৩৬৫ দিন কি ভাবে যাইবে তাহা গননা করিয়া পণ্ডিতগণ প্রাচীন কালে লিখিয়া রাখিতেন—ইহার সংক্ষিপ্ত নাম পঞ্জিকা।

সমগ্র ভারতবর্ষে এখন প্রায় ত্রিশ রকমের বিভিন্ন পদ্ধতির গণনা প্রচলিত আছে। যাহার ফলে একটি পঞ্জিকার মতের সঙ্গে আর একটি পঞ্জিকার বড় একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্জিকার যে অংশ ধর্মকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়. তাহার প্রধান বিষয় হইল তিথি এবং নক্ষত্র। এই তিথি-নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে গননা করা হয়। সম্প্রতি ভারত সরকার সারা ভারতবর্ষে একটি পদ্ধতি অনুসারে গননা করিয়া পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকা বাহির করিয়াছেন। ভারত সরকারের নিযুক্ত পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি বর্তমান গণনায় ভুল থাকায় বৈদিক যুগের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনটিকে আবার তেইশ দিন পিছাইয়া লইয়াছেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—২৪১ শকে=৩১৯ খৃষ্টাব্দে মহাবিষুব-দিন হইয়াছিল। মনে করি সেই সময় গৌড় মাস-গণনা প্রচলিত ছিল। (অর্থাৎ চৈত্র দিয়া বৎসর আরম্ভ হইত) অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাবিষুর আষাঢ় সংক্রান্তিতে দক্ষিণায়নাদি, আশ্বিন সংক্রান্তিতে জলবিষুব এবং পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণাদি।...এবং এই সময়ের কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে, খৃষ্ট পূর্ব ১৮৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাবিষুব হইত।

খৃষ্টপূর্ব ৫৭ অব্দে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার রাজ্যের ঘটনাগুলি অক্ষয় করিবার জন্য বিক্রমাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিক্রম সংবৎ সমস্ত উত্তর ভারতে প্রচলিত হয়; কিন্তু বাংলা দেশে তখন ইহা প্রচলিত হয় নাই। সংবৎ প্রতিষ্ঠার ১৩৫ বৎসর পর শকাব্দ আরম্ভ হয়। ৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আধিপত্যের জন্য কিছুকাল গুপ্তাব্দ প্রচলিত ছিল। তাহার পর ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গলায় পাল রাজবংশের প্রভাব ছিল। ইহার পর ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন রাজবংশের আধিপত্যে বাঙ্গলা দেশে শকাব্দ প্রচলিত হয়।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট "তারিখ-ঈ-এলাহি" প্রবর্তন করেন। ঐ বৎসর সূর্য সিদ্ধান্ত মতে বাঙ্গলাদেশে মহাবিষুব সংক্রান্তির পর দিবসে সৌর বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে বাংলা সন গণনা আরম্ভ হয়। সৌর বৎসরের গণনা কিভাবে করা হয়, তাহা এই স্থানে লিখিত হইল। যথা ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ, হিজরী গণনায় ৯৬৩ সন এবং ইহার সঙ্গে ৩৬৫ দিনের হিসাব সৌরবৎসর ধরা হয়। যেমন ৯৬৩ সন (১৯৬১ খৃষ্টাব্দ —১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ) ১৩৬৮ বাংলা সন ১৩৬৭ সনের চৈত্র সংক্রান্তির শেষে প্রবেশ করিয়াছে।

হিজরী সন ৩৬৫ দিনের পরিবর্তে ৩৫৪ দিনে গণনা করা হইত। সরকারী কাজে হিজরী সন ব্যবহার করা হইলেও হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রতি বৎসর এগার দিন হিসাবে প্রতি তিন বৎসরে তেত্রিশ দিন এবং তেত্রিশ বৎসরে হিজরী এক বৎসরের প্রভেদে নক্ষত্র তিথি ইত্যাদি ভুল ভাবে গণনা হওয়ায় পূজাপার্বন ও বিবিধ ক্রিয়া কলাপাদি শাস্ত্রানুসারে হইবে না বলিয়া হিন্দুগণ উহা গ্রহণ করেন নাই।

ভারতবর্ষে যাবতীয় পঞ্জিকার গণনা ৪০০ খৃষ্টাব্দে রচিত সূর্য সিদ্ধান্ত অনুসারে হইতেছে। উক্ত গণনায় ভুল থাকায় বৈদিক যুগের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনটি তেইশ

দিন পিছাইয়া লইতে হইয়াছে। ভারতসরকার বর্তমানে বর্ষ গণনা করিয়াছেন ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২·৬ মিনিট। কিন্তু প্রকৃত ঋতুনিষ্ট বর্ষ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮·৮ মিনিটে পূর্ণ হয়। সুতরাং বর্তমান নির্ণয়ে ভুল সংশোধনের জন্য আমরা ২৩·৮ মিনিট বেশী গণনা করিয়াছি।

ভারত সরকার ১৩৬৪ সাল হইতে রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ নামে যে পাঁজিকা প্রকাশ করিতেছেন উহাতে বৈদিক মতে ১লা চৈত্র (২২ মার্চ) হইতে বর্ষ গণনা করা হইয়াছে। মহাবিষুব সংক্রান্তি ২১ মার্চ পড়িয়াছে বলিয়া ২২ মার্চ হইতে বর্ষগণনা সুরু করিয়াছেন। ইহাতে তেইশ দিনের যে গণনায় ভুল ছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে। সর্বভারতীয় হিন্দুগণের গ্রহণযোগ্য বৈদিক মতে নির্ভুল গণনা দ্বারা পাঁজিকা যাহা ভারতসরকার প্রকাশ করিতেছেন তাহা ডাঃ মেঘনাদ সাহার চেষ্টায় সম্ভব হয়।

প্রাচীনকালে যখন মুদ্রাযন্ত্র এদেশে আসে নাই, তখন পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া পাঁজিকা তৈয়ার করিতেন। কোন ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান যখন হইত তখন দৈবজ্ঞ পাঁজিকা দেখিয়া দিন ক্ষণ স্থির করিয়া দিতেন। এখনও শুভ কাজে ভট্টাচার্য মহাশয়কে ডাকিয়া শুভ দিন স্থির করা হয়।

যতদূর জানা যায় শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম মুদ্রিত পাঁজিকা শ্রীরামপুর হইতে বাহির হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ তারিখে প্রকাশিত সমাচার দর্পণের একটি সংবাদ হইতে জানা যায় যে, ১২২৭ সালে "নবদ্বীপ সম্মত পাঁজিকা" কলিকাতা শোভাবাজার হইতেও বাহির হইয়াছিল। সংবাদটি এইরূপঃ

নূতন পুস্তক ছাপা।—শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সন ১২২৭ সালের নবদ্বীপ সম্মত পাঁজিকা মোং সভাবাজারের শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানাতে ছাপা করিয়াছেন তাহাতে অন্য অন্য পাঁজিকার মত অঙ্কদ্বারা বার তিথি প্রভৃতি জানা যায় এবং বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গ বিশেষরূপে অক্ষরেতে পৃথক পৃথক লিখিত আছে যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় আছে সেও ঐ পাঁজিকাতে দিন ক্ষণ ভাল মন্দ অনায়াসে জানিতে পারে।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত প্রথম পাঁজিকাখানি দেখিবার আমার সৌভাগ্য হয় নাই। উহা এখন দুষ্প্রাপ্য। শ্রীরামপুর ব্যতীত খানাকুল ও বালির পাঁজিকাও সেই সময় খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত একখানি প্রাচীন পাঁজিকা আমি শ্রীরামপুরে শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে দেখিয়াছি। পাঁজিকাটি সন ১২৩৮ সালের অর্থাৎ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের। এইখানি শ্রীরামপুরে মুদ্রিত প্রথম পাঁজিকা না হইলেও ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য জিনিষ আছে। এই পাঁজিকাতে ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুখড়িয়া, সোমড়া পোঃ আঃ জেলা হুগলী এই কথাগুলি লেখা আছে। ইহা শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের নিকট হইতে ফণীবাবু সংগ্রহ করেন। এই পাঁজিকা সম্বন্ধে সমাচার দর্পণ পত্রে ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ (২১ ভাদ্র ১২৩৮) নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়ঃ

পুস্তক বিক্রয়—পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিকা কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে। ১২৩৮ সালের পঞ্জিকা......মূল্য ১, টাকা।

প্রাচীন পঞ্জিকায় অনেক রকমের জিনিষ থাকিত। যথা ছোট আদালতের নিয়ম ও খরচার নিরূপণ, বিবাহ প্রশ্নকালে অশুভ নিরূপণ, মলমাস কারণং ফলাফল বিবেচনা ইত্যাদি।

অথ মলমাস কারণং।

ফলাফল বিবেচনা।

—পয়ার—

প্রাতঃকালেতে আর সন্ধ্যার সময়।
সূর্যের অভুক্তকাল দুই দন্ড রয়॥
হিসাবেতে প্রতিমাসে এক দিন বাড়ে।
বৎসরের মধ্যে গণ বার দিন পড়ে॥
দ্বিবর্ষে চব্বিশ দিন হয় অবকাশ।
আড়াই বর্ষেতে তেঁঞে হয় মলমাস॥
অমাবস্যা দুই তিন প্রতিপদ জবে।
সেইমাসে সুনিশ্চয় মলমাস হবে॥
ব্রত যজ্ঞ বিবাহ বৈদিক কর্ম মানা।
সান দান তান্ত্রিকের বড় আরাধনা॥
হর হরি পূজনে অত্যন্ত ফল বিদ্ধি।
তপ জপ সাধনে সকল কর্ম সিদ্ধি॥
অনেক ক্লেশের ফল হয় অনায়াসে।
ষটকর্ম সাধন শীঘ্র হয় মলমাসে॥
আদ্যশ্রার্ধ গর্ভাধান অন্নপ্রাশন।
বৈদিকেতে তিন কর্ম হবে নিরূপন॥

১২০৮ সালের পঞ্জিকায় পৌষ মাসের প্রথম পৃষ্ঠায় এই কথাগুলি লিখিত আছে:

পৌষ প্রদং ৬।১॥ রবির্ধনুষি মূলা নক্ষত্রে
ষড়শীতি সংক্রান্তি॥ চন্দ্রো মীনে রেবতী নক্ষত্রে
দিনমান ২৬।৩২॥ মঙ্গলো বৃশ্চিকে বিশাখা নক্ষত্রে
কৃষ্ণং দিনং পুণ্যং॥ বুধো ধনুষি পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে
শকাব্দ ১৭৫৩॥ বৃহস্পতি র্মকরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে
সম্বৎ ১৮৮৮॥ শুক্র স্তুলায়াং স্বাতি নক্ষত্রে
সন ১২০৮॥ শনিঃ সিংহে পূর্ব ফলগুনী নক্ষত্রে
ইংরাজী সন ১৮৩১॥ রাহুঃ কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্রে
ডিসেম্বর মাস॥ কেওর্মকরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে

এই পৃষ্ঠায় রামধন সন্নকারের খদিত একখানি সুন্দর প্রাচীন চিত্র আছে।

অথ বিবাহ প্রশ্নকালে অশুভ নিরূপণ

প্রশ্নকালে শৃগাল কুক্কুর কাল পেচা।
অজা মেষ রব কভু নয় শুভ শুচা॥
সেই কালে মহিষ উষ্টর করে রব।
বিবাহ কর্তব্য নয় অমঙ্গল সব॥
ব্যাধিযুক্ত হয়ে পতি প্রবাসে থাকিবে।
বৈরী বৃদ্ধি মৃত্যুসম শোকান্তর হবে॥

ছোট আদালতের নিয়ম ও খরচার নিরূপণ

উক্ত আদালতের কমিশনার অর্থাৎ বিচারকর্তা চারিজন। এবং সিক্কা ৪০০৲ টাকা পর্যন্ত নালিসের মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয়।

আসামী জেলখানায় কয়েদ হইলে ফরিয়াদী তিন দিবস মধ্যে আসামীর এক মাহার আগামী খোরাকির টাকা ফি রোজ ⁄১০ যে জুমল টাকা হইবেক তাহা জেলখানার সারজন কিম্বা তাঁহার নায়েবের নিকট জমা করিয়া দিবেক। ঐ মত আসামী যে পর্যন্ত কএদ থাকিবেক এক মাহার আগামী খোরাকীর টাকা জমা করিতে হইবেক—তাহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ ফরিয়াদি খোরাকির টাকা উক্তমত জমা না করিলে আসামী জেল হইতে খালাস পাইবেক। ১০৲ টাকার দেনায় যে আসামী কএদ হইবেক, এক মাহা কএদ থাকিয়া খালাস পাইবেক।

১০৲ টাকার ৫০৲ টাকা পর্যন্ত মাহা কএদণ্ডে খালাস পাইবেক। ৫০৲ টাকার উপর ২০০৲ টাকা পর্যন্ত আট মাহা এবং ২০০৲ টাকার উপর ৪০০৲ টাকা পর্যন্ত এক বৎসর উক্ত আসামীদিগের সম্পত্তি ও বিষয় সকল দখল এবং ক্রোকের অধীন থাকিবেক, যে পর্যন্ত দেনা মায় খরচা ও খোরাকির টাকা সমুদায়িকের পরিতুষ্ট হয়।

আদালত সপ্তাহে তিনবার বৈসে। সোম, বুধ এবং শুক্রবার হইতে ইংরাজ, বাঙ্গালী উভয়দিগের মোকদ্দমা হয়।

চন্দননগরের ধর্মযাজক ফাদার গেরাঁ (Father J. F. M. Guerin) শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে"র পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত পুস্তকের পরিশিষ্টে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রহণ গণনার একটি তালিকা দিয়াছেন।

.১৮২৭ খৃষ্টাব্দের সমাচার দর্পণ পত্রে ১২৩৪ সালের নবপঞ্জিকা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও উদ্ধারযোগ্য ঃ

আগামি বৎসরের নবপঞ্জিকা—বিজ্ঞবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি বৎসরের অর্থাৎ ১৭৪৯ শক অথবা ১২৩৪ সালের নবপঞ্জিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুত চন্দ্রিকা যন্ত্রে নির্মিত পঞ্জিকা যে প্রকার হইয়া থাকে তাহা প্রায় অনেকে বিদিত আছেন তথাপি অজ্ঞাত ব্যক্তিদিগের বিজ্ঞাতকরণ কারণ

স্থূলবিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি শ্রীল শ্রীযুত নবদ্বীপাধিপতির অভিমতানুসারে পঞ্জিকা প্রতিদিনের বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণনান্তর যে দিন যে যে কর্ম শুভাশুভ ও বিধি-নিষেধ স্থির করা আছে বিশেষতঃ যে যে রাশির শুভ তাহা নির্ণয় করিয়া লিখিত হইয়াছে, অপর জ্যোতিষ গণনার বহুতর ব্যাপার গণনা আছে এ সকল এমত প্রাঞ্জল শব্দের দ্বারা রচনা হইয়াছে যাহা পাঠ করিবামাত্র অনায়াসে সকলেরি বোধগম্য হয়। ইহা ভিন্ন কলিকাতাস্থ অধ্যাপকের নাম ও ডাকের মাসুল ইত্যাদি নানা প্রকরণ আছে এই বাহুল্য পঞ্জিকার মূল্য একটাকা মাত্র। যাঁহার গ্রহণে বাঞ্ছা হয় তিনি ঐ যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ পাইবেন। (সমাচার-দর্পণ, ৭ই এপ্রিল ১৮২৭)

হাটবাজার ॥ হুগলী জেলায় কম ক'রে প্রায় তিনশ' হাট আছে। তাহার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হাট বসে—শেওড়াফুলি, সিঙ্গুর, চাঁপাডাঙ্গা, ধনিয়াখালি, দশঘরা, মগরা (মগরাগঞ্জ), চুঁচুড়া (মল্লিক কাসিম), মায়াপুর, খানাকুল, জিরাট, জাঙ্গীপাড়া, শিয়াখালা, চণ্ডীতলা, পাণ্ডুয়া, পোলবা, বেগমপুর, চণ্ডীতলা জেজুর, বন্দীপুর, ভাস্তাড়া, খানপুর প্রভৃতি স্থানে।

কেবল খণ্ডিত বা অখণ্ড বাঙলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে যে কয়টি হাট এখন বর্তমান, **শেওড়াফুলির হাট** নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, বিরাটত্বে ও বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে একটি প্রধান ও বৃহত্তম ঘাঁটি হিসাবে বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার শেওড়াফুলির হাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এই হাটে তরি তরকারী, কাঁচা আনাজ, পাট ও আলু বীজের প্রচুর সমাগমে স্থানটির রূপান্তর ঘটে। এই হাট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শেওড়াফুলির দশ-আনি জমিদার রাজা রাজচন্দ্র রায়ের পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায়। বর্তমানে শেওড়াফুলি রাজবংশের আর পূর্বাবস্থা নাই। এই হাটের অর্দ্ধেক অংশ এখন দিঘাপতিয়ার এবং চার আনা উত্তরপাড়ার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের এবং বাকী চার আনা মাত্র শেওড়াফুলির জমিদারগণের আছে। এই হাট সম্বন্ধে হান্টার সাহেব তাহার "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

A market said to be the largest in Bengal, is held here twice a week, at which large transactions take place in various kinds o produce, and specially in jute which is brought from all parts of the adjacent country.

॥ মেলা ॥

তারকেশ্বরে **শিবরাত্রি ও গাজন** উপলক্ষে যে মেলা হয় তাহাতে যেরূপ লোকসমাগম হয় এইরূপ লোকসমাগম পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও হয় না। শ্রীমদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রবর্তিত কৃষ্ণপুরের **উত্তরায়ণ মেলা** বঙ্গের প্রাচীনতম মেলা। মকর সংক্রান্তির পরদিন ১লা মাঘ উত্তরায়ণ। সেই দিন নূতন করিয়া পিঠা আর তৈয়ারী হইবে না। তাই আজও পল্লীর মেয়েরা পূর্বদিন রাত্রি হইতে অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির সন্ধ্যা হইতে উত্তরায়ণ সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত "এস পৌষ যেয়ো না", "সোনার পৌষ যেয়ো না", "সুখের পৌষ যেয়ো না"

প্রভৃতি পল্লী গাথা সুর করিয়া গাহিয়া রাত্রি যাপন করে। এই দিন সূর্যদেব উত্তর দিকে গমন করিবেন, দিন একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যাইবে, তাহারা কাজ করিবার অনেক সময় বেশী পাইবে, তাই এই আনন্দোৎসব। এই আনন্দোৎসবে হাজারে হাজারে লোক কৃষ্ণপুরে আজ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া যোগদান করে, কেবল ধর্মের নামে নয়, রঘুনাথের প্রাণের ডাকে।

১২ই এপ্রিল ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের স্টেটসম্যান পত্রে তারকেশ্বরের মেলায় জনসমাগম সম্বন্ধে ও মেলায় ভীড়ের চাপে পঞ্চাশ জন যাত্রীর আহত হইবার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

তারকেশ্বরে গাজন মেলা ॥ শিবের গাজন বা তারকেশ্বরের গাজন মেলা সুরু হইয়াছে; চৈত্র সংক্রান্তিতে ইহার পরিসমাপ্তি।

প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। রাজা ভারামল্ল তারকেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাই ইতিহাস। রাজা ভারামল্ল শিব-ভক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তারকেশ্বরের গাজনমেলা শিব সন্ন্যাসীর মেলা। সহস্র সহস্র গৈরিক বসন পরিহিত নরনারী উত্তরীয় ধারণ করে। 'আত্মগোত্রং পরিত্যজ্য শিবগোত্রং প্রবিশতু' বলিয়া শিবের সন্ন্যাসব্রত লয়।

২৭শে চৈত্র মেলার সুরু। ৩০শে চৈত্র শেষ। মহাহবিষ্য, ফল, নীল, ঝাঁপ এই চার-দিন তারকেশ্বরের গাজন উৎসব। সেই উৎসব সুরু হইয়াছে। পদব্রজে, ট্রেনে, বাসে, প্রতি-দিন সহস্র সহস্র সন্ন্যাসীর আগমনে, 'বাবা-তারকনাথের চরণে সেবা লাগে' ধ্বনিতে তার-কেশ্বর মুখরিত, মন্দিরে স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিস কর্তব্যরত, সার্কাস ম্যাজিকের ছাওনি, দোকান-পসারির সারি, সবে মিলিয়া তারকেশ্বরের গাজনমেলা এখন পরিপূর্ণ। সংবাদে জানা গিয়াছে প্রতিদিন প্রায় ২০।২৫ হাজার তীর্থযাত্রী আসিতেছে। যাত্রী নিবাসে স্থানাভাব।

তারকেশ্বরের গাজন উৎসবের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান নীল বা শিবের বিবাহ উৎসব। বাজি, বাজনা, শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা সবে মিলিয়া উৎসবের পরিপূর্ণ আয়োজন। মেলা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের মেদিনীপুর ২৪ পরগণা, হাওড়া জেলার তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটে। বর্তমান বৎসরে ২৪ পরগণার যাত্রীসংখ্যা বেশী বলিয়া জানা যায়।

চৈত্র সংক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে তারকেশ্বরের গাজনমেলাও সমাপ্ত হইবে। শিবের সন্ন্যাসী উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া 'শিবগোত্রং পরিত্যজ্য আত্মগোত্রং প্রবিশতু' বলিয়া পুনরায় নিজ-গোত্র গ্রহণ করিবে। তারকেশ্বরের গাজন মেলার এই ধারা বৎসরের পর বৎসর একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

50 INJURED AT FAIR IN TARAKESWAR—More than 100,000 people from different parts of West Bengal visited Tarakeswar, Hooghly in connexion with the three-day fair last night and about 50 were injured in the crowd. They were given first aid by different medical units. A large number of volunteers and policemen

kept control of the crowd. The Statesman 20th February 1958

কৃষ্ণপুরের ন্যায় জমকাল মেলা এখন আর পল্লী অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। এই মেলা উপলক্ষে কয়েক সহস্র ভক্ত নরনারী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাঠে সমবেত হইয়া হরিনাম সংকীর্তন ও বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের সমাবেশে এই সুপ্ত অবলুপ্ত ক্ষুদ্র গ্রাম একদিনের জন্য অতীতের ঐতিহ্য আবার ফিরিয়া পায়—কৃষ্ণপুর সেইদিন একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই মেলার বিবরণ ৫ই মাঘ ১৩৬৭ সালের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল :

উত্তরায়ণ মেলা ॥ কৃষ্ণপুর (হুগলী) ১৬ই জানুয়ারী—গত ১লা মাঘ রবিবার হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম কৃষ্ণপুরে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনের আকুতি ও সম্প্রাপ্তি স্মরণের নিমিত্ত তাঁহারই দেশ কৃষ্ণপুরে প্রবর্তিত বঙ্গের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী উত্তরায়ণ মেলা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মেলায় হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও ২৪ পরগণা হইতে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের সমাগমে গ্রামটি এক দিনের জন্য জনাকীর্ণ শহরে পরিণত হয়।

অপরাহ্নে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ, ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্মরণোৎসব প্রতিপালিত হয়। এই সভায় শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় "হুগলী জেলার ইতিহাস" লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র এই শ্রীপাটে শ্রীশ্রীরাধামোহন ও শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তগ্রামের রাজপুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলেন যে, ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনে তিনি দেহরক্ষা করেন; বৃন্দাবনে বসবাসকালে উক্ত স্থান যখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তখন তিনি বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড কিভাবে পুনরুদ্ধার করেন এবং রঘুনাথক্রীত বৃন্দাবনের জমিগুলির প্রাচীন দলিল যাহা "পার্থসারথি" পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সভাপতি শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত তাঁহার ভাষণে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট সংরক্ষণের আবেদন জানাইয়া বলেন যে, রঘুনাথের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, সপ্তগ্রামের ঐতিহাসিক মর্যাদার বিলুপ্তির পরও, এই মেলা প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া লোকশিক্ষার আকর ও পল্লীজীবনের সামগ্রীক উৎকর্ষ প্রদর্শনের ক্ষেত্ররূপে এক অমোঘ আকর্ষণের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ ও শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় দেবানন্দপুর হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত রঘুনাথ গোস্বামী রোড নামক দেড় মাইল কাঁচা রাস্তাটি পাকা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

পুলিশ স্থানীয় গ্রামরক্ষীদলের সাহায্যে সমস্ত দিন মেলাটি ঘিরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মেলায় সাঁওতাল রমণীগণের নৃত্যগীত ও শ্রীপাটে সারাদিন ধরিয়া সঙ্কীর্তন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

হুগলী জেলায় ছোট বড় বিভিন্ন মেলার মাধ্যমে জেলাবাসীর সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে

একটি মিলনের সুর প্রবাহিত হয়, সেই সময় দুঃখের মধ্যেও আনন্দের গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। মেলায় সাময়িকভাবে নানারকম জিনিষের দোকান বসে আর গাঁয়ের মেয়েরা হাতা, বেড়ি, খুন্তি, শাঁখ, কুলো, ধুচুনী, কড়া পাথরের বাসন কেনা কাটা করে।

হুগলী জেলায় মাহেশের রথ কেবল বাঙলা দেশে নয়, ভারতের মধ্যে পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পরেই ইহার স্থান। এই রথের মেলায় এক মাস যাবৎ যে মেলা হয় তাহাতে পাওয়া যায় না এ হেন জিনিষ নাই। সেই জন্য মাহেশের রথের কথা উঠিলেই রাধারাণীর কথা মনে পড়িয়া যায়। এই রথযাত্রার পটভূমিকায় কত বিচিত্র গল্প লেখা হইয়াছে, কত চরিত্র আঁকা হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত গল্পকে ম্লান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল" এই গল্পের কথাই সকলের সর্বাগে মনে পড়ে কারণ এত বড় মেলা বাঙলাদেশে আর একটিও হয় না। ইহা বাঙলাদেশের বৃহত্তম মেলা।

ধনিয়াখালি থানার শ্রীরামপুরের গাজন মেলা বা 'সালেভর' দুই সপ্তাহ যাবৎ ধর্মের গান, পুরাণ পাঠ প্রভৃতির মধ্যে সমাপ্ত হয়। ঝাপের দিন বাসলীর পুকুরে একজন ভক্ত সন্ন্যাসীকে স্নান করান হয় এবং পরে তাহাকে ছয়খানি ধারাল খড়্গের মাচানের উপর শয়ন করান হয়। খড়্গের উপর শায়িত থাকিলেও বুড়োশিবের মাহাত্ম্যে সন্ন্যাসী অক্ষত থাকে। শ্রীরামপুরে ক্ষেত্র সা'র শিবরাত্রি উপলক্ষে এক মাস যাবৎ যে মেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে পুতুলনাচ একটি দর্শনীয় বস্তু। ইহা ছাড়া শিল্প প্রদর্শনীও এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ।

আরামবাগ মহকুমায় খানাকুলে ঘন্টেশ্বর জীউর গাজন মেলা, কুমুরসা ইউনিয়নে সামবাটীর রামেশ্বর শিবঠাকুরের শিবচতুর্দশী মেলা, বদনগঞ্জ ইউনিয়নে বাতানল, কেষ্টগঞ্জ, কাটগড়িয়া, ভাদুর ইউনিয়নের চাতরায় গাজন মেলায় বহু লোকের সমাগম হয়। রথযাত্রায় বাতানল ইউনিয়নে ষষ্টীপুরে ঠাকুরকে মহাধুমধামের সহিত আনা হয়।

ধনিয়াখালিতে মদনমোহনের মেলায় বোসো হইতে মদনমোহন ধনিয়াখালিতে মাসির বাড়ি আসেন। সেই জন্য দশ দিন যাবৎ যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি নানাবিধ উৎসব এই অঞ্চলের একটি প্রধান আকর্ষণ। ধনিয়াখালি থানার সাহেববাজারে পীর সাহেবের মেলা উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। ইহা ছাড়া সিঙ্গুর থানায বাসুবাটির পীরের মেলা, আরামবাগের পুইন ও নকুন্ডা গ্রামের পীরের মেলা, প্রতাপনগরের বদর সাহেবের মেলা, কানপুরে কালুরায়ের ধর্মমেলা, সেলালপুরে বনবিবির মেলা, চকহাজী গ্রামের কোদালপীরের মেলাও উল্লেখযোগ্য। জঙ্গীপাড়া থানার ফুরফুরা সরীফে মুসলমানদের যে বিরাট ধর্মমেলা হয় তাহাতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান সমবেত হয়। কুমীরমোড়া ইউনিয়নে ভগবতীপুরে পেঁড়োর মেলা ও আরামবাগের লস্করপুকুরে শাহাদীন মিঞার মেলাও মুসলমান সমাজে প্রসিদ্ধ।

পান্ডুয়ার সাহাসুফির দরগায় বহু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু-মুসলমান পৌষ মাসের সংক্রান্তি হইতে সারা মাঘ মাস ধরিয়া সমবেত হয়। ইহা পেঁড়োর মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ সুবৃহৎ ও প্রাচীন মেলা পশ্চিমবঙ্গে খুব অল্পই আছে। খানাকুল থানায় কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামীর শ্রীপাঠে গোপীনাথ ও রাধাবল্লভ জীউর রাসের মেলা এবং বল্লভপুরে রাধাবল্লভের রাসযাত্রাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানে হুগলী জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রতি বছর ছোটবড় প্রায় ১৭৭টি মেলা বসে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মেলার নাম প্রদত্ত হইল :

মেলার নাম	স্থান	যে কয়দিন ধ'রে মেলা বসে
রথের মেলা	মাহেশ (শ্রীরামপুর)	১ মাস
	গুপ্তিপাড়া (বলাগড়)	২ দিন
	দশঘরা	১ দিন
	রাজবলহাট	১ দিন
	ভাস্তাড়া	১ দিন
মহরমের মেলা	হুগলী ইমামবাড়া	১ দিন
পীরের মেলা	পাণ্ডুয়া	১ মাস
	ফুরফুরা (জাঙ্গীপাড়া)	৪ দিন
প্রবর্ত্তক সংঘ (অক্ষয় তৃতীয়া)	চন্দননগর	৭ দিন
রাসের মেলা	মানকুণ্ড (ভদ্রেশ্বর)	৭ দিন
	কৃষ্ণনগর (খানাকুল)	৩ দিন
	ধনিয়াখালি	৭ দিন
গাজনের মেলা	তারকেশ্বর	১ মাস
	ঘন্টেশ্বরের মন্দির (খানাকুল)	৭ দিন
শিবপুজার মেলা	তারকেশ্বর	১ মাস
ষণ্ডেশ্বর মেলা (গঙ্গাস্নান)	চুঁচুড়া	১ মাস
দোলযাত্রার মেলা	দশঘরা (ধনেখালি)	২ দিন
	কানপাড়া (বলাগড়)	৭ দিন
জগদ্ধাত্রী মেলা	চন্দননগর	৪ দিন
উত্তরায়ণ মেলা (১লা মাঘ)	রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাঠ (কৃষ্ণপুর)	১ দিন
কুন্তীমেলা (সাংস্কৃতিক)	চন্দননগর	৪ দিন
পৌষ-সংক্রান্তির মেলা	ত্রিবেণী (মগরা)	১ দিন
দীঘির মেলা (বারুণীস্নান)	ডিহিবয়রা (আরামবাগ)	২ দিন
ভূতিরখাল মেলা (রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব)	কামারপুকুর (গোঘাট)	৩ দিন
স্নানযাত্রার মেলা	মাহেশ (শ্রীরামপুর)	১ দিন
ক্ষেত্রমোহন সাহা মেলা (শিবরাত্রি)	শ্রীরামপুর	২১ দিন
শিবরাত্রিতে জাতের মেলা	মহানাদ	১ মাস
বিষহরি মনসার ঝাপান মেলা	ইশ্বুড়া	১ দিন
শ্যাম মাঝির বারুণী মেলা	পানসিউলি (খানাকুল)	১ দিন

॥ দাস ব্যবসা ॥

মনুসংহিতায় দশরকম ক্রীতদাসের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মেগাস্থিনিস, যিনি চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারত পর্যটনে আসিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে "দাসপ্রথা ভারতে অজ্ঞাত" বলিয়া লিখিয়াছেন।

পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুরা বাংলার পল্লীগ্রামে হানা দিয়া স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ধরিয়া নিয়া যাইত এবং ভাল দামে তাহাদিগকে ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রয় করিত। সুন্দরবন ও বজবজ অঞ্চলে পর্তুগীজ ক্রীতদাসবাহী জাহাজগুলির সর্বপ্রধান আড্ডা ছিল। এই সব জলদস্যুদের জাহাজের দৌরাত্ম্য সেই সময় এত বৃদ্ধি পায় যে, কলিকাতা বন্দর রক্ষার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার এপার হইতে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত একটা খুব মোটা লোহার শিকল লাগাইয়া রাখিয়াছিল।

ভারত মহাসাগরের অন্যান্য ইংরাজ বসতিতে তখন ক্রীতদাসের ব্যাপক চাহিদা ছিল বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব কর্মচারীগণ ক্রীতদাসের ব্যবসা করিয়া খুব ভাল রোজকার করিত। মানুষ রপ্তানির সুবিধার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক নূতন আইন জারি করেন। এই আইনে ঘোষিত হয় যে ডাকাতির অভিযোগে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সমস্ত লোককে ক্রীতদাস পর্য্যায়ভুক্ত করা হইবে এবং সরকারের ইচ্ছামত তাহাদিগকে বাজারে বিক্রয় করা হইবে। হেস্টিংস আর একটি নিয়ম করেন যে, দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের কোম্পানীর পয়সায় না খাওয়াইয়া তাহাদিগকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বিক্রয় করা হইবে। ইহাতে কোম্পানীর অনেক খরচ বাঁচিয়া যায় এবং অর্থাগমের আর একটি নূতন পথ আবিস্কৃত হয়। চন্দননগর, হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলিকাতায় ক্রীতদাসদের বড় আড়ত ছিল এবং তাহাদের বিক্রয়ের জন্য হাট বসিত।

দাসপ্রথা ইংরাজ এদেশে সৃষ্টি না করিলেও ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহার প্রচলন অনেক বাড়িয়া যায়। কারণ তখন দেশী বিদেশী বহু ডাকাতের দল এই ছেলেধরার কার্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া বহু ইংরাজ স্বীকার করিয়াছেন। গরু বা ছাগলের হাট যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা এই 'ক্রীতদাসের বাজারের' ছবি খানিকটা কল্পনা করিতে পারিবেন। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে হাট সাধারণতঃ সুরু হইত। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব হইতেই ক্রেতার দল বালক বালিকা, যুবক যুবতী বাছিয়া রাখিবার জন্য হাটে উপস্থিত হইত। বেশী দাম পাইবার জন্য ক্রীতদাসদিগকে নানান রঙে সাজান হইত। তাহাদের পরিধানে থাকিত এক টুকরা রঙিন কাপড়ের কৌপীন। তরুণী স্ত্রীলোকের দাম ছিল সব চেয়ে বেশী প্রায় ষাট টাকা। প্রতি বৎসর কলিকাতায় তখন দশ হাজার ক্রীতদাস চালান আসিত এবং প্রায় বিশ হাজার কলিকাতা হইতে চালান যাইত।

দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় দালালরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া শিশু ও স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিত এবং পেটের জ্বালায় দেশের নরনারী তখন জিনিসপত্র বিক্রয়ের মত নিজের সন্তান বিক্রয় করিত। নৌকা বোঝাই শিশু ও যুবতীর দলকে কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করা

হইত কিম্বা তাহাদিগকে ভারত মহাসাগরের অন্যান্য ইংরাজ বসতিতে ব্যাপক চাহিদার জন্য পাঠান হইত। একবার দশ জন ভারতীয়কে কোম্পানী সেন্ট হেলেনা দ্বীপে চালান দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পাঁচজন যুবতী জাহাজ হইতে নামিয়া আত্মহত্যা করে। তাহাতে কোম্পানীর লোকসান হয়। ক্রীতদাসদের চিহ্নিত করিবার জন্য তাহাদের দুই পায়ে দুইটি লোহার বালা পরাইয়া দেওয়া হইত।

বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া কোম্পানী ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ ক্রীতদাস রপ্তানী ভারতবর্ষ হইতে নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করেন, কিন্তু উহা বলবৎ করিবার জন্য কোন চেষ্টা না করায় কলিকাতা বন্দর হইতে এই ব্যবসা যথারীতি চলে। এই প্রথা রহিত করিবার জন্য বহু সদাশয় ইংরাজ ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দাসপ্রথা নিবারণ বিল বিলাতের লর্ড সভায় গৃহীত হয়। কিন্তু ডিউক অফ ওয়েলিংটন উহার বিরোধিতা করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে এই আইনের কার্যক্রম আরম্ভ হয় এবং ভারতের সমস্ত ক্রীতদাস ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পায়। মুক্তিলাভ করিয়া ক্রীতদাসগণ তাহাদের প্রাক্তন প্রভুর পদবী গ্রহণ করে এবং আবিসিনিয়া জাঞ্জিবার মালয় প্রভৃতির ক্রীতদাসগণ তখন ভারতীয়গণের সহিত মিশিয়া যায়।

১৮১১ খৃটাব্দে বিদেশ হইতে এইদেশে ক্রীতদাস আনিয়া দাস ব্যবসা করা বেআইনী বলিয়া জানান হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় দাস ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া লইয়া যাইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী আদালতে দাস দাসীর উপর দাবী জানাইয়া নালিশ করা চলিবে না বলিয়া সরকার হইতে ঘোষণা করা হয় এবং পরিশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আইনদ্বারা এই প্রথা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা এইরূপঃ

The first anti-slavery measure was passed in 1811. When the importation of slaves from foreign countries was prohibited. In 1832 the purchase and sale of slaves brought from one district to another was made a penal offence ; and this was followed up in 1843 by removing claims to slaves from the jurisdiction of the civil courts. The slave trade was finally prohibited by the Indian Penal Code in 1860. (২০)

যাহারা দাস ব্যবসায় রত ছিল, তাহারা ভারতীয় ক্রীতদাস বিশেষ পছন্দ করিত। কারণ ভারতীয় ক্রীতদাস খুব বিশ্বস্ত হইত এবং তাহাদের ব্যবহারও খুব সৌজন্যসূচক ছিল। এইচ, এম, এস, হারউইচ (১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে) সাহেব যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি কেপটাউনে অবতরণ করেন। তথায় মালয় দ্বীপপুঞ্জের ক্রীতদাসগণকে তিনি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ক্রীতদাসগণের সহিত ভাল ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাহারা সময় সময় মনিবদের হত্যা করিত। কিন্তু ভারতীয় বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ক্রীতদাস ব্যবহারের জন্য সর্বত্র আদৃত হইত। এই সম্বন্ধে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে হারউইচ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপঃ

Indian slaves were preferred by slave dealers. The work afield and in the house is performed by Malay slaves brought from Batavia of a treacherous cruel disposition often (tho' well treated) murdering their masters, mistress etc. But slaves, if they must have, may be procured from the coast of Malabar, Coromandel, Bengal etc. of a mild and when well-used, a faithful disposition altho' not so capable of labour.

১২ই আগষ্ট ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এম, ডেসগ্রেণগেস্‌ নামক একজন ফরাসী উচ্চপদস্থ কর্মচারী হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার ক্রীতদাসীকে মিঃ ভোগেল লইয়া ছিলেন বলিয়া যে পত্র দেন তাহা উল্লেখ্য:

"Give me leave to address myself to you on the subject of a runaway slave girl, one of my waiting women, who left me some time ago and whom one Mr. Vogel has taken under his protection, although by no means authorized to it, but probably from such reason as is not decent to be mentioned, and which I cannot but be offended with. I wrote to him to return the creature! But he would not."

সেই সময় কলিকাতায় ক্রীতদাস বিক্রয় করিবারজন্য জাহাজে করিয়া তাহাদিগকে আনা হইত তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। এই বিষয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বলেন:

Hardly a man or woman exists in a corner of this populous town, who hath not at least one slave child either purchased at a trifling price or saved for a life that seldom fails to be miserable. Many of you I presume have seen large boats filled with such children coming down the river for open sale in Calcutta.

১৮ই জুন ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণ' ও ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের 'বেঙ্গল ক্রনিকেল' হইতে দুইটি সংবাদ এইস্থানে উদ্ধারযোগ্য:

কন্যা বিক্রয়।—কএক দিবস হইল মোং বর্ধমান হইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া অবগত হইল যে শ্রাদ্ধ হইয়া দান সকলকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন এজন্য ঐ বৈষ্ণবী ধন লোভে শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বাহাদুরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০্ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে।

Slaves of both sexes are generally purchased from the indigent Hindu or Hindustanee mothers, a young girl will bring according to her age and usefulness from Rs. 19 upto Rs. 100.

পর্তুগীজ বণিকগণ এই ব্যবসায়ে খুব পটু ছিল। তাহারা বাঙ্গলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে বলপূর্বক, নরনারী ও বালক বালিকাগণকে ধরিয়া লইয়া ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিত। দাস ব্যবসা ও জলে দস্যুবৃত্তি তাহাদের কলঙ্কস্বরূপ। রেনেলের মানচিত্রে সুন্দরবন depopulated by the Maghs বলিয়া দেখান আছে। পুত্র কন্যা ও ভার্যা বিক্রয় সেকালে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর 'সমাচার দর্পণ' পত্রে ভার্যা বিক্রয়ের একটি সংবাদ উদ্ধারযোগ্য :

ভার্যা বিক্রয়।—শ্রীআনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে জিলা বর্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনক দিবসাবধি বাস করিত সংপ্রতি বর্তমান বৎসরে তন্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে মন্ত্রনা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল ঐ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক যাহা হউক সেই কলুপ কএক টাকা পাইয়া ভার্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল এতাবন্মাত্র শুনা গেল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের চেতনা নিদ্রিত ছিল বলিয়া সমাজেরও তখন সমষ্টিগত চেতনা কিছুই ছিল না। সেই জন্য সামাজিক ও পারিবারিক দাসত্বপ্রথা বঙ্গসমাজে তখন পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। সামান্য ঋণের জন্য বা সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য মানুষ তখন **'আত্মবিক্রয় পত্র'** পর্যন্ত লিখিয়া দিতে পশ্চাদপদ হইত না। কলিকাতা মিউজিয়মে দুইটি এই রকমের দলিল সংরক্ষিত আছে। ২৯শে শ্রাবণ ১০৭৪ সালের (প্রায় তিনশো বছর আগে) একখানি প্রাচীন দলিলে দেখা যায় যে, কায়স্থপাড়া নিবাসী গোপীনাথ মজুমদার শ্রীযুক্ত ইসিন্দার খানের নিকট অভাবের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। আর একখানি ১২১০ সালের ১৪ই আশ্বিন, ইংরাজি ১৮০২ খৃষ্টাব্দের দলিলে দেখা যায় যে, গঙ্গারাম চন্দ্র তাহার স্ত্রী-পুত্র সহ সমগ্র পরিবার কৃষ্ণরাম মল্লিকের নিকট যাবজ্জীবনের জন্য ক্রীতদাস হইয়াছিল। ১৫৮ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে যে আত্ম-চেতনাবোধ সম্যকরূপে জাগ্রত হয় নাই এই সব দলিলগুলি তাহার জলন্ত নিদর্শন। সেই সময় বাঙ্গলার জমিদার-বংশে এইরূপ 'মনুষ্যক্রয়' প্রায়ই হইত। জমিদারবংশের প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক দলিল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১১০১ সালের ১১ কার্তিক তারিখের একখানি আত্মবিক্রয় পত্রের প্রতিলিপি এই স্থানে মুদ্রিত হইল। ইহা হইতে জানা যায় যে সনাতন দত্ত নামক জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতি বিবা দাসী 'অন্নোপহতী ও কর্জ্জোপহতি' ক্রমে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মিত্রের* নিকট হইতে "৯ নয় রুপেয়া পাইয়া" যাবজ্জীবনের জন্য 'আত্মবিক্রয়' করেন।

*রামেশ্বর মিত্র উলার 'মুস্তৌফী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের দুইটি শাখা হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর ও সুখড়িয়া গ্রামে এখনও আছে। আত্মবিক্রয় পত্রখানি শ্রীসুজননাথ মিত্র [illegible] সৌজন্যে প্রাপ্ত। এই বংশে প্রসিদ্ধ আইনগ্রন্থ প্রণেতা বিভূতিভূষণ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন।

(আত্মবিক্রয় পত্র।)

রূপৈয়া ওজন
দশ মাষ
নিশান সহী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মিত্র মহাশয় বরাবরেষু লিখিতং শ্রীসনাতন দত্ত ওলদ গোপীবল্লভ দত্ত সাকিন মৌজে বানিয়াজঙ্গ মামুলে পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায় কস্য আত্মবিক্রয় পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি আর আমার স্ত্রি শ্রীমতি বিবানাম্নি দাসী এই দুইজন কহত সালিতে অন্নোপহতী ও কর্জ্জোপহতি ক্রমে নগদ পন ৯ নয় রুপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিক্রয় হইলাম—ইতি তাং ১১ কার্ত্তিক সন ১১০১ বাঙ্গলা মোতাবেক ১৫ সহর রবিনৌয়ন সন ৩৯ জলুষ

শ্রীমতি বিবা	শ্রীসনাতন
নাম্নি দাসী	দত্ত কস্য
কস্যাঃ	নিসান সহী।
সম্মতিঃ।	

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দাস ব্যবসায় আইনের সাহায্যে রহিত করিবার চেষ্টা করিলেও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা অবাধে ভারতবর্ষে চলে! সেই সময় দারিদ্র্য বশতঃ পুত্র কন্যাগণকে হিন্দু মাতাগণ বিক্রয় করিত বলিয়া তৎকালীন সংবাদ পত্র হইতে জানা যায়।

দাস ব্যবসা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র রায় চন্দননগর ইতিহাসের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন দুইশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল বলিলে একটু আশ্চর্যান্বিত হইবার কথা; তৎকালের খৃষ্টিয়ান বণিকগণ এদেশে অতি বিস্তৃতরূপে দাসব্যবসায় চালাইতেন বলিলে আরও একটু বিস্মিত হইতে হয়; আমাদের দেশের গরিব হিন্দু পিতামাতা গরুবাছুর বেচার মত শিশু ও কিশোর বয়স্ক পুত্রকন্যা বিক্রয় করিত একথা বলিলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। এইস্থানে একখানি দাসখতের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল, তাহা পাঠ করিলে সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাস তিরোহিত হইবে।

/৭ শ্রীশ্রীরাম

সন ১৭৩৫

শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য

সাং বর্দ্ধমান

ইয়াদী কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গি শুচরিতেষু লিখীতং শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং কার্যঞ্চ্যাগ আগে আমার বেটা নাম শ্রীস্যামা বাগদী ছোকরা বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা ইহার কিম্মত মান্দরাজী ৭৲ সাততঙ্কা পাইয়া আমি সেৎছা পূর্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম তুমি ইহারে বাতিজর ক্রিস্তাঙ করিয়া খোরাক-পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ এই ছোকরার দানবিক্রয়ের সত্তাধিকার তোমার আমার সহিত এবং আমার ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম ইতি সন ১১৪২ এগার সত ব্যাল্লিষ শাল তারিখ ১৭ সতরঞী জ্যৈষ্ঠ মাহ ২৮ মাই

সন ১৭৩৫ সাল।

আজ হইতে ঠিক ২২৭ বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার এক বাগ্দীর ছেলে তাহার পিতা কর্তৃক ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইয়াছিল—এই পুরাতন পত্রখানি তাহারই দাসখৎ। দাস-খৎখানি বিবিধ কারণে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জিনিষ। পিতা আত্মারাম বাগ্দী ৭টী মান্দ্রাজী তঙ্কা লইয়া স্ব-ইচ্ছায় ছেলেটিকে "সকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের" নামক সাহেবকে নিঃস্বত্ব হইয়া বিক্রয় করিল; এবং দান বিক্রয়ের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে খৃষ্টিয়ান করিবার অধিকার পর্যন্ত ক্রেতাকে প্রদান করিল। সেই বৎসর অক্টোবর মাসে

শ্যামা প্রভু কর্তৃক ২৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া মসিয়ে থেরোসার নামক একজন ফরাসীর সম্পত্তি হইল। তারপর নভেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে শ্যামা হাতবদল হইয়া ৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া মসিয়ে থেরো নামক তৃতীয় প্রভুর অধীন হইল। তারপর শ্যামার কি হইল কাগজপত্রে আর পাওয়া যায় না। হয়ত শ্যামা পরে স্যামুয়েল নাম প্রাপ্ত হইয়া প্রভু কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বুরবঁ বা মরিশাস্ দ্বীপে চালান হইয়া আকের ক্ষেতে মজুরদারী করিতে করিতে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে—কে তার খবর রাখে? যাহা হউক শ্যামা বাগ্দীর জীবন চরিত লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে অতএব পরে বেচারীর কি হইল না জানিতে পারিলেও ক্ষতি নাই।

শ্যামা বাগ্দীর প্রথম মনিব "শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গী।" ফিরিঙ্গী শব্দটা আজকাল ইউরোপীয়গণের প্রতি প্রয়োগ করা শীলতা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সেকালে এরূপ ছিল না; দাসখতের মধ্যগত "ফিরিঙ্গী সুচরিতেষু" এই কথাই তাহার প্রমাণ। দাসখৎখানির নাম "ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং"। আজকাল ইংরাজ সাহেবেরা তাঁহাদের চাকরকে 'বয়' বলিয়া ডাকেন; ফরাসী সাহেবেরা 'গারকন' বলেন; বালক বৃদ্ধ যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে চাকর মাত্রেই বয় বা গারকন। এই বয় বা গারকন কথার অর্থ বালক নহে "ছোকরা"; ছোকরা শব্দ বান্দা বা ক্রীতদাসের প্রতিশব্দ মাত্র। অবস্থাগতিকে ছোট বড় হয়, আবার বড় ছোট হইয়া যায়; ভাষার মধ্যগত অনেক শব্দেরও এই অবস্থা বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে। "ফিরিঙ্গী" শব্দ সম্মানের আসন হইতে চ্যুত হইয়া এখন প্রায় একটা দুর্বাক্যে পরিণত হইয়াছে বলিলেই হয়; আর যে "ছোকরা" শব্দ দুইশত বর্ষ পূর্বে ক্রীতদাসের অভিধা ছিল—আজ তাহা বেতনভোগী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনবৃত্তি সম্পন্ন ভৃত্য মাত্রের জ্ঞাপক হইয়াছে।

পুত্রের পরিচয় প্রদান কালে আত্মারাম বলিয়াছে "আমার বেটা নাম শ্রীস্যামা বাগদী বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা"। বিশেষ করিয়া ছেলের বর্ণের পরিচয় দিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? আত্মারাম ত আর ছেলের বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল না! ইহার অর্থ—ফরাসী কায়দা অনুসারে শ্যামার জাতিত্বের প্রমাণ দিবার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ সে যে ভারতবাসী, ফিরিঙ্গী নহে, ইহাই "বর্ণ কালা" শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সেকালে দেশীয় ব্যবসাদারের নাম ছিল—ব্লাক মার্চেন্ট, কলিকাতার বাঙ্গালী পল্লীর নাম ছিল ব্লাক টাউন, এখনও মান্দ্রাজের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস তাহার নাম ব্লাক টাউন, পণ্ডিচারীতে ও চন্দননগরে ব্লাক টাউন আছে। দেশীয় লোক বুঝাইতে হইলে 'কালা' বলিতে হইত। কিন্তু কথা এই শ্যামা বাগ্দী বলিলে কি ভারতবাসী বুঝাইত না। খুলিয়া না বলিলে ফরাসী কায়দা মতে হয়ত যথেষ্ট হইত না? এখন পর্যন্ত ফরাসী দপ্তরে সরকারী বা বে-সরকারী কাগজ পত্রে, শ্রীযুক্ত রামধন চট্টোপাধ্যায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, চাকরী কলম পেশা ও তাহার বণিতা শ্রীমতী রামমণি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কোন কর্ম নাই একথা খুলিয়া না লিখিলে কায়দা খেলাফ হয়।

আত্মারাম যখন নিঃস্বত্ব হইয়া ছেলেকে বিক্রয় করিল—ছেলেকে "খোরাক পোষাক

দিয়া" তাহাকে "আপন খেদমতে" রাখিবার কথাটা বিক্রয় পত্রের মধ্যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু ছেলেটীকে "ক্রিস্তাঙ" করিবার কথাটা বিক্রয় সর্তের মধ্যে স্থান পাইল কেন? হিন্দুর ছেলে শ্যামা, বাগ্দী হইলেও, যখন "ফিরিঙ্গী" হওয়া ভিন্ন গতি ছিল না? 'বাতিজর" (baptise) করিবার ভার ও ব্যয়টা বোধ হয় ক্রেতার উপর অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেই এ কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা ৮ বৎসরের বালককে তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে "ক্রিস্তাঙ" করা বিধিসঙ্গত ছিল না তাই দাসত্ব গ্রহণ করিলেও পিতার অনুমতিটা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই দাসখতের তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১১৪২ সাল বা ২৮এ মে ১৭৩৫ সাল। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ২৮এ মের সহিত কেমন করিয়া মিলিল বলা যায় না। ইউরোপীয় পঞ্জিকা সংস্কারের সময় তারিখগুলো একটু সরিয়া গিয়াছে বোধ হয়, সেই জন্য বাংলা মাসের ১লা এখন প্রায় ইংরাজী মাসের মধ্যস্থলে পড়ে। সে যাহা হউক ১৪০৫ সালে চন্দননগরে ফরাসী কুলপ্রদীপ ডুপ্লেক্স ডিরেক্টার জেনারেল। চন্দননগরের তখন বড়ই বোলবোলা, তখন স্বনামখ্যাত শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে ফরাসী বাণিজ্যের প্রধান সহায়; তিনি ফরাসী কোম্পানীর একদিকে বড় দেওয়ান, অপর দিকে রাজস্বের ইজারাদার। আত্মারাম মান্দ্রাজী ৭ টাকায় তাহার ৮ বৎসরের ছেলেকে বেচিল, দরটা চড়া হইল কি নরম হইল এতদিন পরে বলা কঠিন। মান্দ্রাজী টাকার সহিত আজকালকার টাকার সম্বন্ধ কি তাহারও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে আহার্যের মূল্য বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় তখনকার ৭ টাকা এখনকার প্রায় ৩০ টাকার সমান হইতে পারে।

১১৪২ সালে লিখিত এই দলিলখানি গদ্য রচনা পদ্ধতির নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান। এই দলিলখানি অপেক্ষা প্রাচীনতর আর একখানি মাত্র লিখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১৭ই ফাল্গুন ১১২৫ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩০৬ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দাসখৎখানির ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বহুল ও উর্দু ও ফার্সী পারিভাষিক শব্দসংমিশ্রিত। এই ১১ ছত্র লেখার মধ্যে ইয়াদী, কির্দ, ফিরিঙ্গী, ছোকরা, বেটা, কিস্মত, খোরাক, পোষাক, ওয়ারীশ, এলাকা, করার, খেদমতে, তারিখ, সন এই ১৪টি কথা উর্দু বা ফার্সী আর সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বা সংস্কৃত। রচনা ভঙ্গী, প্রথম বাক্যটী ছাড়িয়া দিলে (ইয়াদী কির্দ-স্মরণ রাখিও) বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙ্গলা। একটু বিচিত্রতা এই, আত্মারাম সাহেবের প্রতি তুমি ও তোমার এই কথা ব্যবহার করিয়াছি। উহা লেখকের অনভিজ্ঞতা জনিত বা তাৎকালিক প্রথা অনুযায়ী বলা কঠিন। কতকগুলি শব্দের বর্ণ যোজনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে ভিন্ন; লিখন-পদ্ধতির বৈচিত্র্য এই যে বিরাম-চিহ্নের চিহ্ন মাত্র নাই; বর্ণ রচনা ভঙ্গী অতি পরিপাটি; তবে কএকটি অক্ষর অদ্ভুত ধরণে লিখিত। প্রায় দুই শত বর্ষ পরে আজ যে ভাষায়, যে ভাবে পাট্টা কবুলিয়ৎ লিখা হয় এ দাসখৎখানি তাহারই অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আত্মারাম নিরক্ষর ছিল একথা নিঃসংকোচে বলা যায়। পত্র খানি কোন মসীজীবীর পাকা হাতে লেখা; লেখক
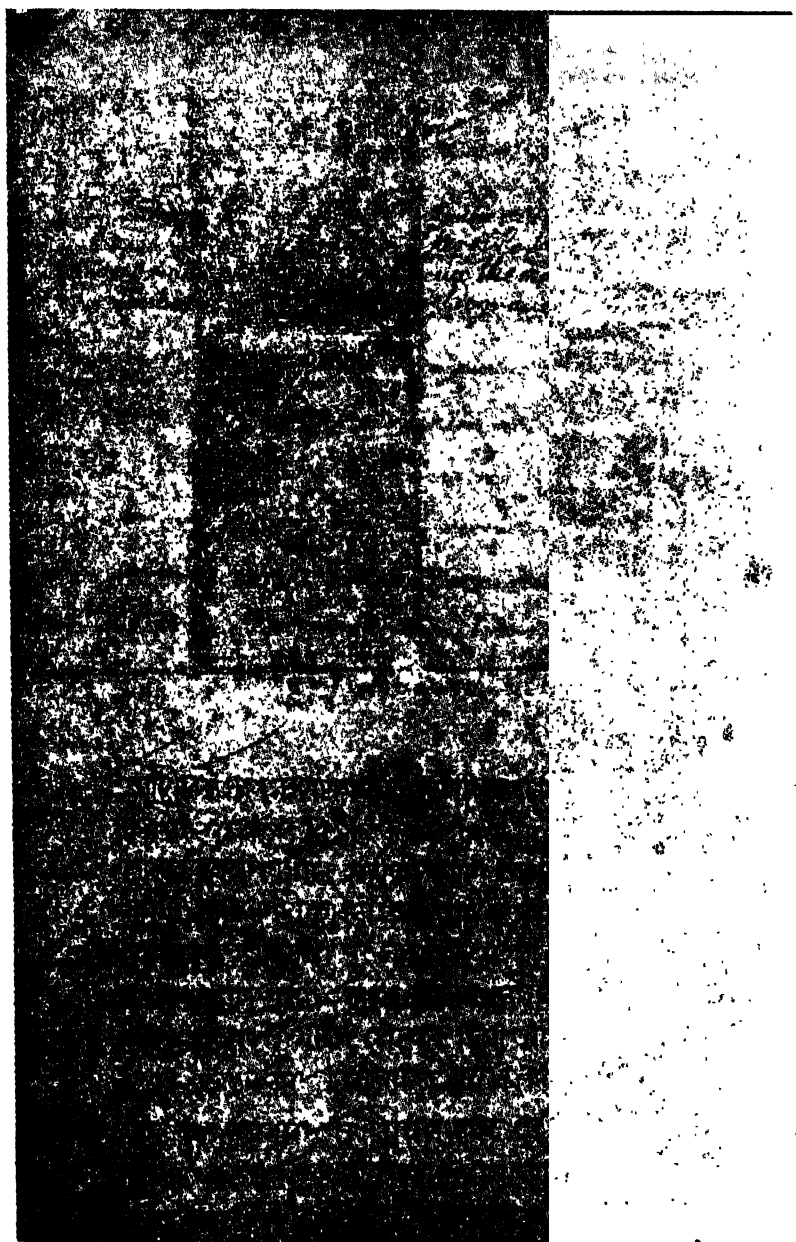
দাসখতের প্রতিলিপি

আত্মারামের হইয়া সহি করিয়াছে, আত্মারাম একটি কালির আঁখর মাত্র কাটিয়া সম্মতি জানাইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই—আত্মারাম তাহার ৮ বছরের ছেলেকে ৭টী টাকায় বিক্রয় করিল কেন? কেন তাহার আভাষ দাসখতেই পাওয়া যাইতেছে। খোরাক পোষাক দিয়া রাখিবার অনুরোধের মধ্যে এই পুত্রবিক্রয়ের নিগূঢ় অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জঠরজ্বালায় পীড়িত দরিদ্র আত্মারাম তাহার আত্মজকে "স্বেৎছাপূর্বক" ক্রীতদাস করিল; ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া, স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া যদি তাহার পুত্র দুটি খাইতে পায় আত্মারাম তাহারই ব্যবস্থা করিল এবং নিজেরও উদারন্নের কথঞ্চিৎ জোগাড় করিল।

তখন মুসলমান রাজ্যস্থিতি তিল তিল করিয়া ভাঙিগয়া পড়িতেছিল, ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় রাহুগ্রস্থ মুসলমান শক্তির জ্যোতি ও তেজ হরণ করিয়া তিল তিল করিয়া বর্ধিত হইতেছিল। এই নিদারুণ পরিবর্তনের যুগে—মারাঠার লুট ও ক্ষুদ্র জমিদারগণের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে পড়িয়া রাজা প্রজা উভয়েই ক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত পীড়িত হইয়া দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল: কিন্তু দুঃখের বোঝা সকল সময়েই দরিদ্রের ক্ষীণ স্কন্ধকে অধিকতর ভারাক্রান্ত করে। নিঃসম্বল নিম্নস্তরের লোকেই দুর্দিনের কশাঘাত উপলব্ধি করে। আত্মারাম বাগ্দীর মত শত শত নিরন্ন দুঃখী প্রজা অনন্যোপায় হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া সন্তান বিক্রয় করিয়া ও পরিশেষে আপনার শেষ সম্পত্তি আপনার দেহ বিক্রয় করিয়া জঠরানলের হব্য সংগ্রহ করিতেছিল

কেহ না মনে করেন যে এক আত্মারাম বাগ্দী ছেলে বেচিয়াছিল বলিয়া এ দেশের এতটা হীন অবস্থা পরিকল্পনা করা অন্যায়। কল্পনা নহে সত্য ঘটনা। শুধু এই একখানি দাসখৎ নহে, বহু বিপর্যয় অতিক্রম করিয়া যে কয়খানা পুরাতন কাগজ পত্র এখনও ফরাসীর দপ্তরখানায় বিদ্যমান আছে তাহার মধ্যে এখনও অন্ততঃ ১০০ খানা দাস বিক্রয়, দাস বিনিময় ও দাসত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য কাগজ পাওয়া যায়।(২১) আর শুধু চন্দননগরে নহে বাংলার সকল জেলায় পুরাতন কাগজ পত্রে ও তৎকালের সংবাদ পত্র সমূহে দাসব্যবসায়ের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।(২২) তখনকার জীবনে দাসব্যবসায় দাসদাসী ক্রয় একটা অতি সাধারণ ঘটনা ছিল প্রত্যেক সমৃদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের সংসারে পাল পাল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল। একপাল ক্রীত দাসদাসী রাখা বড়মানুষীর অঙ্গ ছিল। এমন একটা খৃষ্টান পরিবার ছিল না যাহাতে একটিও ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী না থাকিত।

কেন না কোন সময়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে দাসীকরণ প্রথার প্রবর্তন ছিল; প্রাচীন হিন্দু সমাজে ছিল, প্রাচীন গ্রীসে ছিল, রোমে মিশরে ছিল। মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত দাসপ্রথার উদ্ভব ও বিলোপ। মনুষ্য সমাজের বিকাশের সঙ্গে যে দাসত্ব প্রথার উদ্ভব ও পরিপুষ্টি, সে দাসত্ব প্রথা বস্তুতঃ কদর্য প্রথা নহে; ব্যক্তি বিশেষ তাহার প্রবর্তক নহে তাহা স্বাভাবিক, আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী; সে প্রথা যে কারণ পরম্পরা অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল সে কারণ পরম্পরার বিলোপ হইলে, উহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—কোন

ব্যক্তি বিশেষের হুকুমে সে প্রথা জন্মায় নাই, কাহারও হুকুমে মরে নাই। কিন্তু আমরা খৃষ্টিয়ান জগতে যে দাসত্ব প্রথার কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকি, তাহা মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষ দায়ী এবং সে-প্রথা প্রকৃতই অতি নৃশংস ও ক্রূর; রাজার হুকুমে তাহার উদ্ভব ও রাজার হুকুমে তাহার বিলোপ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষুক্ষেত্রে যে স্থানীয় বর্বর জাতিকে নিয়োগ করা হইত তাহারা অলস ও দুর্বল। আফ্রিকার কাফ্রি আদিম নিবাসীরা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। তখন Bishop Las Casas নামক জনৈক পাদ্রীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল এই বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল নম্রপ্রকৃতি কাফ্রিগণকে ইক্ষুর চাষে লাগাইলে সুবিধা হইতে পারে। পাদ্রীর বুদ্ধিতে পরিচালিত ইউরোপীয় রাজগণ পাদ্রীর সংকল্পের সমর্থন করিয়া হুকুম প্রচার করিলেন; নৃশংসভাবে সহস্র সহস্র কাফ্রি নরনারীকে বলপূর্বক বা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া দেশচ্যুত করিয়া, বন্য পশুর মত জাহাজ বোঝাই দিয়া আমেরিকায় ও তন্নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জে আকের চাষ করিতে চালান করা হইল—এ দাস-ব্যবসায় রাজার হুকুমে আরম্ভ হইয়াছিল এবং উইলবারফোর্স ফাদার গ্রেগোরির চেষ্টায় খৃষ্টিয়ান জগতের করুণা ও কর্তব্যবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইলে, রাজার হুকুমে সে ব্যবসায় রহিত হইল। (২৩)

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে আফ্রিকা হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় কাফ্রিদাসের পণ্যস্রোত, পূর্ণ মাত্রায় বহিয়া চলিয়াছে। খৃষ্টিয়ান ব্যবসায়ীবর্গ যখন প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করিতে আসিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষে দাস প্রথার প্রচলন দেখিলেন। ভারতবর্ষেও তাঁহারা কাফ্রি দাসের আমদানি করিলেন। তখন দেশের রাজা মুসলমান—মুসলমানগণ দাসত্ব প্রথাকে চিরদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আগন্তুক খৃষ্টিয়ান বণিকসকলকে দাস-ব্যবসায় চালাইবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে হইল না। তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে রাজানুসৃত পথ বহিয়া চলিতে লাগিলেন। কাফ্রি খোজা মুসলমান অন্তঃপুরের পরিরক্ষক ছিল। কাফ্রি দাসদাসী খৃষ্টিয়ান আগন্তুকগণের গৃহে, পাচকের কাজ করিত, নাপিতের কাজ করিত, খানসামার কাজ করিত, মেম সাহেবদের নেপথ্যের সহায়তা করিত, সঙ্গীত আলাপ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন করিত। আফ্রিকাবাসী দরিদ্র, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের লোকও দরিদ্র, সেই দরিদ্র ভারতবাসীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দাসীকরণপটু অভ্যাগতগণের বিলম্ব হয় নাই। তাহারা আফ্রিকার ন্যায় চট্টগ্রাম হইতে মান্দ্রাজ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি হইতে প্রভূত ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। আফ্রিকার ন্যায় ভারতবর্ষেও দস্তুর মত দাসব্যবসায় চালাইয়া ছিলেন। তাহার গোটাকতক নিদর্শন যাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি নিম্নে দিলাম।

মরিশাস্ ও বুরবঁর এই দুইটি দ্বীপ মনুষ্য বাসোপযোগী করিয়া কৃষিকার্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার মানসে ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চেষ্টিত হন। অনাদিকাল হইতে বর্দ্ধিত বনানি ধ্বংস করিয়া কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের জন্য এবং বন কাটিয়া নগর নির্মাণ করিবার জন্য প্রথমে ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয়; এবং সে ক্রীতদাসের পাল ভারতবর্ষ হইতে

সংগ্রহ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর উক্ত দ্বীপদ্বয়ে প্রেরণ করেন। প্রথমে চন্দননগরের উপর ক্রীতদাস সংগ্রহের ভার পড়ে; কত যে বাঙ্গালী ও বিহারী দরিদ্র ব্যক্তি জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্র পারে বুরবঁর বনে ও মরিশাসের উৎকট উত্তাপে ইহলীলা সাঙ্গ করে তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

১৭২৯ সালের মধ্যভাগে পণ্ডিচেরী হইতে হুকুম আসে যে চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস কিনিয়া আর পাঠাইতে হইবে না, মান্দ্রাজ উপকূলবর্তী প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে বাংলা অপেক্ষা সস্তা দরে ক্রীতদাস পাওয়া যাইতেছে; দুই বৎসর পরে সে প্রদেশে সুজন্মা হয় তখন হুকুম আসে সেখানে দর চড়া অতএব আবার চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস পাঠান হউক। ১৭৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারীতে সংবাদ যায় যে পাটনার নবাব (আলিবর্দী খাঁ) কোন এক হিন্দু রাজাকে (সম্ভবতঃ বিহারের কোন জমিদার বা বঞ্জারা নামক দস্যুগণকে) (২৪) যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ১২ হইতে ১৫ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। চন্দননগর হইতে ডুপ্লেক্স এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটনার ফরাসী কুঠিয়াল Groiselle কে হুকুম দিলেন ৩০০ ক্রীতদাস ক্রয় কর। পণ্ডিচারী হইতে সংবাদ আসিল—"যদিও বুরবঁ দ্বীপে প্রতি বৎসর ২০ জন মাত্র পাঠাইবার হুকুম আছে—মরিশাস দ্বীপে ৩০০ ক্রীতদাস পাঠাইলে কাজে আসিবে, এবং যেহেতু মনে হয় মাল সস্তায় পাওয়া যাইবে, প্রত্যেক জাহাজে কিছু কিছু করিয়া ৩০০ শতই পাঠাইয়া দেওয়া হউক।"

La Bourdonnais তখন মরিশাস দ্বীপের শাসনকর্তা তাঁহার উপর কোম্পানীর হুকুম ছিল তিনি আবশ্যক মত ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস আমদানি করিতে পারিবেন। ১৭৫১ সালে বুরবঁর শাসন সঙ্ঘ হইতে আবেদন আসে ৬০ জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী, বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ৩০, পাঠান হউক পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরের উপর সে আবেদন রক্ষা করিবার ভার পড়ে। দাসীকরণের প্রক্রিয়া পুরাতন কাগজ পত্র হইতে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে প্রদান করিলাম।

কোন এক ধনী দাসব্যবসায় করিবেন তিনি সংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিলেন। কুলির আড়কাঠির ন্যায় তাহারা ছলে বলে কৌশলে অথবা অতি সহজে দীন-হীনগণের সন্তান সকল ক্রয় করিয়া দাসদাসীর আড়তে হাজির করিল। ঋণদানে আশক্ত হইলে উত্তমর্ণকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, আদিমকালের ন্যায় এ নিয়ম মুসলমান যুগেও বর্তমান ছিল। সুতরাং দরিদ্রকে ঋণজালে জড়িত করিয়া পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য করা, দাসীকরণের অতি সহজ উপায় ছিল। আমরা শিশুগণকে যে ছেলেধরার ভয় দেখাই, সাদসংগ্রাহকগণ সেই ছেলেধরা, (২৫) ইয়োরোপীয় বণিকগণের প্রত্যেক আড্ডায় চন্দননগরে, হুগলিতে, চুঁচুড়ায়, শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় দাসের আড়ত ছিল, দাসের হাট বসিত। গহনার নৌকায় বোঝাই দিয়া যেমন আজকাল ব্যবসায়ী হাটে বেসাত লইয়া আসে, তৎকালে দাসব্যবসায়ী দাসদাসী বোঝাই দিয়া ভাগীরথী বক্ষ বহিয়া দাসের হাটে জীবন্ত বেসাত লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য একেবারেই অভিনব ছিল না। মনুষ্যসমাজে প্রথম কৃতদাস রমণী,

দাসের হাটে রমণীর আদরই অধিক ছিল। যে সংসারে দশটা গোলাম, তাহার মধ্যে নয়জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ। যে কারণ মেষপালক মেষ অপেক্ষা মেষীর অধিক আদর করে দাস অপেক্ষা দাসীর আদর সেই কারণেই অধিক ছিল। মেষী মেষ শাবক প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করে, দাসীও দাসশিশু প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করিত। অনেকে দাসীর পাল পুষিত, দাসব্যবসায়ের সুবিধার Cattle breedingএর ন্যায় Slave breeding একটা লাভের ব্যবসায় ছিল। দাসদাসীর মূল্য স্ত্রীপুরুষ অনুসারে, বয়ঃক্রম অনুসারে ও অন্যান্য গুণাগুণ অনুসারে অল্প বা অধিক হইত। সামান্য নামমাত্র মূল্য হইতে তখনকার শত মুদ্রা পর্যন্ত মূল্যের পরিচয় পাইয়াছি। ইংরাজ কোম্পানীর হুকুমে ডাকাতি অপরাধে অপরাধী হতভাগ্যের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যা দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া সরকারী নিলামে বিক্রীত হইত। জেলের খরচ বাঁচাইবার জন্য আবশ্যক হইলে কয়েদীগণকে সুমাত্রা-দ্বীপে নির্বাসিত করা হইত অথবা দাসরূপে বাজারে বেচিয়া ফেলা হইত। (২৬) ফরাসী বা অন্যান্য কোম্পানীর আদেশ যে অন্যবিধ ছিল তাহা মনে হয় না। কারণ রোমান ক্যাথলিক পাদরী এই জঘন্য আধুনিক দাসব্যবসায়ের প্রবর্তক। ফরাসী কোম্পানী রোমান ক্যাথলিক কোম্পানী এবং এদেশে রোমান ক্যাথলিক পরিবার মধ্যেই অধিক সংখ্যক দাসদাসী পোষিত হইত। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ক্রীত দাসদাসীর নিদর্শন কোথাও পাই নাই। কৃষাণ বা মজুর হিসাবে হিন্দুর ঘরেও হয়ত ক্রীতদাস ছিল কিন্তু গৃহসংসারের পরিচারিকা বা পরিচারক হিসাবে থাকা সম্ভব নহে। হিন্দুগণ অর্থের লোভে আগন্তুক খৃষ্টিয়ানগণের ও মুসলমানগণের দাসব্যবসায়ে সহায়তা করিতেন সন্দেহ নাই; স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়ের শুল্ক আদায় করিতেন কিন্তু তাঁহারা নিজে যে দাসদাসী পুষিতেন তাহার পরিচয় পাই নাই। মুসলমানগণ ক্রীত দাসদাসীর প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। দাসবংশ রাজতক্তে বসিয়াছিল, দাসী পাটরাণী হইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দাসদাসীগণের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলে পুণ্য আছে, ইহাই কোরাণের আদেশ। দাসী দাসশিশু প্রসব করিলে প্রভুর মৃত্যুর পর সে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই মুসলমান-গণের মধ্যে প্রচলিত বিধি। স্বধর্মাবলম্বীকে মুসলমান ক্রীতদাস করিতে পারিতেন না। ক্রীতদাস মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলে সে সামান্য ভৃত্য মধ্যে পরিগণিত হইত; এইজন্য মুসলমান সমাজে নিগ্রো, খৃষ্টিয়ান বা হিন্দু ভিন্ন দাস থাকিতে পারিত না। দাস দাসীকে স্বাধীনতা দান করা মুসলমানের পক্ষে পুণ্য কর্ম। মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক মুসলমান দাসদাসীকে মুক্তি প্রদান করিতেন।

মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত নীতির প্রভাব খৃষ্টিয়ানগণের উপর কিয়ৎ পরিমাণে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমি অনেকগুলি খৃষ্টানের পুরাতন উইল দেখিয়াছি, প্রত্যেকখানিতেই অন্ততঃ একজন দাস বা দাসীকে মুক্তি প্রদানের কথা আছে। দুই এক স্থলে প্রভু আপনার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া মুক্ত দাসদাসীগণকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান যেমন মুসলমানকে ক্রীত দাস করিতে পারিত না, খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে সে স্বধর্মানুরাগ ছিল না। তাহারা দাসগণকে খৃষ্টান করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইত বটে কিন্তু

দাসত্বের কোন ব্যত্যয় হইত না। খৃষ্টিয়ান সংসারে দাসগণ অনেক সময়ে অতি নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হইত, অতি সামান্য অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত অতি সাধারণ শাস্তি ছিল, মাঘের শীতে উলঙ্গ করিয়া দাস বা দাসীর মস্তকে উপর্যুপরি বহু কলসী ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া একটা আমোদজনক প্রক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত ছিল।

দাস ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইলে সরকারকে একটা মাশুল দিতে হইত। ইংরাজ সরকার দাসপ্রতি চারি টাকা চারি আনা শুল্ক লইতেন। ফরাসী সরকার দাসখৎখানি লিখিবার কাগজের জন্য পাঁচসিকা লইতেন এবং দাসদাসীর মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন (২৭) এই পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু পাকা ব্যবস্থার মধ্যে একটা কাঁচা ব্যবহার থাকেই থাকে। আইন থাকিলে আইনের চক্ষে ধূলি দিবার উপায়ও উদ্ভূত হয়। আইন বহির্ভূত উপায়ে—তখনকার লোকের চক্ষে গর্হিত উপায়ে অর্থাৎ জোর করিয়া, চুরি করিয়া, সরকারকে বঞ্চিত করিয়া—দাসদাসী সংগ্রহ ও বিক্রয় এত অধিক মাত্রায় চড়িয়া উঠিয়াছিল যে ১৭৮৯ সালে চন্দননগরের তৎকালীন গবর্ণর মঁসিয়ে মন্টিগ্নি নিম্নলিখিত আজ্ঞা প্রচারিত করেনঃ—

The Master Attendant of Chandernagore is directed to see that no native be embarked without an order signed by the Governor and all Captains of vessels trading to the port of Chandernagore, are strictly prohibited from receiving any natives on board. (২৮)

কিন্তু আইনসঙ্গত দাসব্যবসায় পূর্ববৎই চলিতে থাকে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশে উহা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়।

॥ ডাকাতি ॥

ডুমুরদহ হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও ইহা এক সময় ডাকাতির জন্য বাঙ্গলা দেশে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে নয়াসরায়ের উত্তরে এই গ্রামখানি অবস্থিত। রাজা হরিপালের ভ্রাতা অহিপাল মহেশ ছাড়িয়া ডুমুরদহে বাস করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি সপ্তগ্রামের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া 'দিগ্বিজয়-প্রকাশের' কিলকিলা বিবরণে লিখিত আছে। এই স্থানটি পূর্বে একটি দ্বীপের ন্যায় ছিল, সেইজন্য এই স্থান 'ডুমুর দ্বীপ' বলিয়া প্রখ্যাত হয়।

"অহিপালো মহেশে চ রাজ্য ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণী সন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ॥
ডুমুরদ্বীপ মধ্যে চ বসতিং কৃতবান মুদ্রা।" ৬৮১

গঙ্গার নিকটে দ্বীপ বলিয়া নৌকা করিয়া এই স্থান হইতে ডাকাতি করিবার বিশেষ সুবিধা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই স্থানের বিশ্বনাথবাবু বলিয়া এক ব্যক্তি ডাকাতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তাহাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ সরকারকে পর্যন্ত বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে তিনিই বিশে ডাকাত বলিয়া খ্যাত।

ডুমুরদহের রায়বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া তৎকালে খ্যাত ছিল। বঙ্গের বহু প্রাচীন বনিয়াদী বংশের সহিত তাহারা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ; কিন্তু দুঃখের বিষয় নৌকা করিয়া রাত্রে গঙ্গাবক্ষে ইহাদের লোকজন ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। কোন অতিথি ইহাদের বাড়িতে একবার আশ্রয় লইলে, আর তিনি ফিরিয়া যাইতেন না। ডুমুরদহের কেশব রায় ও গুমান রায়ের ভয়েও কেহ নৌকা করিয়া এই স্থান দিয়া যাইতে পারিত না; নৌকার সাহায্যে ডাকাতির তাহারাই সৃষ্টিকর্তা।

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্বাধিকারী ১২৬২ সালে ভারতের তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া 'তীর্থভ্রমণ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ডুমুরদহের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

"এই বাজারের নিকটের চড়াতে আহারাদি করিয়া পশ্চিমপাড় শিজে-ডুমুরদহ, সেখানে কেশব রায়, গুমান রায়ের বাটি; যাহাদের ভয়ে নৌকাপথে কেহ স্থির থাকিতে পারিত না, নৌকায় ডাকাতির তাহারা সৃষ্টিকর্তা। কলিকাতা বাগবাজারের ঘাট পর্যন্ত তাহাদের বোম্বেটের নৌকা বেড়াইত।"

ডুমুরদহের রায় বংশের বিশ্বনাথ বাবুর নাম জানেন না এইরূপ লোক বঙ্গদেশে এখন বিরল। 'বিশে ডাকাত' বলিয়া তিনি খ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার নাম শুনিলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভয়ে কাঁপিতে থাকিত। নদী মাতৃক বঙ্গদেশের সর্বত্র তাঁহার গতিবিধি ছিল এবং কিম্বদন্তি যে, পূর্বাহ্নে খবর দিয়া তবে তিনি ডাকাতি করিতে যাইতেন। তিনি উপস্থিত হইলে, তাহার প্রাপ্য গণ্ডা যদি কেহ বুঝাইয়া দিত, তাহা হইলে আর কোন গণ্ডগোলই হইত না। কিন্তু যাহারা পুলিশে খবর দিয়া পুলিশের সাহায্যে তাহাকে ধরাইবার চেষ্টা করিত তাহাদের সহিত বিশ্বনাথ বাবুর লড়াই হইত এবং বলা বাহুল্য তাহারাই ধনে প্রাণে মারা যাইতেন।

একবার বিশ্বনাথবাবু যশোহরে কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে যাইবেন বলিয়া খবর দিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামী তাহার ভয়ে ধন-রত্ন, শিশু ও মহিলাগণকে লইয়া কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে পলাইয়া যান, এবং দূর সম্পর্কীয়া এই দরিদ্র মহিলাকে তথায় রাখিয়া যান। মহিলাটির ভূ-সম্পত্তি তাহার জ্ঞাতিবর্গ ভোগ দখল করিতেছিলেন এবং তাহাকে তাহারা বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। যথা সময়ে বিশ্বনাথবাবু যশোহরে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বড়ই বিরক্ত হন। কিন্তু মহিলাটি ইহারা যে ডাকাত তাহা জানিতেন না, তিনি গৃহস্বামীর কোন আত্মীয় আসিয়াছেন ভাবিয়া, তাহার জন্য ভাল খাবার আনিয়া তাহাকে হাতমুখ ধুইয়া খাবার খাইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, বিশে ডাকাতের ভয়ে তিনি পলাইয়া গিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে "তুমি বাবা যখন আসিয়াছ তখন আজ রাত্রে আর যাইও না, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।"

বিশ্বনাথবাবু সরলা বৃদ্ধ মহিলার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন "আমিই যে বিশে ডাকাত।" বৃদ্ধা তাহার কথা কোন মতেই বিশ্বাস করিল না, বলিল "তোমার মত সুন্দর ছেলে কখনও ডাকাত হইতে পারে না। আমারও তোমার মত একটি ছেলে ছিল, গত

বৎসর সে মারা গিয়াছে, তাই আমি ইহাদের বাড়ীতে রান্না করিতে আসিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধা পুত্রশোকে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বিশ্বনাথবাবু অন্যস্থান হইতে ডাকাতি করিয়া যে সমস্ত অর্থ পাইয়াছিল, তাহা বৃদ্ধাকে দিয়া কতকটা তাহাকে সান্ত্বনা দিল এবং তাহার দেবর ও জ্ঞাতিগণের নাম ধাম লইয়া পরে সেই সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া সেই মহিলাকে দিয়াছিলেন। এইরূপ বহু গল্প তাহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এক ডাকাতি করিতে গিয়া তিনি ধরা পড়েন এবং হুগলী জেলের মধ্যে তাঁহার ফাঁসী হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের "সমাচার দর্পণ" পত্রে এই সম্বন্ধে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই সংবাদটি হইতে তৎকালে এই অঞ্চলে যে প্রত্যহ ডাকাতি হইত, তাহা জানিতে পারা যায়।

"ডাকাতি। এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে মধ্যে হয় এমন শুনিতে পাইতেছি. এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি হয় না কিন্তু এমত থাকিবে না পূর্বে এই অঞ্চলে এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাঁচ সাতজন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাত জমা হইয়াছিল তাহাদের সর্দার বিশ্বনাথবাবু নামে এক দুরন্ত ডাকাত ছিল তাহার হুকুমে দিন ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক যে তাহারা পূর্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।"

দুর্গাচরণ রায় ডুমুরদহ ও বিশ্বনাথ বাবু সম্বন্ধে যাহা তাঁহার 'দেবগণের মর্তে আগমন' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ

"বাম দিকে দেখা যাইতেছে ডাকাইত প্রধান স্থান ডুমুরদহ। এক সময় ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাইত ছিল। ঐ গ্রামের লোকেরা বাটীতে অতিথিদিগকে বাসা দিয়া রজনীতে প্রাণ সংহার করিত। দিবসে মৎস্যজীবীরা মৎস্য ধরিত এবং রজনীতে নৌকায় বোম্বেটেগিরি করিত। ফলতঃ সে সময়ে কি জলপথ কি স্থলপথ, কোন পথেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া টাকা কড়ি সহ কেহ যাইলে নিস্তার থাকিত না। প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, বিখ্যাত ডাকাইত বিশ্বনাথবাবু এই স্থানে বাস করিতেন। ইহার অধীনে ডাকাইতেরা নৌকাযোগে যশোহর পর্যন্ত ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। একবার মত্ত অবস্থায় কতিপয় সঙ্গীর সহিত ধৃত হন ও তাঁহার ফাঁসি হয়। যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, উহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটস্থ একটি দোতালা কোঠা। ঐ বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বহুদূর পর্যন্ত কোথায় কে আছে দেখিতে পাওয়া যাইত।"

বিশ্বনাথবাবু যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গদেশের বহু জমিদার এইরূপ ডাকাতি করিয়া অর্থোপার্জন করিতেন। কেহ স্বয়ং করিতেন; কেহ বা পরোক্ষে এইরূপ ডাকাতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু তৎকালে পুলিশ বিভাগের কার্যও অতিশয় নিন্দনীয় ছিল; কারণ গ্রামের চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া

ফাঁড়িদার, দারোগা পর্যন্ত এই কার্যের সহায়ক ছিল। তাহারা দোষী ব্যক্তিকে ধরাইবার কোন চেষ্টাই করিত না, এমন কি বহু স্থলে ডাকাতির অভিযোগে কেহ ধরা পড়িলে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্যই তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিত। তৎকালে রাস্তাঘাটের বিশেষ সুব্যবস্থা ছিল না, সেইজন্য গভর্ণমেণ্টকে ইহা দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

The police and often the zamindars themselves being the patrons of dacoits who preyed on the people.

ডাকাতগণের দৌরাত্মে সেই সময় ধনপ্রাণ লইয়া শান্তিতে বসবাস করা এবং জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত যে কিরূপ বিপজ্জনক ছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। গভর্ণমেণ্ট এই ডাকাতি দমন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় নিরীহ ও ভীরু শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসিগণ ডাকাত আসিয়াছে শুনিলেই কোন প্রকার বাধা দেওয়া দূরের কথা, অগ্রে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইত। বহুক্ষেত্রে ডাকাতগণ পূর্বে পত্র দিয়া ডাকাতি করিতে যাইত; সেই সকল স্থানে গৃহস্বামী টাকা লইয়া ডাকাতদিগকে দিবার জন্য অপেক্ষা করিত।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে ডাকাতদের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রশেখরের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছদে তিনি যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ-কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয় কোন জমিদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, অন্যত্র দেখিতে পাই অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্যাদায় পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশমর্যাদার বিশেষ গর্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্মান্ বা স্কন্দনেবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাঁহারা গোচোর, বিরাটের উত্তর গো-গৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালী জমিদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্যাদা আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতবাদ ঐতিহাসিক সত্য। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণাঙ্গনে যুদ্ধের নামমাত্র অভিনয়ে যখন সিরাজদৌলার পতন হইল, তাহার পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত কোম্পানীর যে রাজত্বকাল চলিয়াছিল তখন দেশের সর্বত্র প্রবলভাবে চলিতেছিল স্বার্থপরতা, অর্থশোষণনীতি এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন। "ইংরেজ তখন বাঙ্গলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুল-

কলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

তখনকার দিনের কোম্পানীর যিনি ইউরোপীয় কর্মচারী থাকিতেন, তাহার প্রধান কার্যই ছিল রাজস্ব আদায় এবং ডাকাত ধরিয়া ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা—ঐ সব ধৃত ডাকাতদের বিচার হইত নায়েব নাজিমের অধীনস্থ ফৌজদারী আদালতে। দেশের শাসন-সংরক্ষণ দস্যু ডাকাতি দমন সে সকলের দিকে কোম্পানী কোন কিছুই লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহাদের স্বার্থ, তাঁহাদের অর্থ নির্বিঘ্নে কলিকাতা পৌঁছিলেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। ডাকাতি সম্বন্ধে ওম্যালি সাহেব লিখিয়াছেন :

This horrid crime was fostered by nearly all classes of the community—the landholders, the native officers of our courts, the police, the village authorities. (২৯)

বাঙ্গালার সর্বত্র সে সময়ে ডাকাত ছিল। তাহারা জলপথে ও স্থলপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া ফিরিত। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, চন্দননগর, হাওড়া, যশোহর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা, বারাসত, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মেদিনীপুর, কটক, পুরী, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, পুর্ণিয়া, মালদহ, দিনজপুর, কোচবিহার, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ত্রিহুত চম্পারণ, সারণ, সাহাবাদ, পাটনা, বিহার এ সকল স্থানের ডাকাত ও দস্যুরা বাঙ্গলার সর্বত্র যাতায়াত করিত। ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৩ এই তিন বৎসরের গভর্ণমেন্টের Statement showing the number of Dacoity and attempts to commit Dacoity) বিবরণী হইতে দেখা যায়, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলাতেই সর্বাপেক্ষা ডাকাতের সংখ্যা বেশী ছিল।

The Bengal Administration Report for 1859-60 হইতে জানা যায় যে, ডাকাতেরা লোহার মুগুর, বল্লম, লাঠি, শর্কী' শাল প্রভৃতি সহকারে ডাকাতি করিয়া ফিরিত। তাহাদের অত্যাচার ও নিপীড়ন ছিল কল্পনাতীত। নৌকারোহীদের প্রতি অতর্কিত আক্রমণকারী একদল জলদস্যু পর্তুগীজ জলদস্যুদের ন্যায় নৌকাযাত্রীদিগকে আক্রমণ পূর্বক তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াই নিবৃত্ত হইত না, বৃহদাকারের খড়্গের আঘাতে তাহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত। গভর্ণমেণ্ট এই ডাকাতি দমনের জন্য বাঙ্গলাদেশে ও বিহারে Suppression of Dacoity নামে একটি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখিতে পাই :

"প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালে প্রথা ছিল।" নাবিকদস্যু বলিতে তিনি Pirate বা বাঙ্গলার River Dacoits দিগকে উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের মর্তিবিবির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

"এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে?"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রী কণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কপালকুণ্ডলা নাকি?"

স্ত্রীলোক কহিল, 'কপালকুণ্ডলা কে তা জানিনা। আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিস্কুন্তলা হইয়াছি।'

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, কপালকুণ্ডলার আখ্যানভাগের বিষয়বস্তু—জাহাঙ্গীরের অর্থাৎ মোগল রাজত্বকালের। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ ভারতবর্ষে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পর্তুগীজেরা তখন বাঙ্গলার প্রধান প্রধান নগরে ও বন্দরে বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সগৌরবে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছিলেন। সপ্তগ্রাম, হুগলী, চাটগাঁ, বাকলা, শ্রীপুর প্রভৃতি সর্বত্র তাহাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। বঙ্কিমবাবু সেজন্য প্রথমেই পর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গি দস্যুগণের উৎপাতে দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিয়া গিয়াছিল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরের নিকট লিখিত ডেসপ্যাচে বলা হইয়াছিল যে, মগদের লুণ্ঠনে দেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল "suffered greatly from the depredation of the Maghs".

"আনন্দমঠে' দস্যুদের কাহিনী উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই দস্যু কাহারা? যাহারা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে অনাহারে শীর্ণ 'মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়' কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না অতিশুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার ইত্যাদি। কিন্তু এই গ্রন্থের মূল আখ্যান বাঙ্গলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত। বাঙ্গলার নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় হইতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের উপদ্রব বাংগলাদেশে বিস্তার লাভ করে। নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে (১৭৪০—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ) হিন্দু সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা বাঙ্গলাদেশ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ফকিরদের অন্যতম দলপতি মজনুসার অত্যাচার বিবরণ সর্বজনবিদিত। সন্ন্যাসীদের মধ্যে সশস্ত্র নাগা সন্ন্যাসীর দল নিঃসঙ্কোচে নানাস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া ফিরিত। ইহারা শৈব নাগা বৈরাগী নাগা, দাদুপন্থী প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাসিম বাঙ্গলার মসনদ পুনরধিকারের নিমিত্ত নাগা সন্ন্যাসীদের তাঁহার সৈন্যদলের অন্তর্ভূক্ত করিরাছিলেন।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রেনস্যাম্ মাষ্টার লিখিয়াছেন যে, আরাকানের দস্যুদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজ বণিকগণ শিবপুরের নিকট থানা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল।

In Tannah stands an old fort of mud walls which was built to prevent the incursions of the Arracaners, for it seems that they were so bold that none durst inhabit lower down the river than this place.

"আনন্দমঠ" সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গলার সন্ন্যাসিবিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।" বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের পরিশিষ্টে মূল ইংরেজী হইতে History of the Sannyasi Rebellion উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব প্রতিভাবলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দেশমাতৃকাকে দেবত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে চাহেন, তাঁহারা রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ সঙ্কলিত Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal দেখিতে পারেন। ১৭৭০—১৭৭২ খৃষ্টাব্দ এই দুই বৎসর কাল—বাঙ্গলাদেশে সন্ন্যাসীদের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

"ইন্দিরা' উপন্যাসের কালদীঘির কথা মনে করুন। 'ইন্দিরা ঊনিশ বৎসর বয়সে ভরা যৌবনে স্বামী সন্দর্শনে যাইতেছে, পথে পড়িল কালদীঘি। দীঘির ঘাটে বটতলায় তাহার পাল্কী নামান হইল। বাহকেরা কেহ দূরে বিশ্রাম করিতেছে, কেহ জলে নামিয়াছে, কেহ নিকটে নাই।......এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সেদিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম যে, একদল কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য। ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে এ সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন। এইরূপ চারিজন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।'

হুগলী জেলার ডাকাতি নিবারণ করিবার জন্য সরকার হইতে বহু প্রকারের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাধা চণ্ড নামক এক প্রসিদ্ধ ডাকাত তিনি চারিটি ডাকাতি করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু কাছারী হইতে সে পলায়ন করিয়া পুনরায় শত শত স্থানে ডাকাতি করা সত্ত্বেও তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। আঠার বৎসর পরে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাধা চণ্ড গ্রেপ্তার হয়, এবং সেই বৎসর ২৫শে আগষ্ট তারিখে তাহার ফাঁসি হয়। সর্বসাধারণের সমক্ষে তাহার ফাঁসি হইয়াছিল এবং উক্ত ফাঁসি দেখিবার জন্য হুগলীতে যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, সেরূপ জনসমাগম ত্রিবেণীতে বারুণীর স্নানের সময়ও হয় না বলিয়া প্রাচীন সংবাদপত্রে লিখিত আছে।

হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট এই স্থান হইতে ডাকাতি বন্ধ করিবার জন্য সেই সময় কিরূপ

নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

নবীন নিয়ম ॥ জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি গ্রাম সকলে কয়েকবার ডাকাইতির ঘটনা হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্তা কর্তৃক নানাবিধ সদুপায় সাধন সত্ত্বেও দুবৃত্তেরা অত্যাচারে ক্ষান্ত হইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার বশীভূত স্থান সকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাঁড়িদার নিযুক্ত হইবেক আর ঐ দশ গ্রামের প্রত্যেক কর্মচারী ও গ্রাম্য প্রহরীদের নিকট হইতে এইমত অংগীকৃত পত্র লওয়া যাইবেক যে তাহারা পরস্পর প্রত্যেক গ্রামের মংগলামংগলের দায়ী হইবেক। (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

বিচার কর্তার নূতন নিয়ম ॥ সংপ্রতি শুনা গেল যে জিলা হুগলীর বিচারকর্তা শ্রীলশ্রীযুত স্মিত সাহেব সকল গ্রামে এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে নীচ জাতীরা সকলে একত্র হইয়া মিলিয়া রাত্রিকালে যষ্টি হস্তে করিয়া গ্রামের ভিতরে চৌকি দিবেক এই হুকুম দিয়াছেন কারণ ডাকাতি কিম্বা কোন হাংগামা উপস্থিত রাইয়ত লোক প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া যাহাতে তাহা নিবারণ হয় তাহা করিবেক অন্যথা বিচারর্তার নিকট যথাবিধি শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক। (১লা আষাঢ় ১২৩৬)

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর হুগলী জেলায় অনুষ্ঠিত ডাকাতির একটি তালিকা সংকলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৎসর	ডাকাতির সংখ্যা	ডাকাতের সংখ্যা	অপহৃত দ্রব্যের পরিমাণ	কয়টি গকাতিতে সাজা ইয়াছিল	কয়জনের সাজা হইয়াছিল	সম্পত্তি উদ্ধার
১৮৩৮	১৪	২৯২	৬,৬২৯ টাকা	৬	৯	১৬৯৲
১৮৩৯	১৩	২০৮	২,৮১৯ "	২	৫	৭২৲
১৮৪০	২০	২২৪	১০,২৯৯ "	২	৯	৭৪৲
১৮৪১	১৫	২৩৮	৮,৬৯৮ "	২	৬	১৪৩৲
১৮৪২	২৯	৩৭০	১৯,৫২৫ "	৭	২৯	৫৪৭৲
মোট	৯১	১৩৩২	৩৭,৯৭০ টাকা	১৯	৫৮	১০০৫৲

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে বঙ্গের প্রথম ছোট লাট মনোনীত হন; এবং তিনি বংগ দেশ হইতে ডাকাতি দমন করিবার জন্য বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; কেবল হুগলী জেলা নয়, বংগ-দেশের অন্যান্য জেলায়ও তিনি কর্ম করিয়া ইহা দমন করিতে না পারিলে যে, বংগবাসীর শান্তি হইবে না তাহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। সেই সময় ইহা দমন করিবার জন্য 'ডাকাতি দমন বিভাগ' বলিয়া বাংলাদেশে একটি নূতন দপ্তর খোলা হয় এবং তাহার কমিশনারের (The Commissioneer for the Suppression of Dacoity) হস্তে ইহা নিবারণ করিবার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

এ সম্বন্ধে স্যার জন স্ট্রেচী যাহা লিখিয়াছেন (ভারতীয় সংস্করণ ১৮৯৪) তাহার

সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ এইরূপ—"তখনকার দিনে ভাল রাস্তাঘাট ছিল না, বিদ্যালয়াদিও বড় একটা ছিল না, লোকের ধনসম্পত্তি এবং জীবনের নিরাপত্তার বিশেষ কোন সুবন্দোবস্তও ছিল না। পুলিশের অকর্মণ্যতার ফলে কলিকাতার উপকণ্ঠেই সশস্ত্র ডাকাতদল কর্তৃক ডাকাতি এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হইত। একজন ছোটলাট নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থার বেশ একটু পরিবর্তন আরম্ভ হয় এবং তখন হইতেই অবস্থা স্থায়ী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।"

হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাগুলি ডাকাতদের প্রধানকেন্দ্র ছিল এবং ডাকাতগণ নদীবহুল পথন দিয়া ডাকাতি করিয়া এমন ভাবে পলায়ন করিত যে, তাহাদিগকে ধরা একপ্রকার অসাধ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দের 'বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশান রিপোর্টে' এই সমস্ত ডাকাতির বিষয় সবিস্তারে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্থলপথে ডাকাতি দমন করিবার পর জল পথে ডাকাতি দমন করিতে সরকারকে যে কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা উক্ত রিপোর্ট এবং 'Selections from the record of the Bengal Government' পাঠ না করিলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। নিম্নে পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে The Bengal Administration Report (1859-60) হইতে অংশ বিশেষের ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল ঃ

"ভারতীয় অপরাধের মধ্যে দলবদ্ধভাবে লুটতরাজ বা ডাকাতি করা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হইত। আরাকান, চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরায় যে সমস্ত ডাকাতি হইত, সেখানে সাধারণতঃ অসভ্য পার্বত্যজাতিরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ ও লুটতরাজ করিত। দুর্গম পর্বতশ্রেণী ও গভীর অরণ্য ছিল তাহাদের আশ্রয়-স্থল, এবং তাহাদের কার্যের প্রতিকারের কোন উপায়ই ছিল না।

কিন্তু এই সমস্ত পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে বাংলাদেশের ডাকাতদের কোনরূপ সাদৃশ্য ছিল না। লাঠি, তরবারি এবং মশাল লইয়া ইহারা কোন অসহায় পরিবার, বা জলপথে নৌকা আক্রমণ করিত। ইহারা নিতান্ত ভীরু ছিল এবং সামান্য বাধা পাইলেই পলাইয়া যাইত।

এক শ্রেণীর ডাকাতের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নাই—তাহারা হইতেছে জলদস্যু। নদীবহুল বাংলাদেশে চলাচলের পক্ষে নদী পথই প্রশস্ত এবং লুটতরাজ করিবার পক্ষে ইহা তাহাদের খুবই অনুকূল। এই সমস্ত ডাকাতদেব খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেত বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। স্থলদেশে তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করা সহজ কিন্তু জলপথে তাহা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।"

সমাজের যে স্তরকে আমরা নিম্নস্তর বলি, তাহাতে নারীদিগের মধ্যে শরীরচর্চা ছিল কিনা, সে প্রশ্ন আমরা করিয়াছি। তাহার কারণ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'আর্যাবর্ত' মাসিক পত্রে দ্রবময়ী চণ্ডালিনীর বিবরণ। দ্রবময়ীর স্বামী বৈকুণ্ঠ সর্দার চৌকিদার ছিল। তখন "হুগলী জেলার উত্তরাংশ ও বর্ধমানের দক্ষিণাংশ একরূপ অরাজক

ছিল বলিলেও চলে। চিতেমার পুকুর, সরালের দীঘী, উচালনের দীঘী, বারবাকপুরের দীঘী—এই সকল স্থানে দিনের বেলায় সামান্য লাভের লোভে দস্যুরা নরহত্যা করিত। তখন চৌকিদারি একটা 'সত্যিকার' কার্য ছিল।" দ্রবময়ী স্বামীর অসুস্থতায় সময় সময় তাহার কাজ করিত। যখন বৈকুণ্ঠ সর্দারের মৃত্যু হইল, তখন তাহার সংসারে তাহার বিধবা —দ্রবময়ী আর শিশু পৌত্র রঙ্গলাল। কিসে তাহাদিগের ভরণপোষণ হয়? গ্রামের লোকের পরামর্শে দ্রবময়ী চৌকিদারী কাজের জন্য দরখাস্ত করিতে কালনায় গেল। তথায় কর্তৃপক্ষ সে লাঠিখেলা জানে জানিয়া তাহাকে বর্ধমানে পাঠাইয়া দিলেন। কাছারীর মাঠে লাঠিখেলার পরীক্ষা জিলার ম্যাজিস্ট্রেটের ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সম্মুখে হইল। উভয়েই য়ুরোপীয়। দ্রবময়ী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে লাঠি খেলিল, দুই দিক হইতে দুই জন কনষ্টেবল তাহাকে আক্রমন করিল আর সে দুই গাছা লাঠি দুই হাতে লইয়া তাহাদিগের আক্রমন ব্যর্থ করিতে লাগিল। দ্রবময়ী স্বামীর চাকরীতে বহাল হইল।

হুগলীর অক্ষয়চন্দ্র সরকার দ্রবময়ীকে দেখিয়াছিলেন।

হুগলীর প্রথম জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অনারেবেল্ সি. এ. ব্রুস। সকৌন্সিল বড়লাটের সহিত তাঁহার চিঠি লেখালেখি চলিত। এখনকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা তাঁহার খাতির এবং ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বেশী ছিল। ব্রুস সাহেবের পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ব্রুক হুগলীর জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হন।

ব্রুক সাহেব গ্রাম্য পাইকদের দোষ দর্শাইয়া একটি রিপোর্ট লেখেন। সে সময় ডাকাতি অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি রিপোর্টে ডাকাতদের দমনের রীতিমত বন্দোবস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। তাহাদের দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। ডাকাতেরা অপ্রতিহত ভাবে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। অধিবাসীদিগের জীবন এবং সম্পত্তি তখন নিরাপদ ছিল না।

টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হুগলী জেলার পঞ্চাশ বৎসরের অপরাধমূলক কাহিনী হইতেছে প্রকৃতপক্ষে ডাকাতির ইতিহাস।

The history of the crime of the Hooghly district between 1795 and 1845 is practically a history of Dacoity. Other heinous crimes were no doubt committed but the one crime with which the old records ring without changing is that of gang robbery. (৩১)

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় শতাধিক প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল। পর বৎসর সেক্রেটারী ডাউড্সওয়েল সাহেব ডাকাতগণের অত্যাচার কাহিনী বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করেন। বড়লাট বাহাদুর এই ভয়ংকর অরাজকতার বিষয় কোর্ট অব ডিরেক্টারদের নিকট লিখিয়া পাঠান। তাহার ফলে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। গোয়েন্দার সাহায্যে ডাকাত ধরিবার ব্যবস্থা করা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের প্রধান কার্য ছিল। কলিকাতা বিভাগের সকল জেলা অপেক্ষা হুগলী জেলার ডাকাতদের অত্যাচার অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। এমন কি ইংরাজ-

দিগকেও ডাকাতদের ভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত। এই সম্বন্ধে হান্টার সাহেব বলিয়াছেন :

> In 1780 they burnt to ashes 15000 houses and 200 souls in Calcutta. In fact even Anglo-Indians lived in the utmost dread and until they had well secured their household goods for the night they would never unbolt their doors. (৩২)

শ্যাম মল্লিক, রাধা ডাকাত, বিশ্বনাথ বাবু, বৈদ্যনাথ এবং পীতাম্বর প্রভৃতি খ্যাতনামা দস্যু সর্দারগণের দোর্দণ্ড প্রতাপে তৎকালে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ জনপদ সমূহের অধিবাসিগণ সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। শ্যাম মল্লিক ডাকাত ছিল বটে তবে তাহার উদারতার কথাও শুনা যায়। ত্রিবেণীর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন কিন্তু স্বভাববশতঃ আদৌ সদ্ব্যয় করিতেন না। শ্যাম মল্লিক এক রাত্রিতে পণ্ডিতকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সুশিক্ষা দিবার জন্য সদলবলে পণ্ডিতের বহির্বাটির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় এবং পণ্ডিতকে ধরিয়া আনিবার জন্য অন্দরে লোক প্রেরণ করে। বাটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল কিন্তু কোথাও পণ্ডিতকে পাওয়া গেল না। তিনি দস্যুগণ বাটী প্রবেশ করিবা মাত্রই প্রস্থান করিয়াছিলেন। শ্যাম মল্লিক পণ্ডিতকে না পাইয়া হতাশ হইয়া সদলে চলিয়া গেল, লুণ্ঠন করিল না। বিশ্বনাথ ডাকাতকে লোক "বিশ্বনাথ বাবু" বলিত। বিশ্বনাথ গরিবের 'মা-বাপ' ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেরউড্ অরণ্যের দস্যুর ন্যায় ধনবানের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া গরীবদিগকে তাহা অকাতরে বিতরণ করিত। তাহার কথা ইতিপূর্বে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। রাধা ডাকাতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাকে ধরিবার জন্য সুদক্ষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়। বহুকাল গোয়েন্দাগণকে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইয়াছিল। অবশেষে এক বারবণিতার গৃহে রাধা ধৃত হয় এবং হুগলীর জজ সাহেবের বিচারে তাহার ফাঁসীর আদেশ হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর অনেক ডাকাত ধৃত হইয়া প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ডাকাতী কমিশন সৃষ্টি হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। প্রথম ডাকাতী কমিশনর হন শ্রীযুক্ত ওয়াকুপ সাহেব। হুগলী জেলা চিরদিনই ডাকাতির জন্য প্রসিদ্ধ। যতদিন ডাকাতেরা কেবল প্রজা লইয়া ছিল বাঙগালী লইয়া ছিল ততদিন এতটা কড়াকড়ি হয় নাই কিন্তু যখন য়ুরোপীয়দিগের উপরও অত্যাচার আরম্ভ করিল, যখন পথি মধ্যে সরকারী খাজনার টাকা প্রহরী পাহারা সত্ত্বেও লুণ্ঠিত হইতে লাগিল তখন সরকারের চমক হইল—বৃটিশসিংহ তখন হাই তুলিয়া গাত্র ঝাড়া দিয়া চক্ষুতে স্থির দৃষ্টি আনিয়া চাহিয়া দেখিলেন ও ভীষণ "থাবা" উত্তোলন করিলেন। এই "থাবা"টি হইতেছে—ডাকাতি কমিশনর। থাবার আঘাতে ডাকাতের দল চূর্ণ বিচূর্ণ দলিত পিষ্ট লাঞ্ছিত হইয়া কোথায় দূরে গিয়া পড়িল। সিংহ সন্তুষ্ট হইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া আবার শয়ন করিলেন কিন্তু কয়েকবার চক্ষু মুদিয়া আবার স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন—একটি চক্ষু হইল নব সৃজিত পুলিস আর অপরটি হইল পিনালকোড। এই রূপে সিংহ শয়ন করিলেন—ডাকাতী কমিশনার আফিস উঠিয়া গেল।

"থাবা"র উত্তোলন কাল প্রায় ১৮ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পর পর কমিশনর হইয়াছিলেন—ওয়াকুপ, এল জাক্‌সন, ওয়ার্ড, র‍্যাভেনাস, কীলী, ডাক্তার জ্যাক্‌সনের পুত্র, রাইলী। রাইলীর আমলেই ইহা উঠিয়া যায়। ওয়াকুপ সৃষ্টির বালসূর্য; ওয়ার্ড সাহেবের সময় ডাকাতী কমিশনের মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড। আর রাইলীতে মরীচীমালী কমিশন অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। ধূমকেতুর ন্যায় এই কমিশনর মার্তণ্ড উত্থিত হইয়া স্বীয় ময়ূখমালায় হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও পরে বাঁকুড়া অঞ্চল উদ্ভাসিত করিয়া পুলিস রূপ পুচ্ছটি রাখিয়া সৌর জগতের কোথায় অস্তমিত হইয়া চলিয়া গেছেন। ১৮৬৫ অব্দে পুচ্ছটি বিচ্ছিন্ন হয়। গবর্ণমেন্ট এই মর্মে লিখিলেন "বোধ হয় ডাকাতী কমিশনার আফিস এখন উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ডাকাত ত দমন হইয়াছে। অনেক বড় বড় নামজাদা ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। আর কেন? তাহা হইলে বাৎসরিক লক্ষ টাকা খরচটা বাঁচিয়া যায়। আর যদি কিছু ছুটছাট থাকে নব নিয়োজিত পুলিস কর্তৃকই তাহাদের দমন হইবে।" জ্যাকসন তদুত্তরে এই মর্মে লিখিয়াছিলেন—ডাকাত দমন হয় নাই—দমন হইয়াছে মনে করাই ভুল। এখনও অনেক পাকা ডাকাত ধরা পড়ে নাই। নামজাদা দলপতি কতক ধরা পড়িয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদের দলের সমস্ত লোক ধরা পড়ে নাই। ডাকাতী কমিশনের গণ্ডীর মধ্যে যে সকল জেলা আছে ডাকাতরা সে সকল জেলা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য জেলায় পলাইয়া গোপন ভাবে বা প্রকাশ্য ভাবে রহিয়াছে। যে কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে তাহা শেষ করা চাই। এখন আফিস উঠাইয়া দিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। দেশ আবার ডাকাতে ছাইয়া যাইবে। আমার বিবেচনায় দল একেবারে উন্মূলিত করা উচিত। সমস্ত বঙ্গদেশ এই ডাকাতী কমিশনের অধীনে আনা উচিত। এইরূপে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে কমিশন জোরের উপর কাজ করিতে পারিবেন। আমার বিবেচনায় বেহার প্রদেশের—বেহারেও অনেক ডাকাত পলাইয়া গিয়াছে—সেই জন্য একজন স্বতন্ত্র ডাকাতী কমিশনার নিযুক্ত হওয়া উচিত।"। জ্যাকসনের এই পত্র পাইয়া গবর্ণমেন্ট সমজাইয়া সকল কথা বুঝিলেন। জ্যাকসন যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশ ১৮৬১ অব্দে ডাকাতী কমিশনের অধীন আসিল। বেহারের জন্য একজন স্বতন্ত্র ডাকাতী কমিশনর নিযুক্ত হইল। পাটনা সহরে তাঁহার আফিস হইল।

১৮৫৪ অব্দের ৩রা নভেম্বর তারিখে জে, আর, ওয়ার্ড সাহেব ডাকাতী কমিশনর নিযুক্ত হন। কমিশন আসামীগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ফুল গারদের আসামী, ঠাণ্ডা গারদের আসামী, আর বড় গারদের আসামী। যাহারা ধরা পড়িত প্রথমে তাহাদিগকে ফুল গারদে রাখা হইত। তাহাদের পায়ে আধমন লোহার বেড়ী থাকিত। বিচার হইবার পূর্বে এই খানে থাকিত। যদি কোন আসামী একরার করিব বলিয়া আশা দিত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ঠাণ্ডা গারদে বদলি করা হইত। এখানে তাহাদিগকে বিশেষ রূপে যত্ন করা হইত। একরার করাইবার জন্য নানা রূপ প্রলোভন তাহাদিগকে দেওয়া হইত, চাকরী হইবে, রাজা বিশ্বাস করিবে ইত্যাদি। ইহারা ভাল খাইতে পাইত।

যাহাদিগের উপর বিচার শেষে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হইত তাহারাই বড় গারদে স্থান পাইত। অনেকগুলি আসামী বড় গারদে জমিলে তাহাদিগকে জাহাজে করিয়া আণ্ডামান দ্বীপে পাঠান হইত। এই সকল গারদে রাত্রিকালে চাবী দেওয়া হইত ও পাহারা থাকিত, দিনে চাবীখোলা থাকিত কিন্তু পাহারা থাকিত। ৩ ঘন্টান্তর পাহারা বদল হইত। আসামীরা প্রত্যেকে ৶১৫ পয়সার হিসাবে দৈনিক খোরাকী পাইত। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইলে যে সকল কয়েদী গবর্ণমেন্টের কার্য করিতে স্বীকার করিত তাহাদিগকে "গোয়েন্দা" বলা হইত। গোয়েন্দারা কেবল সন্ধ্যা বেলা হাজিরা দিত। তাহারা ঘর বাঁধিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বাস করিতে ও ব্যবসা করিতে পাইত। অধিকাংশ গোয়েন্দা গরু পুষিয়া দুধের ব্যবসা করিত। গোয়েন্দারা ৵০ আনা করিয়া খোরাকী পাইত। সর্ত এই ছিল যে গোয়েন্দারা দাঙ্গা করিবে না, জুয়া খেলিবে না, চুরি করিবে না,, রাত্রিকালে নিজের ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না, সরকারের লোক ডাকিবামাত্র সাড়া দিবে, পরস্পর বা অপরের সঙ্গে মারামারী করিবে না, সরকারী কার্যে সাহায্য করিবে, সরকারী কার্যে কখন মিথ্যা বলিবে না ও সন্ধ্যার সময় কমিশন আফিসে হাজিরা দিবে, ইহার অন্যথাচরণ করিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম আমলে আসিত ও গোয়েন্দাকে ধরিয়া আন্দামান প্রেরণ করা হইত। সদাশয় ওয়ার্ড সাহেব এই গোয়েন্দাদের পুত্রদের লেখা পড়ার একটি স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কেবল যে গোয়েন্দাদের পুত্রগণ পড়িত এমন নহে বাহিরের লোকের পুত্রেরাও এ স্কুলে পড়িতে পাইত। এই স্কুলে পাঠ করিয়াছিলেন প্রাক্তন হুগলীর রেভিনিউ এজেন্ট ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। এই সকল লোক বিখ্যাত গোয়েন্দা ছিল--বিষ্ণু ঘোষ, মাণিক ঘোষ, স্বরূপ ঘোষ, মোবারক সেখ (ইনি চুঁচুড়ার মাধব দত্তের বাড়ীর ডাকাতীর দলে ছিলেন ও পরে গোয়েন্দা হইয়া কমিশনের ডাক্তার শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায় অধীনে ডাক্তার খানার কার্য করিতেন), সিন্ধু মাইতি, ব্রজ বৈরাগী।

গোয়েন্দাদিগের নিষিদ্ধ কার্য যদি গোয়েন্দারা করিত তাহা হইলে তাহাদিগকে ধরিয়া আন্দামান দ্বীপে পাঠান হইত। কখন কখনও আবার গোয়েন্দা পলাইত। আধ মন বেড়ী ভেঙ্গে পলায়ন বা ডবল বেড়ী অর্থাৎ একমন লোহার (আধ মন করিয়া দুইটি) বেড়ী একলা ভাঙ্গিয়া পলায়ন ইহাও অসম্ভব ছিল না। এমন ছয় মাস যাইত না যাহার মধ্যে দুটা একটা না পলাইত। কেহ বা আবার ধরা পড়িয়া ফিরিয়া আসিত কেহ বা আর কখনও আসিত না। একবার সার্কিট হাউস হইতে একটা গোয়েন্দা পলাইতেছিল, সে সঙ্গী সহ বর্তমান কালীবাড়ীর পাশের নর্দমা দিয়া পলাইতে ছিল। ঐ খানে এক জন গোয়ালিনী ছিল—সে দুগ্ধের ব্যবসা করিত। গোয়েন্দাও দুগ্ধের ব্যবসা করিত বলিয়া গোয়ালিনীর গোয়েন্দার উপর রাগ ছিল—খদ্দের ভাঙ্গাইয়াছিল। সে যখন দেখিল যে গোয়েন্দা নর্দমায় তখনি দুধের কেঁড়ে ফেলিয়া—মহিলা খুব মোটা সোটা ছিল—গিয়া তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। গোয়েন্দা বাবাজীর সঙ্গী ভোঁ দৌড় দিল কিন্তু বাবাজী নঙ্গরযুক্ত নৌকার অবস্থাপন্ন হইলেন। স্ত্রীরূপী নঙ্গরটি প্রায় ওজনে ৪ মন। ক্রমে গোলযোগ শুনিয়া দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিল। গোয়েন্দা বাবাজীর অদৃষ্ট বড় মন্দ—সে গোয়ালিনীর

দ্বারা কেবল যে ধরা পড়িল তাহাই নহে, তাহার হস্তে শম্ভুনিশম্ভ বধ হইয়া গেল।

চুঁচুড়ার কামারপাড়া বাজারে সুপ্রসিদ্ধ দাসদিগের বাটী আছে। সুবর্ণ বণিক এই দাস-দিগের বাটির শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাস আসিষ্টান্ট ডাকাতী কমিশনর ছিলেন। ই'হার ত্রিশ বেত পর্যন্ত হুকুম দিবার ক্ষমতা ও অধিকার ছিল। ই'হার অধীনে এক একটি নির্দিষ্ট প্রদেশের জন্য একজন কমিটিং অফিসার ছিলেন। হুগলী জেলার কমিটিং অফিসার ছিলেন চন্দ্র-শেখর রায় ই'হার বাটী ছিল পাঁচপাড়া (থানা বলাগড়) সেই সময়ে ই'হার ডাকাত ধরার জন্য বড় নাম যশ বাহির হয়। চন্দ্রশেখর বাবুর বংশধরেরা অদ্যাপি বর্তমান। আমরা তাঁহার দুইটি পুত্রকে দেখিয়াছি। কমিটিং অফিসরেরা এবং কখন কখনও কমিশনর স্বয়ং প্রমান প্রয়োগ যোগাড় করিয়া দিতেন আবার সেই প্রমান নথীস্থ করিয়া তাহার বলে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিতেন। পরে দায়রায় জজের নিকট আসামীদের বিচার হইত। গুরুচরণ দাস মুরশিদাবাদের কমিটিং অফিসর ছিলেন। রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বর্ধমান মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার কমিটিং অফিসার ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কর বাঁকুড়া বীরভুমের কমিটিং অফিসার ছিলেন। রাইলী সাহেবের আমলে সেরেস্তাদার ছিলেন নেড়া নবকৃষ্ণ ঘোষ। খাজাঞ্চি ছিলেন হরিশ্চন্দ্র ঘোষ আর জমাদার ছিলেন দীনদয়াল পাঁড়ে। রাইলী সাহেব অনেক নুতন নীতির অনুসরণ করেন। ক্রমশঃ তাহা বিবৃত হইতেছে।

ওয়ার্ডসাহেব গোয়েন্দার পুত্রগণের অধ্যয়নের নিমিত্ত যে স্কুল স্থাপন করেন এবং যাহাতে অপর সাধারণ লোকের পুত্রগণও পাঠ করিতে পাইত, সেই স্কুলটি রাইলী সাহেব উঠাইয়া দেন। সার্কিট হাউসের নিকট একটি মদের ভাটী ছিল। ডিষ্টিলারী বলিয়াই সকলে সেই বাটিটী জানিত। এই বাটীর নিকটে ওয়ার্ড সাহেবের গোয়েন্দা স্কুল স্থাপিত ছিল। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভাল মানুষ হইবে সমাজে থাকিয়া সংসার ধর্ম করিবে এই শুভ উদ্দেশে ওয়ার্ড সাহেব স্কুলটি সংস্থাপন করেন। কিন্তু রাইলী সাহেব ঐ স্কুলটি উঠাইয়া দিয়া ঐ বাটীতে আসামীর একরার হইবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ডিষ্টিলারী বাটীতে সাফাই সাক্ষী থাকিবার স্থান, কেন? এটা সহজেই মনে হইতে পারে। রহস্যজ্ঞ বলেন এই বাটীতে সাফাই সাক্ষী থাকা আর কয়েদ হইয়া থাকা একই কথা ছিল। আসামীরা বিচারের পূর্বে বলিল অমুক অমুক আমার সাফাই সাক্ষী। তাহারা আসিল। এই বাটীতে স্থান হইল, অভিমনুোর ন্যায় ব্যূহ প্রবেশ আছে কিন্তু নির্গমন নাই। আসিয়াছ—বেশ থাক। গোপনে সাক্ষীদিগের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা হইত আসামীর সপক্ষে কি বিপক্ষে বলিবে। যদি আসামীর মানিত সাক্ষী হইয়া তাহারই বিপক্ষে বলিত তবে তৎক্ষণাৎ তাহার জবানবন্দী হইয়া যাইত ও সে খোলসা পাইয়া তাহাকে ঐ বাটীতেই রাখা হইত। বাহিরে লোকে সাক্ষীকে শিখাইয়া দিবে এই ব্যপদেশে তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখা হইত। কয়েদ বই কি? দেখা গিয়াছে এইরূপে তিন শত চারি শত সাফাই সাক্ষী ঐ বাটীতে তিন চারি মাস ধরিয়া বাস করিতেছে অথচ কোথাও যাইবার স্বাধীনতা নাই। মোকদ্দামাও উঠিতেছে না। যাহারা সত্যবাদী ছিল ভাবুন দেখি তাহাদের কি কষ্ট। যেমন তেমন লোকে আসামীর বিপক্ষে বলিতে রাজি হইয়া পড়িত আর অমনি খালাস পাইত এইরূপে ডিষ্টিলারী বাটীতে

সাফাই সাক্ষী থাকিত আর স্কুল বাটীতে আসামীর একরার করিবার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এখনও পুলিসে মারিয়া ধরিয়া যন্ত্রণা দিয়া কঠোর পীড়ন করিয়া একরার করান শুনিতে পাওয় যায়। হাবড়ার ঈশ্বর নাপিতের কথা অনেকেরই মনে আছে। পুলিসের নির্যাতনের বলে ঈশ্বর স্বীকার করে যে সে তাহার কন্যাকে খুন করিয়াছে। রক্ত মাখা কাপড়, মেয়ের ফুল, হার, গহনা প্রভৃতি আদালতে হাজির হয়। ঈশ্বর অবলীলাক্রমে স্বীকার করে যে সে খুন করিয়াছে এবং খুনের কারণও বলিয়া দেয়। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, কন্যা একদিন স্বশরীরে আসিয়া আদালত গৃহে উপস্থিত হয় ও বলে যে সে মরে নাই—বাঁচিয়া আছে, এবং তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম যখন এখনও এই-রূপ হইতেছে তখন সেকালে যে কিরূপ পীড়ন হইত তাহা অনুমানের কথা। অনুমানের কথা হইলেও কল্পনার কথা নহে। এই স্কুল বাটী হইতে সময়ে সময়ে ঘোর আর্তনাদ সমুত্থিত হইত। যাঁহারা তাহা শুনিয়াছেন এবং পীড়ন দেখিয়াছেন তাঁহারা এখনও অনেকে বাঁচিয়া আছেন। তবে সময়ের গতি, সময়ে সকলই হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিব। কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর। তিনি যে দিন পেন্‌শন প্রাপ্ত হন সেই দিন এক স্থানে একটি ভোজ হইয়াছিল পুলিসের বড় বাবু প্রাণ খুলিয়া সেই দিন আসামীকে একরার করাইবার জন্য কিরূপ পীড়ন করা হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এই স্থানে উল্লেখ্য ঃ

সরবৎ খাওয়ান ॥ অর্থাৎ প্রচ্ছাব করিয়া (অনেক সময়ে মুসলমানের প্রচ্ছাব) খাইতে দেওয়া, না খাইলে পীড়ন হয়। জোর করিয়া উহা মুখে দেওয়া হয়।

রুল দেওয়া ॥ গুহ্য দেশে রুল প্রবেশ করান।

শিল্পকার্য ॥ নখের ডগায় ছুঁচ প্রবেশ করান।

ডলন ॥ বুকে বাঁশ দিয়া ডলা।

দোলন ॥ দড়ী দিয়া আড়ায় টাঙগান। অনেক সময়ে নীচু দিকে মাথা।

কৃষ্ণচূড়া ॥ দুই হাত পেছন দিকে বাঁধা। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ হাত নীচু হইতে মাথার দিকে তোলা। দুঃসহ যন্ত্রণা।

অত্যাচার পূর্বে হইত এখনও হয়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে এসব অত্যাচার কমিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে কবির কথায় বলা যাইতে পারে ঃ

Their best conscience is
Not to keep it undone
But to keep it unknown.

বলিয়াছি এক এক দিন আফিস হইতে কঠোর মর্মভেদী চীৎকার ও আর্তনাদ নৈশ বায়ু তরঙ্গ আলোড়িত করিয়া সুদূরে চলিয়া যাইত। আধ মন করিয়া যে বেড়ী থাকিত তাহা ডবল করিয়া দেওয়া হইত। আর প্রহারের ত কথাই নাই। বাহিরের লোকে তবে দেখিতে পাইত না।

রাইলী সাহেবের আমলে আর একটি ব্যাপার হয়। তিনি অনেক ভদ্রলোককে ধরাইয়া

আনেন তিনি বলিতেন ডাকাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে থানিদার ধরিতে হইবে। যে সকল ভদ্র-লোককে থানিদার সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছিল তাহাদিগকে অনেক দিন আফিসে বাস করিতে হইয়াছিল। যতদূত জানা গিয়াছে একজনও ভদ্রলোক থানিদার হিসাবে দন্ড-প্রাপ্ত হন নাই। আরও কতকগুলি লোককে তিনি "ঘটক" বলিয়া ধরাইয়া আনেন। যাহারা দেখিয়া শুনিয়া ডাকাতী করিবার জন্য বাটী নির্দেশ করিয়া দিত এবং কত টাকার সম্পত্তি পাওয়া যাইতে পারে, বাড়ীতে কত লোক আছে, কোন দিক দিয়া প্রবেশের সুবিধা, কত লোক আসা উচিত, এই সমস্ত সংবাদ যাহারা ডাকাতদিগকে দিত তাহাদিগকে "ঘটক" বলিত। অনেক ঘটক দন্ড পাইয়াছিল। ওয়ার্ড সাহেবের আমলে একজন "ঘটকী" দন্ডিত হইয়া চিরজীবনের জন্য দ্বীপান্তরিতা হইয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও স্ত্রীলোকের নাম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি রাইলী সাহেব ধনীলোক ছিলেন। ইহার পিতা রাইলী এই হুগলীতেই সদর আলা ছিলেন এবং এখানে একটি বাটী নির্মাণ করেন। এই বাটীতে হুগলীতে কাছারী থাকিবার সময়ে রোডশেষ ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের আফিস ছিল চক-রাস্তার ধারে ঠিক বর্তমান ব্রাঞ্চ স্কুলের বিপরীত দিকে এই বাটী অবস্থিত। এখন এখানে জেনানা মিশন অবস্থিতি করিতেছেন। মিস্ রেক্স্ নাম্নী বিবি এই জেনানা মিশনের কর্ত্রী। অনেকগুলি বাঙ্গালী খৃষ্টান রমণী এই বাটীতে অধুনা বাস করেন।

হুগলীর সার্কিট হাউসে ডাকাইতী কমিশনারের যে সকল গোয়েন্দা ছিল তাহাদের মধ্যে সোনা ফকীর আর গুয়ে ফকীর বড় নামজাদা। ইহাদের কীর্তি ইংলন্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে হইলে লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাইতাম।

সোণা ও গুয়ে দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তবে ইহাদের বাড়ী মেমারী অঞ্চলে; মেমারী বর্ধমান জেলা এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেসনও আছে। কেহ কেহ বলেন হুগলীর দত্তপাড়া গ্রামে ফকীর যুগলের আবাস স্থান ছিল। যাহা হৌক সোণা ও গুয়ে অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় ছিল যেখানে সোণা সেইখানেই গুয়ে যেখানে গুয়ে সেইখানেই সোণা। যত ডাকাতী সব দুজনে করিত। ইহাদের এমন ক্ষমতা ছিল যে ইহাদের মধ্যে যে কেহ একক ডাকাতী করিতে পারিত। অনেক যত্নে অনেক চেষ্টায় অনেক মিথ্যা কথায় অনেক প্রবঞ্চনায় সোণা ও গুয়ে হুগলীর সার্কিট হাউসে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের প্রত্যেকের এক মন বেড়ী দেওয়া হইল—অর্থাৎ দুইটা আধ মন করিয়া বেড়ী একেবারে পরাণ হইল। একরার করিয়া দুইজনই গোয়েন্দা হইতে স্বীকৃত হইল। দুই জনেই গোয়েন্দাগিরি করিতে লাগিল। কিন্তু বনবিহঙ্গের মন কখনও কি পিঞ্জরের সহিত সৌহার্দ সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। সে প্রতিনিয়ত মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে সুযোগ পাইলেই পলাইয়া যায়। সোণা ও গুয়ে তাহাই করিল। অবলীলাক্রমে বেড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রহরীকে ফল বিশেষ প্রদর্শন করিয়া শুভক্ষণে গুয়ে ও সোণা হুগলীর সার্কিট হাউস পরিত্যাগ করিয়া গভীর নিশীথ সময়ে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল—কিন্তু কেহ আর খুঁজিয়া পাইল না। কতদিকে কত লোক ধাইল কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিল না। সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিল না। হুগলী

বর্ধমানের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান হইল কিন্তু ভস্মেঘৃত। যেন কোন মন্ত্র বলে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ছিল এই গেল আর নাই গেল কোথা কর্পূরের ন্যায় উপিয়া গেল নাকি?

কিন্তু বেশ বুঝা গেল সোণা ও গুয়ে নিশ্চেষ্ট নাই। চতুর্দিকে অসংখ্য ডাকাতী হইতে লাগিল। বুঝা গেল এ সকল গুয়ে ও সোণার কার্য। যদি বলেন কিসে বুঝিব এসকল গুয়ে ও সোণার কার্য? সোণা ও গুয়ে অশ্বিনীকুমারের ন্যায় কেহই ন্যূন ছিল না। এরা দুজনেই একলা ডাকাতী করিতে পারিত। যেখানে একলা ডাকাতী করিত সেখানে বাটীর সদর ও খিড়কীতে দুইটা (কখনও বা একদিকেই একটা) কলাগাছ পুঁতিয়া তাহার উপর জ্বলন্ত মশাল বসাইয়া দিয়া ডাকাতী করিত। কেহ কেহ বলিত যে কলাগাছের মানুষ করিত। সে যাহা হৌক অনেকগুলি ডাকাতীতে এইরূপ বাটীর কখনও একদিকে কখনও বাটীর দুইদিকে রোপিত কদলীবৃক্ষ দেখা গেল তাহাতে লোকে নিঃসংশয়ে অনুমান করিল যে সোণা গুয়ের হাতের কাজ আর কারও নয়। সুতরাং পুলিস পাহারা সোণা ও গুয়েকে ধরিবার জন্য নিতান্ত চেষ্টিত হইল। হইলে হবে কি কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া অনেক বছর কাটিয়া গেল। লোকে সোণা ও গুয়ের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। যখন সরকার বাহাদুর দেখিলেন যে আর তাহাদিগকে ধরিবার কোন উপায় নাই তখন ধরিতে পারিলে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে এই ঘোষণা করিয়া দিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

কাহার অদৃষ্ট নেমির কিরূপ আবর্তন হইবে তাহা কালই বসিয়া বসিয়া ঠিক করিতে-ছেন। লোকে যখন ভাবিল সোণা ও গুয়ে আর মর জগতে নাই তখন সহসা একদিন ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা তোলপাড় করিয়া এক খানা ছিপ বাজনা বাদ্য বাজাইয়া আসিয়া সার্কিট হাউসের সম্মুখে নঙ্গর করিল—ছিপে অনেক পুলিস পাহারা শান্ত্রি। সোণা ও গুয়ে মধ্য-স্থলে প্রত্যেকের পায়ে ডবল ডবল বেড়ী প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত করবাল ছয়জন করিয়া শিখ পাহারা। ইহাদের সঙ্গে আবার গুলিভরা বন্দুক ও তাহাতে সঙ্গিণ চড়ান। যদি বলেন এত উদ্যোগ কেন? তাহার উত্তরে বলিতে পারি কর্তার ইচ্ছা কর্ম—না পালায়। যাহা হৌক্ এপারে ওপারে নৌকায় ভাউলায় অনেক লোক দাঁড়াইল—সোণা ও গুয়েকে দেখিবার জন্য। উভয় তীরে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে—ও একটা মহাসমারোহ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ পরে বন্দী দুইজন ধীরে—অতি ধীরে এক এক করিয়া—তীরে আনিত হইল। অনেক লোক সমবেত হইয়া প্রহরী বেষ্টিত করিয়া সোণা ও গুয়েকে লইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল।

স্বয়ং কমিশনার সাহেব ও তদীয় সহধর্মিণী—উপর হইতে বন্দী অবতরণ ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। অধুনা সস্ত্রীক সশরীরে স্বয়ং আসিয়া কারাগারে বন্দীগণকে দেখিয়া গেলেন। বন্দীরা সেলাম করিয়া কৃতার্থ হইল। কিন্তু ঐ একটি মুসলমান চারি-দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে উনি কে—যেন চাপরাশির মত পোষাক। আর অত লোক উঁহাকে বেষ্টন করিয়াই বা রহিয়াছে কেন? উনি যেখানে যাইতেছেন অত লোক কেন উঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে? অত লোক অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া মুসলমান-মুখে কথামাত্র শুনিবার জন্য

এত উদ্‌গ্রীব হইয়াছে কেন? কেন? পাঠক, ছিপ্‌ছিপে লম্বা লীনুর চাপকান গায়, ডানদিকে চাপকানের বোতাম, কাণে একটু তুলা, ছাটা দাড়ী, ঈষৎ কুব্জ ব্যক্তিকে যে দেখিতেছেন উনিই আজিকার দিনে সাধারণের মধ্যস্থল। উনিই সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন। উনিই কৌশলে গোপনে—অতি সুকৌশলে সোণা ও গুয়েকে ধরিয়া দিয়াছেন, সরকার বাহাদুরের নিকট উহাঁর আজ বড় খাতির। কিরূপে সোণা ও গুয়েকে উনি ধরিলেন সেই কথা শুনিবার জন্য পঙ্গপালের ন্যায় লোক উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে—উনি কে? উনি মুরশিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের চাপরাশী।

যথা সময়ে বিচার হইল। লোকে লোকারণ্য। কত সাক্ষী সাবুদ আসিল; অনেক ডাকাতী মোকদ্দমার প্রমাণ দেওয়া হইল। সোণা ও গুয়ে বিচারে উভয়েই দোষী হইল। উভয়ের উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল। কয়েদী জুটে নাই বলিয়া সোণা ও গুয়ে বহু প্রহরী বেষ্টিত হইয়া সার্কিট হাউসে বাস করিতে লাগিল ও কবে আণ্ডামান দ্বীপে যাইবার জন্য জাহাজ ছাড়িবে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সোণা ও গুয়ে বলিল মুরশিদাবাদের চাপরাশির ধরার কথা মিথ্যা। তাহারা নিজেই ধরা দিয়াছে। তাহারা ঐ চাপরাশির বাটীতে ছিল সত্য বটে ও বিবাহসূত্রে সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সোণা ও গুয়ের হুলিয়া দেখিয়া যখন তীক্ষ্মবুদ্ধি চাপরাশী বুঝিতে পারিল যে ইহারাই তাহারা ও সহস্র মুদ্রার লোভ সামলাইতে পারিতেছে না এরূপ অবস্থা ঘটিল তখন সোণা ও গুয়ে এরূপ সদাসন্দেহ—সতর্ক জীবন-যাপন ভার সওয়া যায় না সিদ্ধান্ত করিয়া উভয়ে পরামর্শ করিয়া চাপরাশীকে আত্মপরিচয় প্রদান করিল। বলিল খবর দাওনা কিছু পাইবে—আমরা পলাইব না। তাই হইল—শেষের ব্যাপার পাঠক মহাশয় জানিয়াছেন।

দিন যায় থাকে না—সুখীরও যায় দুখীরও যায় ধনীরও যায় নির্ধনীরও যায়। অর্থ চিন্তাকারীরও দিন যায় পরমার্থ চিন্তাকারীরও দিন যায়। যে স্বকর্ণে ফাঁসীর হুকুম শুনিয়া আসিয়াছে তাহারও ত দিন যায়? সোণা ও গুয়েরও দিন গেল—নিরূপিত সংখ্যক কয়েদী জুটিল—তাহারা কলিকাতায় নীত হইল—তাহারা শুভদিনে শুভক্ষণে আণ্ডামান যাত্রী জাহাজে আরোহণ করিল। যথা সময়ে বাষ্পীয় পোত চীৎকার ও ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে আণ্ডামানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনদিন পরে সোণা ও গুয়ে আবার ভূমি দেখিল। এতক্ষণ দেখিতেছিল কেবল—জল—জল—জল। এখন ভূমি দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। কয়েদীরা যথাস্থানে নীত হইল।

সেখানে জেলে থাকিতে হয় না। সেখানে স্বচ্ছন্দ বিহার, কেবল গলায় একখানা করিয়া নম্বর ওয়ারী টিকিট থাকে। সন্ধ্যা বেলা গিয়া আফিসে হাজিরী দিয়া আসিতে হয় ও খাটিয়া খাইতে হয়। প্রথম প্রথম কিছুদিন সরকার বাহাদুর খাইতে দেন পরে আর খাইতে দেন না। কয়েদীকে নিজের উদরান্নের সংস্থান নিজেকে করিয়া লইতে হয়। ভূমি উর্বরা আক বাঁশের মত হয়। অনেক কয়েদী ভূমি লইয়া কর্ষণ করিয়া থাকে। খরচ অল্প চাসে অনেক কয়েদী অল্পদিনের মধ্যেই কিছু সংস্থান করিয়া লয়। সেখানে সব

পাড়া পাড়া ভাগ আছে। আমাদের যেমন বামুন পাড়া কায়েৎ পাড়া, সেখানে খুনপাড়া ডাকাৎ পাড়া, বিষ-খাওয়ানাদের পাড়া। যদি কোন পুরুষ কয়েদী কোন স্ত্রী কয়েদী দেখিয়া মন্মথশরে পীড়িত হয় তাহা হইলে অপর কোন বাধা না থাকিলে তাহাদের বিবাহসূত্রে মিলন হইতে পারে। মাজিস্ট্রেটকে জানাইতে হয় তিনি সবিশেষ তদন্ত করিয়া বিবাহ দেন ও পুরোহিতের কার্য করেন। ভদ্র লোক ও শিক্ষিত কয়েদীরা সেখানে ছাপাখানা স্কুল প্রভৃতিতে কার্য করিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে ৩ দিনে জাহাজ যায় আর মাড়োয়ারীরা ব্যবসা করে।

আণ্ডামান দ্বীপের অংশ মাত্র আবাদে আসিয়াছে। অংশ মাত্রে—অবশ্য উপকূল ভাগে —ইংরেজরা এই বন্দী বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন দ্বীপের অপরার্ধ ঘোর অন্ধকারময় জঙ্গল—বন্য হিংস্র জন্তু ও বন্য অসভ্য আদিম অধিবাসীর স্থান। এই সকল জন্তুগণ ও অধিবাসিগণ কখন কখনও ইংরাজ অধিকারে আসিয়া ঘোর অত্যাচার করিয়া থাকে।

আণ্ডামান এখন সভ্য—এখানে যাহা কিছু আছে—সেখানেও সেই সব বালক বিদ্যালয়. বালিকা বিদ্যালয় ডাক্তারখানা ইত্যাদি ইত্যাদি, বন্দীদের দুঃখ এই যে বিদেশ। সেটা কাহারও লাগে কাহারও লাগে না; কিন্তু অধিকাংশেরই প্রাণে লাগে। সোণা ও গুয়ের প্রাণে বড় লাগিয়াছিল। কোথা দেশ বাঙ্গলার বর্ধমান আর কোথা মহাসমুদ্রের মাঝখান আণ্ডামান দ্বীপ। এখানে কি করিয়া থাকা হইতে পারে? চারিদিকে কেবল অগাধ জল রাশি—যাই-ই বা কি করিয়া, গুয়ে ও সোণা সর্বদা পৃথক পৃথক মনে মনে এই চিন্তা করিত। এক দিন সোণা বলিল এমনি করিয়া কি এখানে থাকিতে হইবে?

গুয়ে বলিল—তাও কি কখন হয়?

সোণা—(লাফাইয়া উঠিয়া) তাই ত তোকে এত ভালবাসি—পালাতে রাজি ত?

গুয়ে—তার আর সন্দেহ কি?

সোণা—যদি প্রাণ যায়।

গুয়ে—গেলই।

সোণা তবে এক কাজ কর। খোরাকীর জন্য যে চাল পাস আজ থেকে এক মুঠা করে লুকিয়ে রাখ্। আমিও রাখ্‌ব।

ক্রমে ক্রমে বন্দীদ্বয়ের আশা অঙ্কুরিত হইয়া একটি তরুণ বৃক্ষে পরিণত হইল। তখন আর কাল বিলম্ব ভাল লাগিতে লাগিল না। সোণা ও গুয়ে যখন দেখিল যথেষ্ট চাল জমিয়াছে—অর্থাৎ ১০ দিনের মত চলিতে পারে—তখন উভয়ে জয় কালী বলিয়া সাগরে ঝম্প দিল। দুইজন ভেতো বাঙ্গালী সেই অগাধ মহাসমুদ্রে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কেবল জন্মভূমির প্রেমে মজিয়া ঝাঁপ দিল।

কতদূর সন্তরণ করিয়া গেলে পর ভগবান, বন্দীদ্বয়ের যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য করিলেন। বন্দীদ্বয় দেখিল একখণ্ড কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছে। সোণা ও গুয়ে উভয়েই সেই কাষ্ঠ খণ্ড ধরিয়া ঘোটকারোহণের ন্যায় চাপিল। সোণা বলিল, ভাই গুয়ে মা কালীর কি দয়া—এখন একমাস সমুদ্রে ভাসিতে পারিব।

গুয়ে বলিল—যখন অদৃষ্টে কাঠ লেগেছে তখন একমাস জলে ভাসিতে হবে না জমীও শীঘ্র লাগ্‌বে।

এইরূপ গুয়ে ও সোণা মাত্র সেই কাষ্ঠ খণ্ড অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া চলিল। কখনও ডুবিতেছে কখনও ভাসিতেছে। ক্ষুধার সময় কাপড়ে বাঁধা চাল হইতে দুটা চিবাইতেছে। জল নাই যে খাইবে। এইরূপ প্রাণের আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিল। যখন দিনের উপর দিন হু হু করিয়া যাইতে লাগিল তখন উভয়ে ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল তখন উভয়েরই আশা ভরসা একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। সোণা বলিল মরণত নিকট কি করিবি?

গুয়ে—পশ্চিম পাড়ার চাটুয্যে গিন্নি বলেন তপ জপ কর কি—মরতে জান্‌লে হয়। শুনিছি মরবার সময় একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ কর্‌লে সগ্‌গ হয়। মরি মারি করে তাই কর্‌ব।

সোণা—দেখিস যেন ভুলিস না। আমিও ভট্‌চায্যি মশায়ের কাছে তাই শুনিচি। তিনি বল্‌তেন—আহা তিনি দেহ রেখেছেন—একবার দুগ্‌গা নাম কল্লে সব বিপদ কেটে যায়।

এই কথাবার্তার পর উভয়েই ভক্তিভাবে দুগ্‌গা কালী কালী হরিবোল বলিতে লাগিল। ইহারা অনেক পণ্ডিত অপেক্ষা ভাল, কালী কৃষ্ণের ভেদ করিল না। যাহা হোক উভয়ে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল। উভয়ে মনে মনে ভগবানের নাম করিতেছে—এটা বেশ বুঝা গেল। সপ্তম দিবসে যখন ভগবান মরীচীমালী অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিতেছিলেন তখন সোণা ও গুয়ের পূর্বোক্ত প্রকার কথোপকথন হইতেছিল। সেই দিন রজনীযোগে উভয়েই জাগরিত ছিল। সহসা সোণা গুয়ের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল "এ কিরে পায়ে পায়ে যে কি ঠেকিতেছে--কোন জন্তু টন্তু নাকি রে।" সোণা ঢ্যাঙ্গা ছিল গুয়ে বেঁটে, সুতরাং টের পায় নাই।

গুয়ে—খুব সাবধান পা-টা না হয় তুলে নে।

সোণা—এইবার বুঝি গেলুম। পা তুল্‌বো কি করে পোন্দ থেকে যে কাঠ বেরিয়ে যাবে।

তখন গুয়ে একটু চেষ্টা করিয়া পা বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ড্যাঙ্গা ড্যাঙ্গা চড়া চড়া। জয় কালী জয় হরি শালা ভগবানের নাম করছিলি আর কি ফস্‌কায়? এ জমী তবে মাঝ চড়া কি কিনারা বলা যায় না।

সোণা—তুই শালা তবে এবার টোল করিস। আমি কর্তা ভজ্‌ব।

যাহা হোক সোণা উদ্বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া নামিয়া চলিয়া দেখিল সত্যই মাটী পাইয়াছে। তখন উভয়ে কাষ্ঠ খণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া তারস্বরে গান ধরিল।

গড়েছে কোন্‌ কারিকর নৌকা খানি।
পরণে তার গুলবসান ঢাকাই সাড়ী॥

খানিক ক্ষণ গাহিয়া গুয়ে বলিল আমি একটা ভাল গাব—

নারী নাশক বিশ্বাস ঘাতক পুরুষ কঠিন প্রাণ

সোণা—দুঃ শালা। এখন কি ও গান গায়।

যাহা হোক উদ্দাম আনন্দের তরঙ্গে এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে সোণা ও গুয়ে রাত কাটাইয়াছিল। ফরসা হইলে দেখিল দূরে উপকূল—প্রায় দুই ক্রোশ হইবে, লক্ষ্য করিয়া চলিয়া দুইজনে তীরে উঠিল। দেখে এক নিবিড় অরণ্য। সেই অরণ্যে ফলমূল খাইয়া কয়েক রাত্রি গাছে গাছে বাস করিয়া দুজনে ক্রমে লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল মগের দেশ। বনভূমি পার হইলে সহসা সোণা বলিল—দেখ্ ভাই গুয়ে আমরা দুজনে আর একত্রে থাকিব না। দুজনে একত্রে থাকিয়াই যত বিপদ—মনে হয় একেলা হইলে ধরা পড়িতাম না। আমার ইচ্ছা এই মগের মুলুকে তুমি এক দিকে যাও আমি অন্য দিকে যাই যার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে মন্দা একত্রে আর থাকিব না।

গুয়ের মাথায় বজ্রপাত হইল। সোণার কথাও যা কাজও তা। কত বুঝাইল রাগ করিল পায়ে ধরিয়া কাঁদিল। শেষে বুঝাইল দুজনে এক সঙ্গে না হইলে তারা কখনই আণ্ডামান হইতে পলাইতে পারিত না। গুয়ে একবার মর্ম্মভেদী চেষ্টা করিল।

কিন্তু সোণা অচল অটল। একবার গুয়েকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বন মধ্যে পলায়ন করিল। কে জানে সে কি মনে করিয়াছিল।

গুয়েকে বড়ই লাগিল। সে একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িল। ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই যে সোণার মনে এতটা আছে। শেষে সেও কোমর বাঁধিল দেখিল মজুর বড় আক্রা। গুয়ের শরীরে যথেষ্ট বল ছিল। মজুরি আরম্ভ করিল। কাজ করিত—ফাঁকি দিত না, মগেরা দেশে এরূপ মজুর পায় না কেহ আপনার মত করিয়া কাজ করে না। সুতরাং গুয়ের ভারী পসার হইয়া পড়িল। সকলেই গুয়েকে খুঁজিতে লাগিল। নীলাম ডাক আরম্ভ হইল, গুয়েরও হু হু করিয়া পয়সা বাড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গুয়ের হাতে অনেকগুলি টাকা জমিয়া গেল। তখন দেশে আসিবার ইচ্ছা হইল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গুয়ে এক দিন রেঙ্গুণ অভিমুখে যাত্রা করিল। ৩।৪ দিন ক্রমাগত হাঁটিয়া রেঙ্গুণে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে অনেক বাঙ্গালী দেখিল। সেখানে দিন কত রহিল। এক একবার মনে করিল এই খানেই মগের মুলুকে বিবাহ করিয়া থাকিয়া যাই। কিন্তু বাটীর সেই মুখ খানি যখন বার বার মনে পড়িল—তখন সে বলিয়া উঠিল—সোণা বেটা বুঝিবে কি? তার যে ও কর্ম্ম নাই। তাকে ও ছেলেটাকে দেখিতে গিয়ে যদি ধরাও পড়ি—ফের যদি আণ্ডামানে আসিতে হয় সেও ভাল তবু ত আমার মনুষ্যত্ব বজায় থাকিবে।

কুক্ষণে গুয়ের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল। কুক্ষণে গুয়ে রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া দেশের দিকে পা বাড়াইল। ক্রমাগত উত্তর দিকে গিয়া ডাঙ্গা পথে গুয়ে অনেক বন জঙ্গল দেশ দেশান্তর এড়াইয়া ত্রিহুতে আসিয়া উপনীত হইল। দিন কত বিশ্রাম করিবার জন্য গুয়ে সেখানে চাকরী স্বীকার করিল। হুগলীর পুলিস কি উপলক্ষে সেখানে গিয়াছিল। গুয়েকে দেখিয়া সে চিনিতে পারে। এ দিকে আণ্ডামান হইতে সোণা ও গুয়ে পলাইলে সে কথা দেশের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল ও হুলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

সোণা ও গুয়ে বা তাহাদের কাহাকেও ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার পাইবে একথাও ঘোষিত হইয়াছিল। সুতরাং হুগলীর পুলিসের লোক কায়দা করিয়া গুয়েকে গ্রেপ্তার করিল।

গুয়ে আবার হুগলীতে আসিল সঙ্গীন চড়ান খোলা তরবারির পাহারায় তাহাকে রাখা হইল। গুয়ে এই অবস্থায় নিজমুখে তাহার পলাইবার কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল। যাহা হোক বিচার হইয়া পুনরায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইল। আবার গুয়ে আণ্ডামানে প্রেরিত হইল। আবার জাহাজে করিয়া গুয়ে আণ্ডামানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যদি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সোণা ও গুয়ের জন্ম হইত তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাহাদের জীবন্যচরিত লেখা হইত; কিন্তু আমাদের দেশের এরূপ সাহস, বীরত্ব, নির্ভীকতা, কার্য-সহিষ্ণুতা অসাধ্য সাধন ক্ষমতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উদাহরণ স্থল কত শত মানবের কীর্তি একেবারে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর অনেক গুণ আছে—নাই কেবল একতা। ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে বাঙ্গালীর আবার মঙ্গল হইতে পারে। আমাদের বিশ্বাস ধর্মাবলম্বন করিলে বাঙ্গালীর নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। ধর্ম যে ভারতের প্রাণ। (৩৩)

হুগলী জেলার মধ্যে হরিপাল ও সিঙ্গুর ডাকাতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং উক্ত স্থানের জমিদারগণ ডাকাতদের প্রশ্রয় দিত। তাই ব্যাকল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন Landowners who too often are more interested in sheltering the criminal than in giving him up to justice.

ডাকাতী কমিশনের একটি ডাক্তারখানা ছিল। শ্রীশিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারখানার কার্য করিবার জন্য একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত ছিল, তাহার নাম সেখ মোবারেক। এই মোবারেক চুঁচুড়ার মাধব দত্তের বাটীর ডাকাতীর জন্য ধরা পড়ে, পরে দণ্ডিত হইয়া গোয়েন্দা হয়। মোবারক মাধব দত্তের বাড়ীর ডাকাতীর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিল।

"আমরা বারাকপুরের নিকট টিটাগড়ের রাজু বৈষ্ণবের দলের। ঘটকের মুখে সংবাদ পাইলাম যে চুঁচুড়ার মাধব দত্ত কলিকাতার তিন চারিটি আফিসের মুচ্ছুদ্দী আর বড় ধনী। ইহাও সংবাদ হইল যে মাধব দত্তের গঙ্গাতীরের বাটীর খুব নিকটেই গোরাবারিক আর সেখানে গোরা সৈন্য আছে। দলপতি বলিলেন গোরা আছে, গোরা আছে—তাহাতে কি হইয়াছে? ডাকাতির সংবাদ পঁহুছিলে বিউগেল বাজিবে, পোষাক পরিবার হুকুম হইবে, সাজিবে তার পর কাওয়াজ করিবার পর, মার্চ করিবার হুকুম হইবে, ততক্ষণ আমরা কাজ সাবাড় করিয়া চলিয়া আসিব। ডাকাতী করাই স্থির হইল। দুই খানা নৌকা করিয়া আমরা চুঁচুড়ায় আসিলাম। তীরে উঠিয়া সন্তর্পণে বাটীর ধারে গিয়া বাঁশ পুতিলাম। বাঁশ আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। সেই বাঁশ দিয়া একে একে আমরা দোতালার ছাদে উঠিলাম। পরে চিলের দরজা ভাঙ্গিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিয়া দেখিলাম দোতালায় মাধব দত্ত ও একটি স্ত্রীলোক শয্যায় নিদ্রিত আছে। আমরা দোর ভাঙ্গিয়া একেবারে

ঘরে গিয়া মাধব দত্ত ও স্ত্রীলোকটিকে বাঁধিয়া ফেলিলাম। পরে নীচে আসিয়া দেখিলাম দেউড়িতে একজন লোক পাহারা দিতেছে ও সেখানে ৮।১০ জন পাঠান নিদ্রিত আছে। আমরা পাহারাওয়ালাকে চীৎকার করিলে কাটিয়া ফেলিব বলিলাম। সে কিন্তু আমাদের ধরিবার পূর্বে পলাইয়া গেল, আমরা পাঠান গুলাকে একে একে বাঁধিয়া ফেলিলাম। তাহারা যোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিল—পেটের জন্য আসিয়াছি, প্রাণে মারিও না। আমরাও অভয় দিলাম বলিলাম চেঁচাইলে কাটিব নহিলে কোন ভয় নাই। মনে হইয়াছিল পাঠানেরা খুব লড়িবে কিন্তু একজনও লড়িল না--ভেড়ার দলের মত কার্য করিল। আমরা বুঝিলাম সামর্থ্যই মূলাধার। আমি বাহিরে গিয়া সদর রাস্তায় দাড়াইয়া ঢাল তরবাল লইয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। চক্ষুর নিমিষে এই সব কার্য হইয়া গেল। বাড়ীতে লুট চলিতে লাগিল। আমি যখন রাস্তায় এদিকে ওদিকে ছুটিয়া ঘাটি দিতেছি তখন একজন অশ্বারোহী গোরা আমার দিকে আসিল। আমি বুঝিলাম যে পলাতক দরওয়ানটা বারিকে খবর দিয়াছে আর তাই সার্জন আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি খাটাইলাম ও সাহেব আসিলে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব বলিলেন, খবর কি? আমি বলিলাম খোদাবন্দ সব ঠিক হ্যায়। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গোল হইতেছে বোধ হয় লোক পড়িয়াছে। সাহেব আমাকে চৌকীদার মনে করিয়াছিলেন। আমার মুখে এই কথা শুনিয়া সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া তরবাল খানি কোষে পুরিয়া—বারিকের দিকে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "খুব হুঁশিয়ার"। আমিও যথারীতি ঘাটি দিতে আরম্ভ করিলাম। অধিক্ষণ থাকা আর নিরাপদ নহে বুঝিয়া সঙ্কেত করিলাম। ইতিমধ্যে কার্যও শেষ হইয়াছিল আমরা বাঁশটি পর্যন্ত তুলিয়া লইয়া গিয়া নৌকায় চাপিলাম। নৌকা ছাড়িয়া দিল। বলিতে ভুলিয়াছি বারিকে বিউগেল শব্দ পাইয়াছি আমি সঙ্কেত করিয়া দিলাম। আমরা যখন গঙ্গার মাঝখানটাও ছাড়াইয়া গিয়াছি তখন দেখিলাম একদল সৈন্য গঙ্গার দিকে আসিতেছে। তাহারা গঙ্গার কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইল ও একবারে সকলে আওয়াজ করিল। বার দুই তিন ঐরূপ আওয়াজ করিল গুলিগুলা জলে পড়িল, আমাদের কাছেও আসিল না। আমরা নিরাপদে চলিয়া গেলাম। তারপর বাঁকুড়ায় একজন ধরা পড়িয়া একরার করায় আমরা জনকতক লোক ধরা পড়ি। বৃদ্ধ রাজুও ধরা পড়িল। আমাদের সব মেয়াদ হইল। আমি ও কয়েক জন গোয়েন্দা হইলাম। রাজুর কষ্ট দেখিয়া আমার প্রাণ বড় কাঁদিত তাহাকেও একরার করিয়া গোয়েন্দা হইতে বলিলাম। শেষে ডাক্তার বাবুকে ধরিয়া বড় সাহেবকে বলিয়া রাজুকে এক দিন ডাক্তার বাবুর বাড়ী লইয়া গেলাম। ডাক্তার বাবু কত বলিলেন শেষে রাজু বলিল "আপনি দেবতা আপনি ও আজ্ঞাটি করিবেন না। আমার ৭০ বছর বয়স হইয়াছে আর কটা দিনই বা বাঁচিব। যদি বাঁচি দেখিতে দেখিতে আর ১২টা বছর কাটিয়া যাইবে। একরার করিয়া আর কতকগুলা গৃহস্থের সর্বনাশ কেন করিব। আমি বেশ আছি কোন কষ্ট নাই।" আমি ও ডাক্তার বাবু শুনিয়া অবাক। বুঝিলাম রাজু দলপতি হইবার উপযুক্ত লোক।

যাহা হউক 'ডাকাতি দমন বিভাগের' কমিশনারের চেষ্টায় পূর্বোক্ত জেলাগুলিতে

১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ডাকাতির সংখ্যা যে অনেক হ্রাস পায়, তাহা নিম্নের পরবর্তী আট বৎসরের তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

বৎসর				ডাকাতির সংখ্যা
১৮৫২	...	...	...	৫২০
১৮৫৬	...	...	...	২৯২
১৮৫৮	...	...	...	১৯০
১৮৫৯	...	...	...	১৭১

বহু চেষ্টার পর, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে জলপথে এবং স্থলপথে ডাকাতি আস্তে আস্তে এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়; বঙ্গের বহু প্রসিদ্ধ ডাকাত ধরা পড়ে এবং বহু ধনী ব্যক্তি ও জমিদার অতঃপর 'ভদ্র' সাজিয়া সমাজে শান্ত হইয়া পূর্ব অর্জিত লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ করিতে লাগিলেন, দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল; বঙ্গবাসীর ধন প্রাণ সরকারের দয়ায় নিরাপদ হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশের কি ইহাতে মঙ্গল হইয়াছে? সর্বদেশে সর্ব-জাতির মধ্যে একশ্রেণীর দুর্দান্ত ব্যক্তি এইরূপ দুর্দমনীয় কার্য চিরকাল করিয়া থাকে; শান্তিপ্রিয় কোন সমাজ বা রাষ্ট্র তাহা পছন্দ করেন না। কিন্তু স্বাধীন দেশ এই সমস্ত দুর্দান্ত ব্যক্তিগণকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া দেশরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া থাকে, যুদ্ধ বিগ্রহের সময় হাসিমুখে মরণ বরণ করিয়া বীর (Martyr) বলিয়া আখ্যাত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরাধীন বঙ্গদেশে বাঙ্গালী জাতিকে সুখে শান্তিতে বসবাস করাইবার জন্য বিদেশী সরকার ডাকাতি দমন করিয়া আপাতঃ দৃষ্টিতে দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেও, বাঙ্গালী জাতির যে মেরুদণ্ড সেই সময় হইতেই সরকার বাহাদুর ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমেরিকার চতুস্পার্শের জলদস্যুগণকে যুক্তরাষ্ট্র যে ভাবে রাষ্ট্রের কাজে লাগাইয়াছেন, আজ যদি বঙ্গের সেই সমস্ত বীর সাহসী সন্তানগণকে, যাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া ইংরাজ পক্ষের সশস্ত্র সিপাহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া ছিল, তাহাদিগকে প্রকৃত দেশের কাজে লাগান যাইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের রূপ অন্যরকম হইত এবং বাঙ্গালী জাতিও আজ একটি 'সামরিক জাতি'তে পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গলার ক্ষাত্রশক্তিকে বেয়নেট দ্বারা পঙ্গু করাতে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাতি চিরতরে বন্ধ হইয়াছে বটে; কিন্তু দেশের তাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হইয়াছে কি-না, তাহা আজ আমরা ঠিক বুঝিতে পারিব না; আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই গুরুতর বিষয়টির মীমাংসা করিবেন।

॥ টিপ ছাপ ॥

স্যার উইলিয়াম হারসেল নামে একজন আই-সি-এস হুগলী জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকা-কালে টিপসহি বা টিপছাপ লইবার এক বৈজ্ঞানিকরূপ সরকারের কাছে রাজকীয় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। তারপর দলিলপত্র রেজিস্ট্রিতে; সরকারী নন্‌গেজেটেড্ অফিসারদের পরিচয়পত্রে, তীর্থযাত্রীদের সংক্রামক রোগ প্রতিষেধের প্রমাণপত্রে আঙ্গুলের টিপছাপ লইবার প্রথা প্রযুক্ত হইয়াছে।

টিপছাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণার ফলে বর্তমান যুগে অপরাধী নির্ধারণের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এক ব্যক্তির আঙ্গুলের রেখার সঙ্গে অপর ব্যক্তির আঙ্গুলের রেখা সাধারণতঃ মেলে না। কোন ব্যক্তির শিশুকাল হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত এই রেখাগুলির আয়তন ভিন্ন অন্য কোন পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর পর চামড়া শিথিল হইয়া যাইলে রেখা অস্পষ্ট হয়।

চোর ডাকাত প্রভৃতি অপরাধীগণের এই টিপসহি প্রবর্তিত হইবার পর আর পলাইবার সুবিধা নাই। একবার পলাইলে যত বৎসর হউক না কেন, যদি তাহার পূর্বে অপরাধের জন্য টিপসহি থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্য ধরা যাইবে।

অপরাধীর টিপছাপ লইয়া যেমন নানা গবেষণা হইয়াছে সেই রকম সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের টিপছাপ লইয়াও নানা রকম তুলনামূলক গবেষণা হইয়াছে। এই সব গবেষণার ফলে অনেকে মনে করেন যে, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হাতের রেখায় ধরা পড়ে এবং সেই জন্য তাহার সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করাও সম্ভব। তবে এই গবেষণা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত তা বিচার সাপেক্ষ।

স্যার ফ্রান্সিস গলটন্ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশের টিপছাপ লইবার প্রথা সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৮২৩ অব্দে পারকেনবি আঙ্গুলের ছাপ সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় জার্মাণীতে ব্রেষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যমূলক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

টিপছাপ দেওয়া সম্বন্ধে কোন ধর্মীয় বিধিনিষেধ নাই। কোন সম্প্রদায়ের লোকই টিপ দেওয়ার আপত্তি করেন না। তবে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মহিলা নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা টিপছাপ লইতে দেন না। মুসলমান মহিলাদেরও এই রকম সংস্কার আছে।

কিন্তু ধর্মের বাধা না থাকিলেও টিপ দেওয়ার মধ্যে মান সম্মানের প্রশ্ন জড়িত আছে। ইংরেজ আমলে নিয়ম ছিল শ্বেতাঙ্গদের টিপছাপ নিষ্প্রয়োজন।
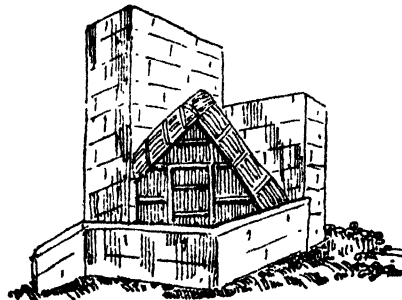
॥ সংকেত সূত্র ॥

১ ইণ্ডিকা (১ম খণ্ড)—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
২ Macrindle's Ancient India as described by Magasthenes.
৩ নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ রায়
৪, ৫ History of Bengal Bihar & Orissa under British Rule —L. S. S. O'Malley.
৬ Hindu Manners, Customs and Ceremonies—J. A. Dubais.
৭ The Administration of the East India Company—John Kaye.
৮ ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৯ পাট-পর্যটন—অভিরাম দাস (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা)
১০ বহু বিবাহ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১১, ১২ শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীবৃন্দাবন দাস
১৩ Bengal under the Lieutenant Governors—C. E. Buckland.
১৪ The Annals of Rural Bengal.
১৫ On the Banks of Bhagirathi—J. A. Long (Calcutta Review).
১৬ Half hour in the Far East.
১৭ Bengal under the Lieutenant Governors—C. E. Buckland. *
১৮ ধর্মপুরাণ—ময়ূর ভট্ট
১৯ দেবগণের মর্তে আগমন—দুর্গাচরণ রায়
২০ History of Bengal Bihar & Orissa under British Rule— L. S. S. O'Malley.
২১ A note on slaves and slavery in old Chandernagore—Bengal Past and Present, Vol VI
২২ Selections from the Calcutta: Gazette—Seton Kerr and Administration of the Hooghly District—Toynbee
২৩ Encyclopedia Britannica.
২৪ Stewart's History of Bengal
২৫ Slavery Days in old Calcutta—Bengal Past and Present, Vol II
২৬ Schedule of taxes for 1732, a maunscript in the French Government archives.
২৭ Anandaranga Pillai's Diary—Madras Govt : Publication. Vol I
২৮ Selections from the Calcutta Gazette.—Seton Kerr. 1865.
২৯, ৩০ Hooghly District Gazetteer.
৩১ Toynbee's Adminstration of the Hooghly District.
৩২ Hunter's Annals of Rural Bengal
৩৩ হুগলীর কথা—মুনীন্দ্র দেবরায়; পূর্ণিমা, ১৩১০

*ইহা ভ্রমক্রমে ১৭ পরিবর্তে ২৫২ পৃষ্ঠায় ১৪ বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা
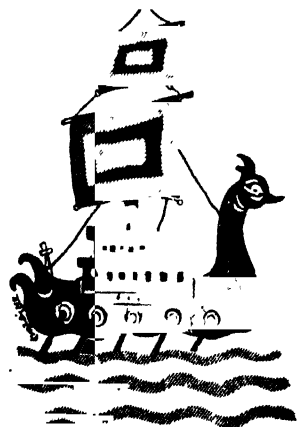
প্রাচীন কালে বঙ্গদেশের সর্বত্র জলপথেই যাতায়াত চলিত, কারণ ভাল রাস্তা তৎকালে বিশেষ ছিল না বলিলেই চলে। হুগলী জেলায় রাণী অহল্যা বাঈ রোড ও শের সাহ প্রবর্তিত গ্রাণ্ড-ট্রাণ্ড রোড ব্যতীত আর কোন উল্লেখজনক ভাল রাস্তার সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য সেকালে যে সকল গ্রাম্য পথ ছিল, তাহাকে ঠিক রাস্তা বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

শের সাহ কর্তৃক নির্মিত গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও প্রধান রাস্তা। এই রাস্তা তেত্রিশ মাইল হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত। প্রত্যহ পনেরহাজার মোটর গাড়ি এই রাস্তায় যাতায়াত করে বলিয়া ভারত সরকার এই প্রাচীন রাস্তাটি চওড়া করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই রাস্তায় প্রতি মিনিটে তিনখানি করিয়া গড়ে মোটরগাড়ি চলাচল করে। হুগলী জেলার যাবতীয় রাস্তার বিবরণ ৮৯-৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে উহার পুনঃরুল্লেখ নিঃপ্রয়োজন। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাস্তা উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক সেন্সাসের যে বিবরণ ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখের 'ষ্টেটসম্যান' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

THREE CARS USE G. T. ROAD EVERY MINUTE—Over 15,000 motor vehicles daily moved along the Grand Trunk Road in both directions, that is, roughly three per minute, according to a traffic of the Road Development Department, Government of West Bengal, during the past three days at Uttarpara, Hooghly.

॥ রেলপথ ॥

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে মিঃ রোলাণ্ড ষ্টিফেনসন নামক একজন ইং-রাজ গভর্ণমেন্টের নিকট যাতায়াতের সুবিধার্থে সর্বত্র রেলগাড়ি চালাইবার জন্য এক আবেদন

করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত একটি সার্ভে করেন এবং লণ্ডনে যাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে রেলগাড়ি চালাইবার জন্য তিনি আদেশ-প্রাপ্ত হন; কিন্তু বলা বাহুল্য, সরকার বাহাদুর ইহার সাফল্য সম্বন্ধে তখন বিশেষ সন্দিহান ছিলেন।

ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণ সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসি বিলাতে যে লিপি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ১২৬০ সালের ১২ই আশ্বিনের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এইরূপঃ

ভারতবর্ষে রেইলরোড নির্মাণ—ভারতবর্ষে রেইলরোড নির্মাণ বিষয়ে আমারদিগের গবর্ণর জেনারেল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব যে মিনিউড অর্থাৎ লিপি লিখিয়া বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সংপ্রতি তাহা ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তিনি একেবারে মান্দ্রাজ বোম্বাই ও আগ্রা প্রভৃতি সকল স্থানে রেইলরোড নির্মাণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু কলিকাতা হইতে যে প্রশস্ত রাস্তা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে, ইহাই প্রধান বর্ত্ম হইবেক, এবং অন্যান্য স্থানে ইহার শাখা সকল বিস্তারিত থাকিবে। কলাগেছিয়া হইতে কলিকাতা পর্যন্ত এক রেইলরোড হইবার যে কল্পনা হইয়াছিল, লার্ড সাহেব তাহা নির্মাণ করা অনাবশ্যক বলিয়াছেন।

রেলওয়ে, ডাক ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তনের জন্য লর্ড ডালহৌসিকে **"সামাজিক উন্নয়নের তিনটি বৃহৎ যন্ত্র"** বলিয়া অভিহিত করা হয়। Dalhousie himself regarded as three great engines of social improvement. সরকারী গ্রন্থে ওম্যালি সাহেব হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হুগলী পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

> The first section of the East Indian Railway (from Howrah to Hooghly) was opened in 1854 and was extended to Raniganj next year. Further progress was interrupted by the Mutiny, but by 1862 the East Indian Railway has been carried as far as Benares.

জর্জ টার্ণবুল নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার রেলপথ নির্মাণে ষ্টিফেনসন সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। সেই সময় রেলপথের জন্য জমি-সংগ্রহের বিশেষ কোন আইন না থাকায়, তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়; কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলগাড়ি চালাইবার জন্য উপযুক্ত রেলপথ প্রস্তুত হয়; কিন্তু ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর ইহার মধ্যে পড়ায়, ফরাসী সরকারের সহিত লেখালেখি করিয়া তাহাদের মত পাইতে প্রায় তিন বৎসর দেরী হইয়া যায়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিলাত হইতে 'ফেয়ারী-কুইন' নামক প্রথম ইঞ্জিনখানি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে এবং ২৮শে জুন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ হজসন বঙ্গদেশের প্রথম রেলগাড়ি হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত চল্লিশ মাইল রাস্তায় প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে রেলগাড়ি চলিতে সুরু হয়। তৎপর ১লা সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া পর্যন্ত এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী হাওড়া হইতে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ১২০ মাইল রাস্তায় নিয়মিত ভাবে রেল-চলাচল আরম্ভ হয়। 'ফেয়ারী-কুইন' নামক ইঞ্জিনখানি বহু বৎসর যাবৎ হাওড়া ষ্টেশনে প্রদর্শনার্থে রক্ষিত ছিল; বর্তমানে ইহা লিলুয়ায় আছে।

প্রথম যে দিন রেলগাড়ি চলিয়াছিল, সে দিন ইহা দেখিবার জন্য যে কিরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। লাইনের দুই পার্শে অগণিত নরনারী শংখধ্বনি করিয়া রেলগাড়িকে অভ্যর্থনা করে এবং বিশেষ জাঁকজমকের সহিত উক্ত কার্য সমাধা হয়।

॥ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ॥

এই জেলার মধ্যে মিঃ এ, এল, রায় প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে" নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় পঞ্চাশ মাইল রেলপথ ছিল, কিন্তু ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে উহা উঠিয়া যায়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই রেলপথ প্রথম খোলা হয়। এইরূপ দেশীয় প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই রেলপথ বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় লোকের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। এই রেলপথ প্রতিষ্ঠার পর বাকল্যান্ড সাহেব লিখিয়াছিলেন :

But the most interesting project was the Tarakeswar-Magra Steam Tramway a light railway $30\frac{1}{4}$ miles long, from Tarakeswar-Magra, both in the Hooghly district, to be undertaken by the Bengal Provincial Railway Company Limited. It was the first undertaking of its kind, to be solely conducted under native management ; it was constructed, but failed to pay as expected.

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের তারকেশ্বর হইতে বসুয়া পর্যন্ত বার মাইল এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ, বসুয়া হইতে মগরা পর্যন্ত প্রায় উনিশ মাইল রেলপথে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া সর্বপ্রথম এই বাঙ্গালী পরিচালিত রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ী যাতায়াত করে। অতঃপর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে তৎকালীন প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাঙ্গলা দেশের ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট এই লাইন আনুষ্ঠানিক ভাবে খুলিয়া দেন। ক্রমশঃ এই কোম্পানী মগরা হইতে ত্রিবেণী এবং দশঘরা হইতে জামালপুর পর্যন্ত শাখা বর্দ্ধিত করে। এই কোম্পানী বাঙ্গালীর একটি গৌরবের বস্তু ছিল। হীরেন্দ্রনাথ রায় এই রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থাপনায় এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইলেও আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় ডিরেক্টারগণ ইহা বন্ধ করিয়া দেন। নিম্নে এই জেলার মধ্যস্থিত রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির নাম প্রদত্ত হইল :

তারকেশ্বর হইতে ত্রিবেণী—তারকেশ্বর, গোপীনগর, দশঘরা, কানানদী, ধনিয়াখালি, রুদ্রাণী, মাজনান, ভাস্তাড়া, মৌলিক, গোয়াই-আমড়া, দ্বারবাসিনী, মহানাদ, হালুসাই, সুলতানগাছা, মগরাগঞ্জ, মগরা, ত্রিবেণী, (মোট রেলপথ ৩৩ মাইল; বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল

রেলওয়ে কর্তৃক ইহা পরিচালিত হইত. কিন্তু বর্তমানে এই রেলপথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।)

মেন লাইন—হাওড়া, লিলুয়া, বেলুড়, বালি, * উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ব্যাণ্ডেল, আদি-সপ্তগ্রাম, মগরা তালাণ্ডু, খন্যান, পাণ্ডুয়া সিমলাগড়, বৈঁচীগ্রাম ওবৈঁচী। (৪৪ মাইল)

নিউ কর্ড লাইন—হাওড়া, লিলুয়া, বেলুড়,* বেলানগর, ডানকুনী, গোবরা, জনাইরোড, বেগমপুর, বারুইপাড়া, মির্জাপুর-বাঁকিপুর, কামারকুণ্ডু, মধুসূদনপুর, চন্দনপুর, পোড়া-বাজার, বেলমুড়ী, হাজিগড়, গুড়ুপ (৪৩ মাইল)।

তারকেশ্বর লাইন—সেওড়াফুলি হইতে দিয়াড়া, নসিবপুর, সিংগুর, কামারকুণ্ডু, নালিকুল, হরিপাল, কৈঁকালা, বাহিরখণ্ড, লোকনাথ, তারকেশ্বর। (২২ মাইল) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই লাইন খোলা হয়।

ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া—ব্যাণ্ডেল, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, নিত্যানন্দপুর, ডুমুরদহ, খামারগাছি, জিরাট বলাগড়, সোমড়া বাজার, বেহুলা, গুপ্তিপাড়া, (২২ মাইল)।

শেয়াখালা লাইন—কদমতলা, উত্তর বাঁটরা, কোনা, একসরা, বলুহাটী, (এই ষ্টেশন পর্যন্ত হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত), কালীপুর, চণ্ডীতলা, জনাই, কলাছড়া, কৃষ্ণরামপুর, জঙ্গলপাড়া, মশাট, শিয়াখালা। (১৯ মাইল) এই লাইন মার্টিন-বার্ন কর্তৃক পরিচালিত।

চাঁপাডাঙ্গা লাইন—সীতারামপুর হাট, প্রসাদপুর, (এই ষ্টেশন পর্যন্ত হাওড়া জেলার অন্তর্গত) জঙ্গীপাড়া আঁটপুর, হাওয়াখানা, পিয়াসাড়া, চাঁপাডাঙ্গা (৩২ মাইল) এই লাইন মার্টিন-বার্ণ কর্তৃক পরিচালিত।

এই রেলপথগুলি ব্যতীত হুগলী জেলা হইতে গঙ্গা পারাপারের জন্য "জুবিলী ব্রীজের" উপর দিয়া ব্যাণ্ডেল-নৈহাটী শাখা এবং দক্ষিণেশ্বরের নিকট হইতে বালী পর্যন্ত "বিবেকানন্দ ব্রীজের" উপর দিয়া শিয়ালদহ হইতে ডানকুনী পর্যন্ত রেলগাড়ী যাতায়াত করে। নিম্নে ষ্টেশনগুলির নাম প্রদত্ত হইলঃ

ব্যাণ্ডেল নৈহাটী শাখা—(জুবিলী ব্রীজের উপর দিয়া) ব্যাণ্ডেল, হুগলীঘাট, গরিফা, নৈহাটী।

কলিকাতা কর্ড লাইন—(দক্ষিণেশ্বরের বিবেকানন্দ ব্রীজের উপর দিয়া) শিয়ালদহ, উল্টাডাঙ্গা রোড, দমদম, বরানগর রোড, দক্ষিণেশ্বর, বালিঘাট, ডানকুনি।

॥ সাঁত্রাগাছি-বিষ্ণুপুর রেলপথ ॥

সাঁত্রাগাছি-বিষ্ণুপুর রেল লাইন নির্মাণের দাবীতে এতদঞ্চলে জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই রেলপথটি নির্মিত হইলে হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার অধিবাসিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। এই রেলপথ নির্মাণ পরিকল্পনাটি তৃতীয় যোজনায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। যাহাতে এই পরিকল্পনাটি সত্বর

*হাওড়া হইতে এই ষ্টেশন পর্যন্ত হাওড়া জেলার অন্তর্গত।
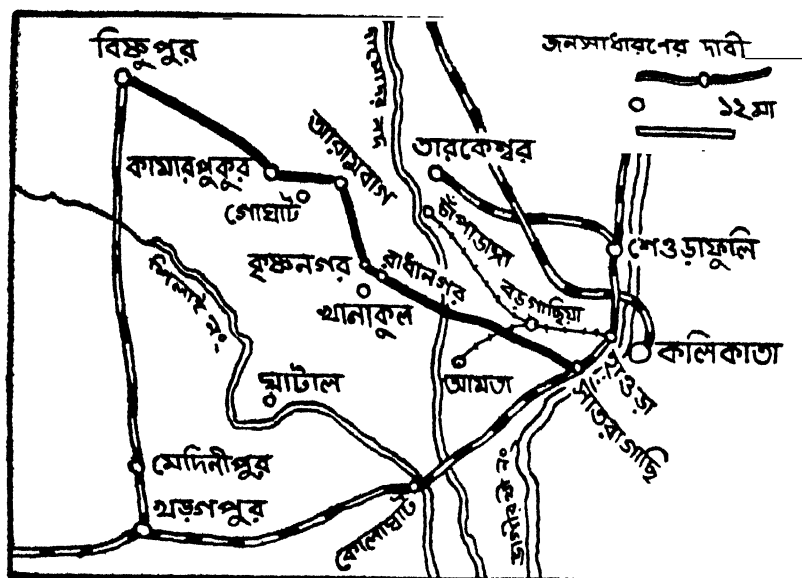
সাঁত্রাগাছি-বিষ্ণুপুর রেলপথ পরিকল্পনা ও তারকেশ্বর-আরামবাগের দূরত্ব এই মানচিত্রে দেখান হইয়াছে
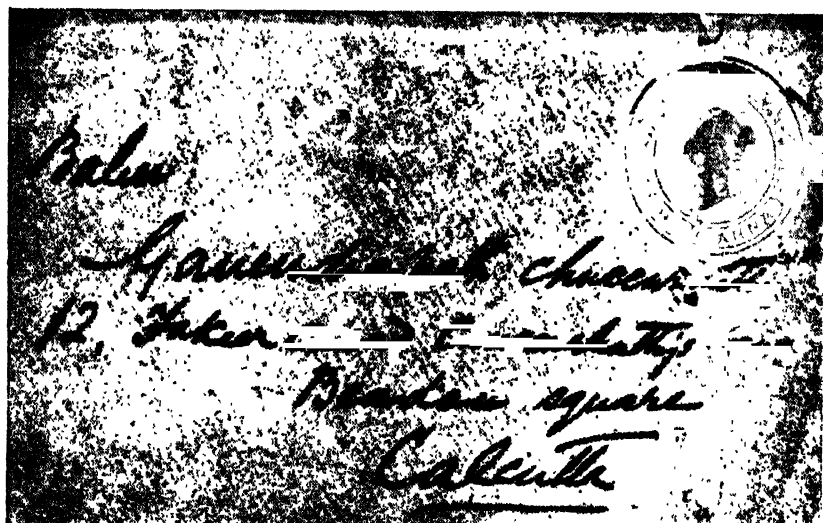
দুই পয়সার প্রথম খামের চিত্র

কার্যকারী হয়, তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া কামনা করিতেছেন। মানচিত্রটিতে কাল রেখা দ্বারা চিহ্নিত লাইন দ্বারা জনগণের প্রস্তাবিত রেলপথের গতিপথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

হুগলী জেলার আরামবাগের মধ্যে কোন রেলপথ না থাকায় জনসাধারণের অসুবিধার পরিসীমা নাই। সাঁত্রাগাছি হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত একটি লাইন ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে হইবার কথা চলিতেছিল, কিন্তু অর্ধশতাব্দী অতিক্রম হইয়া গেল নূতন রেলপথের এখনও জন্ম হইল না। তারকেশ্বর হইতে আরামবাগের দূরত্ব মাত্র বার মাইল। যদি তারকেশ্বর হইতে রেললাইন আরামবাগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়, তাহা হইলে অল্প খরচেই আরামবাগ শহরে যাতায়াতের সুবিধা হয়। সাঁত্রাগাছি-বিষ্ণুপুর রেলপথ নির্মাণে যদি বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে তারকেশ্বর—আরামবাগ রেলপথটি অচিরে নির্মাণ করিলে জনগণের দীর্ঘদিনের দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান হয়। এই স্বল্পদূরত্ববিশিষ্ট রেলপথটি নির্মিত হইলে চুঁচুড়া সদর শহর ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে ও জনকল্যাণমূলক কার্যের প্রধান সহায়ক হইবে। ইহা ছাড়া এই রেলপথ দিয়া কলিকাতা এবং তৎসংলগ্ন বাণিজ্য ও শিল্পাঞ্চল সমূহে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশের কৃষিজ ও অন্যান্য পণ্য ন্যূনতম ব্যয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ হইলে আরামবাগ ও বাঁকুড়া জেলার পল্লী অঞ্চলের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। মানচিত্র হইতে ইহা কত সহজেই নির্মাণ হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইল।

হুগলী জেলার বিভিন্ন রাস্তায় যাতায়াতের সুবিধারজন্য বর্তমানে বহু রাস্তায় মোটর বাস চলাচল করে; নিম্নে জেলার প্রধান বাস রুটগুলির নাম লিখিত হইলঃ

চুঁচুড়া হইতে শ্রীরামপুর।
বালি হইতে বর্ধমান।
চুঁচুড়া হইতে তারকেশ্বর
(ধনিয়াখালি হইয়া)
চুঁচুড়া হইতে পোলবা।
শ্রীরামপুর হইতে বালি।
বৈঁচী হইতে বৈদ্যপুর।
উত্তরপাড়া হইতে চণ্ডীতলা।
হরিপাল হইতে জাঙ্গীপাড়া।
হরিপাল হইতে চুঁচুড়া।
(জেজুর ও ভাণ্ডারহাটী হইয়া)
সেওড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর
চুঁচুড়া হইতে বৈচী।
তারকেশ্বর হইতে চাঁপাডাঙ্গা।

হুগলী হইতে বরাকর।
হুগলী হইতে হাওড়া।
চুঁচুড়া কোর্ট হইতে দশঘরা।
(মেমারী ও চকদিঘী হইয়া)
চুঁচুড়া কোর্ট হইতে চণ্ডীতলা।
ঝিকরা হইতে আরামবাগ।
মুলকাটি হইতে আরামবাগ।
বর্ধমান হইতে বৈদ্যপুর।
(বৈঁচী হইয়া)
হুগলী হইতে বর্ধমান।
আসানসোল হইতে ত্রিবেণীঘাট।
(রাণীগঞ্জ হইয়া)
বর্ধমান হইতে হাওড়া।
তারকেশ্বর হইতে বর্ধমান।

আরামবাগ হইতে ময়নাগ্রাম। চুঁচুড়া কোর্ট হইতে চুঁচুড়া ষ্টেশন।
চুঁচুড়া হইতে ব্যাণ্ডেল। আরামবাগ হইতে খানাকুল।

জলপথ॥ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভাগীরথী-বক্ষে, হুগলীর নিকট বাষ্পচালিত পোত চালান হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম দৈনিক যাত্রীবাহী ষ্টীমার চুঁচুড়া হইতে কলিকাতা পর্যন্ত খোলা হয় এবং তখন প্রতি যাত্রীর আট টাকা করিয়া ভাড়া ধার্য হইয়াছিল। ক্রমশঃ রেলগাড়ী না হওয়া পর্যন্ত ষ্টীমারে—যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বহুবিধ সুবন্দোবস্ত ও সুবিধা হইয়াছিল। প্রথম যে দুইখানি ষ্টীমার কলিকাতা হইতে চুঁচুড়া পর্যন্ত যাতায়াত করিত, তাহাদের নাম 'কমেট' ও 'ফায়ার-ফ্লাই'।

ভাগীরথীতে সারা বৎসর ষ্টীমার চলে; রূপনারায়ণ বন্দর হইতে রাণীচক পর্যন্ত প্রত্যহ ষ্টীমার চলে এবং এই নদী দিয়া নৌকা যাতায়াত করে। কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী গঙ্গায় হাটখোলা হইতে কালনা পর্যন্ত মাল ও যাত্রীসহ ষ্টীমার চালাইত এবং মোট বাইশটি ইহার ষ্টেশন ছিল, তন্মধ্যে তারকা চিহ্নিত পাঁচটি ষ্টেশন গঙ্গার পূর্বদিকে অবস্থিত। নিম্নে ষ্টেশনগুলির নাম এবং দূরত্ব প্রদত্ত হইল। বর্তমানে এই ষ্টীমার সার্ভিস উঠিয়া গিয়াছে।

নাম	মাইল	নাম	মাইল
১। হাটখোলা	...	১২। ত্রিবেণী	... ৩৩
২। উত্তরপাড়া	৬	১৩। সিজাই	৩৬
৩। শ্রীরামপুর	১৪	* ১৪। কালিগঞ্জ	৩৯
৪। সেওড়াফুলি	১৫	১৫। জিরেট	৪১
৫। নবাবগঞ্জ	১৬	* ১৬। গৌরনগর	৪২
৬। ভদ্রেশ্বর	১৮	১৭। শ্রীপুর (বলাগড়)	৪৪
৭। চন্দননগর	১৯	১৮। সোমড়া	৪৮
৮। ভাটপাড়া	২০	১৯। বয়ড়া	৫৪
৯। চুঁচুড়া	২৪	২০। শান্তিপুর	৫৮
১০। হুগলী	২৬	২১। গুপ্তিপাড়া	৬০
১১। বাঁশবেড়িয়া	৩১	২২। কালনা	৬৪

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত রেলগাড়ী চালাইবার জন্য রেললাইন প্রস্তুত হয় এবং ১৫ আগষ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলী পর্যন্ত বঙ্গের প্রথম রেলগাড়ী চলা আরম্ভ হয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। পূর্বে স্থলপথে পালকি করিয়া ও জলপথে নৌকা করিয়া যাতায়াত চলিত। উড়িয়া বেহারাগণ এই পালকি বহন করিত এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী কর্তৃক ঠিকা উড়িয়া বেহারাদের দৈনিক হার নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পাঁচজন ঠিকা বেহারার দৈনিক পারিশ্রমিক সিক্কা ১ৎ টাকা ও অর্ধদিন ৷৷৹ আনা এবং আট মাইল যাইলেই একদিন করিয়া ধরা হইত। পাঁচ মাইলের অনধিক যাইবার জন্য বেয়ারাদের মজুরী জনা প্রতি তখন চারি আনা ধার্য ছিল।

ডাক-বিভাগ কর্তৃক চিঠিপত্র ব্যতীত তাহাদের পালকিতে তৎকালে যাত্রী যাইবারও সু-ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাহার ভাড়া অত্যধিক ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে ডাক-চৌকি থাকিত এবং পালকি ও বেহারাগণ উক্ত স্থানে অপেক্ষা করিত। ডাক-চৌকি পোষ্টাফিসের অধীন ছিল। ৬ই জানুয়ারী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা গেজেটে' বিভিন্ন স্থানের ডাক-চৌকিতে ভ্রমণের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল; উক্ত তালিকায় কলিকাতা হইতে চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ভাড়া ২৪৷৷৹ (চব্বিশ টাকা আট আনা) এবং কলিকাতা হইতে হুগলীর ভাড়া ৪৬।৹ (ছেচল্লিশ টাকা চার আনা) এবং কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়ার ভাড়া ৭৬্ (ছিয়াত্তর টাকা) ছিল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং তৎকালে যাতায়াত কিরূপ ব্যয়সাধ্য ছিল, ইহা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

জলপথে নৌকায় গমনাগমন করা তখন অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে হইত। নৌকা বা বজরা তৎকালে পুলিশের অধীনে থাকিত এবং জলপথে যাইতে হইলে পূর্বে পুলিশের নিকট আবেদন করিতে হইত। পুলিশ দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাসী লোককে দাঁড়িমাঝি নির্বাচন করিত, কারণ পূর্বে জলপথে বা স্থলপথে দস্যুর উৎপাত ছিল বলিয়া যাত্রীগণকে নিজেদের রক্ষার জন্য সিপাহী-সান্ত্রী সঙ্গে লইতে হইত। পথিমধ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহার জন্য কোম্পানী দায়ী হইতেন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ এক পুলিশ বিজ্ঞাপন বাহির হয়, উক্ত বিজ্ঞাপনে জলপথে নৌকার ভাড়া ছিল আটজন দাঁড়ির বজরা দুই টাকা, দশজন দাঁড়ির বজরা আড়াই টাকা, ষোলজন দাঁড়ির বজরা সাড়ে তিন টাকা ইত্যাদি। সেই সময় মেসার্স হোমস এন্ড এলেন কোম্পানীর জলপথে মাল পাঠাইবার কার্য প্রায় একচেটিয়া ছিল।

খেয়াঘাট

হুগলী জেলা হইতে যে সমস্ত ফেরী নৌকা গঙ্গার পূর্বদিকে প্রত্যহ যাতায়াত করে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল; এই খেয়াঘাটগুলি বর্তমানে হুগলী জেলা-বোর্ডের অধীন।

১। গুপ্তিপাড়া	হইতে	শান্তিপুর
২। সোমড়া	হইতে	গোঁসাইচর
৩। বলাগড়	হইতে	চকদহ
৪। জিরাট	হইতে	কালীগঞ্জ বা সুখসাগর
৫। ডুমুরদহ	হইতে	দুর্গাপুর
৬। ত্রিবেণী	হইতে	গুসুটি
৭। বংশবাটী	হইতে	কাঁচড়াপাড়া
৮। কামারপাড়া	হইতে	হালিশহর
৯। হুগলী বাজার	হইতে	নৈহাটী
১০। হুগলী বাবুগঞ্জ	হইতে	নৈহাটী

১১। চুঁচুড়া মেছোবাজার	হইতে	নৈহাটী
১২। ষণ্ডেশ্বরতলা চুঁচুড়া	হইতে	কাঁকিনাড়া
১৩। চন্দননগর	হইতে	জগদ্দল
১৪। তেলিনীপাড়া	হইতে	শ্যামনগর
১৫। ভদ্রেশ্বর	হইতে	গাড়ুলিয়া
১৬। গরুটি	হইতে	ইছাপুর
১৭। চাঁপদানী	হইতে	পলতা
১৮। নিমাইতীর্থের ঘাট	হইতে	নবাবগঞ্জ
১৯। চাতরা	হইতে	বারাকপুর
২০। শ্রীরামপুর কোর্ট	হইতে	বারাকপুর হাঁসপাতাল ঘাট
২১। বল্লভপুর	হইতে	টিটাগড়
২২। মাহেশ জগন্নাথঘাট	হইতে	টিটাগড়
২৩। রিষড়া	হইতে	খড়দহ
২৪। কোন্নগর	হইতে	পানিহাটী
২৫। উত্তরপাড়া	হইতে	এড়েদহ

হুগলী জেলার মধ্যে চুঁচুড়া হইতে মেছুয়াবাজার ঘাটে একটি ফেরী স্টীমার সার্ভিস আছে। গঙ্গা ব্যতীত মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে যে সমস্ত স্থানে ফেরী ঘাট আছে, তাহার কয়েকটি নিম্নে লিখিত হইল ঃ

১। চাঁপাডাঙ্গা হইতে পুরসুঁড়া (দামোদর নদী পারের জন্য)
২। বলরামপুর হইতে আরামবাগে যাইবার জন্য
৩। হরিণখোলা হইতে মুণ্ডেশ্বরী নদী পারের জন্য
৪। হরাদিত্য হইতে খাল পার করিবার জন্য (মুণ্ডেশ্বরীর কিঞ্চিত পশ্চিমে)
৫। অশথখালি খাল পারাপারের জন্য
৬। আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদী পারাপারের জন্য

এতদ্ব্যতীত কানা নদী, সরস্বতী নদী ও রূপনারায়ণ নদীর উপর বহু স্থানে যাতায়াতের জন্য নৌকা আছে। বহুস্থানে গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া যাইলে, নৌকা বন্ধ হইয়া যায় এবং নদীবক্ষ দিয়া তখন লোকজন যাতায়াত করে।

॥ ডাকঘর ॥

বঙ্গদেশে কোন সময় হইতে ডাক বিভাগের কার্য প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বর্তমানে সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব। ডাক প্রবর্তিত হইবার পূর্বে একশ্রেণীর লোক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লোকের চিঠিপত্র পৌঁছাইয়া দিত। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের সময় এই স্থানে ডাকের প্রচলন ছিল এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের

সময়ে ডাকের কিছু উন্নতি হয়। তবে ১০ই জুন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের সর্বত্র তখন ডাকের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সংবাদটি এইরূপঃ—"আগামী ৩০শে জুন হইতে অনারেবল কোম্পানী বাহাদুরের ডাক বেহারাগণ ডাকের কার্য বন্ধ করিবে।" ঐ সময়ে ডাক বেহারাদের চলাচল বন্ধ করিবার একমাত্র কারণ, বর্ষা সমাগমে তখনকার পথ ঘাট দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সেইজন্য বর্ষার সময়ে তৎকালে ডাকচলাচল বন্ধ থাকিত। উক্ত বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর 'কলিকাতা গেজেটে' আর একটি সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়। উক্ত আদেশ হইতে জানা যায় যে, জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত, এই চারি মাস বর্ষার জন্য ডাক চলাচল বন্ধ থাকিত। আদেশটি এইরূপ ঃ—"আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কোম্পানী বাহাদুরের ডাক বেহারারা পুনরায় কার্য আরম্ভ করিবে।"

২০শে নভেম্বর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মিঃ সি. কক্‌রেল জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে "কলিকাতা গেজেটে" একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তি হইতে তৎকালীন ডাকঘরের মাশুল কিরূপ ছিল তাহা জানা যায়। সে কালে ভারতের নানাস্থানে পত্র প্রেরণের কিরূপ ব্যয় হইত, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এস্থলে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ঐ সময়ে বঙ্গদেশে একটি জেনারেল পোষ্ট অফিস এবং একজন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন বিভিন্ন স্থানে ডাকের খরচা ভিন্নরূপ ছিল; যেমন কলিকাতা হইতে ২।।০ তোলা ওজনের একখানি চিঠি হুগলীতে পাঠাইতে হইলে এক আনা এবং ২।।০ তোলা ওজনের একখানি চিঠি কাশী পাঠাইতে সাত আনা খরচা পড়িত। তখন কাশীর ডাকের মাশুল সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল বলিয়া তালিকাতে দেখা যায়।

কলিকাতা হইতে বিভিন্ন স্থানের ডাক খরচা

স্থানের নাম	২।। সিক্কা টাকা ওজনের চিঠি	২।। ও তদুর্ধ্ব সিক্কা টাকার ওজন	২।। হইতে ৪।। সিক্কা ওজন	৪।। হইতে ৫।। পর্যন্ত ওজন	৫।। হইতে ৬।। পর্যন্ত ওজন
শ্রীরামপুর	/০	৵০	৶০	।০	।/০
ব্যারাকপুর	/০	৵০	৶০	।০	।/০
হুগলী	/০	৵০	৶০	।০	।/০
চন্দননগর	/০	৵০	৶০	।০	।/০
বর্ধমান	৵০	।০	।৵০	।।০	।।৵০
মুরশীদাবাদ	৵০	।০	।৵০	।।০	।।৵০
রাজমহল	৶০	।৵০	।।/০	৸০	৸৶০
ভাগলপুর	৶০	।৵০	।।/০	৸০	৸৶০
দিনাজপুর	।০	।।০	৸০	১৲	১।০
মুঙ্গের	।০	।।০	৸০	১৲	১।০

স্থানের নাম	২॥ সিক্কা টাকা ওজনের চিঠি	২॥ ও তদূর্ধ সিক্কা টাকার ওজন	২॥ হইতে ৪॥ সিক্কা ওজন	৪॥ হইতে ৫॥ পর্যন্ত ওজন	৫॥ হইতে ৬॥ পর্যন্ত ওজন
পাটনা	৷/০	॥৵০	৸৶০	১ ৷০	১॥০
বক্সার	৷৵০	৸০	১ ৵০	১॥০	১৸৵০
বারাণসী	৷৶০	৸৵০	১ ৷/০	১৸০	২ ৶০
রাজপুর	৵০	৷০	৷৵০	॥০	॥৵০
ঢাকা	৶০	৷৵০	॥/০	৸০	৸৶০
চট্টগ্রাম	৷৵০	৸০	১ ৵০	১॥০	১৸৶০
কুলপী	৵০	৷০	৷৵০	॥০	॥৵০
মেদিনীপুর	৵০	৷০	৷৵০	॥০	॥৵০
বালেশ্বর	৵০	৷০	৷৵০	॥০	॥৵০
কটক	৶০	৷৵০	॥/০	৸০	৸৶
গঞ্জাম	৷/০	॥৵০	৸৶০	১ ৷০	১॥/০

উপরোক্ত তালিকায় এই আদেশ দেওয়া ছিল যে, সাড়ে নয় ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি চওড়ার অতিরিক্ত আয়তনের পত্র, আগামী ৩০শে নভেম্বরের পর হইতে আর লওয়া হইবে না। সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে কেবল এইরূপ পত্র লওয়া হইবে। ইহার অতিরিক্ত ওজনের পত্র বা পার্শ্বেল ডাকে প্রেরিত না হইয়া বাঙ্গিতে যাইবে। (স্বাঃ) সি ককরেল।

এই বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, অতিরিক্ত ওজনের চিঠি বা পার্শ্বেল ডাকে না যাইয়া "বাঙ্গিতে" যাইবে। "বাঙ্গি" কাহাকে বলে? তৎকালে দেশের নানা স্থানে ডাকচৌকি ছিল; এই সমস্ত ডাক-চৌকিতে পালকি ও বেহারা থাকিত। ডাক-চৌকি পোষ্টাফিসের অধীন ছিল। কোন দূরবর্তী স্থানে যাইতে হইলে সেকালে জলপথে নৌকায় এবং স্থলপথে পালকির সাহায্যে যাইতে হইত। ইহাদের ভাড়াও অনেক বেশী ছিল এবং সরকারী ডাক ছাড়া ভ্রমণকারীদের মালপত্রও উক্ত ডাক বাহকগণ লইত, এইরূপ মালের ডাককে তখন "বাঙ্গি" বলা হইত।

৬ই জানুয়ারী ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা গেজেটে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ডাক চৌকিতে ভ্রমণের ভাড়ার একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত তালিকা হইতে সেকালের লোকদের ভ্রমণের ও মালের খরচা সমেত কত টাকা ব্যয় হইত তাহার আভাস পাওয়া যায়। ঐ তালিকা হইতে জানা যায় যে পালকিতে কাশী যাইতে তখন ৭৬৪৲ টাকা খরচ পড়িত এবং রাজমহল ও ভাগলপুর হইয়া কাশী যাওয়া তখন প্রথা ছিল। সুতরাং স্থলপথে কাশী যাওয়া তৎকালে যে বড়লোক ছাড়া আর কাহারও সাধ্য ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। জলপথে নৌকা বা বজরা করিয়া কাশী যাইতে ৪৮৮৲ টাকা খরচা পড়িত, পাঠকবর্গকে অবগতির জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডাক-চৌকিতে (অর্থাৎ পালকিতে) যাতায়াতের একটি তালিকা প্রদত্ত হইলঃ

॥ ডাক চৌকির ভাড়া ॥

কলিকাতা হইতে চন্দননগর—২৪৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে চুঁচড়া—২৪৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে হুগলী—৪৬৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়ে—৭৬৴ টাকা
কলিকাতা হইতে বহরমপুর—১৫৯৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে কালকাপুর—১৫৯৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে ময়দাপুর—১৫৯৷৷০ টাকা
কলিকাত্তা হইতে কাশিমবাজার—১৫৯৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদ—১৫৯৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে মুরাদাবাদ—১৫৯৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে রাজমহল—২৫৭৸০ টাকা
কলিকাতা হইতে ভাগলপুর—৩৫৪৸০ টাকা
কলিকাতা হইতে মুঙ্গের—৪০৬৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে পাটনা—৫৪০৲ টাকা
কলিকাতা হইতে বাঁকিপুর—৫৪০৲ টাকা
কলিকাতা হইতে দানাপুর—৫৫৩৷৷০ টাকা
কলিকাতা হইতে বক্সার—৬৬৪৲ টাকা
কলিকাতা হইতে বেনারস—৭৬৪৲ টাকা

৬ই জুন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গ দূত' পত্রে নূতন ডাকঘর সম্বন্ধে সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

নূতন ডাকঘর॥—গত ২৩ মে তারিখে রোজরিও কোম্পানি কলিকাতায় এক আনা মাশুলের ডাকঘর স্থাপনের বিষয়ে আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে চিঠি বাঁটিয়া দিবেন একভরি ওজন পর্যন্ত এক আনা মাসুল লাগিবে এবং এক অবধি দুই ভরি পর্যন্ত দুই আনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা তিনবার চিঠি পাঠাইয়া দিবেন প্রথম বন্টন প্রাতঃকালে নয়ঘন্টার সময়ে দ্বিতীয় বন্টন দুই প্রহর এক ঘন্টার সময়ে তৃতীয় বন্টন অপরাহ্নের পাঁচ ঘন্টার সময়ে হইবেক ঐ সাহেব লোকেরা কেবল কলিকাতার মধ্যেই চিঠি প্রেরণ করিতে কল্প করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু কলিকাতার আশপাশ স্থানে যথা উত্তরদিগে চিত্পুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্যন্ত। পূর্বদিগে দম্দমা ও নীলগঞ্জ পর্যন্ত। দক্ষিণদিগে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর পর্যন্ত। পশ্চিমদিগে হাবড়া, সালিকা, শিবপুর পর্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার তাঁহারা চিঠি প্রেরণ করিবেন এবং দম্দমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার, এই রীতির আরম্ভ গত ২ জুন সোমবারাবধি হইয়াছে।

ডাক পালকি পোষ্টাফিসের অধীন ছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু নৌকা বা বজরা সে কালে পুলিশের হাতে ছিল। সুতরাং জলপথে কোথাও যাইতে হইলে পুলিশের নিকট পূর্বে আবেদন জানাইতে হইত। পুলিশ দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাসী লোক দেখিয়া দাঁড়ি মাঝি নির্বাচন করিত। এ স্থলে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। সেকালে জলপথে বা স্থলপথে যাঁহারা যাইতেন তাঁহাদের নিজেদের সেপাহী-শান্ত্রী সঙ্গে লইতে হইত, কারণ তখন সর্বত্র প্রবল দস্যুর উৎপাত ছিল এবং ইংরাজ শক্তি তখন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পথিমধ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সরকার তাহার জন্য দায়ী হইত না। তবে তাহারা যতদূর সম্ভব বিশ্বাসী লোক সংগ্রহ করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখের এক পুলিশ বিজ্ঞাপনী বাহির হয়; উক্ত বিজ্ঞাপনে নানা স্থানের নদী দিয়া যাওয়ার ভাড়া দেওয়া ছিল। নিম্নে উক্ত তালিকাটি প্রকাশ করিলাম।
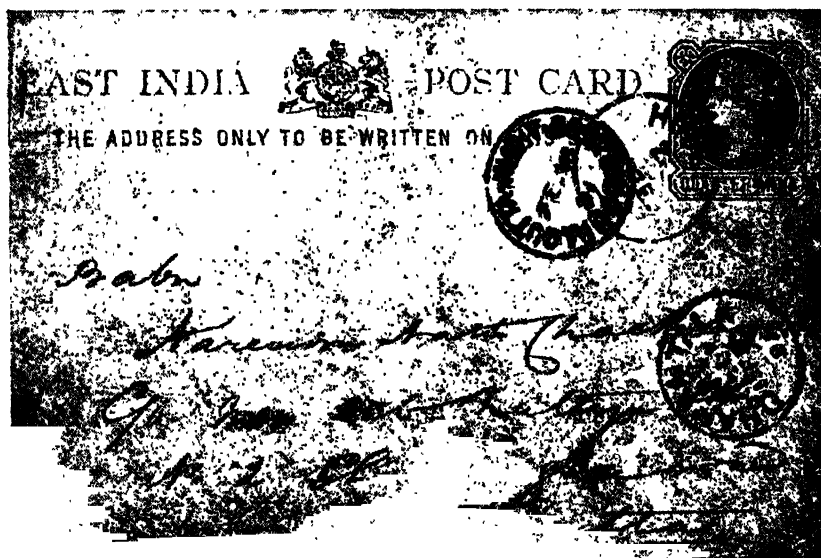
ভারতের প্রথম পোষ্টকার্ড
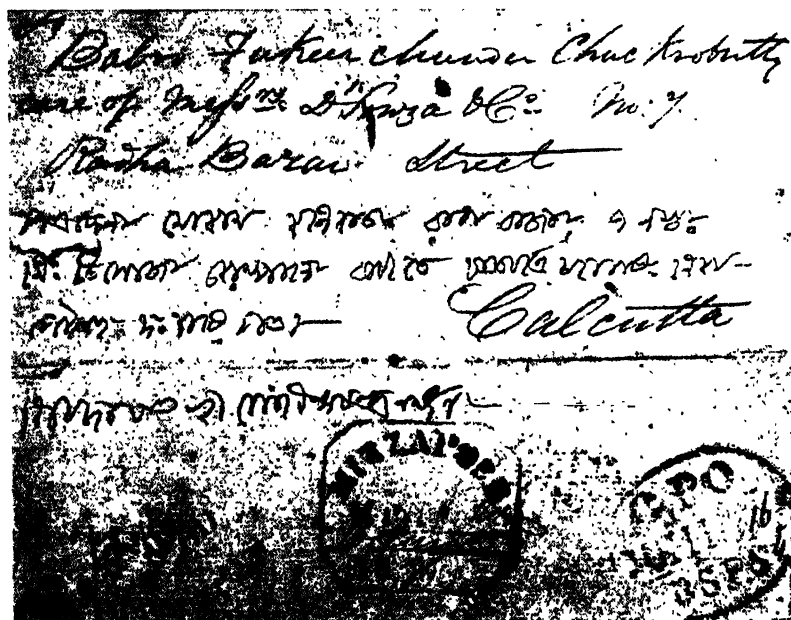
প্রাচীনকালের খামবিহীন পত্রের প্রতিলিপি

কলিকাতা হইতে	সময়	বজরার প্রকার ভেদ	ভাড়া
বহরমপুর	২০ দিন	৮ দাঁড়	২৲ টাকা
মুরশীদাবাদ	২৫ দিন	১০ দাঁড়	২৷৷০ টাকা
রাজমহল	৩৭ দিন	১২ দাঁড়	৩৷৷০ টাকা
মুঙ্গের	৪৫ দিন	১৪ দাঁড়	৫৲ টাকা
পাটনা	৬০ দিন	১৬ দাঁড়	৬৲ টাকা
বেনারস	৭৫ দিন	১৮ দাঁড়	৬৷৷০ টাকা
কানপুর	৯০ দিন	২০ দাঁড়	৭৲ টাকা
ফৈজাবাদ	১০৫ দিন	২২ দাঁড়	৭৷৷০ টাকা
মালদহ	৩৭৷৷ দিন	২৪ দাঁড়	৮৲ টাকা
রঙ্গপুর	৫২৷৷ দিন	মালবোঝাই বোট	
ঢাকা	৩৭৷৷ দিন	২৫০ মণ	২৯৲ টাকা
লক্ষ্মীপুর	৪৫ দিন	৩০০ মণ	৩৫৲ টাকা
চট্টগাম	৬০ দিন	৪০০ মণ	৪০৲ টাকা
গোয়ালপাড়া	৭৫ দিন	৫০০ মণ	৫০৷৷০ টাকা

॥ টেলিগ্রাফ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সংকেত দ্বারা দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার জন্য 'সেমাফোর টেলিগ্রাম' কলিকাতা হইতে চুনার পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে খোলা হয়। কিন্তু স্তম্ভের উপর হইতে জ্ঞাপন ফলপ্রসূ না হওয়ায়, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে 'সেমাফোর টেলিগ্রাফে'র উচ্চস্তম্ভগুলি ত্রিকোন জ্যামিতিক জরিফের জন্য ব্যবহার করা হয়। হুগলী জেলায় নালিকুল, দিলাক্যাস,হায়াৎপুর, মোবারকপুর এবং নবাসনে এইরূপ পাঁচটি স্তম্ভ আজও বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়। উহা তখন সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রথম তাড়িতবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। বেঙ্গল আর্মির ডাক্তার স্যার উইলিয়াম ব্রুক ভারতবর্ষে তাড়িৎবার্তা প্রচলনে প্রথমে সর্ববিষয়ে চেষ্টিত হন। তিনি প্রথম কলিকাতা হইতে কেদ্‌গিরিতে টেলিগ্রাফ লাইন বসাইয়া পরীক্ষা দ্বারা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ক্যাসেলসের ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, টেলিগ্রাফের দ্বারা বর্মার সহিত যুদ্ধকালে ইংরেজের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

The father of the telegraph in India was Dr (afterwards Sir William) O'Shaughnessy, an Aissistant-Surgeon who held the appointment of Professor of Chemistry in the Medical College at Calcutta. He first constructcd experimental lines along and across Hooghly from Calcutta to Diamond Harbour, Mayapur and Kedgree, telegraph offices were opened in 1851 for business.

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৪ হাজার ১ শত ৬২ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পায় ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার প্রধান টেলিগ্রাম অফিস শ্রীরামপুর ছাড়া চুঁচুড়া, হুগলী, মগরা, চন্দননগর ও তারকেশ্বর এই পাঁচটি স্থানেও তার অফিস ছিল এবং উক্ত স্থানগুলি হইতে ৬৮৬৭ তারবার্তা এক বৎসরে প্রেরিত হইয়াছিল।

॥ পোষ্টকার্ড ॥

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। আজকাল যে পোষ্টকার্ড দেখা যায়, আকারে উহা পূর্বাপেক্ষা অনেক বড়। তখনকার পোষ্টকার্ডের মাপ ছিল ৪৩/৪″×৩″ এবং মূল্য ছিল Quarter Anna অর্থাৎ এক পয়সা। পোষ্টকার্ডের ডানদিকে ছিল খয়েরী রংয়ের ছাগা ভারতসম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি আর ইহার মাঝখানে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"র প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ থাকিত একটি শীলমোহর। প্রতীকচিহ্নের একদিকে ইংরাজিতে লেখা ছিল East India আর অপর দিকে Post Card এই কথাটি। ইহার ঠিক নীচে লেখা ছিল The address only to be written on this side. পোষ্টকার্ডের তখন রং ছিল বাদামী।

সেকালের পোষ্টকার্ডে দুই দিকে চিঠি লেখা চলিত না। সেই জন্য তৎকালে ইহা লইয়া বেশ আন্দোলন পর্যন্ত হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ

> "......But the great difficulty is to teach the people on which side of the card the address is to be written and we think it will be some years before they are enlightened in this respect. But really does it matter much if the address is written on the wrong side ? We think that the people of India living under the enlightened rule of the British should have the privilege of writing the address on whichever side they like......"

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে "রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে"র প্রচলন হয়। ইহা পূর্বের পোষ্টকার্ডের অনুরূপ হইয়াছিল; কেবল বামদিকে The annexed card is intended for answer এই কথাগুলি ইংরাজিতে যোগ করা হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম East India Post Card এর পরিবর্তে ইণ্ডিয়া পোষ্টকার্ড India Post Card এই কথাগুলি লেখা হয়। পোষ্টকার্ড অন্য সমস্ত বিষয়ে এক থাকিলেও শীলমোহরটি মাঝখান হইতে বামদিকে সরাইয়া দেওয়া হয় এবং ডানদিকে ইংরাজিতে লেখা হয়"ইণ্ডিয়া পোষ্টকার্ড"। শ্রীসন্তোষ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত প্রথম খাম ও পোষ্টকার্ডের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে Foreign Post Card প্রথম প্রচলিত হয়। উহার মূল্য ছিল ছয় পয়সা। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিদেশী পোষ্টকার্ডকে জনপ্রিয় করিবার জন্য ইহার মূল্য কমাইয়া এক আনা করা হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ডের সময় পোষ্টকার্ডের ডিজাইনের পরিবর্তন হয় এবং ডাকটিকিট বা পোষ্টকার্ডে ছবির উপর মুকুট ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। বর্তমান পোষ্টকার্ডের মাপ সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া।

॥ ডাক টিকিট ॥

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে চিঠিপত্র পায়রার দ্বারা প্রেরিত হইত। পোষা পায়রার গলায় চিঠি বাঁধিয়া যিনি চিঠি পাইবেন তাহার নাম বলিয়া দেওয়া হইত এবং পায়রা যথাস্থানে উহা ঠিক পৌঁছিয়া দিত। খৃষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্রে' পায়রার সাহায্যে ডাক প্রেরণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র রাজা অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত এইভাবে ডাক যাতায়াতের বিবরণ পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবন্ বটুটা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে দুই রকম ডাক প্রচলিত ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন; একটি অশ্ববাহী ডাক আর একটি পদযাত্রী ডাক। ষোড়শ শতাব্দীতে শের সাহের রাজত্বকালে অশ্ববাহী ডাক সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক ফরিস্তা লিখিয়াছেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই ডাক বিভাগ এত উন্নত হয় যে, আগ্রা হইতে আমেদাবাদে একখানি চিঠি পৌঁছাইতে তখন মাত্র পাঁচ দিন সময় লাগিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে তাহাদের অফিস স্থাপন করে, তখন ভারতবর্ষে নিয়মিত ডাকের প্রচলন ছিল না বলিয়া তাহারা তাহাদের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য নিজেদের লোক দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ডাক পাঠাইত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ প্রথম ডাকের প্রচলন হয় এবং সাধারণের চিঠিপত্র মাশুল লইয়া যথাস্থানে প্রেরণের প্রথম ব্যবস্থা করা হয়। মাশুল লইয়া কলিকাতায় প্রেরিত একখানি চিঠির প্রতিলিপি এই স্থানে মুদ্রিত হইল। সেই সময় চিঠি খামের মধ্যে দেওয়া চলিত না। এই খামবিহীন পত্রখানি মির্জাপুর হইতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নন্দন ১০ই জুন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বাবু ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর নিকট ৭ নম্বর রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতায় প্রেরণ করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মাশুল লওয়া হইয়াছে বলিয়া উর্দুতে লেখা আছে এবং পত্রের উপর বাঙ্গলায় "পত্র যেন মোকাম কলিকাতা রাধাবাজার ৭ নম্বর মিঃ ডিসোজা কোম্পানীর বাটিতে চক্কোত্রি মহাশয়ের নিকট পৌঁছে দরকারি পত্র" ইহাও স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নিয়মে ডাক-বিভাগের কাজ চলে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডাক-বিভাগের কার্য কি ভাবে উন্নতি করা যায়, সেই বিষয়ে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিবার জন্য মেসার্স কোর্টনি, ফরবেস্ এবং বিডন সাহেবকে লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ডাক-বিভাগের কার্য বর্তমানে যে ভাবে চলিতেছে, তাহা

স্থিরীকৃত হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডাক-বিভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে পোষ্টাল রানার ৩৩ হাজার ৮ শত ৫৩ মাইল পদব্রজে, এবং গরুরগাড়ি ও ঘোড়ারগাড়ির সাহায্যে ৫ হাজার ১ শত ৫৬ মাইল ভ্রমণ করিয়া চিঠি বিলি করে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি সম্বলিত "হাফ এ্যানা" অর্থাৎ দুই পয়সার খামে সিকি ভরি ওজনের চিঠি ভারতের সর্বত্র ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে যাইতে আরম্ভ করে। এই খামের মাপ ছিল ৪$\frac{1}{8}$"×২$\frac{1}{8}$"। এইরূপ খামের প্রতিলিপিও ৩২৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ডাক টিকিটের হার সম্বন্ধে ওম্যালি সাহেব লিখিয়াছেনঃ

The postal system was also inaugurated in 1884, when a uniform rate of postage, viz., half an anna for a letter weighing quarter of a tolla was fixed irrespective of distance.

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উড ষ্ট্রীট হইতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি সমন্বিত দুই পয়সার ডাকটিকিট প্রথম বাহির হয়। উক্ত ডাকটিকিট বর্তমানে পৃথিবীতে দুস্প্রাপ্য টিকিট বলিয়া পরিগণিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের যাবতীয় ডাকটিকিট বিলাতে মুদ্রিত হইত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ডাকটিকিট মুদ্রণের জন্য বোম্বাই নাসিকে একটি ছাপাখানা খোলা হয়। এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের যাবতীয় ডাকটিকিট ভারতে মুদ্রিত হইতে সুরু হয়।

ভারতবর্ষে ষ্ট্যাম্প মুদ্রণের জন্য বোম্বাই শহরে প্রেস স্থাপনের বিষয় যে সংবাদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ ঃ বোম্বাইয়ের স্ট্যাম্প মুদ্রণ ব্যবস্থাপক এসেম্ব্লি ভারতবর্ষের ষ্ট্যাম্প মুদ্রণের প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন। ষ্ট্যাম্প মুদ্রিত করিবার প্রেসটি সম্ভবতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিক রোডে স্থাপিত হইবে। তাহার উদ্যোগ আয়োজন এখনই চলিতেছে। গত শীতকালেই পরীক্ষা-স্বরূপ দিল্লীতে একটি ষ্ট্যাম্প প্রেস স্থাপিত হইয়াছিল। সে পরীক্ষা সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু দিল্লীর আবহাওয়া স্থায়ী প্রেসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হওয়াতে উহা নাসিক রোডে স্থাপিত হইবে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভি, পি-তে মাল পাঠাইলে পোষ্ট অফিস প্রেরককে মাশুলের পরিবর্তে মালের দাম আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে ২২,১১৬টি পোষ্ট অফিস বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষে পোষ্ট অফিসের সংখ্যা হইতেছে ৪৫,৯০৭।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পর উন্নত প্রণালীতে ষ্ট্যাম্পের প্রচলন হয়। কলিকাতা ট্যাঁকশালের কর্ণেল ফরবেসের আদর্শমত সিংহ ও তালগাছ অঙ্কিত দুই আনা দামের ডাক টিকিট প্রথম প্রস্তুত হয়; পরে বিলাতের দে-লা-রু কোম্পানী কর্তৃক ডাকটিকিট তৈয়ারী হইয়া আসে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্যন্ত কলিকাতার ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৪ শত ৯৬ খানি টিকিট প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

ডাক বহন করিবার জন্য বেহারা সম্বন্ধে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর সমাচার দর্পণ পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহাও এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

ডাক বেহারা।—পূর্বে লোকের প্রয়োজনানুসারে কোম্পানী উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন, তাহাতে কোন স্থানে দেড় টাকা ক্রোশ ছিল ও কোন স্থানে তাহার অধিকও ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কোম্পানী হুকুম করিয়াছেন যে, এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিবে না এবং তাহার মধ্যে তৈল ও মশাল ইত্যাদি সকল খরচ।

হুগলী জেলায় মোটামুটিভাবে ২৮০টি ডাকঘর আছে। টেলিগ্রাম-অফিসও আছে প্রধান প্রধান শহর ও উপ-শহরে। ডাকঘরগুলির যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, প্রধান ডাকঘর একটি, উপ-ডাকঘর বা সাব-পোষ্ট অফিস ২৮টি, সংযুক্ত উপ-ডাকঘর বা জয়েন্ট সাব-পোষ্ট অফিস ২২টি এবং শাখা ডাকঘর বা ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস ২২৯টি। হুগলী জেলার প্রধান ডাকঘরটি চুঁচুড়ায় আছে। অন্যান্য ডাকঘরের সংখ্যা এইরূপ ঃ

থানা			উপডাকঘর	সংযুক্ত ডাকঘর	শাখা-ডাকঘর
চুঁচুড়া	—	—	৭	১	৫
গোঘাট	—	—	১	...	২৮
পুরসুড়া	—	—	—	—	১০
খানাকুল	—	—	—	১	২১
শ্রীরামপুর	—	—	৪	৪	...
উত্তরপাড়া	—	—	৩	২	৩
চণ্ডীতলা	—	—	১	১	২০
জঙ্গীপাড়া	—	—	১	—	১০
হরিপাল	—	—	১	১	১২
সিঙ্গুর	—	—	—	১	১৪
তারকেশ্বর	—	—	—	২	৮
চন্দননগর	—	—	৪	১	১
ভদ্রেশ্বর	—	—	১	২	২
পোলবা	—	—	—	—	১৬
ধনেখালি	—	—	১	—	১৯
মগরা	—	—	১	৩	১
বলাগড়	—	—	১	১	১৫
পাণ্ডুয়া	—	—	২	১	১৭
আরামবাগ	—	—	—	১	২১
		মোট	২৮	২২	২২৯

হুগলী জেলায় ১৬১টি ডাকঘরের তালিকা আদমসুমারির রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত হইল:

হুগলী জেলায় পোস্ট অফিসের তালিকা

১। ব্যান্ডেল জংশন ২' দেবানন্দপুর ৩। চুঁচুড়া বাজার ৪। চুঁচুড়া কোর্ট ৫। হুগলী ৬। [illegible] ৭। কামারপাড়া বাজার ৮। প্রতাপপুর ৯। তালডাঙ্গা ১০। বুড়োশিবতলা ১১। ধরমপুর ১২। কনকশালি ১৩। বারুল ১৪। ধনিয়াখালি ১৫। ভান্ডারহাটি ১৬। মান্দড়া ১৭। কানানদী ১৮। খাজুরদহ ১৯। দশঘরা ২০। গোপীনগর ২১। জামদাড়া ২২। কুমরুল ২৩। রাউথপুর ২৪। বেলমুড়ি ২৫। ভাস্তাড়া ২৬। বোসো ২৭। চোপা ২৮। গোবর আড়া ২৯। গুড়বাড়ি ৩০। গুড়ুপ ৩১। খানপুর ৩২। রাজহাট ৩৩। আকনা ৩৪। গোস্বামী মালিপাড়া ৩৫। পোলবা ৩৬। রামনাথপুর ৩৭। সুলতানগাছা ৩৮। হড়াল ৩৯। বাগনান-চৈতন্যবাটি ৪০। দাড়পুর ৪১। হারিট ৪২। কাটসারা ৪৩। মাকালপুর ৪৪। পাউনান ৪৫। পুইনান ৪৬। সুগন্ধা ৪৭। সেনেট ৪৮। বাবনান ৪৯। ত্রিবেণী ৫০। নয়া-সরাই ৫১। মগরা ৫২। দিগসুই ৫৩। বাশবেড়িয়া ৫৪। বাকুলিয়া ৫৫। বলাগড় ৫৬। ধোবাপাড়া।

৫৭। দিগড়া ৫৮। পাঁচপাড়া ৫৯। পাটুলিগ্রাম ৬০। সোমড়া ৬১। শ্রীপুরবাজার ৬২। পূর্বসাতগাছিয়া ৬৩। গুপ্তিপাড়া ৬৪। ডুমুরদহ ৬৫। বৈঁচি ৬৬। বৈঁচিগ্রাম ৬৭। বিলসোরা ৬৮। হারাল দাসপুর ৬৯। হাতনি ৭০। রায় জামনা ৭১। ইলছোবা মন্ডলাই ৭২। পান্ডুয়া ৭৩। আয়মা ৭৪। বেলুন ৭৫। দাবড়া ৭৬। দ্বারবাসিনী ৭৭। গজিনা দাসপুর ৭৮। ইটাচোনা ৭৯। জামগ্রাম ৮০। খন্যান ৮১। মহানাদ ৮২। পাঁচঘরা ৮৩। রামেশ্বরপুর ৮৪। সিমলাগড় ৮৫। বৈদ্যবাটি ৮৬। সেওড়াফুলি ৮৭। এংগাস ৮৮। ভদ্রেশ্বর ৮৯। বিঘাটি ৯০। মানকুন্ডু ৯১। রাজাবাজার ৯২। তেলিনীপাড়া ৯৩। হরিপাল ৯৪। দলপতিপুর ৯৫। দারহাট্টা ৯৬। মোড়া ৯৭। বন্দীপুর ৯৮। জেজুর ৯৯। কৈকালা ১০০। তারকেশ্বর ১০১। বালিগড়া ১০২। কেশবচক ১০৩। রামনগর ১০৪। তালপুর ১০৫। অমরপুর ১০৬। সিঙ্গুর ১০৭। চন্ডীতলা ১০৮। জনাই ১০৯। বেগমপুর ১১০। বাক্‌সা ১১১। জাঙ্গিপাড়া ১১২। আঁটপুর ১১৩। রাজবলহাট ১১৪। আরামবাগ ১১৫। আরান্ডি ১১৬। বড়ডোঙ্গল ১১৭। বাতানল ১১৮। ভালিয়া ১১৯। ডিহিবাগনান ১২০। কাপসিট ১২১। মাধবপুর ১২২। মায়াপুর ১২৩। নয়াসরাই ১২৪। সালেপুর ১২৫। তিরোল ১২৬। বেলমুড়ি ১২৭। কেশবপুর ১২৮। মলয়পুর ১২৯। রসুলপুর ১২৯। ভাঙ্গামোড়া ১৩১। দেউলপাড়া ১৩২। ঘরগোহাল ১৩৩। জঙ্গলপাড়া ১৩৪। কুলবাৎপুর ১৩৫। শোঙালুক ১৩৬। আলাতি ১৩৭। আনুড় ১৩৮। বাজুয়া ১৩৯। বালি-দেওয়ানগঞ্জ ১৪০। বেঙ্গাই ১৪১। ভুরকুন্ডা ১৪৩। গোঘাট ১৪৪। কামারপুকুর ১৪৫। কুমোরসা ১৪৬। মান্দারণ ১৪৭। নাকুন্ডা ১৪৮। রঘুবাটি ১৪৯। রতনপুর ১৫০। সন্তোষপুর ১৫১। রাধাবল্লভপুর ১৫২। বদনগঞ্জ ১৫৩। পান্ডুগ্রাম ১৫৪। শান্তিপুর ১৫৫। শ্যাম-বাজার ১৫৬। কুমারগঞ্জ ১৫৭। চুয়াডাঙ্গা ১৫৮। ঘোষপুর ১৫৯। ময়াল-বন্দীপুর ১৬০। ঠাকুরাণীচক। ১৬১। দেবখান্ডা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হুগলী জেলায় ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ১০৫টি অর্থাৎ প্রতি এগার মাইলে তখন পোষ্ট অফিস ছিল মাত্র একটি। আর এখন হুগলী জেলায় পোষ্ট অফিসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৮০টি এবং জেলার সর্বত্র গড়ে পাঁচ মাইলে বর্তমানে একটি করিয়া পোষ্ট অফিস আছে। ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে ৩ শত ৪১ মাইল রাস্তায় ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল; এখন উহা দ্বিগুণের বেশী হইয়াছে। পূর্বোক্ত বৎসরে হুগলী জেলায় ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার ২ শত ৬০ খানি পোষ্টকার্ড; ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৮ খানি খামের চিঠি; ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮ শত ৭২টি প্যাকেট; ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩ শত ৩৮টি খবরের কাগজ এবং ১৫ হাজার ২ শত ৩৬টি পার্সেল পোষ্ট অফিসের মারফৎ মালিকদের হাতে সমর্পণ করা হয়। আলোচ্য বৎসরে হুগলী হইতে মণিঅর্ডার যোগে ১৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত ৬৫ টাকা জেলার বাহিরে পাঠান হয় এবং বাহির হইতে হুগলী জেলায় ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩ শত ২০ টাকা আসে। সেই সময় হুগলী জেলায় ১৫ হাজার ৭ শত ৮৫ জনের পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে একাউন্ট ছিল বলিয়া জানা যায়।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ থেকে ডাকঘরের সমস্ত কাজকর্মে **মেট্রিক পদ্ধতির** প্রচলন করা হইয়াছে। কয়েকটি প্রধান ডাক-মাসুলের হার নিম্নরূপ ঃ

অন্তর্দেশীয়

চিঠিপত্র

প্রথম ১৫ গ্রাম—১৫ নঃ পঃ

অতিরিক্ত প্রতি ১৫ গ্রাম—১০ নঃ পঃ

প্যাকেট

প্রথম ৫০ গ্রাম—৮ নঃ পঃ

অতিরিক্ত প্রতি ২৫ গ্রাম—৩ নঃ পঃ

পার্সেল

প্রতি ৪০০ গ্রাম বা তার অংশ—৫০ নঃ পঃ

বৈদেশিক

চিঠিপত্র

প্রথম ২০ গ্রাম—৩০ নঃ পঃ

অতিরিক্ত প্রতি ২০ গ্রাম—২০ নঃ পঃ

মুদ্রিত কাগজপত্রাদি

প্রথম ৫০ গ্রাম—১২ নঃ পঃ

অতিরিক্ত প্রতি ৫০ গ্রাম—৬ নঃ পঃ

ব্যবসামূলক কাগজপত্রাদি ও নমুনার জন্য মাসুল

৩০ নঃ পঃ
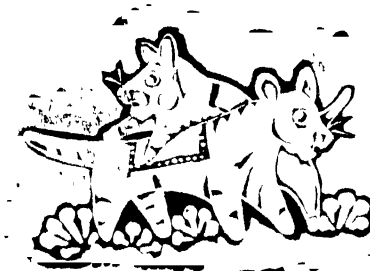
শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন শহরে যেরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, প্রাচীন কালে এইরূপ জনবহুল স্থানে কোন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল না। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে দ্বিজাতিকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) নির্জন অরণ্যবেষ্টিত গুরুর আশ্রমে যাইয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে হইত। যাঁহারা সকল উচ্চবিদ্যার পাণ্ডিত্যলাভে অভিলাষী হইতেন, তাঁহাদিগকে ছত্রিশ বৎসর কাল গুরুগৃহে থাকিতে হইত। "ষট্ ত্রিংশব্দাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্"। (মনু ৩।১)

যে সকল স্থানে দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করে, বর্তমানে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। ইউনির্ভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে আমরা বর্তমানে যে অর্থ করি, এই অর্থ আধুনিক। প্রাচীনকালে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না; 'পরিষদ' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জিনিষ ছিল এবং তাহা দ্বারাই বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহ হইত। University শব্দ মধ্য যুগে লাটিন ভাষায় প্রচলিত Universitas শব্দ হইতে গৃহীত। উহা লোক-সঙ্ঘের সমষ্টি অর্থে প্রযুক্ত হইত; পরে "জ্ঞানান্বেষী সম্প্রদায়ের" পরিজ্ঞাপক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরে সর্বপ্রথম 'পরিষদ' প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে যেরূপ অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ বা বর্ধমান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রের কথা জনসাধারণ আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকেন এবং কাশী বা নবদ্বীপ হইতে শিক্ষিত উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন অদ্যাপি ভারতের সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকেন, প্রাচীন-কালে সেইরূপ ভারতবাসীগণ কাশ্মীরীয় আচার্যের কথা বিশেষভাবে মান্য করিতেন, দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই কাশ্মীর বিদ্যার আদিস্থান বা 'সারদা-পীঠ' বলিয়া প্রখ্যাত।

ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালীর সহিত বর্তমান শিক্ষার কোন তুলনাই হয় না। বর্তমানে স্কুলে বা কলেজে যেমন প্রধান শিক্ষক (হেডমাষ্টার) বা অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপ্যাল) দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কালেও সেইরূপ অধ্যক্ষ থাকিত এবং তিনি 'কুলপতি' নামে অভিহিত হইতেন। বর্তমানে হেডমাষ্টার বা প্রিন্সিপালগণ বেতন লইয়া উচ্চশিক্ষা দান (?) করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে কুলপতিগণ বেতন লওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যেকে দশহাজার শিষ্যকে কেবল বিদ্যাদান নহে, শিক্ষা-সমাপ্তি পর্যন্ত ছাত্রগণকে অন্নদানাদি দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতেন। ইহাই ভারতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল; এই সম্বন্ধে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকাতে লিখিয়াছেন : "একো দশসহস্রানি যোহন্নদানাদিনা ভরেৎ। স বৈকুলপতিরিতি"

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোহন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিবসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেরূপ উচ্চশিক্ষার জন্য নির্জন স্থান নির্দিষ্ট ছিল, বৌদ্ধ-যুগেও সেইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গান্ধার ও উদ্যানে এবং পূর্বপ্রান্তে নালন্দায় বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিহারগুলির কর্তৃত্ব করিবার জন্য 'কুলপতি' ছিলেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে যে কুলপতি প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা মৃচ্ছ-কটিক নাটকের "তৎ পৃথিব্যাং সর্ববিহারেষু কুলপতিরয়ং ক্রিয়তাং" এই উক্তিটি হইতে বেশ বুঝা যায়।

চীন পরিব্রাজক হিউএন সিয়াং সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যান এবং তিনি সেই সময় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থীকে নালন্দায়, কেবল ভারতবর্ষের নহে, এমন কি সুদূর চীন, কোরিয়া, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আগত ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করিতেন, দেখিয়া যান; সেই সময় শীলভদ্র নালন্দায় 'কুলপতি' ছিলেন।

বৌদ্ধগণের সভ্যতা প্রাখর্যের সঙ্গে সঙ্গে মঠেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-প্রভাবের অবসান ও বৈদিক ধর্মের অভ্যুদয় কালে কান্যকুব্জ ও কাশীতে বৈদিক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে কনোজের বিদ্যালয় বিলুপ্ত হইলে বারাণসী ও নবদ্বীপ আজও শাস্ত্র অধ্যয়নের সর্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত।

সেন রাজাগণের সময়ে পূর্বতন আদর্শে মিথিলায় ও নবদ্বীপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য সম্পন্ন হইত। ষোড়শ শতাব্দী হইতে নবদ্বীপই ন্যায়চর্চার সর্বপ্রধান শিক্ষাপরিষদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অদ্যাপি ছাত্রগণ এই স্থানে শিক্ষার্থ আসিয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না বলিয়া শিক্ষার কোন ব্যাঘাত হয় নাই। হাতে লেখা পুঁথি দেখিয়া ছাত্রগণ গুরুগৃহে উহা নকল করিয়া লইতেন। এইভাবে বংশ-পরম্পরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচারিত হইত। এই সম্বন্ধে মহামহো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ—ছাপাখানা আমাদের দেশে বেশী দিন হয় নাই। যাঁহারা বড় পুরাণ খবর জানেন, তাঁরা হয়ত বলিবেন যে, হাল্‌হেড সাহেব

১৭৭৯ সালে হুগলীতে ছাপাখানা খুলিয়া ছিলেন। সে সকল ত পুরাণের কথা; আসল কথা এই যে, ছাপাখানাটা ৬০।৭০ বৎসর হইল খুব বেশী পরিমাণে হইয়াছে; তাহার আগে সকলেই হাতে লিখিয়া পড়িত, আমিও দুই একখানি পুঁথি হাতে লিখিয়া পড়িয়াছি। সবই লেখা হইত হাতে, একখানা হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া দশ জন নকল করিয়া লইত। লোকের যাহা কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-বিজ্ঞান ছিল, সব হাতের লেখা পুঁথিতেই থাকিত। ক্রমে যখন ইংরেজী পড়াশুনা খুব আরম্ভ হইল, ছাপা বহি খুব চলিতে লাগিল, লোকে আর পুঁথির তত আদর করিত না। ভট্টাচার্য মহাশয় পুঁথি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন, পৈতৃক পুঁথিগুলিকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় দেখিতেন, সর্বদা সেগুলিকে ঝাড়াঝুড়া করিতেন পুরু কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। ভাদ্র মাসে পুরা রৌদ্র পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না— সেইদিন পুঁথিগুলিকে রৌদ্রে দিতেন। সমস্ত দিন নিজে পাহারা দিতেন, পাছে হঠাৎ জল হইলে পুঁথিগুলি ভিজিয়া যায়। সন্ধ্যার পূর্বে সেইগুলিকে সযতনে সাজাইয়া রাখিয়া তবে ভট্টাচার্য মহাশয় নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার ছেলে ইংরেজী স্কুলে পড়িতে গেল, ক্রমে চাকরি করিতে গেল, বাবার বড় আদরের জিনিষ পুঁথিগুলিকে রক্ষা করিল, ফেলিয়া দিল না। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পৌত্র অল্প ইংরেজী লেখাপড়া শিখিল, তার পরে চাকরি করিতে গেল; পুঁথি-পাঁজির কোন ধারও ধারিল না। পৌত্রবধূ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় কত আবর্জনা রহিয়াছে। ছেঁড়া ময়লা কাল ন্যাকড়ায় জড়ান কতকগুলো কাগজ রহিয়াছে, তিনি সেগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হয়ত রাঁধিবার সময় কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলিতে লাগিল, তখন পুঁথি অথবা তাহার পাতার কথা মনে পড়িল; সুবিধা পাইলেন ত একখানা পুঁথি উনানে দিয়া ফেলিলেন অথবা পুঁথির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া বহুকালের শুষ্ক কাঠের পাটা দুখানি উনানে দিয়া সেদিনকার রান্না সারিয়া লইলেন। ১৯০৪ সালে একবার নবদ্বীপ গিয়াছিলাম; —দেখিলাম, একজনের বাড়ীর পিছনে রাস্তার ধারে রাশীকৃত পুঁথির পাতা পচিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাটাগুলি পোড়ান হইয়াছে। বাড়ীর গিন্নীমা সরস্বতীকে পোড়াতে চান না, তাই পুঁথিগুলি বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। যে বাড়ীর গিন্নীর মা-সরস্বতীর উপর অতটুকু কৃপা নাই, তাঁহারা পুঁথির পাতা লইয়া কি করেন, অনায়াসে বুঝা যায়।

মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে আরবা ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য এক একটি করিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইত। মুসলমান রাজত্বের অবসানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু দেশীয় লোকের শিক্ষার ভার তাহাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। এই সম্বন্ধে স্যার উইলিয়াম হান্টার লিখিয়াছেন ঃ

"During the early days of the East India Company's rule, the promotion of education was not recognised as a duty of Government. Even in England at that time education was entirely left to private

and mainly to clerical enterprise. A state system of instruction for the whole people is an idea of latter half of the present century."

ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ

সুসভ্য ও সুসমৃদ্ধ জাতিসমূহের মধ্যে ভারতীয় হিন্দুজাতিই সবচেয়ে প্রাচীন। হিন্দুজাতি যখন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে চূড়ান্ত সীমায় উপনীত, তখনই পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতিগণের জীবনে সবেমাত্র অরুণোদয়; তাও ভারতীয় হিন্দুর শিক্ষা-সভ্যতার আলোকে। সেই কথাই মনু বলিয়াছেন, "এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" সর্বাগ্রণী ভারতীয় জাতির কাছেই পৃথিবীর সকল মানব-সমাজ স্বীয় স্বীয় চারিত্র্যনীতি শিক্ষালাভ করেছে। বিদ্যা-চর্চায় ও শিক্ষা-দীক্ষায় প্রাচীনতম কাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দুজাতিই জগদ্‌গুরুর আসন অলংকৃত করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-সূর্যের অস্তাচল গমনে বিভীষিকাময়ী অন্ধতামসী নিশায় হিন্দুজাতির কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের উপর কালো যবনিকা-পতন হইল।

ভারতে বিদ্যা ও অবিদ্যার চর্চা॥—ভারতে শুধু আধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন হইত, জাগতিক বিদ্যার চর্চায় ভারত কখনো উৎকর্ষলাভ করেনি;—এরূপ ধারণা নিতান্ত অজ্ঞোচিত। আবহমানকাল ভারতে উভয় প্রকার জ্ঞানের চর্চা হইত। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে" দুই প্রকার বিদ্যা—আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষণীয়। পাখী যেমন একটিমাত্র পাখায় ভর করে উড়তে অক্ষম, তেমনি একটি মাত্র বিদ্যা অর্জনে মানুষের চলে না। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু প্রয়োজন, তা অর্জন ও সংগ্রহের জন্য তাকে লৌকিক বিদ্যা—শাস্ত্রে যাকে অবিদ্যা বলেছেন—লাভ প্রয়োজনীয়। এই মরজীবনই মানুষের শেষ নয়। জন্ম-জন্মান্তর-ক্রমে এই মর জীবনের সোপান বেয়ে মানুষকে দিব্য জীবনে অমৃতের রাজ্যে পেঁাছলে তার যাত্রা সমাপন। তজ্জন্য তাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা বা সংক্ষেপে বিদ্যার সাধনাও করতে হবে। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে।" অবিদ্যা বা লৌকিক বিদ্যার দ্বারা বেঁচে থাকতে হবে এবং বিদ্যার সাধনায় অমৃতত্ব বা মোক্ষ বা পরমা শান্তি লাভ করতে হবে।

আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার বিষয়-বৈচিত্র্য॥—ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে নারদ তদীয় গুরু সনৎ-কুমারের নিকট স্বীয় অধীত বিদ্যাগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব—চারিবেদ, ইতিহাস-পুরাণ—পঞ্চম বেদ, ব্যাকরণ, পিতৃলোক-সম্পর্কিত বিদ্যা, রাশি-(গণিত) বিদ্যা, দৈবত বিদ্যা (সম্ভবতঃ ফলিত জ্যোতিষ), নিধিবিদ্যা (খনিজ শাস্ত্র), বকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিবিদ্যা, দেব-বিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, যুদ্ধ-বিদ্যা, নক্ষত্র-বিদ্যা (জ্যোতির্বিদ্যা), সর্প-বিদ্যা, দেবজনবিদ্যা ((নৃত্য, গীত, গীত, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি) শিক্ষা করিয়াছেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে প্রাচীনতম কালেও ভারতে সর্ববিধ বিদ্যার (লৌকিক ও আধ্যাত্মিক) অনুশীলন হত।

শ্রীকৃষ্ণের গুরুগৃহে বিদ্যা-শিক্ষা প্রসঙ্গে ভাগবত উল্লেখ করেছেন যে তৎকাল-প্রচলিত যাবতীয় বিদ্যা তিনি অত্যল্পকালের মধ্যে আয়ত্ত করেছিলেন। সেই মহাভারতীয় যুগে

(কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল পাঁচ হাজার বছরেরও আগে) কত প্রকার বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হত, তার বিবরণ দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়।

সান্দীপনি মুনির অন্তেবাসী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ছয় বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ সহ চতুর্বেদে, মন্ত্র দেবতা ও জ্ঞানের সহিত ধনুর্বেদে, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রে, মীমাংসাদি দর্শন-শাস্ত্রে, তর্কশাস্ত্রে এবং ছয় প্রকার রাজনীতি বিদ্যায় (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়) পারঙ্গম হলেন। এতদ্ভিন্ন স্বীয় অলৌকিক প্রতিভার বলে তিনি চৌষট্টি দিনে চৌষট্টি প্রকার কলা-বিদ্যা অধিগত করেন।*

চৈনিক পরিব্রাজক **ইৎসিং ও হিউয়েন চোয়াঙের** বিবরণ থেকে জানা যায় যে **নালান্দা, বিক্রমশীলা** প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিলঃ—

১। চতুর্বেদ ও বেদাঙ্গ ২। বৌদ্ধ হীনযান ধর্মপুস্তক ৩। মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্বনিচয় ৪। ন্যায়শাস্ত্র ৫। ব্যাকরণ ৬। রসায়ন শাস্ত্র ৭। চিকিৎসা-বিদ্যা ৮। যাদুবিদ্যা ৯। যোগশাস্ত্র ১০। জ্যোতিষ ১১। ব্যবহারিক শাস্ত্র ১২। শিল্পস্থান বিদ্যা ১৩। ধাতুবিদ্যা ১৪। তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্র।

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক যুগে ভারতে লৌকিক ও অধ্যাত্ম—উভয় প্রকার বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা—সমান তালে অনুশীলিত হত। তথাপি অধ্যাত্ম বিদ্যাই ছিল মুখ্য, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের মূল কাঠামো। লৌকিক বিদ্যা ছিল গৌণ—এই বিচারে যে অধ্যাত্ম বিদ্যার ভিত্তিতে ও সাথে যুক্ত হয়ে তার অধ্যয়ন অধ্যাপনা হত। বর্তমান ভারতের মত নীতি-ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে লৌকিক বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল না। পরন্তু বিদ্যার্থী ও শিক্ষা-দাতার জীবন ছিল—নীতি ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত।

ভারতীয় শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যের কারণ॥—প্রাচীন ও ঐতিহাসিক যুগে ভারতের শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল, তার কারণ কী? গ্রীস ও পরে রোম যখন উন্নতির শিখরে আরূঢ়, তখনো ভারতীয় শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ছিল স্বীয় আদর্শে অটুট। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মূলেক

*গীত বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, চিত্রবিদ্যা, বিশেষক-ছেদ্যবিদ্যা, তণ্ডুল কুসুমাবলিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশন-বসনাঙ্গরাগ, মণি-ভূমিকা-কর্ম, শয়ন-রচনা, উদক্—বাদ্য, উদ্গাঘাত, চিত্রা যোগ, মাল্য-গ্রন্থন-বিকল্প, কেশ-শেখরাপীড়-যোজনা, নেপথ্য যোগ, কর্ণপত্রভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণ-যোজন, ইন্দ্রজাল, কৌচুমার যোগ, হস্ত-লাঘব, চিত্র-ভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া, পানক-রস-রাগাসবযোজন, সূত্রক্রীড়া, বীণাডমরুবাদ্য, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্বচ যোগ, পুস্তক বাচক, নাটিকা-খ্যায়িকা-দর্শন, কাব্য-সমস্যাপূরণ, পট্টিকা-বেত্র—বাণ—বিকল্প, তর্দ্দুকর্ম, তক্ষণ, বাস্তু-বিদ্যা, রূপ্য, ধাতুবাদ, মণিরাগ, আকর জ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্বেদ-যোগ, মেষ-কুক্কুট-যুদ্ধ বিধি, শুক-শারিকা-প্রলাপন, উৎসাদন, কেশ—মার্জন, অক্ষর—মুষ্টিকা-কথন, ম্লেচ্ছিত-বিকল্প, দেশভাষা জ্ঞান, পুষ্প-শকটিকা, যন্ত্র-মাতৃকা, ধরণা-মাতৃকা, সংপাট্য, মানসী-কাব্য-ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিকল্প, ছলিতক যোগ, কোষ-ছন্দ-জ্ঞান, বস্ত্র-গোপন, দ্যূত, আকর্ষণ ক্রিয়া, বাল-ক্রীড়নক বৈনায়কী, বৈজয়িকী, বৈতালিকী;—এই চতুঃ ষষ্ঠী কলা-বিদ্যা।

হিন্দু-ভারতের অধ্যাত্ম জীবন-ধারা ছিল স্বভাবতঃ অন্তর্মুখী; সুতরাং পল্লী-কেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে ইহ-সর্বস্ব জীবন-ধারা বহির্মুখী সুতরাং নগর-কেন্দ্রিক। ভারতের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—ঐহিক জীবনের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তি বা আত্মতত্ত্বোপলব্ধি। ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা তাই পল্লী-কেন্দ্রিক। অভারতীয় ও অহিন্দু জাতিসমূহের লক্ষ্য, কাম্য ও করণীয় ইহজগৎ ও ঐহিক জীবনে সীমাবদ্ধ। সুতরাং তাদের অনুসৃত সংস্কৃতি-সভ্যতা অর্থ ও কামের অনুগামী। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি নাগরিক-জীবনৈক-কেন্দ্রিক।

শান্ত স্নিগ্ধ পল্লী-প্রান্তে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ছিল প্রাচীন তপোবন বা **গুরুগৃহ**। প্রত্যেক আর্য বালক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং উপযুক্ত শূদ্রও শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হত। সেখানে শিক্ষার্থিগণ উপনয়ন গ্রহণ পূর্বক গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ অনলস জীবন যাপন করত। আদিতে আর্য বালিকাগণও উপনয়ন গ্রহণ পূর্বক শিক্ষার্থিনী হয়ে গুরুগৃহে বাস করত। পরবর্তীকালে সমাজের অবস্থা জটিলতর হওয়ায় সমাজ-স্রষ্টা মনুর বিধানে নারীদের উপনয়ন-প্রথা ও গুরুগৃহে গমনপূর্বক শিক্ষালাভ-প্রথা রহিত হয়। মনু বিধান দিলেন—"বৈবাহিক বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো—বৈদিকোমতঃ"। বিবাহ-সংস্কারই নারীদের বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুগৃহবাস, পারিবারিক কর্তব্যই যজ্ঞানুষ্ঠান।

গুরুর আশ্রমে বিদ্যার্থিগণের কতকগুলি অবশ্য পালনীয় নিত্যকর্তব্য ছিল। অতিপ্রত্যূষে গুরুর গাত্রোত্থানের পূর্বে শিষ্যকে শয্যাত্যাগ করতে হত। রাত্রিতে গুরু শয্যাগ্রহণ করলে পর শিষ্য শয্যাগ্রহণ করত। ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী প্রত্যহ ভিক্ষায় বাহির হত। ভিক্ষালব্ধ অন্নে গুরু-পরিবারের সেবা করিয়া পরে নিজে ভোজন করত। গুরুর গৃহরক্ষা, যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ ও সমিধ্ সংগ্রহ, যজ্ঞাগ্নি রক্ষা, কৃষি-কার্যে সহায়তা, গোধন-পালন ইত্যাদি করতে হত।

শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যারা প্রবীণ তারা ক্রমে গুরু-পর্যায়ভুক্ত হয়ে কনিষ্ঠ বিদ্যার্থিগণকে পাঠ শিক্ষাদান ও পরিচালন করত। এরূপে শিক্ষকের অভাব পূরণ হত। এরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে **'গুরুকুল'** শিক্ষামৃত পরিবেশন করতেন, বিদ্যার্থি শিষ্য-সম্প্রদায় অমৃত পান করতেন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল নিঃশুল্ক। গুরু ছিলেন—একাধারে বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণের পালন-পোষণকারী পিতা, বিদ্যাদাতা অধ্যাপক এবং অধ্যাত্ম সাধনার গুরু। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এমনিতর ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ থাকায় অন্তরে বাহিরে পরস্পর স্নেহ-বাৎসল্য-ভক্তি-সেবার সুমধুর অকৃত্রিম আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য বন্ধন রচিত হত।

গুরুকুলের শিক্ষার্থীদের ব্যয় নির্বাহের ভার ছিল প্রধানতঃ রাজাদের উপর। তারা গ্রাম দান করতেন। এই গ্রাম সমূহের নাম হত **"অগ্রহারগ্রাম"**। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণকে ভিক্ষাদান গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য ছিল। সুতরাং 'গুরুকুল' পালনে ধনীদের ত বটেই, সাধারণ গৃহস্থদের দানও যথেষ্ট ছিল।

গুরু গৃহশিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

(১) শিক্ষাদান নিঃশুল্ক থাকায় গুরু ও ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যথাক্রমে স্নেহ-বাৎসল্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধা-সেবার সম্বন্ধ সহজ হত। তাতে হৃদয়-বৃত্তির অনুশীলন ও উন্মেষ-বিকাশ-প্রকাশ ঘটত। বর্তমান যুগের মত শিক্ষা হৃদয়হীন, শুধু মস্তিষ্কসার ছিল না। হৃদয় ও মস্তিষ্কের যুগপৎ অনুশীলন ও বিকাশ হত।

(২) ব্রহ্মচারিকে 'শান্ত', 'দান্ত', 'উপরত', 'সমাহিত' ও তিতিক্ষু' হয়ে অধ্যয়নে ব্রতী হতে হত। বিদ্যার্থী কদাচ বিচলিত হবে না, সর্বদা ইন্দ্রিয়-সুখে বিরত থাকবে, আত্ম-সংযমী হবে, নিবিষ্ট ও সহিষ্ণু হয়ে বিদ্যাচর্চা করবে। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শান্ত পল্লী-প্রান্ত-পরিবেশে চিত্ত-বিক্ষেপের কোনো কারণ না থাকায় ইন্দ্রিয়-দমন ও মনঃসংযম,—কঠোর জীবন যাপন সহজ, স্বাভাবিক, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর হত।

(৩) গুরু-গৃহের যাবতীয় করণীয় ও গুরু-শুশ্রূষামূলক যাবতীয় কার্য সম্পাদনের দ্বারা বিদ্যার্থী নিরলস, কর্মঠ, উদ্যোগী হত। পরবর্তী গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য কার্যেরও শিক্ষালাভ হত।

(৪) গুরু-গৃহের যাবতীয় কাজ ও ভিক্ষা সংগ্রহের সূত্রে অন্তরের অহঙ্কার-অভিমানাদি বিদূরিত হত। রাজা বা ধনীদের সন্তানও সাধারণ গৃহস্থ-সন্তানদের সহিত একত্র এক পর্যায়ভুক্ত হয়ে গুরুগৃহে বাস পূর্বক বিদ্যাভ্যাস করত।

(৫) ঋষিমুনি বা ঋষিতুল্য গুরুগণের উন্নত চরিত্র, মহান্ জীবনাদর্শ এবং সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বচ্ছ প্রজ্ঞা বিদ্যার্থিগণের জীবন ও চরিত্রের উপরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করত।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার বয়স

পাঠ্যসূচীর পরিধি এবং ব্রত উদ্‌যাপনে বিদ্যার্থীর নিষ্ঠা বিচার পূর্বক অধ্যয়নের কাল নিরূপিত হত। মহাভারতে জীবনের চারি ভাগের এক ভাগ অধ্যয়ন কাল নির্দ্ধারিত আছে। পাঁচ বৎসরে আরম্ভ করে ত্রিশ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপনের ব্যবস্থা নির্দেশ ছিল। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায় যে ভারতীয় বিদ্যার্থিগণ সপ্তবিংশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত বিদ্যাভ্যাসে নিরত থাকত।

গুরু-গৃহের পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দান পূর্বক বিদ্যার্থী সমাবর্তন পূর্বক গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করত। গুরুগৃহ-বাসকালেই স্বাভাবিক ভাবে যাদের অন্তরে দারৈষণা, বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা ক্ষীণ হয়ে আসত, তারা গুরুগৃহ থেকেই পরিব্রাজন পূর্বক সমগ্র জীবন বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যা বিতরণ, অধ্যাত্ম সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রচার এবং সমাজ-হিতৈষণা-মূলক কর্মব্রত গ্রহণ করতেন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাদান ছিল শ্রুতিগত। এখনকার মত গাদা পুঁথি কেতাব নিয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলত না। গুরু মুখে মুখে শিক্ষণীয় বিষয় ব্যাখ্যা করতেন, আর শিষ্য বিদ্যার্থিগণ শ্রবণ ও মনন করত। গুরুগৃহের আচার্যগণ ছিলেন জ্ঞান ও বিদ্যার এক

একখানি বিশ্বকোষ, মনের সমগ্র শক্তি যার সংহত ও আয়ত্ত হয়েছে, তেমন আচার্য ও শিষ্যগণের পক্ষে শ্রবণ-মনন ও স্মৃতিশক্তির সহায়ে সমগ্র অধীত বিষয় অধিগত করা কিছুমাত্র আশ্চর্য বিষয় নয়।

বর্তমান যুগে ছাত্রগণের মনোবিক্ষেপ ও মনোবিভ্রান্তির শতেক দুয়ার খুলে দিয়ে তাদের জীবনের সর্বনাশের আয়োজন করা হয়েছে। অথচ মনোবৈজ্ঞানিক কত প্রকার **'কিণ্ডর গার্টেন' 'মন্তেসরী'** প্রভৃতি শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন হচ্ছে। বিদ্যার্থী-সমাজ কিন্তু দিনের পর দিন মনুষ্যত্ব-হীনতা ও বর্বরতার অতলে ডুবছে।

দশ হাজার বিদ্যার্থীকে যিনি ভরণ-পোষণ ও বিদ্যাদান করতেন, তাঁকে **কুলপতি** বলা হত। বস্তুতঃ এরূপ কুলপতিকে কেন্দ্র করে এক একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় চলত। **দুর্বাসা, কণ্ব, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য** প্রভৃতি কুলপতি ছিলেন। এরূপ মুনিরাজগণকে সশিষ্য পালন-পোষণ রাজন্যবর্গ সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে মনে করতেন। পঞ্চপাণ্ডব যখন বনবাসে অবস্থিত, তখনো তারা বিশ সহস্র ঋষি-মুনি-ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করছেন। এই বিশ সহস্রের মধ্যে কুলপতি, আচার্য, বিদ্যার্থী সবাই ছিলেন।

প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি ॥—উপক্রম, শ্রবণ, অভ্যাস, অর্থবাদ, ফল, উৎপত্তি, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি পাঠের সোপানসমূহ। পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা পূর্বক পাঠের **উপক্রম।** গুরুর নিকট হতে জ্ঞানগর্ভ বাণী—**শ্রবণ।** সমবেত ভাবে আবৃত্তি—**অভ্যাস।** তৎপরে বিষয়বস্তুর **মর্মার্থবাদ** আলোচনা। তৎপরে সতীর্থগণ পরস্পর আলোচনা পূর্বক **তথ্য আহরণ।** ফলে **উপপত্তি** বা যুক্তির সহায়ে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ। তৎপরে একক প্রচেষ্টায় **মনন ও নিদিধ্যাসন। কৌটীল্যের** মতে মৌর্যযুগে বিদ্যার্থিগণের অধ্যয়ন-ক্রম ছিল—'শুশ্রূষা', 'শ্রবণম্', 'ধারণম্', 'উহপোহম্', "বিজ্ঞানম্", "তত্ত্বাভিনিবেশম্"।

বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা ॥ বৌদ্ধ প্রভাবের যুগেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ পাশা-পাশি সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি মূলতঃ ঠিকই ছিল; পরিস্থিতি অনুসারে আকৃতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছিল। বৌদ্ধযুগে সংঘ-বিহার-সংঘারাম প্রভৃতিই ছিল শিক্ষালয়। অষ্টম বর্ষে বিদ্যার্থী সংঘে প্রবেশ করত। শিক্ষার্থীকে হতে হবে—রোগ-মুক্ত, অঋণী, অ-ক্রীতদাস। শিক্ষার্থীকে দশ দিন হতে এক মাস পর্যন্ত 'উপাসক' ব্রত নিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ পূর্বক—জীবহত্যা, চৌর্য, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার ও মাদক দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার উপদেশ গ্রহণ করতে হত। বিদ্যার্থীকে মস্তক মুণ্ডন, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও ভিক্ষাপাত্র ধারণ করতে হত। গুরুশুশ্রূষা ও গুরুসেবা বিদ্যার্থীগণের বিশেষ কর্তব্য ছিল।

ইৎসিং এর বর্ণনায় পাওয়া যায়—৬ষ্ঠ বর্ষ বয়সে বিদ্যারম্ভ; অষ্টম বর্ষে পানিনি

শুশ্রূষা=বিদ্যালাভের আগ্রহ ও উদ্যোগ। শ্রবণম্=গুরুমুখে বিদ্যা-ব্যাখ্যা শুনা। গ্রহণম্=আচার্যের বাক্যের মর্মার্থ-বোধ। ধারণম্=স্মৃতি-সহায়ে শিক্ষণীয় বিষয় ধারণ। উহপোহম্=পরস্পর অধীত বিষয়ের আলোচনা। বিজ্ঞানম্=অধীত বিদ্যার সামগ্রিক বোধ। তত্ত্বাভিনিবেশম্=অধীত বিদ্যার মর্ম-প্রবেশ— **কৌটিল্য ম্বাবিংশ অধ্যায়।**

ব্যাকরণের প্রথমাংশ, দশম বর্ষে ব্যাকরণের কঠিনতর অংশ; পঞ্চদশ বর্ষে পানিনি ব্যাকরণ, পতঞ্জলি মহাভাষ্য, হেতুবিদ্যা, অভিধর্ম, প্রভৃতির অধ্যাপনা হত। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য নালান্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হত। হিন্দু মঠ-মন্দির-আশ্রমগুলিও ছিল শিক্ষালয়। সে-গুলিতেও প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি সুচারুরূপে অনুসৃত হত।

বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ঐতিহাসিক যুগে ভারতে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; সেগুলি আন্তর্জাতিক বিদ্যাচর্চা-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে ছাত্রগণ বিদ্যালাভের জন্য সেখানে আসত।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন—**পানিনি, চাণক্য, শুশ্রুত, জীবক** ইত্যাদি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান। রাজপুত্রগণকে সাংখ্য, যোগ ও লোকায়তদর্শন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং দন্ডনীতি (রাজধর্ম), সমরবিদ্যা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শিল্পকলাও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যারও শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল।

নালান্দা ও **বিক্রমশীলা** বিশ্ববিদ্যালয়ও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন, ইউয়েন চোয়াং নালন্দা দর্শন করেন। নালন্দার মত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান যুগেও কোনো দেশে নাই। নালন্দায় দশ হাজার, বিক্রমশীলায় পাঁচ হাজার শিক্ষক ও ছাত্র একত্র বাস করতেন। শিক্ষা অবৈতনিক ছিল।

ইৎসিংয়ের বর্ণনায় নালন্দার পাঠ্য বিষয় ছিল—মহাযান ও হীনযান ধর্মপুস্তক, থেরবাদ, তত্ত্বনিচয়, ন্যায়শাস্ত্র, শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ), রসায়ন-বিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা, যোগশাস্ত্র, যাদু-বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, ব্যবহারিক শাস্ত্র, শিল্পস্থান-বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র ইত্যাদি। নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ে অতীশ দীপঙ্কর, শান্তরক্ষিত, শীলভদ্র প্রভৃতি বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন অধ্যাপক ছিলেন। বল্লভী, কাশী, কাঞ্চী, ওদন্তপুরী, বিক্রমমনিপুর প্রভৃতি আরও বহু বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

সমাজের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সূত, ভাট, চারণ প্রভৃতি প্রচারকগণের মাধ্যমে পল্লীতে পল্লীতে পূজা, পার্বণ, যজ্ঞ ইত্যাদি এবং উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে। জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে মহাভারতের এবং পরীক্ষিতের সভায় ভাগবতের প্রচারের কথা প্রসিদ্ধ। রাজপুত চারণগণ দেশ-প্রেম-মূলক ও কীর্তি-মূলক সঙ্গীতাদি দ্বারা জাতিকে সঞ্জীবিত করে রাখতেন। ঐতিহাসিক যুগে যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কবি ইত্যাদির মাধ্যমে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সুপ্রাচীন কাল থেকে একই আদর্শে ও পদ্ধতিতে চলে এসেছে। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী আয়োজন ও আকৃতির বদল ঘটেছে। পরাধীনতার সার্ধ সাত শত বর্ষের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক বিপ্লবের ফলে ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি এখন বিলুপ্ত। ভারতের জাতিও তাই আজ হৃতগৌরব অধঃপতিত, বিপর্যস্ত। (প্রণব)

১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষা ও স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে সদস্যগণ কর্তৃক নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে।

A typical Hindu grand mother of the old stock has an unfailing memory for sacred tales and folklore, both of which she imparts to her grandchildren from their infancy.

হুগলী জেলাকে 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র' বলিয়া অভিহিত করা হয়; কারণ শিক্ষার দিক হইতে এইরূপ উন্নত জেলা বঙ্গদেশে আর নাই। পাশ্চাত্যধরণের স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বঙ্গদেশে ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখা দেয় এবং নূতন ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং নবভাবে বঙ্গভাষার পত্তন এই হুগলী জেলা হইতেই আরম্ভ হয়। প্রথম ইংরাজী শিক্ষা এই স্থানের অধিবাসিগণ সর্বপ্রথম গ্রহণ করিবার সুযোগ পাওয়ায় এই জেলা ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল এবং ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষেত্রে হুগলী জেলার অধিবাসিগণই অগ্রণী হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়।

As regards knowledge of English, the ratio in the case of males is the highest in the Province outside Calcutta and Howrah, where conditions are exceptional owing to the numbers of Europeans resident in those two cities. (২).

হুগলী জেলার শিক্ষা-বিস্তারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন শ্রীরামপুরের মিশনারীবৃন্দ। তাঁহারা এই স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন এবং দেশীয় খৃষ্টানগণের শিক্ষার নিমিত্ত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে বঙ্গদেশের প্রথম শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মার্শম্যান সাহেবের চেষ্টায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং উক্ত বৎসরে তাঁহার সহধর্মিণী হ্যানা মার্শম্যানের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে বালিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়।

এই সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন "খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গলাভাষায় যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্য সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গলা পদ্য রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গলা গদ্য রচনা সর্মাধক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। (৩)

॥ শ্রীরামপুর কলেজ ॥

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারীগণ কর্তৃক শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগগুলি খোলা হয়। ইহাই বঙ্গদেশে পাদ্রীদের প্রথম কলেজ। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ইহাকে গঠন করিবার জন্য তাহাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড

সাহেব এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব পরলোকগমন করায়, তাহাদের শুভ ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুতের জন্য একটি কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতে শিক্ষা বিস্তার ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্ণর পাদরীদিগকে শ্রীরামপুরে স্থান দেওয়ায় উইলিয়ম কেরী, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন ফাউন্টেন, ডি, ব্রানসলো এবং জশুয়া মার্শম্যান ২৫শে এপ্রিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মাননীয় কর্ণেল বাই-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইল। শ্রীরামপুরে স্থান না পাইলে তাহাদিগকে এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইত।

25th April, 1800.

To the Honourable Colonel Bie :

Sir,

Having set apart this day in our family to return thanks to God for the establishment of our missionary settlement in this country we could not but recollect the many gracious and important favours which we have received at your hands. We have prayed and shall not cease to pray that our Heavenly Father may pour His most sacred Benediction upon you and long make you a blessing to the world. We hope our conduct will always show that our gratitude is sincere and that we aim at being truly the disciples of Him who exhibited a perfect pattern of obedience.

Accept, Sir, our united and fervent acknowledgments in which we know our Society in England would be happy to concur.

We are, Sir,

Your most affectionate and obedient servants.
William Carey. William Ward. John Fountain..
D. Brunslow, J. Marshman,

শ্রীরামপুর তৎকালে দিনেমারদের হস্তে ছিল এবং কেরী সাহেবের 'মিশনস্কুলে' কলিকাতা হইতে সমস্ত ইউরোপীয় ছাত্রগণ তখন পড়িতে যাইত। কলিকাতা গেজেটে এই বিদ্যালয়ের প্রায়ই The Mission School at Serampur under Mr. Carey বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হইত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেবের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য একটি টোল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে তৎকালীন "সমাচার দর্পণ" পত্রে (২০শে মার্চ, ১৮১৯) যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

"শ্রীরামপুরের টোল—শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কলেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কলেজে

নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহু প্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক একজন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গলা দেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ি সর্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি ভাস্কতাচার্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় বাঙ্গলা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেবলোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্যকে সভাপতি করিয়া এই কলেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন। অতএব যদি কাহার জ্যোতিশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।”

১৮২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজে ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সংবাদ ১৩ই জুলাই তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়। নিম্নে সংবাদটি উদ্ধৃত হইল :

শ্রীরামপুরের কলেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরা বাসনা করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু কিম্বা মুসলমানের সন্তানেদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগ্যবান লোকের সন্তানেরা ইংরাজী শিক্ষার্থে আসিবেন তাঁহারা অত্যল্প ব্যয়েতে বিদ্যা পাইবেন। ঐ বিদ্যার্থিরা অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিবেন কিন্তু কলেজের রীত্যনুসারে তাহাদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ সময়ানুসারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে যে যে ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কলেজের শিক্ষাদাতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কলেজের ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের কোন স্থানে হয় না যেহেতুক এই কলেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোলবিদ্যা ও রসায়ণ বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা ও পূর্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এই বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শ্রীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীযুত রিবরেণ্ড ডাক্তার কেরী সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন।”

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সর্তানুসারে দিনেমারগণ তাহাদের ভারতীয় যাবতীয় সর্ত ত্যাগ করেন। উক্ত সর্তের ষষ্ঠ ধারায় শ্রীরামপুর কলেজ এবং পূর্বোক্ত পাদ্রীগণের শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিত আছে। নিম্নে উক্ত ধারাটি উদ্ধৃত হইল :

“Article VI—The Church Missionary Board at Copenhagen for the Propagation of the Gospel shall be at liberty to continue

their exertions in India for the conversion of the heathens to the Christian religion, and shall be afforded the same protection, by the Government of India as similar English Societies under the general law of the land; the rights and immunities granted to the Serampore College by Royal Charter, of date 23rd of February 1827, shall not be interfered with, but continue in force in the same manner as if they had been obtained by a Charter from the British-India."

এই সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে যাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, স্নাতোকোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে অতঃপর ডিগ্রি দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়:

In 1818 Carey, Marshman and Ward opened the first missionary College at Serampore. It rested upon the foundation of a whole group of Schools which they had earlier established, and in 1827 it actually received, from the King of Denmark, a Charter empowering it to grant degrees. (৫) (Vol. I, Part I, Pages 33-34)

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের এবং শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্ণর কর্ণেল কেফটিং-এর পৃষ্ঠপোষকতায়, কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের দ্বারা শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহারাই কলেজ-কাউন্সিলের প্রথম সভ্য ছিলেন। ভারতের যুবকবৃন্দকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে খৃষ্টধর্ম প্রচার কল্পে শিক্ষা দিবার জন্যই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮২১ খৃষ্টব্দে ডেনমার্কের অধিপতি ষষ্ঠ ফ্রেড্‌রিক এই কলেজে সাহায্য করেন এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে 'রাজকীয় সনন্দ' (The Royal Charter) দ্বারা এই বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণকে 'ডিগ্রি' দেওয়া হইবে স্থির হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারগণ শ্রীরামপুর ত্যাগ করিলে ইংরেজদের সহিত এই কলেজের জন্য কি সর্ত লিখিত ছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরামপুর কলেজ-ভবন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ভবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্যালেন্ডারে' এই ভবনের বিষয় লিখিত আছে:

The College building, erected in 1818 by Dr. Carey and his colleagues, still remains one of the finest College buildings in India.

এই কলেজের জন্য স্থান ও টাকা সংগ্রহ মিশনারীগণের চেষ্টায় সম্পন্ন হয় এবং ভবনটি নির্মাণ করিতে পনের হাজার পাউন্ড ব্যয় হইয়াছিল। এই ভবনের এক অংশে কেরী সাহেব বাস করিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যে আটটি কলেজ ছিল, শ্রীরামপুর কলেজ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ (Baptist Missionary Society) ইহাকে ভারতের খৃষ্টীয় ধর্ম বিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র শিক্ষালয় রূপে পরিগণিত করিবার জন্য, অন্যান্য বিভাগগুলি বন্ধ করিয়া ইহার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, আহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে সময়ে বাক্য-রচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া হইত। যে যত অধিক সংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, তাহার ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তত খ্যাতি প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শোনা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন, যে এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোন বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন অধ্যক্ষ ডক্টর হাউএলস্, প্রোটেস্টান্ট মিশনারীগণের সম্মিলিত আবেদনে ইহাকে প্রতিষ্ঠাতাগণের শিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম যন্ত্ররূপে পুনরায় পরিচালন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন ও সর্বসাধারণের জন্য শ্রীরামপুর কলেজ পুনরায় উন্মুক্ত করা হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত (affiliated) হয়। আর্থিংটন-ট্রাষ্টিগণ কর্তৃক আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে অধ্যাপকগণের ও ছাত্রবৃন্দের বসবাসের জন্য একটি হোষ্টেল নির্মিত হওয়ায় ইহার সৌন্দর্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীরামপুর কলেজ এ্যাক্ট' বলিয়া এক আইন পাশ হয়; কলেজ কাউন্সিলে চৌদ্দজন সভ্য আছেন এবং বিলাতে ইহা অবস্থিত হইলেও 'ফ্যাকালটি" আভ্যন্তরিক ব্যাপারও পরিচালনা করেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম-বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা দিবার জন্য কলেজের সেনেট যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। সতের জন সদস্য লইয়া শ্রীরামপুর কলেজের 'সেনেট' গঠিত এবং রেভারেণ্ড জ্ঞানরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড এস, কে, চাটার্জি প্রভৃতি বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণ এই সেনেটের সদস্য ছিলেন। একমাত্র ভারতীয় মিঃ সি, আব্রাহাম এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। নিম্নে শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষগণের নাম প্রদত্ত হইল ঃ

১৮১৮—উইলিয়াম কেরী,
১৮৩২—জশুয়া মার্শম্যান,
১৮৩৭—জন ম্যাক
১৮৪৫—ডবলিউ, এইচ, ডেনহ্যাম
১৮৫৮—জন ট্রাফোর্ড
১৮৭৯—এ্যালবার্ট উইলিয়াম
১৮৮৩—ই, এস, সামারস্
১৯০৬—জর্জ হাউয়েলস্
১৯২৯—জি, এঙ্গাস
১৯৪৯—সি, আব্রাহাম
১৯৫৯—উইলিয়াম ষ্টুয়ার্ট

॥ হুগলী কলেজ ॥

হুগলী মহসীন কলেজ, হাজী মহম্মদ মহসীনের টাকায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। হুগলীর সিভিল সার্জেন ডাঃ টমাস ওয়াইজ এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং তাঁহার চেষ্টায় এই কলেজের যথেষ্ট উন্নতি হয়। পূর্বে ইহার নাম "কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন" ছিল; পরে ইহা "হুগলী কলেজ" বলিয়া খ্যাত হয়। বর্তমানে উক্ত

নাম পরিবর্তিত হইয়া "হুগলী মহসীন কলেজ" নামে ইহা পরিচিত। কলেজের বিস্তৃত হলে একখানি প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

COLLEGE OF MOHAMMAD MOHSIN—The College was established through the munificence of the late Mohammad Mohsin and was opened on the 1st of August 1836.

বর্তমান কলেজের সুরম্য ভবনের একটি ইতিহাস আছে। পূর্বে ইহা জেনারেল পেরন নামক এক ফরাসী সাহেবের ছিল। তিনি বিলাতে যাইবার পূর্বে এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিক্রয় করিবার জন্য "কলিকাতা গেজেটে" (৬) এক বিজ্ঞাপন দেন এবং হুগলীর স্বনামধন্য জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার এই ভবন ক্রয় করেন। তিনি নোট জাল করিবার অপরাধে ধৃত হইয়া ১৪ বৎসর কারাবাস করেন এবং চুঁচুড়ার অবসর প্রাপ্ত জেলা-জজ ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের নিকট হইতে উক্ত ভবন বন্ধক রাখিয়া তিনি টাকা ধার করেন। হালদার মহাশয় টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কোর্ট হইতে বাটি বিক্রয় হয় এবং ব্রজেন্দ্রবাবু উহা ক্রয় করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বাটি বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিলে হুগলী কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহা ক্রয় করেন।(৭)

কলিকাতা 'প্রেসিডেন্সি কলেজের' অব্যবহিত পরেই এই কলেজের স্থান ছিল এবং ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কলেজের ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ছিলেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দেব, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জেম্‌স সাদারল্যাণ্ড, কুপার, কেলি, কর্পোরেল গ্রেভস, লিওনিজস ক্লীন্ট, ডি-ক্রুজ, শ্রীনাথ পাল প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাচরণ সরকার, নরোত্তম মল্লিক, দিগম্বর বিশ্বাস, কবি ডি, এল, রায় বিচারপতি ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, স্যার এস, এম বসু, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু এবং বিচারপতি আমির আলীর ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলেজ ভবনে একটি প্রস্তর ফলকে দিগম্বর বিশ্বাসের সম্বন্ধে এই কথাগুলি "হুগলী কলেজের প্রথম গুণবান ছাত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের গভর্ণর জেনারেল পুরস্কার প্রাপ্ত" লেখা আছে।

In memory of Digambar Biswas one of the ablest of the first generation of students of Hooghly College and winner of The Governor Generals Prize in 1841. Erected by his son Taraknath Biswas.

হুগলী কালেজের কথা

১২৬০ সালের ১লা ফাল্গুন 'সম্বাদ ভাস্করে' হুগলী কলেজ সম্বন্ধে ইহা বাহির হয়ঃ কলেজ আব মহম্মদ মসিন অর্থাৎ যাহা হুগলী কালেজ বলিয়া বিখ্যাত, এই বিদ্যালয়ের নাম কালেজ আব মহম্মদ মসিন হইবার কারণ প্রায় অনেকেই জ্ঞাত নহেন ইহার বিশেষ কারণ এই যে জেলা হুগলী নিবাসি যবন কুলোদ্ভব মহম্মদ মসিন নামক জনৈক জমীদারের সন্তান সন্ততি কিছুই না থাকাতে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত আপন সম্পত্তি সকল ধর্ম বিষয়ে সমর্পণ করণাশয়ে মৃত্যুকালে এক উইল অর্থাৎ স্বেচ্ছাপত্র লিখিয়া

লোকান্তর গত হয়েন, উক্ত উইলে এতদ্রূপ লিখিত ছিল তাঁহার সকল সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের অধীনে থাকিবে, গবর্ণমেন্ট তাহার কর্তৃত্বের কারণ দিল্লী হইতে কোন এক সম্ভ্রান্ত স্বজাতীয় আনয়ন পূর্বক নিযুক্ত করিয়া তদুপরি মতওলি অর্থাৎ সর্ব শ্রেষ্ঠত্ব দিবেন, এবং ঐ সকল সম্পত্তি লভ্য হইতে এক মাদরসা অর্থাৎ পারস্য অবৈতনিক কালেজ এক ডাক্তার খানা, এক এমাম বাড়া অর্থাৎ অতিথিশালা এবং প্রতি বর্ষে মোসলমান দিগের যে ২ পর্ব আছে তৎ সমুদায় নির্বাহ হইবেক, গবর্ণমেন্ট ঐ স্বেচ্ছাপত্রের লিখিতানুসারে দিল্লীর অনেক সম্ভ্রান্ত মোসলমান আনয়ন করিয়া মতওলি উপাধি প্রদানে সকল বিষয়ের কতৃত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন এবং খৃষ্টাব্দ ১৮৩৬ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম দিবসে কালেজ আর মহম্মদ মসিন কিম্বা হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়া প্রথমত ডাক্তার ওয়াইজ নামক বহুদর্শি ব্যক্তি প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইলেন।... ..

॥ পেরন সাহেব ॥

পেরন সাহেব একজন নগন্য ফরাসী। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে একখানি ফরাসী জাহাজে সামান্য নাবিক রূপে পেরন ভারতবর্ষে আগমন করেন। পেরনের আসল নাম ছিল পেরী কুইলার (Mr. Pierre Cuieller) গোহাদের রাণার অধীনে কর্মগ্রহণ কালে পেরন নাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পেরন ভরতপুরের রাজার, তৎপর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মাধোজী সিন্ধিয়ার সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া আশাতীত উন্নতি লাভ করেন। প্রথমে ডিবয়েন নামক বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতির সহকারী রূপে কার্য করেন পরে ডিবয়েন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পেরন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রধান সেনাপতি পদ লাভ করেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মাধোজী সিন্ধিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র দৌলত রাও সিন্ধিয়া সিংহাসনে অধিরোহন করেন। ইঁহার আমলে পেরন রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন। দৌলত রাও নামে মাত্র রাজা ছিলেন। পেরনের সৈন্যগণ ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট সৈন্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। সাহারাণপুর, পানিপাত, দিল্লী, নরনৎ, আগরা, আজমীর প্রভৃতি পেরন স্বাধীন ভাবে শাসন করিতেন। রাজপুতনা হইতে কর গ্রহণ করিতেন। দিল্লীশ্বর সাহ আলম কে প্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। পেরন আলিগড়ে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সামরিক বিজ্ঞানানুযায়ী একটি উৎকৃষ্ট দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার প্রভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের অধীনে ইংরাজ সৈন্যগণ আলিগড় দুর্গ আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর ইংরাজেরা জয়ী হন। ইংরাজ পক্ষে ২২৩ জন কর্মচারী এবং পেরনের পক্ষে ২০০০ সৈনিক রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করে। পেরন আত্মসমর্পন করেন। পেরনকে পদোচিত সম্মানের সহিত প্রথমে লক্ষ্ণৌ পরে কলিকাতায় রাখা হয়। পরিশেষে পেরন চুঁচুড়ায় আসিয়া ভাগীরথী তীরে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া অল্পদিন তথায় বাস করেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে পেরনের বাটীতেই হুগলী কলেজ স্থাপিত আছে। তিনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ প্রত্যাগমন করেন এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। পেরন মৃত্যুকালে প্রায় পাঁচ ক্রোড় টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পেরন সাহেব মাত্র দুই বৎসর চুঁচুড়ায় বাস করেন। এই বাড়িতে তাঁহার প্রথম পুত্র জোসেফ্ ফ্রান কসি-রেনি (Joseph Fran Caise-Rene) জন্মগ্রহণ করে এবং এই স্থানে তাহার প্রথমা স্ত্রীর দেহান্ত হয়। অদ্যাপি চন্দননগরে পেরন সাহেবের স্ত্রীর সমাধি আছে। এই ঐতিহাসিক ভবনের প্রথম বাসিন্দা জোসেফ্ নেপোলিয়নের প্রধান সেনানায়ক ডিউক-অফ-রেগিওর কন্যা ক্যারোলিনকে বিবাহ করেন।

The building, however, has always been known "Perron's House" and its plan has an architectural unity which suggests a single mind.

পেরনের একখানি সুবৃহৎ জীবনী এ, মার্টিনও (A. Martineau) রচনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত জীবনীতে পেরন সাহেব চুঁচুড়ায় একটি বাড়ি ক্রয় করিয়া উহা অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। Perron bought and embellished a fine residence at Chinsurah. অথচ "কলিকাতা গেজেটে" ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবরের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে, জেনারেল পেরনের আদেশে এই ভবন নির্মিত হইয়াছিল এবং তিনি ইউরোপে যাইতেছেন বলিয়া উহা বিক্রয় করা হইবে।

FOR SALE—The house at Chinsura now nearly finished, built by order of General Perron, leaving for Europe.

হুগলী কলেজের বাড়ি সম্বন্ধে ১৩৫১ সালে হুগলী কলেজে অনুষ্ঠিত রবিবাসরের এক অধিবেশনে তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য ঃ

হুগলী এই স্থানটি বৃটিশ রাজত্বের প্রাক্‌কালে একটি ডাচ্ উপনিবেশ ছিল। গঙ্গার তীরে পাশাপাশি ফরাসী ডাচ্ ও পর্তুগীজদিগের ছোট ছোট উপনিবেশের কথা সকলেই জানেন। এই স্থান হইতে প্রায় ৪০০ গজ দূরে একটি পুরাতন বাড়ি আছে, তাহার নাম এখনও 'ডাচ্-ভিলা', এখান হইতে প্রায় চার মাইল দূরে একটি চমৎকার পুরাতন গির্জা, তাহার নাম 'ব্যাণ্ডেল চার্চ'। তাহার বয়স ৩৫০ বৎসর। এই গির্জার মধ্যে যে সকল মূর্তি ও প্রতিকৃতি আছে, সেগুলি অতি সুন্দর। গঙ্গার উপরে অবস্থিত এই গির্জাটি দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে জনসমাগম হইয়া থাকে।

এখান হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে হুগলীর বিখ্যাত ইমাম-বাড়া। পুরাতন ঐশ্বর্য বর্তমানে লুপ্ত হইলেও ইহার সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য সুধীগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মহাশয়ের বাটী। ইহার একাংশে এখন কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার অর্থে স্থাপিত একটি টোলও এখানে আছে।

কলিকাতার সুপরিচিত অনেকগুলি বিখ্যাত বংশের আদিভূমি এইখানে। কলিকাতার স্বনাম ধন্য লাহা মহাশয়দিগের পিতৃভূমি এই হুগলীতে। কলিকাতার অনেকগুলি বড় বড় ব্যবসায়ীর আদি বাসও এই হুগলীতে।

এই হুগলীর প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে দেবানন্দপুর গ্রাম বাংলার অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের বাসভূমি। এখান হইতে ১৫।১৬ মাইল দূরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃভূমি। এই বাড়ী হইতে দেড় মাইল দূরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতৃভূমি।

কলেজটির জন্ম ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ একশত নয় বৎসর পূর্বে। এই বাড়ীটি প্রস্তুত হইয়াছিল সম্ভবতঃ ১৮০৩ সালে। তখন চুঁচুড়া একটি ডাচ্ উপনিবেশ ছিল। যতদূর জানা যায় এই বাড়ীটি নির্মাণ করিয়াছিলেন একজন ফরাসী সেনাপতি। তাঁহার প্রকৃত নাম পেরি কুইলার সাধারণতঃ তাঁহাকে লোকে পেরন বলিয়াই জানিত। ইনি সাধারণ সৈনিকের মতই এদেশে আসেন এবং সিন্ধিয়ার অধীনে কার্য করিতে করিতেতিনি ইংরাজ সেনাপতির পদ পান। এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসনভার লাভ করেন। ইংরাজ ও সিন্ধিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার পর সিন্ধিয়ার সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া বহু ঐশ্বর্য সহ ইনি বাংলাদেশে চলিয়া আসেন এবং কলিকাতা বাস তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় তিনি চুঁচুড়ায় আসিয়া এই বাড়ী নির্মাণ করিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন।

পেরন এখানে বেশী দিন বাস করেন নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে চলিয়া যান। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র জোসেফ ফ্রান্সিস্ রেনি এখানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

পরে এই বাড়ী ক্রয় করিয়া লন প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক একজন ধনী ব্যক্তি। ইনি এই বাড়ীটিকে তাহার প্রমোদ-গৃহরূপে ব্যবহার করিতেন। ইহার মধ্যবর্তী প্রকাণ্ড হল-ঘরটি বহুমূল্য আসবাব-পত্রে পরিপূর্ণ ছিল এবং এই ঘরটিতে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হইত।

প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার বহু গল্প প্রচলিত আছে। ঐ বড় হলঘরটিতে কয়েকটি বহুসহস্র মুদ্রা মূল্যের ঝাড় ছিল। একবার নাকি অসাবধানতার ফলে উহার মধ্যে হইতে একটি ঝাড় ভূমিতে পড়িয়া যায়। তাহাতে এমন একটা বহুক্ষণ ব্যাপী ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইয়াছিল যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া হালদার মহাশয় হুকুম দিলেন, আরো একটা ঝাড় ঠিক অমনি করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হউক। আর একটা গল্প আছে, তিনি নাকি একবার সখ করিয়া একটি শৌচাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার ভিত্তি হইতে ছাদ পর্যন্ত জানালা দরজা প্রভৃতি সমস্ত অংশ কড়া-পাকের সন্দেশ দিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ এই প্রকার উদ্ভট বিলাস-প্রিয়তার জন্যই তাঁহার সর্বনাশও শীঘ্র ঘনাইয়া আসিল। কথিত আছে, মাটির নীচে গুপ্ত গৃহ নির্মাণ করিয়া সেখানে তিনি নোট জাল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ধরা পড়িয়া তাঁহাকে সর্বস্ব হারাইতে হয়।

হালদারদিগের নিকট হইতে এই বাড়ী কিনিয়া লন শীলেরা। এবং শীল মহাশয়দিগের নিকট হইতে এই বাড়ী তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের জেনারেল কমিটি কলেজের জন্য কিনিয়া লন।

বিগত একশত নয় বৎসরের কলেজের ইতিহাস অতিদীর্ঘ। অতি সামান্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই কলেজ

প্রতিষ্ঠার মূলে মহানুভব হাজি মহম্মদ মহসীনের বদান্যতা বহু সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া এই কলেজের নামের সহিত মহসীনের নাম সংযুক্ত হইয়াছে।

হুগলী এবং তন্নিকটবর্তী গঙ্গার উভয়তীরস্থ স্থানগুলি বাংলার জ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান বলিলে বোধহয় বেশী অত্যুক্তি হইবে না। বর্তমান বাংলায় যুগধর্ম প্রবর্তক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান এই হুগলী জেলায় কামারপুকুর গ্রামে। এখান হইতে প্রায় দুই মাইলের মধ্যে নৈহাটিতে অমর সাহিত্যিক বঙ্কিমের বাসভূমি। এখান হইতে এক মাইল দূরে এখানকার প্রধান খেয়াঘাটের অনতিদূরে একটি একতলা বাড়ী আছে। সেই বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠ" লিখিয়াছেন।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এবং বাংলার অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে বিখ্যাত এবং সুপরিচিত বহু ব্যক্তি এই কলেজের ছাত্ররূপে ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অমর সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৪৯ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত এই স্কুল ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৮২-৮৩ সালে এখানে ছাত্র ছিলেন। লেখক ও সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত এখানে ছাত্র ছিলেন। জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রও এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকটি নাম মনে পড়িতেছে। দেশবিখ্যাত জাষ্টিস্ আমির আলি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। জাষ্টিস্ বিজনকুমার মুখার্জি, এডভোকেট জেনারেল এস, এম, বোস এই কলেজে পড়িয়াছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

হুগলী জেলায় সর্বপ্রথম স্যার জর্জ ক্যাম্বেল একটি 'সিভিল সার্ভিস কলেজ' এবং স্যার রিচার্ড টেম্পল একটি সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটি উঠিয়া যায়। বঙ্গদেশে পুলিশদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, হুগলীতে "পুলিশ ট্রেনিং স্কুল" সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে উক্ত শিক্ষালয় ভাগলপুরে স্থানান্তরিত হয়।

শ্রীরামপুর কলেজ এবং হুগলী কলেজ সেকালে এই জেলার দুইটি প্রথম শ্রেণীভুক্ত কলেজ; চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজ, উত্তরপাড়া কলেজ, এবং চুঁচুড়ার হুগলী মাদ্রাসা এই জেলার দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামপুর গভর্ণমেন্ট উইভিং ইনষ্টিটিউট, চুঁচুড়ার ভূতনাথ পাল এগ্রিকালচার্যাল স্কুল ও গভর্ণমেন্ট এগ্রিকালচার্যাল ফার্ম এবং মবার্লি টেকনিক্যাল স্কুল আছে। এতদ্ভিন্ন সিঙ্গুরে সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক হেল্‌থ ইউনিট ও মেটার্নিটি ক্লিনিক অবস্থিত, ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলারের দানে ও বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হয়; এইরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই।

১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন রিপোর্টে উক্ত বৎসরে হুগলী কলেজে ছাত্র সংখ্যা ২৪৯, শ্রীরামপুর কলেজে ২৪০ এবং উত্তরপাড়া কলেজে ১৬৫ জন ছাত্র ছিল বলিয়া লিখিত আছে।

॥ ডুপ্লে কলেজ ॥

চন্দননগরের "ডুপ্লে কলেজ" ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; পূর্বে ইহা 'সেন্ট মেরীস্ ইনিষ্টিটিউশন" বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহা ফরাসী সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং এই কলেজে অন্যান্য ভাষার সহিত "Brevet Elementaire" পর্যন্ত ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা করেন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নিয়ম অব্যাহত ছিল, কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই কলেজ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে কলেজ পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইন্ডারমিডিয়েট কলা ও বিজ্ঞান পরীক্ষা তখন এই কলেজ হইতে দিবার ব্যবস্থা হয়। চন্দননগরের ভারতভুক্তির পর ইহার নাম চন্দননগর কলেজ হইয়াছে।

॥ রাজা প্যারীমোহন কলেজ ॥

উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহারা সরকারের হস্তে ইহা পরিচালনার জন্য বৈঁচী এবং রামনগর মহল দুইটি পত্তনি করিয়া দেন। কিন্তু সরকার কর্তৃক কতকগুলি নূতন বিধি আরোপিত হওয়ায়, তাহার পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (কারণ তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন) নিজ ব্যয়ে ইহা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং এই কলেজের জন্য এক লক্ষ টাকা দেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার পুত্র কুমার ভূপেন্দ্রনাথ ইহা পরিচালনা করেন। বর্তমানে ইহা রাজা প্যারীমোহন কলেজ নামে পরিচিত।

॥ মুসলিম আমলে শিক্ষার অবস্থা ॥

মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে এই দেশে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না; পরে তাহারা ফারসী শিক্ষার জন্য 'মক্তব' প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিন্দু ছাত্রগণকে উক্ত মক্তবে মুসলমানদের সহিত পাঠ করিতে হইত। টোল ও চতুষ্পাঠীতে একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাত্র ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের ছাত্রবৃন্দের প্রবেশাধিকার ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। কায়স্থ ব্যতীত অন্য কোন জাতি তৎকালে ফারসী অধ্যয়ন করিতেন না; সেই জন্য রাজকার্যে একমাত্র কায়স্থগণই নিয়োজিত হইত দেখা যায়।

স্ত্রীশিক্ষা মুসলমান রাজত্বে নিতান্ত দূষনীয় ছিল; যদি কোন মহিলা রামায়ণ বা মহাভারত কদাচিৎ পড়িতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি শিক্ষিতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। স্ত্রীলোকদের বার-ব্রত পালন ও কথকথা শ্রবণ তৎকালে একমাত্র শিক্ষা ছিল। এই 'কথকথা' প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষায় যে কিভাবে সহায়তা করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। প্রতিদিন হিন্দুদের গৃহে সন্ধ্যাকালে বর্ষীয়সী মহিলাগণ, হিন্দু ধর্মের কোন না কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন এবং বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধাগণ সমবেত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। ইহা তৎকালে 'কথা' বলিয়াই

খ্যাত ছিল। অদ্যাপি বহু হিন্দু গৃহে কোন পর্ব উপলক্ষে এইরূপ 'কথা' (যেমন ইতুর কথা, মঙ্গল-চণ্ডীর কথা) হইয়া থাকে। এইরূপ 'কথা' ও 'কথকথা' দ্বারাই তৎকালে স্ত্রীলোকদের প্রধানতঃ শিক্ষা দেওয়া হইত।

আকবর মোগলযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট, শুধু মোগলযুগের কেন, পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নরপতির নাম আমাদের মনে উদিত হয়, আকবর তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। উদারতা, পরমত-সহিষ্ণুতা, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি গুণে ও অপক্ষপাত রাজ্যশাসনে তিনি ভারতের মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন; তিনি লিখিতে কিম্বা পড়িতে পারিতেন না; কিন্তু শিক্ষার প্রতি, তাঁহার খুব আগ্রহ ছিল।

রাজ্যমধ্যে যাহাতে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার হয় আকবরের সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি একটি বড় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সমভাবে সচেষ্ট ছিলেন। মাদ্রাসা সমূহে যাহাতে মুসলমান ছাত্রগণের সঙ্গে হিন্দুছাত্রগণও শিক্ষালাভ করিতে পারে, তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে আকবরের রাজ্যশাসন প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আকবর যে সংস্কার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়; বিবরণটির সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

প্রত্যেক দেশেই বিশেষতঃ হিন্দুস্থানে, বিদ্যালয়ের বালকগণের স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিতেই বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়। আর কতকগুলি অনাবশ্যক বই পড়িতে বাধ্য করিয়া ছাত্রগণকে অধিকাংশ সময় নষ্ট করান হয়। সুতরাং সম্রাট আদেশ দিতেছেন যে, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালককে প্রথমে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখিয়া শিখাইতে হইবে এবং এইজন্য তাহাদিগকে অক্ষরের উপর দাগা বুলাইতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। প্রথমে ছাত্রগণ বর্ণমালার অক্ষরগুলির নাম এবং আকৃতি শিখিবে, দুই দিনেই ইহা শিখান যাইতে পারে। তৎপরে ছাত্রগণ যুক্তাক্ষর লিখিতে শিখিবে। এক সপ্তাহেই যুক্তাক্ষরগুলি আয়ত্ত হইবে। ইহার পরে কিছু গদ্য ও পদ্য মুখস্থ করাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু স্তোত্র ও নীতিকাব্যও মুখস্থ করাইবে। এইগুলি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ছাত্র যেন নিজের চেষ্টায় সব বুঝিতে শেখে; শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে তাহাকে একটু সাহায্য করিবেন মাত্র। প্রত্যহই ছাত্রকে কিছু কিছু হাতের লেখা লিখিতে হইবে; প্রসিদ্ধ কবিতার এক লাইন বা অর্দ্ধ লাইন বারংবার লিখিবার অভ্যাস করিলে হস্তাক্ষর সুন্দর হইবে। শিক্ষক মহাশয় বিশেষ করিয়া পাঁচটি জিনিষের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন—(১) বর্ণ জ্ঞান; (২) শব্দার্থ জ্ঞান; (৩) কবিতার অর্দ্ধ লাইন; (৪) কবিতার পূর্ণ লাইন; (৫) পূর্বের পাঠ। পূর্বে যাহা শিখিতে ছাত্রগণের বহু বর্ষ লাগিত, এই শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিলে এক মাসের মধ্যেই তাহারা তাহা শিখিয়া ফেলিবে।

প্রত্যেক বালকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা করা উচিত—নীতি, অংক, কৃষি, ক্ষেত্র-বিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চরিত্রানুমান বিদ্যা, গৃহস্থালী, রাজনীতি, চিকিৎসা, ন্যায়, ইতিহাস এবং তাবী, রিয়াজী ও ইলাহী বিদ্যা (অর্থাৎ বিজ্ঞান, সংখ্যাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র)। এইগুলি ক্রমশঃ শিখিতে হইবে। যাহারা সংস্কৃত শিখিবে তাহাদিগকে ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ও পতঞ্জল পড়িতে হইবে বর্তমান কালোপযোগী বিদ্যা কেহই অবহেলা করিতে পারিবে না। এই বিবরণ দিয়া আবুল ফজল বলিতেছেন যে, সম্রাটের এই অনুশাসনের ফলে বিদ্যালয়সমূহ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং মাদ্রাসাসমূহ উজ্জ্বল আভায় দীপ্ত হইল।

॥ ইংরাজ আমলে শিক্ষার অবস্থা ॥

হুগলী জেলার শিক্ষা সম্বন্ধে টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কাগজপত্র হইতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার কালেক্টরকে চুঁচুড়া এবং পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার্থ রেভারেন্ড মুন্ডীর হস্তে মাসিক আটশত টাকা দিবার নির্দেশ দেন। কোম্পানীর পক্ষ হইতে একাউন্টেন্ট-জেনারেল কর্তৃক ২৫শে মার্চ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

To continue to pay to the Revd : Mr. Mundy Rs. 800/- per mensem on account at the native Schools supported by Government at Chinsura and its vicinity. (৮)

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রবার্ট মে চুঁচুড়াতে একটি ইংরাজী স্কুল খোলেন; এই সম্বন্ধে পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

গঙ্গাতীরবর্তী চুঁচুড়া শহরে রবার্ট মে নামক লন্ডন মিশনারি সোসাইটিভুক্ত একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরাজী স্কুল খোলেন। প্রথম দিন ১৬টি মাত্র বালক উপস্থিত হয়। কিন্তু ত্বরায় ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টার ফর্বস ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্য একটি প্রশস্ত ঘর দিলেন। রেভরেন্ড মে সেখানে স্কুল করিতে লাগিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে আরো কয়েকটি শাখা স্কুল স্থাপিত হইয়া ঐ সকল স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মিষ্টর ফবর্স স্কুলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে প্রীত হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা সাহায্য দেওয়াইয়া দিলেন। রেভরেন্ড মের চুঁচুড়ার স্কুলগুলির উন্নতি দর্শনে উৎসাহিত হইয়া বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর আপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটিকে ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিলেন।

সার্প সাহেব তাঁহার 'এডুকেশ্যানাল রেকর্ডে' লিখিয়াছেন— The schools were projected by a missionary Mav and at his death in 1818 there were 36 schools with 3,000 pupils. (Part I, Pp. 188)

পর বৎসর চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের হস্ত হইতে ইংরাজদের নিকটে আসিলে, তিনি ওলন্দাজদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'চুঁচুড়া স্কুল সোসাইটি'র হস্তে প্রতিমাসে আরো পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিবার নির্দেশ দেন।

The Chinsurah schools are at present 14 in number situated on both banks of the river above and below Hooghly. The number of scholars in the books is 1,050 of whom about 800 attend with some regularity. The instructions given in them is confined to the Bengali language—reading, writing and arithmetic with some insight into Geography and natural History.

রেভারেণ্ড মুণ্ডী কর্তৃক নিম্নলিখিত চৌদ্দটি স্থানের বিদ্যালয় তখন পরিচালিত হইত। যথা নৈহাটী, ভাটপাড়া, গৌরপাড়া (GauraPara) (ইহা সম্ভবতঃ গৌরীপুর হইবে) বিবিহাট, মানকুণ্ডু, হালদারপাড়া, হাজিনগর, হুগলী, খসবাটী (Khasbati) বাঁশবেড়িয়া, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, কুলোপুকেরি (Kulopakheree) এবং কাঁকসাল (Kankshali । ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর সরকারী মাসিক আট শত টাকা সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং যদি কোন ভদ্রলোক নিজ ব্যয়ে কোন বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে আসবাব পত্রগুলি দেওয়া হইবে বলিয়া জানান হয়, কিন্তু কেহই অগ্রসর না হওয়ায় এই বিদ্যালয়গুলি পরে উঠিয়া যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই দেশে শিক্ষা বিস্তারে কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না এবং এদেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া যে তাহাদের কর্তব্যের অন্তর্গত তাহাও তাহারা চিন্তা করিতেন না। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের যত দোষই থাকুক, উচ্চশিক্ষা দানের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহারা দুর্বল তাহাদের রক্ষা করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা প্রশংসার্হ; কিন্তু জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধির চেষ্টা ঐশ্বরিক দানের মত গৌরবজনক।

It is humane, it is generous to protect the feeble, it is meritorious to redress the injured but it is Godlike bounty to bestow expansion of intellect to infuse the Promethaen Spark into the statue and weaken it into a man. (৯)

তৎকালে এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের দিকে সরকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল না; আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য সরকার হইতে সামান্য কিছু ব্যয় করা হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের 'মিনিটে' গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিংক প্রথম লিখিলেন—"ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারই বৃটিশ রাজ্যের মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং শিক্ষা বাবদ সকল মঞ্জুরী অর্থ শুধু ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেই ভাল হয়।" ইহার পর হইতেই সরকার বাহাদুর শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎসাহ দান করিতে থাকেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বঙ্গদেশে ছোটলাটের পদ সৃষ্টি হয় এবং স্যার

ফ্রেডারিক হ্যালিডে প্রথম ছোটলাট হইবার পূর্বে তিনি শিক্ষা পরিষদের সদস্যরূপে ২৪শে মার্চ তারিখে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

"বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে; ইউরোপীয় এবং এদেশীয় উভয় শ্রেণীর ভদ্রলোকের কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় কারণ শিক্ষকের কার্য অতি অযোগ্য লোকের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই পাঠশালাগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হইবে। পাঠশালা-গুলির আদর্শস্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে, গুরুমহাশয়ের আদর্শের প্রেরণায় ক্রমশঃ পাঠশালাগুলিকে উন্নত ধরণে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন।" (১০)

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যেই ছোটলাট বাহাদুর বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন; হ্যালিডে সাহেব তাহাও পূর্বোক্ত মন্তব্যর সহিত বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিম্নে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ্য :

"সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন না মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। কেবল লেখা, পড়া ও কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন-চরিত, পাটিগণিত, পদার্থবিদ্যা, নীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব শেখান প্রয়োজন।"(১১)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে পাঠশালার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এই পাঠশালায় পূর্বেকার সংকীর্ণ প্রথায় শিক্ষাদান করা হইত এবং তৎকালে পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল। খৃষ্টান মিশনারীগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা ও চর্চার পথ সুগম করিলেও তরুণ ছাত্রগণকে খৃষ্টতত্ত্ব শিখাইয়া তাহাদিগকে জোর করিয়া খৃষ্টান করিতেন। তৎকালীন হিন্দুগণ ইহাতে বিশেষ শঙ্কিত হইলেন এবং মিশনারীগণের এইরূপ কার্যের প্রতিবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রতিবাদ সুরু করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই কার্যে অগ্রণী হন। ইহার ফলে দরিদ্র হিন্দু-ছাত্রগণকে যাহাতে মিশনারীগণের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাইতে না হয় তজ্জন্য হিন্দু হিতৈষী বিদ্যালয় (Hindu Charitable Institution) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উত্তম পাঠ্যপুস্তক সংকলন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক "বৈতাল পঁচীসী" অবলম্বনে রচিত হইয়া প্রকাশিত হয়।*

*বৃটিশ মিউজিয়মে বাংলা পুস্তকের তালিকায় এই পুস্তকের প্রচারকাল ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ দেওয়া আছে।

যাহা হউক হ্যালিডে সাহেব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর মডেল বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের যাবতীয় ভার অর্পণ করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ২১শে মে হইতে ১১ই জুন পর্যন্ত হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, কেশবপুর, পাঁতিহাল প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় গ্রামের অধিবাসিগণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কেহ কেহ নিজ ব্যয়ে স্কুলগৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ উচ্চ বা নিম্ন বিদ্যালয় হইতে উন্নীত হইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের জমিদার বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ এই সব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের রিপোর্টে এই সম্বন্ধে লিখিত আছে :

High Schools in vlllages have, as a rule, grown out of middle, or even out of primary schools. The establishment and developement of these high schools have generally been the work of zamindars or of other persons of local importance. Thus the schools are connected with certain families, whose names they frequently bear.

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় মাসে পাঁচটি করিয়া কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়গুলিতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া খরচ হইত। নিম্নে হুগলী জেলার কোন কোন্ গ্রামে বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রদত্ত হইল।

১। হারোপ মডেল স্কুল	প্রতিষ্ঠাকাল	২৮ আগষ্ট ১৮৫৫
২। শিয়াখালা মডেল স্কুল	”	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫
৩। কৃষ্ণনগর মডেল স্কুল	”	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫
৪। কামারপুকুর মডেল স্কুল	”	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫
৫। ক্ষীরপাই মডেল স্কুল	”	১ নভেম্বর ১৮৫৫

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ‘এডুকেশন ডেসপ্যাচে’ ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার কল্পে যাহা উল্লিখিত হইয়াছিল তাহার ফলে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে **বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপিত হয়।

(1) The constitution of a separate Department of the administration for education. (2) the institution of Universities at Presidency towns. (3) the establishment of the institutions, for the training teachers for all classes of Schools. (4) the maintenance of the existing Government Colleges and high Schools, and the increase of their number, where necessary, (5) the establishment of new middle Schools; (6) increased attention to vernacular schools, indigenous or other for elementary education; and (7) the introduction of a system of grants-in-aid.,

স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদরী মার্শম্যান সাহেবের সহধর্মিণী হ্যানা মার্শম্যানের চেষ্টায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর সহরে বঙ্গদেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় শ্রীরামপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে তেরটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহারা সমাচার-দর্পণে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল উক্ত পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

স্ত্রী-শিক্ষা॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ **পূর্ব২** প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানীং বিদ্যাভ্যাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন।

যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজস্ত্রী লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্বতন স্ত্রীসকল অশেষ শাস্ত্রধ্যয়ন করিয়া তত্ত্বৎ শাস্ত্রের পরিদর্শকরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এঁরা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতিপ্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাহাদিগের কোন অংশে মানত্রুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন এবং দ্রুপদরাজার কন্যা পাণ্ডব পত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুদাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উদাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং উদয়নাচার্যের কন্যা লীলাবতী এমন পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামীর সহিত শঙ্করাচার্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেক২ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকর্তা ভাস্করাচার্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কর্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী যে২ কবিতা করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা যে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে তালধ্বজপুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব যখন সুলোচনাকে বিবাহ করিতে

দীব্যন্তী নগরে গিয়া সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নামস্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাত হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালীপাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায় পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

স্ত্রী শিক্ষার শেষ ॥ স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক বিষয়ের অবশিষ্ট যে ছিল তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের দুই কন্যা বার্তাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। এবং মালতী মাধব নাটক গ্রন্থে অতিসুস্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেক বিদ্যাবতী অদ্যাপী আছেন কেহবা স্বয়ং রাজকার্য করিতেছেন এবং সংস্কৃত অনেকে কহেন এমত অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা বাঈ নামে একজন পুণ্যবতী ছিলেন তাঁহার কীর্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে। তিনি তাবৎ রাজকার্য স্বয়ং করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য অনর্গল কহিতেন। এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংলন্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখনও দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ কর্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতুক স্ত্রী লোকেরা অবীরা হইলেও বার্তাবিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্যে প্রতারণা কিরতে পারে না। আরও আপন মনোভিলষিত স্বামীর নিকটে লিখিতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পূর্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্তব্য। সে এই যে বাল্য কালে পিতামাতার বশীভূত হইয়া আজ্ঞানুসারে চলিবে। যৌবনাবস্থাতে স্বামীর বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম কর্মানুষ্ঠানাদি করিবেক। অতএব স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে। পিতা রক্ষতি কৌমার ইত্যাদি।

অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে স্ত্রীলোকের অকর্তব্য এই এই দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্য পুরুষাবলোকন সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যাভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম নাশের কারণ হয়। যে স্ত্রী গৃহকর্মে নিপুণা ও পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ওঅপ্রগল্‌ভা ও লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।”

শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ এই অঞ্চলে কেবল বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; অধিকন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে শিল্প-শিক্ষা দিবারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বয়স্কা কোন মহিলা শিক্ষায় অনুরাগ দেখাইলে, তাঁহারা মহিলা পাঠাইয়া বিনামূল্যে তাঁহাকে শিক্ষিতা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। মহিলাগণকে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করাও যে মিশনারিগণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সম্বন্ধে কবি রাধামাধব মিত্র ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭ সুধাকরে লিখিয়াছেন ঃ

যুবক ধরার পক্ষে বিঘ্ন দেখে ভারী।
ফাঁদ পাতা হয়েছিলো ধরিবারে নারী॥
অন্তঃপুরে অঙ্গনাকে পড়াবার ছলে।
আরম্ভ করিল যেতে খৃষ্টানী সকলে॥
ঘরের ঘরণী যত বিদ্যালাভ আসে।
মহানন্দে তাদিগে আসিতে দিত পাশে॥
অন্তঃপুর নিবাসিনী কুলের ললনা।
স্বভাবে সরলা সব বুঝে না ছলনা॥
পরিণামে কি হবে, না ভেবে পুরুষেরা।
বড় খুসি, বিদ্যাশিক্ষা করিছে মেয়েরা॥
শিক্ষাদায়িনীর মনে অন্য ভাব রয়।
বাহিরে যেমন ভাব, ভিতরে তা নয়॥
সাবধান! সাবধান! যত হিন্দু ভাই।
শিক্ষাদায়িনীর বাক্যে আর ভুলো নাই॥
প্রবেশিতে দিও না, দিও না ভবনেতে।
বিদ্যাশিক্ষা হয় না কি অন্য উপায়েতে॥
নারীগণে এ উপায়ে বিদ্যা শিখিবারে।
সম্মতি দিও না আর বলি বারে বারে॥
নারীরা না শিখে বিদ্যা সেও বরং ভালো।
আঁধারে থাকুক তারা, কাজ নাই আলো॥

মিশনারীগণ প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের প্রতি বৎসর পরীক্ষা হইত এবং যে সমস্ত ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইতেন তাহাদিগকে চারি আনা, দুই আনা করিয়া পারিতোষিক দেওয়া হইত। নিম্নে ১২৩০ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্র হইতে একটা সংবাদ উদ্ধৃত হইল।

"পরীক্ষা—৫ এপ্রিল (১৮২৪) সোমবার দিবা দশ ঘন্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটীতে শ্রীরামপুরের ও [illegible] গ্রামের পাঠশালার বালিকাদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি

লোক অনেক আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্বশুদ্ধ দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ-পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ওঅবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্সমন উঠিয়া বালিকাদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন অপর সকলে সন্দেশ পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। দুই প্রহরের পরে পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুক্ত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকেরা তুষ্টি হইল। আবার বালিকারা যে সকল শিল্প কর্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।"

খৃষ্টান পাদরীগণ শিক্ষা-বিস্তারের সহায়তায় যুবক-যুবতীগণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হন। বঙ্গের সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ পাদরীদের এই কান্ডে বিশেষ বিচলিত হন এবং যে সমস্ত হিন্দু খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য "পতিত-তোদ্ধার সভা" গঠিত হয় এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রথম অধিবেশন হয়। বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে পাঁতি সংগ্রহ করিয়া ভিন্নধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরুদ্ধারের আলোচনা সম্বলিত একখানি পুস্তিকা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।* হিন্দুগণের এই আন্দোলনকে তৎকালীন ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখের কাগজে "ঊনবিংশ শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "One of the most important events that has occurred in India in the persent century"

শিক্ষা-বিভাগ ব্যতীত সরকারী অন্য বিভাগগুলিতেও তৎকালে পাদরীদের প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। এই সম্বন্ধে রাজা রাধাকান্ত দেব কর্তৃক ডক্টর উইলসনকে লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে "Missionary influence is now on the ascendant ; every department from the fountainhead of the Government to the lowest course of office is infected with it."

খৃষ্টান পাদরীগণ স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করিলেও, সরকার বাহাদুর নারীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার কল্পে কিছুই করেন নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন কলিকাতায় একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্ত দেব কলিকাতায় দ্বিতীয় বালিকা বিদ্যালয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে স্থাপন করেন। সেই সময় হুগলী জেলার মিশনারীগণের বালিকা বিদ্যালয়গুলি দেখিয়া বহু স্থানে বালকদের বিদ্যালয়ে বালিকাদের পড়াইবার সূচনা হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি মনে করিতেন যে স্ত্রী শিক্ষা ভিন্ন আমাদের দেশের উন্নতি নাই। সৌভাগ্যক্রমে বিটন

* রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে এই পুস্তিকা রক্ষিত আছে।

সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ছিল এবং 'বিটন নারী বিদ্যালয়ে'র, সম্পাদকরূপে কাজ করিবার জন্য তিনিই নির্বাচিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ীর দুই পাশে মনুসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোকটি দেশবাসীকে সচেতন করিবার জন্য খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন ঃ "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।" অর্থাৎ পুত্রের মত কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিতে এবং শিক্ষা দিতে হইবে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার কল্পে বহুল পরিমাণে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব সংগৃহীত হয়। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা সরকারের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ভাল বলিয়া মনে করিয়া স্বয়ং এই দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেন।

সেই সময় দক্ষিণ-বঙ্গের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টার প্রাট সাহেব বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীগণের তিনখানি আবেদন পত্র পান; প্রথম দুই খানি হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত দারহাট্টা গ্রাম, এবং সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত গোপালনগর গ্রাম হইতে আসে এবং তৃতীয়খানি বর্ধমান জেলার নারোগ্রাম হইতে পাওয়া যায়। প্রাট সাহেব আবেদন পত্রগুলি ছোট লাটের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তিনি দরখাস্ত তিনখানি মঞ্জুর করেন। প্রত্যেক স্থানেই গ্রামবাসীগণ তাহাদের গ্রামে বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণের জন্য ভার লইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্বে মডেল বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্তমান স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তাহাই করিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাস এই সাত মাসের মধ্যে তিনি হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এই বিষয়-গুলির জন্য সরকারের মাসিক ৮৪৫৲ টাকা ব্যয় হইত। এই স্থানে হুগলী জেলার বালিকা বিদ্যালয়ের একটি তালিকা ৫ আগষ্ট ১৮৫৮ এডুকেশন কনস্যালটেশন হইতে প্রদত্ত হইল।

হুগলী জেলার বালিকা বিদ্যালয়

গ্রামের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক খরচ
১। পোলবা	২৪শে নভেম্বর ১৮৫৭	২৯৲
২। দাসপুর	২৬শে নভেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৩। বৈঁচী	১লা ডিসেম্বর ১৮৫৭	৩২৲
৪। দিগশুই	৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	৩২৲
৫। তালাণ্ডু	৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৬। হাতিনা	১৫ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৭। হয়েরা	১৫ই ডিসেম্বর ১৮৫৭	২০৲
৮। ন'পাড়া	৩০শে জানুয়ারী ১৮৫৮	১৬৲
৯। উদয়রাজপুর	২রা মার্চ ১৮৫৮	২৫৲

গ্রামের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	মাসিক খরচ
১০। রামজীবনপুর	১৬ই মার্চ ১৮৫৮	২৫৲
১১। আকবরপুর	২৮শে মার্চ ১৮৫৮	৩৫৲
১২। শিয়াখালা	১লা এপ্রিল ১৮৫৮	২০৲
১৩। মাহেশ	১লা এপ্রিল ১৮৫৮	২৫৲
১৪। বীরসিংহ *	১লা এপ্রিল ১৮৫৮	২০৲
১৫। গোয়ালসারা	৪ঠা এপ্রিল ১৮৫৮	২৫৲
১৬। দণ্ডীপুর	৫ই এপ্রিল ১৮৫৮	২৫৲
১৭। দেপুর	১লা মে ১৮৫৮	২৫৲
১৮। রাউজাপুর	১লা মে ১৮৫৮	২৫৲
১৯। মলয়পুর	১২ই মে ১৮৫৮	২৫৲
২০। বিষ্ণুদাসপুর	১৫ই মে ১৮৫৮	২০৲
২১। বদনগঞ্জ †	১০ই মে ১৮৫৮	৩১৲

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখের পত্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষ বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেও, পরে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য আর্থিক অনটন হওয়ায়, স্থায়ীভাবে সাহায্য করিতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন এবং শুনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই জন্য অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ডিরেক্টার অফ-পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে ২০শে জুন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে পত্র দেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। এই পত্রখানি হইতে যাবতীয় ব্যাপার সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

"হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম; বিশ্বাস ছিল সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল গৃহ তৈয়ার করিয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত-সরকার কিন্তু ঐ সর্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবর্গ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন।

সরকারী আদেশ পাইবার পূর্বেই, আমি অবশ্য স্কুলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমে আপনি, অথবা বাঙ্গলা সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ অমত প্রকাশ করেন নাই; করিলে এতগুলি বিদ্যালয় খুলিয়া এখন আমাকে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। স্কুলের কর্মচারিবর্গ মাহিনার জন্য স্বভাবতই আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। যদি আমাকে নিজ হইতে এত টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে, সত্যই আমার উপর অবিচার করা হইবে—বিশেষতঃ খরচ যখন সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে।"

* বীরসিংহ গ্রাম তৎকালে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

† বদনগঞ্জ বর্তমানে হুগলী জেলায় হইলেও তৎকালে মেদিনীপুরের মধ্যে ছিল।

সরকার হইতে এই বিদ্যালয়গুলির খরচা দেওয়া হইলেও, ভবিষ্যতে সরকার হইতে পুনরায় সাহায্য দান করা হইবে না বলায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় "নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" নামক এক ভাণ্ডার স্থাপন করেন এবং পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করায়, এই অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রসারলাভ করিয়াছিল।

এই দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনারীগণ এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় সবিশেষ চেষ্টা করেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি; এই সম্বন্ধে পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক" শীর্ষক একখানি পুস্তক রচনা করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই এই পুস্তকের দুইটি সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায় এবং কলিকাতার 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' জনমত গঠনের জন্য এই পুস্তকখানি বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় এবং প্রথমেই 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন' নামে একটি নূতন অধ্যায় ইহাতে সংযোজিত হয়। একটি কবিতা এবং উক্ত গ্রন্থের, দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি। ইহা হইতে প্রাচীন কালে স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায় সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

প্রশ্ন। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উত্তর। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝি এতকালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমাদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না; ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কাজ কর্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কাজ কর্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকেরা ঘর দ্বারের কাজ রাঁধা বাড়া ছেলে পিলে প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাজ কর্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহে'ন যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা যদি এটা সত্য হয় তবে শেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরানীদিদির ঠাঁই

শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতরশোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড় বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এত দিনে এ দেশের মেয়্যা মানুষ কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলা ধুলা ও নাট রঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখা পড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কাজ কর্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি সংসারের কর্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায় হায় কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশালা আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইয়া দেখ না। যদি ছোট ছোট কন্যারা বাটীর বালকের লেখা পড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাতভাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে যায়। সকলে কহে যে এই মন্দা ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অংকুরে জানা যায়।(১৪)

খৃষ্টান মিশনারীগণ স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে বঙ্গদেশে নারীজাতির শিক্ষার বিরোধিতা করিয়া তৎকালে পত্র-পত্রিকায় বহু আলোচনা হয়। "বাঙ্গলা সমাচার-পত্রের মর্ম" নামক একটি প্রবন্ধ 'সংবাদ কৌমুদি'তে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন (১১ই আষাঢ় ১২৩৮) তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এইরূপঃ

"স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওনের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহাদের লিখন পঠন শিক্ষা বিনা কিতাবৎ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনির্মাতা নির্মাণ করেন নাই—যে সেখানে পাটোয়ারীগিরি ও মুহুরীগিরি ও নাজিরী ও জমীদারি ও জমাদারী ও আমীরী নারী বিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়। এবং কেবল বাঙ্গলা ক খ ফলা বানান আস্ক আঙ্ক শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ববৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য অন্য লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। যেহেতুক বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি যে ভাষ্যগ্রন্থ আছে তাহা পাঠ করিয়া যে বিদ্যা বৃদ্ধি হয় স্ত্রীলোকেরা সে বিদ্যার অপ্রাচুর্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা কর্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়। যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবেরা স্ব স্ব ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন—এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবদের তাদৃশ্য ব্যবহারকরণের কি দোষ।

উত্তর—সে সত্য বটে কিন্তু ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয় সঙ্কলিত নানাপুস্তক আছে তৎপ্রযুক্ত তাহাদের উচিত হয় যে তদ্বিষয়ক পুস্তকানুশীলন দ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুস্তক আছে যে তাহাতে এতদ্দেশীয় অবলারা প্রবলা হইতে পারেন।"

এই উদ্ধৃতি হইতে মনে হয়—বিলাতের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শেখে—ইহাতে লেখক আপত্তি করার কোনো কারণ আছে বলিয়া মনে করেন না। বিলাতের সাহিত্যের অনুরূপ সাহিত্য আমাদের দেশে থাকিলে হয়তো নারীজাতির শিক্ষালাভের বিরোধিতা করিবার কথা তিনি ভাবতেন না। লেখকের উদ্ধৃতি হইতে নারীজাতি সম্পর্কে তাহার প্রগতিবিরোধ মনোভাবই শুধু প্রকট হয় নাই তাহার চেয়েও প্রবল হইয়াছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা!

কিন্তু লেখকের এই নারীশিক্ষা-বিরোধী মনোভাব শিক্ষিত সমাজের সর্বস্তরের সমর্থন পায় নাই; তাহার প্রমাণও রহিয়াছে সে-যুগের সংবাদপত্রে। উপরোক্ত প্রবন্ধের প্রকাশকাল ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। তারপর ছয়টি মাস অতিক্রান্ত হয় নাই—রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া সহানুভূতিশীল শিক্ষক সমাজের সমর্থনে খাস কলিকাতা শহরের বুকে আত্মপ্রকাশ করিল এক নূতন বালিকা-বিদ্যালয়। এই খবরটি ছাপা হইয়াছিল ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের 'সংবাদ কৌমুদী'র পৃষ্ঠায়। সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ "আমরা শুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরিবাবুর পথের একবিংশতি সংখ্যক ভবনে ৬ জন বালিকাদের পাঠের জন্য শ্রীযুত রিবেরণ্ড মেকফর্সন্ সাহেব এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকাদের পাঠজন্য বেতন অত্যল্প স্থিরকৃত হইয়াছে।"

তৎকালে বাঙ্গলা পদ্যে কি ভাবে ইংরাজী শব্দের অর্থ ছাত্র-ছাত্রীগণকে শিখান হইত, নিম্নের কবিতাটি হইতে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইবেঃ

গড ঈশ্বর, লর্ড ঈশ্বর, কম মানে এসো।
ফাদার বাপ, মাদার মা, সিট মানে বসো॥
ব্রাদার ভাই, সিষ্টার বোন, ফাদার-সিষ্টার পিসী।
ফাদার-ইন-ল মানে শ্বশুর, মাদার-সিষ্টার মাসী॥
আই মানে আমি, আর ইউ মানে তুমি।
আস মানে আমাদিগকে, গ্রাউণ্ড মানে জমি॥
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত।
উইক কে সপ্তাহ বলে, রাইস মানে ভাত॥
পমকিম্ লাউ কুমড়ো, কোকম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বেগুন, আর প্লাউম্যান চাসা॥

১২৬০ সালের ১০ই আষাঢ় সংবাদ প্রভাকরে বাঙ্গলার নারীদের শিক্ষায় অনুরাগ সম্বন্ধে যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্যঃ

স্ত্রীগণের বিদ্যানুরাগ

এতদ্দেশের স্ত্রীগণের এক্ষণে বিদ্যানুশীলনে যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহার প্রমাণ সর্বদাই আমাদিগের নয়নগোচর হইতেছে। আহা! কবে এমত দিবস আসিবে, যে দিন এদেশের সীমন্তিনীগণ বিদ্যাভ্যাস সম্যকরূপে কৃতকার্য হইবেন। বোধ করি জগদীশ্বরের অনুকম্পায় সিদ্ধ হইবে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষার জন্য পাদ্রীগণের চেষ্টার ফলে এইদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হয়। আর ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি হইতে বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জগদীশ্বরের অনুকম্পায় সীমন্তিনীগণের বিদ্যাভ্যাস কিরূপ প্রসারলাভ করিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হয়।

ঠাকুরমার কৃতিত্ব ॥ এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ॥ উত্তরপাড়া ৯ই মার্চ—সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবাহিতা মহিলা, দুই পুত্র ও দুই কন্যার জননী এবং তিনটি নাতি-নাতনীর ঠাকুরমা রানী চট্টোপাধ্যায় এ বৎসর এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার এক কন্যা ও এক পুত্র গ্র্যাজুয়েট এবং স্বামী একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি সংসারের সমস্ত কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পাইয়াছেন, উহার সদ্ব্যবহার করিয়া একে একে আই এ, বি এ ও এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরে সেন্ট জোসেফ্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে কেবলমাত্র বালিকাগণ শিক্ষা লাভ করে। এই বিদ্যালয় সিনিয়ার কেম্ব্রিজের অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ নিয়মানুবর্তিতা খুব কম বিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান রমণীগণ ইহা পরিচালনা করেন। চন্দননগরের অন্যান্য বিদ্যালয়ের বিবরণ চন্দননগর অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হরিহর চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া হিতকারী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভা উত্তরপাড়ায় শিক্ষা বিস্তার, দরিদ্রব্যক্তিগণকে ঔষধ পথ্য বা অর্থসাহায্য করা, চরিত্রগঠন করিবার জন্য বক্তৃতা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে বালিকাদের বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করে। বর্ধমান বিভাগের ছাত্রীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই সভা উপযুক্ত সার্টিফিকেট দিবারও ব্যবস্থা করে। এইরূপ হিতকর প্রতিষ্ঠান হুগলী জেলায় আর নাই। প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় তাঁহার বহু সম্পত্তি দান করিয়া যান। এই সভা হইতে একটি পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হইত; উহার নাম ছিল উত্তরপাড়া হিতকারী সভা। ওম্যালীসাহেব ও মনোমোহন চক্রবর্তী হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে হিতকারী সভা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

Its chief objects being to educate poor, to distribute medicines to the indigent seek, to support poor widows and orphans, to encourage female education by the award of scholarships to girls and to ameliorate the social, moral and intellectual condition of the inhabitants of Uttarpara and neighbouring places. It holds annual examination for girls in the Burdwan Division issuing certificates to the successful candidates, and awarding prizes and scholarships.

॥ ইংরাজী বিদ্যালয় ॥

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে হুগলী জেলায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর (১৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 'সমাচার দর্পণে' অমরপুর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে **"প্রধান জিলা হুগলীতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না।"** সংবাদটি এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য :

বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সেই পাঠশালায় হিন্দু কালেজের ন্যায় দেড় শত বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। জেনরল কমিটি ইনিষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ উক্ত পাঠশালার সুসিদ্ধতা সন্দর্শনে ঐ পাঠশালা কমিটির অধীনস্থ করতঃ এক সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত পাঠশালা সংস্থাপনে আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে অতি প্রধান জিলা হুগলীতে গত ৪ বর্ষ মধ্যে বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্তু এক্ষণে সাধারণ চাঁদার দ্বারা গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিনটি বিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছে।

হুগলী হইতে এক ক্রোশ দূরে অমরপুর গ্রামে দানবীর তারকনাথ পালিতের পিতা কালীকিঙ্কর পালিত ১৮৩৭ সনের মাঝামাঝি বেনাভোলেন্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় সম্পর্কে 'জে আর এম', স্বাক্ষরে একখানা পত্র ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়; পত্রখানা এইরূপঃ

"এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই অল্পকালের মধ্যে বালকেরা নানাপ্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এবং অরিএন্টাল সেমিনারির অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগের নানাপ্রকার শিক্ষা দেওনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন।...শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোযোগ দ্বারা অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন।"

১৮৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন রিপোর্ট অমরপুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

Umorpore School...In the annual report of July an apprehension was expressed, that the Umorpore School would be given up, but the liberal proprietor, Baboo Kallykincur Paulit, continued it, entirely at his own expense, with exception of the trifling aid afforded by Government for the purchase of books up to the date of his death in December last. It was then found that his estate was bankrupt, and that there were no funds to carry it on. The Head Master Baboo Peary Mohun Banerjee, however, carried on the school for sometime at his own risk, and without pay, and second Master is now trying to keep it together on reduced scale...The Head Master

has left the School to seek employment and the Pundit has been appointed, at the Principal's recommendation, to the Bulia Government School.

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অমরপুর অবৈতনিক স্কুল কালীকিঙ্কর পালিতের দানেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, সরকার পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য সামান্যমাত্র অর্থ দিতেন। ১৮৪২ সনের ডিসেম্বরে মৃত্যুকাল অবধি কালীকিঙ্করবাবু এইরূপ অর্থ দিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, স্কুলের পরিচালনার জন্য তিনি কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিছুকাল নিজ দায়িত্বে বিনা বেতনে ইহা চালাইয়াছিলেন, পরে দ্বিতীয় শিক্ষক এ কার্যে ব্রতী হন। শেষে প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় শিক্ষক বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অমরপুর বিদ্যালয় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল উঠিয়া যায়। ১৮৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন রিপোর্টে লিখিত আছেঃ "The final cessation of the Umorpore School, took place on the 25th of April, 1844."

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজ সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার আদর্শে ১৮৪০ সনের ১৩ই জুন কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত এই পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন। কলিকাতায় তিন বৎসর কাল (জুন ১৮৪০—এপ্রিল ১৮৪৩) অবস্থানের পর পাঠশালাটি বংশবাটি বা বাঁশবেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হয়। মফঃস্বলে নব্য-শিক্ষার প্রসার আবশ্যক—ইহা বিবেচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পাঠশালাটিকে ঐ স্থলে লইয়া যান। কলিকাতায় ইহা প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় ছিল। বংশবাটীতে ইহা একটি পুরাপুরি শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। অক্ষয়কুমার বংশবাটিতে শিক্ষকরূপে কার্য করেন নাই, স্থানীয় এক জন যোগ্য লোকের কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষাদান কার্য পরিচালিত হইতে থাকে। স্কুলে ছয়টি শ্রেণী ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে ছেলেদের ইংরাজী পড়ানো হইত বটে, কিন্তু সকল বিষয়ই বাংলার মাধ্যমেই পড়াইবার রীতি ছিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার পাঠ্য পুস্তক রচনায় রত হইলেন। অক্ষয়কুমার অঙ্ক, পদার্থ-বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধে বাংলাতেই পাঠ্য পুস্তক লেখেন। এখানে ধর্মশিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা হইল। বেদান্ত প্রতিপাদ্য উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত হয়। কলিকাতা এবং বংশবাটী উভয় পাঠশালাটির বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখা হইয়াছিল। পাঠশালার বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্বন্ধে মাঘ ১৭৬৭ শকের (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখেন ঃ

"এই পাঠশালাতে পদার্থ বিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা। অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্রে সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক, দ্বিতীয়তঃ ছাত্ররা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে

উক্ত শাস্ত্র সকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপনা করা যাইতে পারিবেক।"

১৮৪৫-৪৬ সনের এডুকেশন রিপোর্টেও (পৃঃ ৭৭) হুগলী কলেজ প্রসঙ্গে পাঠশালাটির এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ

Native Education in the District.—There is an English school at Bansberia, an ancient seat of Hindoo learning, supported by Baboos Debendranath Tagore and Ramaprasaud Ray the sons of distinguished fathers. It is established for the diffusion of Vedantic principles but is conducted by an ex-student of the [Hooghly] College, who is himself not of that persuasion.

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা হইতে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে উঠিয়া যায়। পরে ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ইহার পর তিন বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৪৮ সনে ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কার ঠাকুর কোম্পানী এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হেতু সবিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। সেই বৎসরের মার্চ মাস নাগাদ পাঠশালাটি উঠিয়া যায়। ইহার পর ডাফ সাহেব এই স্থানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সিন্ধুপ্রদেশের মেজর আউটরামের রুধিরাক্ত মুদ্রা দ্বারা এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। Dr. Duff's school house was built with Major Outram's Sind blood-money as it was called. ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের জ্বর নামক মহামারীতে বাঁশবেড়িয়ার জনসংখ্যা হ্রাস হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি বন্ধ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাসাদোপম গঙ্গার ধারের বিরাট ভবন ললিতমোহন সিংহ ক্রয় করিয়া উহার "শ্রীবাস" নামকরণ করেন। ইহার পর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী রাজা পূর্ণেন্দু দেবরায় পুনরায় বাঁশবেড়িয়াতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

হুগলী জেলার দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জনাই, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, দশঘরা, ভাণ্ডারহাটি ও ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় জমিদারশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জনাই গ্রামের শিক্ষালয়ের নাম **জনাই ট্রেনিং স্কুল।** ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী **রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের** অর্থানুকূল্যে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহাদের ছেলেরা বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান হইয়া যাইবে, এই ভয়ে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে বিরত হন এবং ঠাকুরদাসকে হিন্দুর ছদ্মবেশে খৃষ্টান মনে করিয়া, তাঁহাকে "ঠাকুরদাস পাদ্রী" বলিয়া অভিহিত করেন। এই সম্বন্ধে ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর জীবনীতে লেখা আছে ঃ

The orthodox members of the community took fright at the prospect of their children being brought up in foreign course of learning ..they took Takoordass as a Christian Missionary in disguise whom they called "Takoordass Padri".

কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পীল এই বিদ্যালয়ে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন এবং বেথুন সাহেব (ভারত সরকারের ল' মেম্বার ও কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি) জনাই স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন, যে তিনি ইহার জন্য মাসিক এক শত টাকা করিয়া সরকার হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। স্টো-সাহেবের **"গ্লাসগো ট্রেনিং সিস্টেম"** এই বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবর্তিত হয়।

This was the first Grant-in-aid given by the Government to an institution managed by a local body, resulting in the inauguration of the Grant-in-aid system in India...Mr. Bethune was the life and soul of the Janai Training School during its early days.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এবং ইংরাজী ভাষায় মহাভারত অনুবাদক কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় জনাই ট্রেনিং স্কুলের ছাত্র এবং জয়পুরের মন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষক ছিলেন।

উত্তরপাড়ায় **জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়** ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ইহা পরিচালনার জন্য বাৎসরিক বারশত টাকার সম্পত্তি তিনি ও তাহার ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দান করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার পর, ইহা সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সরকারের সর্তানুযায়ী উত্তরপাড়া কলেজ নিজ ব্যয়ে পরিচালনা করেন। এই সম্বন্ধে গেজেটিয়ারে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

After long continued efforts to have the School raised to the status of a College, he submitted a proposal to Government, in 1887, for the establishment of an aided college in connection with the Government school. The Government consented to this proposal provided that the school was taken off its hands to which he agreed.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নব্যশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে যেরূপ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছিল, শিক্ষার ইতিহাসে তাহা একটি গৌরবময় অধ্যায়। সাধারণের অনাদর এবং সরকারী ঔদাসীন্য হেতু এ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই, তবে কোন কোনটি বৈতনিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া এখনও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু এই সকল উদ্যোগ আয়োজনের জন্য পূর্বগামিগণ যে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন তাহা অনস্বীকার্য। দেশের জমিদারগণ ইংরাজী শিক্ষার প্রসারকল্পে যেরূপ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন. এইরূপ আগ্রহ বাঙ্গলাদেশ ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখা যায় নাই।

হুগলী কলেজ চুঁচুড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, জেলার সর্বত্র জমিদারগণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঝোঁক ও দেশবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইহা দেখিয়া শিক্ষা বিভাগের জেনারেল কমিটি আরবী, ফারসী ও ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য হুগলীতে আর একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু সেই সময় হুগলীর জজ মিঃ ডি সি স্মিথের আগ্রহে হুগলীর জমিদারগণ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পূর্বেই **সাবসক্রিপসান স্কুল** অথবা **জমিদারী স্কুল** হুগলীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা আর নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্মিথ সাহেব বিদ্যালয় ভবনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেন এবং জমিদারগণ বিনামূল্যে, ছাত্রদের শিক্ষার জন্য সকলেই মাসিক চাঁদা দিতেন। সেই জন্যই ইহার নাম "সাবসক্রিপস্‌ন স্কুল" হইয়াছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন যখন নির্মিত হইতেছিল সেই সময় চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজ প্রথমে অবৈতনিক বিদ্যালয় হিসাবে খোলা হয়। সেই জন্য জমিদারগণ সাবসক্রিপসন স্কুল বন্ধ করিয়া দেন এবং উক্ত ভবনে তখন কলেজের শাখা হিসাবে **হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল** খোলা হয়। পার্বতীচরণ সরকার ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার সহকারী নিযুক্ত হন।

When Hooghly College was opened as a free school, the Zemindary School ceased to exist. (History of Hooghly College)

জয়কৃষ্ণের ন্যায় প্রগতিশীল ও বিদ্যোৎসাহী জমিদার সেই সময় বাঙলা দেশে খুব অল্প ছিল। তাঁহার অর্থে ৪৪টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি বেথুন কলেজে দশ হাজার টাকা দান করেন। পিতা জয়কৃষ্ণ ও পুত্র প্যারীমোহন সম্বন্ধে সে সময়ের একটি প্রচলিত কবিতা উদ্ধারযোগ্য ঃ

বয়সে অনাদি লিঙ্গ, জরাসন্দ বলে। এখনও দাপটে যার জেলা হুগলী টলে॥
মাল আইনে তোডরমল, রোখে হায়দার আলি। কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলী॥
গোষ্ঠি বহু বাস্তুবাটী যেন লঙ্কাপুরী। ইন্দ্রজিৎ সম পুত্র কৌন্সিলে মুহুরী॥
দিগ্বিজয়ী দন্ডধর রাষ্ট্রজোড়া নাম। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ চরণে প্রণাম॥

হুগলী ইমামবাড়ার সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ছোট বিদ্যালয় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হয়। সার্প সাহেব এডুকেশ্যানাল রেকর্ডে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ফিসার-এর মেমোয়ের-এ লিখিত আছে যে In 1817 the existence of a small School attached to the Imambarah was reported. (Flsher's Memoir) ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইমামবাড়ার সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়টিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। হুগলী কলেজের ইতিহাসের মধ্যে ইহার বর্ণনা উদ্ধারযোগ্য ঃ The Madrasah attached to the Imambarah, like the English School was abolished when the College was founded.

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ওয়াইজের প্রস্তাবে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে একটি **শিশু শিক্ষালয় বা ইনফ্যান্ট স্কুল** খোলা হয়। মিঃ গোমেস্ ইহা সুন্দরভাবে পরিচালনা করিতেন।

শিশু বিদ্যালয়ে ৫৩ জন হিন্দু ও ৩ জন মুসলমান ছাত্র পাঠ করিত। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া গোমেস্ সাহেবের ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হওয়ায় শিশু শিক্ষালয়টি উঠিয়া যায়। এই ধরণের বিদ্যালয় হুগলীতে এই প্রথম স্থাপিত হয়।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণী স্কুল উঠিয়া যায়। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপঃ

On the whole my impression is, that conducted as this school now is, if it serves the purpose of keeping the boys and the young men who compose it out of mischief for a few hours in the day, that is all the good it effects or is likely to effect as long as it is so conducted or misconducted.

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মিঃ কার্টিয়ারের উইলের দ্বারা অর্পিত টাকায় সীতাপুর স্কুল ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। হুগলী কলেজের ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লেখা আছেঃ

The Seetapore Fund was a special endowment granted in consequence of a bequest for the purpose by Mr. Cartier in 1772 and renewed by Warren Hastings in 1781. After some discussion and one or two appeals three-fourths of it were made over to the late General Committee of Public Instruction to found a preparatory school for the Hooghly College······

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ঝিকরা গ্রামেও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু হুগলী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ মিঃ রকফোর্ট বিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থায় আলস্যের জন্য এক জন ইউরোপীয় ইংরাজীর শিক্ষক পাঠাইবার জন্য আবেদন করেন। মিঃ এইচ, ডবলিউ, ফক্স সীতাপুর স্কুলের জন্য প্রেরিত হন; কিন্তু নিদ্রাচ্ছন্ন বিদ্যালয়ের কর্মকুণ্ঠতার কিছুই ব্যাঘাত হয় নাই। The drowsy indolence of the school was not seriously interrupted.

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সীতাপুর স্কুল উঠিয়া যায় এবং ৭৯ টাকায় স্কুল গৃহটি বিক্রয় করা হয়।

হুগলী কলেজের দুই জন পুরাতন ছাত্রের দ্বারা চুঁচুড়ায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে আরও দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি দিগম্বর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত "চুঁচুড়া প্রেপারেটরি স্কুল," আর একটি হরিচরণ রায় প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া বড়বাজারের "চুঁচুড়া সেমিনারী"। হুগলী কলেজের বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রগণ এই দুইটি স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অর্থসাহায্যে ইহা বহুদিন চলিয়া ছিল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ লাইব্রেরীর ইংরাজী পুস্তকের ক্যাটলগ লাইব্রেরিয়ান মিঃ ভারনক্সের দ্বারা প্রথম বাহির হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারের তালিকা প্রনয়ণ সম্বন্ধে তাহার বহুদর্শিতার অভাবে তালিকাটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া কলেজের অধ্যক্ষ বলেন— the arrangement of the catalogue is very indifferent owing to the inexperience of Mr. Vernieux, the Librarian of the College. মিঃ হান হুগলী কলেজের প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ ঘোষ কলেজের গ্রন্থাগার সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যায় খুলিবার জন্য মাসিক দশ টাকা বেতনে সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।

চন্দননগরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একটি **অবৈতনিক বিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' (৬ই জুন ১৮৩৫) এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ্য :

ইতিমধ্যে ফ্রান্সীয় বা ইংগলণ্ডীয় এমত কোন শিক্ষক প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওনের কল্পে হইয়াছে। ফুডচেরির গবর্ণমেন্ট ঐ পাঠশালার ব্যয়ার্থ কতক টাকা সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত সাধারণ ব্যক্তিরদের চাঁদার টাকাতে তাহার ব্যয় চলিতেছে ছাত্রেরদের স্থানে বেতন লওয়া যায় না। পাঠশালার নিয়ম এই যে সর্বজাতীয় বালকেরদিগকে জাতি ও ধর্ম্ম বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি আছে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি না হয় বা কোন উদ্বেগ না হয় এ নিমিত্ত ঐ **পাঠশালাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না**। এই বিষয়ে হিন্দু কালেজের যেমন নিয়ম আছে তদনুসারে কার্য্য চলিবে।

হুগলী জেলার ইটাচোনা গ্রামে **শ্রীনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের** সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে (১৯১৭-১৯) একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। এইস্থানে ছাত্রগণ বিনা বেতনে পড়িতে এবং ছাত্রাবাসে দরিদ্র ছাত্রগণ বিনামূল্যে থাকিতে পর্যন্ত পারিত। রায় বাহাদুর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে কেবল এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তিনি গ্রামের কিরূপ উন্নতি করিয়াছেন তাহাও রিপোর্টে লিখিত আছে। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণী-সমন্বিত বহু উদ্দেশ্যসাধক বিদ্যায়তন বা "মাল্‌টিপারপাস স্কুলে" পরিণত হইয়াছে এবং প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের বর্ণনা এইরূপঃ

In the Hooghly district some of our members visited the village Itachuna (near Khanyan Station, E. I. Ry.). Rai Bejoy Narayan Kundu Bahadur is the holder of the zamindary ; during his father's lifetime, he took to industrial work, and won considerable success as a railway contractor. When he succeeded to the zamindari he retired from business with a fortune, and resolved to devote himself to the development of the estate. He has made an admirable system of roads. He has drained the land, filled up many small tanks

and substituted several large and well-built tanks in their place. He has in this way raised the level of the village. He has built a large house for himself in the centre of his village and has instituted a model farm for the guidance of the cultivators, and finally he has provided a village hospital, well-equipped, and a good school covering all grades from the primary to the matriculation. The lower classes are open without fee to all village boys. The fees for the upper classes are small but graded.

ভাস্তাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ছকুরাম সিংহের দ্বিতীয় পুত্র **যজ্ঞেশ্বর সিংহ** ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গ্রামে একটি মাধ্যমিক বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে সাহায্য করেন শশীভূষণ মিত্র। সেই সময় ইংরাজী শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের আগ্রহ দেখিয়া যজ্ঞেশ্বর সিংহ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন এবং বিদ্যালয় ভবনও নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার সুষ্ঠু পরিচালনায় বিদ্যালয়ের ক্রমশ উন্নতি হয়। এই অঞ্চলে ইহাই তৎকালে একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ইহার উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্রলাল কুমার যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানের জন্য ভাস্তাড়ায় একাধিকবার আগমন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যজ্ঞেশ্বর বাবুর পরলোকগমনের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে বিদ্যালয়ের নাম **"ভাস্তাড়া যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে"** পরিবর্তিত হয়। গৃহ নির্মাণ সমস্যায় ও আর্থিক সংকটে শ্রীনির্শিকান্ত মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের সহিত ছাত্রীগণের সহশিক্ষার ব্যবস্থা এখন হইয়াছে। বর্তমানে ইহা একাদশ শ্রেণী সমন্বিত সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে।

কোন্নগর হাইস্কুল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শিব চন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বর্গত শিবচন্দ্র দেবের আবক্ষ মূর্তির আবরণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উন্মোচন করিয়া বলেন যে, এই বিদ্যালয় বংশ পরম্পরায় ছাত্র গঠন করিতেছে। শতবার্ষিকীতে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠাতার ভস্ম সমাধিস্থ করেন।

শিবচন্দ্র কলিকাতা **সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের** প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ

কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল,
স্থির যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল।
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে, ভারতীর ভাব॥

দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় জমিদার **মানগোবিন্দ বিশ্বাস** প্রতিষ্ঠা করেন। সামান্য খড়ের ঘরে যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, আজ তাঁহার উত্তরাধিকারি ও বংশধরগণের আপ্রাণ চেষ্টায় ইহা আঠার বিঘা জমির উপর প্রকাণ্ড অট্টালিকায় পরিণত

হইয়াছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীপৃথ্বিশচন্দ্র বিশ্বাসের চেষ্টায় ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে বলেন যে, একটি গ্রাম্য উচ্চ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের একশত বর্ষ পূর্ণ হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষ করিয়া কোন শিক্ষায়তনের পক্ষে শতবর্ষ পূর্তি হওয়া গৌরবের জিনিষ। একশত বৎসর পূর্বে যাঁহারা মফঃস্বলে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণযোগ্য। এই দরিদ্র দেশে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে যে সকল মহাপুরুষ জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালাইয়াছিলেন, তাঁহারা জাতির যে মহৎ কল্যাণকার্য করিয়া গিয়াছেন সেই জন্য দেশবাসীগণ তাঁহাদের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে চিরদিন আবদ্ধ থাকিবে। একশত বৎসর কেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশের গ্রামগুলি আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের দিক হইতে একেবারে দরিদ্র ও হতভাগ্য ছিল। সেই দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের দিনে হুগলী জেলার কয়েক জন মহাপুরুষ পল্লীর সাধারণ মানুষকে বিদ্যার্জনের সুযোগ দিয়া বাংলা দেশে শিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেন।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; সিপাহী বিদ্রোহের জন্য উক্ত বৎসরটি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সেই সময় বিদ্রোহের জন্য কলিকাতার অবস্থা কিরূপ ছিল 'বঙ্কিম-জীবনী' লেখক শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার একটি চিত্র দিয়াছেন, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া এই স্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছিঃ

"তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারিদিকে প্রজ্বলিত। ইংরাজের সিংহাসন প্রবল স্রোতোমুখে জীর্ণ তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে। ইংরাজের শিশু ও রমণীরা, বাঙ্গালীর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরাজদের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব আলিপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। গভর্নর জেনারেল ক্যানিং নেটিভ গার্ড তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। ভলাণ্টিয়ারদল চারিদিকে সজ্জিত হইতেছে। কোম্পানীর কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নামিয়া গিয়াছে। কাজকর্ম বন্ধ। দস্যু তস্কর মাথা তুলিয়াছে। কলিকাতাবাসীরা ভীত, ত্রস্ত; যে যেখানে পারিতেছে, পলাইতেছে।"

কলিকাতার যখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং সেই বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষা এবং পর বৎসর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রথম প্রবর্তন হয়। ভারতীয়গণের মধ্যে সর্বপ্রথম দুইজন বাঙ্গালী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু উক্ত পরীক্ষায় সর্বপ্রথম উত্তীর্ণ হন বলিয়া, তাঁহারা ভারতের প্রথম গ্রাজুয়েট

বলিয়া প্রখ্যাত। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ বুঝিতে পারিলেন, ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষাব্যবস্থা তাহাদের কর্তব্যের অন্তর্গত। ১৯ জুলাই, ১৮৫৪ তারিখে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড 'ভারতের শিক্ষা বিষয়ক চার্টার' নামে সুপরিচিত পত্রখানি স্বাক্ষর করিলেন। তদনুসারে বাংলাদেশে কাজ আরম্ভ হইল। শিক্ষা পরিষদের পরিবর্তে ডিরেক্টার অফ পাবলিক ইন্স্ট্রাকশন বহাল হইলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষভাবে ইংরাজী অথবা দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় নির্ধারণার্থে একটি ইউনিভার্সিটি কমিটি গঠন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই কমিটির নির্দেশ অনুসারে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রানুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনের পর ২৪ জানুয়ারী, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই সম্বন্ধে উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারী সি ই বাক্ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন:

> In July 1855, povisional rules were issued by Government for giving a good secular education, either through English or the Vernacular to males or females or both, under adequate local management. A University Committee was formed······this committee was charged with the duty of framing a scheme for the establishment of Universities at the Presidency towns...The Calcutta University was incorporated under Act II of 1857, on the model of the London University.

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি পরিকল্পনা ডিরেক্টার বোর্ডের নিকট একটি সরকারী ডেসপ্যাচে প্রথমে বিবৃত করা হয়। স্থির হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোর্স সমাপ্ত করিয়া যে সকল ছাত্র প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাদিগকে 'ডিগ্রী' দেওয়া হইবে। সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ভারতের ইউরোপীয় সম্প্রদায় এদেশে উচ্চশিক্ষা ভারতবাসিগণকে যাহাতে দেওয়া না হয়, তাহার জন্য আন্দোলন করেন, কিন্তু বাংলার ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক্ হ্যালিডে ২৮ এপ্রিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরার নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে হয়, তাহাই করা আমাদের কর্তব্য।

প্রথমাবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন প্রসার হয় নাই; যদিও বাংলা ও উত্তর ভারতে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল সেইগুলি, এমন কি, বাহিরের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালে খৃষ্টান মিশনারীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ছিল বলিয়া ইহা প্রধানতঃ খুব জনপ্রিয় হয় নাই। পরে বাঙ্গালীদের চেষ্টায় কয়েকটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় ২৪৪ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তারপর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩,৮২৭ জন পরীক্ষার্থী, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৮,১৫০ জন, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৮,৬১৮ জন, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৩০,২০২ জন, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৩৫,৩৫৭ জন, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ৪৫,০০৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হুগলী জেলার সতেরটি বিদ্যালয় সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলাবোর্ডের সাহায্য পাইত। সমস্ত বিদ্যালয়-গুলির সাহায্যপ্রাপ্তির মোট পরিমাণ বাৎসরিক ৭৬৭১৲ টাকা। ১৯০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে যে সকল স্থানের বিদ্যালয় সমূহ সাহায্য পাইয়াছিল তাহাদের নাম—আরামবাগ, বাগাটি, বৈদ্যবাটি, বলাগড়, ভদ্রেশ্বর, ভাণ্ডারহাটি, ভাস্তাড়া, চাতরা, চুঁচুড়া ফ্রি চার্চ, দশঘরা, গুপ্তিপাড়া, ইলছোবামণ্ডলাই, জনাই, কৈঁকালা, কোন্নগর, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন, এবং সোমড়া।

তৎকালে ১ অক্টোবর হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের বৎসর গণনা হইত এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বৃত্তি পরীক্ষা ও বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া দশহরার দীর্ঘ অবকাশের পর নূতন পড়া আরম্ভ হইত। সেই সময় হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগে সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে পাঁচটি শ্রেণী এবং জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে আটটি শ্রেণী ছিল। স্কুলের উচ্চ বিভাগের ৩য় শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণকে সার্টিফিকেট দেওয়া হইত।

হুগলী কলেজের ইংরাজী বিভাগ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। স্কুল বিভাগের উচ্চভাগে (সিনিয়র ডিভিসনে) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকসন এবং নিম্নভাগে (জুনিয়র ডিভিসনে) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকসন ছিল। জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি-পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১০ জন হুগলী কলেজ হইতে ৭ জন, হুগলী মাদ্রাসা হইতে ৮ জন, কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে ৮ জন ও সংস্কৃত কলেজ হইতে ১০ জন (১৮৫৬) পাস হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যদুনাথ বসু ব্যতীত ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য ও দেবেন্দ্রনাথ বসুও ২৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। হুগলী কলেজ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য বৃত্তিলাভ করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, 'সিনিয়র বিভাগের বা উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য বর্তমান সময়ের বি. এ পরীক্ষার পাঠ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না, বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে।'

তৎকালে প্রত্যেক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রকে তাঁহার বৃত্তি বজায় রাখিবার জন্য এক বৎসর পরে পুনরায় তাঁহাদের একটি পরীক্ষা দিতে হইত। সেই পরীক্ষায় যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে দক্ষতা দেখাইতেন, তাঁহাদের বৃত্তি বহাল থাকিত। যাঁহারা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে পারিতেন না, কিম্বা পড়াশুনা ত্যাগ করিতেন, তাঁহারা আর বৃত্তি পাইতেন না।

হুগলীর বিদ্যালয়গুলিতে রবিবার দিন সম্পূর্ণ ছুটি ও শুক্রবার অর্ধদিবসের জন্য

ENTRANCE EXAMINATION
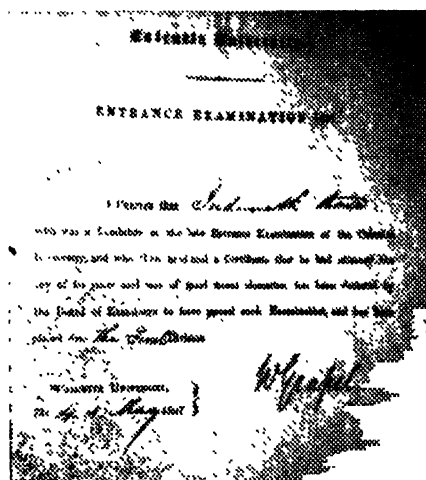
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার প্রথম সার্টিফিকেট
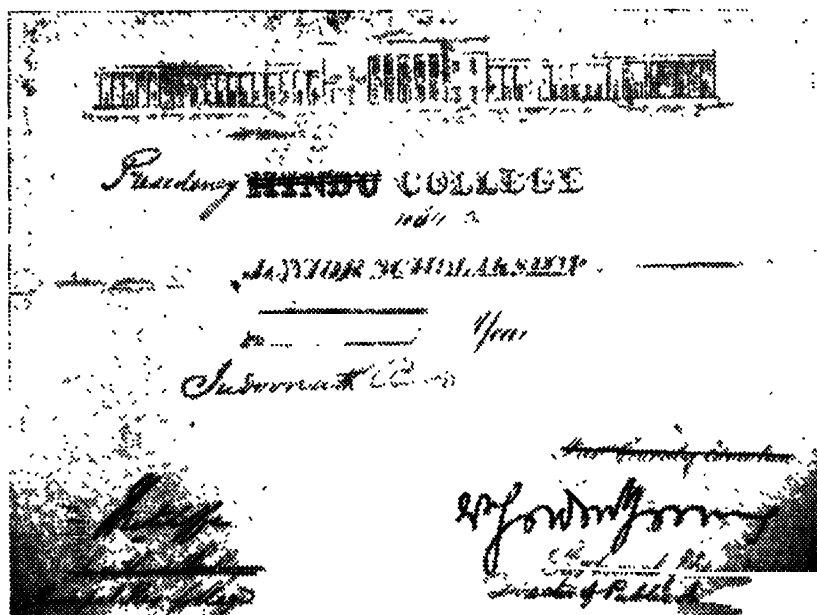
COLLEGE

জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার সার্টিফিকেট

ছুটি দেওয়া হইত। শনিবার দিন তখন পুরা ক্লাস হইত। গরমের সময় প্রাতঃকালে ক্লাস হইত বলিয়া হুগলী কলেজের ডাঃ রস উহার বিরোধিতা করেন। কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রগণ প্রাতঃকালীন স্কুলের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই সম্বন্ধে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ রিপোর্ট দেনঃ

Dr. Ross the Medical Attendant of the College, considers morning school injurious to the health of the boys. They leave home, he says, in the morning without breaking their fast, and do not return till 11 o' clock or, some cases, till 12; which he considers too long to be without food.

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে হুগলীর জুনিয়র স্কুলের ছয়জন শিক্ষকের সাধারণ জ্ঞানের অভাব ও উচ্চারণে ত্রুটির জন্য তাহাদিগকে শিক্ষকের পদ হইতে অপসারিত করা হয়।

In February 1841 about half-a-dozen of the masters of the Junior School were dismissed with reference to their general ignorance and defective pronunciation.

এনট্রান্স পরীক্ষা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বৎসর ৬ এপ্রিল তারিখে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেট সভায় ৩৮ জন সদস্য ছিলেন। চ্যান্সেলার ছিলেন ভারতের বড়লাট লর্ড ক্যানিং, এতদ্ভিন্ন স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন জেম্‌স কর্লভিল।

প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষায় ৩০টি বিদ্যালয় যোগদান করে। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিঃ ৫৲ টাকা ধার্য হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ মার্চ ছাত্রগণকে ফিঃ জমা দিতে হয় এবং ৬ এপ্রিল এনট্রান্স পরীক্ষা গৃহীত হয়। যদুনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের জেনারেল ডিপার্টমেণ্ট হইতে পরীক্ষা দেন। ৪ মে তারিখে পরীক্ষার ফল বাহির হয়; যদুনাথ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ২৩ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হন।

এতদ্ভিন্ন গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হিন্দু স্কুল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সর্বসমেত ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হন। ৮২ জন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই। শতকরা ৬৫·৫ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করে; তখন তৃতীয় বিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। যাহারা সর্বসাকুল্যে অর্ধেক বা তাহার উপর নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা প্রথম বিভাগে এবং এবং যাহারা অন্যূন এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেকের কম পাইয়াছিল তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। প্রত্যেক বিষয়ে পরীক্ষার্থীর সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকিলে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

প্রথম বি-এ পরীক্ষার ডিপ্লোমা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের এনট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্য ছিল কৃত্তিবাসী "রামায়ণ" ও "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম"। সংস্কৃত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ইংরাজী গোল্ডস্মিথ ও অন্যান্য লেখকগণের পুস্তক এবং ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক এবং Natural Philosophy কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ছিল না। প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি এই স্থানে দেওয়া হইল।

বি এ পরীক্ষা

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়; এবং এপ্রিল মাসের প্রথমে বি এ পরীক্ষা গৃহীত হয়। সর্বসমেত ১৩ জন ছাত্রের পরীক্ষা দিবার কথা ছিল; কিন্তু অসুস্থতা বশত ৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হয়। ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান ও যদুনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উহারা দুইজনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র—বঙ্কিমচন্দ্র আইন বিভাগের এবং যদুনাথ জেনারেল ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছিলেন। বি এ পরীক্ষার প্রথম সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্বজনবিদিত, কিন্তু ভারতের অন্যতর প্রথম গ্র্যাজুয়েট যদুনাথের বিষয় আজ সকলে বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল।

॥ যদুনাথ বসু ॥

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রানুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। উক্ত পরীক্ষায় **ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু** উত্তীর্ণ হন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

যদুনাথ বসু ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর শুকদেবপুর নামক এক গণ্ডগ্রামে (২৪ পরগণা) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নন্দলাল বসু; ইঁহারা মাহিনগর 'বসু' সমাজভুক্ত। ইহার আদি নিবাস বোড়াল এবং যদুনাথ রাজনারায়ণ বসুর সহিত জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আবদ্ধ। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ও বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার আত্মীয়। অতি শৈশবে যদুনাথের পিতৃবিয়োগ হয়; তাই যাবতীয় শিক্ষার ভার তাঁহার মাতা স্বরূপমণি দেবীর উপর পড়িয়াছিল।

গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতা গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে তাঁহাদের পৈতৃক বাটিতে চলিয়া আসেন এবং হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবেশ করেন। তথায় প্রতিবৎসর বৃত্তি পাইয়া তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসর বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারী মিঃ ইয়ং যদুনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা চাকুরী গ্রহণ

করিতে স্বীকৃত হন; বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট ও যদুনাথ ২৩শে সেপ্টেম্বর উক্ত পদে নিযুক্ত হন।

বঙ্গীয় সরকারে ৩৪ বৎসর যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ১ম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কৃষ্ণনগর হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে তিনি দেহরক্ষা করেন। যদুনাথ চুঁচুড়ার সোমবংশে অমৃতলাল সোমের জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্ষিরোদমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

॥ স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ॥

শিক্ষাক্ষেত্রে হুগলী জেলায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮০৫। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১৫৯৬টি হইয়াছে। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার শতকরা ৯৮%। এই তের বৎসরের মধ্যে হুগলী জেলায় ৮৮টি বেসিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বে এই জেলায় মাত্র ১টি টেকনিক্যাল স্কুল ছিল, বর্তমানে মোট তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র চন্দননগর মহকুমা ব্যতীত অন্যান্য মহকুমায় যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট বলা যায়। পূর্বে হুগলী জেলায় চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ লইয়া কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র চারটি। আর এখন হুগলীতে তেরটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাদান করিতেছে। ইহার মধ্যে হুগলীতে নারীদের জন্য একটি মহিলা কলেজ আছে। ডুপ্লে কলেজের নাম বর্তমানে চন্দননগর কলেজ হইয়াছে। তারকেশ্বর, হরিপাল, ভদ্রেশ্বর ও সিঙ্গুর থানা লইয়া চন্দননগর নূতন মহকুমা সৃষ্টি হইবার পর এই মহকুমায় শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন উন্নতি হয় নাই। হরিপাল ও তারকেশ্বরে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চলিতেছে, আশা করা যায় শীঘ্রই এই স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠা হইবে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে এই জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

	১৯৪৭	১৯৬০	শতকরা বৃদ্ধি
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮০৫	১৫৯৬	৯৮
জুনিয়র বেসিক	—	৭৮	
সিনিয়র বেসিক	—	১০	
মাধ্যমিক (জুনিয়ার হাই)	৭৭	১৩৭	৭৮
উচ্চ মাধ্যমিক	৬৭	১০৩	৫৪
উচ্চতর মাধ্যমিক (ক্লাস ইলেভেন)	—	৫২	
কলেজ	৪	১৩	২২৫
টেকনিক্যাল স্কুল	১	২	১০০
টেকনিক্যাল কলেজ	—	১	
	৯৫৪	১৯৯২	

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্যের ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দিবার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় সরকারের বার্ষিক ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে সরকারের উদ্যোগে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহরাঞ্চলে এই ব্যবস্থা পৌরসভাগুলির উপর ন্যস্ত। তাহাদের শিক্ষা বিষয়ে উদাসীনতার জন্য সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার খুব অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমতাবস্থায় শিক্ষা-প্রসার কল্পে সরকারের এই আদর্শ পরিকল্পনাটিকে সকলেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বহু শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রয়োজন হইবে। বর্তমান বেকার সমস্যার যুগে ইহার দ্বারা বহু শিক্ষিত বেকারের অন্নসংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কৃষি-গবেষণাকেন্দ্র

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যখন পৃথক কৃষিবিভাগ গঠিত হয়, তখন তাহার সদর কার্যালয় স্থাপন করা হয় ঢাকায়। সেই সময় কৃষিবিভাগটি কিন্তু ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের অধীন ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ঢাকায় একটি কৃষি-গবেষণাগারও স্থাপিত হয়। পরবর্তী ২২ বছর এই গবেষণাগারের কাজ বেশ ভালভাবেই চলিয়া ছিল। তারপর, প্রয়োজন অনুসারে চুঁচুড়া ও বাঁকুড়াতেও দুইটি কৃষি-গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের কথা।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চুঁচুড়া কৃষি-গবেষণাকেন্দ্রটি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রি-কালচারাল রিসার্চের আনুকূল্যে গবেষণার কাজ চালাইতেছিল। তারপর গবেষণাকেন্দ্রটি তদানীন্তন বাঙলা-সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়ে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষিবিভাগ হইতে চুঁচুড়ার এই কৃষি-গবেষণাকেন্দ্রে আউশ আমন ও বোরো ধান হইতে বিভিন্ন ধরনের ধান উৎপাদন এবং তাহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণার কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। এই গবেষণাকেন্দ্রের বিভিন্ন শাখায় যে সব কাজ হইতেছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে প্রকাশিত 'হুগলী' নামক পুস্তিকা হইতে দেওয়া হইল ঃ

(১) **অর্থকর উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ শাখা**—এই শাখার কাজ হইল উৎপাদিত ধানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা।

(২) **কীটবিদ্যা শাখা**—এই শাখা বিপজ্জনক কীটপতঙ্গ থেকে ধানক্ষেতকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই শাখায় দুইটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়—(ক) চারা-গাছের ডাঁটার ভিতর গর্ত অনুসন্ধান করা, এবং (খ) পোকা-মাকড়ে ক্ষতি হইবার আশঙ্কায় জীবাণুনাশক ওষুধ ছড়ানো।

(৩) **ছত্রাকবিজ্ঞান শাখা**—'হেল্‌সিন্থস্‌ পোরিস' নামে যে রোগ প্রায়ই ধানগাছকে আক্রান্ত করে, এই শাখার কাজ হইল সেই রোগের কারণ অনুসন্ধান ও রোগমুক্তির উপায় নির্ণয় করা।

(৪) **কৃষি-রসায়নবিৎ শাখা**—এই শাখায় দুইরকম সার নিয়ে পরীক্ষা করা হয়—(ক) অ্যামোনিয়া, ও (খ) কয়েক রকমের সবুজ পাতার সার।

বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ার এই গবেষণাকেন্দ্রটির কাজ বেশ ভালভাবেই চলেছে। শস্যোৎপাদনবৃদ্ধি ও মিশ্রবীজ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ধান উৎপাদনের জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফলে পাওয়া গিয়াছে ঃ (১) জাপানিকা ইন্‌ডিকা (মিশ্র), (২) ভাসমানি সাতিকা (মিশ্র) ও (৩) পাটনাই (২৩) আচরা ১০৮ (মিশ্র)। সারা ভারতে এই ধরনের যে কয়টি কেন্দ্র আছে, তাহার মধ্যে উড়িষ্যার কৃষি-গবেষণাকেন্দ্রটির পরেই চুঁচুড়ার কৃষি-গবেষণাকেন্দ্রের নাম করা যাইতে পারে। এই কেন্দ্রের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে আধুনিক ধরনের সাজসরঞ্জামযুক্ত গবেষণাগার, একটি সংগ্রহশালা ও একটি পাঠাগার। গবেষণা-কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণাগারটি নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে। এই পর্যবেক্ষণাগারটির প্রধানকাজ হইল শস্যের উপরে সূর্যতাপের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা করা।

চুঁচুড়ার এই কৃষি-গবেষণাকেন্দ্রে বর্তমানে ধান ছাড়া অন্য কয়েকটি ফসল সম্বন্ধেও গবেষণা চালানো হয়।

কৃষি-বিদ্যালয়

১৯২১ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বাঙলা-সরকার চুঁচুড়ায় যে কৃষি-বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সেটি বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যায়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আবার উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে লইয়া আসা হয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে বিদ্যালয়টিকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। এই কৃষি-বিদ্যালয়ে যেসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইল—(১) কৃষি; (২) উদ্যান-কর্ষণ ও ফল-উৎপাদন; (৩) পশুবিজ্ঞান; (৪) কৃষি-বাস্তুবিদ্যা, এবং (৫) জীববিদ্যা—(ক) উদ্ভিদবিদ্যা, (খ) ছত্রাকবিজ্ঞান, ও (গ) কীটবিজ্ঞান। এই বিদ্যালয়ে মৌমাছি-পালন সম্পর্কে শিক্ষা দেবারও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া, বিদ্যালয়-সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রে যাইয়াও শিক্ষার্থীরা কাজ করবার সুযোগ পায়। এই কৃষি-বিদ্যালয়ে একটি গবেষণাগারও আছে। শিক্ষার্থীরা সেখানে কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-ভাবে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সাম্প্রতিককালে এই বিদ্যালয়ে একটি কৃষি-সংগ্রহশালাও স্থাপন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, পশুবিজ্ঞান সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে সাহায্য করেছে দুগ্ধাগার ও পক্ষীসংস্থানকেন্দ্রটি। এই বিদ্যালয়ে প্রতি বছর ৮০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। একটি **ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার** আছে এই বিদ্যালয়ের কাছে। যেসব ছাত্র কৃষি-বিদ্যালয় হইতে কৃতকার্য হইয়া আসেন, তাঁহাদের সেখানে নেওয়া হয়। এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। গ্রামসেবকদের শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। চুঁচুড়ার এই কৃষি-বিদ্যালয় সংলগ্ন খামারটি ৭০·৩ একর জমি লইয়া তৈয়ারী হইয়াছে।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলায় নিম্নোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠনগুলি চালু ছিল ঃ

(ক) **একাদশ শ্রেণী-সমন্বিত বহু উদ্দেশ্যসাধক বিদ্যায়তন বা মাল্‌টি-পারপাস স্কুল**

(১) আনুর জনশিক্ষা সংসদ, আনুর; (২) আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আঁটপুর; (৩) বৈদ্যবাটী বনমালী মুখার্জী ইন্সটিটিউশন, বৈদ্যবাটী; (৪) ভাণ্ডারহাটী বি

এম ইন্সটিটিউশন; (৫) চাত্‌রা নন্দলাল ইন্সটিটিউশন, শ্রীরামপুর (৬) হুগলী কলেজিয়েট স্কুল, চুঁচুড়া; (৭) জাঙ্গীপাড়া, ডি, এন উচ্চ বিদ্যালয়, জাঙ্গী-পাড়া: (৮) কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, কোন্নগর; (৯) শ্রীনারায়ণ ইন্সটিটিউশন (প্রবুদ্ধ-ভারত সঙ্ঘ) ইটাচুনা; (১০) সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিঙ্গুর; (১১) শ্রীরামপুর ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়, শ্রীরামপুর; (১২) তেলেনিপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর; (১৩) উত্তরপাড়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরপাড়া; (১৪) উত্তরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরপাড়া; (১৫) কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষামন্দির, চন্দননগর এবং (১৬) রবীন্দ্র মেমোরিয়াল বেসিক-কাম-মালটিপারপাস স্কুল, পূর্বাচলপল্লী ভদ্রেশ্বর।

(খ) একাদশশ্রেণী-সমন্বিত সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়

(১) বাকুলিয়া রাজেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউশন, বাকুলিয়াগ্রাম; (২) চাঁপাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা; (৩) দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইন্সটিটিউশন, দ্বারহাট্টা; (৪) শিয়াখালা বেণীমাধব হাইস্কুল, শিয়াখালা; (৫) গুটিয়াবাজার বিনোদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। (৬) গুরুদয়াল ইনষ্টিটিউশন, হরিপাল; (৭) যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়, ভাস্তাড়া; (৮) আর, কে উচ্চ বিদ্যালয়, গুড়ুপ; (৯) দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয়; দশঘরা (১০) প্রবর্তক বিদ্যার্থী ভবন, চন্দননগর; (১১) গুপ্তিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, গুপ্তিপাড়া এবং (১২) সারদাপল্লী কন্যা বিদ্যাপীঠ, ভদ্রেশ্বর; (১৩) সেন্ট জোসেফস্ কনভেন্ট স্কুল, চন্দননগর।

(গ) দশমশ্রেণী-সমন্বিত উচ্চ বিদ্যালয়—(ইহাদের নাম পরে প্রদত্ত হইয়াছে।)

(ঘ) মধ্যবিদ্যালয় বা জুনিয়র হাইস্কুল (সিনিয়র বেসিক স্কুল সহ)—১০৪

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাইমারী স্কুল (জুনিয়র বেসিক স্কুল সহ)—১,৫৭৭

(চ) প্রাথমিক শিক্ষণ-বিদ্যালয় বা প্রাইমারী ট্রেণিং স্কুল—৪

(ছ) বাস্তুবিদ্যা শিক্ষালয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল—২

(জ) শিল্প-বিদ্যালয় বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল—২

(ঝ) বাণিজ্যিক বিদ্যালয় বা কমার্শিয়াল স্কুল—৪

(ঞ) কৃষি-বিদ্যালয়—১

(ট) হস্তশিল্প-বিদ্যালয়—১

(ঠ) টোল-চতুষ্পাঠী—১১০

(ড) সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় বা মিউজিক কলেজ—২

হুগলী জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ৬২,৫২,৩২০ টাকা ছিল বলিয়া জানা যায়।

শিক্ষকতা বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দেবার উদ্দেশ্যে হুগলিতে একটি বি টি ট্রেনিং কলেজও স্বাধীনতালাভের পর স্থাপিত হইয়াছে।

হুগলী জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

কৃষি বিদ্যালয় ॥ ভূতনাথ পাল এগ্রিকালচার্যাল স্কুল ও গভর্ণমেন্ট এগ্রিকালচার্যাল ফার্ম শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও মিশ্র বীজ হইতে ধান উৎপাদনের জন্য ইহার কাজ চালিতেছে।

সার্ভে ইন্সটিটিউট, ব্যাণ্ডেল ॥ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই সরকারী জরীপ শিক্ষানিকেতনটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এখানে ৭৯ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইন্সটিটিউট অব টেক্‌নোলজি ॥ এখানে এল সি এফ কোর্স ও ড্রাফটস্‌ম্যানশিপ শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ২১৬ জন।

উইভিং স্কুল, রিষড়া, শ্রীরামপুর ॥ এই বয়ন বিদ্যালয়টি বহুদিনের। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে এখান থেকে ১৩ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। ইহার নাম গভর্ণমেন্ট উইভিং ইনষ্টিটিউট—শ্রীরামপুর। **শিল্প বিদ্যালয়**—মবার্লি টেকনিক্যাল স্কুল—চুঁচুড়া।

চন্দননগর স্কুল অব আর্ট, চন্দননগর ॥ চিত্রবিদ্যার একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আছে সমগ্র জেলায়।

বয়স্ক শিক্ষা ॥ এই জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা অব্যাহত আছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পুরুষদের জন্য ৪০টি সরকারী বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ৩৪ জন শিক্ষক ও ২০ জন সাধারণ শিক্ষক কাজ করিতেছেন। তাহা ছাড়া ঐ বছর মহিলাদের জন্য ১৪টি সরকারী বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ৭জন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তশিক্ষিকা ও ১৩জন সাধারণ শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষালাভ করেছে ১,৪৭৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও ৩৯৫জন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা। ইহা ছাড়া, ঐ বৎসর সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ৪৬টি পুরুষ বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে ও ১টি মহিলা বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে যথাক্রমে ১,১০৮ জন পুরুষ ও ২৮ জন মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য ২০টি পাঠাগারও স্থাপিত হইয়াছে। হুগলী জেলার সমস্ত পাঠাগারের বিবরণ পরে পৃথকভাবে বিবৃত হইবে।

॥ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ॥

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পাল বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ক্ষমতাবলে গত বৎসর ১লা জুলাই হইতে ৩১টি কলেজ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এক আদেশ জারি করেন এবং শ্রীসুকুমার সেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হন; পরে তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয় উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্দ্ধমানের নয়টি কলেজ, বীরভূমের চারিটি কলেজ, বাঁকুড়ার তিনটি কলেজ, পুরুলিয়ার দুইটি কলেজ এবং হুগলীর তেরটি কলেজ উহার অন্তর্ভুক্ত।

হুগলী জেলার তেরটি কলেজের মধ্যে বারটি ছাত্রদের ও একটি মহিলাদের। মহিলা কলেজটি হুগলীতে অবস্থিত। উহা সরকারী মহাবিদ্যালয় নাম হুগলী উইমেন্স কলেজ।

হুগলী জেলার চারিটি মহকুমা; হুগলী সদর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ। হুগলী সদরে মোট কলেজের সংখ্যা পাঁচটি। (১) হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া। (২) হুগলী উইমেন্স কলেজ, হুগলী। (৩) গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী, (৪) শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ, মগরা ও (৫) বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয় পাণ্ডুয়া।

চন্দননগরে মোট কলেজের সংখ্যা মাত্র একটি চন্দননগর কলেজ অর্থাৎ প্রাক্তন ডুপ্লে কলেজ। পাঁচটি থানা লইয়া চন্দননগর মহকুমা গঠিত; যথা চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, হরিপাল,

তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর। চন্দননগর নূতন মহকুমা গঠিত হইবার পর এই উন্নতিশীল মহকুমায় শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা হয় নাই; ইহা খুবই দুঃখের বিষয়।

শ্রীরামপুর মহকুমায় কলেজের সংখ্যা চারটি, যথা—(১) শ্রীরামপুর কলেজ, শ্রীরামপুর। (২) বিধানচন্দ্র কলেজ, রিষড়া। (৩) রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া ও (৪) হীরালাল পাল কলেজ কোন্নগর।

আরামবাগ মহকুমার কলেজের সংখ্যা তিনটি—(১) নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ। (২) অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, বেঙ্গাই ও (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ, কামারপুকুর। বলা বাহুল্যে দশ বৎসর পূর্বে আরামবাগে একটিও কলেজ ছিল না। আরামবাগের উন্নতিকল্পে সদাচেষ্টিত মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল ও শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় আরামবাগে তিনটি কলেজ হইয়াছে। আনুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিদ্যামহাপীঠের বিজ্ঞাপনীতে লেখা আছে ঃ জননীং সারদাং বন্দে রামকৃষ্ণং জগদগুরুম্। পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

চন্দননগর মহকুমার তারকেশ্বরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়া জানি। তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ কলেজের জন্য বাড়ি ও পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম; কিন্তু কেন উহা হইল না তাহা জানা যায় নাই। তারকেশ্বরে একটি কলেজের বিশেষ প্রয়োজন। এই স্থানে এখন তারকেশ্বর হইতে বর্ধমান ও তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ পর্যন্ত বাস চলাচল করিতেছে। এই সব অঞ্চলের ছাত্রগণ কলেজের অভাবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না।

ভদ্রেশ্বর, হরিপাল ও সিঙ্গুর এই তিনটি থানায় তিনটি কলেজ হওয়া উচিৎ। নচেৎ শিক্ষার প্রসার হইতে পারে না। হরিপাল হইতে জেজুর হইয়া চুঁচুড়া পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। হরিপাল থানার মধ্যে যে কোন একটি গ্রামে এই কলেজ হইলে ভাল হয়। আমি জেজুরে মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধৃত শ্রীঅরবিন্দের সতীর্থ দেবব্রত বসুর নামে একটি কলেজ স্থাপন করিবার জন্য চন্দননগর মহকুমার সুধীবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানাইতেছি। দেবব্রত বসু পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন ও সন্ন্যাসী হইয়া দেহরক্ষা করেন।*

সিঙ্গুর বর্তমানে একটি আদর্শ পল্লী হইয়াছে। এই স্থানে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নামে একটি কলেজ ভদ্রেশ্বর বা চাঁদপানী এই দুই শহরে যে কোন একটিতে যাহাতে হয়, সেইজন্য এই দুই মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের ও শহরের করদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

হুগলী জেলার মহিলা কলেজ রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখার্জির চেষ্টায় হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি বর্ধমান অথবা মেদিনীপুরে স্থাপিত হইবে ঠিক হইয়াছিল। কারণ সরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলিয়া দিতে হইবে বলিয়াছিলেন। সতীশবাবু ছয় মাসের মধ্যে উক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন এবং উহা হুগলীতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

*দেবব্রত বসু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তাঁহার দেহান্ত হয়। এই জেজুরের বসু বংশে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুও জন্মগ্রহণ করেন।

॥ কথকতা ॥

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকশিক্ষা' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"লোকশিক্ষার একটা উপায়ের কথা বলি, সেদিনও ছিল, আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী বা পীঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরের উপর বেষ্টিত করিয়া নাদুস কালো কথক 'সীতার সতীত্ব', 'অর্জুনের বীরধর্ম', 'লক্ষ্মণের সত্যব্রত', 'ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়', 'দধীচির আত্ম সমর্পণ' বিষয়ক সংস্কৃত পুরাণ-কথার সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর-সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত না পায়, সেও শিখিত—শিক্ষিত যে ধর্ম নিত্য, ধর্ম দৈব, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, পরের জন্য জীবন; ঈশ্বর আছেন বিশ্বধ্বংস করিতেছেন; পাপ পুণ্য আছে, পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে; জন্ম আপনার জন্য নহে—পরের জন্য; অহিংসা পরমার্থ, লোকহিত পরম কার্য। সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল?—বঙ্গীয় নব্যযুবকের কুরুচির দোষে। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত হইতেছে বই বর্ধিত হইতেছে না।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন কথকতা বাংলার জনশিক্ষা প্রচারের একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি—আমাদের সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রণালী। প্রাচীন বাংলার লোকশিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহার অবদান অনবদ্য ও অতুলনীয়। আমাদের দেশের জনসাধারণ যুগযুগান্তর ধরিয়া ইহা হইতে ধর্মশিক্ষা ও নীতিজ্ঞান লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা আমাদিগকে পুরুষানুক্রমে একই সঙ্গে আমোদ, আনন্দ ও শিক্ষা দান করিয়াছে।

কথকতা শ্রবণে বঙ্গবাসিগণের বিশেষতঃ বাংলার পল্লীবাসীদিগের সরল ধর্মজীবন সহজেই বিকশিত হইত; তাহাদের অন্তরে স্বভাবতঃই ধর্মভাব বর্ধিত ও জাগরিত হইত এবং তাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য-শিব-সুন্দর সুরটি হৃদয়ের গভীর ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমের সহিত উৎসারিত হইত। কথকতা করিতে করিতে কথকেরও কণ্ঠস্বর ভাবাবিষ্ট হইত, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গেরও অন্তর এক অনির্বচনীয় প্রেম ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইত।

কথকগণ সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকা অবলম্বনে কথকতা করিতেন। তাঁহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, রামের বনবাস, সীতা-সাবিত্রীর দুঃখভোগ, সতীর দেহত্যাগ বেহুলার পাতিব্রত্য, ধ্রুব প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তি, রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতা প্রভৃতির কাহিনী শুনাইয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ এবং প্রেম ভক্তি বিশ্বাস ও ভাবে বিগলিত করিতেন।

কথকতা একবার শুনিলে সারা জীবন শ্রোতার মনে উহার বিষয়বস্তু ও সারমর্ম, অঙ্কিত থাকিত। কথিত আছে কাশীরাম দাস মহাশয় কথকের মুখে ব্যাস সংহিতায় মূল সংস্কৃত মহাভারতের কথকতা শুনিয়া উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তিনি

পরে ঐ সমস্ত কথা-কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ **'কাশীদাসী মহাভারত'** রচনা করেন।

আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের অধিকাংশই আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন না হইয়াও কেবল প্রাত্যহিক কথকতা শ্রবণে সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির উপাখ্যানসমূহ ও উপদেশাবলী আগাগোড়া হুবহু আয়ত্ত করিয়া লইতেন।

যখন গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না, মুদ্রযন্ত্র ছিল না, মুদ্রিত পুস্তক ছিল না, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, হস্তলিখিত পুঁথির প্রাচুর্য ছিল না তখন আমাদের দেশের প্রাচীন পুণ্যশ্লোক কথককুলই কথকতার মাধ্যমে জাতীয় নিয়ম-নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমাজে মুখে মুখে প্রচার করিতেন। প্রত্যুতঃ, সে যুগে বিশাল জনতাকে শিক্ষা-দীক্ষা দানের পবিত্র ব্রত এই কথকগণই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমোদজনক বিষয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষা লাভ অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে। এই জন্য চিরকালই আমাদের দেশে ধর্ম-কর্ম, পূজা-পার্বন ও আনন্দ-উৎসবের সূত্রে কথকতা, যাত্রা, কবি গান, পাঁচালী গান, রামায়ণ গান, চণ্ডী গান, বাউলের গান, নামকীর্তন, তর্জা, রায়বেঁশে, সারি, জারি প্রভৃতির মাধ্যমে কেমন আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-আহ্লাদের ভিতর দিয়া সমাজে জনশিক্ষা প্রচারের বিপুল আয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের লোকশিক্ষা বিস্তারের এই সমস্ত জাতীয় প্রণালী ক্রমশঃ আয়ত্তের বাহিরে গিয়া বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীগুলিকে শিক্ষা-দীক্ষায় স্বাস্থ্য-সম্পদে উন্নত করার মধ্যেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ ও প্রগতি নিহিত রহিয়াছে। সিনেমার প্রচলনে গ্রাম হইতে আমোদ প্রমোদের ঐ সমস্ত জিনিষ উঠিয়া যাওয়াতে গ্রামগুলি ক্রমশঃ আনন্দশূন্য, শ্রীহীন ও নির্জীব হইয়া পড়িতেছে। জনশিক্ষার বিস্তারকল্পে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই কর্তব্য হইতেছে দেশে স্কুল কলেজ প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলার জনশিক্ষা প্রচারের ঐ সমস্ত আনন্দপ্রদ প্রণালীকে পুনরুজ্জীবীত করা। এই উদ্দেশ্যে পল্লীগ্রামে লোকচক্ষুর অন্তরালে সামান্য পর্ণকুটীরে কোথায় ভাল কথক, যাত্রাওয়ালা, কবি, বাউল, কীর্তনীয়া, পুরাণবিদ্ পণ্ডিত প্রভৃতি নীরব জীবন যাপন করিতেছেন তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং গ্রামসমূহ হইতে প্রাচীন পুঁথি, ছড়া, গীত প্রভৃতি সঙ্কলনের জন্য অভিযান আরম্ভ করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

॥ ট্রাস্ট ফাণ্ড ॥

হুগলীতে যে সকল দাতা জনসাধারণের জন্য ট্রাস্ট ফাণ্ড করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নাম :

সনৎকুমার স্টাফ নার্সেস্ ফাণ্ড ॥ হুগলী ইমামবাড়া হাসপাতালের নার্সদের জন্য ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫ শত ৬৭ টাকা দানে এই ফাণ্ড গঠিত হয়। ইহার সুদ হইতে বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার টাকা পাওয়া যায়। এই ফাণ্ডের টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই ফাণ্ডের পরিচালক।

রাখালচন্দ্র পাল চতুঃষ্পাঠী ট্রাষ্ট ফান্ড ॥ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারকল্পে চতুষ্পাঠী পরিচালনার জন্য রাখালচন্দ্র পালের পঁচিশ হাজার টাকা দানে এই ট্রাষ্ট ফান্ড গঠিত হয়। হুগলীর কালেক্টর ইহার সভাপতি এবং একটি শক্তিশালী কমিটি কর্তৃক ইহা পরিচালিত হয়। বর্তমানে এই ফান্ডে ৩১ হাজার ৩ শত টাকা জমা আছে। প্রতি বৎসর ৯৩৬৷৷ সুদ এই ফান্ড হইতে পাওয়া যায়। ২রা আগষ্ট ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই ট্রাষ্ট ফান্ড ১৫৯০ নম্বর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে স্থাপিত হয়। ইহার অর্থ পশ্চিমবঙ্গ চ্যারিটেবল এনডাউমেন্টের কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত আছে।

রামনগর অতুল বিদ্যালয় চ্যারিটেবল এনডাউমেণ্ট ফান্ড ॥ রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের রক্ষণকল্পে চুয়ান্ন হাজার টাকা দিয়া এই ফান্ড গঠিত হয়। ইহার বাৎসরিক সুদ এক হাজার ছয়শত ষোল টাকা পাওয়া যায়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে এই ফান্ড ১০১৪ নম্বর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গঠিত হয়। হুগলীর কালেক্টর ইহার সভাপতি ও একটি কমিটি কর্তৃক ইহা পরিচালিত হয়। এই ফান্ডের অর্থ পশ্চিমবঙ্গ চ্যারিটেবল এনডাউমেণ্টের কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা আছে।

বিনোদবিহারী ট্রাষ্ট ফান্ড ॥ বৈচী গ্রামের বিনোদ বিহারী দাঁ-র স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি দাঁ কর্তৃক এই ট্রাষ্ট ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে গঠিত হইয়াছে। এই ফান্ডে মোট দানের পরিমাণ ৬৭ হাজার টাকা। বৈচী গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য "বিনোদ চতুঃষ্পাঠী" স্থাপনার্থে ৫১ হাজার টাকা, রথযাত্রার বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ৬ হাজার টাকা এবং বৈচী বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১০ হাজার টাকা প্রদত্ত হয়। বিনোদ চতুঃষ্পাঠীর বাৎসরিক সুদ ১৫২৬৶৹ এবং অন্য দুইটির সুদ ১৭৯৷৹ ও ৩১৭।৹ পাওয়া যায়। এই ফান্ডের স্থায়ী তহবিল কলিকাতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল ১৭৫৪ নম্বর সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এই ফান্ড অনুমোদিত হইয়াছে।

গঙ্গানারায়ণ গুপ্তের ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ ফান্ড ॥ কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে পাঠরত বৈদ্যবাটীর কোন কৃতি ছাত্রের আংশিক বেতন দিয়া উক্ত ছাত্রের শিক্ষায় সহায়তা করিবার জন্য ছয়শত টাকা দিয়া এই ফান্ড গঠিত হয়। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই ফান্ডের পরিচালক। এই ফান্ডের টাকা মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে বৈদ্যবাটির কোন ছাত্র পাওয়া না যাওয়ায় বর্তমানে বাড়িয়া ৩ হাজার ২ শত টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই টাকা শতকরা ৩৷৷৹ সুদের সরকারী কাগজে আবদ্ধ আছে।

নবকৃষ্ণ স্কলারশিপ ট্রাষ্ট ॥ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রকে মাসিক দুই টাকা বৃত্তি দিবার জন্য ছয়শত টাকা এককালীন দানে এই স্কলারশিপ ট্রাষ্ট ফান্ড গঠিত হয়। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার পরিচালক। এই টাকায় কোম্পানীর কাগজ কেনা আছে। ইহা হইতে বাৎসরিক সুদ ২৪ টাকা পাওয়া যায়। কোম্পানীর কাগজের নম্বর ০৯৩৩৬৭।

মাণিকলাল দত্ত চক্ষু আতুরশালা ॥ শ্রীরামপুরের মাণিকলাল দত্ত ওয়ালশ হাসপাতালের সহিত যুক্ত চক্ষু আতুরশালার রক্ষনার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন।

কোন্নগর রিপন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফাণ্ড ॥ কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের যে ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে একটি রৌপ্যপদক দিবার জন্য এই ফাণ্ড ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। এই ফাণ্ডে দাতা দুইশত টাকা দান করেন। ইহা বাৎসরিক চার টাকা সুদের সরকারী কাগজে পশ্চিমবঙ্গের একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের নিকট গচ্ছিত আছে। হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইহার পরিচালক।

সোমড়া দুর্গাচরণ উচ্চ বিদ্যালয় ফাণ্ড ॥ সোমড়া দুর্গাচরণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দশ হাজার টাকা দিয়া এই ফাণ্ড গঠিত হয়। ইহা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই স্থায়ী ভাণ্ডারের অর্থ শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে গচ্ছিত আছে। ইহার বাৎসরিক সুদ পাওয়া যায় ৩৪২৵০ আনা।

স্বর্গীয়া হরসুন্দরী দাসী প্রাইজ ফাণ্ড ॥ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার স্বর্গীয়া হরসুন্দরী দাসীর স্মৃতি রক্ষার্থে একশত টাকা দিয়া এই প্রাইজ ফাণ্ড গঠিত হয়। এই টাকায় শতকরা চার টাকা সুদের একখানি ডিবেঞ্চার কেনা আছে। এই ফাণ্ড হইতে বাৎসরিক চার টাকা সুদ প্রতি বৎসর উত্তরপাড়া হিতকারী সভার নির্দেশে উক্ত সভার কর্তৃপক্ষ যাঁহাকে পুরস্কার দেওয়ার কথা বলিয়া দিবেন, তাহাকে উহা দেওয়া হইবে। ডিবেঞ্চার কলিকাতার ডেপুটি কণ্ট্রোলার অফ কারেন্সীর নিকট গচ্ছিত আছে।

উত্তরপাড়া স্কুল স্কলারশিপ ফাণ্ড ॥ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১১ হাজার ৮ শত টাকা দিয়া উত্তরপাড়া স্কুলের কৃতি ছাত্রদের স্কলারশিপ দিবার জন্য এই ফাণ্ড গঠিত হয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক উহা বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়ায় উক্ত টাকা সুদে বাড়িয়া ৫৪৮০০ টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই ফাণ্ডের টাকাও হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে আছে।

রিভার টমসন প্রাইজ ফাণ্ড ॥ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রিভার টমসন সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশে ১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা দিয়া এই ফাণ্ড গঠিত হয়। উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র যিনি উক্ত স্কুল হইতে প্রথম হইবেন, তিনি পঞ্চাশ টাকা মূল্যের পুরস্কার পাইবেন। হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই ফাণ্ডের পরিচালক।

মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি ফাণ্ড ॥ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র মুসলমান বালকদের সাহায্যের জন্য চার হাজার টাকা দিয়া এই তহবিল খোলা হয়। বর্তমানে এই ভাণ্ডারে ছয় হাজার টাকা আছে। সোসাইটির সম্পাদকের নির্দেশে ইহার বাৎসরিক সুদ হুগলী জেলার দরিদ্র মুসলমান ছাত্রকে দেওয়া হয়।

হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী ফাণ্ড ॥ হুগলী জেলার যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগার এবং পাঠাগারের উন্নতিকল্পে বাৎসরিক ১২২ টাকা সাহায্য দিবার জন্য এই ফাণ্ড দুই হাজার টাকা দিয়া গঠিত হয়। কোন সময় কাহার দ্বারা এই ফাণ্ডটি হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। হুগলীর কালেক্টার এই ফাণ্ডের কোষাধ্যক্ষ। বর্তমানে এই তহবিলের টাকা বাড়িয়া সাড়ে তিন হাজার টাকা হইয়াছে।

তারাচরণ চ্যাটার্জি ফান্ড ॥ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় তারাচরণ চট্টোপাধ্যায় ছয়শত টাকা দিয়া এই ফান্ড গঠন করেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের বেতন উহার সুদ হইতে দেওয়া হয়। ইহা শতকরা ৩৷৷৹ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে গচ্ছিত আছে। বাৎসরিক সুদের পরিমাণ একুশ টাকা। হুগলীর কালেক্টার এই ফান্ডের পরিচালক।

রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মেমোরিয়াল ফান্ড ॥ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের স্মৃতি রক্ষার্থে সাত শত টাকা দিয়া এই ফান্ড গঠিত হয়। ১১ই মার্চ ১৯০২ হইতে ৩১শে মার্চ ১৯০৪ পর্যন্ত রাজা গোপেন্দ্র হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে এই ফান্ড গঠিত হয়। হুগলী জেলার যে কোন স্কুল হইতে ইংরাজীতে যে ছাত্র সর্বোচ্চ নম্বর পাইবে তাহাকে "রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব স্বর্ণ পদক" দেওয়া হইবে। বাৎসরিক ২৭৷৷৹ সুদ হইতে প্রতি বৎসর পদক দেওয়া হয়। হুগলীর কালেক্টার এই ফান্ডের পরিচালক।

হুগলী-বালি স্নানের ঘাট ও মন্দির সংরক্ষণ ফান্ড ॥ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহরের বালি স্নানের ঘাট ও তথায় মন্দির সংস্কারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়া এই ফান্ড হয়। দাতার নাম অজ্ঞাত। এই ফান্ডের টাকা সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজে আবদ্ধ আছে। হুগলীর কালেক্টার এই ভান্ডারের পরিচালক। বাৎসরিক ২১২৸৹ সুদ এই ফান্ড হইতে পাওয়া যায়।

গুপ্তিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন ফান্ড ॥ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার গুপ্তিপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বজায় রাখিবার জন্য সাড়ে ছয় হাজার টাকা দান করেন। এই ফান্ড হইতে বাৎসরিক ২২৬৸৹ সুদ পাওয়া যায়।

ডাঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ট্রাস্ট ফান্ড ॥ ডাঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দুই হাজার এক শত টাকার ভারত সরকারের ১৯৩১ অব্দের শতকরা ৬ টাকা সুদের বন্ড দিয়া এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। এই তহবিলের বাৎসরিক সুদ ১২৬ টাকা হইতে গুপ্তিপাড়া স্কুলের নবম ও দশম দুইটি শ্রেণীর দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের বেতন তিন টাকা হিসাবে দেওয়া হয় এবং বাকি ৫৪ টাকা বিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলে জমা হয়।

প্রসন্নকুমার মিত্রের গ্রান্ট ফান্ড ॥ আঁটপুরের প্রসন্নকুমার মিত্র ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়া এই ফান্ড গঠন করেন। আঁটপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একটি কৃতি ছাত্রের বেতন এই তহবিলের সুদ হইতে দেওয়া হয় এবং বাকি টাকা বিদ্যালয় সংরক্ষণে ব্যয় করা হয়। বর্ধমান বিভাগের স্কুল বিভাগের ইন্সপেক্টর এই ফান্ডের পরিচালক।

কোনা ইউনিয়ন ফান্ড ॥ হুগলী কালেক্টরী অফিস হইতে এই তহবিলের কোন বিশদ বিবরণ জানা যায় না। চারশত টাকা দিয়া এই ফান্ড গঠিত হয়। মধ্যে মধ্যে বাৎসরিক সুদ দিবার জন্য আদেশপত্র হুগলী জেলা অফিসে আসে এবং ইহার সুদ মগরা ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতির নিকট পাঠান হয়। উহার ব্যয় কি ভাবে হয় তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

এলোকেশী ট্রাস্ট ফান্ড ॥ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চোদ্দ শত টাকা দিয়া এই ফান্ড গঠিত হয়। ইহার বাৎসরিক ৪৩৷৷• সুদ বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রকে স্কলারশিপ হিসাবে দেওয়া হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের অতিরিক্ত 'কলিকাতা গেজেটে' আরও পাঁচটি ট্রাস্ট ফান্ডের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু উহাদের বিশদ বিবরণ জানা যায় নাই। গোবিন্দসুন্দরী ডিস্পেন্সারী ফান্ড, হুগলী মহেশতলা অনাথ ভান্ডার ফান্ড, গিরীশ ইনষ্টিটিউশন ফান্ড, রামবল্লভ নন্দন চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী ফান্ড, এবং সত্যচরণ ডেভালপমেন্ট ফান্ড।

॥ হুগলী জেলার উচ্চ বিদ্যালয় ॥

আক্না ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, আক্না; আকুনি বি, জি, বিহারীলাল ইনষ্টিটিউশন, আকুনি; আনন্দনগর আনন্দচরণ রায় উচ্চ বিদ্যালয় আনন্দনগর, সিঙ্গুর; আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয় আঁটপুর; আনুর উচ্চ বিদ্যালয় আনুর, গোঘাট; আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয় আরামবাগ; বাবনান উচ্চ বিদ্যালয় বাবনান, পোলবা; বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় বদনগঞ্জ গোঘাট; বাগাটি রামগোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয় বাগাটি, মগরা; বাহিরখন্ড গিরিশ ইনষ্টিটিউশন বাহিরখন্ড কৈ'কালা; বৈদ্যবাটি বনমালী মুখার্জী ইনষ্টিটিশন বৈদ্যবাটি; বাকুলিয়া রাজেন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউশন বাকুলিয়া গ্রাম; বলাগড় উচ্চ বিদ্যালয় বলাগড়; বালি উচ্চ বিদ্যালয় বালি দেওয়ানগঞ্জ; বনমালী মুখার্জী ইনষ্টিটিউশন, হুগলী; ব্যান্ডেল সেন্ট্ জনস্ উচ্চ বিদ্যালয় হুগলী; বন্দীপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্দীপুর; বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় বাঁশবেড়িয়া; বড়ডোঙ্গল রামনাথ ইনষ্টিটিউশন বড়ডোঙ্গল; বাতানল ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় বাতানল; বেলমুড়ি ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন বেলমুড়ি; বেঙ্গাই উচ্চ বিদ্যালয় বেঙ্গাই; বেড়াবেড়ী সূর্যনারায়ণ মেমোরিয়েল উচ্চ বিদ্যালয় বেড়াবেড়ী; ভদ্রকালী উচ্চ বিদ্যালয় ভদ্রকালী; ভান্ডারহাটি বি, এম্, ইনষ্টিটিউশন ভান্ডারহাটি; ভাঙ্গামোড়া নূতনগ্রাম কেদারনাথ চীনা মেমোরিয়েল ইনষ্টিটিউশন ভাঙ্গামোড়া; ভাস্তাড়া যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ভাস্তাড়া; বৈঁচি বি, এল, মুখার্জীস্ ফ্রি ইনষ্টিটিউশন বৈঁচিগ্রাম; বড়া মধুসূদন উচ্চ বিদ্যালয় বড়া; চাঁপাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় চাঁপাডাঙ্গা; চাতরা নন্দলাল ইনষ্টিটিউশন শ্রীরামপুর; চুঁচুড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় চুঁচুড়া; চুঁচুড়া ডাফ্ হাই স্কুল চুঁচুড়া; চুঁচুড়া শিবচন্দ্র সোম ট্রেনিং একাডেমী চুঁচুড়া; চক্ তাজপুর হাজি ইলাহি বক্স উচ্চ বিদ্যালয় ইলাহিপুর, চন্ডীতলা; দমদমা নরেন্দ্র মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় পোঃ আয়েমানবাবপুর; দশঘরা উচ্চ বিদ্যালয় দশঘরা; দেউলপাড়া ভূধরনাথ বিদ্যানিকেতন দেউলপাড়া, পুরসুড়া; ধনিয়াখালি মহামায়া বিদ্যামন্দির ধনিয়াখালি; ডিহি বাগনান কে. বি, রায় উচ্চ বিদ্যালয় ডিহি বাগনান; ডুমুরদহ ধ্রুবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় ডুমুরদহ; দ্বারবাসিনি কুমার রাজেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় দ্বারবাসিনি; গরলগাছা উচ্চ বিদ্যালয় গরলগাছা; গড়বাটি উচ্চ বিদ্যালয় বড় শিবতলা; ঘুটিয়াবাজার মল্লিক-বাটি পাঠশালা হুগলী; গোঘাট উচ্চ বিদ্যালয় গোঘাট; গোঁসাই-মালিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় গোঁসাই-মালিপাড়া; গুপ্তিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

গুপ্তিপাড়া; গুড়প রমণীকান্ত ইনষ্টিটিউশন গুড়প; হরাল দাসপুর তিনকড়ি শিবানী-প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় হরাল দাসপুর; হরিপাল গুরুদয়াল ইনষ্টিটিউশন, হরিপাল; হাতিনি পূর্ণচন্দ্র বিদ্যামন্দির হাতিনি; হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হুগলী; হুগলী কালিজিয়েট্ স্কুল চুঁচুড়া, ইলছোবা-মণ্ডলাই উচ্চ বিদ্যালয় ইলছোবা-মণ্ডলাই; ইটাচোনা শ্রীনারায়ণ ইনষ্টিটিউশন ইটাচোনা; জামগ্রাম জনার্দন ইনষ্টিটিউশন জামগ্রাম; জনাই ট্রেনিং স্কুল জনাই; জঙ্গলপাড়া বগলাচরণ কুণ্ডু মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় জঙ্গলপাড়া; জঙ্গলপাড়া-কৃষ্ণরামপুর দেশপ্রাণ উচ্চ বিদ্যালয় জঙ্গলপাড়া বাজার; জঙ্গীপাড়া দ্বারকানাথ উচ্চ বিদ্যালয় জাঙ্গীপাড়া; কেশবপুর মহেন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউশন তারকেশ্বর; খানাকুল-কৃষ্ণনগর জ্ঞানদা ইনষ্টিটিউশন তারকেশ্বর; তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় তারকেশ্বর; তেলেনীপাড়া-ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় ভদ্রেশ্বর; ঠাকুরাণীচক ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ঠাকুরাণীচক, খানাকুল; তিরোল উচ্চ বিদ্যালয় তিরোল, আরামবাগ; উত্তরপাড়া গভর্ণমেন্ট উচ্চ বিদ্যালয় উত্তরপাড়া; উত্তরপাড়া হাই স্কুল উত্তরপাড়া; বঙ্গ বিদ্যালয়, চন্দননগর; দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয়, চন্দননগর; কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর; প্রবর্তক বিদ্যার্থী ভবন, চন্দননগর; চন্দ্রহাটী দিলিপ-কুমার হাই স্কুল, ত্রিবেণী; গৌরহাটি উচ্চ বিদ্যালয়, আরামবাগ; রাজেন্দ্র স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, কোন্নগর; বাজুয়া উচ্চ বিদ্যালয়, গোঘাট; চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, হরিণখোলা; দৌলতপুর দলুইগাছা ভারতী বিদ্যালয়, পারগোপালনগর, সিঙ্গুর; দিগড়া মল্লিকহাটি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ, ভদ্রেশ্বর; দারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনষ্টিটিউশন, দারহাট্টা, হরিপাল; গুটি উদয়চাঁদ বিদ্যামন্দির, জাঙ্গিপাড়া; গৌরহরি হরিজন বিদ্যামন্দির, হুগলী; কালীপুর স্বামীজী হাই স্কুল, আরামবাগ; কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, উত্তরপাড়া; মধুবাটী সুরবালা বিদ্যামন্দির, বলরামবাটী; উত্তরপাড়া ইউনিয়ন হাই স্কুল, উত্তরপাড়া; গুড়বাড়ি মুকুন্দ-বল্লভ অম্বিকাচরণ হাই স্কুল, চোপা; কানাইপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কোন্নগর; রিষড়া বিদ্যাপীঠ, রিষড়া; শ্যামাপ্রসাদ জাতীয় বিদ্যালয়, সাহাগঞ্জ; দুর্গাচরণ রক্ষিত বঙ্গ বিদ্যালয়, চন্দন-নগর; বারুইপাড়া রাখাল বিদ্যাপীঠ, বারুইপাড়া, সিঙ্গুর; ভোঁপুর যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাপীঠ, বৈঁচী; নিবারণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যামন্দির, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর; চাঁপদানী সার্বজনীক বিদ্যাপীঠ, চাঁপদানী; ডাঃ শীতলপ্রসাদ ঘোষ আদর্শ শিক্ষালয়, চন্দননগর; হুগলী মাধ্যমিক শিক্ষায়তন, আস্তারবাগান, চুঁচুড়া; জেজুর হাই স্কুল জেজুর, হরিপাল; জিরাট কলনী হাই স্কুল জিরাট, বলাগড়; দেশবন্ধু বাণীমন্দির নালিকুল, হরিপাল; রামনগর অতুল বিদ্যালয়; কিঙ্করবাটি এ্যাগ্রিকালচার্যাল ইনষ্টিটিউশন নালিকুল; কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় কোন্নগর; মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয় রিষড়া; মরোখানা উচ্চ বিদ্যালয় মারোখানা, খানাকুল; মশাট উচ্চ বিদ্যালয় মশাট, চণ্ডীতলা; ময়াল কে, সি রায় ইনষ্টিটিউশন ময়াল, বন্দীপুর; মলয়পুর উচ্চ বিদ্যালয় মলয়পুর; মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয় মায়াপুর; নন্দনপুর রূপচাঁদ একাডেমি নন্দনপুর; নতিবপুর ভূদেব বিদ্যালয় নতিবপুর; পাণ্ডুয়া শশীভূষণ সাহা উচ্চ বিদ্যালয় পাণ্ডুয়া; পাউনান রাধারাণী উচ্চ বিদ্যালয় পাউনান; পুঁইনান উচ্চ বিদ্যালয় পুঁইনান; রাজবলহাট উচ্চ বিদ্যালয় রাজবলহাট; রামনাথপুর কুমীরমোড়া

আশুতোষ ননীলাল উচ্চ বিদ্যালয় কুমীরমোড়া; রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয় রিষড়া; সেকেন্দারপুর রায় কে, পি, পাল বাহাদুরস অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় হেলান, খানাকুল; শ্রীরামপুর টাউন একাডেমি শ্রীরামপুর; শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন শ্রীরামপুর; শিয়াখালা বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয় শিয়াখালা; শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয় পারশ্যামপুর, পুরসুড়া; সিঙ্গুর মহামায়া হাই স্কুল সিঙ্গুর; সোমড়া দুর্গাচরণ উচ্চ বিদ্যালয় সোমড়া; তালপুর পাঠশালা তালপুর, বিদ্যালয় রামনগর, খানাকুল।

॥ হুগলী জেলার বালিকা বিদ্যালয় ॥

আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল আরামবাগ; বৈদ্যবাটি বনমালী মুখার্জী ইনষ্টিটিউশন বৈদ্যবাটি; চাতরা নন্দলাল ইনষ্টিটিউশন শ্রীরামপুর; চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির চুঁচুড়া; ঘুটিয়াবাজার বিনোদিনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঘুটিয়াবাজার; কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় কোন্নগর; শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শ্রীরামপুর; শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় শ্রীরামপুর; উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় উত্তরপাড়া; কাশীশ্বরী পাঠশালা, চন্দননগর; কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দির, চন্দননগর; প্রবর্তক নারী মন্দির বালিকা বিদ্যালয়, চন্দননগর; সত্যব্রত বালিকা বিদ্যালয় আওদা, বলাগড়; চুঁচুড়া বালিকা শিক্ষা মন্দির, চুঁচুড়া; গুপ্তিপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, গুপ্তিপাড়া; হুগলী গালর্স হাই স্কুল, হুগলী; কোন্নগর নবগ্রাম হরলাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, উত্তরপাড়া; পরমেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, মাহেশ; তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর; রিষড়া বালিকা বিদ্যালয়, রিষড়া; চন্দননগর লালবাগান বালিকা বিদ্যালয়, চন্দননগর; উষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়, চন্দননগর; বাঁশবেড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়, বাঁশবেড়িয়া; দেশপ্রিয় বালিকা বিদ্যালয়, ভদ্রকালী; মিরেরহাট বালিকা বিদ্যালয়, সাহাগঞ্জ, ডানলপ।

॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হুগলী জেলার যে সকল ব্যক্তি অদ্যাবধি ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ৩১ মার্চ ১৯১৪ হইতে ৩০ মার্চ ১৯১৮, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ৪ এপ্রিল ১৯২৩ হইতে ৭ আগষ্ট ১৯২৪, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৩১ মার্চ ১৯০৬ হইতে ৩০ মার্চ ১৯১৪ এবং ৪ এপ্রিল ১৯২১ হইতে ৩ এপ্রিল ১৯২৩ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৮ আগষ্ট ১৯৩৪ হইতে ৭ আগষ্ট ১৯৩৮ চারুচন্দ্র বিশ্বাস ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ হইতে ১০ মে ১৯৫০ এবং স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ১২ এপ্রিল ১৯৫৪ হইতে ১৪ মে ১৯৫৫।

মেকলের পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্যার এডওয়ার্ড রায়ন শিক্ষা বিভাগের "জেনারেল কমিটি অফ পাব্লিক ইন্সট্রাকসনের" সভাপতি হন। সেই সময় হুগলীর কলেজ অফ মহম্মদ মহসীনে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের লালনক্ষেত্র

ছিল। এই সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্য :

Of the colleges only the Hooghly College was for some years one of the nurseries of Bengali literature.

নিম্নে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও হুগলী জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র সংখ্যা উল্লিখিত হইল :

কলিকাতা	**ছাত্র সংখ্যা**
হিন্দু কলেজ	৫২০
মেডিক্যাল কলেজ	৮৭
মাদ্রাসা	২৫৩
সংস্কৃত কলেজ	১১৮
হুগলী	
কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন	৯৬৪
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	৩৬৮
হুগলী ইনফ্যান্ট স্কুল	৫৪
সীতাপুর ব্রাঞ্চ স্কুল	১৪১
ত্রিবেণী স্কুল	৬৮
অমরপুর স্কুল	১০০

বিশ্ববিদ্যালয়ে দান ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার তারকনাথ পালিত, বিহারীলাল মিত্র, শ্রীগোপাল মল্লিক, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের দানে যাদবপুরে বেঙ্গল কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠিত হয়। এই বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**। বিজ্ঞান চর্চার জন্য ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের দানও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

॥ সংকেত সূত্র ॥

১ হরপ্রসাদ রচনাবলী (প্রথম সম্ভার)
২ Hooghly District Gazetteers—L. S. S. O'Malley.
৩ বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন
৪ The story of Serampore and its College.
৫ Report of the Calcutta University Commission.
৬ Calcutta Gazette—10th. October 1805.
৭ History of Hooghly College—K. Zachariah.
৮ Toynbee's Administration of Hooghly District.
৯ Good old Days of Honourable John Company, Vol. I.
১০ Selections from the Records of thc Bengal Government
১১ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য
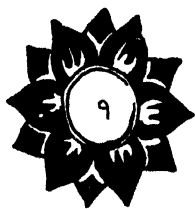
প্রসংগ

মানব সমাজকে বিমোহিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ কবিতা—সেইজন্য জগতের সকল সাহিত্যের প্রথম উৎপত্তি কাব্যে হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর অতীতকাল হইতে কাব্যই ছিল আমাদের এই দেশে রচনার একমাত্র বাহন; ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, স্থাপত্য এমন কি চিকিৎসা ও অংকশাস্ত্রও তৎকালে কাব্যে রচিত হইত। আর্যজাতির প্রথম ভাষা বেদে, তারপর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির ভাষা সংস্কৃত, সংস্কৃতের পর বৌদ্ধদিগের পালি ও গাথা প্রভৃতি প্রাকৃত। প্রাকৃত হইতেই আধুনিক বংগভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া পন্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বংগভাষার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিলে, সেই দিনের অসম্পূর্ণ ও অগঠিত সদ্য উদ্গত অংকুর কি ভাবে পূর্ণাংগ ও সুগঠিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। যাঁহারা এই ভাষাকে ঋদ্ধিমতী করিয়া অপরূপ রূপমাধুর্যে বিকশিত করিয়াছেন—তাঁহারা আমাদের বরণীয় স্মরণীয় ও প্রণম্য। হুগলী জেলার বিশেষ সৌভাগ্য যে, এই স্থানেই আধুনিক বংগ-সাহিত্যের সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানে বংগভাষা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার মধ্যে পঞ্চম, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। বংগভাষার ন্যায় ঐশ্বর্য, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, অসাম্প্রদায়িকতা সহজবোধ্যতা এবং সংখ্যাধিক্য ভারতের আর কোন ভাষার নাই।

ভাষাবিদ্‌গণের অভিমত যে, বংগভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। 'বংগ' শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ঐতরেয় আরণ্যকে। জাতিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পন্ডিত-গণ বলেন যে, যাযাবর 'বংগ' নামক জাতি হইতে দেশবাচক বংগ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত যাযাবর বংগজাতি পূর্বদিকে হাটিতে হাটিতে পূর্ব-বংগে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন এবং তাহাদের নামানুসারেই এই দেশের নাম বংগদেশ হইয়াছিল। বংগদেশ অনার্যদিগের

দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া, এই দেশে আগমন ও বসতি আর্যদিগের নিষিদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশে আর্যদিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় বরেন্দ্র ভূমিতে। ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপন মৌর্যযুগে আরম্ভ হয় এবং যাহারা উপনিবিষ্ঠ হন তাহারা সকলেই জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। জৈনধর্ম সর্বপ্রথম প্রবেশলাভ করিলেও এই ধর্ম এ দেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, কারণ বঙ্গদেশে তখন অসভ্য জাতির প্রাধান্য ছিল। জৈন ধর্মের পর বৌদ্ধ-ধর্ম এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ধীরে ধীরে এই স্থানে প্রাধান্য লাভ করিল।

বঙ্গদেশের আসল বাসিন্দারা দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শাখার অন্তর্গত ভাষায় কথাবার্তা বলিত। অঙ্গ ও মগধ বঙ্গদেশের নিকটতম প্রদেশ সুতরাং ঐ দেশের উপনিবেশকারিগণ ক্রমশঃ বঙ্গদেশে আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাদের দ্বারাই আর্যভাষা বঙ্গদেশে আনীত হয়। গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আর্যভাষী হইয়া গিয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণের সময় গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে এক ভাষা বলিতে শুনিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে অনার্য ভাষাগুলি যে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।

উপনিষদের ভাষা ভাঙ্গিয়া যে ভাষা সর্বপ্রথম উৎপত্তি লাভ করে তাহা পালি ভাষা। এই পালি ভাষা হইতে চারি প্রকার প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়—যথা মহারাষ্ট্রী, শৌরসেণী, পৈশাচী ও মাগধী। বঙ্গদেশে মগধ হইতে অধিকাংশ উপনিবেশকারী আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা যে প্রাকৃত ভাষায় কথা-বার্তা বলিত তাহাকে মাগধী-প্রাকৃত বা পূর্ব-প্রাকৃত বলা হইত। উক্ত মাগধী প্রাকৃতের ধ্বনি অবলম্বনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয়।

আদি বাংলা সাহিত্য

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত **"চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের" ভাষা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।** নেপালে এই পুঁথিখানি আবিষ্কার করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। ইহাতে বৌদ্ধ সিদ্ধদেব দোহা আছে। অনেকে ইহা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ বলিয়া স্বীকার করেন; আবার অনেকে বলিয়াছেন—ইহা বাংলা নহে, পাশ্চাত্য অপভ্রংশ। ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে আদিম বাংলা বলেন। আনুমানিক দশম শতকে এই চর্যাগুলি রচিত। একটি পদ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
আম্হে ন জাণহ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জাইসে জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥
জা এথু জান মরণে বিসঙ্কা।

সো করউ রস রসানেরে কংখা।
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি
জামে কাম কিঁ কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥"

[অর্থ : লোক আপন মনে ভব ও নির্বাণ রচনা করিয়া মিথ্যা আপনাকে বন্ধ করে। অচিন্ত্য যোগী আমরা জানি না, জন্ম মৃত্যু ও ভব কিরূপে হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনই; জীবিতে ও মৃতে কোন বিশেষ নাই। এ ভবে যাহার জন্ম-মরণের আশঙ্কা, সে রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক। যাহারা স্বর্গ-মর্ত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা অজর অমর কিছুই হইতে পারে না। জন্ম হইতে কর্ম কিম্বা কর্ম হইতে জন্ম, সরহ বলে, সে ধর্ম (যোগীদের পক্ষে) অচিন্তনীয়।]

বঙ্গভাষা নবকলেবরে রূপান্তরিত হইবার পর দশম শতাব্দীতে কানু ভট্ট **বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের নব প্রভাতের উদ্বোধন করিয়াছিলেন**। তারপর একহাজার বৎসরের অধিককাল ধরিয়া শত-সহস্র শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক যে ভাবে এই ভাষাকে সজীব, স্নিগ্ধ ও ঋদ্ধিমতী করিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা না করিয়া কেবলমাত্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্গীয় এন্ডারসন সাহেব "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুইটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আছে—প্রথমটি ইংরাজী আর দ্বিতীয়টি বাঙ্গলা" বলিয়া বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন।

পঞ্চম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীনতম বাঙ্গলা ভাষার নমুনা কয়েকটি শিলালিপি ও প্রাচীন পুস্তকে ব্যবহৃত কয়েকটি স্থানের নাম ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহার পরেই বড়ু **চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন** ও রমাই পণ্ডিতের 'শূণ্য পুরাণ' বঙ্গভাষার নমুনা হিসাবে প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলি চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা হইতে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষে বঙ্গভাষা তাঁহার অসংখ্য প্রেমিক ভক্ত কর্তৃক নানা অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া বর্তমান কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ **শ্রীমদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী** সপ্তগ্রামের অধিপতি গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র; তিনিও বুদ্ধদেবের ন্যায় স্ত্রী, রাজ্য, পিতামাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার নিকট হইতেই শ্রবণ করিয়া ঝামটপুর নিবাসী **কৃষ্ণদাস কবিরাজ** বৈষ্ণবদিগের অমূল্য গ্রন্থ **'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'** রচনা করেন। নিম্নে সপ্তগ্রামের রাজপুত্র শ্রীমদ রঘুনাথ দাস রচিত একটি 'পদ' উদ্ধৃত হইল :

"আর এক কহি কথা সহোদর বন্ধু সখা দুই চারি জন মোর আছে।
কহি শুন তার কথা পাছে হেট কর মাথা ননী চুরি কর যার কাছে॥
যত সব গোপ নারী লইয়া দধির পসারি মথুরার দিকে যায় তারা।

পথ আগোরিয়া রও দধি দুগ্ধ কাড়ি খাও একি তোমার অনুচিত ধারা॥
নারীগণ স্নান করে বসন রাখিয়া তীরে চুরি করি রহ লুকাইয়া।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী কুলবধু কর দাসী কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া॥
খাওয়াব পরের খন্দ এখনি করিব নন্দ লইয়া যাব কংসের গোচরে।
দাস রঘুনাথ কয় শুনিতে লাগএ ভয় চমকিত হইল যদুবীরে॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্যক্তি পরিচয় সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট নয়। কবির নিজস্ব পরিচয় হইতে জানা যায় যে নৈহাটির নিকট ঝামটপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কবি বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রূপ সনাতন গোস্বামীর কৃপা ও রঘুনাথ দাসগোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন। কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কামটপুর গ্রাম বলিয়া 'আনন্দ রত্নাবলী'র লেখক মুকুন্দদেব গোস্বামীর উপর নির্ভর করিয়া ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু কবির রচনা হইতে তাঁহার জন্মভূমি ঝামটপুর ছিল নৈহাটির অন্তর্গত এবং শ্রীভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'য় লিখিয়াছেন "এই নৈহাটি হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত—বর্ধমানে নয়।"

বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল?

সংস্কৃত ভাষা হইতে কালক্রমে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে এবং এই প্রাকৃত ভাষা হইতে কালক্রমে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের কাহিনী'তে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছেন,—'প্রাকৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছিল আজ হইতে প্রায় হাজার বছর আগে। তাহারও দেড় হাজার বছর আগে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হইয়াছিল সংস্কৃত ভাষা হইতে' (পৃঃ ১)। তিনি আরও বলিতেছেন—'চর্যাগানের আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের ঊর্ধ্বতম সীমানা ১০০০ খৃষ্টাব্দে গিয়া পৌঁছিল' (ঐ, ৩ পৃঃ)। ডাঃ সেন মহাশয়ের মতে বাংলা ভাষা মোটামুটি হাজার বছরের প্রাচীন। সবিনয়ে বলিতে চাই, সেন মহাশয়ের এ অনুমান বিচারসহ হয় নাই। বাংলা ভাষা ইহা হইতেও যে বহু প্রাচীন সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শহীদুল্লাহ, ডাঃ সুকুমার সেন একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, নাথসিদ্ধা **মীন নাথের রচিত নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।**

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম্ম-কুরঙ্গ সমাধিক পাট।
কমল বিকশিল কহিহণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা॥"

মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় ঐ শ্লোকটি নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার বৌদ্ধ গান ও দোহার ভূমিকার টীকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—**"ইহা সত্যই মীন নাথের লেখা, খৃঃ ৮০০ বৎসরের লেখা, খাস বাংলা, এখনও বুঝিতে কষ্ট হয় না।......এই যে শৈবযোগী বা নাথ ইঁহারা ত ভারবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন** (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ)।" ডাঃ শহীদুল্লাহ বলিয়াছেন খৃঃ সপ্তম শতকের পূর্বে বাংলা রূপের উদ্ভব হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে উক্ত শ্লোকটি খৃঃ অষ্টম শতকের। অন্যান্য কৃতী গবেষকেরাও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং নির্বিচারে উক্ত মত মানিয়া নিয়াছেন। ইঁহারা বাংলা ভাষার আদিম লেখক নাথসিদ্ধা মীন নাথের সময় নির্ণয় করার তেমন কোন চেষ্টা না করিয়াই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মোটামুটি হাজার বছরের প্রাচীন বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ হয় নাই আমরা তাহাই প্রমাণ করার চেষ্টা করিব।

শ্রীগুণানন্দ ও শ্রীশিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত নেপালের ইতিহাসে আছে মীননাথ (যিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ নামেও খ্যাত ছিলেন) **কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গতে অর্থাৎ ৫৩৩ খৃঃ অব্দে নেপালেশ্বর কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া নেপালে গিয়াছিলেন।** নেপালের 'করণ্ড ব্যূহ' ধর্মগ্রন্থে মীননাথের জীবনী আলোচিত এবং উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে। পৃথিবী-বিখ্যাত ঐতিহাসিক হডসন সাহেব বলেন, নেপালের দ্বাদশ বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ করার জন্য নেপালেশ্বরের বিশেষ আহ্বানে **মীননাথ** (মৎস্যেন্দ্রনাথ) **আন্দাজ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নেপালের ললিত-পত্তন গমন করিয়াছিলেন** (R. A. S. J Series VII, Part I, Page 137) তাহা হইলে মীননাথকে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্য হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে বাংলা রূপের উদ্ভব খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বা তৎপূর্বেই হইয়াছে বলাই যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ হইবে। **এ বিচারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স দেড় হাজার বৎসর দাঁড়ায়। যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মোটামুটি হাজার বছরের পুরাতন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উক্তি যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ নহে**; উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

"......প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটি স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল সে সময় স্বতন্ত্র বঙ্গ-ভাষার প্রচলন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তখনকার বাংলা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই [**বিশ্বকোষ** (১৩১৪ বাং), অষ্টাদশ ভাগ, ১৯ পৃঃ]।"

এরূপ অনুমান করা যুক্তিহীন হইবে না যে, **বুদ্ধদেবের আমলে প্রাকৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছিল। এবং কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলা ভাষা যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল বর্তমান বাংলা সাহিত্য উহারই সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। এ বিচারে বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটি আড়াই হাজার বৎসর দাঁড়ায়।**

ইহার পর যে বই পাওয়া যায়, তাহা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—ইহার রচনাকাল আনুমানিক চতুর্দশ শতক। এইখানেই আমরা প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপ দেখিতে পাই। এই পুস্তকের একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাই স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সম্পাদনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশ করেন। পুঁথিখানি প্রাচীন, সেজন্য ভাষা বিকৃত হইয়া আধুনিক রূপ ধারণ করে নাই। রাধাকৃষ্ণের যে লৌকিক রূপ দেখা যায়, এই পদগুলিতে তাহাই পাওয়া যাইতেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় বিশেষ জানা যায় না, তবে তাঁহার যে বিশেষ কবিত্বশক্তি ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে (প্রত্নলিপিতত্ত্ব অনুসারে) ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ চতুর্দশত শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে রচিত। ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে (ভাষাতত্ত্ব অনুসারে) "১৪০০ বা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের এধারে কিছুতেই হতে পারে না।" এই পুস্তকের কিছুটা নমুনা দিলাম।

"আয়িলা দেবের সুমতি শুণী"
কংসের আগক নারদ মনী॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকে কানে॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ।"

বাংলা ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন কতকগুলি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। বন্দ্যঘটিয়া সর্বানন্দের অমরকোষের টীকাতেও কিছু কিছু বাংলা শব্দের নির্দশন পাওয়া যায়—এইটির রচনাকাল ১১৬০ খৃষ্টাব্দ; ইহা ভিন্ন ভাষার নিদর্শন আর কিছু পাওয়া যায় না।

ইহার পর ১৫০০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। বৈষ্ণব পদাবলী, কাশীরাম দাসের, মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় প্রভৃতি এই সময়ের রচনা। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, কালিকা বা চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের আদি গ্রন্থগুলি এই কালে রচিত।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল বন্যায় লৌকিক পুজাপদ্ধতির মহিমা সমন্বিত কাব্যগ্রন্থগুলি সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হইলেও, পরে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর গান, মনসার ভাসান প্রভৃতি পুস্তকগুলি সুসংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ সাহিত্যের এই যুগকে 'সংস্কার যুগ' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে সংস্কার যুগের তিন জন প্রধান ব্যক্তি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তারকেশ্বরের অনতিদূরে দামুন্যা গ্রামে খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সাত পুরুষ যাবৎ উক্তস্থানে বসবাস করিতে-ছিলেন, কিন্তু মামুদ সরিফ নামক এক ডিহিদারের অত্যাচারে তিনি প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাহার চন্ডী কাব্য রচনা শেষ হয়। মুকুন্দরাম বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহার 'চন্ডীকাব্যে' ভগবতীর পৃথিবীতে পূজা প্রচারার্থে কালকেতু ব্যাধের ও শ্রীমন্ত সওদাগরের দুইটি বৃহৎ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারত-বর্ষের নানা নদ নদী, গ্রাম, নগর, ও অরণ্য প্রভৃতির সুন্দর বর্ণনা এবং নানা লোকের বিভিন্ন প্রকারের স্বভাব, কবি এই কাব্যে সুললিত ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কাব্য হইতে তৎকালীন সমাজের ও প্রসিদ্ধ স্থানের বহু বিবরণ অবগত হওয়া যায় এবং ঐতিহাসিক-গণ তাঁহার এই কাব্যের সাহায্যে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে ততদিন মুকুন্দরামের নাম অমর হইয়া থাকিবে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীর ভক্ত ছিলেন এবং তিনি উক্ত চন্ডীর অংশ বিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট যাইলে, তিনি উহা মুখস্ত বলিতেন। তিনি মুকুন্দরামকে বিলাতের কবি চসার এবং ক্রেবের সহিত তুলনা করিতেন বলিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "লিটারেচার অফ বেংগল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন। এক কথায় মুকুন্দরাম ছিলেন অখন্ড জীবন রসের কবি।

কাশীরাম দাস ১০০০ সালে বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১০১১ সালে মহাভারতের বিরাট পর্বখানি শেষ করেন। পন্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩০৭ সালে 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' কাশীরাম দাসের বিরাট পর্বের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে "চন্দ্রবান পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়" অর্থাৎ ১৫২৬ শকে (১০১১ সালে) বিরাট পর্ব সমাপ্ত হয় বলিয়া জানা যায়। বিরাট পর্ব রচনা করিয়া ব্যাঘ্র কর্তৃক আহত হইয়া তিনি পরলোকগমন করেন। পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ও ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম এবং আত্মীয় ভৃগুরাম এই তিন জনে মিলিত হইয়া মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন।

তাঁহার মহাভারতে বিরাট পর্বের শেষে লিখিত আছেঃ

আদি, সভা, বন, বিরাট, রচিয়া, পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্বলোকে অতি কুতুহলী॥
পূর্বে তেঁই আরম্ভিয়া ছিল এই পুঁথি।
কাল বশে মৃত্যু তাঁর হৈল দৈবগতি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কাশীরামের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণকে জাতির মনের খাদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "মহানদী যেমন সকল দেশে নাই তেমনই মহাকাব্য পৃথিবীর অতি অল্প জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সে দেশের সৌভাগ্যের আর অন্ত নাই।"

কবির জন্মস্থান লইয়া বর্তমানে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু কবির জন্মস্থান হুগলী জেলার 'সিন্ধি' গ্রাম বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু কেহ কেহ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 'সিন্ধি' গ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় হুগলী জেলা বলিয়া কোন জেলা হয় নাই—১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা গঠিত হয় এবং বর্ধমান জেলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বর্ধমান জেলার উত্তর ভাগ বর্ধমান এবং দক্ষিণ ভাগ হুগলী বলিয়া তদবধি কথিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'চুল-চিরিয়া' তাহার জন্মস্থান কোন জেলার তাহা নির্ণয় করা বর্তমানে সম্ভব নয়। তবে তিনি যে দক্ষিণ রাঢ়ে (এই নামে তৎকালে হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ কথিত হইত) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর হুগলী জেলার ভুরসুট পরগণায় ১৬৩৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভুরসুট পরগণা সেই সময় বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার দত্তমুন্সী মহাশয়গণের আশ্রয়ে থাকিয়া পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন; পরে নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সভাপণ্ডিত হন। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যা-সুন্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতচন্দ্র রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"Bharat is a close immitator of Mukunda Ram. In character painting, however, Bharatchandra can not be compared with the great master whom he has imitated."

কবি ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাব্দে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে গতাসু হইলেও, তাঁহার কাব্যগ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বাঙ্গলা নাটক রচনার তিনি পথ-প্রদর্শক; চণ্ডী তাঁহার প্রথম নাটক। এই সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইল ঃ

প্রথম বাঙ্গলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি দেবানন্দপুরবাসী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। **"চণ্ডী"**ই তাহার প্রথম প্রচেষ্টার সুফল। কিন্তু ইহা একখানি বিমিশ্র নাটক। ইহাতে বাঙ্গলার ভাগ খুবই কম। ইহার চরিত্রগুলি চণ্ডী, মহিষাসুর ও প্রজাগণ। তাহারা কথা বলে বাঙ্গলা ভাষায় কিন্তু তাহা অতি দুর্বোধ্য। সংস্কৃত, ফারসী, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষারও অবতারণা আছে। ভারতচন্দ্র ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সূত্রধর বলে সংস্কৃত ভাষায়, নটী বলে বাঙ্গলা ও প্রাকৃতে। সূত্রধরের স্তব এইরূপঃ

"সা দুর্গা দশদিক্ষু
বঃ কলয়াতু শ্রেয়াংসি
নঃ শ্রয়সে—"

অতঃপর সূত্রধর "রাজ্ঞোহস্য প্রমিতামহো নরপতী রুদ্রোহভবাদ্রাঘব" প্রভৃতি কথায়

কৃষ্ণচন্দ্রের বংশপরিচয় ও ভারতচন্দ্রের প্রতি রাজানুগ্রহের পরিচয় দেন। নটী বলিতেছে বাঙ্গলা কথায়ঃ

"শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ
সভাসদ সারী চতুরী
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত
হাম তোঁহি নূতন নারী।"

চন্ডীর প্রতি উল্লেখ করিয়া মহিষাসুর বলিতেছেঃ

"ভাগেগা দেবদেবী পাথর পাথর ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকে রীত দেনা যমঘর যমকো আগকে আগলাগে"॥

তারপরে আবার মহিষাসুর প্রজাগণকে বলিতেছেঃ

"শোন্‌রে গোঁয়ার লোগ, ছোড়দে উপাস রোগ,
মানহোঁ আনন্দ ভোগ ভৈষরাজ যোগমে।
আগ্‌মে লাগাও ঘীউ, কাহেকো জলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পিউ, ভোগ এহি লোগ মে।
আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যোগ ভোগ, মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্থ নার আর জ্ঞান,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব রোগ মে॥"

তাহাতে চন্ডীর ক্রোধ ও হাস্য; তাঁহার কথা এইরূপঃ

"—কমঠ করটট, ফণী ফণা ফলটট
দিগ্‌গজ উলটট ঝগটট ভ্যায়রে।
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত
জলনিধি কম্পত বাড়ব ময়রে।"

'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সুন্দর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে তৎকালীন ও তাহার পূর্ববর্তী কালের সাহিত্যের বিষয় অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। নিম্নে উক্ত কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

"চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তাবতার।
অনন্ত কবীন্দ্র গায়ে মহিমা যাঁহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত করিল ব্যাস মহাশয়।
গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চন্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্য চরিত্র আগে করিল প্রকাশ॥
চৈতন্য সহস্রনাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞিমহাশয়ে।
সংক্ষেপে করিল তিহঁ গোবিন্দ বিজয়ে॥
আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড করি।
শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিল সর্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সংগীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য মঙ্গল তার চামর বিচ্ছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সংগীত বাদ্য বসে।
জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গায় শেষে॥

মহাপ্রভুর পর নদীয়াধিপতি বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যত্নে বঙ্গভাষায় বহুশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় দুইটি রত্ন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ স্বীয় জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া যে ভাবে ভাষা জননীকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সময়ে বঙ্গভাষা হইতে গ্রাম্যভাব বিদূরিত হইয়া ইহা রসাশ্রিত অলঙ্কারবহুল সুললিত ভাবময় এক মধুর ভাষায় পরিণত হয়। ইহাদের পর দাশরথি রায় পাঁচালী রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

বঙ্গসাহিত্যের এই নয় শত বৎসরের ইতিহাসে গদ্যের স্থান নাই; গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত কিছু রচনা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে এবং ঐগুলিকেই বাঙ্গলা গদ্যের আদিমতম নমুনা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি পুঁথি হইতে সম্পাদনা করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে 'শূন্যপুরাণে'র যে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভাঙ্গা গদ্যকেই বঙ্গভাষার প্রথম গদ্য বলিতে হয়; নিম্নে প্রথম গদ্যের নমুনা শূন্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইল :

"কোন মাসে কোন রাসি। চৈত্র মাসে মীন রাসি। হে কালিন্দিজল বার ভাই বার আদিও। হস্তপাতি লহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি। সেবক হব সুখি আমনি ধামাৎ কারি। গুরু পণ্ডিত দেউল্যা দানপতি। সারসুর ভোক্তা অমনি।"

মুদ্রাযন্ত্রের সহিত সাহিত্যিক উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বঙ্গদেশের আধিপত্য লাভ করিয়া এই দেশের দেওয়ানী ভার গ্রহণ করেন। সেই সময়

কোম্পানীর কর্মচারীদের বঙ্গভাষা না জানায় বিশেষ অসুবিধা হয়। এমন কি দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায় কটকের তৎকালীন সভাপতি মিঃ ব্রিস্টোকে (Mr Bristow) অপসারিত করা হইয়াছিল বলিয়া অপ্রকাশিত সরকারী রেকর্ডে(No 355—Consultation, July 3) লিখিত আছে।(১) সেই জন্য কোম্পানীর কর্মচারীদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষায় প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, নাথানিয়েল হালহেড এবং চার্লস উইলকিন্স প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। প্রগাঢ় অভিনিবেশের ফলে হুগলীর তৎকালীন সিভিল কর্মচারী হালহেড সাহেব অল্প দিনের মধ্যে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজদের শিক্ষার নিমিত্ত একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন: এই ব্যাকরণ খানিই বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ইহাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অংশ বিশেষ বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। কিন্তু তিনি কোন গদ্য সাহিত্যের উদাহরণ লইতে পারেন নাই বলিয়া গদ্যের নিদর্শন স্বরূপ "জগতধির রায়" লিখিত (১১ই শ্রাবণ ১১৮৫) একখানি পত্র উদ্ধৃত করেন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন 'থিউসিডাইডের পূর্বে গ্রীস দেশের সাহিত্যের যে দশা ছিল, বঙ্গীয় সাহিত্যেরও এখন সেই দশা। গ্রন্থকারগণ কেবল পদ্যেই পুস্তক রচনা করিয়া আসিতেছেন। গদ্য রচনা এ দেশের সাহিত্যে একেবারেই অপ্রাপ্য। বিষয় কার্যের চিঠি পত্র, আবেদন এবং বিজ্ঞাপনী (ইস্তাহার) প্রভৃতি অবশ্য পদ্যে লিখিত হয় না, কিন্তু এই সকল রচনাতেও গদ্যের কোন নিয়ম নাই, ব্যাকরণ সঙ্গত বাক্য গ্রন্থনের কোন প্রণালী নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্মতত্ত্ব বল, ইতিহাস বল, নীতিকথা বল, সে সকল বিষয়ে পুস্তক রচনা করিলে গ্রন্থকারগণের নাম চিরস্মরণীয় হয়, তৎ সমস্তই পদ্যে লিখিত হইয়া আসিতেছে।"

হালহেড কৃত "A Grammar of the Bengal Language" হুগলী হইতে এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরাজের দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। চার্লস উইলকিন্স উক্ত পুস্তকের জন্য কাষ্ঠখণ্ডে অক্ষর খোদাই করিয়া দেন। পরে তিনি বড়া নিবাসী পঞ্চানন কর্মকারকে অক্ষর খোদাই করিবার প্রণালী শিখাইয়া দেন।

উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে চার্লস উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অব্দে ইলাইজা ইম্পের সংগৃহীত ইংরেজী ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডনকেন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কোম্পানীর যন্ত্রে

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের আখ্যাপত্র

BENGAL LANGUAGE

মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব মধ্যে এক অধ্যায়

Mohaabhaaratar dronporbbo mod,hya ak ad,hyaaye

মুনিঃ বলে শুন পরিক্ষিতের তনয়।
জেমতে সাত্যকি বীর হইল পরাজয়॥

Moonih bole fono Poreekhyetar toneye
Jamota Saatyokee beero ho-ile poraajoye

এক কালে বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করে।
নিমন্ত্রিয়া ভ্রাতৃ বন্ধু আনে সভাকারে॥

Ak kaala Bofodab pertree fhraddho kora
Neementreeyaa bhraatree bondhoo aana fobhaakaara

সোমদত্ত বাল্হিক আদি আর পঞ্চানন।
সাল শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রণ॥

Somdot Baahleek aadee aar Penchaanon
Saaloo fheefhoo aaeelo paaeeyaa neemontron

আইল অনেক রাজা নাহয় গননে।
সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে॥

Aaeelo onak Raajaa naahoy gonona
Sobhaakaara Bofodab ko-ile obhyort,hona

পাতা।

পুস্তকটির ভিতরের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙগলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসর কাল পর্যন্ত বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিত মাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই।" (২)

ইংরাজদিগের শিক্ষার জন্য হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ কিরূপ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটি নিদর্শন উদ্ধৃত হইলঃ

"আর বান এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
দুশ্বাসনের অঙ্গ কাটি করে খান খান॥"

Aar baan are beer pooreeyaa soundhaan,
Dhooshwaasonar unga kaatee kare khaan khaan. (f. s.)

'The hero having well pointed his aim shot another arrow cutting the body of Dooshwaason hewed it in pieces. In this District word বান baan, সন্ধান Sondhaan, অঙ্গ ungo, and খান খান khaan khaan are in the passive or subjective case." (৩)

বাঙগলা গদ্যের প্রথম মুদ্রিত নমুনা হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ যাহা আছে, তাহাও এই স্থলে উল্লিখিত হইল; ইহা হইতে তৎকালীন বাঙগলা গদ্যের রীতি ও প্রকৃতি দেখা যাইবে। পত্রখানি বাঙগলায় লিখিত হইলেও আরবি ও ফারসী শব্দের বাহুল্যে ইহার মর্ম অনুধাবন করা অসম্ভব।

"৭ শ্রী রাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারী পরগণে কাকজোলা তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশী কিশতী হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্তি হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মাল গুজারির শরবাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুছিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেয়ালা দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১।

ফিদবি
জগতিধর রায়"

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কেননা, এই বৎসরই বাংলা হরফের প্রথম প্রচার ও তখন হইতে বাংলা টাইপে বাংলা পুস্তক নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হয়। ফিরিঙ্গিদের উপকারের জন্য লেখা হালহেদের গ্রামার বৃটিশ ভারতে প্রকাশিত বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক। বাংলা পুস্তকের ইহাই সর্বপ্রথম প্রচার। অবশ্য ইংরেজীতেই লেখা এ গ্রামার। তবে তাহার দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতিগুলি সব রামায়ণ মহাভারত আর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে গৃহীত আর বাংলা হরফেই মুদ্রিত। সাধারণ একটি তুচ্ছ ঘটনাই কিন্তু ভিন দেশী এই ইংরেজকে টানিয়া আনিয়াছিল এই ভারতের সাগর-তীরে।

ঘটনাটি এই : হ্যারোর দুই অন্তরঙ্গ ছাত্রবন্ধু একদা প্রেমে পড়েন অক্সফোর্ড চ্যাপেলের

এক সুকণ্ঠী গায়িকার। দুজনেই কবি-খ্যাত। একজন আবার নাট্যকারও। গায়িকা মিস্ লিন্‌লে দুইজনকে ভালবাসলেও প্রেমের জয়মাল্য কিন্তু পরিয়ে দিলেন নাট্যকার বন্ধু রিচার্ড সেরিডনের কণ্ঠে। আশাহত ব্যর্থ প্রেমিকের নিকট তখন মাত্র দুটি পথ খোলা। এক, তখনকার প্রচলিত প্রথানুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিস্তল লড়াইয়ের ডুয়েলে আহ্বান করা। অপরটি আপন দয়িতার কাছ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দূর বিদেশে পথ খোঁজা পলায়নের। প্রিয় বন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া হালহেদ শেষোক্ত পথই বাছিয়া নিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ এক কেরাণীর পদ গ্রহণপূর্বক তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিলেন দূর বাংলা দেশের উদ্দেশ্যে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সুবা বাঙলার শাসনভার বিশেষ করিয়া দেওয়ানী আদায়ের ভার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসে। বাংলা ভাষা জানা না থাকায় কোম্পানীর ইংরেজ আমলাদের নানা অসুবিধায় পড়িতে হইত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে। ইংরেজ আমলাদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত হয়। একান্তভাবে এই সময় ঘটনাচক্রে সিভিলিয়নরূপে এদেশে আগমন হয় মিঃ নার্থানিয়েল ব্রাসি হালহেদের। কোম্পানীর আমলা-দের এ-অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। অটুট অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে অচিরেই তিনি বাংলা ভাষা ও দেশীয় অপরাপর ভাষাগুলিতে এমনভাবে সুপণ্ডিত ও পারদর্শী হন যে, শোনা যায়, বর্ধমানে এক যাত্রাগানের আসরে নিজেকে তিনি দিব্যি বাঙ্গালী বলিয়া চালাইয়া দেন। তাঁর কথা-বার্তা, বেশ-ভূষা আর চাল-চলনে বিদেশী বলিয়া আঁচ করিবার নাকি কাহারও অবকাশই জুটিল না।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে ওয়েস্টমিনিষ্টারে জন্ম হয় হালহেডের। তাঁহার পিতা উইলিয়ম হালহেড ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। হালহেড শৈশবে হ্যারোতে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আর তাঁহার বাল্যবন্ধু প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার ও রাজনীতিক রিচার্ড সেরিডন দুইজনে মিলিয়া এক অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ডে পাঠ্যা-বস্থায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদ উইলিয়ম জোন্স-এর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। তিনিই হালহেদকে প্রাচ্য ভাষা আরবি ও ফারসী শিক্ষায় প্রথম অনুপ্রাণিত করেন।

ভারতে আসিয়া বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে তাঁহার বেশী দেরী লাগিল না। বড়লাট হেষ্টিংস-এর নির্দেশে ও পরামর্শে তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত আইন-এর সংক্ষিপ্তসার 'এ কোড অব জেন্টুলস' নামে অনুবাদ করেন। এর দু'বছর পর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় হালহেদের ব্যাকরণ **A Grammar of the Bengal Language.** এই গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র লিখিত হইল।

অবশ্য পঞ্চদশ শতকে ইয়োরোপে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভব হইবার পর বাণিজ্য ব্যপদেশে পোর্তুগীজগণ প্রথম ভারতে আসিতে সুরু করে। শোয়ার জেসইট ধর্মযাজকেরাই ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম ভারতীয়দের মুদ্রাযন্ত্রের কথা শোনান এবং গোয়া, মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছাপাখানা স্থাপন করনে। হালহেডের গ্রামারের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২১৬। ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও শুদ্ধাশুদ্ধির অংশ

বাদ দিয়া গ্রন্থটি মোট আটটি অধ্যায়-এ বিভক্ত। ইংরেজী গ্রামারের অনুকরণেই হালহেড তাঁহার ব্যাকরণের বিষয়বস্তু পরিবেশন করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রামারের আঙ্গিককেই তিনি অন্বয় অধ্যায়ে পুস্তকের পরিসমাপ্তি আনিয়া ঘটাইয়াছেন। বিদেশী দৃষ্টিকোণ হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফিরিঙ্গি আমলাদের জন্য মুখ্যতঃ রচিত হইলেও, বাঙলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত তিনি তাঁহার ব্যাকরণের কোথাও একথা ভুলেন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখিবার তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। অপপ্রয়োগ কোথাও তিনি করেন নাই।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে হালহেডের যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তাহা তাঁহার রচিত গ্রামারখানাই সাক্ষী। পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনিই প্রথম প্রমাণ করিয়া দেখান যে, সংস্কৃত ও দেবনাগরী, আরবী ও ফার্সী, এমন কি ল্যাটিন ও গ্রীক হরফের মধ্যে একটা নিবিড় সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই দিক থেকে তাঁহাকে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার ব্যাকরণকে আরবী ও ফার্সী প্রভাব থেকে যথা-সম্ভব মুক্ত করিয়া অপেক্ষাকৃত সংস্কৃত পদ্ধতিতে ঢালাই করিবার চেষ্টা করেন। হালহেড তাঁহার গ্রামারের দীর্ঘ ভূমিকায় তখনকার বাংলা গদ্যের শোচনীয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

'আমি এ ব্যাকরণে প্রাচীন বাংলা কবিদের কাব্যগ্রন্থ থেকে যে সকল উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি তাতে এ কথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বাঙলা ভাষার শব্দ-গৌরব অসীম। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদির যে কোন বিষয় রচিত হতে পারে। কিন্তু বাঙালীরা এ-সম্বন্ধে যত্নশীল নন।......বাঙালী গ্রন্থকারেরা কেবল পদ্যেই পুস্তক রচনা করে আসছেন। গদ্য রচনা এদেশের সাহিত্যে এক প্রকার বিরল। বিষয়-কার্য উপলক্ষে চিঠি-পত্র, আবেদন-নিবেদন, ইস্তেহার প্রভৃতি অবশ্য পদ্যে লিখিত হয় না, কিন্তু এ সকল রচনাতেও গদ্যের কোন নিয়ম নেই, ব্যাকরণ-সঙ্গত বাক্য-গ্রন্থনের কোন প্রকার প্রণালী নেই। এ-ছাড়া, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, নীতিকথা প্রভৃতি সকল বিষয়েই রচিত গ্রন্থ পদ্যে লিখিত হয়ে আসছে।

তখনকার দিনে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের দুরাবস্থার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, বঙ্গ-ভাষার প্রতি তিনি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিতেন। বরং ঠিক তার উল্টা। বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকামী অমন একটি সুহৃদ সে যুগে মেলা ভার।

প্রথম বাঙ্গলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপি

১৬৯২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একটি পুস্তক সর্বপ্রথম বাঙ্গলা অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় এবং ফাদার হস্টেন ইহার প্রথম উল্লেখ করেন। **2 maps and I plate containing the characters of the people of Bengala and Baramas.** (৪)শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন বাঙ্গলা অক্ষরের দ্বিতীয় নমুনা পাওয়া যায় ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় **'Aurenk Szeb'** নামক পুস্তকে; এই পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হইতে ১১ পর্যন্ত বাঙ্গলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ব্যঞ্জনবর্ণ ও একটি জার্মান নাম

"শ্রী সরজন্ত বলপকাং মাএর" (Sergeant Wolffgang Meryer) বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা আছে। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের পরে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের লাউডেন নগর হইতে ডেভিড মিল লাটিন ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকের শেষে হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি ব্যাকরণ আছে; এই ব্যাকরণ অংশে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। সজনী বাবু তাঁহার বাংলা গদ্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে উক্ত প্লেটগুলি পুনঃমুদ্রিত করিয়াছেন।

ডেভিড মিল পুর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আমি আরও দুইটি বর্ণমালা তাম্রফলকে খোদাই করিয়াছি–ব্রাহ্মণদিগের বর্ণমালার পরিচয় হিসাবে এখানি মূল্যেবান বিবেচিত হইবে টেবল III Bতে যে ব্রাহ্মণ বর্ণমালা (Alphabetum Brahm. 111 B) অর্থাৎ বাঙ্গলা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হয়।(৫)

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হালহেড সাহেব অনুদিত A Code of Gentoo Laws নামক পুস্তকেও বাঙ্গলা ও হিন্দী বর্ণমালা মুদ্রিত আছে। পরে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে বাঙ্গলা হরফের জন্ম হয় এবং সেই সময় হইতেই বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি সুরু হয়।

The first book in which Bengalee types were used was Halhed's Bengalee Grammar printed at Hooghly, at the press established by Mr. Andrews, a bookseller, in 1778. (৬)

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের 'প্রচার' নামক মাসিকপত্রে লিখিত আছে যে, ১৭৭৮ খৃীঃ মিঃ এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ হুগলী সহরে সর্বপ্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ হলহেড সাহেব সর্বপ্রথমে 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপেন।

প্রাচীনকালে বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ডেভিড মিল লিখিয়াছেন। এই বিষয় অনুসন্ধান প্রয়োজন। বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাঙ্গলা ছাপার হরফ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম নির্মিত হয়। কিন্তু পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে উহার কোন উন্নতি হয় নাই। স্যার চার্লস উইলকিন্স প্রাচীন পুথির অক্ষর এবং হুগলী নিবাসী খুসমৎ মুন্সীর হস্তাক্ষর দেখিয়া অক্ষর প্রস্তুত কার্যে ব্রতী হন; পরে কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তির সুন্দর হস্তাক্ষর দেখিয়া বর্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁচ সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়।

"বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসরকাল পর্যন্ত বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎমাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর ফণ্টর সাহেব কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্মকার নুতন এক সেট তাঁমা নির্মাণ করিয়া প্রস্তুত করেন। এই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাহারই দেখিয়া বর্তমান মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষরের যাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্রীরামপুরে সংসিদ্ধ হইয়াছে।"(৭)

১২৩৭ সালে হালহেড সাহেবের মৃত্যু হয়। সমাচার দর্পণ পত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদের সহিত প্রথম অক্ষর নির্মাণের কথা ছিল বলিয়া নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল ঃ

"অপর পূর্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য এক জন সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলন্ডদেশাগত সংবাদপত্রে লেখেন যে হালহেড সাহেব অতিবৃদ্ধ হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংলন্ডীয়রদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলী নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনী উলকিন্স সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতি বৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিকতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেন্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্স সাহেব পঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।"(৮)

ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নবজাগরণের যুগ; এই নব যুগের অবতারণা করেন **শ্রীরামপুরের মিশনের অধ্যক্ষ ডক্টর কেরী।** ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে নানা বিষয়ে কর্মনিষ্ঠার ভাব সঞ্চারিত হয়, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা অভাবে তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুদ্রাযন্ত্রের সহিত সাহিত্যের উন্নতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট; সেই মুদ্রাযন্ত্র হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একদল মিশনারী কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু কলিকাতায় ইংরাজগণ তাহাদের আশ্রয় না দেওয়ায়, তাঁহারা দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে আগমন করেন এবং শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ২৫শে মে চুঁচুড়া নিবাসী রামরাম বসু এই মিশনে যোগদান করেন এবং এই মিশন হইতেই পরবর্তী কালে গদ্য সাহিত্যের উদ্বোধন ও বিকাশ হইয়াছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না।

কেরী সাহেবের জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামপুর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যের অক্ষর ঢালায়ের প্রধান স্থান ছিল।

Serampore continued down till 1860 to be the principal Oriental type foundry of the East. (৯)

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা গদ্যের গোড়াপত্তন হইতে প্রাথমিক ইতিহাস পর্যন্ত 'প্রথমযুগ'; গদ্য সাহিত্যের গঠনকার্য 'মধ্যযুগ' এবং নবভাবে নূতন ছাঁচে বর্তমান রূপ 'নবযুগ'। এই প্রথমযুগে কেরী সাহেব বঙ্গভাষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, গদ্য রচনার সৌকর্য সাধনে যে ভাবে চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে

তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে এবং বঙ্গবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিবে; বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিয়া বঙ্গবাসীগণকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেও, বঙ্গভাষার প্রতি প্রীতির জন্য, শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য করিতে পারেন নাই এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সেই জন্য তাঁহার হাত দিয়াই বঙ্গভাষার বিকাশ হইয়াছিল। তিনি নিজে শুধু যে ব্যাকরণ, অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্র স্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া একদল লেখক গদ্যে লেখনী চালনা করিতে সুরু করেন।'

তৎকালে বঙ্গদেশে শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল এবং দেশে কোন উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় পর্যন্ত ছিল না। লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় ব্যক্তিগণের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপন করেন এবং কেরী সাহেব উক্ত কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজকে কেন্দ্র করিয়া কেরী সাহেবের যথার্থ সাধনা আরম্ভ হয়। দেওয়ান রামকমল সেন এই সম্বন্ধে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন:

In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language w s made inperative on young civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta ; a number of books were supplied by the Serampore Press which set the example of printing works in this and other eastern languages···I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee Lauguage its improvement and in fact the establishing it as a language must be attributed to the excellent man Dr. Carey and his colleagues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the press and the general tone of the language of this province so greatly raised. (১০)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইয়া কেরী সাহেব বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকের জন্য বিশেষ অসুবিধায় পড়েন এবং তাহার চেষ্টায় দেশীয় পণ্ডিতগণের পুস্তক রচনায় সাহায্য করিবার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কতিপয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। কলেজ অধিবেশনের কার্য বিবরণে প্রকাশ:

RESOLVED that premiums shall be proposed to the learned native for encouraging literary works in the native language. (১১)

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয় এবং কেরী সাহেবের অধীনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলেজে নিযুক্ত হন।

প্রধান পণ্ডিত—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—বেতন ২০০৲ টাকা
দ্বিতীয় পণ্ডিত—রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি " ১০০৲ টাকা
সহকারী পণ্ডিত—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়—বেতন ৪০৲ টাকা

আনন্দচন্দ্র	বেতন ৪০৲ টাকা
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	বেতন ৪০৲ টাকা
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়	বেতন ৪০৲ টাকা
পদ্মলোচন চূড়ামণি	বেতন ৪০৲ টাকা
রামরাম বসু	বেতন ৪০৲ টাকা

হুগলীর অন্যতম সুসন্তান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত" শীর্ষক পুস্তকে এই সমস্ত পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন: অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক বিষয় অবগত হইবেন।(১২)

যাহা হউক কেরী সাহেব বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার কোন পুস্তক নাই বলিয়া স্বয়ং ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং **রামরাম বসুকে** দিয়া **'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'** নামক একখানি গদ্যগ্রন্থ লেখাইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে প্রকাশ করেন। ইহাই বঙ্গভাষায় বাঙ্গালী কর্তৃক লিখিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া খ্যাত। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া রামরাম বসু তিনশত টাকা পুরস্কার পান। গ্রন্থখানিতে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দুইটি আখ্যাপত্র আছে: আখ্যাপত্র দুইটি এইরূপঃ

The History of Raja Pratapaditya. By Ram Ram Boshoo, one of the Pundits in the College of Fort William, Searmpore, Printed at the Mission Press. 1802

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র যিনি বাস করিলেন যশহরের ধুমঘাটে একব্বর বাদসাহের আমলে। রামরাম বসুর রচিত। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১।

মারাঠা পাঠ্য পুস্তকের অভাবে এই পুস্তকখানি পণ্ডিত বৈদ্যনাথ কর্তৃক মারাঠী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই পুস্তক সম্বন্ধে মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

He therefore employed Ram-boshoo···the compile a history of King Protapaditya, an edition of which was published in the Bengalee language.

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের রচনার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

"রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজ হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল-গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি ছত্রী রাজা হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছুকাল ধৈর্য অবলম্বন কর্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর২ বৃদ্ধি হইতেছে।
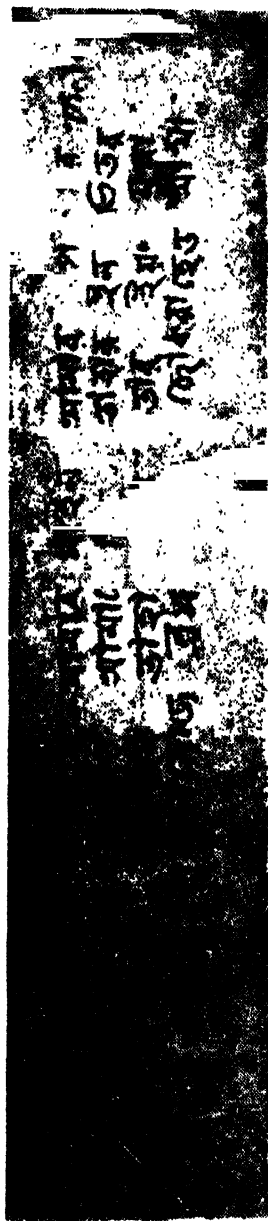
কেরীর ব্যাকরণের একটি পৃষ্ঠা
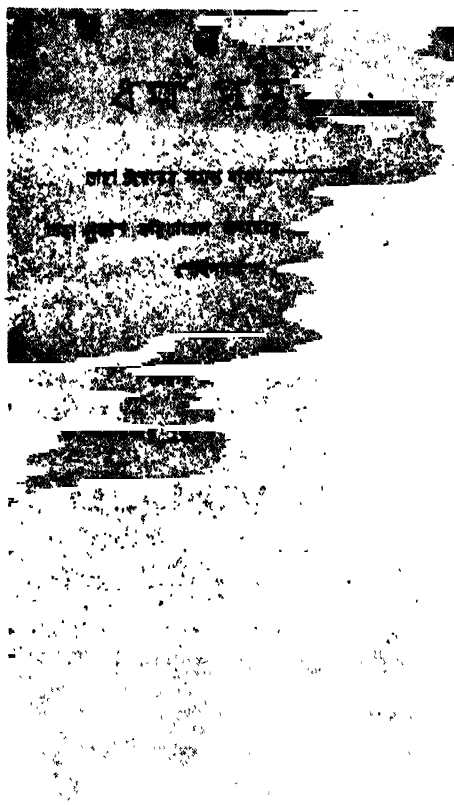
বর্তমান গ্রন্থের লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত
প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ ধর্মপুস্তকের আখ্যাপত্র
(বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য)

নিকটবর্তি আর২ পাট্টিদার যে২ ছিল সমস্তকেই উৎখাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।"

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া খ্যাত হইলেও সম্প্রতি এই নগন্য লেখক শ্রীরামপুর হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধর্মপুস্তক' নামে একখানি আটশত পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সুবৃহৎ গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া ১৮ই শ্রাবণ ১৩৫৩ সালের 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য ধর্মপুস্তক প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া এখন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। উহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইল।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের রামরাম বসুর 'লিপিমালা' নামক আর একখানি পুস্তক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি খৃষ্ট বিষয়ক বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি চুঁচুড়ায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি পরলোকগমন করিলে তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গলা বিভাগে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের কেরী সাহেবের 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়; খ্রীষ্টধর্মবিষয়ক পুস্তকগুলি বাদ দিলে ইহাই তাহরা বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বাঙ্গলা ভাষার মহিমা যে কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। নিম্নে বাঙ্গলা ব্যাকরণের ভূমিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইল:

"Bengalee a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. This idea is very far from correct; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe.

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India...four fifths of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East."

১৮০১ খৃষ্টাব্দে **"কথোপকথন"** নামে তাঁহার আর একখানি পুস্তক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা কেরী সাহেবের একখানি অপূর্ব গ্রন্থ; চলতি ভাষায় তিনি কিরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকখানিই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এই পুস্তকখানির মাত্র একমাস পূর্বে প্রকাশিত হয়। বাঙলায় এই পুস্তক কেরীর 'কথোপকথন' নামে পরিচিত।

পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :

Dialogues । intended । to facilltate the acquiring । of । The Bengalee llanguage । Serampore । Printed at the Mission Press । 1801.

কেরী সাহেবের এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ত্রয়োদশ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে মুদ্রিত হইয়াছে; নিম্নে উক্ত পুস্তকের রচনার নিদর্শন উদ্ধৃত হইল :

॥ মজুরের কথাবার্তা ॥

ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কাজ করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঢেটা মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তোকে ।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোর খাটনি নিব। ভাল ভাই। তুই চল, তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।

এতদ্ভিন্ন কেরী সাহেব ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ খণ্ডে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও চার খণ্ডে কাশীরাম দাসের মহাভারত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ইতিহাস-মালা, ইংরেজী অভিধান, বাইবেলের বঙ্গানুবাদ, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন বা সম্পাদন করিয়া তিনি প্রকাশ করেন।

কেরী, ম্যার্শম্যান ও ওয়ার্ডের অপর কীর্তি বঙ্গদেশ হইতে প্রথম শ্রীরামপুর হইতে 'দিগদর্শন' নামে একখানি মাসিক সাময়িক পত্র বাহির করা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জোসুয়া মার্শম্যানের পুত্র ক্লার্ক মার্শম্যান ইহা সম্পদানা করেন এবং শ্রীরামপুর মিশন হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার এক মাস পর—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে বঙ্গদেশের প্রথম সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" প্রতি সপ্তাহে জে, সি মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রায় তেত্রিশ বৎসর যাবৎ এই পত্র সমগ্র বাঙলা দেশে গদ্য সাহিত্য প্রচারে ও জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল। 'শ্রীরামপুর' শীর্ষক অধ্যায়ে এই পত্র দুইটি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'সমাচার দর্পণে' মুদ্রিত ও জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থে সুন্দর ভাবে লিখিত আছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' সংবাদ পত্রের ইতিহাস প্রকাশ করেন। উক্ত ইতিহাসে তিনি **গঙ্গাধর ভট্টাচার্য** কর্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গাল গেজেট" নামক পত্রিকা বঙ্গদেশের প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতগণ আলোচনা করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত কথিত নামটি 'গঙ্গাধর' নয় 'গঙ্গা কিশোর' হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেট' অদ্যাপি কোথাও আবিস্কৃত হয় নাই। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গাকিশোর হুগলী জেলাস্থ শ্রীরামপুরের অনতিদূরে বহড়া (বড়া?) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। তাঁহার সংবাদ পত্র আবিস্কৃত হইলে বঙ্গদেশে প্রথম সাংবাদিকের গৌরবময় পদের অধিকারী তিনিই যে হইবেন, তাহা সুনিশ্চিত। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় তাহার প্রথম হাতে খড়ি হয়, পরে স্বাধীন ভাবে পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়ের জন্য তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" নামক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ

বেঙ্গল গেজেট—১৮১৬ খৃষ্টাব্দে (১২২৩ সাল) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় প্রচারিত সর্বপ্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ইহার মূল্য মাসিক এক টাকা বা বার্ষিক ১২্ বার টাকা নির্ধারিত হইয়াছিল। এই সংবাদপত্রখানি মাত্র এক বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়াছিল। "সমাচার দর্পণ" নামক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত মিসনরিগণের সংবাদপত্রকে. কোন লেখক, 'দর্পণেই' ইহাকে সর্বপ্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র বলিয়া প্রকাশিত করিলে, 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামক পত্রে চন্দ্রিকার একজন পাঠক নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ঃ

"ঐ লেখক মহাশয়. বুঝি এতন্নগরবাসী না হইবেন। কেন না, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, (গঙ্গাধর—প্রকৃত নাম) যিনি এখন অন্নদামঙ্গল পুস্তক ছবির সহিত ছাপা করেন, তিনি "বাঙ্গলা গেজেট" নামক এক সমাচার পত্র সর্জন করিয়াছিলেন। তাহা, নগরে প্রায় সর্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রকাশক. সাংসারিক কোন বিষয়ে বিশেষ বাধিত হইয়া, তাঁহার নিজ ধাম বহড়া গ্রামে গমন করিলে. সে পত্র, রহিত হয়। তৎপরে দর্শনাবতার, ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছিলেন। অতএব এ বাদার্থ, প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (সমাচার দর্পণ, ১২০৮ সাল—৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৯১ পৃঃ)।

রেভারেণ্ড লং সাহেবও তাঁহার বাঙ্গলা পুস্তকের তালিকা নামক পুস্তকে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

In 1816 the "Bengal Gazette" was started by Gangadhor Bhattacherjee who had gained much money by popular editions of the Vidyasundar and varions other works, illustrated with woodcuts ; the paper was short-lived.

(A Descriptive Catalogue of Bengali Works.)

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্যই ভারতচন্দ্র-বিরচিত 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যা-সুন্দর' প্রভৃতি গ্রন্থাবলী চিত্রসহ সর্বপ্রথম মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট উইলিয়ম কেরী নর্দামটনশায়ারের পলার্সপিউরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম এডমণ্ড কেরী। তিনি তন্তুবায়ের কার্য করিতেন. পরে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া. অল্প বয়সেই কেরীকে উপার্জনের চেষ্টা করিতে হয় এবং কিছু দিন তিনি জুতা সেলাইয়ের কার্যও করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তিনি বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১১ই নভেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং একচল্লিশ বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশে বহুবিধ কার্য করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন পরলোকগমন করেন। অক্লান্ত অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতার গুণে বঙ্গভাষার তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। জনৈক সুধী সমালোচকের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতে পারি, কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাঁহাকে বিছিন্ন করিতে পারিবেন না।

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের উন্মোধনের সময় হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে আর একজন মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল; তিনি পুরুষসিংহ **মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়**। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে রামমোহনের কীর্তি অসামান্য এবং প্রকৃত গদ্য সাহিত্যের প্রবর্তক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। রামমোহন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী" নামক প্রথম গদ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গলা গদ্যে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকায় সাধারণ লোকের তাহা বুঝিবার বিশেষ অসুবিধা হইত বলিয়া, তিনি এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁহার শাস্ত্র বিচার ও বিবাদ মূলক রচনার দ্বারা তিনি বঙ্গ সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন।

রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কর্ম ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ দেশের উন্নতি কল্পে ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে জীবন উৎসর্গ করেন। লোক শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে পারে না, ইহা তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 'সংবাদ কৌমুদী' নামক একখানি পত্রিকা প্রচার করেন। তিনি বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্ত সার, ঈশোপনিষৎ, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পথ্যপ্রদান, কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, ব্রহ্মোপাসর্ণা, ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রভৃতি প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া যান। ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন "ব্রাহ্মণ সেবধি—ব্রাহ্মণ ও মিসিনারি সম্বাদ" Brahmunical Magazine. The Missionary & the Brahmun No, 1.

নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরাজী অনুবাদ থাকিত। শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ইহা প্রকাশিত হইত। খ্রীষ্টান মিশনারীগণের হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' হইতে রাজা রামমোহনের ইংরাজী ও বাংলা রচনার নমুনা উদ্ধৃত হইল:

"Wise and good men always feel disinclined to hurt those that are of much less strength than themselves and if such weak creatures be dependent on them and subject to their authority they can never attempt even in thought to mortify their feelings.

We have been subjected to such insults for about nine centuries, and the cause of such degradation has been our excess in civilization and abstinence from the slaughter even of animals ; as well as our division into casts which has been the source of what of unity among us."

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনরী নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তি রূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকারে এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানেরা ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকারে এই যে লোকে দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোন কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগের কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে যদ্যপিও যিশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ঔৎকর্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সকল দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিশনরীরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভর ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাংলা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে

যদি সেই দুর্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্মান্তিক কোন মতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয়শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব-প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।" (ব্রাহ্মণ সেবধি-সং ১)

রাজা রামমোহনের উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে তৎকালে মিশনারীদের খৃষ্টান করিবার কয়েকটি অলৌকিক পন্থা অবগত হওয়া যায়। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকল্পে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্যাপিষ্ট অক্সিলিয়ারী মিশনারী সোসাইটি "গস্পেল ম্যাগাজিন" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন; ইহা দ্বিভাষিক ছিল অর্থাৎ প্রতি পৃষ্ঠার দুইটি স্তম্ভে বাম দিকে ইংরাজী ও দক্ষিণ দিকে উক্ত ইংরাজীর বঙ্গানুবাদ থাকিত। মিশনরীগণের হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিবার জন্যই 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশিত হয় এবং বলা বাহুল্য রাজা রামমোহন সেই সময় ইহার প্রতিরোধ না করিলে, বঙ্গদেশের বহু হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেন।

ইংরাজী রচনায়ও তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পুনঃ মুদ্রিত করেন এবং অনেকগুলি নূতন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন; নিম্নে তাঁহার কাব্য রচনার নিদর্শন স্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত হইলঃ

"অজ্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে কর এ কি অনুষ্ঠান।
পরাৎপর করি পর, অপরে পরম জ্ঞান॥
জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার,
অলভ্য বাণিজ্যে তাহে না দেখি সুসার,
অবিবেক ত্যজি তত্ত্ব, ততত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান।"

রাজা রামমোহনের পর মদনমোহন তর্কালঙ্কার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার 'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল' জানেন না এরূপ বাঙ্গালী কে আছেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বঙ্গসাহিত্য গগনে যে সমস্ত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের বিমল প্রভায় কেবল বঙ্গদেশ নয় সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামের (বর্তমানে এই গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে) **পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দুই মাস বার দিন পূর্বে হুগলী জেলার সন্নিহিত বর্ধমানের অন্তর্গত চুপী গ্রামে বঙ্গের আর এক সুসন্তান অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাকে সুবর্ণ যুগ বা সৌভাগ্যের দিন বলা যায়। কারণ একই সময়ে বিধাতা এই দুই জনকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের গঠন কার্যে প্রাণ সঞ্চারণ করেন। রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়া যে সর্বাঙ্গনীতা বঙ্গভাষা অনুভব করিতেছিল তাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মধ্য দিয়া চরিতার্থ হয়। আজ যে সুমধুর সুললিত ভাষা বঙ্গবাসীর কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে,

যে ভাষার সৌন্দর্য পরিপাটি দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবান্বিত যে ভাষার বহুমুখী প্রতিভাতে আজ ভারতবাসী ঈর্ষান্বিত, যে ভাষায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' মহামন্ত্র রচনা করিয়া ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করেন, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া 'বিশ্বকবি' বলিয়া প্রখ্যাত হন, সেই ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের শোণিত বিন্দু পাত করিয়া গঠন করেন এবং তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন তৎকালীন কবি ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ।

বঙ্কিম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক। তাহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গলা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য ভাষা। আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য ভাষা। এস্থানে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।......

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভার বিষয় জানে না এরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী বোধ হয় এ দেশে কেহই নাই। তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইলঃ

বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাঁহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন— এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সৈনানীর রচনাকর্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকেই দিতে হয়।...বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা লেখায় সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন্ প্রভৃতি ছেদচিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। বাস্তবিক একাকার সমভূমি বাঙ্গলা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্তন এতদ্বারা যাহা জড় ছিল তাহা গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। (১৩)

এই সময় **কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের** নামও উল্লেখযোগ্য; তিনি অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচনা করিলেও তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' গদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। উক্ত পত্রে সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য

বিষয় যে, এই পত্রের সাহায্যে একটি 'লেখক-গোষ্ঠী' তৈয়ারী হইয়াছিল এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি রঙ্গলাল, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, কাঙ্গাল হরিনাথ, কবি রাধামাধব মিত্র প্রভৃতি বহু যশস্বী লেখক প্রভাকর লেখক গোষ্ঠী হইতেই বাহির হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' বহু খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবির জীবনচরিত ও তাঁহাদের গীতাবলী প্রকাশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গদ্য রচনার নিদর্শন ১৩ মার্চ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে প্রাচীনকালের গদ্য রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানা যাইবে।

অধুনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার যদ্রূপ সুপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহার ৪০ বৎসর পূর্বে এতদ্রূপ ছিল না, কেবল মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় রচনার এক নূতন সূচনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহার পূর্বে সাধুভাষায় কিরূপে শব্দ সংযোগ করিতে হয় তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরাও জানিতেন না; সচরাচর পত্র লিখিতে হইলে "যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক। আমরা ভাল আছি তাহাতে ভাবিতে নহিবেন" ইত্যাদি। বিষয়ি লোকেরা কতক হিন্দি, কতক বাঙ্গলা, কতক পার্সি মিশ্রিত করিয়া পত্র লিখিতেন, যথা "বাপা হে, তুমি একবার খবরটা লও না, আজ্ সাত রোজ হল প্রাণাধিক বাবাজির ব্যাম হয়েছে, কবিরাজ তিন ওক্ত তিকিচ্ছে, কর্‌ছেন, এখানে দাওয়াই ভাল নাই, তুমি একটু বিষ্ণু তোল পাঠাবা" ইত্যাদি। গদ্য রচনার এইরূপ শ্রী ছিল, নতুবা প্রায় হেয়ালী দ্বারা তাবৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইত, যথা "সদানন্দ আনন্দ পাইয়া যার দল" "পর্বত শিখর পরে গঙ্গার তরঙ্গ" তথা "আগা ঝম্‌ঝম্ গোড়া মোও" ইত্যাদি। দুঃখের কথা কি কহিব, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যিনি অতি সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন তিনি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক বহুবিধ পণ্ডিত কর্তৃক বেষ্টিত হইয়াও ভাষা লেখনের ব্যবহারে শুদ্ধ প্রহেলিকা দ্বারা আমোদ প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিৎ সমাদর ছিল; রাজা রামমোহন রায় সমাচাব পত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা দ্বারা স্বাভিমত ব্যক্ত করণে প্রবৃত্ত হইলে মহানুভব বিদ্যাতৎপর ৺নন্দলাল ঠাকুর মহাশয় তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন, তৎকালে উভয় দলে অনেক সাহায্যকারি পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, উভয় পক্ষের বিবাদে ভাষার বিস্তর উন্নতি হয়।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে সময় 'সংবাদ প্রভাকরে'র সাহায্যে 'লেখক গোষ্ঠী' তৈয়ার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে এবং **অক্ষয়কুমার দত্তের** সম্পাদনায় **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার** আবির্ভাব হয়। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দেশের হিতকর বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক ও সমাজ সংশোধক সুচিন্তিত প্রবন্ধাদির দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের সমৃদ্ধির সহায়তা করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাভারতের অনুবাদ এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ইহা জনসাধারণের এত মনোরঞ্জন করিয়াছিল যে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভারতীয় ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তৎকালে কলেজের শিক্ষিত যুবকগণ বঙ্গভাষা পাঠ

করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন, কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনা প্রকাশিত হইলে উক্ত শিক্ষিত যুবকগণ ও পণ্ডিতবর্গ আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতেন। সেই সময় পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া, কেহ সাহস করিয়া বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেন না—পড়িলেও গোপনে পড়িতেন। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতেছেন যদি কেহ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তিনি এমন লজ্জিত ও মর্মাহত হইতেন, যে সুরা পান করিয়া বারবণিতার গৃহে যাইতেছেন দেখিলেও, বোধ হয় তিনি ততটা লজ্জিত হইতেন না। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে' স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন :

"স্বামী—তোমরা ছাইভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? সব immoral obscene filthy

স্ত্রী—পড়িলে কি হয়? স্বামী— demoralize হয়—কি না, চরিত্র মন্দ হয়।

স্ত্রী—আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডী মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া কাজ করা হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক, যে তাদের মুখ দেখিলেও পাপ হয়। আপনার বন্ধুগণ ডিনারের পর যে ভাষায় কথাবার্তা ক'ন, শুনিতে পাইলে খানসামারাও কানে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগী-মটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে তারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই—আর আমি গরীবের মেয়ে একখানা বাঙ্গলা বই পড়লেই গোল্লায় যাব?

স্বামী—আমরা হলেম Brass pot : তোমরা হলে Earthen pot.

স্ত্রী—একবার এই বইখানা একটু পড় না।

স্বামী—আরে না-না; ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করো না।"

কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত মনোরঞ্জন করিত যে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে পত্রিকা প্রকাশের দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করিত। তাঁহার সরল মধুর জ্ঞানপ্রদ রচনাগুলি বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল এবং এক 'চারুপাঠই' তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।

বঙ্গসাহিত্যে মধ্যযুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তকে এই যুগের শেষ বলা যায়, কারণ তাঁহারা গদ্য সাহিত্যের যে আদর্শ স্থাপন করেন তাহাই পরিগৃহীত হয়। মাইকেল মধুসূদন হইতে নবযুগের সূত্রপাত হয়; মধ্যযুগ ও নবযুগের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা হুগলী জেলার সাগরদিয়ার **কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** পূরণ করিয়া যশস্বী হন। রঙ্গলালের গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনাই সাধারণের প্রীতিপদ ছিল। তিনি পদ্মিনী উপাখ্যান কর্মদেবী, সুরসুন্দরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহার রচনায় প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় ভাবের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' স্বাধীনতার বাণী বঙ্গদেশে তিনিই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের জাতি বৈরী ঘটিয়াছে; এই জাতি-বৈর ভাব হেমচন্দ্রের পূর্বে রঙ্গলালই সর্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা উপাসনার মঙ্গলঘট তিনিই সর্বপ্রথম স্থাপন করেন।" 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' রঙ্গলাল স্বাধীনতার যে

বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল ঃ

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?
কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে
স্বর্গ-সুখ তায়।"

ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া মহাকাব্য রচনায় রঙ্গলাল অগ্রণী হন এবং বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'ঋতুদর্পণ' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন "অধুনাতন বঙ্গীয় কবিবৃন্দ মধ্যে শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।" ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাতুলালয় বাকুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কাব্য গ্রন্থ ব্যতীত তিনি 'সংবাদ-সাগর' 'এডুকেশন গেজেট' 'উৎকল দর্পণ' (উড়িয়া ভাষায়) প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৩৩০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের নৈহাটী অধিবেশনে, সাহিত্য শাখার সভাপতি রসরাজ অমৃতলাল বসু রঙ্গলাল* সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

ঈশ্বর গুপ্তের 'মিউটিনী' প্রভৃতির পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্য বঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশ হিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—কে বাঁচিতে চায় ?" আবৃত্তি করিয়া বাঁখারী ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলে বেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ; কিন্তু এইখানে এক সময় বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।

বঙ্গসাহিত্যে নবযুগের উদ্বোধন করেন হুগলী জেলার পাণিশেওলার অধিবাসী প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে **টেকচাঁদ ঠাকুর**। ইতিপূর্বে সাধারণের ধারণা ছিল যে, কথিত ভাষায় কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করা যায় না, কিন্তু প্যারীচাঁদ কথিত ভাষাকে বঙ্গভাষার সর্ববিধ রচনার বাহন করিবার প্রথম ব্যাপক চেষ্টা করেন বলিয়া পরবর্তীকালে তাঁহারাই অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজীর আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। তিনি এই সাহস প্রদর্শন না করিলে—বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের এইরূপ উন্নতি আশা করিতে

*মন্মথনাথ ঘোষের "রঙ্গলাল" ও শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মহাকবি রঙ্গলাল" পুস্তকে কবির জীবনী লিখিত আছে।

পারিতাম না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রথম সামাজিক উপন্যাস **'আলালের ঘরের দুলাল'** প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে সমাজের রুচি ও আবহাওয়া অনুযায়ী ভাষা কিরূপ চিরাচরিত সংস্কৃতানুরাগিনী না হইয়া পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। আলালের ঘরে দুলাল গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও রচনার নিদর্শন এইরূপ ঃ

আলালের ঘরের দুলাল/শ্রীযুক্ত টেকচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত/কলিকাতা/রোজারিও কোম্পানীর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত/সন ১২৬৪ Calcutta :—Printed by D'Rozario and Co/8, Tank-Square./

"বেচারাম! বাবুরাম! ভাল দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পুষিয়াছিলে। তোমাকে পুনঃ ২ বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার কথা গ্রাহ্য কর নাই—ছেলে হতে ইহকালও গেল—পরকালও গেল। মতি দেদার মদ খায়—জোয়া খেলে—অখাদ্য আহার করে। জোয়া খেলিতে খেলিতে ধরা পড়িয়া চৌকিদারকে নির্ঘাত মারিয়াছে। হলা, গদা ও আর ২ ছোঁড়ারা তাহার সঙ্গে ছিল। আমার ছেলে পুলে নাই। মনে করিয়াছিলাম হলা ও গদা এক গণ্ডূষ জল দিবে এখন সে গুড়ে বালি পড়িল! ছোঁড়াদের কথা আর কি বলিব? দুর ২।"

প্যারীচাঁদ মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, রামারঞ্জিকা, অভেদী, আধ্যাত্মিকা, বামাতোষিণী, যৎকিঞ্চিৎ প্রভৃতি এগার খানি বাঙগলা পুস্তক এবং আট খানি ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইংরাজী গ্রন্থগুলিরমধ্যে Life of Dewan Ramcomal Sen এবং Agriculture in Benga নামক পুস্তক দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদারের সহযোগীতায় মহিলাদের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙগল স্পেকটেটার' পত্রের পরিচালন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা-গুলিতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র 'লুপ্তরত্নোদ্ধার বা 'প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী'তে বাঙগলা সাহিত্যে 'প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থানে নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, নিম্নে উক্ত প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইলঃ

বাঙগলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙগলা সাহিত্যের এবং বাঙগলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।.. প্রাচীনকালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বে বাঙগলায় সচরাচর পুস্তক রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। আমি নিজে বালকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগের যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—' 'খদির' বলিতেন: 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙগলাভাষা, আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের

হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গলা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গলা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় না এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।.. অতএব বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত সেকালের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি উহার সেবা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্র লিখিয়াছিলেন ঃ

In him the country loses a literary veteran, a devoted worker a distinguished author, a clever wit, an earnest pariot, and an enthuis-astic spritual enquirer.

সেই সময় আলালী ভাষার অনুকরণে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়া ছিল: তন্মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' উল্লেখযোগ্য।

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমসাময়িক, বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক **মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়** হুগলী জেলায় আত্মপ্রকাশ করেন। ইহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ, গদ্য সাহিত্যে এক অপূর্ব জিনিষ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি বহু গদ্য পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' তাঁহার অভিনব সৃষ্টি—ইহা সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময় এই দুই ভাগে বিভক্ত। পরবর্তী লেখকগণ তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় এত অধিক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় আব কেহ লেখেন নাই। এই গদ্য রচনা তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। 'সামাজিক প্রবন্ধ' হইতে ভূদেব বাবুর রচনার একটি নমুনা উদ্ধৃত হইলঃ

"প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে; ইংরাজের প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী হিন্দু শ্রমশীল সুবোধ, নম্র স্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্যকুশলতা শিখিতে হইবে; আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীকে সর্বোতভাবে স্বজাতি বিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে এবং স্বজাতির সহানুভূতিকেই পরমধন ভাবিয়া ভোগ করিতে হইবে।"

তিনি এডুকেশন গেজেটের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সম্পাদনা কালে এই

পত্র সর্বশ্রেণীর মধ্যে সমাদৃত হইয়াছিল। পরে তিনি 'শিক্ষাদর্পণ' নামে আর একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি উক্ত পত্রিকাগুলিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

তিনি পরলোকগমন করিলে 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিয়াছিলেন—"ভূদেব চরিত্রের মূল সূত্র তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্মবিসর্জন দিয়া পাশ্চাত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে তাঁহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

ভূদেব না ভাবিয়া কিছু করিতেন না। নিজের চিন্তা ও বিচার শক্তির সাহায্যে যাহা কর্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রাণপণে তাহা পালন করিতেন। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলী—কেবল সাহিত্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না এই সকল গ্রন্থে তিনি নিজের হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বদান্য ভূদেবের দানশীলতা বাঙ্গালীর আদর্শ হইয়া থাকুক। ভূদেবের জীবনতত্ত্বের অনুশীলনে ও অনুসরণে, বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণ জীবন প্রশস্ত ও পবিত্র হউক।"

এই সময় অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক এক ধনী সন্তান বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন—ইনি **মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ**। যে সময়ে ধনী সন্তানগণ বিলাসে, ইংরেজের অনুকরণে জীবন কাটাইবার জন্য ব্যগ্র হইত, ঠিক সেই সময়ে কালীপ্রসন্নের আবির্ভাব যেন বিধাতা প্রেরিত বলিয়াই মনে হয়। মাত্র ত্রিশ বর্ষ তিনি জীবিত ছিলেন—কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি যে সমস্ত কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ ও অলৌকিক বলিয়া মনে হয় এবং মনুষ্য সমাজে দুর্লভ বলিলেও চলে। কেবল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ বা হুতোম পেঁচার নক্সা রচনার জন্য নয় তিনি বাঙ্গালীর সামাজিক বহুবিধ সংস্কার ও উন্নতির জন্য যেভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে মহাত্মা কালীপ্রসন্নের নাম বাঙ্গালী হৃদয়ে চিরকাল খোদিত থাকিবে।

দীনবন্ধু মিত্র সুরধুনী কাব্যে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"দয়াশীল কালীসিংহ বিজ্ঞ মহোদয়,
সভ্য 'সারস্বতাশ্রম' যাঁহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে আপনি পণ্ডিত,
ভারতের অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী-ধনেশ,
দেশের কল্যাণ প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য-কৌতুক-হাসি-রসিকতা-ভরা,
'হুতোমপেঁচা'র ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তরুণ যুবক কালীপ্রসন্নের অমর কীর্তি এই মহাভারত। এই একখানি গ্রন্থে তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রহিবে।

এই অপূর্ব জিনিষ আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শোভা পাইতেছে। রাশি রাশি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞানলাভ না হয়, একমাত্র সিংহমহাশয়ের 'মহাভারত' পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করা যায় ইহা আমি স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি। সহস্রখানি 'রাবিশ' গ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করা শ্রেয়ঃ নয় কি?"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী কালীপ্রসন্ন তাঁহার ভবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অমৃতাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য সম্বর্দ্ধনা সভায় অভিনন্দন প্রদান করেন। উক্ত সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি মধুসূদনের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন এবং 'মেঘনাদবধ-কাব্য' বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালী সাহিত্যে একপ্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।" মাইকেলের এই নূতন ছন্দ তিনি বড় পছন্দ করিতেন এবং মাইকেলের পর কালীপ্রসন্নই প্রথম অমৃতাক্ষর ছন্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র (১ম ও ২য় ভাগ) প্রথমে একটি কবিতা রচনা করনে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি এইরূপ ঃ

প্রথম ভাগ

হে শারদে! কোন দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে?
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাসিবে
সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
কুমার—সে সময়ে মনে য্যান থাকে: চির অনুগত লেখনীরে!

দ্বিতীয় ভাগ

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্য রসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপা চক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহু মানে লব শির পাতি।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তৎকালীন সমাজের দূষিত চিত্র দেখাইয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। নিম্নে উক্ত পুস্তকের রচনার নমুনা উল্লিখিত হইল ঃ

"দুর্গোৎসব বাঙ্গলা দেশের পরব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই; বোধহয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙ্গলায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। পূর্বে রাজা-রাজরা ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলীকেও প্রতিমা আনতে দেখা যায়; পূর্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।"

কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা', 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও

'পরিদর্শক' প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেন এবং ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত "মুখার্জিস ম্যাগাজিন" ও ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত 'দুরবীণ' পত্র পরিচালনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন বাবু, বিক্রমোর্বশী, সাবিত্রী সত্যবান, মালতী মাধব প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও প্রণয়ন করেন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন এবং লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। বহু দুঃস্থ সাহিত্যিক তাঁহার দানে বঙ্গভারতীর সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তিনি কোন কারণে, বাঙ্গালী জাতির ব্যবহারে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া 'পরিদর্শক' নামে দৈনিক পত্রখানি বন্ধ করিয়া দেন। পত্রিকাখানি বন্ধ হইলে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন—"আমরা সম্পাদকের একটি সক্ষোভ অনুচিত প্রতিজ্ঞা দেখিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলাম। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালী সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালীদিগের উপকার করিবেন না।"

কালীপ্রসন্নের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং স্বীয় জন্মভূমির প্রতি কিরূপ প্রীতি ছিল, তাহা তাঁহার মহাভারতের উপসংহারে খুব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

"জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান ব্যক্তিরা কায়মনে জন্মভূমির উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্বক অবিনশ্বর সৎ কীর্তি লাভ করুন। তাঁহাদিগের যশঃ সৌরভে ভূমণ্ডল পরিপূরিত হউক। বিদ্যার বিমল জ্যোতি সাধনের হৃদয়-নিহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘ কাল মলিনা ভারত-বর্ষের সৌভাগ্য দিন দিন নবোদিত শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি হউক। সহৃদয় সাধুজনেরা নিরাপদে চিরদিন স্বদেশীয় সাহিত্য রসাস্বাদনে কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কবিবরেরা জন্মগ্রহণ পূর্বক ভাষাদেবীকে অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া সাধু সমাজের মনোরঞ্জন করত অমরতা লাভ করুন।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গ সাহিত্যের তিনজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি তিনটি বিভাগে বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা রচনা করেন; সেই তিনজন হইতেছেন—কাব্য-সাহিত্যে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গদ্য-সাহিত্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাট্য-সাহিত্যে মহাকবি নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মধুসূদন যশোহরে জন্মগ্রহণ করিলেও, হুগলী জেলার সাহিত্যের ইতিহাসকে—বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হইবে না। কারণ প্রথম মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, প্রথম গদ্য পুস্তক, উপন্যাস, প্রথম সংবাদপত্র প্রভৃতি সাহিত্যের যাবতীয় উপকরণ এই জেলা হইতেই সর্বপ্রথম বাহির হয়। তারপর বঙ্গভাষার বর্তমান রূপদাতাগণ প্রায় প্রত্যেকেই এই জেলায় জন্মগ্রহণ করায় এই জেলা বঙ্গভাষার পুজারীগণের নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আজ সেই তীর্থক্ষেত্রের ইতিহাসে কাব্য সাহিত্যের প্রতিভাশালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তাই হুগলী জেলার শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার উদ্দেশ্যে আমরা অর্পণ করিতেছি।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত নব্যতন্ত্রী হইলেও মধ্যযুগের তিনি শেষ কবি। তাঁহার পরলোক-গমনের পর **মধুসূদন কাব্য** জগতে অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 'মেঘনাদ বধ' ও 'তিলোত্তমা-সম্ভব' অমৃতাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়া কাব্যসাহিত্যে তিনি যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহার রচনা দেখিয়া তৎকালীন সুধী সমাজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। মধুসূদনের পরিচয় মেঘনাদ বধ মহাকাব্য; তিনি যদি আর অন্য কোন গ্রন্থ রচনা না করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কাব্য জগতের সম্রাট বলিতে, কেহই বোধহয় আপত্তি করিতেন না। অমৃতাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া প্রভৃতি নাটক এবং হেক্টর-বধ নামে একখানি গদ্য কাব্যও রচনা করেন। মধুসূদন সর্বপ্রথম ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙলা নাটক রচনা করেন, ইহাও তাঁহার অন্যতম কীর্তি।

তারপর **বঙ্কিমচন্দ্র** বাঙলা গদ্য সাহিত্যকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এক নূতন সরল সুমধুর ভাষার সৃষ্টি করিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজে পাঠকালে তিনি "ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস" রচনা করেন। সেই সময় কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। তাহার পর 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহার নবসৃষ্ট ভাষায় নবচিন্তা, নবচিত্র, ও নবশক্তির আদর্শ লইয়া আবির্ভূত হইলে বঙ্গ সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হইল। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেনঃ

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজ বদুন্নতধ্বনিঃ" এবং মুষলধারে ভাব বর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল। (১৪)

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে Indian Field নামক সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার ইংরাজী উপন্যাস Rajmohon's Wife প্রকাশিত হয়। তখন বঙ্গদেশে পাশ্চাত্ত্য ভাবের বন্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায় হাবুডুবু খাইতেছেন—ইংরাজীতে তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই মোহ কাটিয়া যায় এবং বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের মত তিনিও বলিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
তা' সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি'
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

"বঙ্গদর্শনের" অনুষ্ঠানপত্রে তাই তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিখি না কেন. ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ—"যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল. তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বলার্ক কিরণে প্রফুল্ল হইল. সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দ রব উত্থিত হইল. বঙ্গবাসীগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। (১৫)

ক্রমে কপালকুণ্ডলা. মৃণালিনী. চন্দ্রশেখর. যুগলাঙ্গুরীয়. বিষবৃক্ষ. ইন্দিরা, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, কমলাকান্তের দপ্তর, রাজসিংহ, রজনী, সীতারাম, প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বর্তমান বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গালীর ভাবধারা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহা যে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যই হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণে আরও কয়েকজন ব্যক্তি বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন—তন্মধ্যে হুগলী জেলার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা স্পর্শমণির ন্যায় যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে—তাহাই যেন সোনা হইয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন. আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।" বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একাধারে কবি. সাহিত্যিক, শিল্পী, সমালোচক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও দার্শনিক এবং তিনি নিজে সাহিত্যের সকল পথ খুলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সেনাপতির ন্যায় সেই সমস্ত পথে যে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া আমার ন্যায় নগণ্য লেখকের পক্ষে অসম্ভব, তবে হুগলী জেলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এবং নাড়ীর যোগ আছে বলিলেও কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হইবে না। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা এবং লীলাভূমি ছিল এই হুগলী জেলা—এই স্থানের চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটের বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁহার রজনী (১৮৭৭) উপকথা (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে, (১৮৭৭) কবিতা পুস্তক (১৮৭৮) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৯) প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৮) সাম্য (১৮৭৯) প্রভৃতি পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে তিনি চুঁচুড়া হইতে

নবীনচন্দ্র সেনকে পত্র দেন, তাহা হইতে এই স্থানে বসিয়া তিনি 'আনন্দমঠ' ও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতেছিলিন, এই কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। সেই আনন্দমঠের প্রাণ-স্বরূপ আমাদের জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম' তাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; সেই ঝঙ্কারে সমগ্র দেশ মুখরিত, ভারতবাসী তাঁহারই সেই নবমন্ত্রে আজ দীক্ষিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অমূল্য গ্রন্থরাজি বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। নিম্নে উত্তরচরিত সমালোচনা হইতে তাহার রচনার নিদর্শন কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ঃ

'সীতার নির্বাসন সামান্য স্ত্রী-বিয়োগ নহে। স্ত্রী-বিসর্জন মাত্রই ক্লেশকর-মর্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জন করে, তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়। যে বাল্যকালে ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার-সৌন্দর্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জন্মাবলম্বন—ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্যা, ধর্মে যে গুরু, ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন দিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশ,—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে, পত্নী বিসর্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা!' ইত্যাদি।

তিনি কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহার পৈত্রিক আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামে; তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ অদ্যাপি উক্ত স্থানে বসবাস করেন। এই সম্বন্ধে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "সঞ্জীবনী সুধা" নাম দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের যে রচনা সঙ্কলন করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বংশপরিচয় পাওয়া যাইবে। "অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীন দিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতি দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র।

কাব্য-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট মাইকেল মধুসূদনের ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী কালে দুইজন কবি দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন একজন কবি **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** আর একজন কবি নবীনচন্দ্র সেন।* ইহাদের মধ্যে কবি হেমচন্দ্র উত্তরপাড়ার আদি অধিবাসী হইলেও, তাঁহার মাতুলালয় হুগলী জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাটে তিনি

* নবীনচন্দ্র সেনের পূর্বপুরুষ হুগলী জেলার ত্রিবেণী হইতে চট্টগ্রামে চলিয়া যান।

জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং পরবর্তীকালে মধুসূদনের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ে কাব্য রচনার দিকে তাঁহার ঝোঁক হয় এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রকাশিত হয়। পরে 'বীরবাহুকাব্য', কবিতাবলী, প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ও কবিতায় বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করেন।

"অসভ্য চীন অসভ্য জাপান।
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

প্রভৃতি কবিতা বঙ্গে সুপরিচিত। তাঁহার 'বীরবাহু কাব্যে'র আখ্যাপত্রে একটি সুন্দর কবিতা আছে, নিম্ন তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"আর কি সেদিন হবে জগত জুড়িয়া যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ
ভারতবাসীর মন জানা রসে তুষিত॥
যবে দেব অবতংশ, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্বার সে শোভা হবে কি আর
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে বিন্দু যবে বসিত॥"

মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে বাঙ্গলার কাব্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১২৮০) যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উল্লিখিত হইল ঃ

"কিন্তু বঙ্গ-কবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র, মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন—কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গ-মাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" বঙ্গদর্শন।

তিনি বৃত্রসংহার, আশাকানন, দশমহাবিদ্যা, হুতোম প্যাঁচার গান, চিত্তবিকাশ, রোমিও জুলিয়েত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং নলীনী বসন্ত নাটক রচনা করিয়া সেই সময়কার শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ভেরী ও সিঙ্গা রবে মাতাইয়াছিলেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের মর্ম সেই সময় কেহই বুঝিতে পারেন নাই এবং সাহিত্যিকগণের মধ্যে একমাত্র কবি হেমচন্দ্র ও নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ব্যতীত কেহই বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত সঙ্গীত গ্রহণ করেন নাই। কবি হেমচন্দ্র, বন্দেমাতরম্‌কে জাতীয় সঙ্গীত রূপে প্রচলিত করিবার জন্য 'রাখিবন্ধন' কবিতা রচনা পূর্বক তন্মধ্যে বন্দেমাতরমের কয়েক পংক্তি সন্নিবেশিত করেন এবং তাহাই জাতীয় সঙ্গীতরূপে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে গীত হয়। নিম্নে উক্ত গীতটি উদ্ধৃত হইলঃ

ভারত জননী জাগিল।
পূরব বাঙগলা মগধ বিহার
দেরাইসমাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাট গুজরাটী মারহাটী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।
প্রেম আলিঙগনে করে রাখি কর
খুলে গেছে হৃদি পরস্পর
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
সুখে জয়ধ্বনি করিল।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল 'বন্দেমাতরম্'
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনিং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনিং
সুখদাং বরদাং মাতরম্—
বহুবলধারিনীং নমামি তারিনীং,
রিপুদল বারিনীং বন্দে মাতরম্।

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগত মাতিল।
আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণ যুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—"কীর্তিই জীবন। মহাপুরুষগণের কীর্তি-কীর্তনই তাঁহাদের প্রকৃত জীবন। কবির কবিত্ব-কীর্তনই কবির জীবন।"

এই সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম-ই জাতীয় মহাসম্মিলনীর জাতীয় মহাসঙ্গীত; কিন্তু তখনও বন্দেমাতরমের মর্ম কেহ বুঝেন নাই। সহযোগী সাহিত্যিকেরাও ইহা পছন্দ করিতেন না। বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া নেতৃবৃন্দ আনন্দধ্বনি (Cheers) বিদেশীয় অনুকরণে

সুর মিলাইয়া তাহারই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে 'রাখিবন্ধন' কবিতা রচনা করিতেন। বন্দেমাতরম তখন তাঁহারা ভাবিতে আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে চাকুরী করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্র শুনিলেন যে, তাঁহারই বন্ধু হেম তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া তাহারই সঙ্গীতের প্রতিধ্বতি করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে 'রাখিবন্ধন' কবিতা রচনা করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন।.........কবির সঙ্গীতে বাঙলা উদ্দীপিত হইল।"

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগেশ কাব্য'** রচনা করিয়া বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমধিক পরিচিত হন। চিত্তমুকুর তাহার প্রথম পদ্য গ্রন্থ, তারপর বাসন্তী ও চিন্তা নামে গীতি কাব্য দুইখানি প্রকাশিত হয়।

ঈশানচন্দ্রের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়া হইতে 'পূর্ণিমা' নামে ১৩০০ বঙ্গাব্দে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাব্য জগতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কিরূপ ছিল, তাহা 'যোগেশ কাব্য' পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জন দেন। তিনি 'সুধাময়ী' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই । গদ্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন—তম্মধ্যে পূর্ণিমায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাবের জীবনী উল্লেখযোগ্য।

'বাসন্তী' হইতে তাঁহার কবিতা কয়েক লাইন উল্লিখিত হইলঃ

"সুখশূন্যে মরুপ্রায় তবে কি সংসার?
জীবন কি কিছু নয়, শুধু যন্ত্রণাময়
এত ক্লেশ এত শ্রম সব কি মিছার?
এই দেহপিন্ড লয়ে, এ অনন্ত দুঃখ সয়ে
পার্থিব জীবন ফিরে বিড়ম্বনা সার?
নরভাগ্যে জীবনে কি নাহি পুরস্কার?"

এই সময়ে হুগলী জেলায় জেজুর গ্রামে **কবি রাধামাধব মিত্র এবং** বড়া গ্রামে পল্লীকবি রসিকচন্দ্র রায় তাঁহাদের রচনায় কাব্য সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন। রাধামাধব কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর 'সংবাদ প্রভাকর' মাসিক সংস্করণ, গুরুর ধারা বজায় রাখিয়া আট বৎসর যাবৎ সম্পাদনা করেন। এতদ্ব্যতীত রসার্ণব, সুধাকর সুজন রঞ্জন, বঙ্গরঙ্গ, দ্বিজরাজ প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক পত্রও তিনি সম্পাদনা করেন। সেই কবিতার যুগে অজস্র কবিতা ও কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে কবিতাবলী (পাঁচ খণ্ড) বোধেন্দুদয়, স্ত্রীলোকের দর্প চূর্ণ, বিধবা মনোরঞ্জন নাটক, বণিতামরণ খেদের কারণ, স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্ব, শারদীয় মহোৎসব, ভাবলহরী তোমার কথা প্রভৃতি উল্লেখ্য। তাঁহার একখানি অপ্রকাশিত নাটকও লেখকের নিকট আছে। রাধামাধবের* রচনার নিদর্শন স্বরূপ পর পৃষ্ঠায় তাঁহার চার পঙ্‌ক্তি কবিতা উল্লিখিত হইলঃ

---

*কবি রাধামাধবের কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তারিতভাবে হইয়াছে "বঙ্গশ্রী" ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৫৩, পৃষ্ঠা ২২৫-২৩০, ১০৫ ১৩২।

KABITABALEE

FOR THE USE

OF

SCHOOLS.

BY

RADHA MADHUB MITTRE.

PART II.

কবিতাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।

শ্রী[illegible] মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয়বার মুদ্রিত।

CALCUTTA.

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS.

PUTTULDANGA, COLLEGE STREET. No. [illegible].

1866.

Printed for the Publisher and sold by Messrs. [illegible] & [illegible], [illegible], College Street, Calcutta, and also at the Calcutta School Book Society's Depot

রাধামাধবের কবিতাবলীর আখ্যাপত্র

"পরোক্ষে লোকের নিন্দা যে মানব করে।
লোকের অনিষ্ট চেষ্টা, করে, করে করে॥
অধম তাহার মত কেহ নাই আর।
অত্যন্ত জঘন্য হয়, স্বভাব তাহার॥

ডক্টর সুকুমার সেন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস. ২য় খণ্ড (পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭) কবি রাধা-মাধব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"জেজুর নিবাসী রাধামাধব মিত্র ছিলেন ঈশ্বররচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। রাধামাধব কিছু কাল মাসিক প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ইঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল রাধামাধব শীলস্ ফ্রী কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। ইঁহার কবিতা গ্রন্থের মধ্যে 'বোধেন্দুদয়' (১৮৬৩) এবং পাঁচখণ্ড 'কবিতাবলী' (১৮৬৮-৭৩) পাঠ্য পুস্তক হিসাবে লেখা হইয়াছিল। অলোকনাথ ন্যায়ভূষণের সহযোগিতায় রাধামাধব আরব্য উপন্যাসের গদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৮৭৬)। স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ' (১৮৬৩) প্রণয়ঘটিত আখ্যায়িকা কাব্য। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ হইতেছে বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত' 'বিধবা মনোরঞ্জন নাটক' (১৮৫৬, দ্বি-স ১৮৭৭)। রাধামাধব মিত্র দীর্ঘজীবী ছিলেন (১৮২৫—১৯২১)।"

সুকুমার বাবু রাধামাধবের 'কবিতাবলী' পাঁচখণ্ডের প্রকাশ কাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। তাঁহার 'কবিতাবলী' ২য় ভাগ (তৃতীয় সংস্করণ) একখণ্ড আমার নিকট আছে, উহার ভূমিকা হইতে ২য় ভাগের প্রকাশকাল "২৭শে শ্রাবণ ১২৬৮" বলিয়া লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙলা ১২৬৮ সাল ইংরেজী "১৮৬১ খৃষ্টাব্দ" হইবে। প্রথম ভাগ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কবিতাবলী ২য় ভাগের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি পাঠকগণের অবগতির জন্য ৪৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

রসিকচন্দ্র মাত্র দশ বৎসর বয়সে ছড়ার মত কবিতা বলিতে পারিতেন এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার কবি প্রতিভার বিকাশ হয়। 'জীবনতারা' কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ; হাস্য-করুণ ও আদিরসের সমবায়ে এই গ্রন্থ পাঠকের মনে আনন্দরসের সৃষ্টি করিলেও ইহার মধ্যে অশ্লীল অংশ থাকায় সরকার হইতে ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে 'নব জীবনতারা' নামে আপত্তিকর অংশ বাদ দিয়া ইহা পুনঃ মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচনার মধ্যে পদ্যসূত্র (দুই খণ্ড) শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদাঙ্কদূত, দশমহাবিদ্যা, শকুন্তলা বিহার, বর্ধমান চন্দ্রোদয়, কুলীন কুলাচার প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি গোবিন্দ অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুঁই, মহেশ চক্রবর্তী, প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদের যাত্রার গান এবং সোনা পটুয়া, শশী চক্রবর্তী, ত্রিপুরা বিশ্বাসকে পাঁচালীর গান ও ছড়া রচনা করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল আলোকে এই সমস্ত কবি বর্তমানে ম্লান হইয়া যাইলেও তৎকালের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট, ইহারা সাহিত্য স্রষ্টারূপে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

নিম্নে রসিকচন্দ্রের রচনা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইলঃ

এ জগতে দোষ নাহি চুরির সমান।
মন যায় ধন যায় আর যায় প্রাণ॥
দেশে অপবাদ অপরাধ কত।
সবার ঘৃণিত কাজ নিন্দা শত শত॥
একে পাপ যোগাযোগ তায় অনুযোগ।
কখনও চোরের দ্রব্য নাহি হয় ভোগ॥

হুগলী জেলায় আর একজন সুসাহিত্যিক ও সমালোচক জন্মগ্রহণ করেন; তিনি হইতেছেন **অক্ষয়চন্দ্র সরকার**। তাঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকারও একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং ঋতুবর্ণন, হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা এবং বাঙ্গলা সাহিত্য ও বঙ্গভাষা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পুত্র সম্পাদিত 'সাধারণী' ও 'নবজীবনে' গঙ্গাচরণের অনেক সুলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রনাথ বসু পৃথিবীর সুখ দুঃখ নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের শেষ পয়ারপ্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ায় সর্বজন সম্মানিত পিতা রসসাগর গঙ্গাচরণ। তাঁহার কবিতা পড়িলে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি।" বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন; সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণে তিনিও একজন সুসাহিত্যিক বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। যে সময়ে বহরমপুর বিদ্বজ্জনমণ্ডলী দ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রামদাস সেনের বাটী বহরমপুর; তাঁহার গ্রন্থাগার বহু ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকে পূর্ণ থাকিত। হুগলী জেলার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সে সময় বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। বাঙ্গলার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময় গঙ্গাচরণ সরকার বহরমপুরে মুন্সেফ, দীনবন্ধু মিত্র পোষ্টাল ইনস্পেক্টর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার বহরমপুরের উকিল। এই সাহিত্যিকগণের একত্র সমাবেশের ফলে তথায় বাঙ্গলা ভাষা চর্চার এক মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে ইহার অপূর্ব পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১লা বৈশাখ ১২৭৯) এবং অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী'র (১১ই কার্তিক ১২৮০) আবির্ভাব।

অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' সম্পাদনা করিতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত একযোগে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিতেন। তাঁহার 'গ্রাবু,' 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত; সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে অক্ষয় বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের একদিন অমিত প্রতাপ ছিল এবং বঙ্কিম পরিমণ্ডলের অন্যতম জ্যোতিষ্ক বলিয়া তিনি প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে তাহার 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটিকে কমলাকান্তের দপ্তরে স্থান দিয়া অক্ষয়চন্দ্রকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন।

অক্ষয়চন্দ্রের প্রত্যেক রচনার মধ্যে তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতি পরিস্ফুট হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'দশমহাবিদ্যা' নামক প্রবন্ধ 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; উক্ত প্রবন্ধে ভারতমাতার দশদশা বর্ণনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেনঃ—

"আমার বোধ হয় যে এই ভারতবর্ষে দশ দশাই দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশা চলিতেছে, সেই দশার প্রতিমূর্তিই ধূমাবতী মূর্তি। কিন্তু তাহার পর মাতা আবার বগলা মূর্তিতে দেখা দিবেন। ভারত মাতা আবার রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারত মাতা আবার সুভূষণে ভূষিতা হইবেন। এমন দিন হইবে......ইহার পরেই ভারতের মাতঙ্গী মূর্তি। ভারতমাতা আপনার চির পরিচিত দয়ায় বশবর্তিনী হইয়া সেই করকবলিত শত্রুকে বিমুক্ত করিয়াছেন; আত্মরক্ষার্থ খড়্গচর্ম ধারণ করিয়াছেন; শাসনাস্ত্রে পাশাঙ্কুশ পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্নপদ্মাসনে রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহার পর মা 'মহালক্ষ্মী' রূপে ভবে দেখা দিবেন.........ভারতমাতার যুগ যুগান্তরের মল রাশি শ্বেত হস্তিগণ অমৃতবারি সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে। ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে অভয় দান করিতেছে। আহা কি শুভ দিন! শরীর রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দধ্বনি কর। ভারতমাতার অভিষেক হইতেছে। মাতা যোগিনী মূর্তি, রাজ্ঞী মূর্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা ভুবনেশ্বরী মূর্তি —মাতা তাহা গ্রহণ করেন নাই। মা এখন মহালক্ষ্মীভাবে শোভা পাইতেছেন—সকলে জয়ধ্বনি কর।" এই জয়ধ্বনি "বন্দেমাতরম্"—ইহার সহিত আনন্দমঠের মাতৃমূর্তি তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

অক্ষয়চন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অধিকাংশ রচনা পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। শিক্ষানবিশের পদ্য, প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ, সমাজ সমালোচনা, গোচারণের মাঠ, হাতে হাতে ফল, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, আলোচনা, সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র, মোতী কুমারী মহাপূজা, রূপক ও রহস্য, সাহিত্য-সাধনা এবং সাহিত্য পাঠ।

তিনি 'সাধারণী' ব্যতীত 'নবজীবন' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ তাঁহার হস্তে রাজ্যভার দিয়া প্রায় বিদায় গ্রহণ করেন। এই নবজীবন ও প্রচার পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব ও অনুশীলনের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। অক্ষয়চন্দ্রের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও সহজ, সরল ও সুন্দর হইত। তাই বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা অন্যতম আদর্শ হইয়া থাকিবে। তিনি উকিলের মত যুক্তি দিয়া তাঁহার বক্তব্য পাঠকের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিতে পারিতেন, ইহাই তাঁহার রচনার একটি বিশেষত্ব ছিল।

পরবর্তীকালে মাহেশের সত্যচরণ শাস্ত্রী জালিয়াত ক্লাইভ, ছত্রপতি শিবাজি, নন্দকুমার প্রভৃতি দেশাত্মবোধক রচনা দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। মাহেশের আর একজন কৃতি সন্তান প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গলা ও হিন্দী ভাষায় ২৪শ খণ্ডে

বিশ্বকোষ রচনা করিয়া বঙ্গ ও হিন্দী সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী একক চেষ্টায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার রচয়িতাকে তিনি দর্শন করিতে আসিয়া পরে "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে লিখিয়াছিলেন যে, ইহাদের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে জাতি গঠিত হয়। Nations are made from these giants. এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এখন দুঃষ্প্রাপ্য হইয়াছে; সরকারের বিশ্বকোষ পুনরায় মুদ্রনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

জালিয়াত ক্লাইব দেশবাসীর হস্তে অর্পণকালে সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন "যাঁহারা আমাদিগের আশা, ভরসা ও গৌরব; শ্রীভগবান যাঁহাদিগের হস্তে অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করাইয়া জগৎকে মুগ্ধ করিবেন, সেই দেববলসম্পন্ন আমার স্বদেশবাসী যুবকবৃন্দের হীরক-হস্তে এই গ্রন্থ অর্পণ করিলাম।"

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় ভারতের অন্যতম প্রধান ধর্মবক্তা ও বহু ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা **পরিব্রাজকাচার্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী** জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতাদি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছে। স্বামীজী যখন শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, তখন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র উহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গলা ভাষায় অপূর্ব রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।" তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তি ও ভক্ত, পরিব্রাজকের সঙ্গীত, নীতি রত্নমালা, প্রবোধ কৌমুদি, শ্রীকৃষ্ণ-রত্নাবলী, প্রভৃতি অসংখ্য পূজোপকরণ আহরণ করিয়া বঙ্গবাণী-মন্দিরে জননী বিদ্যাদেবীর শ্রীচরণকমলে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য **"গীতার্থ-সন্দীপনী"** নামক গীতার অপূর্ব ব্যাখ্যা। গীতার এইরূপ সহজ ও সরল ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় নাই।

খৃষ্টান প্রচারকদের হাত হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি দ্বিভাষিক পত্র **'ধর্মপ্রচারক'** নামে একটি বাঙ্গলা-হিন্দী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।* ইহা ছাড়া ইংরাজীতে 'মাদারল্যাণ্ড' নামে সাপ্তাহিক পত্র ও বাঙ্গলা ভাষায় 'সুনীতি' নামে পাক্ষিক পত্রও সম্পাদনা করেন। ধর্মসাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। একবার তাঁহার বিলাতে যাইবার একটি সংবাদ প্রকাশিত হইলে স্বামী বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মিঃ ষ্টার্ডিকে লিখিয়াছিলেন—"স্বামী কৃষ্ণানন্দ ইংলণ্ডে আসছেন; তাই যদি হয়, তবে আমি যাঁদের পেতে পারি, তাঁদের মধ্যে ইনিই হবেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী।" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১১)

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেহরক্ষা করেন। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতাবলীকে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাব ও ভাষার অপূর্ব সমাবেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ধর্মবক্তার মনোমুগ্ধ-কর বক্তৃতাগুলি "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেকে 'নারী নরকের দ্বার স্বরূপ' নারী পিশাচী রাক্ষসী, 'কামিনী বাঘিনী' ইত্যাদি ভাষায় স্ত্রীজাতিকে নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বামীজী নারী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী সকলেরই

*ধর্মপ্রচারক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সাময়িকপত্রের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

পূজিতা, গর্ভধারিণী নারী জগৎ প্রসবিত্রী ও নারীকে শক্তি বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, নারীকে পিশাচী ইত্যাদি দুর্বাক্য বলা তোমার ভ্রম; স্ত্রী নরকের মূল নহে, তোমার মলিন মনই নরকের মূল। তুমি নর ও নারী পৃথক পৃথক পদার্থ না দেখিয়া সকল কায়াই ভগবানের নিবাস-মন্দির, এইরূপ দর্শন কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। এই সম্পর্কে তাঁহার রচিত কবিতাটি উদ্ধারযোগ্যঃ

নারী মাতা সবিতা নারী — কোঁ নারী নরকমূল।
নারী পিশাচী কহনা তেরা — মলিন মনকা ভুল॥
জগন্মাতা নারী ভয়ী — জনক দুহিতা রূপ।
ভূধর ভবন মেঁ পার্বতীপদ — পূজে ত্রিভুবন ভূপ॥
নারী ভয়ী অন্নপূর্ণা — অন্ন দেনেওয়ালী।
কুঞ্জ কানন মে নারী রূপ ধর — ভয়ে কৃষ্ণ কালী॥
নর নারী সব রূপ আধারা — ঘট ঘট নিবাসে রাম।
নিহারো শ্রীকৃষ্ণানন্দ — সব কায়া হরিধাম॥

এই সময় নাট্য সাহিত্যে হরিপালের আদি-অধিবাসী মহাকবি গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে। "বাঙ্গলা সাহিত্যের গঠন ও ক্রমবিকাশে বঙ্কিম-চন্দ্রের যে স্থান, বাংলার নাটকসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের ঠিক তদনুরূপ স্থান। তাঁহার ভাব ও ভাষা, তাঁহার ছন্দ ও উচ্চারণ বর্তমান নাট্য সাহিত্যের ছাঁদ ঠিক করিয়া দিয়াছে।" (১৬)

বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র অভিনয়োপযোগী বঙ্গভাষায় নাটকের অভাব দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নাটকান্তরিত করিয়া অভিনয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং পরবর্তীকালে সাহিত্য-সম্রাটের যাবতীয় উপন্যাস গিরিশচন্দ্রই নাটকে রূপান্তরিত করেন। পরে তিনি স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক প্রায় পঁচাত্তরখানি রচনা করিয়া অভিনয় করেন। তাঁহার 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয়ের খ্যাতি শুনিয়া যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পর্যন্ত অভিনয় দর্শন করেন ও অভিনয় দেখিয়া রঙ্গালয়ের মধ্যেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া যান।

তাঁহার [illegible] সিরাজদ্দোলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি নাটকগুলি তাঁহার দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার সিরাজদ্দোলা নাটকের অভিনয় দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান এবং বলেন যে, আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহস্র বক্তৃতা মঞ্চ হইতে যাহা করিতে অসমর্থ; গিরিশচন্দ্র একটি অভিনয়ের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশের তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার করিতে সমর্থ হইতেছেন।

গিরিশচন্দ্র একাকী যত নাটক রচনা করিয়াছেন, পৃথিবীর কোথাও কোন নাট্যকার এতগুলি নাটক রচনা করিতে সমর্থ হন নাই; নাটক রচনায় ইহা 'রেকর্ড' বলিতে পারা যায়। ইংরাজী ভাষা হইতে তাহার ন্যায় অনুবাদ কেহই করিতে পারিতেন না। সেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদ ফরাসী ভাষায় সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া কথিত; কিন্তু গিরিশচন্দ্র

কর্তৃক 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদ ফরাসী ভাষাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মিঃ এন, এন, ঘোষ প্রমুখ পন্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এক বন্ধু ম্যাকবেথের উইচ (Witch) বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয় বলায়, তিনি উক্ত নাটকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন।

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ যে কিরূপ প্রকৃষ্ট ছিল, দুই একটি স্থান হইতে তাহার পরিচয় দিতেছি। এই নাটক ১২৯৯ সালে নব প্রতিষ্ঠিত মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

Scene I A Desert Place
Thunder and Lightning. Enter three Witches.

প্রথম দৃশ্য ঃ মরুভূমি—বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ চমক (তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ)

First Witch—Where shall we three meet again
In thunder, lightning, or in rain ?
Second Witch—When the hurlyburly's done
When the battle's lost and won.
Third Witch—That will be ere the set of sun.

১ম ডাকিনী—দিদি লো বল্‌না আবার
মিলব কবে তিন বোনে ?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর
কড় কড়াকত্ কড়াৎ কড়াৎ
ডাকবে যখন ঝন্‌ঝনে ?

২য় ডাকিনী—যখন বাধবে মাতবে, হারবে
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রণরণে

৩য় ডাকিনী—চিকি চিকি ঝিকি মিকি
ডুবু ডুবু হ'বে চাকি
লড়াই কি আর থাকবে বাকী ?

First Witch—Where the place ?
Second Witch—Upon the heath.
Third Witch—There to meet with Macbeth.

১ম—কোন্‌খানে বোন কোন্‌খানে
ঠিকঠাক বলে দেলো যেতে হবে কোন্‌খানে ?

২য়—চষণো রাঁড়ীর মাঠে যাব

৩য়—ম্যাকবেথেরে দেখা দেবো ঘাপটি মেরে এককোণে

A sailor's wife had chestnuts in her lap
And she munch'd and munch'd and munch'd

এলো চুলে মালার মেয়ে ব'সে উদোম গায়
ভোর কোঁচড়ে ছে'চা বাদাম চাকুম চুকুম্ খায়।

Canst thou not minister to a mind diseased
Pluck from the memory a rooted sorrow ;

Raze out the written troubles of the brain
And, with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bossom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart ?

পার নাকি মনোব্যাধি করিতে মোচন
স্মৃতি হ'তে উত্থারিতে নহে কি হে তুমি
দুরন্ত সন্তাপ বদ্ধমূল ?
অগ্নিবর্ণে—থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে
লেখা অনুতাপ লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায় ?
অন্তর সরল যার প্রবল পীড়নে !
ব্যথিত হৃদয়াগার—
বিস্মৃতি অমৃতবারি করি দান
ধৌত কর—পারো যদি—।

Doctor—There in the patient must minister to himself.

ডাক্তার—এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভিষক্

জাতীয়তার মূলমন্ত্র যে স্বার্থত্যাগ, তাহা তিনি তাঁহার বহু নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার 'চণ্ড' নাটক হইতে কয়েক লাইন উল্লিখিত হইলঃ

অন্তরের গূঢ়স্থান কর অন্বেষণ
মন। পশি' অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কোথা স্বার্থ লুক্কায়িত। উচ্চ-আশ
উন্নতি প্রয়াস, আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশ-বৎসল ভাব ? আধিপত্য লিপ্সা
কিম্বা চিতোরের হিতে চালিত অন্তর ?
সত্যতত্ত্ব কর নিরূপণ। দেখ মন,
স্বার্থশূন্য নহে কি অন্তর তব ?

সংস্কৃত ভাষার প্রতি গিরিশচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং বঙ্গভাষার সেই জন্য কোন দৈন্য হইবে না বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি একস্থানে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"দেব ভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার
কোন ভাষে বাক্যে ভাবে হেন সংযোজন।
মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমলে কলি
কোন ভাবে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে,
কালের করাল হাসি, দলকে দামিনী রাশি
নিবিড় জলদ জাল ঢাকে বা অম্বরে।"

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' সহজ অমৃতাক্ষর ছন্দের কয়েক লাইন দেখিয়া তিনিই প্রথম নাটকের মধ্যে উক্ত ছন্দ প্রচলন করেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

গিরিশচন্দ্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যাঁর কবিতায় ধর্ম নাই প্রাণ নাই, সে কবি অধিক দিন বাঁচে না! মহাকবি বলি কাকে? যাঁর কবিতায়, গানে, রচনায়, ধর্ম আছে, জাতীয়তা আছে, জাতির বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাকেই বলি মহাকবি। আমি আমার 'নারায়ণ' পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এইভাব বিশেষরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আবার ভারত-চন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা জাগিয়া উঠে, আবার মলিন হইয়া গিরিশ ঘোষে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। গিরিশবাবুর কবিতায়, নাটকে ও গানে আমরা জাতীয়তা পাই, আর ধর্ম ও জাতীয়তার দিকে প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া পাই।

ইউরোপীয় শিক্ষার আদর্শে আমার আস্থা নাই। কলা কলাই ইহার অপর উদ্দেশ্য নাই এই যাহাদের অভিমত—তাঁহারা ঘোর জড়বাদী; ভারতবর্ষের কালচার সম্বন্ধে তাহাদের বলিবার অধিকার নাই। ধর্ম ও জীবন অচ্ছেদ্য—যিনি একের সহিত অপরের পার্থক্য করেন, তিনি উভয় দিকেই হারাইয়া ফেলেন। এই বৈশিষ্ট্যেই গিরিশচন্দ্রকে যশের অন্বেষণে ইউরোপ, আমেরিকা বা সমুদ্রের পরপারে যাইতে হয় নাই। তিনি দেশবাসীর যথার্থ পরিচয় পাইয়া দেশীয়ভাবে, খাঁটি দেশের ভাষায়—বাঙলা দেশে বসিয়াই দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন। এই জন্যই গিরিশ মহাকবি—দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বেশী দেরী নাই, এমন দিন আসিবে যখন পাশ্চাত্য জাতি এই বাঙলায় আসিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় আমাদের ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য ও নাটক আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিবে। তখনই তাহারা গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় পাইবে—বুঝিতে পারিবে, তিনি কত বড়।

গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষরকে ঢালিয়া এক নূতন ছন্দ সৃষ্টি করেন; সেই ছন্দ এখন তাঁহারই নামানুসারে **'গৈরিশ ছন্দ'** বলিয়া পরিচিত। তিনি এই ছন্দের স্রষ্ঠা বা প্রবর্তক না হইলেও তিনি ইহার আমূল সংস্কার না করিলে বাঙলা নাটকে কখনই ইহার প্রয়োগ হইত না। নাটকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন 'দানব বিজয়' নাটকে **যাত্রাওয়ালা ব্রজমোহন রায়** এবং হুগলী জেলার অন্যতম **নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র**। রাজকৃষ্ণ রায়ও তাঁহার কাব্যে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে এই ভাষার যে সংস্কার হইল, তাহাতে এই ছন্দ একেবারে নূতন রূপ ধারণ করিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেন যে, গিরিশ-চন্দ্রের দ্বারাই নাটকে এবং অভিনয়ে এই ছন্দের সার্থক ব্যবহার হইয়াছিল এবং গিরিশ-চন্দ্রের এই কৃতিত্ব সমসাময়িক নাট্যকারগণের দ্বারা অনুকৃত হইতে মোটেই বিলম্ব হয় নাই।

শ্রীমধুসূদন বাঙলা নাট্যসাহিত্যের প্রকাশের দৈন্য দূর করিবার জন্য যে অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যৎ নাট্যকারের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছিলেন, কারণ বাঙ্গালী অভিনেতা ও শ্রোতার কান তখন অমিত্রাক্ষরের জন্য প্রস্তুত ছিল না, গিরিশচন্দ্রের হাতে সংস্কার লাভ

করিয়া সেই ছন্দ নাট্যোপযোগী হইয়া এত সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে যে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পূর্বগামীদের ব্যবহৃত ছন্দের আলোচনা করিলে তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমধুসূদন আশা করিয়াছিলেন I should like very much to see Blank-verse gradually introduced in our dramatic literature, বলা বাহুল্য মধুসূদনের আশা নাট্যসম্রাট সফল করিয়াছিলেন।

হুগলীর অন্যতম সুসন্তান মোহিতলাল মজুমদার "কবি শ্রীমধুসূদন" গ্রন্থে গিরিশ-চন্দ্রের ছন্দকে "মিলহীন ছড়ার মত" doggerel (?) বলিয়া যে শ্রদ্ধাহীন উক্তি করিয়াছেন, উহা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

এই সময় নাট্যসাহিত্যে কোন্নগরের **অতুলকৃষ্ণ মিত্র** বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। গীতিনাট্যকার হিসাবে অতুলকৃষ্ণ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। "নন্দ-বিদায়" নামক দৃশ্যকাব্য তাঁহাকে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। "আর ত ব্রজে যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়" গানটি তৎকালে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে গীত হইত। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "স্বৈতসঙ্গীত রচনায় তাঁহার জোড়া ছিল না। আর এই জন্যই তাঁহার রচিত সঙ্গীত আজও রঙ্গমঞ্চে জীবিত।" তাঁহার রচিত ৪০ খানি পুস্তক আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল ও দেবী চৌধুরানী তিনি নাটকান্তরিত করেন।

ব্রজমোহন রায় **'দানব বিজয়'** নাটকে যে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া হইল ঃ

এ রণ-সাগরে
কাণ্ডারী যখন তুমি জগৎ-জননী,
তখন কি আর ভয় মাগো?
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
ভয়-নিবারণী যবে দিলেন অভয়,
তখন কি ডরি আর সামান্য দানবে?

বাঙ্গলাদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের উৎকৃষ্ট ফল কৈকালার **চন্দ্রনাথ বসু**। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে তিনি বাঙ্গালীর আদর্শ স্থানীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা অতি উচ্চস্তরের ছিল। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি গভীর ভাবের দ্যোতক এবং ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্য পাঠকের চিত্তাকর্ষক ছিল। রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। ত্রিধারা, পৃথিবীর সুখদুঃখ সাবিত্রীতত্ত্ব বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃতি কঃপন্থা প্রভৃতি পুস্তকাবলী বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার আসন চির-স্থায়ী করিয়াছে। ১৮৪৪ খৃঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

এইবার বর্তমান যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কল্পস্রষ্টা ও কথাশিল্পী **ডক্টর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের** আবির্ভাবে উপন্যাস-সাহিত্যে গতিবেগের যে নবধারা প্রবাহিত হয় তাহাই আলোচ্য। হুগলী

জেলার সাহিত্যের ধারা বজায় রাখিয়া তিনি বর্তমান শতাব্দীতে বঙ্গ সাহিত্যের উদয় শিখরে স্বীয় কিরণজ্যোতি বিকিরণ করিয়া হুগলী জেলাকে ধন্য ও পবিত্র করিয়াছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পর তাহার ন্যায় শক্তিমান লেখক বঙ্গসাহিত্যে যে, আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। অবশ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা ধরিব না—কারণ তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি এবং তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী। বঙ্গ-ভাষাকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিবার জন্য যা কিছু কৃতিত্ব তা সমস্তই যে বিশ্বকবির প্রাপ্য, তাহা আজ আর কে অস্বীকার করিবে? তিনি উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রতিভার ছাপ মারিলেও উপন্যাসের পরিধি ও প্রসার বিশেষ বৃদ্ধি করেন নাই।

শরৎচন্দ্র বাঙ্গলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বাঙ্গালী পাঠকের ব্যাপকতর পরিধি তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল আবর্তিত হইয়াছে। পুরাতন নীতির বন্ধন ভাঙ্গিবার জন্য নীতিবিরোধিতায় অভিযোগে তিনি ধিকৃত হইলেও, মানুষ বড় না নীতি বড় এই প্রশ্ন তিনি বার বার তাঁহার উপন্যাসে উচ্চারণ করিয়াছেন। জনপ্রিয়তা অবশ্য সাহিত্যের উৎকর্ষের মানদন্ড নয়। বিদ্রোহের অগ্রনায়ক বলিয়া তাঁহার উপর প্রশংসাবাণী বর্ষিত না হইলেও তাঁহার আবেগপ্রবণ রচনায় বঙ্গবাসী মুগ্ধ হইয়াছে। আবেগের সংহত রূপদানে তাঁহার ন্যায় শিল্পী খুব অল্পই দেখা যায়। নিজের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ না করিয়া, অন্যের আবেগ জাগাইয়া তোলায়ই সহিত্যের সার্থকতা। তিনি এই শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জনপ্রিয়তা সর্বাধিক হইয়াছিল।

তিনি ছিলেন পারিবারিক জীবনের রূপকার। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি দক্ষ শিল্পীর মত নিপুণভাবে কাজে লাগাইয়াছিলেন বলিয়া পরিবাররসের আবেদন জাগাইয়া তুলিতে তিনি সমর্থ হন। বাঙ্গলাদেশের গ্রাম্য সমাজের নানা কদাচার, সমাজপতিগণের অন্যায় স্বার্থপরতা, জমিদারশ্রেণীর অত্যাচার ও শোষণকে শরৎচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহার গল্প ও উপন্যাসে প্রকাশ করিয়াছেন।

'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য যে স্রোতহীন, শুষ্কপ্রায় খাতের মধ্য দিয়া অলস-মন্থর গতিতে উদ্দেশ্য-হীনভাবে চলিতেছিল, তিনি সেখানে বহিঃসমুদ্রের স্রোত বহাইয়া তাহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিয়াছেন, নূতন ভাবের উত্তেজনায় তাহার মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি কবিত্বশক্তির অধিকারী না হইয়াও কেবলমাত্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, চিন্তাশীলতা ও করুণ-রস সৃজনে সিদ্ধহস্ততার গুণে বঙ্গ-সমাজের কঠিন, অনুর্বর মৃত্তিকা হইতে নূতন রসের উৎস বাহির করিয়াছেন ও উপন্যাসের ভবিষ্যৎ গতির পথরেখা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের পারিবারিক জীবনে অকিঞ্চিৎকর বাহ্য ঘটনার মধ্যে গূঢ়ভাবের লীলা দেখাইয়াছেন; আমাদের নারী-চরিত্রের জড়তা ও নির্জীবতা ঘুচাইয়া তাহার দৃপ্ত তেজস্বিতা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া একসঙ্গে স্বাধীন চিন্তা ও করুণ রসের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, এই আত্মপীড়ননিরত জাতির ভগবদ্দত্ত দুঃখ যে নিজ মূঢ়তায় কত বাড়িয়াছে

তাহা দেখাইয়াছেন। সর্বশেষে তিনি প্রেম বিশ্লেষণের দ্বারা প্রেমের রহস্যময় গতি ও প্রকৃতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

শরৎ সাহিত্যে দুর্নীতি ও অশ্লীলতা আছে বলিয়া একদল লোক শরৎ সাহিত্য আজও বিশেষ পছন্দ করেন না; কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। শরৎচন্দ্রের পর নবীন সাহিত্যিকগণ বর্তমানে যে ভাবে নগ্নভাবে অশ্লীল রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে কলুষিত করিতেছেন, তাহাদের তুলনায় শরৎচন্দ্র যে কত সংযত ছিলেন, তাহাই আজ আমাদের যাচাই করিবার সময় আসিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের উত্তরে তিনি স্বয়ং এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই শরৎচন্দ্রের বক্তব্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

"আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না। অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জনীয়; ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই; তাঁহার সেই নির্ভিক কর্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্য সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি ত সে তাহার মর্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই।"

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বঙ্গভাষার সম্পদ; নানা ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়াছে। থিয়েটার ও সিনেমায় তাঁহার গল্প ও উপন্যাসগুলি প্রায় সমস্তই রূপান্তরিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহার রচনার পাঠকের সংখ্যা বঙ্গদেশে সর্বাধিক বলিলে বোধ হয় বেশী বলা হইবে না। সুতরাং তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা না দিয়া কেবল তাঁহার প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'বড়দিদি' ও শেষ অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' এই দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিলাম। তাঁহার শেষ অবদান তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তির রশ্মিজালমণ্ডিত।

উপন্যাস-সাহিত্যে **চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের** নাম নূতন পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রবর্তনের জন্য উল্লেখ্য। আবেগপূর্ণ সরস বর্ণনা ও রসানুভূতির জন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'চোর কাঁটা' 'ভিখারিণী' 'দোটানা' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে বৈদেশিক উপন্যাসের ছায়াপাত হইলেও ঘটনাবিন্যাসে তিনি অতি সুকৌশলে বাঙ্গালী জীবনের সহিত উহাদের এমন সুন্দরভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন যে, উহার মধ্যে বৈদেশিক গন্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার হেরফের, হাইফেন, মন না মতি প্রভৃতি উপন্যাস রস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ইহা ছাড়া রবিরশ্মি ও পঞ্চদশী, বরণ-ডালা প্রভৃতি ছোট গল্প রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনক

বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই সাহিত্যব্রতী। সাহিত্য-সমালোচনায় কনকবাবুর খ্যাতি আছে।

স্ত্রী-ঔপন্যাসিকদের মধ্যে **সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর** নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক যুগ হইতে আমাদের মনে যে ভাবের ঝংকার হইতেছে লেখিকা সেই চিরপরিচিত সুরটি তাঁহার **"মা"** উপন্যাসে জাগাইয়া বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই জনপ্রিয় উপন্যাস সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—'মা' নামে এমন একটি মন্ত্রশক্তি নিহিত আছে, যাহার প্রভাব কেবলমাত্র আমাদের সাহিত্যরস-বোধের রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। মা যে কেবল আমাদের সাহিত্য জীবনের কেন্দ্র কেবল যে তাহার সমস্ত স্নেহ-মমতা ভক্তিধারার উৎস ও প্রতীক তাহা নহে। আমাদের ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরাধনায় সমস্ত অতীন্দ্রিয় মহিমা তাহাকে নিজ জ্যোতির্মণ্ডলবেষ্টিত করিয়াছে। এই নামের ডাকে আমাদের সমস্ত সুকুমার অনুভবশক্তি, সমস্ত অন্তর্নিহিত করুণা—সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে।

তাঁহার মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, পথহারা, গরীবের মেয়ে প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বলা যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষায় তাঁহার পৌত্রী অনুরূপা দেবী আমাদের অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস যে অস্থিমজ্জাগত এই ধর্ম-বিশ্বাস মন্ত্রশক্তিতে খুব সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। নিরুপমা ও অনুরূপা দেবী বাঙ্গলা উপন্যাসক্ষেত্রে যে বিশেষ দিকের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যান্য মহিলা ঔপন্যাসিকগণ সেই পথ এখন অনুসরণ করিতেছেন। স্ত্রী-ঔপন্যাসিক রূপে অনুরূপা দেবীর বড়দি **ইন্দিরা দেবীর** নামও বঙ্গ-সাহিত্যে স্মরণযোগ্য। মহিলা কবিগণের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গুড়ুপের **প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের** একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনযাত্রার আমরা সন্ধান পাই তাহার লঘু, তরল প্রবাহ, সরল নির্দোষ হাস্য-পরিহাস ও সমস্যা-ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দগতি পাঠককে মুগ্ধ করে। উপন্যাস ও ছোট গল্প এই দুই রকম লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্প রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব সর্বাধিক।

প্রভাতকুমারের নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদ্বীপ ও সিন্দুর কৌটা ঘটনার-বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহার চরিত্র-মাধুর্য আমাদের মনে গভীরতর রেখাপাত করে। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'রমাসুন্দরী ১৩১৪ সালে প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

ছোট গল্প রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এ-সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করি ঃ

আমাদের সংকীর্ণ বাঙ্গালী জীবনে বৃহৎ উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পের স্বাভাবিকতা ও উপযোগিতা সহজেই লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমাদের জীবনে সমস্যা এত সুদূরপ্রসারী হয় না। যাহাতে তাহাদের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রয়োজন হয়। আমাদের জীবনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঢেউ লাগে, যে ছোটখাটো সমস্যার স্পর্শে ইহা হিল্লোলিত হয়, আশা ও কল্পনা, উচ্চাভিলাষ ও কর্মশক্তি যে ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া তোলে। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বৈষম্য হাস্যরসের সৃষ্টি করে—তাহার সমস্ত বুদবুদ

ও উত্তেজনা ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পেয়ালায় বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুশোভনভাবে ধরিয়া রাখা যায়। এই ছোট গল্পের আর্টে প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক নিপুণতা বিস্ময়কর। তাঁহার অগভীর আলোচনা-প্রবণতাও ছোট গল্পের উৎকর্ষলাভে সহায়তা করিয়াছে।

গভীর আলোচনায় ও আত্যন্তিক দুঃখবাদচর্চায় ক্লান্ত বঙ্গসাহিত্য তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকরস ও ঘটনা বৈচিত্রের জন্য কৌতুহলোদ্দীপক রচনাকে সাদরে নিজ স্থায়ী সম্পদরূপে বরণ করিয়া লইবে। ছোট গল্প রচনায় বঙ্গসাহিত্যে এককথায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নেই প্রভাতকুমারের স্থান।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাঁহার নিকট হইতে কাব্যসাধনার মূলমন্ত্রটি গ্রহণ করেন, তিনি হইতেছেন হুগলীর প্রসিদ্ধ কবি **বিহারীলাল চক্রবর্তী**। বিহারীলাল সর্বপ্রথম বাঙ্গলা-সাহিত্যে রোমান্টিক গীতিকাব্যের ধারা প্রবর্তন করেন। এই নবধারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহু বিশালতা ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গময় মহানদীতে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমায় শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন, শক্তিশালী সাধক যেমন গুরুদত্ত, স্বল্পাক্ষর অচেতন বীজমন্ত্রকে একাগ্র সাধনায় জাগ্রত করে, সাধনার স্তরে স্তরে বহু রহস্য, বহু অপূর্ব অনুভূতি, বহু বিস্ময়কর চেতনা লাভ করে, তারপর সেই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া অত্যাশ্চর্য বিভূতিলাভে জগৎকে স্তম্ভিত করে। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বিহারীলালের মন্ত্রটি গ্রহণ করিয়া—আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে দীক্ষিত হইয়া আপন তপস্যা দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা বহু বিচিত্র রহস্যানুলাভে অত্যাশ্চর্য বিভূতির ইন্দ্রজালমণ্ডিত কাব্যসৃষ্টি করিয়া জগৎকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়াছেন।

বিহারীলালের এই রোমান্টিক-মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গী বাঙ্গলা সাহিত্যে একেবারে নূতন।

বর্তমানে অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিজীবন বিশ্লেষণের সঙ্গে পৃথিবীর জটিল চিন্তাধারা আলোচনায় রত থাকেন, হুগলী জেলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক **অন্নদাশঙ্কর রায়** তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে বলেন যে, অন্নদাশঙ্করের মননশক্তি অতি তীক্ষ্ন ও সক্রিয়। অতি সহজ, সরল কথায়, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া তিনি দুরূহ আলোচনার মর্মভেদ করিতে পারেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'অসমাপিকা' বাহির হয়। তাহার পর আগুন নিয়ে খেলার শেষাংশরূপে পুতুল নিয়ে খেলা প্রকাশিত হয়। ইহার পর ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্য' মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও বিশালতার জন্য বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

চাতরার **শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়** সমস্যা-প্রধান রচনা ও সাহিত্যিক আলোচনার জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার গল্পসমষ্টি 'রিয়ালিষ্ট' ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত ও মোহনা নামক উপন্যাসে মৌলিকতার পরিচয় দিয়া তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

চাতরার **শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** বঙ্গসাহিত্যে বর্তমানে হাস্যরসিক লেখকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার

রানুর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ ও রানুর কথামালা এই হাস্যরসমূলক গল্প-সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হইবার পর তিনি একজন শক্তিশালী লেখক বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার রচনায় কাব্যধর্মের উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ম চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে 'প্রবাসী'র গল্প প্রতিযোগিতায় তাঁহার প্রথম লেখা "অবিচার" পুরস্কার লাভ করে। তাঁহার অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে "নীলাঙ্গুরীয়" সর্বাধিক প্রচারিত; কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম সৃষ্টি "স্বর্গাদপি গরীয়সী"। বস্তুতঃ 'মা'এর সম্বন্ধে এমন স্নেহ মধুর উপন্যাস আজ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে রচিত হয় নাই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁহার মন্তব্য ও গল্প বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে একটি সহজ আতিশয্য-বর্জিত রসিকতার সুর সর্বত্র পরিস্ফুট। প্রতিবেশ রচনা ও বিশেষ রকমের ভাব ফুটাইয়া তোলা বিষয়েও তাঁহার নৈপুণ্য অসাধারণ।

॥ মহিলা কবি ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্গসাহিত্যের গৌরবময় যুগ। হুগলী জেলা হইতেই এই গৌরবময় যুগের উদ্বোধন হয়। সেই শুভ অভ্যুদয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে এক নূতন ভাব বিকশিত হয়। সেই যুগের প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে মহিলাদের যথেষ্ট দান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেকালের লোকের ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাচর্চা করিলে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবে। সেই অন্ধবিশ্বাসের যুগে মহিলারা নির্যাতনের ভয়ে গোপনে সাহিত্যসাধনা করিতেন বলিয়া তাঁহাদের নাম চিরদিনের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যায়। সামাজিক গ্লানি সহ্য করিয়াও হুগলী জেলার যে সকল বরেণ্যা মহিলা কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর নাম অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত ছিল। সিঙ্গুরের নিকট দলুইগাছা গ্রামের নৃত্যগোপাল সরকার ইঁহার পিতা। মাতুলালয় পালাড়া (ভদ্রেশ্বরের নিকট) গ্রামে ইনি ১২৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের চেষ্টায় অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও নগেন্দ্রবালা বাঙ্গলা, উড়িয়া, সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর সুখাড়িয়া গ্রামের মিত্র মুস্তাফী বংশের খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই সময় বিভিন্ন মাসিক পত্রে তাঁহার রচিত গদ্য ও পদ্য প্রায়ই প্রকাশিত হইত। বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত 'পূর্ণিমা' মাসিকপত্রে তাঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়।

'মর্মগাথা' খণ্ড কবিতার সমষ্টি ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হয়, ইহাতে অতি সহজ ও সরল ভাষায় পঞ্চান্নটি কবিতা লিখিত আছে। লেখিকার 'প্রেমগাথা'র কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া 'হেয়ার প্রাইজ এসে ফণ্ডের' অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। তাঁহার সুলিখিত কবিতা পাঠে মুগ্ধ হইয়া ১৩০৬ সালে তাহাকে "সরস্বতী" উপাধি দেওয়া হয়*। সতী নামে

*মর্মগাথা ও প্রেমগাথা প্রকাশিত হইবার পর পূর্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন তাঁহাকে ১৩০৬ সালে "সরস্বতী" উপাধি দেন।

একখানি সামাজিক উপন্যাস ব্যতীত তাঁহার দশখানি কাব্য গ্রন্থ আছে। লেখিকার **'অমিয় গাথা'** ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি প্রকৃত সৌন্দর্য, প্রেম সৌন্দর্য ও চিন্ময় সৌন্দর্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। ইহার ভূমিকায় লিখিত আছে "ইনি যেমন সুগৃহিণী সেইরূপ সুপাচিকা, সীবনকুশলা এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বাভিজ্ঞা। অতিথি পরিচর্যা, আতুর সেবা এবং দীনে দয়া ইহার যেন স্বভাবগত।

১৩১৩ সালে নগেন্দ্রবালা পরলোকগমন করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় নিম্নের 'সাধ' নামক কবিতার চার পঙ্‌ক্তি হইতে পাওয়া যাইবে। কবিতাটিতে লেখিকার বিশ্বজনীন ভাবের প্রকাশ আছে। বার বৎসর বয়স হইতে তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি সাহিত্য-সেবায় অনুরাগিণী হন।

বড় সাধ হয় মনে মানবের ব্যথা রাশি
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পাতি লব আমি দিবানিশি।
বড় সাধ হয় মনে হ'য়ে আমি অশ্রুজল,
সখাসম ব্যথিতের সাথে র'ব অবিরল।

মোক্ষদা দেবী কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডবলিউ, সি ব্যানার্জীর (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ভগ্নী। তাঁহার পুরা নাম মোক্ষদায়িণী মুখোপাধ্যায়। তাঁহার রচিত 'বন-প্রসূন' কাব্য গ্রন্থে 'বাঙ্গালীর বাবু' নামক প্যারডি বা ব্যঙ্গ-কবিতা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালীর মেয়ে"র পাল্টা জবাব হিসাবে তিনি মেয়েদের তরফ হইতে দিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল যে, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শর সন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালীর পুরুষ লেখকদের মধ্যে এমন শূরবীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্য-বীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর-ধৃতাস্ত্র।

মোক্ষদা দেবী বিরচিত এই কবিতা সেকালে খুব কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল ও লেখিকার সাহসিকতার জন্য সুধীসমাজ তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম বন-প্রসূন (১৮৮২), সফলস্বপ্ন (১৮৮৪) ও কল্যাণ প্রদীপ (১৯২৮) সফল-স্বপ্ন একখানি ইতিহাসমূলক উপন্যাস এবং কল্যাণ প্রদীপ লেখিকার পৌত্র ক্যাপ্টেন ডাক্তার কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় যিনি তুরস্ক বৃটিশ যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহার জীবনী। মোক্ষদায়িনী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচনার নিদর্শন স্বরূপ **'বাঙ্গালীর বাবু'** হইতে কয়েক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

হায় হায় ঐ যায় বাঙ্গালীর বাবু।
দশটা হতে চারটাবধি দাস্যবৃত্তি করা
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।

উকীল, ডেপুটি কেহ, কেহ বা মাষ্টার,
সব্‌জজ কেরাণী কেহ, ওভারসিয়ার,
বড় কর্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারাদিন খেটে খেটে রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।

গুপ্তিপাড়ার শ্যামাচরণ সেনের কন্যা **ফুলকুমারী গুপ্ত** 'সৃষ্টিরহস্য' নামক পুস্তকে দুর্বোধ্য দর্শন-শাস্ত্র এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেন যে, তৎকালীন পন্ডিতবর্গ বঙ্গমহিলার পক্ষে ইহা এক বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করেন। এই পুস্তকে দর্শনশাস্ত্রের গভীর তত্ত্বের মর্মার্থ তিনি যেরূপ বিশদভাবে ব্যক্ত করেন তাহা দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ বলেন যে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কীর্তিভূত ভারতবর্ষে এইরূপ বিদুষী গ্রন্থরচয়িত্রীর জন্ম অসম্ভব না হইলেও ইহাঁর দ্বারা জন্মভূমি যে বিশেষ গৌরবান্বিত হইবেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ পরলোকগমন করেন।

ফুলকুমারীর **"অবসর"** নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে। ইহাতে লেখিকা স্বদেশীয়তার যে সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন যে, গৃহস্থালীর নানা কার্যে অষ্টপ্রহর ব্যাপৃত থাকিয়াও যে তিনি এমন সুন্দর পদ্যরচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমার বড়ই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। বর্ধমানের মহারাজ বাহাদুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ কৃষ্ণকিশোর গুপ্তের পৌত্র উত্তরভারতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীশচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার রচনার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইলঃ

পেরেছিস্‌ শিখিতে কি একতা বন্ধন,
ইংরাজ জাতির যাহা গৌরবের ধন,
ব্রিটীশ নন্দন যারে
আদরে হৃদয়ে ধরে
জলে স্থলে পাতিয়াছে নবীন কেতন,
সেই ধন পারিলি কি করিতে অর্জন?

চুঁচুড়ার মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা **ইন্দিরা দেবীর** নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। 'স্পর্শমণি' বাহির হইবার পরই সাহিত্যজগতে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার ভগিনী অনুরূপা দেবীর নামও মহিলা সাহিত্যিকগণের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য। হুগলীর প্রসিদ্ধ সরকারী উকিল শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মাত্র দশ বৎসর বয়সে ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অপূর্ব কবিত্ব শক্তির স্বাভাবিক উন্মেষ দেখা যায়। সংসারের সমুদয় কাজ করিয়া এই মহীয়সী

মহিলা রন্ধনশালার কোণে বসিয়া সাহিত্যসেবা করিতেন। দারিদ্র্যের ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি সাহিত্যচর্চা করেন তাহা আদর্শস্থানীয় বলা যায়। তাহার গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা দশখানি এবং "গীতিগাথা" হইতেছে তাঁহার কবিতা সংগ্রহ। সংসার, সমাজ, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং নির্ভরতাই এই কাব্যের লক্ষ্য।

১৩২৯ সালে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইন্দিরা দেবীর আসল নাম ছিল সুরূপা, কিন্তু রক্ষণশীল পরিবারের বধূ বলিয়া তিনি "ইন্দিরা দেবী" এই নাম দিয়া গোপনে সাহিত্য চর্চা করিতেন। তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, তাঁহার শ্বাশুড়ী জানিতে পারিয়াছিলেন যে সুলেখিকা ইন্দিরা দেবী তাঁহারই পুত্রবধূ। নম্র ও মধুর স্বভাব এবং আত্মগোপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টার জন্য জীবিতকালে তিনি লোকলোচনের অন্তরালে ছিলেন। কথাসাহিত্যে ও কাব্যসাহিত্যে ইন্দিরা দেবী আজ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য রচনার নিদর্শন এই স্থানে উল্লিখিত হইলঃ

এ সংসার রঙ্গভূমে নিত্য চলে অভিনয়!
আজ যারা প্রতিবেশী—কাল তা'রা কেহ নয়।
এ জগতে তৃপ্তি নাই, এ জগতে শান্তি নাই,
এসো, তবে এসো মৃত্যু, এসো বন্ধু, এসো ভাই,
সুখেতে জন্মেছে শ্রান্তি—দুঃখেতে দারুণ ক্লান্তি—
এখন নীরবে শুধু একান্তে ঘুমাতে চাই,
হে চির-সুহৃদ, আজি তোমারে ডেকেছি তাই।

বলাগড় থানার অন্তর্গত বাক্সাগড় গ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক দেবেন্দ্রবিজয় বসুর কন্যা **নলিনীবালা ঘোষ** ১২৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৪ সালে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেবেন্দ্রবিজয়কে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে দীনবন্ধু মিত্রের একমাত্র কন্যা তমালিনীর সহিত দেবেন্দ্রের বিবাহ হয়। নলিনীবালা তাঁহাদের প্রথম সন্তান। তিনি ছিলেন যেমন সুরূপা তেমনই মনীষায় ভাস্বর। বাল্যে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া তাহার বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। দশ বৎসর বয়স হইতে তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত অগণিত কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গমাতার সেবা করেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত জয়পুর বাগুটিয়া গ্রামের সতীশচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার তের বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা ও মাতুলগণ **নলিনী-গাথা** নাম দিয়া ১৩৪৫ সালে তাঁহার কবিতাগুলি চয়ন করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে তাহার মনের সম্প্রসারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নলিনীবালার অধিকাংশ কবিতাই ধর্মমূলক। কয়েকটি কবিতায় সেকালের সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার **"ভারতমাতা"** নামক একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হইলঃ

এলায়ে কুন্তল রাশি অধরেতে আধ হাসি
রূপের বিজলি হেরে হাসিছে ধরণী,

কমনীয় কান্তি ছটা মরি কি রূপের ঘটা
আনন্দে নাচিগো দেখে ও রূপের মোহিনী।
কিরণ বসন গায় মরি কিবা শোভা পায়
দাঁড়ায়ে ঐ যে মাতা ভারত-জননী;
সিন্দুরের বিন্দু ভালে কমনীয় শোভা খেলে
ঝলসিছে জননীর কিবা তনুখানি!

হুগলীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের কন্যা **সরযূবালা সেনের** নাম অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যান এবং তথা হইতে গ্রোবিল ইনষ্টিটিউশন হইতে শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

পিতার শিক্ষা ও আদর্শে তাঁহার জীবন গড়িয়া উঠে। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বসন্ত প্রয়ান' প্রকাশিত হইলে বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া লেখিকাকে সকলে অভিনন্দিত করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দেন। ইহা ছাড়া তাঁহার দোবোত্তর, ত্রিবেণী-সঙ্গম, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি আরো কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার **অন্নপূর্ণা** নামক একাঙ্ক নাটিকা হইতে **'কোমর বেঁধে চল'** নামে একটি যুগোপযোগী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইলঃ

আজ খুঁড়বো মাটি তুলবো সোনা,
শুনবো না আর কারো মানা,
চষ্‌লে মাটি ফলবে দানা,
এ যে অন্নপূর্ণার কল।
তবে ভাবনা কিসের বল,
চলরে সবাই চল।
কোটি কোমর বেঁধে চল।
মাটিতে আছে সোনার খনি,
বাহুতে আছে বল।
তবে ভাবনা কিসের বল্‌
চলরে সবাই চল,
কোটি কোমর বেঁধে চল।

শ্রীরামপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা **শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর** "মায়ের দান" একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক মাস পরে তাঁহার স্বামী বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে গমন করেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় দেশের সেবা করিবার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে মুরারীপুকুর বোমার মামলায়

রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে গমন করেন এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসেন। সুতরাং গিরিবালা দেবীর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। তিনি অতি কষ্টে তাঁহার মাতার নিকট অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি যে সব কবিতা রচনা করেন তাহার কয়েকটি মাত্র 'মায়ের দানে' সংরক্ষিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখিকা গিরিবালা দেবী সম্বন্ধে এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে. ১৯০৮ সালের পর বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল এই বইখানি তাহারই এক অঙ্গ। আলিপুরের বোমার মামলায় পড়িয়া আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত হৃষিকেশ ত' বেদান্তের বচন আওড়াইতে আওড়াইতে শ্রীধাম আন্দামান যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহার আঁধার গৃহে সাঁঝের বাতি জ্বালাইবার জন্য রাখিয়া গেলেন সপ্তদশ বর্ষীয়া গৃহিণী আর এক বৎসরের শিশু পুত্র। সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল তাহাদের কেমন করিয়া দিন কাটিল, তাহা সেই অন্তর্যামী জানেন যাঁহার বুকে সব ব্যথার কথা ইতিহাসেই লেখা থাকে। দশ বৎসর পর যখন পণ্ডিতজী ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন গৃহকোণের দীপশিখা একবার দপ দপ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার পর এ জন্মের মত নিভিয়া গেল। দুঃখের বোঝা যাঁহার মাথায় সহিয়াছিল. সুখ তাঁহার সহিল না; শূন্য গৃহের মধ্যে স্বামী পুত্রকে রাখিয়া তিনি ব্যাধি জর্জরিত দেহভার ফেলিয়া দিয়া দুঃখের হাত হইতে এড়াইলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গিরিবালা দেহরক্ষা করেন। তিনি গ্রন্থের এক স্থানে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন "অব্যক্ত নিবিড় দুঃখ সম্বল আমার. বৎস দুর্বিসহ কঠোর যন্ত্রনা।" তাঁহার রচনার নিদর্শন স্বরূপ **"স্বাধীনতার প্রতি"** নামক একটি কবিতা এই স্থানে উদ্ধৃত হইলঃ

তোমার উজ্জ্বল হস্ত পরশে যাহায়,
সফল জীবন তার. ধন্য সেই জন,
স্বাধীনতে. হে অমৃতে তব মহিমায়
উদ্ভাসিত, আনন্দিত নিখিল ভুবন।
প্রকৃতির স্বরূপ তুমি নিখিল জীবের,
আনন্দের অমৃতের তুমি প্রস্রবন
তুমি উৎস শিল্প বিদ্যা জ্ঞান বিজ্ঞানের
স্বাধীনতা. জগতের তুমিই জীবন।
পূর্ণ হোক্ প্রতি অণু মম শরীরের
তব প্রেমে, পূর্ণ হোক্ হৃদয় আমার
তোমার সঙ্গীতে, দেবী, তন্ত্রী হৃদয়ের
হউক স্পন্দিত সদা হরষে আমার।

সেকালের খ্যাতনামা অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের প্রিয় ছাত্র হুগলী জেলার পাউনান গ্রামের নীলমণি দের কন্যা **সুরবালা ঘোষ** ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩

খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র অতুলচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকাল হইতে গ্রন্থপাঠে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। মধুসূদন, রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি তৎকালীন কবির কবিতাবলী তাঁহার শেষ বয়স পর্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল। তাহার গাথা ও অসংখ্য কবিতা "যমুনা" মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম **মথুরা**। উক্ত গ্রন্থ হইতে একটি কবিতার কয়েক লাইন উল্লিখিত হইলঃ

কে জানে কোথায় যাব, সে স্থান কেমন পাব
কে আছে তথায়?
স্বজন বিরহ দুঃখে ভুলাইয়া নব সুখে
ভরিবে হৃদয়?
বিধুর হৃদয় মোর, আনন্দ অমৃতে ভোর
হবে শান্তিময়?
অবশ্য অবশ্য আছে, সে শান্তি আলয় আছে
নহে সৃষ্টি বৃথা;
কল্পনা করিতে যারে, দর্শন বিজ্ঞান হারে
কহে ইতিকথা।
অধম মানব জ্ঞান, পায় নাই সে সন্ধান
কিন্তু আছে, আছে,
নহিলে এ ধর্মাধর্ম স্নেহ প্রেম কর্মাকর্ম
সব কিগো মিছে?

হুগলী কোর্টের প্রসিদ্ধ মোক্তার বৈদ্যপুরের ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা **বিদ্যুৎলতা দেবী** ১৩০৭ সালে হুগলী শহরের তেওয়ারী পাড়া লেনে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে হোয়েড়ার ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অল্প-বয়সে বিবাহ হওয়ায় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার তাঁহার কোন সুযোগ হয় নাই। সেই-জন্য বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা বাল্যকাল হইতে ধর্মসাধনাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সাধনাকালে ভাবাবেগে তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। এইরূপ ধর্মপ্রাণা মহিলা বর্তমানে বিরল। তাঁহার রচিত কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা নিদর্শন স্বরূপ উল্লিখিত হইল ঃ

তোর ঘর ছাড়া ঐ বাঁশের বাঁশী
আবার বুঝি বাজে
মাখিয়ে দেব ফুলের রেণু
গোষ্ঠে নিয়ে যাবি ধেনু
পাঠিয়ে গোঠে প্রাণ কানু
আমার মন বসে না কাজে।
নিয়ে ধেনু আসে গোপাল
গোধূলিয়া সাঁজে।

যে সমস্ত মহিলা-সাহিত্যিক বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, হুগলী জেলার **আশাপূর্ণা দেবীর** নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আশাপূর্ণা দেবীর পিতার নাম হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। হুগলী জেলার বেগমপুরে তাঁহার নিবাস ছিল। ১৩১৫ সালে আশাপূর্ণার জন্ম হয়। কোন স্কুলে অধ্যয়ন না করিয়া, নিজের প্রখর ধীশক্তি ও অধ্যবসায়ে গৃহশিক্ষায় তিনি বহুদূর অগ্রসর হন। ১৩২৯ সালে 'শিশুসাথী'তে "বাইরের ডাক" নামক একটি কবিতা তাঁহার প্রথম রচনা। তাহার পর অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমানে মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছেন। তাঁহার শশীবাবুর সংসার, পঞ্চমীমহল, বলয়গ্রাস, কনক দীপ, নবজন্ম, অগ্নিপরীক্ষা, ছাড়পত্র, নেপথ্য নায়িকা, নির্জন পৃথিবী, উত্তরলিপি প্রভৃতি উপন্যাস এবং ছোটদের জন্য রচিত রাজা নয় রাণী নয় এবং বলবার মতন নয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা।

জেজুরের মহিলা কবি **আভাদেবী মিত্রের** আমার-কবিতা নামক কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া সাহিত্য-প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আভাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অক্ষয়কুমার ঘোষ। শিশুকাল হইতে ছড়া ও কবিতা মুখস্থ করিবার তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁহার মাতা সরলতা ঘোষের কবি খ্যাতি ছিল; মাতার নিকট হইতে তিনি কবিতা রচনার প্রেরণা পান। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাঁহার অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি একত্রে গ্রথিত করিয়া **"আমার কবিতা"** নামক পুস্তকে প্রকাশ করিবার সময় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে লেখিকার আকস্মিক দেহান্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর লেখিকার কাব্যসংগ্রহ আমার-কবিতা নাম দিয়া ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। **'যুগান্তর'** সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ এইরূপ :

এই পুস্তিকার লেখিকা আভা মিত্র পরলোকগতা হইয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার স্বামী এই পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছেন। স্বামীর ইহা যোগ্য কাজ। লেখিকার কবিতা রচনার শক্তি ছিল, কবিতাগুলির উপর চোখ বুলাইলে, বিশেষতঃ একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ পড়িলে ইহা বুঝা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে লেখিকার এই শক্তি পরিচিত হইবার সুযোগ পাইল না, অতি অল্পবয়সেই তিনি লোকান্তরিতা হইয়াছেন। তাঁহার কবিতা রচনার যে শক্তি ছিল, উহার স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ এই পুস্তিকা তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়বর্গের নিকট নিশ্চয়ই আদরণীয় হইবে। যে ফুল অকালে ঝরিয়া গেল, তাহার গন্ধ বিচ্ছেদের বোঝা বহন করিয়া অক্ষয় হইয়া থাকুক, ইহাই শুধু কামনা করি।

'বঙ্গের মহিলা কবি' নামক গ্রন্থের লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, লেখিকার কয়েকটি কবিতার রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর। সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ-সংকলিত **'সাহিত্য-সেবক মঞ্জুষা'**-তে লেখিকার সম্পর্কে উল্লেখ আছে। 'আমার কবিতা' প্রকাশিত হইবার পরেও লেখিকার অনেক কবিতা অপ্রকাশিত থাকে। তাঁহার পরলোকগমনের পর

এগুলি নানান পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলি সংকলিত করিয়া **'কুণ্ঠিত ফুলগুলি'** নামে লেখিকার আরও একটি কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এবং রসিক-সমাজের স্বীকৃতিলাভে ধন্য হইয়াছে।

'আমার-কবিতা' প্রকাশিত হইলে সর্বত্র উচ্চপ্রশংসা লাভ করে। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক সংবাদ-পত্র **"লিডারে"** এই পুস্তক সম্বন্ধে ৬ই এপ্রিল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্য ঃ

It is, indeed, a delicate task for the reviewer to review the poetry of one who is no more in this world—whose lyrical fancy blossomed only for a while and withered away thereafter. Yet this volume of poetry containing several good lyrics is fairly indicative of what Mrs. Mitra could have accomplished had she been destined to live longer. Her muse had just started seeking expression through the most difficult medium of words ; her lyrical fancy had just seen the first glimmer of joyous creation. Her technical skill could not naturally attain even the minimum amount of perfection ; her imagination too was yet seeking to burst forth from the nebula of mere self-consciousness. Her lines are, therefore, trembling ; her muse just lisping, as it were. She naturally never saw the fulfilment of the genius and the Bengali literature is poorer for her death. (The Sunday Leader, 6th April 1947.)

আভাদেবীর রচনার নিদর্শন হিসাবে অবসর নামক জাপানী কবিতার ছন্দে রচিত অনুবাদ এবং সূর্যের চুম্বন নামক একটি কবিতা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল ঃ

অবসর

আজ নেই কাজ মোটে
যে ফুল উঠেছে ফুটে
গন্ধ তার লব আজি
ভরিব আমার সাজি
তাদেরি স্মৃতিতে শুধু
লয়ে সে যে মধু
প্রজাপতি উড়ে যায়
আজিকের উতলা হাওয়ায়
তাই সে দেখিব আমি
দিব সবটুকু দামই
মিটাইয়া দিব আজ
নাই কিনা কিছু কাজ।

সূর্যের চুম্বন

ঘুম নেই।
দু' চোখের কোলে ক্লান্তির কলোফুল ঃ
যে দিকে তাহাই
কেউ কোথাও নেই ঃ
হিসেবে বোধহয় হয়েছে আবার ভুল।
উঠেছে এবার দুশ্চিন্তার ঝড় ঃ
কোথা পাই তাকে
কখন এবং কেমনে?
শূন্য হৃদয়ে কাটাই দ্বিপ্রহর
ফুল মরে গেছে
সূর্যের চুম্বনে।

হুগলী জেলার মহিলা-কবি পর্যায়ে আমাদের আলোচনার সমাপ্তি ঘটাইলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে হুগলী জেলা একটি দ্যুতিমান ঐতিহ্যের অধিকারী। এবং এই ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠায় মহিলা-কবিদের শ্রদ্ধাশীল দানের কথা অনস্বীকার্য। মহিলা-কবিদের সম্পর্কে আমরা যথাসম্ভব আলোচনা করার প্রয়াস পাইয়াছি। তথাপি অনবধানতাবশত হয়ত অনেকের প্রসঙ্গ বাদ থাকিয়া যাইবে। ইঁহাদের আন্তরিক এবং অনহংকারী সাধনায় সাহিত্যে হুগলী জেলার স্থান যে উজ্জ্বল হইতেছে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

উদীয়মান লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে মাহেশের শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ওরফে বনফুল) উপন্যাসের রূপরীতির মধ্যে নূতনত্বের প্রবর্তনের জন্য কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা পরিকল্পনার মৌলিকতায় শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছে। বনফুল তাঁহার ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার চিত্রাঙ্কণে তিনি মনোজগতের নানা কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তৃণখণ্ড (১৩৪২), বৈতরণী তীরে (১৩৪৩), কিছুক্ষণ (১৩৪৪), অগ্নি (১৩৫৩), সে ও আমি (১৩৫০), মানদণ্ড (১৩৫৫), নবদিনান্ত (১৩৫৬), কষ্ঠিপাথর (১৩৫৯), প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ। ইহা ছাড়া তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'জঙ্গম' সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এই উপন্যাসে আধুনিক জীবন-যাত্রার বিরাট-সুদূর-প্রক্ষিপ্ত দিগ্‌বলয় ও কেন্দ্রভ্রষ্ট বিশৃংখল, বহুমুখী., স্বপ্নসঞ্চরণবৎ লক্ষ্যহীন প্রচেষ্টার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা যেন একটা উদভ্রান্ত, আদর্শের আশ্রয়হীন জীবনলীলার মহাকাব্য—এক সীমাহীন সমুদ্র-বিস্তারের তটাভিমুখী তরঙ্গ-পরম্পরার অকারণ ওঠা-পড়া। আখ্যায়িকা গ্রন্থের ভিতর দিয়া লেখকের মননশীলতা ও সরস বর্ণনাকৌশল এই দুই পরিস্ফুট হইয়াছে। এত জটিল ও বিরাট ঘটনাপুঞ্জ ও কর্মশীলতার মধ্যে তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহার সত্যই প্রশংসার্হ।

॥ ধর্মপুস্তক : বাঙ্গলার প্রথম গদ্যগ্রন্থ ॥

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার গ্রহণ করিয়া এই দেশের সম্পূর্ণ আধিপত্য গ্রহণ করেন; অথচ গদ্য রচনার বিশেষ সুবিধা না থাকায়, কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত, কারণ তৎকালে জমিদারী কার্যের কাগজপত্র বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। কোম্পানীর ভূতপূর্ব কর্মচারী স্যার চার্লস উইলকিন্স ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে কোম্পানীর আমলের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিঃ হালহেড ইংরাজদের পূর্বোক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে উক্ত মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিই বঙ্গদেশের মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।

১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী ডাঃ কেরী ওয়ার্ড সাহেবের সহিত শ্রীরামপুরে মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাঁহাদের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস নামক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং রামরাম বসু কৃত 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' শীর্ষক পুস্তক ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত গদ্য পুস্তক বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু ধর্মপুস্তক আবিষ্কৃত হওয়ায় উহা সেই সম্মানের দাবী রাখে।

মর্য্যদা থাকিতে কেনো নাজাও উঠিয়া।
আপন সদৃশ স্থানে উঠি বৈস গিয়া॥

এত সুনি সোমদত্ত কোপেতে জনিন।
অগ্নির উপরে জেন ঘৃত ঢালি দিন॥

সোমদত্ত বলে সেনী নাকরিস গর্ব্ব।
তোমার মহিমা জত আমি জানি সর্ব্ব॥

হুগলী হইতে মুদ্রিত বঙ্গের প্রথম পুস্তকে যে ছাপার অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহার প্রতিলিপি
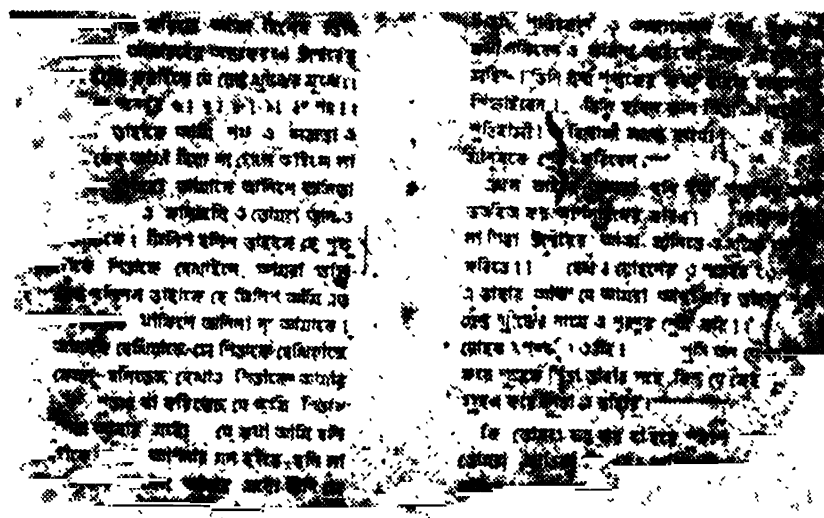
লেখক কর্তৃক আবিস্কৃত ধর্ম্মপুস্তকের ভিতরের দুই পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

উইলকিন্স সাহেব ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ফ্রোম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ওয়াল্টার উইলকিন্স এবং মাতা তৎকালীন বিখ্যাত এন্‌গ্রেভার রবার্ট বেটম্যান রে নামক শিল্পীর ভাইঝি ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া রাইটার রূপে বাঙ্গলায় আসেন।

তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা এই দেশের ভাষা শিখিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া উপলব্ধি করেন নাই। তখন দোভাষীর সহায়তায় কোম্পানীর সমস্ত কাজ-কর্ম চলিত। উইলকিন্স সাহেব বাঙ্গলায় আসিয়া প্রথমে কলিকাতায় সেক্রেটারির অফিসে দুই বৎসর কাজ করেন এবং পরে তাঁহাকে কোম্পানীর কুঠির সহকারী সুপারিন্টেডেন্ট রূপে মালদহে পাঠান হয়। তিনি সর্বপ্রথম এই দেশের ভাষা শিখিয়া কার্য করিলে ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে এই কথা চিন্তা করিয়া বাঙ্গলা ও ফার্সী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীসজনীকান্ত দাস বলিয়াছেন, অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তি বলে এই দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য এই সকল সাধারণ-ব্যবহৃত অপরিপুষ্ট প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নহে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের আকর সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার একটি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। হালহেড উইলকিন্সের পূর্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু হালহেডের সংস্কৃতে জ্ঞান মোটেই গভীর ছিল না। ওয়ারেন হেষ্টিংস উইলকিন্সকে দিয়া বাঙ্গলা হরফ প্রস্তুত করাইয়া হালহেডের বাঙ্গলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান। বাঙ্গালা ভাষায় ছেনি-কাটা হরফে স্যার চার্লস উইলকিন্স ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহরে সর্বপ্রথম মুদ্রন-কার্য আরম্ভ করেন এবং "গ্রামার অফ দি বেঙ্গল লেঙ্গুয়েজ" বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক। ইহার পূর্বে পর্তুগীজগণ গোয়া শহরে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ ভাষায় রোমান অক্ষরে খৃষ্টবিষয়ক একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন; ইহাই ভারতের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহার পূর্বে কাষ্ঠের ব্লকের অক্ষর করিয়া যে ছাপিবার ব্যবহার ভারতবর্ষে ছিল, তাহার প্রমাণ ১২৮৪ সালের 'নব-বার্ষিকী' পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

"বহুকাল পূর্বেও যে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালীন তিনি দেখিতে পান যে বারাণসী জেলার একস্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অনূন্য এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।" (১৩)

উইলকিন্স **পঞ্চানন কর্মকার** নামক স্থানীয় এক কর্মকারের সহায়তায় হুগলীতে ছেনি-কাটা ছাঁচে সীসা ঢালাই করিয়া বাঙ্গলা অক্ষর নির্মাণ করেন এবং সেই সীসার বাঙ্গলা হরফ

দিয়া এই প্রথম গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। হরফ-প্রস্তুতের কাজে পঞ্চানন বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পরে শ্রীরামপুর হরফ-ঢালাই করিবার প্রাচ্যের সুবৃহৎ কারখানা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই পঞ্চানন ও তাহার জামাতা মনোহর শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনে যোগদান করেন এবং তাহারা এদেশীয় বহু ভাষায় অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজও বাঙগলাদেশে যে অক্ষর প্রচলিত আছে, তাহা পঞ্চানন ও মনোহরের আদর্শে প্রস্তুত অক্ষর। হালহেড সাহেব রচিত গ্রামারে সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষর ব্যবহৃত হয় তাহার প্রতিলিপি ৪৭২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

উইলকিন্স সাহেবের হুগলীর ছাপাখানা হইতে প্রথম যে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই পুস্তকখানি হালহেড সাহেবের পূর্বোক্ত বাঙগলা ভাষার ব্যাকরণ এবং উহাই বঙ্গদেশের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক—সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এই পুস্তকখানির আখ্যাপত্রের উপরে লিখিত আছে ঃ

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী"

পরে ইংরাজী ভাষায় **এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল লেঙ্গোয়েজ** এবং তৎপরে এই শ্লোকটি ঃ

"ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়য়ুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎসস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥"

এবং পরিশেষে নিচের দিকে হুগলী হইতে মুদ্রিত ও রোমান টাইপে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ইহা লিখিত আছে। PRINTED AT HOOGLY IN BENGAL. এই পুস্তকের ভূমিকার শেষ ভাগে হালহেড সাহেব একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, উক্ত বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন যে, বর্ষাকালে পুস্তকখানি মুদ্রিত হওয়ায় গ্রীষ্মারম্ভে যেন পুস্তক বাঁধান হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ ঃ

It is recommended not to bind this book till the setting in of the dry season as the greatest part of it has been printed during the rains.

রেভারেন্ড লং সাহেব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় বাঙ্গলা পুস্তকের তালিকায় রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র"কেই প্রথম মুদ্রিত গদ্য ও ঐতিহাসিক পুস্তক বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেরী সাহেব এই সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এই পুস্তকের বিষয় ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেও, "প্রতাপাদিত্য চরিত্র"কেই বঙ্গের প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেন। "প্রতাপাদিত্য চরিত্রে"র দুইটি আখ্যাপত্র আছে একটি ইংরাজিতে ও একটি বাঙলায়; ইংরাজি আখ্যাপত্রে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ও বাঙলা আখ্যাপত্রে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বলিয়া লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে পুস্তকখানি যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া কখনই বলিতে পারা যায় না। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ৪৮০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

১৩৫৩ সালে. হুগলী জেলার ইতিহাস সংকলনের জন্য আমাকে বহু ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় এবং বহুস্থানে যাইতে হয়। সেই সময় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত একখানি সুবৃহৎ গদ্য পুস্তক আমি শ্রীরামপুরের উকিল শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট দেখি; উহার নাম "ধর্মপুস্তক"। পুস্তকখানি দেখিয়া উহা বঙ্গের প্রথম মুদ্রিত গদ্যপুস্তক বলিয়া আমার ধারণা হয় এবং সেই সম্বন্ধে ১৩৫৩ সালের ১৮ই শ্রাবণ তারিখের "দেশ" পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

'ধর্মপুস্তকের' আখ্যাপত্র ৪২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে ঃ

ধর্ম পুস্তক

যাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য

যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য

শোধনার্থে

তাহার অন্তভাগ

তাহা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যেশু খ্রীষ্টের

মঙ্গল সমাচার

তর্জমা হইল গ্রীক ভাষা হইতে

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল

১৮০১

রামরাম বসু ও টমাস কর্তৃক অনুদিত এবং কেরী সাহেব কর্তৃক সংশোধিত "মঙ্গল সমাচার মতিয়ের রচিত" (মেথু লিখিত সুসমাচার নহে) ও ধর্মপুস্তক এক বলিয়া শ্রীযুত নিরঞ্জনকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কেরীর পুস্তকখানি ডিমাই আট-পেজি ১২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং উহার একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। উক্ত পুস্তকে এবং আলোচ্য ধর্মপুস্তকে মুল বাইবেল হইতে কিরূপ বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছিল. তাহার একটি প্যারার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

16. Moreover when ye fast, be not, as the hypo-critics of a sad countenance : for they disfigure their faces, that they may appear into men to fast, verily I say unto you, they have their reward.

কেরীর পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ঃ—১৬—

অপর যখন তোমরা উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাইবার কারণ আপনাদের মুখ বিকৃত করে সত্য আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের প্রতিফল পাইয়াছে।

নবাবিস্কৃত ধর্মপুস্তকের বঙ্গানুবাদ ঃ—১৬—

পুনর্বার যখন তোমরা উপবাস কর তখন ক্লিষ্ট মুখ হইও না কাল্পনিকের মত এ

মাত্তিউ ষষ্ঠ অধ্যায়।— 19

যের কি২ আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের
৯ পূর্ব্বে তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা
এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ
১০ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার
রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই
১১ মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিব
১২ সিক খাহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা
আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই
১৩ মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং
আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ
হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও
১৪ গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন। অতএব
যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে
তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ
না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপ
১৬ রাধও ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা
উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও
না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাই
বার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য
আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের
১৭ প্রতিফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ
তখন আপন মস্তকে তৈলমর্দ্দন কর ও মুখপ্রক্ষালন
১৮ করহ। তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের দৃষ্টিতে উপবাসী

কেরী সম্পাদিত 'মঙ্গল-সমাচার' মাতিউ পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি
(৯ হইতে ১৮ প্যারা)

কারণ তাহারা মুখ বিশ্রি করে উপবাসী দেখনের জন্য সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।

আলোচ্য ধর্মপুস্তকখানি ডিমাই আটপেজী ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং ইহাতে নিউ টেষ্টামেন্ট এবং ওল্ড টেষ্টামেন্ট অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাইবেলখানির বঙ্গানুবাদ আছে। কেরীর পুস্তকের এবং ধর্মপুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আমার নিকট রহিয়াছে তাহাতে দেখা যাইবে যে, কেরীর পুস্তকে ইংরাজীতে পৃষ্ঠার নম্বর দেওয়া আছে ও পৃষ্ঠার শীর্ষে "মাতিউ ষষ্ঠ অধ্যায়" এবং ৯ হইতে প্যারার বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু 'ধর্মপুস্তকের' পৃষ্ঠার কোন ক্রমিক নম্বর নাই; পৃষ্ঠার শীর্ষে "৬ষ্ঠ পর্ব মাতিউর রচিত" এবং ১৬ হইতে ২৪ প্যারার বঙ্গানুবাদ একটি পৃষ্ঠায় আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য দুইটি পৃষ্ঠার আলোকচিত্র যথাক্রমে ৪৭৬ ও ৪৭৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী টমাস-বসু-কেরী-ফাউন্টেন অনুদিত এবং কেরী সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেষ্টামেন্টের বঙ্গানুবাদ "ধর্মপুস্তক" নামে প্রকাশিত হয়; পূর্বোক্ত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' নামক পুস্তক সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হয় কিন্তু উহার আখ্যাপত্রের সহিতও নবাবিষ্কৃত ধর্মপুস্তকের আখ্যা-পত্রের কোন মিল নাই। কেরী সাহেবের পুস্তকের আখ্যাপত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য / বিশেষত / যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন / তাহাই ধর্মপুস্তক / তাহার অন্তভাগ / তাহা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখৃষ্টের / মঙ্গল সমাচার গ্রীক ভাষা হইতে তর্জমা হইল / শ্রীরামপুরে ছাপা হইল / ১৮০১।

কেরী সাহেবের পুস্তক সম্বন্ধে "The Christian Observer" নামক পত্রে, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, ১২৫ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানি ছাপাইতে এগার মাস সময় লাগিয়াছিল; সুতরাং আট শত পৃষ্ঠার **"ধর্মপুস্তক"** নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ ছাপাইতে কত বৎসর যে লাগিয়াছিল, তাহা অনুমেয়।

The New Testament was brought through the press within eleven months, Carey having taken an impression of the first page, March the 18th, 1800, and the last page being printed February the 10th * 1801. (Page 454).

আলোচ্য পুস্তকখানি আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে কেরী সাহেব কর্তৃক ব্যাপটীষ্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেও যে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা ছিল, তাহাই প্রমাণিত হয়। আর একটি প্রমাণ ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে জন মিলার কর্তৃক "The Tutor" বা সিক্ষ্যাগুরু শীর্ষক একখানি ওয়ার্ডবুক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুতরাং শ্রীরামপুরে পাদরীগণ আসিবার পূর্বেও যে দিনেমার গভর্ণ-

---

* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীসজনীকান্ত দাস এই পুস্তকের প্রকাশকাল ৭ ফেব্রুয়ারী বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু উহা ১০ ফেব্রুয়ারী হইবে।

৬ মথি পবর মাত্তিওর রচিত

১৬ পুনর্ব্বার যখন তোমরা উপবাস কর তখন ক্লিষ্ট মুখ হইও না কাল্পনিকের মত একারন তাহারা মুখ বিশি করে উপবাসি দেখানের জন্য সত্য আমি বলি তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।

১৭ কিন্তু যখন তুমি উপবাস কর তখন তোমার মস্তকে

১৮ তৈল মর্দ্দন কর এবং মুখ প্রক্ষালন কর ইহাতে তুমি উপবাসি দেখা যাইবা না মনুষ্যেরদের দৃষ্টে কিন্তু তোমার পিতার দৃষ্টে যিনি আছেন অপকাশ স্থানে এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন অপ্রকাশে তিনি ফলোদয় দিবেন তোমাকে প্রকাশ করিয়া

১৯ আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না পৃথিবীর উপর যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক খায় এবং যেখানে চোরে সিঁদ

২০ দিয়া চুরি করে। কিন্তু আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় কর স্বর্গে যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক না খায় এবং যে

২১ স্থানে চোরে সিঁদ দিয়া না লইয়া যায় একারন যে স্থানে

২২ তোমার [illegible] ধন সে স্থানে তোমারদের অন্তঃকরণ। চক্ষু সরীরের প্রদীপ অতএব যদি তোমার চক্ষু সোজা তবে

২৩ তোমার সকল সরীর পূর্ণ দীপ্তি হইবেক কিন্তু যদি তোমার চক্ষু মন্দ তবে তোমার সকল সরীর পূর্ণ অন্ধকার অতএব যদি সে দীপ্তি যাহা তোমার মধ্যে অন্ধকার হয় তবে কি মত বড় সে অন্ধ[illegible]

২৪ কোন মনুষ্য দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না একারন এক জনকে ঘৃণা করিয়া আর এক জনকে প্রেম করিবেক কিম্বা এক জনের অনুগত হইয়া অন্য করিবে

লেখক কর্ত্তৃক আবিস্কৃত 'ধর্ম্মপুস্তকের' একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

(১৬ হইতে ২৪ পারা)

মেন্টের মুদ্রাযন্ত্র শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। নচেৎ সিক্ষ্যাগুরু বা ধর্মপুস্তক শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল কিরূপে?

রেভারেন্ড লং সাহেবের 'ক্যাটলগে' নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বিশ্বকোষ' এবং ডক্টর সুশীল কুমার দের 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলী লিটারেচার' পুস্তকে জন্ মিলারের গ্রন্থের কথা উল্লিখিত আছে। সংবাদপত্রে সেকালের কথায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সিক্ষ্যাগুরু' কলিকাতার কোন প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয় লিখিয়া সকলকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত জন্ মিলারের **"দি টিউটর"** পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম :

The | Tutor | or a | New English & Bengalee work | well adapted to teach | the natives English | in three parts. |

এই ইংরাজী আখ্যাপত্রের নীচে বাঙ্গলা হরফে লেখা আছে : সিক্ষ্যাগুরু। কিম্বা এক নৈতন ইংরাজী আর বাঙ্গলা বহি। ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালিদিগেরকে ইংরাজি। সিক্ষা করাইতে তিন খণ্ডে। পরে ইংরাজিতে Compiled Translated and Printed | by John Miller | 1797. |

লংয়ের ক্যাটলগে এই পুস্তক **শ্রীরামপুরে মুদ্রিত বলিয়া লিখিত আছে**। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০। ইহার ভাষাও বিচিত্র। শ্রীসজনীকান্ত দাস "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" পুস্তকে শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কোনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই...সুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। শ্রীরামপুরে ঐ সময়ে ছাপাখানা ছিল এবং উহা কলিকাতায় যে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং লং সাহেবের কথা অবিশ্বাস করিবার আমরা কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না।

বাঙ্গলা টাইপের জন্মকথা প্রসঙ্গে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা খৃষ্টিয়ান অবজারভার নামক পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইল :

"India had never seen printing in her own indigenous characters, till about twelve years before the arrival of the brethren Carey, and Thomas in India. She was indebted for its existence to the ingenuity and unceasing efforts of Lieut : Wilkins, then a young man in the Bengal Army, and now, the justly celebrated Dr. Wilkins. The attachment of this young man to Indian literature is testified both by Sir William Jones and by Nathaniel Brassey Halhed Esq, the author of the first and the most elegant grammar of the Bengalee language, which was yet appeared. This was printed at Hooghly in 1784 * with the first complete fount of Bengalee Types Lieutenant Wilkins fabricated………" (page—451).

*বাঙলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রমক্রমে এই স্থানে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ লেখা আছে।

THE
TUTOR,
OR A
New English & Bengalee Work,
WELL ADAPTED TO TEACH
THE NATIVES ENGLISH.
IN THREE PARTS.

শিক্ষা গুরু

কিম্বা এক নেতন ইংরাজি আর বাঙ্গলা বহি

তাঁহা উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দিগকে ইংরাজি

শিক্ষা করিতে দিবার জন্যে

By JOHN MILLER

1797.

শ্রীরামপুর হইতে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত শিক্ষাগুরু

রাজা প্রতাপাদিত্য।

চরিত্র।

এ বঙ্গ ভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক২ রাজাগন উদ্ভব হইয়া ছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায় তদ্ব্যতিরেক তাঁহারদের বিশেষ২ বিশেষন কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরূপণ করন কিছুই উপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রসঙ্গ শ্রবন করে আনুপূর্ব্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়া ছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ

শ্রীরামপুর হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

"সিক্ষ্যাগুরু" পুস্তকের ভূমিকায় জন্ মিলার যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পুস্তকের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি ৪৮০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

আমার মনস্ত ছিলো সপরোধ করিতে এই কেতাব সমস্কৃততে। কিন্তু আমি এক্ষেণে দেখিলাম জে অতি অল্প লোক আছে জে আমার এ বিশয় বুঝে। অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারায়।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত এই পুস্তকখানি ইংরাজী প্রথম ব্যাকরণ হিসাবে অতিশয় মূল্যবান। জন্ মিলার ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা অনুবাদের যে সহজ নিয়ম সেই সময় আবিস্কার করিয়াছিলেন, কোম্পানীর কর্মচারীগণ সেই নিয়মে তখন বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিত বলিয়া ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার উদ্ভব হইয়াছিল।

"ধর্মপুস্তক" ব্লটিং কাগজের ন্যায় পুরু কাগজে কাষ্ঠের অক্ষর দিয়া মুদ্রিত ও পত্র সংখ্যা আট শতের উপর। ওল্ড টেষ্টামেন্টের ধারা অনুসারে পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে এবং প্রথমে ম্যাথু, মার্ক, লুক, জন ও পরে করিনথিয়ানস্, গ্যালেসিয়ানস্, কলোসিয়ানস্, থেসালোনিয়ানস্, টিমোথিটিটাস, ফিলেমন, পিটার ১ম ও ২য়, জন ১ম, ২য় ও ৩য়, জুডা এবং জনের কাহিনী বর্ণিত আছে। পুস্তকখানির কোন ক্রমিক পত্র সংখ্যা নাই, নিম্নে পুস্তকখানির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

"নিত্য নিত্য প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল ধর্মপুস্তকের কথা পড়িবেন ও কামনা করিবেন নিজ পরিজনের সহিৎ। তিনি ধর্মপুস্তকের কথা তাহার সন্তানকে শিক্ষাইবেন। তিনি হবেন ভাল পিতা ও স্বামী ও প্রতিবাসী। বিশ্বাসী সমস্ত কার্যে। ও সকল মানুষকে প্রেম করিবেন।

"এখন ভাইর আমরা বলি ধর্মপুস্তকের কথা তর্জবিজ কর আপনারদের কারণ। দেরী করিও না পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিতে ও খ্রীষ্ট আশ্রয় করিতে॥ দেখ ১ যোহনের ৩ পর্বের ২৩ পদ। এ তাহার আজ্ঞা যে আমরা আস্থা করি তাহার পুত্র যেশু খৃষ্টের নামে ও পরস্পর প্রেম করি। যোহন ২ পর্ব ২৩ পদ। প্রতি জন যে নৈরাস করে পুত্রকে গ্রহণ করে পিতাও তাহার।

"তোমরা কখনও পিতাকে ভয় করিও না। তোমরা কি করিবা কোথায় পলাইবা খৃষ্ট আশ্রয় না করিয়া॥ ব্রাহ্মণ ও যজমানের মত তোমরাও অনন্ত নরকে পড়িবা॥ দেখ মার্ক ১৬ পর্বের ১৫।১৬ পদ॥ খৃষ্ট বলিলেন তাহাদিগকে যাও সমস্ত জগত দিয়া এ মঙ্গল সমাচার ঢোঁড়ি দিও সকল লোকের শ্রবণে যে জন প্রত্যয় করিয়া তুবিৎ হয় সে ত্রাণ পাইবেক, কিন্তু যে আস্থা করে না সে আকল্প-নারকী হইবেক। ও প্রকাশিতের ২১ পর্বের ৮ পদ॥ কিন্তু ভীরু ও অনাস্থিক ও ঘৃণিত কর্তা কসবিবাজ ও গুণি ও প্রতিমাপূজক ও গন্ধক প্রজ্জ্বলিত সমুদ্রে যাহা দ্বিতীয় মৃত্যু॥"

আলোচ্য "ধর্মপুস্তকে" কোন ব্যক্তির নাম মুদ্রিত নাই, কিন্তু শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল কেবল এই কথাই আখ্যাপত্রে লিখিত আছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস

প্রতিষ্ঠার পূর্বেও যে, শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র ছিল, ধর্মপুস্তক তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। ডিমাই সাইজের আট শত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতে অন্ততঃ যে দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। "প্রতাপাদিত্য চরিত্রে"র পূর্বে "ধর্মপুস্তক" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কেরীর পরলোকগমনের পর "সমাচার দর্পণের" নিম্নোক্ত সংবাদটি হইতেও প্রমাণিত হয় ঃ

"১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারীতে ডাক্তার কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া শ্রীযুত ডক্টর মার্শম্যান ও শ্রীযুত উয়ার্ড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য সাহেবদের সঙ্গে মিলিয়া যে মিশনারী সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিশন নামে বিখ্যাত হইল তাহা স্থাপিত করিলেন। যে বৎসরে শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তার কেরী সাহেব বাস করিলেন, সেই বৎসরে ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনুদিত হইয়া প্রায় তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল।" (১২)

"ধর্মপুস্তক" ১৮০০ খৃষ্টাব্দে 'মুদ্রাঙ্কিত' হইয়াছিল বলিয়া সমাচার দর্পণে দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং ইহাই বঙ্গের প্রথম গদ্য পুস্তক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যাঁহারা এই বিষয়ে অনুরাগী, তাহাদিগকে শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিকট উক্ত পুস্তকখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

ধর্মপুস্তকখানির শেষে কালি দিয়া জনাই নিবাসী শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম এবং ৪ঠা ফাল্গুন ১২০৯ সাল এই কথা লিখিত আছে। ইহা ফণীন্দ্রবাবু বেগমপুরের এক তন্তুবায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য এবং যতদূর মনে হয়, কলিকাতার কোন গ্রন্থাগারে এমন কি ন্যাশানাল লাইব্রেরীতেও এই গ্রন্থখানি নাই।

হুগলী জেলার ইতিহাসে "ধর্মপুস্তক"কে আমি বঙ্গের প্রথম গদ্যপুস্তক বলিয়া ঘোষণা করিলে আনন্দবাজার পত্রিকা 'বিচিত্র কথায়' ১লা আশ্বিন ১৩৫৬ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) এবং দৈনিক বসুমতীতে শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ 'বাঙ্গলার প্রত্নতাত্ত্বিক' প্রবন্ধে (২৬ ফাল্গুন ১৩৬৩) তাহা অনুমোদন করেন। তাঁহারা এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ্য ঃ

॥ প্রথম বাংলা গদ্যের বই ॥

১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি উইলিয়ম কেরী ও ওয়ার্ডের চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস। ১৮০১ সালে রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" এই প্রেস থেকে ছেপে বেরোয়। আমাদের প্রদেশের প্রথম ছাপা গদ্যের বই বলে এটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতি [illegible] মিত্র তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, "ধর্মপুস্তক" এই সম্মানের দাবী রাখে। এই বই ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও যে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা ছিল তার প্রমাণ আছে। জন মিলারের "The Tutor" বা সিক্ষ্যাগুরু নামক একখানি 'ওয়ার্ড বুক' ১৭৯৭ সালে শ্রীরামপুরে ছাপা হয়েছে বলে জানা যায়। "ধর্মপুস্তক" যে "প্রতাপাদিত্য চরিত্রে"র আগে ছাপা হয়েছিল তা "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত এই খবর পড়লে

বোঝা যায় ঃ "১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারীতে ডাক্তার কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়া শ্রীযুত ডক্টর মার্শম্যান ও শ্রীযুত উয়ার্ড সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য সাহেবদের সঙ্গে মিলিয়া যে মিশনারী সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিশন নামে বিখ্যাত হইল তাহা স্থাপিত করিলেন। যে বৎসর শ্রীরামপুরে আসিয়া ডাক্তার কেরী সাহেব বাস করিলেন, সেই বৎসরে ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনুদিত হইয়া প্রায় তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল।" তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'ধর্মপুস্তক' ১৮০০ সালে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল। **অতএব 'ধর্মপুস্তক'ই যে বাংলার প্রথম গদ্যের বই তা স্বীকার করতে হয়।**

[আনন্দবাজার পত্রিকা]

সুধীরবাবু হুগলী জেলার বহু পুরাতন তথ্য আবিস্কার করেন। ইতিহাস সংকলনের জন্য তাঁকে বহু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বহুস্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। সেই সময় তিনি **১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত একখানি সুবৃহৎ গদ্যপুস্তক আবিস্কার করেন।** পুস্তকখানি শ্রীরামপুরের উকীল শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে দেখতে পান। তার নাম **"ধর্মপুস্তক"**। বইখানি দেখে উহাই যে বাঙলার প্রথম মুদ্রিত গদ্যপুস্তক বলে ধারণা হয় এবং তার খুঁটিনাটি আলোচনা করে তিনি ১৩৫৩ সালের ১৮ই শ্রাবণ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন এবং **ঐ 'ধর্মপুস্তক'খানি যে বাঙলার প্রথম গদ্যপুস্তক, উহাই ঘোষণা করেন।**

এখন সুধীরবাবু যে "ধর্মপুস্তক" নামক বইখানি পেয়েছেন তার পাতা ৮০০ এবং এই বইখানা ছাপতে কত দিন সময় লাগতে পারে? কেরী সাহেবের বই ১২৫ পাতা ছাপতে যদি ১১ মাস লেগে থাকে—নিশ্চয়ই এ বইখানা ছাপতে আরও অনেক বেশি লেগেছে। তাহলে ১৮০০ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী তারিখে কেরী সাহেব কর্ত্তৃক ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেও যে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর একটা প্রমাণ ১৭৯৭ খৃঃ জন মিলার কর্তৃক "The Tutor" বা "সিক্ষ্যাগুরু" নামে একখানি ওয়ার্ড বুক শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয় ব'লে উল্লিখিত আছে; সুতরাং **শ্রীরামপুরে পাদরিগণ আসবার আগেও যে দিনেমার গভর্ণমেন্ট বা বাঙালীদের পরিচালনায় মুদ্রাযন্ত্র শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল—তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।** নচেৎ "সিক্ষ্যাগুরু" বা "ধর্মপুস্তক" শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত হ'ল কিরূপে? উক্ত আলোচনা আর আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সুধীরবাবু তাঁর গ্রন্থে (হুগলী জেলার ইতিহাস) দিয়েছেন।

[দৈনিক বসুমতী]

১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাসের **'প্রবাসী'** পত্রিকায় শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য হুগলী জেলার ইতিহাসের চার পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া **'ধর্মপুস্তক'** যে প্রথম গদ্যগ্রন্থ তাহা তথ্য প্রমাণাদি দেখিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধারযোগ্য ঃ

বহু মনীষী বাঙ্গলার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ এই [হুগলী] জেলার বিবরণ বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে পারেন নাই—

বস্তুতঃ একজনের পক্ষে তাহা অসাধ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। চারি বৎসর পূর্বে তরুণ সাহিত্যিক শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের শতাধিক চিত্রসম্বলিত সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সাগ্রহে তাহা অধ্যয়ন করি। সমালোচনাচ্ছলে অযথা প্রশস্তি করার রীতি অবলম্বন না করিয়াও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, গ্রন্থকার এই অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য হইয়াছেন।...প্রভূত পরিশ্রমে শতাবধি প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ-সহ সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষার বিপুল উপকরণ হইতে নির্বাচন করিয়া তিনি যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, ভাষায় এবং ঘটনাবৈচিত্র্যে তাহা প্রায় উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে এবং গ্রন্থটির পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।...এই গ্রন্থে [হুগলী জেলার ইতিহাস] বহু নূতন তথ্য ও প্রমাণপত্র বিবৃত হইয়াছে—বাঙ্গলায় প্রথম গদ্যপুস্তক (পৃঃ৫৪৪-৫৫), নিমাই-তীর্থের ঘাটের সূর্যমূর্তি (পৃঃ ৬২৭-২৮), মাহেশের জগন্নাথদেবের দেবোত্তর সম্পত্তির মূল দলিল (পৃঃ ৬৮১-৮৩) প্রভৃতি।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তৎসম্পাদিত **'বঙ্গশ্রী'** মাসিক পত্রে ১৩৫৩ সালের ভাদ্র মাসে "বাঙ্গলা ভাষার প্রথম গদ্য পুস্তক" নামক প্রবন্ধে ধর্মপুস্তক যে বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যগ্রন্থ তাহা বলেন। উক্ত প্রবন্ধটি পরে তাঁহার রচিত "সাহিত্যের কথা" নামক পুস্তকেও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন ঃ সম্প্রতি শ্রীরামপুর সহরে একখানি গদ্যগ্রন্থ আবিস্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম ধর্মপুস্তক; ৮০০ পৃষ্ঠার বহি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার মুদ্রাঙ্কন শেষ হইয়াছে। ১৭৯৯ অথবা তাহারও পূর্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের নবপ্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে" এই পুস্তকখানির কোন উল্লেখ নাই। বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্র হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণয়নে রত হইয়া আমাকে শ্রীরামপুরে ফণীন্দ্রবাবুর কাছে রক্ষিত কতিপয় মহামূল্য রচনার কথা বলেন। তদনুসারে শ্রীমান সমভিব্যাহারে শ্রীরামপুরে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া আসিয়াছি।...ইতিপূর্বে আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে কতিপয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মনে করেন, ১৮০১ সালে মুদ্রিত রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য' প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু আমাদের কথিত **ধর্মপুস্তকখানি রাজা 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রের'ও কয়েক বৎসর পূর্বে যে রচিত**, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত উইল ॥

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি কি ভাবে বন্টন করা হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া যান। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এই দলিলখানি এযাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দলিলখানি বঙ্কিম-চন্দ্রের দৌহিত্র স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। আমরা এই অপ্রকাশিত মূল্যবান **দলিলখানি** ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুধীরকুমার মিত্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" মাসিকপত্রে ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সর্বপ্রথম প্রকাশ করি। নিম্নে এই দলিলখানির চারপৃষ্ঠা ব্যাপি প্রতিলিপি সংরক্ষণের জন্য এই স্থানে প্রদত্ত হইল ঃ

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া থানা নৈহাটি জেলা ২৪ পরগণা সবরেজিষ্ট্রি নৈহাটি হাল মোকাম সহর কলিকাতা ৫ নং প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে যে হেতু আমার প্রাচীন বয়স উপস্থিত, এক্ষণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার উইল করা বিধেয়, এজন্য আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থশরীরে সজ্ঞানে নিম্নলিখিত মত উইল করিতেছি

১। আমার মৃত্যুর পর আমার যে কিছু স্থাবর অস্থাবর পুস্তকের কাপিরাইট বা অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে, বা থাকিবে তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন। এবং তাহাতে দান বিক্রয় হস্তান্তর করার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এবং ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন।

২। কেবল ঐ সকল সম্পত্তির মধ্যে সহর কলিকাতা পটলডাঙ্গার অন্তর্গত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলির ৫ নম্বরের যে [illegible] ও ৪ নম্বরের যে [illegible] আছে তাহা আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। বা তৎসম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না।

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া, থানা নৈহাটি, জেলা ২৪ পরগণা, সবরেজিষ্ট্রি নৈহাটি হাল মোকাম শহর কলিকাতা ৫ নং প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে যে হেতু আমার প্রাচীন বয়স উপস্থিত এক্ষণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার উইল করা বিধেয় এজন্য আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে নিম্নলিখিত মত উইল করিতেছি ঃ

১। আমার মৃত্যুর পর আমার যে কিছু স্থাবর অস্থাবর পুস্তকের কপিরাইট বা অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে, বা থাকিবে তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন। এবং তাহাতে দান বিক্রয় হস্তান্তর করার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এবং ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ ৫ নম্বরের বাটী ও ৪ নম্বরের ভূমি
আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী
প্রাপ্ত হইবেন। তখন উক্ত শরৎকুমারী দেবী উহাতে
সম্পূর্ণ স্বত্বশালিনী হইবেন, এবং তাঁহার
উহাতে দান বিক্রয় বা অন্য প্রকার হস্তান্তর
করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি আমার বনিতা
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে আমার জ্যেষ্ঠা
কন্যা (ঈশ্বর না করুন) বিদ্যমান না থাকেন, তবে
উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি শরৎ
কুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি আমার মৃত্যুর পরে কোন সময়ে আমার
বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বিবেচনা করেন যে
উক্ত ৫ নম্বরের বাটী বা ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয়
করা আবশ্যক তবে আমার উক্ত জ্যেষ্ঠা কন্যা
শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি
লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন নচেৎ পারিবেন না।
ঈশ্বর না করুন ঐ সময়ে যদি শরৎকুমারী
দেবী বিদ্যমান না থাকেন, তবে শ্রীমতী রাজ-
লক্ষ্মী দেবী আপন ইচ্ছানুসারে ঐ ৫ নম্বরের ভবন
ও ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কাহারও
সম্মতির অপেক্ষা করিবেন না।

৪। যদি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমার উক্ত
বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়, তবে

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতা পটলডাঙ্গার অন্তর্গত প্রতাপ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে ৫ নম্বরের যে খরিদা পোক্তাবাটী ও ৪ নম্বরের যে খরিদা জমি আছে তাহা আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। বা তৎসম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ ৫ নম্বরের বাটী ও ৪ নম্বরের ভূমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তখন উক্ত শরৎকুমারী দেবী উহাতে সম্পূর্ণ স্বত্বশালিনী হইবেন, এবং তাঁহার উহাতে দান বিক্রয় বা অন্য প্রকার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি আমার বনিতা শ্রীমতী

আমার মৃত্যুর পর আমার ত্যক্ত সম্পত্তিতে যে যে
প্রকারে অধিকারী ও হস্তান্তর হইবে তাহা নিম্নে
ক. খ. গ, ঘ, দফাওয়ারি লিখিলাম।

(ক) আমার সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে বাসস্থানের
সম্পত্তি, তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী-
শরৎকুমারী দেবী সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইবেন।
তাঁহার দান বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে। উহার
মধ্যে আমার কাঁটালপাড়ায় যে পৈতৃক ভদ্রাসন
বাটী আছে, তাহাতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী
নীলাব্জকুমারী দেবী এবং আমার তৃতীয়া কন্যা
শ্রীমতী উৎপলকুমারী দেবীর যাবজ্জীবন কেবল
বসতির অধিকার থাকিল।

(খ) আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আমার
সকল [illegible] কাগজ [illegible]
[illegible] নগদ আসবাব ও গহনাদি আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা-
শ্রীমান রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হইবেন।
অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিন কন্যা
তুল্যাংশে পাইবেন।

(গ) আমার লিখিত পুস্তকের কাপিরাইটে আমার
যে স্বত্ব তাহা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎ
কুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে যে লাভ হইবে,
অর্থাৎ পুস্তক ছাপান ও বিক্রয় করার খরচখরচা
বাদে যে লাভ থাকিবে, তাহার মধ্যে কি: টাকায়

রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা (ঈশ্বর না করুন) বিদ্যমান না থাকেন, তবে উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি আমার মৃত্যুর পর কোন সময়ে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বিবেচনা করেন যে উক্ত ৫ নম্বরের বাটী বা ৫ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক তবে আমার উক্তা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন ঐ সময়ে যদি শরৎকুমারী দেবী বিদ্যমান না থাকেন তবে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী আপন স্বেচ্ছাক্রমে ঐ ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের

ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিবে না।

৪। যদি আমার মৃত্যুর পূর্বেই আমার উক্তা বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয় তবে আমার মৃত্যুর পরে আমার ত্যক্ত সম্পত্তিতে যে যে প্রকারে অধিকারী ও স্বত্ববান হইবে তাহা নিম্নে ক, খ, গ, ঘ, দফাওয়ারিতে লিখিলাম।

(ক) আমার সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা স্থাবর সম্পত্তি তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইবেন। তাঁহার দান বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে। ইহার মধ্যে আমার কাঁঠালপাড়ায় যে পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটী আছে তাহাতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারী দেবী এবং আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারী দেবীর যাবজ্জীবন বাস করিবার অধিকার রহিল।

(খ) আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আমার শাল, রুমাল, ইলবাস, পোষাক, গাড়ী, ঘোড়া, ঘড়ি, ঝাড়, লণ্ঠন, আসবাব ও লাইব্রেরী আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিন কন্যা তুল্যাংশে পাইবেন।

(গ) আমার লিখিত পুস্তকের কপিরাইটে আমার যে স্বত্ব তাহা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে যে লভ্য হইবে অর্থাৎ পুস্তক ছাপান ও বিক্রয় করার খরচ-খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে, তাহার মধ্যে ফি টাকায় তিন আনা তিনি আমার দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারীকে দিবেন, এবং ফি টাকায় তিন আনা আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারীকে দিবেন। এবং তাঁহারা চাহিলে তিন মাস অন্তর তাহাদের এক এক খণ্ড হিসাব দিবেন। শরৎকুমারী স্বয়ং ফি টাকায় দশ আনা লইবেন।

(ঘ) ঈশ্বর না করুন যদি আমার মৃত্যুকালে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী উভয়েরই অভাব হয় তবে এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমি শ্রীমতী শরৎকুমারীকে দিলাম তাহা তদভাবে তাঁহার পুত্রগণ প্রাপ্ত হইবেন। আর এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমার অপর দুই কন্যাকে দিলাম তাঁহাদের অবর্তমানে তাহাঁদের পুত্রগণ আপন আপন মাতার অংশ তুল্যাংশে পাইবেন। যদি (ঈশ্বর না করুন) ঐ দুই কন্যার কাহারও পুত্র বর্তমান না থাকে তবে সেই কন্যার অবর্তমানে শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর পুত্রগণ তাঁহার স্বত্বে স্বত্ববান্ হইবেন। ইতি তারিখ, ১৮৬৭, ২১ ফিব্রুয়ারী।

এই দলিলের প্রথম পৃষ্ঠায় ১১ ছত্রে "তাহার" শব্দ কাটা আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্রে "না" শব্দ তোলা আছে। আর ৪র্থ পৃষ্ঠায় ১ ছত্রে "জ্যেষ্ঠ" শব্দ কাটা আছে। ইতি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Executed in my presence

Bepin Chandra Chatterjee of Kantalpara
Anukul Chandra Chatterjee of Kantalpara

আমার সম্মুখে দস্তখত হইল

শ্রীউমাচরণ বন্দোপাধ্যায় সাং—ভাটপাড়া,
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস সাং অস্পষ্ট জেলা—বাঁকুড়া

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত শেষ রচনা ॥

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে **মহাভারত** রচনা করিতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনে উহা আর সম্পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর পুত্র অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে মহাভারতের পাণ্ডুলিপি ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সংগ্রহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত অপ্রকাশিত সর্বশেষ রচনার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই স্থানে মুদ্রিত হইল।

উপক্রমণিকা।

মহাভারতকে ইতিহাস বলে। ইতিহাসের লক্ষণ

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥*

এই লক্ষণযুক্ত মহাভারত আছে। মহাভারতকে প্রাচীন ঋষিগণ এত আদর করিতেন, যে ইহা পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। দ্বিজবর্ণ ভিন্ন শূদ্র, কি স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। বেদ পাঠে যাহা শ্রবণ হয়, তাহার তুল্য উপদেশ ইহাতে মহাভারত পাঠে হয়। সুতরাং পঞ্চম বেদ বলায় অত্যুক্তি হয় না।

যে মহাভারত এক্ষণে প্রচলিত, তাহা

* ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই সকলের উপদেশ, এবং পূর্ব্ববৃত্ত কথা যাহাতে আছে তাহাকে ইতিহাস বলে।

মহাভারতে [illegible] সকল লোকের অধিকার আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা মহাভারতের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

॥ সাময়িক সাহিত্য ॥

বর্তমানে সংবাদপত্র একটি নিত্যব্যবহার্য জিনিষ হইয়াছে। যদিও পাশ্চাত্যসভ্যতার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ, তথাপি ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই দেশে ইহা প্রচলন করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। সুতরাং সংবাদপত্রের ইতিহাস ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন নয়।

এইরূপ কথিত আছে যে, এশিয়া মহাদেশ হইতেছে সংবাদপত্রের জন্মভূমি, চীন সভ্যতার উন্মেষকালে প্রাচীন চীনদেশে সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল এবং মোগল রাজত্বকালে ইহা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়। দিল্লী হইতে পারস্য ভাষায় প্রকাশিত 'পয়গম-এ-হিন্দ' নামক একখানি পত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (নব্যভারত ১৩০৫)। ঐ সকল সংবাদপত্র আধুনিক পদ্ধতির সংবাদপত্র হইতে ভিন্ন ধরণের ছিল; কারণ রাজনৈতিক মন্তব্য অথবা শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে উহাতে কোন সমালোচনা থাকিত না।

চীনদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম আবিস্কৃত হয়; কিন্তু কেরী সাহেব তাঁহার "Good old days of Hon'ble John Company" নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের হিন্দুগণ ও চীনাগণ মুদ্রাযন্ত্রের আবিস্কারক বলিয়া লিখিয়াছেন। It is known that the Hindoos and Chinese contend for invention of the Press.

ইংরেজ আমলে সরকারের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিলাত হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত; ইহাতে অর্থব্যয় ও সময় অধিক লাগিত। এই অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী স্যার চার্লস উইলকিন্সকে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়া অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য তখনও কোন ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র বৃটীশ-ভারতে স্থাপিত হয় নাই। এই হুগলীর মুদ্রাযন্ত্র হইতে হ্যালহেড্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না; তবে হুগলীতে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার ফলে বাংলাদেশে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ সুরু হয়, সংবাদপত্র প্রকাশ উহার একটা দিক্। এই সাময়িক সাহিত্য প্রচারও হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর হইতে প্রথম সূত্রপাত। জগতের প্রথম সাহিত্য ও সমালোচনা পত্র হইতেছে "Journal Des Scavans" ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরী হইতে প্রকাশিত হয়। মিশনারীদের যত্নে ও চেষ্টায় বাংলাদেশে শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে **"দিগ্দর্শন"** নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়; ইহাই বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক-পত্র। যে সময় ইহা প্রকাশিত হয়, তখন পর্তুগীজ ভাষার বাংলাদেশে খুব প্রচলন ছিল। সরকারী আদালতগুলিতে তখন ফার্সি ভাষা চলিত এবং বাংলা ভাষা তখন একপ্রকার অপাংক্তেয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অপাংক্তেয় বঙ্গভাষা পাংক্তেয় হইলে ১২৬৫ সালের ফাল্গুন মাসের 'পূর্ণিমা' মাসিকপত্র **"বঙ্গদেশের ক্রমোন্নতি"** নামক প্রবন্ধে বঙ্গভাষার বৃদ্ধিশালিনী অবস্থা দেখিয়া কি অপূর্ব

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR,
Calcutta General Advertifer.

From Saturday March, 25, to Saturday April, 1ft. 1780. [No. X.]

ENGLAND.

Extract of a Letter from Lewes, Dec. 28,

LAST Sunday morning the Greyhound, a letter of marque, of ... pounders, and

Haftings gaol) into the Downs. The Greyhound had only two men wounded, but her rigging was fhot to-pieces, having had not lefs then ... fhot, great and fmall, pafs through her mainfail, the Frenchman firing very lofty. One of the tenders had one man killed and another wounded. The french failors,

Admiral Barrington for an account of the French fquadron's proceedings at this place, from whence it feems Mont. D'Estaing withdrew his troops and fhips the 29th of laft month. I have difpatched fome frigates and fmall veffels to Martnico to reconnoitre Fort Royal, and bring intelligence whether

ভারতের প্রথম ইংরাজীপত্র হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল এডভারটাইজার নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

আনন্দরসে প্লাবিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নের কয়েক লাইন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 'পূর্ণিমা'র বর্ণনা এইরূপ ঃ

আজি আমার অন্তঃকরণ দেশীয় ভাষার দিন্ দিন্ বৃদ্ধিশালিনী অবস্থা আলোচনা করিয়া কি এক অপূর্ব আনন্দরসে প্লাবিত হইতেছে, আবার যখন এই অবস্থা ইহাপেক্ষা শত সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যখন আপামর সাধারণ সকলেই মাতৃভাষার আলোচনায় একান্ত মনে প্রবৃত্ত হইবে, যখন দেখিব নিতান্ত ভীরুস্বভাব কৃষাণেরা পর্যন্ত বঙ্গভাষা আলোচনা করিতে করিতে আপনাদিগের ঘোরতর জঘন্য অবস্থা জানিয়া তৎশোধনের চেষ্টা করিবে; আহা সেদিন আমার পক্ষে কি সুখময় হইবে। এখন কল্পনা পথে তাহার কি অত্যাশ্চর্য মনোহর প্রতিমাই দর্শন করিতেছি; যদি নিষ্ঠুরের হস্ত বঙ্গদেশের মৃত্তিকা একেবারে উলটাইয়া না ফেলে, তবে সেদিন অবশ্যই সময়ক্রমে উদয় হইবে।

যদিও আমাদিগের ভাষার পূর্ণাবস্থা হইতে অনেক বিলম্ব আছে, তথাপি অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চিত হইবে যে, আধুনিক অনেক সুবিখ্যাত বিদ্যালোকসম্পন্ন দেশের ভাষাও এত শীঘ্র এরূপ বৃদ্ধিশালিনী হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে যাঁহাদিগের কোনটি মাতৃভাষা ও কোনটি পরভাষা তাহার বোধ ছিল না, এক্ষণে তাঁহাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বে যাঁহারা বাঙ্গলা পুস্তকের নামে একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেন ও তাহাকে পদতলে দলন করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহাকে মস্তকে তুলিয়াছেন ও একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে যাঁহারা কাহাকেও বাঙ্গালা পাঠ করিতে দেখিলে পুস্তক কাড়িয়া লইতেন ও নানাপ্রকার অশ্লীল নীচবাক্যে বিদ্রূপ করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে আবার কত ব্যক্তি অন্যকে সেই ভাষায় উপদেশ দিতেছেন। কিছু দিন পূর্বে আপামর সাধারণের এরূপ সংস্কার ছিল যে, আমরা ইংরাজী রচনা করিতে পারিলেই পরম যশোভাজন হইব, কিন্তু এক্ষণে অনেকেরই সেই ভ্রম দূরীভূত হইয়া স্বদেশীয় ভাষায় রচনা করিতে প্রবৃত্ত জন্মিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে ইংরাজি স্কুলে বাংলার নাম গন্ধ ছিল না বলিলেই হয়, (আহা! ভাবিতে ভাবিতে মন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে) এক্ষণে তথাকার অনেক বালকেরা বাঙ্গালা প্রবন্ধ পর্যন্ত রচনা করিয়া যশোলাভের প্রকৃত পথে আগমন করিতেছে। সম্পাদকেরাও স্ব স্ব পত্রে স্থান দান করিয়া তাহাদিগের উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার মধ্যে আট দশটা বাঙ্গালা যন্ত্র ছিল কি না সন্দেহ, এক্ষণে শত শত মুদ্রাযন্ত্র প্রতিদিন অসংখ্য অসংখ্য পত্র মুদ্রাঙ্কণ করিতেছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারী ভারতের প্রথম সংবাদপত্র **"হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল এডভারটাইজার"** কলিকাতা হইতে **ইংরাজী ভাষায়** প্রথম প্রকাশিত হয়। বিলাতের প্রসিদ্ধ 'টাইমস্' পত্র ইহার আট বৎসর পর জন্মগ্রহণ করে। হিকি সাহেবের কাগজ সাপ্তাহিক ছিল এবং ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। এই কাগজখানি ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। হিকি সাহেব ওয়ারেন হেস্টিংস ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পেকে পর্যন্ত আক্রমণ করিয়া লিখিতেন। হেস্টিংস সেইজন্য

তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং জেলের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ভারতের প্রথম ইংরাজী সাময়িক পত্রের আলোকচিত্র পাঠকগণের অবগতির জন্য ৪৯২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

'দিগদর্শন' প্রকাশের এক মাস পরে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন; ইহার নাম **"সমাচার দর্পণ"**। ইহাই বাংলা দেশের প্রথম সংবাদপত্র। সেই সময় বাংলা ভাষার চর্চা একপ্রকার ছিল না। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯ বিধান অনুসারে বাংলা ভাষা সরকারী আদালতে প্রচলিত হইবার আদেশ হইলে বাংলা ভাষার সমাদর হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ফার্সী ভাষা আদালত হইতে একেবারে উঠিয়া যাইলে বাংলা ভাষা শিক্ষা তখন প্রত্যেকেরই একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে এবং সর্বত্র পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী হইতে হ্যালহেডের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হওয়ার পর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া নিবাসী রামতারক রায় "সদর দেওয়ানী আইন বিধি" নামক একখানি পুস্তক, ইংরেজী আইনগ্রন্থ হইতে সারসঙ্কলন করিয়া বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬।

ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ সেই সময় দেশীয় ভাব বিসর্জন দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার সমস্তই মঙ্গলদায়ক বলিয়া বিবেচনা করিত। বাঙ্গালী যুবকগণের যখন এইরূপ মনের অবস্থা, সেই সময় লর্ড মেকেল মন্তব্য করিলেন—"That a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia." এক সেলফের ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষে বা আরব-সাহিত্যে তাহা নাই। এই শ্লেষাত্মক উক্তিতে কাহারও কাহারও প্রাণে স্বদেশহিতৈষণার ভাব উদ্দীপ্ত হইল। হুগলী জেলার অন্যতম সুসন্তান রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে লইয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে **"জ্ঞানান্বেষণ"** নামে পত্রিকা বাহির করেন।

॥ দিগ্দর্শন ॥

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর হইতে মিশনারীগণ বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র **"দিগ্দর্শন—অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ"** নামে একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন; ইহার ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল, পরে এই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ইংরেজী সংস্করণ ১৫শ সংখ্যা পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর হইতে প্রথম সাময়িকপত্র **"দিগ্দর্শন"** বাহির হইবার সময় ইহাতে কোন **'ভূমিকা'** ছিল না। কারণ মিশনারীগণ শ্রীরামপুর হইতে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় ইংরেজ সরকারের মনোভাব সংবাদপত্রগুলির উপর ভাল ছিল না, তাই তাহারা 'দিগ্দর্শন'কে পরীক্ষার জন্য বাহির করেন বলিয়া উহাতে কোন ভূমিকা ছিল না। এই সম্বন্ধে মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

It appeared in 1818 that the time was ripe for a native newspaper and I offered the missionaries to undertake the publication of it. The jealousy which the Government had always manifested of the periodical press appeared however to present a serious obstacle. *In this state of things it was difficult to suppose that a native paper would be tolerated for a moment.

It was resolved therefore to feel the official pulse by starting a monthly magazine in the first instance and the Dig Dursun appeared in April 1818.

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জনক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীগণ "দিগ্দর্শন" নামক একখানি বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। "দিগ্দর্শন" পত্রিকা সম্বন্ধে "ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় এইরূপ মন্তব্য লিখিত হয়ঃ

"দেশীয় বালকদিগকে বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত করিবার প্রথা গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে, ইহাতে বিদ্যালয়গুলিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করা যে অত্যাবশ্যক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় ও বিদেশীয় ঘটনা পরম্পরার বিবরণ জানিবার যে ইচ্ছা যুবকদিগের মনে প্রবল হইয়াছে, সেই ইচ্ছার পুষ্টিসাধন ও তাহাদিগের পাঠোপ-যোগী উৎকৃষ্ট বিষয় সমূহের নির্বাচন করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে তাহাদিগের নিজের উন্নতি হইতে পারিবে এবং তাহাদিগের মনে অসৎ ও অনিষ্টকর চিন্তাসমূহ বদ্ধমূল হইতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে "দিগ্দর্শন" নামক বঙ্গভাষায় একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি মাসিক প্রত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে দেশীয় যুবকদিগের পাঠনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করা যায়, উক্ত পত্রিকার দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কোন বিশিষ্ট বন্ধুর উপদেশানুসারে প্রতি সংখ্যায় সূচী প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকেরা বাঙ্গালা পাঠ করুক আর নাই করুক, যদি তাহারা তাহাদিগের দেশীয় ভৃত্য ও প্রতিবাসীদিগের মধ্যে ইহার কতকগুলি বিতরণ করিতে ইচ্ছা করে. তবে তাহারা অনায়াসে প্রত্যেক সংখ্যায় যে যে বিষয় লিখিত আছে তাহা সম্যক অবগত হইতে পারিবে।"

দিগ্দর্শনের প্রচারসংখ্যা খুব বেশী ছিল না কারণ সেই সময় দেশের অধিকাংশ লোকই লেখাপড়া তেমন জানিত না। যাঁহারা শিক্ষিত মুন্সী বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহারা পার্সী ও সামান্য ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহা ছাড়া ডাকের বেলুন, প্রতিধ্বনি প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি দিগ্দর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের অসুবিধা ইহার অল্প প্রচারের একটি প্রধান কারণ ছিল। রাজা রামমোহন রায় দিগ্দর্শনের লেখক ছিলেন। তাঁহার 'অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি' 'মকর মাসের বিবরণ', গ্রন্থাবলীতে এই প্রবন্ধগুলি "সংবাদ কৌমুদী"তে প্রকাশিত বলিয়া যাহা লিখিত আছে,

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং কর্ম্ম হইয়াছে সেং কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লোহে ঘষিলে সে লৌহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমানাংশ করিয়া চতুর্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্

ক না

প্রথম সাময়িকপত্র দিগ্দর্শন পত্রের বাংলা সংস্করণের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

তাহা ঠিক নয়। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার 'বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্যে'ও এই ভুলটি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'য় দিগ্দর্শনের ১ম ও ২য় সংখ্যার যে সূচী বাহির হইয়াছিল তাই এইরূপঃ

প্রথম সংখ্যার সূচী

(১) আমেরিকা আবিস্কারের বিবরণ। (২) হিন্দুস্থানের ভৌগলিক সীমা। (৩) হিন্দুস্থানের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য সমূহ। (৪) মিঃ স্যার্ডলারের ডব্‌লিন হইতে হোলিহেড্ ভ্রমণ। (৫) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার বিবরণ। (৬) শঙ্কর তরঙ্গের কথা।

দ্বিতীয় সংখ্যার সূচী

(১) উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতে আগমনের পথ আবিস্কার। (২) বাঙ্গালা দেশের বৃক্ষলতাদি। (৩) রাজকন্যা সারলটীর মৃত্যু। (৪) বাস্পীয় পোতের বিবরণ। (৫) কুমিল্লা দেশবাসী কর্তৃক দেশীয় বিদ্যালয়ে চাঁদা দান। (৬) বিখ্যাত পণ্ডিত বাচস্পতির মৃত্যু। (৭) নূতন প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণ। (৮) এ দেশীয় লোকের বিবিধ পরোপকারের কার্য। (৯) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কথা।

ইহা বিলাতী কাগজে ও দেশীয় অক্ষরে মুদ্রিত। প্রতি সংখ্যায় ২৪ খানি পৃষ্ঠা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

দিগ্দর্শনের ২৬ সংখ্যায় মোট ১০, ৬৭৬ পত্রিকা মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া লং সাহেব লিখিয়াছেন। সুতরাং গড়ে এই পত্রিকা মাত্র চারশত ছাপা হইত বলিয়া জানা যায়।

দিগ্দর্শনের মলাটে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় পত্রিকার নাম ও সাল লেখা হইত। উপরে নীল বর্ণের মলাট ও ইংরাজী পুস্তকের অনুকরণে উপরে সূচী লিখিত আছে। পত্রিকাখানি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইবার পর যে কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট থাকে, তাহা পরে একত্রে বাঁধিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। নিম্নে আখ্যাপত্রের বিবরণ দেওয়া হইল :

দিগ্দর্শন

অর্থাৎ

যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ।

ইংরেজী এপ্রিল ১৮১৮ লাং মার্চ ১৮১৯

এবং

ইংরেজী জানুয়ারী লাং এপ্রিল ১৮২০

DIG DURSHUN
or the
Indian youths' Magazine
from April 1818 to March 1819
and from
January to April 1820
C. S. B. S.
১৮২২

॥ সমাচার দর্পণ ॥

প্রথম বাংগলা মাসিকপত্র প্রকাশের এক মাস যাইতে না যাইতে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন **"সমাচার দর্পণ"** নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) তারিখে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন; মার্শম্যান এই পত্রের সম্পাদক হন। ইহাই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র। রেভারেণ্ড লং সাহেব সমাচার দর্পণকে বাংলার আদি সংবাদপত্র বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইত এবং দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া জনহিতৈষণামূলক প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইত। এই পত্রের চতুর্থ সংখ্যায় যে **"ইস্তাহার"** প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উল্লেখ্য ঃ

"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্য-মত ১৷৷৹ টাকা প্রতি মাস লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইয়া এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১৷৷৹ টাকা যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস মাস এক টাকা দিতে হবেক।"

দিগ্দর্শনকে সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া প্রকাশ করা সত্ত্বেও যখন ইংরাজ রাজ-পুরুষগণ কোনরূপ আপত্তি করিলেন না, তখন শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ দিগ্দর্শন বন্ধ করিয়া আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং পত্রিকার নাম ঠিক করিবার জন্য তাঁহাদের এক বৈঠক বসিল। কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন যে, বৈঠকে স্থির হইল, বিলাতের প্রাচীনতম সংবাদপত্র "Mirror of News" এর অনুকরণে এই পত্রিকার নাম "সমাচার দর্পণ" রাখা হউক। তখন সকলের সম্মতিক্রমে নাম স্থির হইয়া কার্য আরম্ভ হইল। কিন্তু কেরী সাহেব সংবাদপত্র বাহির করিয়া ইংরেজ রাজপুরুষগণের শুভদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হওয়া সঙ্গত নয় বলিয়া তিনি এই অনুষ্ঠানে বিরোধী হন, তবে মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের চেষ্টায় তিনি শেষে তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 'সমাচার দর্পণে'র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ

সমাচার দর্পণ

কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকরদের নিকট সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না। এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা যাইত তবে কাহারও উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এই ২ সমাচার দেওয়া যাইবে।

১। এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যে ২ নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংলন্ড ও ইউরোপের অন্য ২ প্রদেশ হইতে যে ২ নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোক কর্তৃক যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ ইংগলন্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।" সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ৫০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

এই সাপ্তাহিক পত্র ক্রমশঃ অর্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল, সপ্তাহে দুইবার অর্থাৎ প্রতি শনিবার ও বুধবারে প্রকাশিত হইত। উক্ত সময়ে বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী ভাষা শিখিবার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল, সেইজন্য শ্রীরামপুর মিশন এই কাগজটিকে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজী ও বাংলা এই উভয় ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। যে সঙ্কল্প লইয়া ইহার জন্ম হয়, পরিচালকগণের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় শেষে তাহা পরিত্যক্ত হয়। 'সমাচার দর্পণ' কেবল খবর প্রদান করিতে লাগিল এবং **বিদ্যা প্রকাশের** জন্য দিগ্দর্শন জীবিত রহিয়া গেল।

মার্শম্যান সাহেব ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে **"গভর্ণমেন্ট গেজেট"** নামক একখানি সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক হইলেন; তিনখানি সংবাদপত্র পরিচালনা করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া তিনি ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সমাচার দর্পণ বন্ধ করিয়া দেন। সম্পাদকের কর্ম-বাহুল্যের জন্যই যে সমাচার দর্পণ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত "ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া" পত্রে (৩০ ডিসেম্বর ১৮৪১) লিখিত আছে:

> The editor of the Samachar Darpan finds himself under the necessity of closing that journal with the termination of the present year. With two other journals the Friend of India and the Bengalee Government Gazette to attend to, it is not possible to do that justice to the Darpan whether in reference to the supply of editorial observation and intelligence, or to the translation of them into Bengalee, which a due regard for the interests of his subscribers and his own reputation require.

মিশনের কর্তৃপক্ষগণ সমাচার দর্পণ বন্ধ করিয়া দিলেও দীননাথ দত্তের চেষ্টায় ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়; এবং ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদনা করেন, কিন্তু কিছুদিন পর ইহাও বন্ধ হইয়া যায়।অতঃপর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে টাউনসেন্ড সাহেব কর্তৃক তৃতীয়বার সমাচার দর্পণ 'শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়' হইতে প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' যাহা লিখিয়াছেন (১৫ই মে ১৮৫১) তাহা উদ্ধারযোগ্য:

সমাচার দর্পণ।

১ সংখ্যা] শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫।

সমাচার দর্পণ।

কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাসং ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এইং সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কলেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্যক্ষেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যেং নূতন আইন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ ইংগ্লণ্ড ও ইওরোপের অন্যং প্রদেশহইতে যেং নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইওরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যেং নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যেং নূতন পুস্তক মাসেং ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যেং নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে ৮ জুন সোমবার সাড়ে দশ ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরানা কুঠীর মধ্যে খাতাবাটীতে মোকাম বান্দা আমদানী মসলা জাহাজ সুবরয়া ও মেনাডুন আইসে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবেক নীচে দফাওআরী লিখিত মতে জানিবা।

বান্দা আয়ফল প্রথম রকম	৭৫০০ পোন
মধ্যে দোসরা রকম	৭৫০০
মাবা— নীরস	২০০১
এমবোয়ানা আয়ফল	
খোমামমেত	৮০
বান্দা জৈত্রী প্রথম রকম	১০০০০
মাবা নীরস	২০৬
এমবোয়ানা নীরস	১৪১

২ দফা এক টাকা ফিলাট বায়না ও আমানত ফিশত ১০ দশ টাকার উপর দিতে হইবেক নিলামের সময় মাতবরির কারণ তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট পুনরায় বিক্রয় হইবেক ক্রয় করিতে কোন নোকসান হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক।—

৩ তিন দফা ইস্তক নিলামের তারিখ লাগাইদ এক মাহার মধ্যে মসলা খরিদের বেবাক টাকা দিয়া মাল খালাষ করিয়া লইয়া যাইবেক যদি এই মাফিক না করে তবে ঐ আমানত এবং বায়নার টাকা কোম্পানিতে ওলাগায় হইবেক এবং মসালা নগদ টাকায় পুনরায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে যে নোকসান হইবেক এবং বাজে

প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

"The Samachar Darpan—We are happy to perceive that this native journal has been revived. It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon dropped or died."

ডাক্তার উইলিয়ম কেরী **"সমাচার দর্পণ"** প্রকাশ করিবার পূর্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদপত্রে সমাচার দর্পণের প্রচার বৃত্তান্ত প্রথমে ঘোষণা করেন। কেরী সাহেব ইংরাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে সেই সময় কার্য করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে এই সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, "এই বঙ্গভাষায় লিখিত সংবাদপত্রে রাজনীতি আলোচনা করা রাজপুরুষগণের প্রীতিকর হইবে না, কারণ ইহাতে আপামর ব্যক্তি পর্যন্ত রাজনীতির আস্বাদন পাইবে, তাহাতে রাজ্যে বিশৃংখলা ঘটিবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ ইংরাজী সংবাদপত্র পরিচালনকারীগণকেই যখন সময়ে সময়ে রাজপুরুষগণের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইতে হয়, তখন এই সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য হয়ত তাঁহাকেও রাজপুরুষগণের বিষনয়নে পড়িতে হইবে। সমাচার দর্পণ প্রকাশের পূর্ব রজনীর সান্ধ্য সমিতিতে বসিয়া পাণ্ডুলিপির শেষ রচনা সংশোধন করিবার সময় ডাক্তার কেরী ঐ ভীতি প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করেন। তদুত্তরে ডাক্তার মার্শম্যান বলেন যে, "আগামী কল্য প্রাতে গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট সূচী ও সংবাদপত্র প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলেই গভর্ণমেন্টের মন্তব্য জানিতে পারা যাইবে।" ডাক্তার মার্শম্যানের প্রস্তাবানুযায়ী পরদিবস ডাক্তার কেরী গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর নিকট সূচী ও সংবাদপত্র প্রেরণ করেন। উক্ত সংবাদপত্র পাঠ করিয়া কোন রাজপুরুষ কোনরূপ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন না; অধিকন্তু গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস বাহাদুর প্রীত হইয়া সম্পাদককে স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন : It is salutary for the supreme authority to loo to the control of public scrutiny.

এই অপ্রত্যাশিত রাজসম্মান প্রাপ্ত হওয়ায়, ডাক্তার কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীগণ যে, অত্যন্ত প্রীত ও উৎসাহন্বিত হন তাহা বলাই বাহুল্য। "সমাচার দর্পণ" পাদ্রীদিগের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র হইলেও, হিন্দু সমাজের তদানীন্তন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ পর্যন্ত উহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের নাম গ্রাহক তালিকার সর্বপ্রথমে লিখিত থাকায়, ইংরাজ সমাজে বাঙ্গালীর নাম যশ ও মুখোজ্জ্বল হয়। "সমাচার দর্পণে" রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য এবং ইংলণ্ড ও ভারতের কথাতে যেমন সমলংকৃত হইত, তেমনি বাঙ্গালীদের প্রেরিত মফস্বল সংক্রান্ত "প্রেরিতপত্র," "সংবাদ" ও "অভাব অভিযোগ" প্রকাশিত হইত। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মিশনারিগণ "সেরিফসেলের বিজ্ঞাপন (নিলামী ইস্তাহার) বঙ্গভাষায় প্রচার করা আবশ্যক" বলিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করায়, গভর্ণমেন্ট তাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, "সমাচার দর্পণে" বঙ্গভাষায় সেই[illegible] বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। "সমাচার দর্পণ" একাদিক্রমে ২১ বৎসর কাল বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হয়, তাহার পর

ইংরাজী ও পারশ্য ভাষায় মুদ্রিত হয়। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকালে গভর্ণমেন্ট শতাধিক সংখ্যা পত্রিকা ক্রয় করতঃ রাজকর্মচারীগণকে বিতরণ করিতেন।* "সমাচার দর্পণের" ৩৫০ জন গ্রাহক হইয়াছিল এবং ১৬০ জন নগদ মূল্যে ক্রয় করিতেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল ১২্ টাকা; চাঁদার টাকায় ও বিজ্ঞাপনের মূল্যে উহার ব্যয় নির্বাহ হইত। "দর্পণের" পশ্চাদ্ভাগে পারদ না থাকিলে বা বহু পুরাতন হইলে যেমন তাহাতে বদন নিরীক্ষণ করা যায় না, সেইরূপ "সমাচার দর্পণ"ও পুরাতন হওয়ায় এবং তাহার কার্য-কারিতা পূর্বের ন্যায় ফলপ্রদ না হওয়ায় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মিঃ টাউনসেন্ড ও মিঃ জে মার্শম্যান প্রভৃতি অপরাপর মিশনারি-দিগের ঐকান্তিক চেষ্টায় "সমাচার দর্পণ" পুনরায় প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়ের সমাচার দর্পণ দেড় বৎসর চলিবার পর একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। ১লা বৈশাখ ১২৬০ (১২ই এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, "সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরের গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে।"

॥ ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া ॥

১৮১৮ খৃঃ, ৩০শে এপ্রিল ডঃ মার্শম্যান শ্রীরামপুর হইতে **"ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া"** নামক একখানি ইংরাজী মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। "ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" পত্রে ভারতবর্ষের উন্নতি বিষয়ক মৌলিক রচনা, লর্ড হেষ্টিংসের চেষ্টায় স্থাপিত সভা সমিতির কার্যবিবরণী এবং শিক্ষা ও মিশনারী সমিতির কার্যাবলি প্রকাশিত হয়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্শম্যান "ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া"র একখানি ত্রৈমাসিক সংস্করণও প্রকাশ করেন। ঐ সময়ে দেশের উন্নতি বিষয়ক আন্দোলন অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, উক্ত পত্রিকা প্রচারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছিল, সেই কারণ তাঁহাকে উক্ত পত্রিকা প্রকাশ করিতে হয়। ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার ত্রৈমাসিক সংস্করণে ভারতের উন্নতি বিষয়ক কথা এবং যে সকল পুস্তক পাঠ করিবার জন্য দেশের লোক আগ্রহ প্রকাশ করিত সেই সকল পুস্তকের সমালোচনা উহাতে প্রকাশিত হইত।

"ফ্রেন্ড অফ্ ইণ্ডিয়া"য় সতীদাহ প্রথা নিবারণ সমর্থন করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া মিষ্টার এডাম কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, "উক্ত প্রবন্ধটি আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া দেশবাসীর মনে আতঙ্ক হইতে পারে যে তাঁহারা তাহাদের ধর্ম ও রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

* "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয় প্রস্তাব" নামক পুস্তকে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—আমাদের স্মরণ হয়, আমরা বাল্যকালে এই "সমাচার দর্পণ" অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। আমাদের গ্রামে "বন্ধারিয়া" দল নামক পরপীড়ক একদল গাঁজা-খোর ছিল। সমাচার দর্পণে তাহাদের অত্যাচারের কথা লিখিত হওয়ায়, দারোগা আসিয়া সুরথাল করে, তাহাতে তাহারা শাসিত হয়।"

কিন্তু মারকুইস্ অফ্ হেষ্টিংস উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তন্মধ্যে আপত্তির কোন কিছু দেখিতে না পাওয়ায়, তিনি মাননীয় মিঃ এডামের প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। বরং সম্পাদককে ধন্যবাদ দিয়া জানান যে, তিনি সতীদাহ প্রথা নিবারণের সম্পূর্ণ পক্ষপাতি।"

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে **"ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া"র** সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রেভারেন্ড মার্শম্যান, মিঃ জনম্যাক্ এবং লিচম্যান এই তিন জনে মিলিয়া "ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া"র সাপ্তাহিক সংস্করণ পরিচালনা করেন। এই সাপ্তাহিক সংস্করণে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ থাকিত না। সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধ উহাতে লিখিত হইত। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতির আন্দোলন ও আলোচনার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার শাসন কালের শেষভাগ এই সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং যে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি এই পত্রিকার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সাপ্তাহিক সংস্করণে সমাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির আলোচনা প্রকাশিত হওয়ায়, সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারীগণ উহার পৃষ্ঠপোষক হন। প্রথম বৎসরে "ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া"র সংস্করণের দুইশত গ্রাহক হইয়াছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার স্বত্ত্বাধিকারী মিঃ রবার্ট নাইট উক্ত "ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া" পত্রের স্বত্ত্ব ৩০,০০০্ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। তিনি প্রথমে উহার দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার পর "ষ্টেটসম্যান এন্ড ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া" নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাবধি এই পত্র "দি ষ্টেটসম্যান" এই নামে কলিকাতা ও দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইংরাজী সংবাদপত্রের মধ্যে ইহার প্রচার ভারতে সর্বাধিক।

॥ শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত অন্যান্য সাময়িক পত্র ॥

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই হইতে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট গেজেট মিশনারীদিগের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। উক্ত গেজেটে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রতি সপ্তাহে দুইবার মুদ্রিত হইত। ১৮৪০ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জনক্লার্ক মার্শম্যান এবং ১৮৫৩ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জন রবিন্সন উক্ত গেজেটের সম্পাদক ছিলেন এবং মিঃ মার্শাল ডিক্রুজ মুদ্রাকর ছিলেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে হইতে (২৫ বৈশাখ ১২৩৩) শ্রীরামপুর মিশন **"আখবারে শ্রীরামপুর"** নামে 'সমাচার দর্পণে'র ফার্সী সংস্করণ প্রকাশ করেন। গভর্ণমেন্ট এই পত্রিকার জন্য মাসিক ১৬০্ টাকা সাহায্য করিতেন।

বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত **"জ্ঞানারুণোদয়"** নামক একখানি মাসিকপত্র ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী (১৯শে মাঘ ১২৫৮) শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়. কালিদাস মৈত্র পত্রিকাখানি সম্পাদনা করিতেন। পর বৎসর উক্ত পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। পূর্বোক্ত "চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়" ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং এই প্রেস হইতেই শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা বাহির হইত। 'জ্ঞানা-

রুণোদয়' সম্বন্ধে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল : "শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশ্য পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।"

সেওড়াফুলির রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় ও পূর্ণচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে **'জ্ঞানারুণোদয়'** প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক কালিদাস মৈত্র আকনানিবাসী হরিশচন্দ্র দে ও শ্রীনাথ দে'র অর্থসাহায্যে "বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই পুস্তকে রেলওয়ের বিস্তারিত বিবরণ, দিনেমারদের শাসন ব্যবস্থা ও শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কথা লিখিত আছে।

জ্ঞানারুণোদয়ের কর্তৃপক্ষ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই (২৪শে আষাঢ় ১২৫৯) চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে"সংবাদ শশধর" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার" বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত। কিছুদিন চলিবার পর ১২৫৯ বঙ্গাব্দেই 'সংবাদ শশধর' বন্ধ হইয়া যায়। এই বিষয়ে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখের "সংবাদ প্রভাকরে" নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াহিল :

"গত বৎসর কয়েকখানি পত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 'শশধর' নামে শ্রীরামপুরে যে এক বারোইয়ারী পত্র হয়, সেই শশধর একেবারে মেঘাচ্ছন্ন হইলেন।"

১২৬৪ সালের ২রা বৈশাখ শ্রীরামপুর 'তমোহর' যন্ত্রে জে, এচ, পিটার্স কর্তৃক মুদ্রিত এবং নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া **"বিজ্ঞান-মিহিরোদয়"** নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পরে এই পত্রিকা পাক্ষিকে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর যন্ত্রালয় হইতে শ্রীমেরিডিথ টৌন্সেন্ড কর্তৃক **"সত্যপ্রদীপ"** নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে প্রকাশিত এবং এক বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬শে এপ্রিল ১৮৫১।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীরামপুর যন্ত্রালয় হইতে "The Evangelist **মঙ্গলোপাখ্যান পত্র"** নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, এই পত্রিকাখানি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ইহার বামদিকে ইংরেজী অংশ ও ডানদিকে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইত। এই দ্বিভাষিক পত্র কিছুদিন খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে **"অরুণোদয়"** নামে একটি সচিত্র পাক্ষিক পত্র শ্রীরামপুর তমোহর যন্ত্রালয় হইতে শ্রীযুক্ত জে, এইচ পির্টাস কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। রেভারেন্ড লালবিহারী দেব ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রের ১ম সংখ্যায় মঙ্গলাচরণে লিখিত হইয়াছিল যে, "জগদীশ্বরের প্রসাদেতে এই পত্রিকা পক্ষান্তে একবার অর্থাৎ প্রতি-মাসে দুইবার প্রকাশ পাইবে এবং ইহার প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য এক আনা অথবা অগ্রে প্রদান করিলে বার্ষিক মূল্য এক টাকা নির্ধারিত হইল। এই সচিত্র পত্রিকাখানি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর আলফ্রেড প্রেস হইতে (ফাল্গুন ১২৭৯) **"সর্বার্থ-সংগ্রহ"** নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। অতুলনাথ তর্কবাগীশ ও কালীবর

বেদান্ত বাগীশ এই মাসিকপত্র সম্পাদন করিতেন। পত্রিকাখানিতে "বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক" বলিয়া লেখা থাকিত।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে **প্রসূকমূনন্দিনী** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় বলিয়া কেদারনাথ মজুমদার বাঙলা সাময়িক সাহিত্যে লিখিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহার কোন সংখ্যার সন্ধান পাই নাই।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চাতরা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত অভিলাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **"বিবিধ বার্তা প্রকাশিকা"** নামে একখানি পাক্ষিক পত্র শ্রীরামপুর হইতে বাহির করেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে (বৈশাখ ১২৮৩) শ্রীরামপুর হইতে "চুম্বক নজীর" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে "হাইকোর্টে নিষ্পন্ন মোকদ্দমার চুম্বক সংগৃহীত হইত।"

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে (বৈশাখ ১২৮৫) **"প্রকৃতি রঞ্জন"** নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। সারদাচরণ মিত্র এম. এ. বি. এল এই পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। এই পত্রিকায় লেখা থাকিতঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক মাসিকপত্র প্রজাসাধারণের পাঠার্থ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে (পৌষ ১২৮৯) **"বঙ্গবন্ধু"** নামে একটি মাসিকপত্র শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র রায় ইহা প্রকাশ করেন। এই নামে "খৃষ্টতত্ত্বমূলক মাসিক পত্র" বলিয়া রেঃ বরদাচরণ ঘোষের সম্পাদনায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। খৃষ্টতত্ত্বমূলক বঙ্গবন্ধু কত দিন চলিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে **"স্নেহময়ী"** নামে মাসিক পত্র ডবলিউ কেরীর সম্পাদনায় শ্রীরামপুরে হইতে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে (কার্তিক ১২৯৬) **"রুচী"** নামে একটি মাসিকপত্র শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার **"শ্রীরামপুর"** নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। চারমাস পর উহার স্বত্ত্ব বসন্তকুমার বসুকে দেওয়া হয়। তিনি প্রথমবর্ষে আট মাস পাক্ষিক রূপে প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় বর্ষ হইতে উহা সাপ্তাহিক পত্র রূপে প্রকাশ করেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের মূল্য এক পয়সা ছিল। শ্রীরামপুরের বহু প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্মস্থানের বিবরণ ইহাতে প্রকাশিত হইত। পরিচালকগণের মধ্যে ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অন্যতম ছিলেন। ১৩২৪ সালে বসন্তবাবু "শ্রীরামপুরে" প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি **"শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস"** নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপদ মুখোপাধ্যায় ও শশীভূষণ সরকার শ্রীরামপুর হইতে **"শ্রীরামপুর ও আরামবাগ সম্মিলনী"** নামে একখানি বাঙলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানি পাঁচ বৎসর চলিয়া পরে বন্ধ হইয়া যায়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট (৩০ শ্রাবণ ১৩২৪) শ্রীঅতুল্য ঘোষ হুগলী জেলার মুখপত্র রূপে **"পত্র"** নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। শ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উহা সম্পাদনা করেন। শ্রীরামপুর হইতে "নির্মোক" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলি আজও চলিতেছে।

খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি

১৮২২ সনের মে মাসে **'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি'** নামে একখানি "মাসিক সমাচার পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা দ্বিতীয় মাসিকপত্র। প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিতঃ এই সমাচার পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হইবে. ইহার মূল্য প্রতি কাগজ এক আনা লাগিবেক।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের সহায়তাকল্পে পত্রিকাখানির সৃষ্টি হয়। প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছেঃ

সকলকে জানান যাইতেছে এই পত্র প্রতিমাসে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা করিবার বাসনা আছে অতয়েব যে কোন খৃষ্টিয়ান মণ্ডলীর কোন সমাচার প্রকাশের আবশ্যকতা বোঝেন তাহা এখানে পাঠাইলে এই পত্রে ছাপান যাইবেক।

ইহার পর খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি দীর্ঘ প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা যাইবেঃ—

অন্য২ দেশে খৃষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিরদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোকদ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহারদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগকে জ্ঞাত করার কারণ মাসে মাসে এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক। এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল ভাল পুস্তক ছাপাইয়া ধর্মজ্ঞানার্থে হিন্দুদিগকে দিতে এবং তাহাদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এবিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিয়া ও মাস২ কিছু২ করিয়া দিবা ও প্রভু য়িশু খৃষ্টের মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করর্ণার্থে বাঙ্গালি খৃষ্টিয়ানের মধ্যে এক দল কর। যখন শ্রীযুত মেস্তর ম্যাক সাহেব ইংলণ্ড ছাড়িলেন তখন কতক গরিব চাকরেরা একত্র হইয়া বাঙ্গালি কোন কেতাব ছাপাইয়া বাঙ্গালি লোককে দিতে ৫ টাকা দিল তাহারা বাঙ্গালি লোকেরদিগকে প্রেম বোধ করিয়া টাকা দিল এই পাঁচ টাকার দ্বারা আমরা এক পুস্তক আরম্ভ করিব এবং এই ভরোসা করি যে তোমরা ক্রমে ক্রমে ইহা বৃদ্ধি করিবে।

॥ চুঁচুড়ার সাময়িক পত্র ॥

সুবোধিনী—চুঁচুড়া হইতে প্রথম সাময়িকপত্র ঠিক শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী (১লা মাঘ ১২৪৬) প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি পাক্ষিক পত্র নাম "সুবোধনী" এবং ইহা সম্পাদনা করিতেন রামচন্দ্র দীক্ষিত। ইনি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, কিন্তু খুব ভাল বাংলা জানিতেন। এই পত্রিকাখানি চুচুঁড়ার 'চন্দ্রোদয় যন্ত্রে' মুদ্রিত হইত বলিয়া লং সাহেব উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অভয়চন্দ্র পাঁড়ে প্রভৃতি লিখিতেন। অভয়চন্দ্র সুরসিক ছিলেন; তাঁহার

রচিত একটি কবিতা সুবোধিনীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক লাইন উল্লেখ্যঃ

জয় বৃটিশের জয়, জয় বৃটিশের জয়।
যতেক বিদ্রোহীদল, যাক সব রসাতল
প্রবল বৃটিশের বল, হউক অক্ষয়।
বল হউক অক্ষয়।
জয় বৃটিশের জয়, জয় বৃটিশের জয়।

'সুবোধিনী' পত্রিকার কোন সংখ্যা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মাত্র দুইটি সংখ্যা (১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা) বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

'সুবোধিনী' প্রকাশিত হইলে, উহার ১ম সংখ্যা দেখিয়া 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' ২২শে জানুয়ারী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে সমালোচনা প্রকাশ করে, তাহা এইরূপ ঃ

"চুঁচুড়া নগরে প্রকাশিত সুবোধিনী নাম্নী এক পাক্ষিকী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম, বর্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসে ইহার জন্ম হইয়াছে। × × আমরা প্রার্থনা করি, এবম্প্রকার পত্র নিকর বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে পম্বনবৎ প্রকাশিত হউক। পরন্তু সুবোধিনীর উচিৎ, জন্মভূমি চুঁচুড়া এবং অদন্তঃপাতি প্রদেশের সমাচার প্রদান পূর্বক পাঠকগণকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করেন, ইহাতে বিশেষ উপকার এই যে, সংবাদ লিখনের অভ্যাস সুন্দররূপে হইলে তাঁহার ভাষার লালিত্য বৃদ্ধিসহ সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হইবেক।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার 'পিতা-পুত্র' প্রবন্ধে সুবোধিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "সুবোধিনী নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারসিয়ার পরীক্ষা পাশ করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায় সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুলস্ক্যাপ আকারের কাগজ, দুই স্তম্ভে । যাহারা সাধারণী দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, যে সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ।

সুবোধিনীতে ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্র শ্রেণী অনেকেই পদ্য লিখিতেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় এবং মাদালের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বোধ হয় সকলেই এখনও কেহ কেহ স্মরণ রাখিতে পারেন। অভয়চন্দ্র পাঁড়েকে বোধ হয় সকলেই ভুলিয়াছেন। তিনি সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিতের মামাত কি পিস্তুত ভাই ছিলেন। * * *

স্কুলের প্রথমাবস্থায়, সংবাদপত্রের মধ্যে এই সুবোধিনী আমার প্রধান সম্বল ছিল। এডুকেশন গেজেট বা প্রভাকর আর দেখিতে বা পড়িতে পাইলাম না।"

সুবোধিনী কতদিন চলিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি সঠিকভাবে জানা যায় নাই, কারণ ইহার সমস্ত সংখ্যাগুলি দেখিবার কাহারও সুযোগ হয় না। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইহা 'তিন কি চারি বৎসর' চলিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। সম্পাদক রামচন্দ্র বাবু উচ্চতর কর্মে নিযুক্ত হওয়ায়, তিনি কাজ পরিচালনা করিবার ভার চুঁচুড়ার অন্যতম পণ্ডিত যাদবচন্দ্র

তর্কবাগীশ নামক এক পণ্ডিতের উপর দেন। কিন্তু তিনি এরূপ কঠিন বাংলায় কাগজ লিখিতে লাগিলেন, যে দুই-চারি মাসের মধ্যেই কাগজ উঠিয়া যায়।

চুঁচুড়া হইতে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র 'সুবোধিনী' নামে ১লা বৈশাখ ১২৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা খাঁটি বাঙ্গলায় "পয়ারাদি ছন্দে লিখিত" হইত। ইহা সম্পাদনা করিতেন কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায়। সাপ্তাহিক আকারে "সুবোধিনী" আট সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর, পরবর্তী আষাঢ় মাস হইতে ইহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এই মাসিক সুবোধিনী সম্পাদন করিতেন শ্রীকালীদাস মিত্র।

চুঁচুড়ায় সাময়িক-পত্রের জন্ম হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে; সেই সময় হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চুঁচুড়া হইতে ত্রিশখানি সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে একখানি দৈনিক, আটখানি সাপ্তাহিক, একখানি পাক্ষিক ও কুড়িখানি মাসিকপত্র ছিল। এই সকল পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। এইগুলি ছাড়া চুঁচুড়ায় আরও সাময়িকপত্র হয়ত জন্মলাভ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু লিখিত বিবরণ না থাকায় এবং অযত্ন ও জলবায়ুর দোষে অধিকাংশই এখন লোপ পাইয়াছে। সুতরাং বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা বর্তমানে সহজসাধ্য নহে।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ॥ চুঁচুড়ার দ্বিতীয় সাময়িকপত্র; ইহা 'কলিকাতা ইটালি পদ্মপুকুর ১৪ নম্বর ভবনে সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া' ২২শে আষাঢ় ১২৬৩ (৪ জুলাই ১৮৫৬) সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় 'সুবোধিনী' প্রকাশের দেড় বৎসর পূর্বে বাহির হয়; ইহা প্রতি শুক্রবারে রেভারেন্ড ও ব্রায়ান স্মিথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত। শিক্ষাবিভাগ হইতে এই পত্রিকাকে মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য দেওয়া হইত।

এডুকেশন গেজেটের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ২৫শে আগষ্ট ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিভাগের একখানি পত্র হইতে নিম্নোক্ত কথাগুলি জানা যায়।

The object is to supply the people in the interior of the country with a newspaper cheap in price and healthy in tone.

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন এই পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন। সম্পাদক ও'ব্রায়ান স্মিথের শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিলাত চলিয়া যান; তখন অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার উক্ত বৎসরের মার্চ মাস হইতে সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্যারীচরণ বাবু সম্পাদক হইবার পূর্বে কিছুদিন কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক এডুকেশন গেজেট পরিচালনা করেন। প্যারীচরণ বাবুর সময়ে এই পত্রিকা খুব সুনাম অর্জন করে।

আড়াই বৎসর কৃতিত্বের সহিত পত্রিকা চালাইবার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামনগর স্টেশনে রেল দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয় বলিয়া প্যারীচরণ স্বয়ং উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার কাগজে একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। সরকারী অর্থে প্রতিপালিত পত্রে সরকারের বিরুদ্ধে লেখায়, সরকার তাঁহার উপর বিরক্ত হন এবং তিনি পদত্যাগ করিতে

বাধ্য হন। "ফার্স্ট বুক অফ রিডিং" প্যারীচরণ সরকারকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

প্যারীচরণ পদত্যাগ করিলে তৎকালীন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং লেপটেন্যান্ট স্যার উইলিয়ম গ্রে মাসিক তিনশত টাকা সাহায্যসহ ভূদেব বাবুকে পত্রিকাখানির সর্বস্বত্ব দান করেন। ভূদেব বাবু কলিকাতা হইতে পত্রিকাখানিকে চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত করেন এবং ১২৭৬ সালের ৫ই বৈশাখ (১৬ এপ্রিল ১৮৬৯) "চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্র" হইতে বাহির হয়। পূর্বে ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা, কিন্তু ১৩০৩ সাল হইতে বার্ষিক মূল্য দুই টাকা হয়। ভূদেব বাবুর সম্পাদকত্বে এডুকেশন গেজেট যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করে এবং ইহার গ্রাহক সংখ্যাও বহু বৃদ্ধি পায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাতে লিখিতেন।

ব্রজমোহন মল্লিক তাঁহার স্মৃতিকথায় যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ

"হুগলীতে অবস্থানকালে ভূদেব বাবু কলিকাতায় এডুকেশন গেজেট অফিসে প্রায়ই আসিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারীচরণ সরকারের হাতে গেল; তিনি ছাড়িয়া দিলে ভূদেব বাবু ইহার সম্পাদক হইলেন। * * * বঙ্কিম বাবুর সহিতও আমার আলাপ হয় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে। বঙ্কিম বাবু তখন সবেমাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে এডুকেশন গেজেটে লিখিতেন।"

শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার ঃ—১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা এবং প্রতি সংখ্যা দুই আনা ছিল। "এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়" বলিয়া লেখা থাকিত। প্রথম সংখ্যা শিক্ষাদর্পণে একটি বিস্তৃত ভূমিকায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছিল। ভূমিকার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

"বৎসরের প্রথম দিন হইতে পত্রিকা বাহির করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু ইহার পর প্রতি মাসের শেষ দিবসে বাহির করিবার চেষ্টা করি—অন্ততঃ পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবেই হইবে। মাসিকপত্র সকল যেমন কখন কখন ছয় মাস কালবিলম্বে বাহর হয়, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহার সেইরূপ দশা হইবে না। * * জার্ম্মাণ দেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন, যে শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য; মনুষ্যদেহ ধারণের আর দ্বিতীয় প্রয়োজন নাই।

১২৪৭ সালের পৌষ মাস হইতে "বর্ধমান মাসিক পত্রিকা" শিক্ষাদর্পণের সহিত সম্মিলিত হয় এবং ইহার নূতন নামকরণ হয় 'শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা'। বর্ধমান ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে "বর্ধমান মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হইত। এই সম্মিলন সম্বন্ধে 'শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা'য় ১২৪৭ সালের পৌষ মাসে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। ঃ

"বিজ্ঞাপন। বর্তমান মাস হইতে শিক্ষাদর্পণ ও বর্ধমান মাসিক পত্রিকা সম্মিলিত হইল এবং সেইজন্য শিক্ষাদর্পণের পূর্বনাম পরিবর্তিত করিয়া "শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক

পত্রিকা" নাম দেওয়া গেল। বর্ধমান মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য মূল্য হুগলী বুধোদয় যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। পৌষ মাস পর্যন্তই বর্ধমান মাসিক পত্রিকার মূল্যেই প্রাপ্য রহিল। পর মাস হইতে গ্রাহকগণকে ডাক-মাসুলসমেত বার্ষিক ১।।০ টাকা দিতে হইবে।...শ্রীকেশবচন্দ্র মিত্র।"

শিক্ষাদর্পণের অধিকাংশ প্রবন্ধই ভূদেব বাবু নিজে লিখিতেন; অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম দেখা যায়। শিক্ষাদর্পণ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বন্ধ হইয়া যায়; সেই বৎসর ভূদেব বাবু "এডুকেশন গেজেটে"র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "১৬ এপ্রিল, ১৮৬৯ তারিখ হইতে ভূদেব বাবু'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা শিক্ষাদর্পণের প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে শিক্ষাদর্পণের প্রচার রহিত করেন।" কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, তাহার মৃত্যুতে পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষা-দর্পণের প্রচার রহিত সম্বন্ধে 'এডুকেশন গেজেট' যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত হইলঃ

ভূদেব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম ছিল 'সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। যখন উহার দুই বৎসর মাত্র বয়স তখন শিক্ষাদর্পণ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে কাগজ ভাঁজিয়া মুড়িতে ব্যাপৃত বাড়ীর লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া শিশু "আমার কাগজ" বলিয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। বুধোদয় যন্ত্র বাড়ীতেই ছিল এবং বাড়ীর লোকই কাগজ ভাঁজা-মোড়ক করা প্রভৃতি কার্য করিত। শিশুর ঐ কথা শুনিয়া এবং আনন্দ দেখিয়া ভূদেব বাবু কৌতুক করিয়া বলেন "এখানি সিধুরই কাগজ"; হিসাব-পত্র উহার নামেই লিখিও। ওই ইহা চালাইবে।"

"ইহার পর প্রকৃতই সেইরূপেই খাতাপত্র লেখা হইত। যৌথ ছাপাখানার বিল তাহার নামে হইত। শিক্ষাদর্পণ সিদ্ধেশ্বরের কাগজ বলিয়া বাড়ীতেও সর্বদা উক্ত হইত। ভূদেব বাবুর বাড়ী হইতে অনুপস্থিতকালে বালকের ৭ বৎসর মাত্র বয়সে কলেরায় মৃত্যু হয়। সুতরাং ১৮৬৯ অব্দের মে মাসে তাঁহাকে ঐ পুত্রটির সহিত পত্রিকাখানিকেও বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।"

বাসনা :—১৩০১ সালের বৈশাখ মাস হইতে চুঁচুড়া বাসনা সমিতির তত্ত্বাবধানে মাসিকপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়; ইহা সম্পাদনা করিতেন কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

জ্যোৎস্না-হার :—চুঁচুড়া চৌমাথা হইতে ১৩০১ সালের মাঘ মাস হইতে এই মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদনা করিতেন সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

দর্শক :—সাপ্তাহিক পত্ররূপে ১৩০১ সালের মাঘ মাস হইতে চুঁচুড়া বার্তাবহের প্রতিদ্বন্দ্বীহিসাবে প্রকাশিত হয়।

মহামায়া :—সাপ্তাহিক পত্র; হেমশশী সোমের সম্পাদনায় চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।

প্রজার মঙ্গল তরে, ফিরি আমি ঘরে ঘরে,
প্রাণপণে সাধি সদা তাঁহাদের কাজ।
সাধিতে স্বদেশ হিত, ঘটে যদি বিপরীত,
বুক পাতি স'ব তাহা—কিবা তায় লাজ?

প্রথম ভাগ। } চুঁচুড়া,—রবিবার, ১২ই আষাঢ়, ১৩০০। ২৫শে জুন, ১৮৯৩। প্রথম সংখ্যা।

হুগলী জেলার মুখপত্র **চুঁচুড়া বার্তাবহ** পত্রের প্রথম সংখ্যার প্রতিলিপি
(বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ইহা প্রাচীনতম বাংলা সংবাদপত্র)

ধর্ম্মপ্রচারক।

গরিফাপাড়ার শ্রীকৃষ্ণানন্দ সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
বাংলা-হিন্দী দ্বিভাষিক পত্র **ধর্মপ্রচারকের** ১ম ও ২য় সংখ্যার প্রতিলিপি

॥ চুঁচুড়া বার্তাবহ ॥

হুগলী জেলার মুখপত্ররূপে ১২ আষাঢ় ১৩০০ সালে চুঁচুড়া বার্তাবহ নামক সাপ্তাহিক-পত্র চুঁচুড়া নিবাসী দীননাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথাক্রমে অমৃতলাল ও নিতাইচাঁদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ইহার পরিচালক ছিলেন; "হুগলী জেলার অভাব ও অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার ও আলোচনা করাই সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য" বলিয়া অনুষ্ঠানপত্রে লিখিত হয়।

প্রথম বৎসরে 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' হুগলী 'সাবিত্রী প্রেসে' মুদ্রিত হইয়াছিল কারণ তখন ইহার কোন নিজস্ব ছাপাখানা ছিল না। দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে দীননাথ তাঁহার পিতা হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের নামে "হীরা-যন্ত্র বা ডায়মণ্ড প্রেস" প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' প্রকাশ করেন। হীরালাল হুগলী কলেজ হইতে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু বৎসর শিক্ষা-বিভাগে কর্ম করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার খামারগাছি, দ্বারবাসিনী, চক্‌দিঘী, বালুচর প্রভৃতি বিদ্যালয়ের তিনি হেড-মাষ্টার ছিলেন। হীরালাল যখন বালুচর বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছিলেন, সেই সময় (২০ ডিসেম্বর ১৮৭০) দীননাথের জন্ম হয়।

চুঁচুড়া বার্তাবহের প্রথম সংখ্যায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ "চুঁচুড়া বার্তাবহ এই নামটি আমাদের সহযোগী দৈনিক সমাচার-চন্দ্রিকার পছন্দ হয় নাই। ঐ পত্রিকার মতে আমাদের কাগজের নাম হওয়া উচিত ছিল—**'হুগলী সমাচার'** বা **'হুগলী বার্তাবহ'** কেননা এখানি হুগলীর মুখপত্র। কথাটা অযুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের অনুষ্ঠানপত্র পূর্বেই বাহির হইয়াছিল এবং "চুঁচুড়া বার্তাবহ" এই নামটি খোদাই হইয়া আসিয়াছিল, এ-কারণ নাম পরিবর্তন করি নাই। আশা করি, সহযোগী তজ্জন্য দুঃখিত হইবেন না।"

দীননাথ বাল্যকালে হুগলী মডেল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। তখন হইতেই বাঙ্‌লা ভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১২ বৎসর বয়সে তিনি বাংলায় কবিতা রচনা করিতেন এবং শিক্ষক দিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতেন। পরে তিনি হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার পিতা ও মাতার বিয়োগে সংসারের যাবতীয় ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয় এবং অর্থোপার্জনের জন্য তিনি চেষ্টা করিতে বাধ্য হন। সেই সময় হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামমাধব রায় ও হুগলীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগনের পরামর্শে তিনি চুঁচুড়া বার্তাবহ বাহির করেন। হুগলীর সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বনামধন্য হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বলিয়া দীননাথ মুখোপাধ্যায়কে বিশেষ স্নেহ করিতেন: সেইজন্য অল্পদিনের মধ্যেই এই কাগজ তৎকালে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই কাগজ প্রকাশের পূর্বে দীননাথ বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন।

হুগলীর ডিস্ট্রীক্ট ও সেস্‌ন জজ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এই সংবাদপত্রে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের "নিলামী ইস্তাহারের" সংবাদ প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া, ইহার প্রয়ো-

জনীয়তা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন। দীননাথ এই কাগজখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে অদম্য চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সালে ৫ই ফাল্গুন রবিবার (ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮) ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ইহা আজও তাঁহার বংশধর শ্রীধ্যানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও শ্রীবিমলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যোগ্যতার সহিত প্রকাশিত হইতেছে।

'চুঁচুড়া বার্তাবহ' যে সময় বাহির হয়, সেই সময় বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও সঞ্জীবনী প্রভৃতি বহুল প্রচারিত বিরাটকায় সংবাদপত্র বাঙ্গলাদেশের গৌরবের বস্তু ছিল। কিন্তু এই পত্রগুলি এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইংরাজী পত্রের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা ও বাঙ্গলা পত্রের মধ্যে 'চুঁচুড়া বার্তাবহ' বাঙ্গলাদেশের প্রাচীনতম পত্র। ইহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যথাসাধ্য দেশের ও জাতির সেবা করিয়াছে। এখন দেশবাসীর কৃপাদৃষ্টি পড়িলে পত্রিকাখানি দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। বাঙ্গালার এই সুপ্রাচীন পত্রিকা যাহাতে দীর্ঘ জীবি হয়, সেই জন্য জাতীয় সরকারেরও দেখা কর্তব্য।

"চুঁচুড়া বার্তাবহে"র অনুষ্ঠান পত্রে হুগলী জেলার প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ করা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া উল্লিখিত ছিল। নিম্ন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের দুইটি প্রয়োজনীয় সংবাদ উদ্ধৃত হইলঃ

"রথ—মাহেশে রথের চাকা এবার এরূপ কাদায় বসিয়া গিয়াছিল যে, গত পূর্ব শনিবার ও রবিবার বহু চেষ্টাতেও 'জগন্নাথ দেবের রথ কেহ টানিতে পারে নাই। গত সোমবার ৩টার সময় রথ টানা হইয়াছিল।" (১ম বর্ষ; ৫ম সংখ্যা)

"রথচাপা। সেদিন মাহেশের রথ শ্রীরামপুর সাব-ডিভিসনাল অফিসার মিঃ টমসন্ সাহেবের পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। শুনিতেছি, তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন।" (১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা)

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরলোকগমনে 'চুঁচুড়া বার্তাবহে' ১৩০০ সালে যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

বঙ্গীয় সাহিত্য আকাশের আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়াছে। ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র অর্থাৎ ৮ই এপ্রেল রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বঙ্কিম বাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গবাসী আজ শোকসাগরে নিমগ্ন। যেখানে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিতেছে সেইখানেই অশ্রুপাত, সেইখানেই বিষাদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় বঙ্গবাসীর হৃদয়ে ভীষণ আঘাত করিতেছে। বঙ্গবাসী আজ অশ্রুজলে তাঁহার তর্পণ করিতেছে। বঙ্গবাসী! আজ তোমরা যে রত্ন হারাইয়াছ, সে রত্ন যে তোমরা সহজে পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, এরূপ আশা আমাদের ত হয় না, তাঁহার স্থান অধিকার করে এমন লোক ত দেখি না। স্বীয় প্রতিভাবলে বঙ্কিম বাবু বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, এমন কয়জন লোক পারিয়াছে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলাসাহিত্যের জন্মদাতা, এবং বঙ্কিম তাহার রক্ষাকর্তা, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্কিম! তোমার পরিচয় আর কি দিব? তুমি বঙ্গমাতার কৃতি পুত্র। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট তুমি পরিচিত। তোমার নাম শুনে নাই, এমন লোক ত আমরা দেখি নাই। তাই বলি তোমার পরিচয় আর কি দিব।.........

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চুঁচুড়া বার্তাবহে হুগলী জেলার আদালতসমূহের বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশিত হইতে থাকাকালীন উহা বার বৎসর যাবত হাওড়া ও হুগলীর একমাত্র প্রধান সাপ্তাহিক বলিয়া পরিগণিত হয় এবং অন্যান্য জেলার পত্রিকাগুলিতে উক্ত বিজ্ঞাপন ছাপা সুরু হয়। চুঁচুড়া বার্তাবহ এযাবৎ নিম্নোক্ত সাইজে প্রকাশিত হইয়াছে : ১ম বর্ষ—ডিমাই; ২য়—৬ষ্ঠ বর্ষ—সুপার রয়েল; ৭ম—২৮শ বর্ষ—ডিমাই; ২৯শ—৩৭শ বর্ষ—ফুলস্কেপ; ৩৮শ—৪৯শ বর্ষ—ক্রাউন (মধ্যে তিন মাস ডবল ডিমাই অর্থাৎ দৈনিক পত্রিকার সাইজ); ৫০শ—৬৫শ বর্ষ—ফুলস্কেপ; ৬৬শ বর্ষ হইতে ডিমাই সাইজ আকারে চলিতেছে। বর্তমানে শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ইহা সম্পাদনা করেন।

চিকিৎসা দর্পণ (মাসিক) :—ইহা চুঁচুড়া হইতে ১ বৈশাখ ১২৭৮ সাল হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা; যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ইহা সম্পাদনা করিতেন। তৎকালে চিকিৎসা বিষয়ক কোন সাময়িকপত্র না থাকায় যদুনাথ এই মাসিকপত্র বাহির করেন। চরক প্রভৃতির অনুবাদক সুবিখ্যাত ডাক্তার ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তৎকালে চিকিৎসা-দর্পণ বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যদুনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার উপদেশমত তিনি ধাত্রী-শিক্ষা, উদ্ভিদ-বিচার, শরীর-পালন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'চিকিৎসা-দর্পণ' মাসিকপত্র বাহির করেন। তাঁহার সরল রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ভূদেব বাবু বলিতেন, "ইহা দ্বারা তুমি যশস্বী হইবে।" ভূদেব বাবুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। চিকিৎসা-দর্পণ বন্ধ হইবার পর, উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মাসিক) :—ইহা ১২৭৮ সালের শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের নাম জানা যায় নাই।

সাধারণী (সাপ্তাহিক) :—১২৮০ সালের ১১ই কার্তিক চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইহা প্রকাশ করেন। ইহা সেযুগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্র; অক্ষয় "রাজনীতিজড়িত সাহিত্যিক সক্ মিটাইবার জন্য" এই সাপ্তাহিকপত্র বাহির করেন। সাধারণীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণের রচনা প্রকাশিত হইত। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে 'নববিভাকর,' 'সাধারণী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া "নববিভাকর-সাধারণী" নাম ধারণ করে। ভবানীপুর এল-এম-এস কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববিভাকর' সম্পাদনা করিতেন। ইহাও সে-কালের একখানি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ১২৯৬, ১৮ই ভাদ্র (৪র্থ ভাগ—২১ সংখ্যা) পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া "নববিভাকর-সাধারণী"র বিলুপ্তি ঘটে। 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সাধারণীতে হাতেখড়ি হয়।

'সাধারণী' প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে" কাঁটালপাড়া হইতে মুদ্রিত হইত; অক্ষয়চন্দ্র ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁহার কদমতলার বাড়ীর সংলগ্ন

একটি বাড়ীতে "সাধারণী যন্ত্রালয়" স্থাপন করিয়া চুঁচুড়া হইতে সাধারণী মুদ্রিত করেন। গঙ্গাচরণ সরকারের "ঋতুবর্ণন" উক্ত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণী যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। সাধারণীতে প্রকাশিত গঙ্গাচরণের **সতীদাহ** সম্বন্ধে একটি কবিতা ২০১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—সাধারণীতে "চেনাচুর" নাম দিয়া পাঠককে বালক সাজাইয়া মুঠা মুঠা বিদ্রূপ-বর্ষণ করিতাম। "সাধারণীর চেনাচুর"একটা উপমার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে সাধারণীর চেনাচুরের উল্লেখ থাকিত। "কিষণ দাস কি চেনা,—তের রূপেয়া, চার আনা—বড় লোক লেতেহে, বড় লোক খাতেহে" ইত্যাদি কথা তখন লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। চেনাচুর ছেলেরাই খায়; সাধারণীর চেনাচুর বুড়োরাও ফোক্‌লা দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন।"

"সাধারণীর চেনাচুর" কিরূপ ছিল, তাহার রসাস্বাদনের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

॥ ধরমচাঁদ কি চেনাচুর ॥

"ধরম-চাঁদকি চেনাচুর।
মজামে ভোর পুর।
তু দেখেগা কেত্না সাধু, কেত্না অবতার।
নাচ রংমে তেরা সামনে করেগা বিহার।
মুসা নাচে, য়িসা নাচে, শাক্যসিংকা সাত,
নাচে লুথর পাকর লেকে, নানকজীকা হাত।
জনক নাচে, জসুয়া নাচে, নাচে গজাধর,
মক্কা ছোড়কে মোহিত হোকে নাচে পগম্বর।
জন নাচে, লুক নাচে, নাচে সেইন্ট পাল,
পিটর নাচে, কুঞ্জী বাজে, মেথু দেওয়ে তাল।
গৌর নাচে ধিয়া ধিয়া, গিরে আঁসু ধার,
চসমা চোক্‌মে দেকে নাচে, সেন অবতার।
দেখো গে এইসি তরে, খেয়াল তাজা তাজা,
কাঁহা তেরা ভাং, অওর কাঁহা তেরা গাজা।"

অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন যে, সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই। সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই। সুতরাং সরল বালিকার মত কাঁদিত। ছোট ছোট আব্দার করিত। রাজ-পুরুষেরা অতি ছোট ছোট আব্দার কর্ণপাত করিতেন বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল; আর সাহিত্যসেবাপরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গলার কৃতবিদ্যের কাছে।

চুঁচুড়ায় সেই সময় ম্যালেরিয়া জ্বরে সকলেই আক্রান্ত হয়। 'জ্বরের জ্বালায় জ্বালাতন' হইয়া ১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণী কলিকাতায় উঠিয়া যায়। কম্পোজিটার, প্রেস-

ম্যান, পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি সকলেই জ্বরে পড়িয়া, কাগজ ত আর সময়ে বাহির হয় না। এক সপ্তাহ নহে, দুই সপ্তাহ নহে, আশ্বিন, কার্তিক ক্রমাগতই এইরূপ হয়, পরের পয়সা ঘরে লইয়া এইরূপ করিলে চলিবে কেন? কাজেই আমাকে তোড় জোড় সমস্ত লইয়া কলিকাতায় যাইতে হইল।"

১২৯৫ সালের ২২ কার্তিক অক্ষয়চন্দ্রের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার পরলোকগমন করেন। তিনি "চুঁচুড়া হিতৈষিণী সভার" সভাপতি ছিলেন;সেই সময় চুঁচুড়ার রাধাজীবন রায় "নববিভাকর-সাধারণী"তে একটি শোক-পদ্য প্রকাশ করেন তাহার দুটি শ্লোক এইরূপঃ

একদিন পর বলি, ভাবি নাই মনে,
জনকের মত তাঁরে, করিতাম জ্ঞান;
পুত্রসম ভাবিতেন, তিনি সর্বজনে,
হৃদে তাঁর ছিল চিন্তা—মোদের কল্যাণ!
'আমারে বাসেন ভাল সবার উপর,'
পরস্পর সবাকার আছিল ধারণা;
হেন লোক আছে কোথা ভবের ভিতর,
এ গুণ স্মরণে আরো, হতেছে যাতনা।

ভারতদর্পণ ও পুলিস বার্তাবহ:—১২৮০ সালের ৩ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩) এই পাক্ষিক সংবাদপত্র চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইবার পর (১২ই পৌষ ১২৮০) এডুকেশন গেজেটে নিম্নলিখিত সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়ঃ

ভারতদর্পণ ও পুলিস বার্তাবহ—এই নামে একখানি সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এখানি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হইবে। চুঁচুড়া হইতে ৩রা পৌষ অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আকার দুই ফরমা, আট পৃষ্ঠা, মূল্য ডাকমাশুল সমেত বাৎরিক ২৷৷৹। প্রথম সংখ্যায় যেরূপ প্রবন্ধ, যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া পত্রিকাখানির উপর শ্রদ্ধা জন্মিল। আশা করি, উত্তরোত্তর ইহা উৎকর্ষলাভ করুক এবং দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজের হিতব্রতে নিযুক্ত থাকুক

আজীবন নেহার:—চুঁচুড়ার মুসলমানগণ কর্তৃক পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র। ইহা বৈশাখ ১২৮১ সাল হইতে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হইত। হুগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের চেষ্টায় ইহার প্রচার আরম্ভ হয়। ইহার সম্পাদনা করেন মীর মশাররফ হোসেন। এই মাসিকপত্র মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় ছিল।

সাহিত্য কুসুম:—হুগলী বুধোদয় যন্ত্র হইতে বৈশাখ ১২৮১ সাল হইতে বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহাও মাসিকপত্র।

কুমুদিনী:—১২৮১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে মাসিকপত্ররূপে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেঙ্গল ম্যাগাজিন:—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নিমাইচাঁদ শীল কর্তৃক প্রবর্তিত হয়: প্রতি মাসে রেভারেন্ড লাল বিহারী দের সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হইত।

প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ:—১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মাসিকপত্ররূপে ইহা প্রকাশিত হইত। ইহাতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক কবির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদি ও "প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহে" সন্নিবিষ্ট হইত। ইহা সম্পাদনা করিতেন সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বরদাকান্ত মিত্র।

'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণব সাহিত্যে আমার অনুরাগ সৃষ্টি করা পূর্বেই বলিয়াছি। বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক উদ্ধৃত একটি মাত্র পদ পাঠে সেই অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর বহরমপুরের সদর মুন্সেফির অন্যতম উকিল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় পরিষ্কার হাতের লেখায়, গোটা গোটা কাল কাল অক্ষরে একখানি 'পদকল্পতরু' আমাকে পাঠ করিতে দেন। সেইখানি নিয়ত নাড়িয়া চাড়িয়া দুরূহ পদের ক্রমাগত অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া, আমি সেই অনুরাগ পোষণ করিতেছিলাম। জগবন্ধু বাবু কর্তৃক পিতার নাম সম্বলিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" পাইয়া মহা আনন্দিত হইলাম। সেই আনন্দফলস্বরূপ শ্রীযুক্ত (জজ) সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সঙ্গে আমা-কর্তৃক 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশ।

বিনোদিনী:—১২৮২ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইহা ভুবনমোহিনী দেবীর সম্পাদনায় মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সম্পাদকরূপে মহিলার নাম থাকিলেও 'ভুবনমোহিনী প্রতিভার'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "বিনোদিনী" প্রকাশ করেন। অনেকে ইহাকে মহিলা পরিচালিত প্রথম মাসিকপত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। নবীনচন্দ্র নসীপুরের ছোট তরফের রাণী অন্নপূর্ণা দেবীর পোষ্যপুত্র জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তের আনুকূল্যে ইহা প্রকাশ করেন।

পঞ্চানন্দ:—১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্র হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা "জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রূপ এবং পবিত্র আমোদের খনি" ছিল। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর, উহা অদৃশ্য হইয়া যায়, পরে ভবানীপুর হইতে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

এই সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, তৎপর ঐ বাসাতেই "পঞ্চানন্দে"র সূত্রপাত হয়। কিন্তু কতক কতক লিখিয়া, যা-ই চুঁচুড়ায় পাঠাইয়া দিলাম, অমনই দাদা (অক্ষয়চন্দ্র সরকার) তাহা "সাধারণী"র উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। দুইএকবার এইরূপ হইবার পর, একবার চুঁচুড়ায় গিয়া দুইজনে একখণ্ড পঞ্চানন্দ লিখিলাম; তাহা ছাপানও হইল। কিন্তু আমাদের উভয়েরই আলস্য এবং ঔদাসীন্য রীতিমত পঞ্চানন্দ চালাইবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, একখানি ছাড়া তখন আর পঞ্চানন্দ বাহির হয় নাই।

বেঙ্গল মিস্‌লেনি:—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে চুঁচুড়া বুড়াশিবতলা হইতে ইংরেজী বাংলা দ্বিভাষিক মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিষ-চন্দ্র ও বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, ইহা কতদিন চলিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

দৈনিক-বার্ত্তা:—চুঁচুড়ার প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র; ইহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা

আগষ্ট হইতে বাহির হয়। ইহার প্রকাশক হিসাবে গিরীন্দ্রলাল চৌধুরীর নাম পাওয়া যায়। "দৈনিক-বার্তা"র সম্পাদনাভার কাহার উপর ছিল, তাহা সঠিক জানা যায় নাই।

নবজীবন:—উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র; ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। প্রথমে ইহা চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ করা হইবে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু "জ্বরে জ্বরে বিষম জ্বালাতন হইয়া" কলিকাতায় কিছুদিন বাস করেন এবং কলিকাতা হইতেই **'নবজীবন'** প্রকাশিত হয়। ইহা পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথীদের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া ইহা প্রকাশিত হইত। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রথম রচনা 'মহাশক্তি' নবজীবনে (পৌষ, ১২৯১) প্রকাশিত হয়।

'নবজীবন' সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন—"নবজীবন প্রকাশিত হইল। বঙ্গের মহা-মহারথীগণের প্রায় সকলেই লিখিতে লাগিলেন। আমি সম্পাদক, কাজেই আমার জাঁক-পসার খুবই হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় জ্বরের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছিলাম; নিয়মিতরূপে সাধারণী প্রকাশ করিতে কোনমতেই পারিতাম না; ভূয়ো কর্তব্যের দায়ে সাধারণী উঠাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় বসিয়া বঙ্কিম সঙ্গতে হাওয়ার সুর বুঝিয়া নবজীবন প্রকাশিত করিলাম। পিতা কিন্তু মহা-আনন্দিত, আমার গৌরবে মহাসুখী। নবজীবনের প্রথম মাসে ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। তাঁহার রচিত চারি ছত্রের গানটি (ভোর হইল, জগত জাগিল ইত্যাদি) আমি মহা-ধৃষ্টতা করিয়া বিশছত্র করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলাম—তাহাতেও ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না।"

নিম্নে গঙ্গাচরণ সরকার রচিত এবং 'নবজীবনে' প্রকাশিত **'দুর্গোৎসব'** শীর্ষক একটি কবিতার শেষাংশ ১২৯৫ সালের আশ্বিন মাসের "নবজীবন" হইতে উদ্ধৃত হইল :

এস এস বঙ্গবাসী মিলিয়া সকলে,
জগত-জননী পূজি, পূজা কুতূহলে।
দাঁড়ায়ে মায়ের পাশে,
গললগ্নী-কৃতবাসে,
পুষ্পাঞ্জলি পাদপদ্মে, দেহ অবিলম্বে,
উচ্চস্বরে বল 'জয় জয় জগদম্বে'॥

বয়স্য:—মাসিকপত্র; ১২৯১ সালের আশ্বিন মাস হইতে চুঁচুড়া অরুণ প্রেস হইতে প্রকাশিত। ইহার সম্পাদক ছিলেন অরুণকুমার দত্ত।

ভারত সঞ্জীবন:—এই মাসিকপত্র ১২৯৫ সালে মাঘ মাস হইতে ভূপতিনাথ দাসের সম্পাদনায়, হুগলী বুধোদয় প্রেস হইতে প্রকাশিত। ইহা কতদিন চলিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই।

সুবোধিনী:—১লা বৈশাখ ১২৯৭ সাল হইতে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়; সম্পাদক কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়। আট সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর, ইহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়; কালিদাস মিত্র এই নবপর্যায়ের মাসিক সুবোধিনী সম্পাদনা করিতেন।

পূর্ণিমা ঃ—বৈশাখ ১৩০০ সাল হইতে কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও উদ্যোগে হুগলী সাবিত্রী যন্ত্র হইতে পূর্ণিমা নামক উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র মুদ্রিত হয় এবং বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। পূর্ণিমার সম্পাদনাভার কুমার মুণীন্দ্র দেবরায়ের উপর ছিল।

দর্শক ঃ—১৩০১ সালের মাঘ মাস হইতে "চুঁচুড়া বার্তাবহের" প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে 'দর্শক' নামক সাপ্তাহিকপত্র চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়।

পুরোহিত ঃ—অগ্রহায়ণ ১৩০১ সাল হইতে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির সম্পাদনায় 'পুরোহিত' নামক মাসিকপত্র হুগলী হইতে প্রকাশিত হয়।

বাসনা ঃ—চুঁচুড়া বাসনা সমিতির তত্ত্বাবধানে বৈশাখ ১৩০১ সাল হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়।

সমাচার ঃ—ব্রজবল্লভ রায় ও সুবোধ রায়ের সম্পাদনায় 'সমাচার' নামক সাপ্তাহিকপত্র ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

মিতা ঃ—শিশুদের মাসিকপত্র; অজরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় চুঁচুড়া হইতে১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হয়।

যুগরবি ঃ—প্রফুল্লকুমার সরকারের সম্পাদনায় ১৩৫৩ সালের বৈশাখ মাসে এই মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়।

হরকরা ঃ—**হুগলী** পোষ্টাল ম্যাগাজিন শ্রীসত্যচরণ বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সনাতন ধর্মকথা ঃ—চুঁচুড়া মাধবীতলা হইতে ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাস হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন দুর্গাদাস রায়। "বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার ধর্মকথার একমাত্র উদ্দেশ্য" বলিয়া পত্রিকায় লেখা থাকিত।

"সনাতন ধর্মকথা" বলিয়া আর একখানি কাগজ কালীকুমার দত্তের সম্পাদনায় চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হইত বলিয়া শুনিয়াছি। কোন্ সময়ে ইহা বাহির হয়, তাহা জানিতে পারি নাই; এ দুইটি একই কাগজ কি-না তাহা না দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

জননী ঃ—বৈশাখ ১৩০৫ হইতে মাসিকপত্ররূপে চুঁচুড়া মাধবীতলা "হীরাযন্ত্র" হইতে প্রসাদদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

প্রতিমা ঃ—আষাঢ় (?) ১৩০৫ হইতে বামাচরণ বসুর সম্পাদনায় মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম প্রকাশের তারিখটি সঠিক জানা যায় নাই।

বঙ্গদর্পণ ঃ—২রা বৈশাখ ১৩১২ সাপ্তাহিকপত্ররূপে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়; সম্পাদক ও প্রবর্ত্তক—নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া বার্তাবহের ভূতপূর্ব সম্পাদক)। তিন বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

শিল্প ও সাহিত্য ঃ—ফাল্গুন, ১৩১৬ সালে চুঁচুড়া হইতে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ঃ নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (চুঁচুড়া বার্তাবহের ভূতপূর্ব সম্পাদক)।

সমাধান ঃ হুগলী হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্র। ইহা শ্রীঅর্পণা সেনগুপ্তার পরিচালনায় ইমামবাড়া: সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোডস্থ

অঘোর প্রিণ্টিং ওয়াকর্স হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্রীসতীপ্রসাদ রায়। সমাধানের বার্ষিক চাঁদা দুই টাকা পঁচিশ নঃ পঃ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় নয়া পয়সা।

বর্তমান ভারত॥ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে "বর্তমান ভারত" নামে প্রগতিশীল পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হয়। হুগলী চকবাজারে অবস্থিত "হুগলী প্রিন্টিং ওয়ার্কস" হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হয়। সহযোগী সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার সেন ও শ্রীঅনন্তদেব ঘোষ। শ্রমিক নেতা শ্রীনির্মলকুমার সেন এই পত্রের প্রধান সম্পাদক। সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য অল্প দিনেই ইহার খুব সুনাম হইয়াছে। ইহার বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও প্রতি সংখ্যার দাম দশ নয়া পয়সা।

প্রথম পর্যায়ে ১২৬৪ সাল হইতে ১৩১২ পর্যন্ত চুঁচুড়ায় যে সকল পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলির পরিচয় যথাসাধ্য এই স্থানে দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। অধিকাংশ পত্রিকা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই; ইহা সংগ্রহ করা আজ আর সহজসাধ্য নয়। বহু পত্রিকা অযত্নে ও বাংলাদেশের জলবায়ুর দোষে বর্তমানে লুপ্ত হইয়াছে। কোন গ্রন্থাগারেও এই সকল পত্রিকা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্য সরকারী রিপোর্ট, সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা এবং কেদারনাথ মজুমদার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক হইতে এই তালিকা সংকলিত হইয়াছে।

॥ নিতাইচাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥

হীরালালের কনিষ্ঠ পুত্র নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গাব্দ ১২৮৬ সালের ২৭শে আশ্বিন রবিবার চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নিতাইচাঁদের জন্মের কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রথমে জননী এবং পরে পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। নিতাইচাঁদের বাল্য-ইতিহাস কঠোর ক্লেশ ও দুঃখের কাহিনীতে পূর্ণ। তিনি হুগলী নর্মাল স্কুলে (বর্তমান চুঁচুড়া কোর্ট বাটীতে স্থিত ছিল) সপ্তম ক্লাশ পর্যন্ত পড়েন। আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সুযোগ না থাকায় তাঁহার স্কুলের লেখাপড়া এইখানেই শেষ হয়। ইহার পর তিনি পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কয়েক বৎসর ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার একাগ্রতা ও আন্তরিক বিদ্যানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, যখনই যেখানে সুবিধা পাইতেন, তখনই সেখানে গ্রন্থরাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া নিজের জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি বরাবরই বঙ্কিম ও অক্ষয় সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। আচার্য অক্ষয়চন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ভাষা শিক্ষা ও পত্রিকা পরিচালন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কালে তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় স্বরচিত রচনার মধ্যে দিয়া। তাঁহার ভাষাজ্ঞান ও বর্ণনানৈপুণ্য দেখিয়া কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় 'পণ্ডিত' আখ্যা দেন।

"চুঁচুড়া বার্তাবহ" যখন (১৩০০ সাল) প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তখন হইতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা দীননাথ ও অমৃতলালের ন্যায় তাঁহারও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তিনি এই পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং দুইখানি

পত্রিকা প্রকাশ করেন—পূর্বোক্ত 'ধর্মদর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক ও 'শিল্প ও সাহিত্য' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা। তাঁহার অগ্রজদ্বয় দীননাথ ও অমৃতলালের মৃত্যু ঘটিলে তিনি "চুঁচুড়া বার্তাবহ" পত্রিকার সম্পাদন ভার (খৃষ্টাব্দ ১৯১৮) গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল তিনি এই পত্রিকাখানি বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। এই সময় কয়েক বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'অনাদিনাথের উৎসাহ ও চেষ্টায় 'বার্তাবহ' এক অপরূপ কলেবর ধারণ করে। সেই সময় অনাদিনাথ হুগলী জেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক মনীষীর সচিত্র জীবনী এবং বহু পুরাকাহিনী বার্তাবহে প্রকাশ করিতে থাকেন এবং অমৃতলাল কর্তৃক সংগৃহীত জেলার তথ্য "জেলা হুগলীর ইতিহাস" প্রবন্ধে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বার্তাবহে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

নিতাইচাঁদের আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি একজন অসাধারণ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন এবং খেলায় 'যাদুকর' আখ্যা লাভ করেন। চুঁচুড়ায় ফুটবল খেলার গোড়াপত্তনে ইঁহার দান বড় অল্প নহে এবং চুঁচুড়া টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠার একজন অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। খেলাধূলার ইতিহাসে তাঁহার নাম অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সময় তিনি গোপনে স্বাধীনতা আন্দোলনেও যোগ দেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ তিনি ভক্ত ছিলেন; সুরেন্দ্রনাথের বজ্রগম্ভীর ইংরাজী বক্তৃতা শুনিবার জন্য তিনি প্রায়ই কলিকাতা যাইতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে থাকাকালীন তিনি বিপ্লবীদলেও প্রবেশ করেন।

নাট্য পরিচালনা ও শিক্ষকতা বিষয়ে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাঁহারই নেপথ্য পরিচালনায় দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহকল্পে শেষ নাটক অভিনীত হয়—"কর্ণার্জুন"। অনবদ্য অভিনয় দর্শনে তদানীন্তন কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যসম্প্রদায় ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে কর্ণার্জুন পুনরায় একরাত্রি অভিনীত হয়। চুঁচুড়ার শ্রীগৌরাঙ্গ নাট্য সমাজের মঞ্চ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান। ইহা চুঁচুড়াবাসীর অন্যতম গৌরবের বস্তু; দুঃখের বিষয় উহা আজ ভগ্নদশায় পরিণত।

তিনি অতিশয় অমায়িক ও সদালাপী উদারভাবাপন্ন ছিলেন। গোপনে তিনি যথাসাধ্য দান করিতেন। তিনি দুইখানি নাটক রচনা করেন। একখানি ঐতিহাসিক নাটক 'গায়ত্রী' এবং আর একখানি সামাজিক 'ঝর্ণা'। 'বালগঙ্গাধর তিলক' নামে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রচারের মোহ ছিল না। তিনি তাঁহার কুলগুরু বর্ধমান জেলার সোনাপলাশী নিবাসী শ্রীমৎ কালাচাঁদ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইলেও পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

উত্তরপাড়া, কোন্নগর প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িকপত্র হইতে সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত হইল।

॥ উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা ॥

১৮৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহার ৫ম সংখ্যার তারিখ ২৯ মাঘ ১২৬৩; সুতরাং প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ পৌষ হওয়া সম্ভব।

ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত হইত। এই পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন উত্তরপাড়া নিবাসী বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; ১৫শ সংখ্যার শেষে তাঁহার নাম পাওয়া যাইতেছে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রতিমাসে বারদ্বয় মুদ্রাঙ্কিত হইয়া উত্তরপাড়া নগরে প্রকাশ হয়। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়রা উক্ত নগর নিবাসী সম্পাদক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অথবা বালী পোস্ট অফিশে সংবাদ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :

সৎপক্ষ পক্ষপাতেয়ং পাক্ষিকী নাম পত্রিকা।
রাজতে রাজহংসীব মানসাম্ভোজলাসিনী॥

ইহাতে সাধারণতঃ কবিতা, প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদের সার থাকিত; মাঝে মাঝে কোন কোন ইংরেজী রচনা মুদ্রিত হইত অথবা খ্যাতনামা লেখকদের রচনার অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হইত। সম্পাদকের ইংরেজী প্রবন্ধ "Topography of Ooterparah" ১০ম সংখ্যা (১৫ বৈশাখ ১২৬৪) হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৬ সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। ইহার মাসিক মূল্য ছিল ৵০ মাত্র।

'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' সম্বন্ধে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' ৭ই আগস্ট ১৮৫৭ তারিখে লিখিয়াছেন :

উত্তরপাড়া নিবাসী বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদিগের দর্শনার্থ "উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকার" প্রথম সংখ্যা হইতে চতুর্দশ সংখ্যা পর্যন্ত...প্রেরণ করিয়াছেন। উপনগর বা ভদ্রগাম বিশেষের অবস্থা বিবৃত পত্রিকা বা পুস্তিকা যত প্রচার হয় ততই আহ্লাদের বিষয়, যেহেতু তদ্দারা গ্রাম্যগণের অবস্থা সংশোধনের বিশেষ উপযোগিতা হয়, অতএব উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা উন্নতিপথারূঢ় হয়েন ইহা প্রার্থনীয় বটে। পরন্তু একপ্রকার দেশহিতকর বিষয় দেশীয় ভূম্যধিকারী মহাশয়দিগের প্রযত্ন ব্যতীত কখনই সুসিদ্ধ হওনের সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ কুমার প্রথমোদ্যোগ করেন, তিনি বহু ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ নিউস ও মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী নামক ইংরেজী বাঙ্‌লা ভাষার যুগ্ম সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন; ঐ রাজা যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা প্রভৃতি দুর্ভেদ্য বাগুরায় বদ্ধ হইয়া যদ্যপি অকালে কাল সদনে গমন না করিতেন তবে তাঁহার দ্বারা উক্ত স্থানীয় জনগণের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল, যেহেতু রাজা কৃষ্ণনাথ উদ্যমদাতা ও সদনুষ্ঠানব্রতে অনুরাগী ছিলেন। পরন্তু রঙ্গপুরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায়ের যত্নে রঙ্গপুর বার্তাবহ পত্রের সৃষ্টি হয়; যদিও উক্ত উদারচিত্ত বাবু নিতান্ত তরুণ বয়সে লোকান্তর গমন করাতে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অন্যান্য কীর্তি মধ্যে উক্ত সংবাদপত্রখানি এ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। কিয়ৎকাল গত হইল বর্ধমানে দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ লোকে অনুমান করিয়াছিল তদুভয়পত্র বর্ধমানাধিপতির আনুকূল্যে প্রকটিত হইতেছে, কিন্তু উভোভয় পত্রের অকালে বিলয় প্রাপ্তি বিধায় বোধ হইতেছে উক্ত অনুমান অমূলক হইবেক। আমরা বোধ করি উত্তরপাড়া

পাক্ষিক পত্রিকা স্থানীয় ভূম্যধিকারীগণের সহায়তা বলে আবির্ভূতা হইয়াছে; তাহা হইলেই মঙ্গল বলিতে হইবেক। পরন্তু আমরা প্রার্থনা করি উক্তপত্র সম্পাদক প্রেরিত পদ্য মালায় পত্রিকা পূর্ণ না করিয়া স্থানীয় ঘটনাবলী ও দেশহিতকর প্রস্তাবপুঞ্জে তাহা বিভূষিত করেন, কারণ তাহাতেই দেশের প্রকৃত উপকার সাধন এবং গদ্য লিখনের প্রণালী বিশুদ্ধ হইয়া আনিবেক। কদাচ কখন নিরবদ্য পদ্য দুই একটি প্রকটিত করিলে হানি নাই, বরং তাহাতে পাঠকদিগের সুরুচিবর্ধন হইতে পারে। পুষ্টিকর ভোজ্য পেয়াদি পরিশেষে দুই একটা মিষ্টান্ন ভাল লাগে, দুস্পচ বাজারু মোদক দ্বারা উদর পূর্তি করিলে কেবল পীড়াজননের কারণ হয়।

॥ ধর্মমর্ম প্রকাশিকা ॥

এই মাসিক পত্রিকা ১৮৫০ সনের মাঝামাঝি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়' ২৯ জুলাই ১৮৫০ (১৫ শ্রাবণ ১২৫৭) তারিখে লিখিয়াছিলেন ঃ

কোন্নগরস্থ ধর্মমর্ম প্রকাশিকা সভার সংগৃহীত পুস্তকের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদক কর্তৃক অস্মৎ সমীপে প্রেরিত হওয়াতে আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম...।

১৮৫২ সনের এপ্রিল মাসে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত গুপ্ত কবির সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তেও দেখিতেছি যে, 'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা' "কোন্নগর ধর্মসভার মুখপত্র" ছিল। গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ('নবজীবন', আষাঢ় ১২৯৩) লিখিয়াছেন ঃ

সন ১২৫৭ সাল। ....ধর্মমর্ম প্রকাশিকা কোন্নগরের ধর্মসভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। স্থিতিকাল—কয়েক সংখ্যা।

১২৬১ সালেও এই মাসিক পত্র জীবিত ছিল। ১১ জুলাই ১৮৫৪ (২৮ আষাঢ় ১২৬১) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন ঃ

কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুতবাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'ধর্মমর্ম প্রকাশিকা' নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশারম্ভ করিয়াছেন, তাহার দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সনাতন হিন্দু ধর্মের সার ভাগ প্রকাশ করাই ঐ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য'...।

উত্তরপাড়া গভর্ণমেন্ট বাংলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বালী-উত্তরপাড়া হইতে "শুভকরী পত্রিকা" ১২৬৯ সালের ৩০ বৈশাখ (১২ মে ১৮৬২) হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইত।" শুভকরী পত্রিকা" যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়, তাহা ২য় সংখ্যার প্রকাশিত নিম্নোক্ত অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

...পত্রিকা প্রচার করণের পূর্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের পত্রিকাখানি সংবাদপত্র হইবে না; উহা কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পূর্ণ থাকিবে। তদনুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর আর আমরা পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সমর্থ হইতেছি না...আগামী মাস হইতে প্রধান ২ কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া লইবে।

তিন বৎসর চলিবার পর শুভকরী পত্রিকা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া যায়।

উত্তরপাড়া হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে **"উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা"** নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহা সম্পাদনা করিতেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। "বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকা প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য" বলিয়া পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি পকাশিত হইত।

১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাস হইতে **"সবিতা"** নামে একখানি মাসিকপত্র উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ। পত্রিকাখানি কতদিন চলিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

পুরাতন সংবাদ পত্র হইতে তৎকালীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এবং সে যুগের সমাজের বহু প্রাচীন কাহিনী জানিতে পারা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত মহা-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন, পুরাতন সংবাদ পত্র হইতে সেইরূপ বহু কবির সন্ধান পাওয়া যায়। হুগলী জেলার জেজুরের কবি রাধামাধব মিত্র তন্মধ্যে অন্যতম।

॥ সুধাকর ॥

১২৬৮ বঙ্গাব্দে মথুরানাথ শর্মার পরিচালনায় প্রথমে কলিকাতা হইতে 'সুধাকর' নামক একখানি পাক্ষিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর চলিবার পর পরিচালকের 'অনবকাশ প্রযুক্ত' ইহা বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর ১২৭৭ সালে জেজুরের কবি রাধামাধব মিত্রের সম্পাদনায় 'সুধাকর' পুনঃপ্রকাশিত হয়। বর্তমানে 'সুধাকর' পত্র দুঃষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও এই পত্রের কোন সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানের ফলে আমি সম্প্রতি দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সুধাকরের' কয়েকটি সংখ্যা আবিষ্কার করিয়াছি। প্রথম পর্যায়ের 'সুধাকর' গদ্যে প্রকাশিত হইত; কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের সুধাকর পদ্যে লিখিত হইত এবং মধ্যে মধ্যে দু-একটি সংবাদ গদ্যেও প্রকাশিত হইত দেখা যায়। হুগলী জেলার অধিবাসী কর্তৃক এই পত্র সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে বিবৃত হইল।

'সুধাকরের'* পরিচালক মথুরানাথ শর্মা প্রথম সংখ্যায় [১ বৈশাখ ১২৭৭] যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উল্লেখ্যঃ

"এই সুধাকর পত্র ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়া গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতে ত্রুটি করে নাই। পরে আবার অনবকাশ প্রযুক্ত উহা বন্ধ হইয়া যায়। অধুনা আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব মিত্র মহোদয়ের সাহায্য ভরসায় পুনর্বার সুধাকর উদিত করিয়া ইহার স্নিগ্ধ কিরণে গ্রাহকগণের অন্তঃকরণ সুশীতল করিতে উদ্যত হইলাম।

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সুধাকর' সাপ্তাহিকপত্র ছিল বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়।

সুধাকর

স্তোত্র।

'সুধাকর' পত্রের ২য় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

এবারে ইহাতে অধিকাংশ পদ্য লেখাই আমার উদ্দেশ্য, তজ্জন্য রাধামাধব বাবুকেই সম্পাদকতা কার্যের ভার দিয়া স্বয়ং সহকারিতা অবলম্বন করিলাম।"

সুধাকরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ ও ষাণ্মাষিক মূল্য ১।৵০ এবং মাসিক মূল্য ।০ এবং প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০ বলিয়া লিখিত আছে। ইহা কলিকাতা মির্জ্জাপুর হলওয়েলস্ লেন নং ২ প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ইহার কন্ঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রতি সংখ্যায় মুদ্রিত হইত ঃ

ভো ভো বিচিত্রবিষয়ামৃত ভূরিপাণপর্য্যুৎসুকা সুজনবৃন্দমনশ্চাকোরাঃ।
মালং বিষীদত যতোহদ্য তমঃ সমূলমুন্মূলয়ন্নুদয়মেতি সুধাকরোহয়ং॥

রাধামাধব মিত্র ১২৩২ সালের ২৬শে ভাদ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত জেজুর গ্রামের প্রসিদ্ধ মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা শীলস্ ফ্রী কলেজে তিনি দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য করিতেন পরে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের তিনি শিষ্য ছিলেন এবং সংবাদ প্রভাকরে তিনি নিয়মিত রূপে কবিতা লিখিতেন। তৎকালে কবি বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করেন। বহরমপুরের প্রখ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রামদাস সেনের একখানি পত্র ১২৬৬ সালে ১লা মাঘ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রে তিনি বঙ্গ কবিগণের কয়েকখানি গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে মাইকেলকে কবিগণের মধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হয়। নিম্নে তাঁহার পত্রের অংশবিশেষ পূর্বোক্ত তারিখের প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা ললিত মনোহর ও বালক বালিকা, যুবা, বৃদ্ধ, সকলেরই মনোরঞ্জক এবং তাঁহার নিকট পদ্য লিখনের ধারা শিক্ষা করিয়াই শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তবাবু রাধামাধব মিত্র ও শ্রীযুক্তবাবু প্রিয়মাধব বসু প্রভৃতি অনেক মহোদয়গণ অধুনা কবিশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে সহস্রবার স্বীকার করি, বিশেষতঃ তাঁহার হাস্য ও শৃঙ্গার রস বর্ণন বিষয়ে একটি ক্ষমতা ছিল।"

'সুধাকরে' কবিতায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী কি ভাবে সম্পাদক মহাশয় প্রকাশিত করিতেন তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইলঃ

১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গদেশে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হয় এবং বহু লোকের তাহাতে প্রাণবিয়োগ হয়। এই ঝড়-বৃষ্টি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে অনায়াসে, ঝড় বৃষ্টি এনে।
অনেকের ঘর দ্বার, ফেলে দিলি টেনে॥
তাহাতে লোকের কষ্ট, হয় যে প্রকার।
তার চেয়ে ভাল ছিল, যষ্টির প্রহার॥
করিলি দরিদ্রের, ওষ্ঠাগত প্রাণ।
ভেঙ্গে দিলি ধনিদের, সকের বাগান॥
ভাঙ্গা ঘরে হোলো তায়, অনেকের বাস।

বহুলোকে কাঁদালি, ঘটায়ে সর্বনাশ॥
একাত্বর চোয়াত্বর, ঝড়েতে যা করে।
আজো প্রাণ ভয়ে কাঁপে, মনে হোলে পরে॥
হেরিয়া ঝড়ের কান্ড, স্তব্ধ হোয়ে থাকি।
হয়েছে পৈত্রিক প্রথা, ঝড় আনা নাকি?॥
ঝড়ের আশঙ্কা যেন, সদা মনে জাগে।
এত বাড়াবাড়ি কই, ছিলো না তো আগে॥ [১লা বৈশাখ ১২৭৭]

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে **'সোমপ্রকাশ'** প্রথম পর্যায়ের 'সুধাকর' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন : 'সুধাকর' অন্য অন্য অনেক বাঙ্গলা সমাচারপত্রের ন্যায় কেবল সামান্য বিষয় দ্বারা পরিপূরিত না হইয়া, মহার্থ বিষয় সকলকে সহৃদয়ে স্থান দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; ক্রমশঃ ইহার লিপি-নৈপুণ্যও দৃষ্ট হইতেছে।

॥ ধর্মপ্রচারক ॥

১২৮৪ সালে মুঙ্গের আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা হইতে **"ধর্মপ্রচারক"** নামক একটি বাংলা হিন্দী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি দ্বিভাষিকপত্র, ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার দক্ষিণ পার্টিতে হিন্দী এবং বাম পার্টিতে বাংলায় লেখা থাকিত। ইহার পূর্বে আরও তিন খানি দ্বিভাষিতপত্রের বিষয় জানা যায়, উহাদের নাম **"গসপেল ম্যাগাজীন" "ব্রাহ্মণ সেবধি"** ও **বিজ্ঞানসার সংগ্রহ"**। এই তিনখানি পত্রিকা বাংলায় প্রকাশিত হইলেও ইংরেজী অনুবাদের জন্য এইগুলি দ্বিভাষিক পত্র বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। প্রথমোক্ত কাগজ-খানি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম প্রচারিণী সভা "ব্যাপটিষ্ট অক্সিলিয়ারী মিশনারী সোসাইটি" কর্তৃক খৃষ্টীয় তত্ত্ব বিষয়ে জনসাধারণকে জানাইবার জন্য প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কাগজখানি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক পরিচালিত এবং শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলীর ৪৫৫-৪৮৫ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন সংখ্যা "ব্রাহ্মণ সেবধি" মুদ্রিত আছে।

তৃতীয় দ্বিভাষিকপত্র "বিজ্ঞানসার সংগ্রহ" ১৮৩৩ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী নাম "The Hindoo Manual of Literature and Science" ইহা প্রথমে পাক্ষিকপত্ররূপে এবং দ্বিতীয় বর্ষে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ইহা মুদ্রিত হইত এবং "শ্রীডবলিউ এম উলেষ্টন শ্রীনবকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীগঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত" ইহা পরিচালনা করিতেন। ইহাও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম কলম ইংরেজী ও দ্বিতীয় কলমে তাহার বঙ্গানুবাদ থাকিত।

আলোচ্য "ধর্মপ্রচারক" দ্বিভাষিক মাসিকপত্র হইলেও এইরূপ পত্র ভারতবর্ষে আর পূর্বে বাহির হয় নাই। ইহার প্রথম কলম বাংলায় এবং দ্বিতীয় কলমে তাহার হিন্দীতে অনুবাদ থাকিত। **এইরূপ বাংলা হিন্দী মাসিকপত্র আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।**

"ধর্মপ্রচারক" প্রতি পূর্ণিমাতে মুঙ্গের আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা হইতে গুপ্তিপাড়ার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইত এবং কলিকাতা ২২ নং ঝামাপুকুর লেন হইতে বি পি মজুমদার কর্তৃক বি পি এমস প্রেসে মুদ্রিত হইয়া "মিত্র এন্ড কোম্পানী" দ্বারা প্রকাশিত হইত। বিহার প্রদেশ হইতে হিন্দীভাষায় প্রকাশিত, ইহাই প্রথম সাময়িক পত্র। হুগলী জেলার অন্যতম সুসন্তান কর্তৃক ইহা পরিচালিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত হইত বলিয়া এই পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে বর্ণিত হইল।

ধর্মপ্রচারকের প্রথম সংখ্যা ১২৮৪ সালের কার্তিক মাসে, ইংরেজী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ-কাল "আশ্বিন ১২৮৪" বলিয়া লিখিত আছে। এই পত্রিকায় যাবতীয় সংখ্যার ফাইল শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনের নিকট হইতে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ইহার প্রথম সংখ্যায় "আশ্বিন ১২৮৪—পূর্ণিমা" লেখা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কার্তিক মাসেই প্রকাশিত হয়; কারণ ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল "অগ্রহায়ণ ১২৮৪"। আশ্বিন ১২৮৫ সালে ১ম বর্ষ শেষ হইয়াছে এবং কার্তিক ১২৮৫ সালে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ফুলিস্কেপ কাগজের আকারে মুদ্রিত হইত এবং প্রত্যেক সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকিত। এই পত্রের শিরোভাগে প্রতি সংখ্যায় একটি সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত হইত। শ্লোকটি এইঃ—

"এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্বমন্যত্তু গচ্ছতি।"

দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে উক্ত সংস্কৃত শ্লোকটির উপরে এক ঋষির লাইন ব্লক মুদ্রিত হইত।

ধর্মপ্রচারকের নিয়মাবলীতে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়ঃ

"যদি কোন ধর্মাত্মা আর্যধর্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও প্রচার নিমিত্তে বাঙ্গলা অথবা হিন্দী ভাষায় বা উভয় ভাষাতেই কোন প্রস্তাব লিখিয়া প্রেরণ করেন, তবে লিখিত বিষয়টি সারবান বিবেচনা হইলে আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে ধর্মপ্রচারকে প্রকাশ করিব। এই পত্রের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, তিন টাকা, ষান্মাসিক ১৸৹, ত্রৈমাসিক ১, এক টাকা ও প্রতি খণ্ড ।৶৹ আনা। ডাক মাশুল প্রতি খণ্ডে ৲১০ অর্ধ আনা।

মুঙ্গের, আর্যধর্ম — শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন,
প্রচারিণী সভা — সম্পাদক।"

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে"ধর্মপ্রচারক" উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ এই-তিনরকম কাগজে মুদ্রিত হয় এবং বার্ষিক মূল্যও তিনরকম হয়। এই বিষয়ে ১২৮৫ সালের কার্তিক পূর্ণিমায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ ছিলঃ

বিজ্ঞাপন

ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুমাত্রেই "ধর্মপ্রচারক" পাঠেচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহার ডাককর সহিত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৶৹ থাকায় অনেকে অসমর্থতা প্রযুক্ত গ্রাহক শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহাদিগের সুবিধা ও বহুল পরিমাণে আর্যধর্ম

পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য মূল্যের হার পরিবর্তিত হইল। ধর্মপ্রচারকের সাহায্য সামর্থ-অনুগ্রাহক, গ্রাহক মহোদয়গণ প্রথম শ্রেণীভুক্ত থাকেন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।" দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ধর্মপ্রচারক তিন রকম বিভিন্ন কাগজে মুদ্রিত হইত। তিন রকম কাগজের তিন প্রকার মূল্য ছিল। নিম্নোক্ত নিয়মাবলী হইতে কাহার কিরূপ মূল্য ছিল তাহা জানা যায়।

"ধর্মপ্রচারক ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যা হইতে ডাক-মাশুলসহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্যের নিয়ম তিন প্রকার হইল। উত্তম কাগজে বার্ষিক ৩।৶০, ষাণ্মাষিক ১৸৶০, ত্রৈমাসিক ১/১০, মধ্যম কাগজ বার্ষিক ২।৶০, ষাণ্মাষিক ১৷৷০, ত্রৈমাসিক ৸০, সাধারণ কাগজ ১।৶০, ষাণ্মাসিক ৸০, ত্রৈমাসিক ।৶০ ।"

ধর্মপ্রচারকের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে **বেদব্যাস** নামে একখানি মাসিকপত্র ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। "হিন্দুদের প্রকৃত মহিমাকীর্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য" বলিয়া পত্রিকায় লেখা থাকিত। এই মাসিকপত্র দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

"ধর্মপ্রচারক" কি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহার রচনার নিদর্শন কিরূপ ছিল তাহা ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "মঙ্গলাচরণ" হইতে বুঝিতে পারা যায়।

২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ সালে "ধর্মপ্রচারক" সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিহার রাজ্যে প্রথম হিন্দী পত্রিকা বলিয়া যে ভুল সংবাদ বাহির হয়, লেখক কর্তৃক লিখিত তাহার প্রতিবাদ যাহা আনন্দবাজার পত্রিকায় [২১ ডিসেম্বর ১৯৫৯] প্রকাশিত হয়, তাহার একাংশ উদ্ধৃত হইলঃ

॥ বিহারের প্রথম হিন্দী পত্রিকা ॥

২৪শে অগ্রহায়ণের আনন্দবাজার পত্রিকায় "বিহারের প্রথম হিন্দী পত্রিকা" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ যে, বিহার ও পাটনার ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারের ষ্টেট এডিটার 'ধর্মপ্রচারক' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিকের ফটোচিত্র পাইয়াছেন। এই পত্রিকাটি ১৮৭৪ সালে স্বামী কৃষ্ণচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং বিহার রাজ্যে ইহাই ছিল প্রথম হিন্দী পত্রিকা।

এই সংবাদে তথ্যগত কিছু ভুল আছে। 'ধর্মপ্রচারক' কেবল হিন্দী পত্রিকা ছিল না, ইহা দ্বিভাষিক পত্র ছিল এবং বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষায় মুঙ্গের আর্য ধর্ম প্রচারণী সভা হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ইহা ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ বাংলা ১২৮৪ সাল। (১৭৯৯ শক) কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। ইহার সম্পাদক ছিলেন হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীকৃষ্ণানন্দ সেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র' নহে। ইনি পরবর্তীকালে 'স্বামী কৃষ্ণানন্দ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, কলিকাতা-২৬

"হে পরমেশ! তুমিই আমার দুশ্চর কার্যের নেতা হও, তুমিই আমার আশ্রয়স্বরূপ হইয়া তোমারা সার সত্য সকল প্রচার করিতে আমাকে বল প্রদান কর। তোমার যে কৃপা-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সংগ্রহ ও বাল্মীকি শ্রীরাম চরিত ব্যাখ্যা করিয়া ভারতকে বিমোহিত করিয়াছিলেন, হে নারায়ণ! আমি যেন তোমার সেই দয়ায় বঞ্চিত না হই।......আমি তোমার শরণাপন্ন, তুমিই আমার লজ্জা নিবারণ করিবার একমাত্র কর্তা; ক্ষুদ্র হইয়া মহানগণের দুষ্কর কার্যের ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেছি। তুমি সহায় থাকিলে ভয়-ভাবনা বিঘ্ন-বিপত্তির স্রোত আমার গতি রোধ করিতে পারিবে না; হে হরে! তোমাকে পুনর্বার নমস্কার করি। যেন ভারতকে পাপ-তাপ-শোকাদির জন্য রোদনের পরিবর্তে তোমার প্রেমে দুনয়নে অশ্রু ফেলিতে দেখিতে পাই এই প্রার্থনা।"

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে গুপ্তিপাড়ায় "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সালের ৬ই ফাল্গুন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত হরিমন্দিরের উদ্বোধন করেন। স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর এই মন্দিরে তাঁহার স্মৃতিপূজা হয়। ধর্মপ্রচারকের প্রতিলিপি ৫১২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

॥ সুজন রঞ্জন ॥

১৩০১ সালে কলিকাতা ৩৫নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরাধামাধব মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া **"সুজন রঞ্জন"** নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উক্ত মাসিক পত্রখানি কোথাও দৃষ্ট হয় না। সম্প্রতি আমি সুজন-রঞ্জনের অবতরণিকা এক খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছি। এই অবতরণিকায় ডবল ক্রাউন ষোলপেজি দশ পৃষ্ঠা লেখা আছে। অবতরণিকা পাঠে সুজন-রঞ্জন কবিতায় প্রকাশিত হইত এবং বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছিল। কবি রাধামাধবের সাহিত্যিক প্রতিভার কথা ৪৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

সুজন-রঞ্জন কলিকাতা ২৪নং বিডন ষ্ট্রীট, ফুলমুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস কর্তৃক নন্দমোহন ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানী হইতে মুদ্রিত হইয়া জেজুরের শ্রীরাধামাধব মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে ঃ

শ্রী—পদ পঙ্কজ তব, চা—হি বিশ্বসার।
রা—খ পদে, পদে পদে, হে—করুণাধার ॥
ধা—রণা হতেছে মনে, ত—ব সহকার।
মা—নসিক ভাব আশু, ব—লাবে আবার ॥
ধ—রি যেন লেখনীটি, কৃ—পাতে তোমার।
ব—লিতে মনের কথা, পা—রি অনিবার॥
মি—ত্র তুমি আছ বলি, চি—ন্তার সংহার।
ত্র—পা ভয় করি তাই, ত্র—স্ত পরিহার॥

কবিতাটির প্রতি লাইন দুই ভাগে বিভক্ত এবং প্রথম অক্ষরটি উপর হইতে পাঠ করিলে **"শ্রীরাধামাধব মিত্র চাহে তব কৃপা চিত্র"** এই পদ্যটি হয়।

সুজন-রঞ্জনের প্রথম পৃষ্ঠায় "সহৃদয় গ্রাহকপুঞ্জের প্রতি নিবেদন" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং রাধামাধব মিত্র সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

আছেন ঈশ্বর গুপ্ত, বিশ্বের আধার।
ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, তনয় তাঁহার॥
ঈশ্বরের করুণায়, সুকবি ঈশ্বর।
ঈশ্বরের গুণগান, করেন বিস্তার॥
করিবারে মানবের, মানস রঞ্জন।
আজীবন ছিল তাঁর, সুদৃঢ় যতন॥
কবিবর গুণধর, প্রভাকর কর।
যাঁর গুণে পেয়েছিল, প্রভা প্রভাকর॥
যাঁহার যশের গীত, গায় সর্বজনে।
তুষিয়াছিলেন যিনি, বঙ্গবাসিগণে॥
আজো যার গুণফুল, আছে বিকসিত।
আজো সে সৌরভ ছুটে, করে' আমোদিত॥
আজো যাঁর নাম জাগে, হৃদয়ে সবার।
কবির প্রসঙ্গ সঙ্গে, প্রসঙ্গ যাঁহার॥
তাঁর ছাত্র হয়ে আমি, কেমনে তাঁহারে।
ভুলিয়া থাকিতে পারি, থেকে এ সংসারে॥
গিয়াছেন যোগ্য ধামে, বহু দিন গত।
মম উপকারী আর, কেবা তাঁর মত॥
শোকের সাগরে আহা, করিয়া মগন।
গুরু কবি পরলোকে, গেলেন যখন॥
তাঁহার মাসিক পত্র, সম্পাদন তরে।
ভ্রাতা তাঁর দেন ভার, আমার উপরে॥
অগত্যা লইতে ভার, হইল তখন।
কয় বর্ষ করিলাম, পত্র সম্পাদন॥
হয় নি তাঁহার মত, আসরের জাঁক।
ঢাকের বদলে মাত্র, বাজায়েছি শাঁখ॥
পিকরব বিনিময়ে, সত্য এই বাক্।
ডাকা হয়েছিল মাত্র, বায়সের ডাক॥
প্রভাকর পাঠকেরা, সুধীর সুজন।
তথাপিও করিলেন, কৃপা প্রদর্শন॥
দশজন স্ব স্ব গুণে, হলে অনুকূল।
অযোগ্যও যোগ্য হয়, তাতে নাই ভুল॥
করিয়া উৎসাহবারি, সেচন নিয়ত।
আমার সাহস-তরু, করেন উন্নত॥
তাঁদের উৎসাহ আর, গুরুর প্রসাদে।
মাসিক যে প্রভাকর, লিখি নির্বিবাদে॥
ছিলেন উৎসাহদাতা, পাঠকেরা যত।
অনেকেই হয়েছেন, পরলোকগত॥
জীবিত আছেন যাঁরা, এখন ধরায়।
নিশ্চয় গেছেন ভুলে, এই অভাগায়॥
ঈশ্বরের করুণায়, আজো আছি বেঁচে।
বাসনা লেখনী ধরি, পুনর্বার কেঁচে॥
ঈশ্বর জানেন সব, জানাব কি বোলে।
যা নয় তা হতে পারে, তাঁর ইচ্ছা হোলে॥
নব্যদলে যেন নাহি, হই হতাদর।
ঈশকাছে এ প্রার্থনা করি নিরন্তর॥

সুজন-রঞ্জনের শেষ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত নিবেদনটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল:

মদীয় গুরু কবি মহোদয়ের শেষ অনুজ্ঞানুসারে এবং কতিপয় উৎসাহদাতা প্রিয় বন্ধুর বিশেষ অনুরোধ বশতঃ আমি এত কালের পর পুনর্বার লেখনী ধারণ পূর্বক প্রায় কবিতায় পরিপূর্ণ একখানি "সুজন-রঞ্জন" নামক মাসিক পত্র প্রকটন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বর্তমান সময়ে বঙ্গভূমের বহুতর পত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া গ্রহকপুঞ্জের উৎসাহ অভাবে অকালে কাল-কবলে পতিত হইয়াছে দেখিয়া এই মাসিক পত্র প্রকাশ করিবার পূর্বে কতকগুলি সহৃদয় গুণগ্রাহক, অনুগ্রাহক, গ্রাহক নির্ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছি।
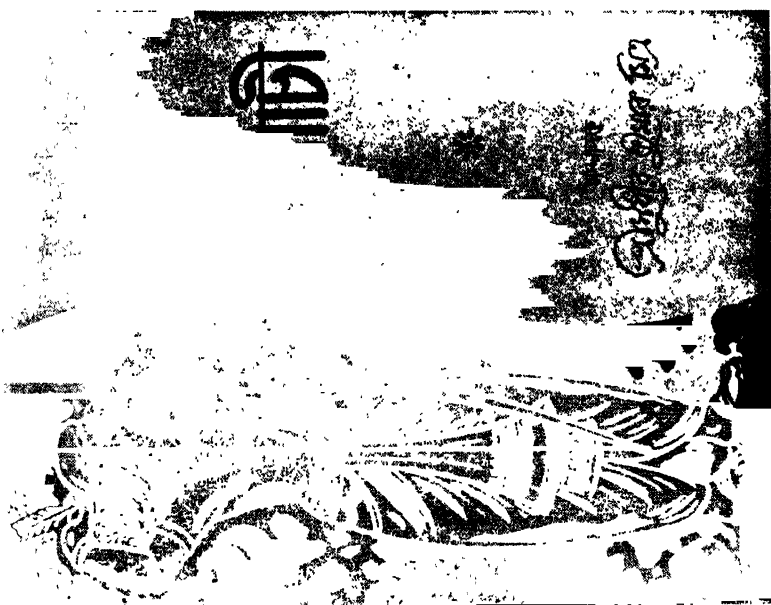
'সুজন-রঞ্জন' পত্রের প্রতিলিপি
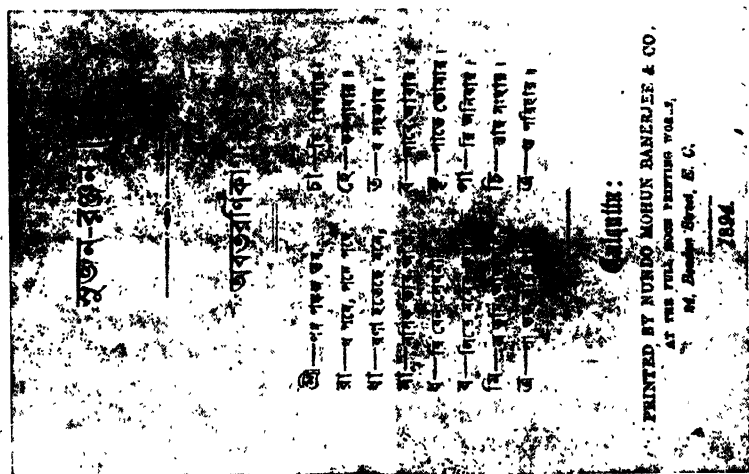
'সব্যসাচী' মাসিকপত্রের সচিত্র কভারের প্রতিলিপি

এই পত্র প্রতি মাসের শেষে প্রকাশিত হইবে এবং ইহার আকার ডিমাই আট-পেজী চারি ফরমা বিশিষ্ট হইবে। এই অবতরণিকা-পত্রের ন্যায় ছাপা ও কাগজ হইবে।

ইহার অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য সহরে ২৲ টাকা এবং মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ২॥৹ (আড়াই) টাকা মাত্র ধার্য করা হইয়াছে।

ইতি তারিখ ১লা বৈশাখ একান্তানুগত—

সন ১৩০১ সাল শ্রীরাধামাধব মিত্র, সম্পাদক

কবি রাধামাধব মিত্র ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্র ছিলেন এবং 'রসার্ণব,' 'সুধাকর,' 'মাসিক-প্রভাকর' প্রভৃতি পত্র সম্পাদনা করেন। 'সুজন-রঞ্জন' তাঁহার শেষ সম্পাদিত মাসিক পত্র। শেষ জীবন তিনি ধর্মচর্চায় অতিবাহিত করেন এবং ঘোষপাড়ায় 'সতী-মা'র ভক্ত হন বলিয়া সাহিত্যালোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই পত্র বন্ধু-বান্ধবদিগের অনুরোধে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর বাহির করিবার সময় তিনি লিখিয়াছিলেনঃ

"পঁচিশ বৎসর, চিত্ত-সরোবর, পূর্ণ নিরন্তর, অনভ্যাস পঙ্কেতে।
পূর্ব-ভাব পয়, স্বতঃ পায় লয়, তায় দুঃখ চয়, সংখ্যা নয় অঙ্কেতে॥

'সুজন-রঞ্জন' বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং পত্রিকাখানি কতদিন চলিয়াছিল তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে ৪৪৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে রাধামাধব মিত্র **"রসার্ণব"** নামে একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা আমরা কোথাও দেখি নাই। "সংবাদ প্রভাকরে" (১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৪) প্রকাশঃ

মাঘ ১২৬০। বাবু রাধামাধব মিত্র কর্তৃক রসার্ণব নামে /৹ মূল্যে এক মাসিক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়।

॥ পল্লীগ্রাম বার্তাবহ ॥

বৈদ্যবাটী॥ ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাস হইতে **'পল্লীগ্রাম বার্তাবহ'** নামে একটি পাক্ষিক পত্র বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার অনুষ্ঠানপত্রে লেখা ছিল পল্লীগ্রামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই 'পল্লীগ্রাম বার্তাবহে'র প্রধানোদ্দেশ্য।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (অক্টোবর ১৮৬৮) পত্রে লিখিত হইয়াছে ঃ এই পাক্ষিক সংবাদপত্রখানি শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই পল্লীগ্রাম বার্তাবহের প্রধানোদ্দেশ্য।...নগরের বার্তা প্রকাশ করে এরূপ সংবাদপত্র অনেক আছে। পল্লীগ্রামের মঙ্গলার্থ যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ততই তাহার হিতসাধক হইবে। পল্লীগ্রাম বার্তাবহের লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে বৈদ্যবাটী হইতে **"কেয়া"** নামে একখানি মাসিক সাময়িকী প্রকাশিত হইতেছে। ডাঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ইহা সম্পাদনা করেন। **'নববিধান'** বলিয়া আর একখানি পত্র বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত হয়।

॥ আয়ুর্বেদ পত্রিকা ॥

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে বংশবাটী নিবাসী দ্বারকানাথ দাস দাসের সম্পাদনায় "আয়ুর্বেদ পত্রিকা" নামে একখানি সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা ছিল। এই পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের "সোমপ্রকাশ" লিখিয়াছিলেন ঃ ইহা পাঠ করিয়া আমরা দুটি কারণে আহ্লাদিত হইলাম। এক, এরূপ পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই নূতন প্রচারিত হইতেছে, এতদ্বারা মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়, ইহা অতি সহজ ভাষায় ও সহজ রীতিতে লিখিত হইতেছে।

'আয়ুর্বেদ পত্রিকা' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যাইবে।

সম্প্রতি আয়ুর্বেদ পত্রিকা নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাবড়ার সিবিল সারজন শ্রীযুক্ত ডাং রবার্ট বার্ড মহোদয়ের সাহায্যে প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্যদেহের কি ভাব, দেহমধ্যে কিরূপে রোগ প্রবেশ করে, সেই রোগ হইতেই বা কি প্রকারে পরিত্রান পাওয়া যায়, তাহার উপায় এবং নানাবিধ বিধান প্রভৃতির বিবরণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার মাসিক মূল্য ॥৹, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ৎ এবং মফঃস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮ৎ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে।

হাবড়া জেনারেল হাসপাতাল — শ্রীদ্বারকানাথ দাস দাস, সাং বংশবাটী

হয়েড়া॥ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'শিক্ষা' নামে একখানি মাসিকপত্র বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়। হয়েড়া গ্রামের এই মাসিকপত্র একসময় খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। ১৩০৪ সালের চৈত্র মাসের পূর্ণিমা'য় ইহার দ্বিতীয় সংখ্যার (ফাল্গুন ১৩০৪) সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'আলোচনা'য় 'শিক্ষা' সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা বিবৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

বদনগঞ্জ॥ ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে **"বঙ্গীয় রহস্য"** নামক মাসিক পত্র হেমগিরি চন্দ্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১।৹ পাঁচসিকা ছিল। ১৩০৭ সালের ভাদ্র মাসের "প্রভাকরে" ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল যে "বঙ্গীয় রহস্যে"র গল্প আমাদের বেশ লাগিয়াছে।

জগশড়া॥ ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে জশড়া গ্রাম হইতে **"সমীরণ"** নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ছিলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড মাখনলাল দত্তের সম্পাদনায় ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা কতদিন চলিয়াছিল তাহা জানা যায় না।

১২৮৭ সালের ভাদ্র মাস হইতে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় **"রহস্য মঞ্জরী"** নামক আর একখানি মাসিকপত্র জশড়া হইতে বাহির করেন।

॥ সমাজ-দর্পণ ॥

চন্দননগর ॥ ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে চন্দননগর হইতে **"সমাজ-দর্পণ"** নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। চন্দননগর হইতে ইহাই স্বল্পমূল্যের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। এই পত্রের সম্পাদকের নিবেদনে প্রকাশিত হইয়াছিলঃ

'আমাদের পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গার মধ্যে কোন স্বল্প মূল্যের কাগজ না থাকায় 'সমাজ-দর্পণ' নাম দিয়া এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি চন্দননগর হইতে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ যাহারা গরিব তাহারা প্রায়ই এখানে সংবাদপত্র পড়িতে পায় না, পড়া দূরে থাকুক, বোধ হয় দেখিতেও পায় না; তজ্জন্যই তাহাদের অভাব দূরীকরণাশয়ে আমরা এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না, আমরা ইহাতে বিবিধ সংবাদ, হিতোপদেশ, ইতিহাস, জীবনচরিত ও নানা গদ্য পদ্য রচিত কাব্য সন্নিবেশিত করিব, ইহা ভিন্ন কুৎসিত গল্প বা লোকের কুৎসা লিখিয়া পাঠকগণের বিরাগভাজন হইব না।' ('এডুকেশন গেজেট', ২ কার্ত্তিক ১২৮০)

॥ প্রজাবন্ধু ॥

১২৮৯ সালের আশ্বিন মাস হইতে গোন্দলপাড়া হইতে **"প্রজাবন্ধু"** নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র "ব্যাস যন্ত্র" হইতে সুলভ মূল্যে প্রচারিত হয়। ইহা সম্পাদনা করিতেন তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালনা করিতেন শ্রীশচন্দ্র বসু। শ্রীশ বাবু **"অ্যামেচার ওয়ার্কসপ"** নামক ইংরাজীপত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। আর একজনের নাম কুসুমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা চন্দননগর ব্যাস প্রেসে ছাপা হইত। শ্রীহরিহর শেঠ লিখিয়াছেনঃ **শ্রীশচন্দ্র বসু** চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রজাবন্ধু নামক সংবাদপত্রের একজন সহায় এবং "Amateur Workshop" নামক পত্রের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। "লীলা" নামক একখানি প্রবন্ধ পুস্তক ও "প্রতাপ" নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। "সংসার" নামে আরও একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মাসিকপত্রেও প্রবন্ধ লিখিতেন। (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩১)

১২৮৯ সালের ফাল্গুন মাস হইতে **"মুকুলমালা"** নামক মাসিকপত্র কাশীকুণ্ডুর ঘাট, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হয়।

১২৯৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে চন্দননগর হইতে **"ধূমকেতু"** নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শিবকৃষ্ণ মিত্র।

১২৯৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে **"বঙ্গপ্রভা"** নামক মাসিকপত্র বিপিনবিহারী কোলের সম্পাদনায় চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হয়। এই বৎসর চন্দননগর হইতে **"হিতসাধিনী"** নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদনা করিতেন নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩০৮ সালে চুঁচুড়া ঘোষ প্রেস হইতে **"স্বাস্থ্যসখা"** নামে স্বাস্থ্যবিষয়ক মাসিকপত্র চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন ডাঃ গগনচাঁদ নন্দী।

১ম বর্ষ
১ম সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীভূতনাথ ভৌমিক

১৬ই মাঘ ১৩৫৬
মূল্য ছয় পয়সা।

'আরামবাগের কথা'র প্রথম সংখ্যার এক অংশের প্রতিলিপি

"সমগ্র ভারতের হৃদয়ভূমি বঙ্গদেশ-- বাংলার হৃদয়স্পন্দন ধ্বনিত হয় হুগলী জেলায়।"--শ্রীঅরবিন্দ

নির্দলীয় গঠনমূলক পাক্ষিকপত্র

চন্দননগর

(চন্দননগর মহকুমার মুখপত্র)

সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি : শ্রীসুধীর কুমার মিত্র

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] * [চন্দননগর বৃহস্পতিবার ১৩৬২ সাল ২৯শে ভাদ্র] * [15th. September 1955.] * [মূল্য এক আনা

পাক্ষিক 'চন্দননগর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার এক অংশের প্রতিলিপি

॥ চন্দননগরের অন্যান্য পত্র ॥

চন্দননগর হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে **"চন্দননগর পত্রিকা"** নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। প্রবর্তক সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে **"নবসঙ্ঘ"** নামক পাক্ষিকপত্র সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়ের পরিচালনায় চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ইহা সম্পাদনা করেন শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত।

১৩৫৫ সালে **'সংহতি'** নামে একখানি পাক্ষিকপত্র শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় গোন্দলপাড়া হইতে প্রকাশিত হয়। অসংখ্য পত্র-পত্রিকা এই স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়াছে তাহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপঃ

সমাচার (পাক্ষিকপত্র) সম্পাদক শ্রীপ্রভাত পালিত, প্রগতি (পাক্ষিক) সম্পাদক শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়, সেবক (পাক্ষিক) সম্পাদক শ্রীমতিলাল লাহা, নাগরিক (পাক্ষিক) সম্পাদক শ্রীবসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিমত (মাসিক) সম্পাদক শ্রীঅমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রতচারী সঙ্ঘ ও ব্যায়াম (মাসিক) সম্পাদক শ্রীবলাইকৃষ্ণ গোল। ইহা ছাড়া দর্পণ, মাতৃভূমি, স্ফুলিঙ্গ, আজকাল, মায়াজাল, বড়বাজার, গোস্বামীঘাট, সুহৃদ প্রভৃতি আরো কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকার নামও উল্লেখযোগ্য। চন্দননগরের সাময়িকপত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ শ্রীহরিহর শেঠ লিখিত 'প্রবাসী'তে (আশ্বিন ১৩৩১) প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখিত আছে।

॥ চন্দননগর ॥

ফরাসী চন্দননগরের ভারতভুক্তির পর চন্দননগর হুগলী জেলার একটি নূতন মহকুমা বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর শ্রীরামপুর মহকুমার এই চারিটি থানা লইয়া নূতন চন্দননগর মহকুমা গঠিত হয়। নবগঠিত **চন্দননগর মহকুমার মুখপত্র** হিসাবে **"চন্দননগর"** নামে একখানি নির্দলীয় গঠনমূলক পাক্ষিকপত্র চন্দননগর হইতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৫৫ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতি-সংখ্যার মূল্য এক আনা ও বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা ছিল। চন্দননগর বাগবাজারস্থিত "দি বেঙ্গল আর্ট প্রেস" হইতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও গোন্দলপাড়া হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। 'কচিপাতা' বলিয়া শিশুদের বিভাগ এই পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল এবং পার্থসারথি (পলাশ মিত্র) ইহা পরিচালনা করিতেন। সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। একবৎসর চালাইবার পর পরিচালকগণ এই নির্দলীয় সুন্দর পাক্ষিক পত্রখানি বন্ধ করিয়া দেন। 'চন্দননগরে'র শিরোভাগে শ্রীঅরবিন্দের এই বাণীটি মুদ্রিত হইত ঃ "সমগ্র ভারতের হৃদয়ভূমি বঙ্গদেশ—বাংলার হৃদয়স্পন্দন ধ্বনিত হয় হুগলী জেলায়।"

॥ পূর্ণিমা ॥

বাঁশবেড়িয়া॥ কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উৎসাহে ও উদ্যোগে" হুগলী 'সাবিত্রী যন্ত্র' হইতে ১৩০০ সালের বৈশাখ মাস হইতে **"পূর্ণিমা"** নামক "মাসিকপত্র ও সমালোচনী" প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। পূর্ণিমা নিত্যানন্দ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃত' ইহাতে প্রকাশিত হইলে ৪ঠা

শ্রাবণ ১৩০৭ সালের বসুমতী লেখেন—রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত প্রকৃতই অমৃতের ন্যায় পূর্ণিমার প্রতি পৃষ্ঠায় ক্ষরিত হইয়াছে। এই কথোপকথনগুলি যেমন জ্ঞানগর্ভ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। পূর্ণিমার সূচনায় কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন:

"সকলেরি জীবনে এমন অবসর অনেক থাকে, যাহা অতিবাহিত করিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। বালকে খেলা করে, প্রৌঢ়ে শাস্ত্র আলোচনা করেন, বৃদ্ধে হরিনাম করেন, কিন্তু যুবায় কি করিবেন ভাবিতে হয়। উপন্যাস বা নভেল পাঠ যুবকের পক্ষে সুখকর বটে; সাধারণে তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ইংরেজী ভাষায়। দেশীয় ভাষায় সুখপাঠ্য উপন্যাস অতি অল্প, নভেল নাই বলিলেই হয়। * * *

আমরা তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব চেষ্টা ও যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমাদিগকে "দেশীয়" বলিয়া আমাদের সঙ্গ ত্যাগ না করেন। পূর্ণিমায় সকল বিষয়েই আলোচনা হইবে। যে কোন বিষয়ের রচনা উপাদেয় হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে।"

'পূর্ণিমা'র প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে "পূর্ণিমা" নামে ঈশানচন্দ্রের একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল; নিম্নে কবিতাটির শেষ চার পঙক্তি উদ্ধৃত হইল:

"(আমি) আধ আধ সাধ পারি না মিটাতে
খুঁজিয়া বেড়াই ভরা।
ওহে পরিপূর্ণ, লুকায়ে কোথায়,
আইস নিকটে ত্বরা।"

ঈশানচন্দ্র কবি হেমচন্দ্রের ভ্রাতা; ৪২ বৎসর বয়সে বিষপান করিয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'পূর্ণিমা' যে শোক-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা এইরূপ:

"কবিবর হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহজগতে আর নাই। সেই ভীষণ ভূমিকম্পের রাত্রিতে ঈশান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, শুক্রবার. ঈশান ভূমিষ্ঠ হন, তাঁহার বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ঈশানের অকাল-মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত. তাঁহারই উৎসাহে এবং উদ্যোগে আমাদের পূর্ণিমা প্রকাশিত হয়, তিনি সেই অবধি পূর্ণিমার প্রধান ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার আকস্মিক বিয়োগে অবসন্ন। তাঁহার প্রতিকৃতি এই সংখ্যার পূর্ণিমায় দেওয়া হইল।" (পূর্ণিমা-আষাঢ় ১৩০৪)

পূর্ণিমার ন্যায় সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র হুগলী জেলা হইতে আজও বাহির হয় নাই। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল যাবত মাসিক সাহিত্য সমালোচনা করিয়া পাঠকদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় ইহা সম্পাদনা করিতেন। তিনি "বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী" নামক ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

বংশবাটী হইতে 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকা আমরা ১৩০০ সাল হইতে ১৩১৭ সাল পর্যন্ত অষ্টাদশবর্ষকাল পরিচালনা করিয়াছিলাম। সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়. দেবেন্দ্রবিজয় বসু, চন্দ্রশেখর

কর, সুরেশচন্দ্র সেন, কোমতের শিষ্য যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি 'পূর্ণিমা' পরিচালনে প্রধান সহায় ছিলেন। [ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৩১]

॥ সব্যসাচী ॥

জেজুর॥ ১৩৬০ সালের মাঘ মাস হইতে **"সব্যসাচী" নামক** একখানি সচিত্র মাসিক-পত্র শ্রীসুধীরকুমার মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য চার টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় আনা ছিল। সম্পাদকীয় কার্যালয় "বিশ্বম্ভর ধাম" জেজুর ও কলিকাতা কার্যালয় ৮ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। ইহা লক্ষ্মীবিলাস প্রেস হইতে শ্রীসুধীর-কুমার পালিত কর্তৃক মুদ্রিত হইত। পত্রিকাখানি খুব জনপ্রিয় হইলেও পরিচালকগণ এক বৎসর চালাইবার পর ইহা বন্ধ করিয়া দেন। পত্রিকাখানির প্রচ্ছদপটের সাজসজ্জা ও মুদ্রণের পারিপাট্য খুব আকর্ষণীয় ছিল। হাল্কা রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইত না। ইহার কভারের প্রতিলিপি ৫৩৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

'সব্যসাচী'তে **শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত** একটি **অনুবাদ** পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে শ্রীমা (২৫ নভেম্বর ১৯৫৩) আশীর্বাদী বাণীরূপে যাহা পাঠান তাহা উল্লেখ্যঃ

একটা আন্তর পরিপূর্ণতা এসেছে, অন্ধকার গুহার মধ্যে আলো-আসার মত; পূর্ণ করেছে, উজ্জ্বল করেছে, স্পন্দিত করেছে জীবনের বহুল তন্ত্রী; অতীতের বিস্মৃত সিদ্ধি সকলের সঙ্গে সংযোগ আবিষ্কার করেছে, যাতে আমি ভবিষ্যতের নূতন সিদ্ধি সব সুরু করতে পারি, বর্তমানের নিত্য-নব রূপাবলীর উপর প্রতিষ্ঠা করে। জীবনের ধারা উধর্বমুখে ছুটে চলেছে, উত্তর দ্যুলোক হতে নেমে এসেছে যে জ্যোতির্লেখা সব তাদের সঙ্গে মিলিত হতে, নীচকে অন্ধকারকে আলোকে ও সত্যে পরিণত করবার জন্যে, কুৎসিতকে ভুলকে সুন্দরে ও যথার্থে পরিণত করবার জন্যে।

জ্যোতির্ময়ী হে জননী! আমার মানসের সংকীর্ণ দিকচক্রবালে তুমি উদিত; তার অতল কাঠিন্যের ভিতর থেকে, তার চতুর্দিক-বেষ্টিত আয়তনের মধ্যে থেকে, তুমি গড়ে তুলেছ তার চিরন্তন জীবন দিয়ে যেন একখানি হৃদয়। তুমি আমার কাছে খুলে ধরেছ এক-খানি সজীব সুখের ঘর আমার মনের অসার হিমরাজ্যের মধ্যে, সেখানে আমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারি, আশ্রয় পেতে পারি তোমার কোলে।

নীচেকার চলমান শক্তিদের জাল রয়েছে এখনো, কিন্তু তার মধ্যে তোমার সান্নিধ্য আমি অনুভব করি। উপরের চলমান শক্তিদের জালও রয়েছে, এখানেও **তুমি এসেছ, চেলেছ** জীবনের উচ্চতর ধারা, পূর্বে যা ছিল না। মলিন ধূমল আভাকে তুমি পরিণত করেছ জীবন্ত জ্যোতির স্রোতে। তোমার সান্নিধ্য সর্বত্র সক্রিয় সজীব। আমার আস্পৃহার বাণী, আমার আকৃতির আগুন চেয়েছে তোমার সার্বভৌম সান্নিধ্য - তাদের দিকে তুমি ফিরেছ। অজ্ঞানের বশে আমি যত না খুঁজেছি, তারও বেশি তুমি আমায় ধরে দিয়েছ। তুমি আমার অন্তরঙ্গ, আমার সঙ্গে এক, যখন আমি সত্য ও ঋতের মধ্যে রয়েছি; যে মুহূর্তে চলে গিয়েছি মিথ্যা ও অনৃতের মধ্যে তখন তুমি গিয়েছ দূরে সরে।

আমার চারিদিকে যখন আর আঁধার-করা ছায়া নেই, যখন তুমি দেখছো আমার প্রত্যেক

অঙ্গ থেকে সকল কৃত্রিমতা সকল সাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, দেখছো আমার দেহের প্রতিটি কোষ তোমার চিরন্তন বাস্তু তোমার চিরন্তন মন্দির, দেখছো তোমার সঙ্গে আমি একাত্ম একীভূত হয়েও তোমার আরাধনা করি, যখন তুমি তোমার জ্ঞানের জমাট সুবর্ণ গলিয়ে ভক্তির জীবন্ত চলন্ত স্রোতস্বতী বহিয়েছ, আমার জড়মাটিকে চূর্ণ করে তা থেকে নির্মুক্ত করেছ কর্মবল, তোমার হাতে আমার গর্ব যখন পরিণত হয় সামর্থ্যে, অজ্ঞান হয় আলো, সঙ্কীর্ণতা হয় বিশালতা, স্বার্থপরতা হয়ে ওঠে একটি বিশেষ কেন্দ্রে শক্তিসংগ্রহ, লোভ হয়ে ওঠে সত্যের জন্যে অশ্রান্ত অন্বেষণ, লক্ষ্য যার পরম সদ্‌বস্তু, আমার অহং যখন হবে তোমার সত্যকার যন্ত্রস্বরূপ এক কেন্দ্র, আমার মন হবে তোমার অবতরণের জন্য আশ্রয়, হৃদয় হবে অগ্নি ও অগ্নি শিখার পূত-কুন্ড, আমার জীবন হবে শুদ্ধ স্বচ্ছ পদার্থ তা দিয়ে যাতে তুমি যথেচ্ছ গড়তে পার, যখন আমার দেহ হবে সচেতন আধার, তোমার যতটুকু আমার জন্যে নির্দিষ্ট তা ধারণ করবার জন্যে—তখনই নিখিল জ্যোতির অধিকারিণী হে জননী, আমার জীবনের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সিদ্ধ হবে সত্যভাবে যথার্থভাবে বৃহদ্‌ভাবে। আস্পৃহা জাগছে আমার মধ্যে। যা-কিছুর জন্যে আমি প্রজ্বলিত, সে সব সংসিদ্ধ কর আমার মধ্যে। **শ্রীঅরবিন্দ**

জিরাট॥ ১২৭৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে এই গ্রাম হইতে **"হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষনী"** নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা জিরাট হিন্দুহিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল।

ভাঙ্গামোড়া॥ ১২৮১ সালের ৩১ আশ্বিন ভাঙ্গামোড়া হইতে প্রতি সংক্রান্তির দিন **"হিতবোধ"** নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ভাঙ্গামোড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও 'হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়' গ্রন্থের রচয়িতা অম্বিকাচরণ গুপ্ত এই মাসিকপত্র সম্পাদনা করিতেন। ইহা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই।

আরামবাগ॥ ১২৯৪ সালের ফাল্গুন মাস হইতে **"ভারতবন্ধু ও জাহানাবাদ পত্র"** নামে একখানি মাসিক পত্র আশুতোষ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

॥ আরামবাগের কথা ॥

১৩৫৬ সালের ১২ই মাঘ হইতে আরামবাগ মহকুমার মুখ্যপত্র হিসাবে **"আরামবাগের কথা"** নামক একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম হইতে সপ্তদশ সংখ্যা পর্যন্ত শ্রীভূতনাথ ভৌমিক, পরে শ্রীধীমানচন্দ্র ঘোষ ইহা সম্পাদনা করেন। পরিচালকগণ "আরামবাগের কথা" প্রকাশের সময় লিখিয়াছিলেন "দারিদ্র্যের পীঠভূমি আরামবাগ, দারিদ্র্যের পত্র "আরামবাগের কথা"। ইহার তেমন সঙ্গতি নাই যে নিজের বলে নিজে চলিতে পারে। ইহার পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে হইলে আরামবাগবাসী সকলের বিশেষ করিয়া আরামবাগ হিতৈষীদের সহযোগিতা ও আনুকূল্য অপরিহার্য।" এক বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদকীয় কার্যালয় দেউলপাড়া আলাটী পোষ্ট অফিস, হুগলী এই স্থানে অবস্থিত ছিল। কলিকাতা হইতে ইহা মুদ্রিত হইত। ১ম সংখ্যার প্রতিলিপি ৫৩৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

তারকেশ্বর॥ পশ্চিমবঙ্গে শৈবতীর্থ হিসাবে তারকেশ্বরের নাম সুপরিচিত হইলেও

এই স্থানে কোন সাময়িকপত্র প্রাচীনকালে ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। তারকেশ্বর মঠ হইতে ১লা ফাল্গুন ১৩৬৩ সালে "পুণ্যভূমি" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য তিন টাকা বার আনা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা। 'পুণ্যভূমি'র সম্পাদক শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর ও সহকারী সম্পাদক শ্রীরামরতন ভট্টাচার্য ও শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য। তারকেশ্বরের মোহান্ত শ্রীমদ্দণ্ডিস্বামী হৃষিকেশ আশ্রম এই পত্রের আচার্য। বাবা তারকনাথের বহু মাহাত্মের কথা ইহাতে প্রকাশিত হয়।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস (আশ্বিন ১৩৬৭) হইতে তারকেশ্বর হইতে "পঞ্চায়েত" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক শ্রীঅজিত-কুমার বসু। শ্রীশ্যামাশঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক উদয় প্রেস হইতে ইহা মুদ্রিত এবং কানানদী হইতে প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্র খুব অল্পদিনের মধ্যে বলিষ্ঠ লেখনীর জন্য জনপ্রিয় হইয়াছে। ইহার বার্ষিক মূল্য দুইটাকা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য সাত নয়া পয়সা।

॥ সন্ধ্যা ॥

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত খন্যান নিবাসী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব "সন্ধ্যা" নামক দৈনিক সংবাদপত্রের সাহায্যে সমগ্র বঙ্গদেশে জনসাধারণের মধ্যে স্বাদেশিকতা প্রচারে যে ভাবে সাহায্য করেন, তাহা স্বাধীনতার ইতিহাসে অতুলনীয়। "বঙ্গবাসী" তাঁহার পরলোক-গমনের পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ্যঃ

যখন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন-তরঙ্গে বাঙ্গলা ডুবু ডুবু—যখন সেই উর্মিমালার উপর স্বদেশীয় কনককান্তি সপ্তপর্ণে ফুটিয়া উঠিল—তখনই উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নূতন ঢঙে, নূতন ছাচে, নূতন ভাষায়, নূতন পদ্ধতিতে 'সন্ধ্যা' দৈনিকপত্র প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যার ভেরীনিনাদে বাঙ্গালী চমকিয়া উঠিল।

স্বদেশী আন্দোলনের নির্ভীক নেতা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত "সন্ধ্যা" দৈনিক সংবাদপত্র সম্বন্ধে ভারতবরেণ্য দুইজন মনীষীর উক্তি লিখিত হইল। তাঁহার নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল বলেন— "The first successful venture of popular journalism in vernacular of our province." এবং 'বন্দেমাতরমে'র সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়ঃ "The trumpet-call to liberty sounded in the fulness of faith."

ব্রহ্মবান্ধবের জীবনী স্থানান্তরে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

বৈঁচিগ্রাম॥ ১৩৬৮ সাল হইতে বৈঁচিগ্রাম চিত্তরঞ্জন ক্লাব হইতে **"দেশবন্ধু"** নামে একখানি ত্রৈমাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পল্লীগ্রাম হইতে এইরূপ পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ক্লাবের কর্তৃপক্ষ গ্রামের একটি মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও সহযোগী সম্পাদক শ্রীরাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩৭ নয়া পয়সা।

মগরা॥ ১৩৫৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে **"দেবযান"** নামক একখানি মাসিক ধর্মপত্রিকা মগরা হইতে প্রকাশিত হয়। হুগলীর অন্যতম প্রধান সাধক ঠাকুর শ্রীসীতারামদাস
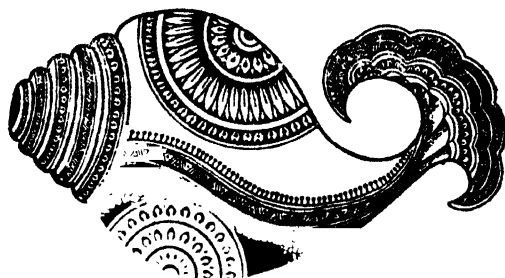
১ম বর্ষ, মাঘ—১৩৬৭ ৮ম সংখ্যা

সম্পাদক—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র
সহ-সম্পাদক—শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ

'পার্থসারথি' পত্রিকার প্রতিলিপি
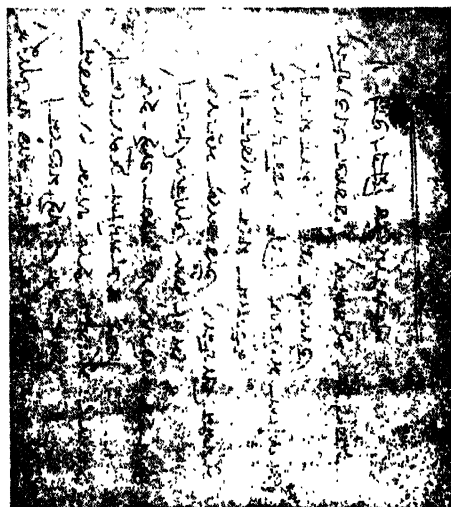
কবি রাধামাধবের হস্তাক্ষর

ওঙ্কারনাথ বাঙ্গলাদেশে তারকব্রহ্ম নাম পুনঃপ্রবর্তনের জন্য এই সুন্দর সুখপাঠ্য ধর্ম-মূলক মাসিকপত্র প্রবর্তন করেন। এইরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের আর কোন জেলা হইতে প্রকাশিত হয় না। ইহার সম্পাদক শ্রীশ্যামশঙ্কর বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ। দেবযানের সম্পাদকীয় কার্যালয় শ্রীরামাশ্রম ডুমুরদহ। ইহার বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা এবং প্রতি সংখ্যা ৷৷৹ আনা। দেবযানের 'কর্মকিঙ্কর' ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ।

সিঙ্গুর ৷৷ **"গ্রামের কথা"** নামক একখানি সাপ্তাহিকপত্র শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সিঙ্গুর হইতে ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় হুগলী জেলার বহু কৃতি ব্যক্তির জীবনী প্রকাশিত হইত। অল্পদিনের মধ্যে এই পত্রিকা জেলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কিন্তু গ্রামের কাগজ বলিয়া উপযুক্ত বিজ্ঞাপন না পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ ইহা তিন বৎসর চালাইবার পর বন্ধ করিয়া দেন। ইহার বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা।

ভদ্রেশ্বর ৷৷ ১৩৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে **"লোকবাণী"** নামক পাক্ষিকপত্র ভদ্রেশ্বর সরোজিনী প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২৪/১, আর, কে, ব্যানার্জি স্ট্রীট, তেলিনীপাড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা এবং প্রতি সংখ্যা এক আনা ছিল। সম্পাদক শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। এই পত্রিকা সু-সম্পাদিত হইলেও স্থানীয় লোকের সহযোগিতার অভাবে ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

পাণ্ডুয়া ৷৷ ১৩৬৬ সাল হইতে **"সাধনা"** নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। সুলিখিত গল্প ও প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য এই পত্রিকাখানি অল্প-দিনের মধ্যে খুব সুনাম অর্জন করিয়াছে। ইহার সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ রায় ও সহকারী সম্পাদক শ্রীগণপতি দাসদত্ত। সাধনার বার্ষিক মূল্য ৪৷৷৹ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৷৵৹ আনা।

জেজুর ৷৷ ১৩৬৭ সালের আষাঢ় মাস হইতে 'পার্থসারথি' নামে একখানি মাসিকপত্র কলিকাতা ৫-এ, অক্ষয় বোস লেনস্থিত 'মুদ্রাকর' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদকীয় কার্যালয় "বিশ্বম্ভরধাম" জেজুর। 'পার্থসারথি'র সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র ও সহযোগী সম্পাদক শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। ইহাতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিত **'শ্রীচৈতন্যভাগবতের'** সরল ব্যাখ্যা শ্রীসুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক লিখিত হওয়ায় এই পত্রিকা ধর্মজগতে খুব সুনাম অর্জন করিয়াছে। ইহার বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও প্রতি সংখ্যা চার আনা। ইহার কভারের প্রতিলিপি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীসুকুমার দত্তের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রের **হুগলী জেলা বার্ষিকী** একখানি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ পুস্তক। নবজীবন কলিকাতা ১০ নং ক্লাইভ রো হইতে প্রকাশিত হয়।

হুগলী জেলার অন্যান্য স্থান হইতে আরো যে সব সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে আছে নবপ্রবাহ, পল্লীডাক (শ্রীরামপুর), সমাচার (শ্রীরামপুর), দক্ষিণ দামোদর (আরামবাগ), লোকমত (চাপাডাঙ্গা), পরিবেশক (উত্তরপাড়া), জেলার কথা (বাঁশবেড়িয়া), কানানদী (ধনিয়াখালি), দিশারী (ভদ্রেশ্বর) প্রভৃতি। এই স্থানে হুগলী জেলা হইতে প্রকাশিত

যে সকল সাময়িকপত্রের বিবরণ দিয়াছি; তাহা ছাড়া আরও বহু পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নয়। যদি এই তালিকায় প্রকাশিত হয় নাই এইরূপ পত্রিকার সন্ধান ভবিষ্যতে কেহ দয়া করিয়া আমায় দেন, তাহা হইলে পরবর্তী সংস্করণে উহা সন্নিবন্ধ করিয়া দিব।

এই অধ্যায়ে কোন কোন সাময়িকপত্রের বিস্তৃত পরিচয় এবং যে সকল পত্রিকা দেখিবার আমার সুযোগ হয় নাই, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিয়াছি। যদি কাহারও নিকট এই স্থানে উল্লিখিত কোন পত্রিকা থাকে, তাহা দয়া করিয়া আমায় দেখাইলে, আমি সেগুলিরও যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংস্করণে দিবার চেষ্টা করিব। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে যে সকল সাময়িক পত্র-পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সন্ধান করাই বর্তমানে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যতদূর সম্ভব অচিরে এই তালিকাটি সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে ইহা যে, অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে তাহা সুনিশ্চিত; তজ্জন্য সকলের এই বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গদেশের সর্বত্র সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ দেখিয়া "পূর্ণিমা" মাসিকপত্র ১২৬৫ সালের ফাল্গুন মাসে "বঙ্গদেশে বিদ্যোন্নতি" শীর্ষক যে নিবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার অংশ-বিশেষ এই স্থানে উল্লিখিত হইল। ইহা হইতে তৎকালীন বঙ্গদেশের একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহা উল্লেখ করিয়া আলোচ্য অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিলাম।

বঙ্গদেশে বিদ্যোন্নতি

...কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় লোকোপকারী পুস্তকের নাম গন্ধও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে যদিও সর্বপ্রকার বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে সঙ্কলিত না হউক, তথাপি একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে, যে তাহাদের তাবতেরই কিছু কিছু অংশ সঙ্গৃগিত (?) হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে মহানগরী কলিকাতার ভিতরেও বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল না বলিলেই হয় এক্ষণে অনেকানেক গ্রামেও বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বে এখানে একটিও সাধারণ পুস্তকালয় দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু এক্ষণে কত কত গ্রামেও সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার এতাদৃশ উন্নত অবস্থা দেখিয়া কোন্ দেশ হিতৈষীর মনে আনন্দ রসের সঞ্চার না হইবে? সভ্যাভিমানী দাম্ভিকপ্রধান ইংরাজেরা কত দিন আর নির্দোষী বঙ্গবাসীদিগকে পশুবৎ বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারিবে?

বিবিধ প্রকার সাময়িক পত্রিকা প্রচার হওয়া সাধারণরূপে বিদ্যা প্রচারের এক মুখ্য উপায়; কিন্তু তাহারই বা আমাদের অভাব কি? "তত্ত্ববোধিনী" জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। "প্রভাকর" সুমধুর পদ্য রস প্রচার করিয়া দিন দিন বাঙ্গালা কবিতার উন্নতি সাধন ও উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন। * (ছিন্ন) * "বিজ্ঞান মিহীরোদয়" গরীয়সী সংস্কৃত ভাষা হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান ও উত্তমোত্তম ভাব সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মহোচ্চ মহিমার যশোগান করিতেছেন; এবং হিন্দু ধর্মের গূঢ় মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া পূর্বতন তত্ত্ববিৎদিগের অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। "সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র" মহাপুরাণ.

উপপুরাণ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ দেশীয় লোকদিগের অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন এবং **"এডুকেশন গেজেট"** ও **"অরুণোদয়"** প্রভৃতি আরো কত ২ পত্র অবিরত স্বদেশীয় ভাষায় উন্নতি সাধনে সচেষ্টিত রহিয়াছেন। আবার সম্প্রতি অত্যুৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র **"সোমপ্রকাশ"** ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন-প্রণালী ও দুরাবস্থার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ পদ ক্ষেপন করিয়া আসিতেছেন। আহা! কি আনন্দের বিষয়; ভরসা করি আমাদিগের **'পূর্ণিমাও'** এই উপযুক্ত সময়ে দেশের অন্তরাবস্থায় দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবে।

এই সকল কি মঙ্গলজনক চিহ্ন নহে। ইহার দ্বারা কি আমরা এক সময়ে বঙ্গভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির আশা করিতে পারি না? যখন অনেকেই মাতৃভাষা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই এককালে তাহার পূর্ণাবস্থা অবলোকন করিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ উদয় হইবে।... "পূর্ণিমা"

॥ বাঙ্গলা ভাষায় পোর্তুগীজ কথা ॥

পোর্তুগীজদের এই দেশে অবস্থিতিকালে তাহাদের ভাষা অনেকাংশে বাঙ্গলাভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বাঙ্গলাভাষার মধ্যে উহা স্থান পাইয়াছিল। জে, জে, এ, কম্পোজের "হিস্টি অফ দি পোর্তুগীজ ইন বেঙ্গল" নামক গ্রন্থে তাহার একটি বিস্তারিত তালিকা আছে। বাঙ্গলাভাষায় যে সকল পোর্তুগীজ কথা প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহা উল্লিখিত হইল।(১৬) প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে পোর্তুগীজদের অধিকারে গোয়া, দমন ও দিউ এই তিনটি স্থান ছিল। এই স্থানগুলি হইতে বৈদেশিক শক্তি নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য ভারত সরকার এক অভিযান চালাইয়া ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর গোয়া, দমন ও দিউ অধিকার করে এবং এই স্থানগুলি পরশাসনমুক্ত হয়। ইহার ফলে বিদেশী শাসনের শেষ চিহ্ন যাহা ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর ছিল তাহা অবলুপ্ত হয়।

পোর্তুগীজ কথা	বাঙ্গলা কথা	পোর্তুগীজ কথা	বাঙ্গলা কথা
Acabar	কাবার	Canhao	কামান
Ananas	আনারস	Alcatrao	আলকাতরা
Aia	আয়া	Alfinete	আলপিন
Armario	আলমারি	Anona	নোনা
Bacia	বাসন	Ata	আতা
Biscoito	বিস্কুট	Bafo	বাষ্প
Baixel	বজরা	Balde	বালতি
Botas	বোতাম	Botelh	বোতল
Cedeira	কেদারা	Catatua	কাকাতুয়া
Cafe	কাফি	Camisa	কামিজ

পোর্তুগীজ কথা	বাঙ্গলা কথা	পোর্তুগীজ কথা	বাঙ্গলা কথা
Cha	চা	Cristao	খৃষ্টান
Boia	বয়া	Fita	ফিতা
Chapa	ছাপ	Funil	ফুঁদিল
Cocha	কোচ	Gudao	গুদাম
Cauve	কপি	Ingles	ইংরাজ
Deus	দেব	Lanterna	লণ্ঠন
Festa	ফেস্তা	Limao	লেবু
Forma	ফর্ম্মা	Mesa	মেজ (টেবিল)
Grade	গরাদ	Achar	আচার
Igreja	গির্জ্জা	Fita	ফিত
Janela	জানালা	Pato	পাতিহাঁস
Leilao	নিলাম	Papaia	পেঁপে
Padre	পাদ্রি	Peru (Turkey)	পেরু
Pera	পেয়ারা	Prego	পেরেক
Pistola	পিস্তল	Resto (Fund)	রেস্তো
Quaresma	কর্জ্জ	Saia (Gown)	সায়া
Sabas	সাবান	Toco (To note down)	টোকা
Tobaco	তামাক	Varanda	বারান্দা
Toalha	তোয়ালে	Ispada	ইস্পাত
Verdi	বেরদি	Verga	বরগা
Viola	বেয়ালা	Compasso	কম্পাস
Chave	চাবি	Camara	কামরা
Compaso	কম্পাস	Sagu	সাগু

॥ অন্যান্য ভাষা হইতে আগত বিদেশী শব্দ ॥

পোর্তুগীজ ভাষা ছাড়া অন্য যে সকল **বিদেশী শব্দ** বিকৃত ও অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

পারসিক ॥ পুঁথি, মুচি, হিন্দু।

গ্রীক ॥ দাম, সুড়ঙ্গ।

তুর্কী ॥ বিবি, বেগম, বাহাদুর, চাকু, কাবু, কুলি, আলখাল্লা; দারোগা।

আরবী ॥ কেতাব, কোরান, কলম, বিদায়, মৌলভী, তাজ্জব, দফারফা; কেচ্ছা।

ফারসী ॥ কম, বেশী, নগদ, খরচ, আন্দাজ, শহর, খেয়াল; জমী; দলিল-দস্তাবেজ; মামলা-মোকদ্দমা, সরকার, বাদশাহ, হুজুর, খাজনা, শহীদ, আবাদ; দরকার; খবর; দোকান; চরখা, সাদা, আবহাওয়া, হালুয়া, শাল, আতর খাতা, হিসাব; ময়দা; সেতার; সেপাই; পিয়াদা, আসামী, উকীল, সাগরেদ।

ওলন্দাজ ॥ রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কাবন।

ইংরাজী ॥ অফিস, স্কুল, চেয়ার, টেবিল, পাশ, ফেল, গেলাস; হাসপাতাল; বোতল; বাক্স।

ফরাসী ॥ কুপন, কার্তুজ, বুর্জোয়া।

চীনা ॥ চিনি, লুচি।

জাপানী ॥ যুযুৎসু, রিক্সা।

বর্মী ॥ লুঙ্গি, লামা।

॥ সংকেত সূত্র ॥

১ Selections from Unpublished Records of the Government of India. Vol. I.
২ নববার্ষিকী, প্রথম বর্ষ, ১২৮৪
৩ A Grammar of the Benga Language.
৪ Bengal Past & Present, Vol IX, Part I.
৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস
৬ The Life and Times of Carev. Marshman and Ward. Vol I.
৭ নববার্ষিকী, প্রথম বর্ষ, ১২৮৪
৮ সমাচার দর্পণ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০
৯ The Life of Willam Carey by George Smith.
১০ A Dictionary in English & Bengalee (1834).
১১ Home Department, Miscellaneous no 559.
১২ সাহিত্যসাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
১৩ বিদ্যাসাগর চরিত—সাধনা, ভাদ্র, ১৩০২
১৪ আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০১
১৬ পুরাতনী—হরিহর শেঠ
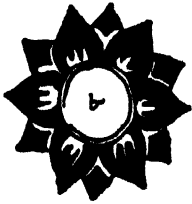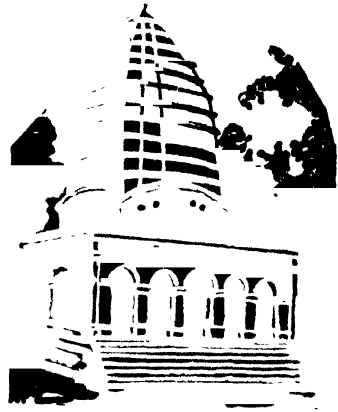
সুদূর প্রাচীনকাল হইতে হুগলী জেলাস্থ সপ্তগ্রাম ভারতের সর্ব প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনী লিখিয়া গিয়াছেন যে 'বাণিজ্যার্থে আগত বৈদেশিক জাহাজ সমূহ কেপ-পালিমারাস হইতে ফলতার অপরদিকে টেনিনগেল হইয়া ত্রিবেণীতে যাইত এবং তথা হইতে পরে পাটনায় যাইত।"

ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, তাঁহার চণ্ডীকাব্যে লিখিয়াছেনঃ

"এই সব সহরে যত সৈদাগর বৈসে।
কত ডিঙ্গা লয়্যা তারা বাণিজ্যায় আইসে॥
সপ্তগ্রামের বণিক কেথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥"

এই স্থানের কার্পাস সুক্ষ্ম বস্ত্র এবং নানা প্রকারের ছিট, ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে লইয়া গিয়া তাহারা বিক্রয় করিতেন এবং রোমের রাণীগণ পর্যন্ত বঙ্গের এই সমস্ত সুক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। বিদেশীয় বণিকগণ হুগলী হইতে সোরা, নীল, লাক্ষা, তৈল (Oil of Zerzeline প্রভৃতি বহু দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইত এবং বৈদেশিক দ্রব্যাদি এই স্থানে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। হুগলী জেলার বস্ত্রশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে বলিয়া এই স্থানে আর তাহা পুনরুল্লিখিত হইল না। সপ্তগ্রামের তৎকালীন বাণিজ্যের অবস্থা 'সপ্তগ্রাম' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় বণিকগণের মধ্যে পোর্তুগীজগণ সর্বপ্রথম বাণিজ্য করিতে এই দেশে আসেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীবৃন্দ কর্তৃক এই জেলার গঙ্গাতীরস্থ স্থানগুলিই অধ্যুষিত ছিল। তন্মধ্যে ইংরাজদের প্রাধান্য হুগলীতে, পোর্তুগীজদের ব্যাণ্ডেলে, গ্রীকদিগের রিষড়ায়, জার্মানদিগের ভদ্রেশ্বর, কোন্নগরে অস্ট্রিয়ানদের, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের এবং শ্রীরামপুরে দিনেমারদের অধিষ্ঠান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তিনজন পোর্তুগীজ ও বিস্‌প রেডিক ভারতসম্রাট আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রায় আসেন। সেই সময় তাঁহার মন্ত্রী আবুল ফজল উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সহিত সম্রাট আকবরের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই কথা-বার্তা হইতে বিস্‌প সাহেবের ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা জানা যায়।

আকবর : ধর্মপ্রচারের জন্যই কি আপনাদের ভারতে আগমন?

রেডিক : উহা প্রভুর আদেশ সত্য; কিন্তু আমাদের এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য বাণিজ্য।

আকবর : আপনাদের মুখে ভারতে আসিবার পথের আবিষ্কার কাহিনী শুনিয়া বুঝিয়াছি যে, আপনারা সত্যসত্যই খুব পরিশ্রমী ও সাহসী জাতি।

রেডিক : হ্যাঁ জাহাপনা, আপনি চিরদিনই নিরপেক্ষ বলিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনি 'গ্রেট মোগল' বলিয়া খ্যাত।

আকবর : এখন বলুন ভারত সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা?

রেডিক : ইউরোপে ভারতের অনন্ত ঐশ্বর্যের খ্যাতি প্রবাদবাক্যের ন্যায় পরিগণিত। বহুকাল হইতে ভারতের কৃষি-শিল্পজাত দ্রব্য ইউরোপের বিস্ময় জন্মাইয়া আসিতেছে। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে ভারত সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য রকমের বিবরণ পাঠ করা যায়। সেখানকার লোকের ধারণা ভারত হইতেছে স্বর্ণভূমি; আর এখানকার দীনদরিদ্রের ঘরেও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ (Mr. Ralph Fitch) নামক একজন ইংরাজ বাগদাদ ও এপলো হইয়া প্রথম ব্যবসায়ের জন্য ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন; তিনি হুগলীতে আসিয়া এই অঞ্চলের ব্যবসায়াদি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। তিনি তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে আগ্রা হইতে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভ্রমণের বিবরণ দিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন যে **সপ্তগ্রাম একটি সুন্দর শহর** এবং এই স্থানে **সমস্ত জিনিষপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।** Satgaon a faire city very plentiful of all things.

১৫৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বাঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্যের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বলিয়া লণ্ডনবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়া দেন। He thrilled London in 1591 with the magnificient possibilities of Eastern Commerce.

র‍্যালফ ফিচের পূর্বে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ষ্টিফেন্স ভারতবর্ষে আগমন করিয়া-ছিলেন, তিনিই ইংরাজদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতে আগমন করেন; তাঁহার পূর্বে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে হিউ উইলোবি ভারতে আসবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন।

ভেনিসের প্রসিদ্ধ সওদাগর সিজার ফ্রেডরিক ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষ পরি-ভ্রমণ করেন। সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে সেই সময় যে সকল জিনিসপত্রাদি রপ্তানি হইত সেই সম্বন্ধে তিনি যে মনোজ্ঞ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য:

Port of Satgaon every year lade thirtie or five and thirtie ships, great and small, with rice, cloth of bombast of diverse sorts, lacca,

great abundance of sugar, mirabolam dried and preserved, long pepper, oyle zerzeline and other sorts of merchandise.

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের ব্যবসায়ের মূল কারণ বিলাতে মরিচের দর বৃদ্ধি। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মরিচের দর তিন শিলিং হইতে ছয় শিলিং আট পেন্স বৃদ্ধি হওয়ায় বিলাতের বণিকগণ এক সভা করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন। ব্যবসায়ীবৃন্দ ভারতবর্ষে ব্যবসা করিবার জন্য চাঁদা তুলিয়া ৩০ হাজার ১শত ৩৩ পাউণ্ড সংগ্রহ করেন এবং বিলাতের তৎকালীন সাম্রাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে পনের বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথমে ১২৫ জন অংশীদার ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ইংরাজ বণিকগণ প্রথম বালেশ্বরে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং তথায় 'ফ্যালকন' নামক জাহাজে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের অধিক মাল আসে। প্রধানতঃ ইংরাজগণ লৌহ, টিন, কাঁচ, বস্ত্র, পারদ, ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র এই দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে স্যার টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি রূপে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া, বিবিধ সৌখীন বিলাতী সামগ্রী উপহার দিয়া বাদশাহের প্রসাদ লাভে যে সমর্থ হন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। তাঁহার প্রদত্ত সনন্দবলে ইংরাজগণ বঙ্গদেশ ও বিহারে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণের অধিকার লাভ করেন। ইহার পর সম্রাট সাজাহানের শাসনকালে ইংরাজ ডাক্তার গোব্রিয়েল ব্রাউটন সম্রাটের অগ্নিদগ্ধা কন্যাকে সুচিকিৎসায় আরোগ্য করায় সাজাহান তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চান। ডাঃ ব্রাউটন পুরস্কারের পরিবর্তে, তাঁহার স্বজাতিবৃন্দকে বঙ্গদেশ ও বিহারে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিবার প্রার্থনা করেন এবং সম্রাট তাহা মঞ্জুর করেন। শাহাজাদা সুজা সেই সময় বঙ্গের সুবাদার সুজা ডাক্তারকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পিপলী, বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরাজ বণিকগণকে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ব্রুকহ্যাভেন মান্দ্রাজ হইতে হুগলীতে কুঠি নির্মাণের জন্য প্রেরিত হন। তিনি হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করিবার পর কোম্পানীর মান্দ্রাজস্থিত প্রধান অফিস হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী কুঠির কর্মচারিগণকে হুগলী হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র, লবণ, সিল্ক, কাটা কাপড়ের ছিট, প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ বঙ্গদেশে সেই সময় মাদ্রাজে অবস্থিত প্রধান অফিসের অধীনে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতেন বলিয়া মান্দ্রাজ হইতে তাহাদের যাবতীয় নির্দেশ পত্র বঙ্গদেশে আসিত। তাহাদের নির্দেশ-পত্রখানি এই স্থানে উল্লিখিত হইলঃ

On the 31st December 1657, the Madras Factory issued instructions to the Council in "the Bay" to procure at *HUGHLY* Cotton yarne, Salt Peeters, Bengala Silike, *SAMOES ADATY* (piece goods) Cynomon, Taffaties, *BOUGEES* (Cowries, Portuguese, *BUZIES*) Turmerick and Gumlack (১)

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ জন কেন্ (John Kenn) হুগলী হইতে কোন মাসে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার সুবিধা হয় তাহা লিখিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার প্রদত্ত রিপোর্ট উদ্ধৃত হইল, এই রিপোর্ট হইতে হুগলী জেলায় উৎপন্ন কোন কোন জিনিষের বিশেষ প্রাচুর্য ছিল তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

হুগলী হইতে নিম্নলিখিত মাসে, তৎপার্শ্বে লিখিত জিনিষগুলি ক্রয় করিলে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন।

Hooghly the best time to buy goods, in this place is as followeth, viz

In March and April—Wheat, Gunneyes and Sugar.

In May and June—Butter, Ginghams, White cloths and several sorts of striped stuffs.

In July and August—Rice, Hemp, Flax.

In September, October and November—All things are very dear, being the time of shipping, and in which we receive in those goods for which money was given but in the months aforewritten.

In December and January—Long pepper, oyle, and rice of the second growth.

মার্চ ও এপ্রিল মাস—গম, চট এবং চিনি।

মে ও জুন মাস—মাখন, ডোরাকাটা বস্ত্র, সাদা কাপড় এবং নানাপ্রকারের ছিট, ছাতা।

জুলাই ও আগস্ট মাস—চাউল, লাগলাইন দড়ি, তিসিগাছের সূক্ষ্ম অংশের সুতায় প্রস্তুত কাপড়।

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যাবতীয় দ্রব্য খুব মহার্ঘ হয়; এবং উক্ত সময়ে আমাদের ক্রীত দ্রব্যাদি যাহা পূর্বোক্ত মাসগুলিতে, পূর্বাহ্ণে টাকা দিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা রপ্তানী করা হয়।

ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস—পিপুল, তৈল এবং দ্বিতীয়বার উৎপন্ন চাউল। (২)

বেনস্ সাহেবর বিবরণী হইতে হুগলী জেলা বস্ত্র শিল্পে যে কত সমৃদ্ধ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় এবং বস্ত্র যে কত প্রকারের এই অঞ্চলে প্রস্তুত হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। ডোরা-কাটা বস্ত্র (Ginghams) সাদা কাপড় (White cloth), বহুবিধ ছিটের কাপড় Several sorts of striped stuffs) ও তিসি গাছের সূক্ষ্ম অংশের সুতায় প্রস্তুত (Flax) একপ্রকার সুন্দর কাপড় হুগলী জেলা হইতে রপ্তানী হইত। তুলাজাত সুতা প্রস্তুতে এই স্থানের অধিবাসীগণ অসাধারণ নিপুণতা দেখাইতেন এবং তাঁহাদের প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি মানুষের দ্বারা তৈয়ারী তাহা মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না বলিয়া বেন্স সাহেব বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কলকব্জার নিপুণতম কারিগরও ঐ বস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারেন না। তাহার আরো মনে হয় যে, উহা যেন কোন কীট বা পরীর দ্বারা নির্মিত হইয়াছে।

পিটের ডেসপ্যাচ হইতে জানা যায় যে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ বাঙ্গলাদেশে

পশম ও সিল্কের জিনিস লইয়া আসিত এবং বঙ্গদেশ হইতে কোটী কোটী টাকার সূতার কাপড় লইয়া গিয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ২ কোটী ৪২ লক্ষ ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী হয়। ভারতীয় এই বস্ত্রশিল্প কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই সম্বন্ধে কোম্পানীর সুরাটের-কুঠির তত্ত্বাবধায়ক রিচার্ডসন সাহেব বলিয়াছেন যে, তাঁতিদের প্রতি অত্যন্ত নৃশংস অত্যাচারের ফলে তাহারা জাত ব্যবসা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

কোম্পানীর কর্মচারীগণ কাপড় পাইবার জন্য অগ্রিম তাঁতিদের দাদন দিয়া রাখিত এবং তাহারা কত জোড়া কাপড় দিবে, তাহাও মুচলেখায় সহি করিয়া রাখিত। সর্ত অনুসারে মাল দিতে না পারিলে, কিম্বা উৎপন্ন মাল অন্যকে বিক্রয় করিলে কোম্পানীর পাইকরা তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া চাবুক মারিত এবং অত্যন্ত হেয় উপায়ে তাহাদের ও অন্যান্য পরিবারবর্গের ধর্ম ও জাতি নষ্ট করিত। এই অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য সেইজন্য বঙ্গদেশের বহু তাঁতি আঙ্গুল পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিত, যাহাতে আর তাহাদের কাপড় বুনিতে ও দাদন লইতে না হয়।

হুগলী জেলায় তাঁতিগণ কিভাবে বস্ত্র বয়ন করিতেন এবং কোম্পানী কি ভাবে তাহা আদায় করিয়া অন্যত্র রপ্তানী করিতেন তাহা An Account of the Trade of Hugly গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইলঃ

About Hugly there live many weavers who weave cotton cloth and cotton and Tesser or Herba of several sorts, and from the parts thereabout :there is brought silk, sugar, opium, rice, wheat, oyle, butter, course hempe, gunnyes, and many other commodities. The way of procuring these is to agree upon musters with the merchants of *HUGLY*, or to send Bannians who can give security, to buy them, on our accounts in the places where they are made or procurable at cheapest hands, and whether we use one way or other we give passes in the *ENGLISH* name for the bringing those goods free of custome, and all those places have so great a convenience that most of the goods are brought by water, unless from the places near unto *HUGLY* which lye the wart the country.

The goods we sell in Hugly by merchants there are upon time, or ready money, but which way soever it is that we sell them we give passes and send them out in our names to avoid the merchants paying custome, which otherwise they would not doe and we are forced to abate in the price proportionate. (৩)

হুগলী জেলার দক্ষ শিল্পীকুল কালক্রমে অন্তর্হিত হইলেও, আজও সিমুলিয়া, ফরাসডাঙ্গার ধুতি কাপড় বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এই জেলার হরিপাল, কৈকালা, চন্দননগর, খানাকুল, রাজবলহাট, দারহাট্টা, বেগমপুর, আঁটপুর, খরসরাই, জয়নগর, গৌরহাটী,

বালি দেওয়ানগঞ্জ, বদনগঞ্জ, বাবনান, রসিদপুরে এবং তারকেশ্বরে বস্ত্র ও গামছা উৎপন্ন হয়। এই তাঁতশিল্পের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, দেশের মঙ্গল হইবে। হান্টার সাহেব "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে" হুগলী জেলার উন্নত ধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্রের এক সুন্দর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সুজার পতনের পর মীরজুমলা বঙ্গের সুবেদার নিযুক্ত হন; তাহার শাসনকালে হুগলীর ফৌজদার ইংরাজ-বণিকগণের বাণিজ্যের উপর বার্ষিক তিন হাজার মুদ্রা শুল্ক ধার্য করেন। কিন্তু ভূতপূর্ব সম্রাট সাজাহানের সনদ অধিকারে ইংরাজ বণিকগণ শুল্ক প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে মীরজুমলা ইংরাজদের সোরা বোঝাই কয়েকখানি নৌকা আটক করেন। ইহাতে ইংরাজগণ উত্তেজিত হইয়া মীরজুমলার একখানি নৌকা অবরোধ করে, ফলে তিনি বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ বণিকগণের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধ-পরিকর হন; কিন্তু চতুর বণিকগণ প্রমাদ গুনিয়া পোত প্রত্যর্পণ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করায় মীরজুমলা তাহাদিগকে মার্জ্জনা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন।

অতঃপর হুগলীর ফৌজদার ইংরাজ বণিকদের উপর যে শুল্ক নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা বহাল রাখিলেন এবং ভবিষ্যতে ইংরাজদের কোন নৌকা প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ দেন। মীজুমলার পর সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের সুবেদার হন; তাঁহার শাসনকালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনরায় গঙ্গায় পোত চালাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সায়েস্তা খাঁ ইংরাজ বণিকগণকে বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলেও তিনি শুল্ক হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেন নাই। তাহার শাসনকালে ফরাসী ও দিনেমারগণ বঙ্গদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সায়েস্তা খাঁর পর আজিম খাঁ বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হন। দিনেমারগণ সেই সময় উপদ্রব আরম্ভ করায়, সম্রাট তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেন। দিনেমারদের উচ্ছেদ সূত্রে আজিম খাঁ ইংরাজদের গঙ্গাবক্ষে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। এক বৎসর পর আজিম খাঁ আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় দেওয়ান সুফি খাঁ বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজদের পরম শত্রু ছিলেন এবং শাসনভার গ্রহণ করিয়াই আদেশ দিলেন যে, সুরাটে ইংরাজদের নিকট হইতে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে যেরূপ শুল্ক আদায় করা হইয়াছিল; বঙ্গদেশেও তাহাদিগকে অতঃপর উক্ত হারে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।

বাঙ্গলার শাসনকর্তা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য সংস্রবে এই সকল অসুবিধার নিবারণ কল্পে ইংরাজ বণিকগণ এইবার সরাসরি সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই সময় ওয়ালটার ক্লাডেল নামক জনৈক ইংরাজ আলমগীরের দরবারে, সম্রাট সাজাহানের সনন্দ পেশ করিয়া শুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আবেদন উপস্থিত করেন। সম্রাট তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া (জুন, ১৬৬২ খৃষ্টাব্দ) নিম্নোক্ত আদেশ দেনঃ

"প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ শাজাহান ও শাহাজাদা সুলতান সা-সুজা প্রদত্ত আদেশ পত্র অনুসারে ইংরাজ কোম্পানীর আমদানীক্রীত বিক্রীত কোনও পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত

হইত না। সুতরাং এতদ্বারা আমিও উক্ত হুকুমনামা দুইটি বলবৎ রাখিয়া আমার আদেশ প্রচার করিতেছি, যে আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহারা যে সকল পণ্য আমদানী করিবেন অথবা আমার সাম্রাজ্য হইতে সোরা বা অন্য যে সকল সামগ্রী সমুদ্রপথে রপ্তানী করিবেন, সে সকল দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইবে না।

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা বা উদ্বেগ সৃষ্টি না করিয়া অবাধে ইঁহাদের জন্য সামগ্রী ছাড়িয়া দিবেন। যদ্যপি আমার রাজ্যের কোনও প্রজা প্রকৃতপক্ষে এই ইংরাজ কোম্পানীর নিকট ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ঋণ যাহাতে আদায় হইতে পারে, সে বিষয়ে শাসনকর্তারা অবহিত হইবেন। সম্প্রতি দিনেমারগণ আমার রাজ্যে গর্হিত আচরণ করায় আমি তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি এবং আমার উক্ত আদেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই সূত্রে প্রাদেশিক কর্মচারীগণ ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের সমূহ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, দিনেমারদের ব্যবসায়ের সহিত ইংরাজের ব্যবসায়ও আমি বন্ধ করিবারা আদেশ দিই নাই এবং তাহার প্রয়োজনও হয় নাই। কেন না ইংরাজরা আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনও গর্হিত আচরণ করে নাই। অতএব এখন হইতে তাহাদের বাণিজ্য বিষয়ে কেহ যেন কোনওরূপ অসুবিধা বা ব্যাঘাত উপস্থিত না করে। অতঃপর আমার কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে এই ইংরাজ বণিকগণ কোনরূপ অভিযোগ উপস্থিত না করিলেই আমি সুখী হইব। আমার এই আদেশ যেন বর্ণে, বর্ণে, পালিত হয়।"

বাদশাহের সনন্দ লইয়া কোম্পানীর এজেন্ট ওয়ালটার ক্লাডেল যে দিন হুগলী বন্দরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সেই দিন ইংরাজ বণিকগণ তোপধ্বনি সহকারে বাদশাহের পূর্বোক্ত ফারমান গ্রহণ করেন। এই সময় ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাব সায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয়বার বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আনুকূল্যে কেবল হুগলী জেলায় নয়, সমগ্র বঙ্গদেশে ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর ইংরাজদিগের সহিত নবাব সৈন্যের প্রথম যুদ্ধ হুগলীর রাজপথে সংঘটিত হয়; তাহার বিবরণ 'হুগলী' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হয় এবং হুগলীর পণ্যরাশিপূর্ণ কুঠি ভস্মীভূত হওয়ায়, তাহাদের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

নবাব শায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগের যাবতীয় কুঠি অধিকার করিবার আদেশ দেন এবং নবাবের কর্মচারীগণ কুঠিসমূহ কাড়িয়া লয় এবং কুঠির কর্মচারীদিগকে বন্দী করে। ইহাতে বণিকদিগের চৈতন্য হয় এবং তাহারা বঙ্গের নবাব ও ভারতের সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও জরিমানা দণ্ড দিবার প্রস্তাবসহ দরখাস্ত পেশ করেন। ইংরাজ বণিকগণের সৌভাগ্য ক্রমে তাহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়; এই সম্বন্ধে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আলমগীর যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল। কেবল হুগলী জেলায় ইংরাজ বণিকগণের ব্যবসার জন্য নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের ব্যবসায়ের জন্য ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"ইংরাজগণ অতি বিনীতভাবে অবনত মস্তকে বাদশাহ সমীপে দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছে, যে তাহাদের সকল অপরাধ মার্জনা পূর্বক ফারমান বা আদেশ প্রদানে তাহাদিগকে এই মার্জনার কথা সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন করা হয়। এই জন্য তাহারা জগন্মান্য বাদশাহের দরবারে তাঁহাদের উকিলকে প্রেরণ করিয়াছেন। বাদশাহের অনুগ্রহলাভ করাই উকিলের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু সুরাটের শাসনকর্তা এত্তিমাদ খাঁ দরখাস্তে জানাইলেন যে. ইংরাজগণ বাদশাহের সমীপে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে প্রস্তুত আছেন। উপরন্তু তাহারা অন্যান্য বণিকগণের নিকট হইতে হাঙ্গামার সময় যে সকল পণ্যদ্রব্য বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহা বণিকগণকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ভবিষ্যতে আর কখনও তাহারা এরূপ গর্হিত কার্যে লিপ্ত হইবেন না এবং বন্দর সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা ঠিক ভাবে মানিয়া চলিবেন। বাদশাহ ও তাঁহার স্বাভাবিক উদারতাবশে ইংরাজদের সকল অপরাধ মার্জনা করিলেন। ইংরাজগণ পুনরায় বন্দরের উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন নিয়মাধীনে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। এই গর্হিত কার্যের ইংরাজ নায়কগণ দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে।"

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তিন জায়গায় উপনিবেশ (Settlement) ছিল; যথা হুগলী, বালেশ্বর এবং ক্বাশিমবাজার। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ষ্ট্রেসাম মাষ্টার Mr. Streyhsham মাদ্রাজের গভর্ণর হইয়া সুরাট হইতে তথায় যান। উক্ত বৎসরের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি হুগলীতে আসেন। কারণ কর্তৃপক্ষ বিলাত হইতে বঙ্গদেশের কোন স্থান প্রধান কেন্দ্র হইবে তদ্বিষয়ে তাহার মতামত চান। তিনি কাউন্সিলের অন্যান্য সভাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হুগলীতেই প্রধান স্থান নির্বাচন করিয়া বিলাতের কোর্ট-অফ-ডিরেক্টারদের ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে যে অভিমত প্রেরণ করেন, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ এই স্থানে উদ্ধৃত হইলঃ

The Council having taken into consideration and debate which of the places, *HUGLY* or *BALLASORE*, might be most proper and convenient for the residence of the Chiefe and Councell in the Bay. Did resolve and conclude that Hughly was the most fitting place, notwithstanding the Europe ships doe unloade and take in their ladeing in *BALLASORE* roade. *HUGLY* being the key or scale of Bengala, where all goods pass in and out to and from all parts, and being near the center of the Company's business is more *commodious for receiving of advices from and issueing of orders to all subordinate factoryes.*

Wherefore it is thought convenient that the Chiefe and Councell of the Bay doe reside at *HUGLY*, and upon the despatch of the Europe ships, the chief and councell, or some of them (as shall be thought convenient) doe yearly goe downe to *BALLASORE* soe

well to expedite the dispatch of the ships as to make inspection into the affairs of *BALLASORE* factory. And the Councell did likewise conclude that it was requisite a like inspection should be yearly made into the factory at *CASSIMBAZAR* the Hon'ble Company's Principall concerns of sales and investments in the Bay lyeing in these two places, by reason of conveniency of travelling in these countreys by land or water. (8)

মর্মার্থ—কাউন্সিলের সভায় অধিবেশনে বঙ্গদেশের মধ্যে কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ বা সভাপতি মহোদয়ের বসবাসের জন্য হুগলী কিম্বা বালেশ্বরের মধ্যে কোন স্থানটি সর্ব-বিষয়ে সুবিধাজনক তাহা লইয়া আলোচনা হয়। কারণ ইউরোপ হইতে আগত যাবতীয় মালপত্র এই স্থানেই খালাস করা হয় এবং হুগলী হইতে বালেশ্বর উহা স্থলপথে লইয়া যাওয়া হয়।

হুগলীকে বঙ্গদেশের চাবিকাটি বলা হয়, কারণ বঙ্গদেশের যাবতীয় দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানী এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে; এবং হুগলী কোম্পানীর বাণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায়, এই স্থানে কোম্পানীর প্রধান কেন্দ্র ও বসবাসের ব্যবস্থা করিলে বাণিজ্য-বিষয়ক আদেশপত্র এই স্থান হইতে দেওয়ার বিশেষ সুবিধা হইবে।

সভায় আরো স্থির হয়, যে কাউন্সিলের সভাপতি বা সভ্যবৃন্দ হুগলীতে বসবাস করিলেও, ইউরোপ হইতে বাণিজ্যতরী আসিবার সংবাদ পাইলে, তাঁহারা বৎসরে অন্ততঃ একবার বালেশ্বরে যাইয়া তথাকার কুঠিতে কি কি মাল আবশ্যক তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। এইরূপ অনুসন্ধান কাশিমবাজার কুঠিতেও করিতে হইবে; বালেশ্বরে ও কাশিমবাজার স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণের এই দেশে বিশেষ ব্যয় হয় না। সুতরাং উক্ত কুঠিতে বিক্রয়ার্থ যে সকল প্রধান প্রধান দ্রব্য রাখা হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমণ বাবদ খরচায় লোকসান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

হুগলী জেলায় প্রাচীনকালে অহিফেন, রেশম, নীল, দড়ি ও চিনির কারবার প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমানে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ হুগলী জেলা হইতে কোন কোন জিনিস লইয়া যাইতেন, তাহা নিম্নোক্ত কথাগুলি হইতে জানা যায়ঃ

The Dutch carry home rice, oyle, butter, hempe. cordage, saile cloth, raw silk, silk, wrought, saltpetre, opium, Turminck, Neelas, Ginghams, Tapits, Browles or slave cloutes, achee Beagues, Sugar, long pepper and Bees wax, as much as they can gett. (৫)

পূর্বে বলাগড়ে নৌ-শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল; এই স্থানের কত শত তরণী যে যুদ্ধজয় ও জলদস্যু বিতাড়ন করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।কোন্নগরে জাহাজ প্রস্তুতের একটি কারখানা ছিল বলিয়া ক্রফোর্ড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। ওম্যালী সাহেবও শ্রীপুরের নৌ-শিল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ boat-building is also carried on here.

বাংলার গ্রামীন শিল্পসমূহ আজ সবগুলিই প্রায় ধ্বংসের মুখে। যন্ত্রের প্রতিযোগিতায়

প্রতি মুহূর্তেই ইহারা অবক্ষয়ের ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। ইহাদেরই একটি—বলাগড় থানার অধীন শ্রীপুরের নৌ-শিল্প। এই শিল্পের ইতিহাস অনেক কালের। বোধহয় ভাগীরথীর মর্তে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই। অন্ততঃ কয়েকশো শতাব্দী তো বটেই। শ্রীপুরের শান্ত ছায়াঘন পরিবেশে বেণুকুঞ্জের তলে তলে এই শিল্পের স্বাক্ষর আজও আছে। কিন্তু সেদিন আর নাই। কে বলিবে এখানকার ময়ূরপঙ্খী, ছিপ গয়নার নৌকা ভাগীরথীর বুক বাহিয়া একদিন সাগরপারের স্বপ্ন দেখিত? সত্যই আজ তাহা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। শ্রীপুর আজ ম্লান, হৃতসর্বস্ব। সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও আজ যাইতে বসিয়াছে। কারিগররা বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া এখানে ওখানে অন্য কর্মে উদ্যোগী। যা দু-একজন আছে, যাইবার অন্য কোথাও জায়গা নাই বলিয়াই আছে। নৌকা গড়িয়া আজ আর তাহাদের পেট ভরে না। কিনিবে কে? ভাগীরথী বন্ধ্যা, দুগ্ধহীনা, দু-দিন বাদে ইহার উপর দিয়া গো গাড়ী করিয়াই যাওয়া যাইবে। জলের নৌকা কে কিনিবে? তাহা ছাড়া পশ্চিম বাংলায় নদীই বা এত কোথা, যেখানে এই নৌকার চাহিদা আছে? তাই শ্রীপুরের নৌশিল্প আজ মরিতে বসিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় সরকার বিভিন্ন শিল্পদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কথা বোধহয় ভাবেন নাই। সেইজন্য এই সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় যে, শ্রীপুরের নৌকা যদি পাকিস্থানে রপ্তানী করিবার কোন সুযোগ হয় এবং এখানকার এই শিল্পকে আধুনিকভাবে সংগঠন করিবার জন্য সরকার হইতে সর্বরকম সাহায্য দানের যদি চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে এই শিল্প হয়ত আবার বাঁচিবে। তাহা ছাড়া সরকারী প্রয়োজনেও এখান হইতে নৌকা ক্রয় করিলে ইহাদের মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে।

হুগলী জেলায় বহু প্রাচীন কাল হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সপ্তগ্রাম, মহানাদ, পাণ্ডুয়া, কোলশা, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের তুলট কাগজ বঙ্গদেশের কাগজের অভাব মিটাইত। বর্তমানে বালির কাগজ বলিয়া যে কাগজ প্রসিদ্ধ তাহা এই জেলার বালি গ্রামে প্রস্তুত হইত বলিয়া বালির কাগজ বলিয়া খ্যাত। কাগজ শিল্প বর্তমানে এই জেলা হইতে এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে, দশঘরা, দেয়ারাদাণ্ড প্রভৃতি স্থানে কয়েকঘর মুসলমান আজও দেশী তুলট কাগজ প্রস্তুত করে।

হুগলীতে সর্বপ্রথম বরফ কল তৈয়ারী হয় এবং যে স্থানে উক্ত কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল উহা অদ্যাপি বরফতোলার মাঠ বলিয়া খ্যাত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সাহেবদের নাচের মজলিসে সর্বপ্রথম বরফ আসিয়াছিল; উহাতে কলিকাতা গেজেটে লিখিত হইয়াছিল, যে সম্ভবতঃ এই বরফ হুগলীর প্রসিদ্ধ বরফের কারখানা হইতে আসিয়াছিল; কারণ হুগলী ব্যতীত তখন নিম্নবঙ্গে আর কোথাও বরফের কল ছিল না।

The ice it is presumed, must have come from the well known ice-field at Hooghly the only one known to have existed in the lower provinces. (৬)

হুগলী জেলার মগরা, পাণ্ডুয়া ও হরিপালের বালি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন

ভাল ইট বালিখালের ধারে, বৈদ্যবাটী ও বাঁশবেড়িয়াতে খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোতরং গ্রামে পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের ইটখোলা ছিল। ভাল গৃহ নির্মাণের জন্য সুরকিও এই অঞ্চলের খ্যাত। মাটির খেলনা ও অন্যান্য জিনিস উত্তরপাড়ায় বহুকাল যাবত তৈয়ারী হইয়া থাকে। পাণ্ডুয়া ও তারকেশ্বরের কুঁজা, হাঁড়ি ও জালা, এই জেলার অন্যতম খ্যাতনামা জিনিস। মাকলায় ফাঁপা টালি নির্মাণের একটি কারখানা আছে; ইহা কিলবর্ণ কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হয়। বালিই হুগলী জেলার একমাত্র খনিজ দ্রব্য। এই সম্বন্ধে ক্রফোর্ড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ

> The only article of trade or export in the Hoogly district which may be called a mineral product is Magra sand. This is a very fine sand which occurs in extreme beds near Magra, having been deposited there in former times by the Damoder river, before it changed its course to its present bed ..both Bricks and Surkis are manufactured in large quantities over the district especially in the towns. (৭)

পাণ্ডুয়া, পোলবা, মগরা, হরিপাল প্রভৃতি অঞ্চলের বালির ব্যবসায়ের ফলে বহু ধানি জমি, বাস্তু জমি নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া এই অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। মগরা ও হরিপালের বালি গৃহ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহার হওয়ার জন্য ও ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে মগরা ও হরিপালের সর্বত্র ধানজমি বালির স্তূপে চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। উত্তরে জি. টি রোড ধরিয়া বৈঁচি পর্যন্ত, দক্ষিণে খন্যান অতিক্রম করিয়া ত্যালাণ্ডু পর্যন্ত এবং হরিপাল ষ্টেশন হইতে জেজুর পর্যন্ত এই বালির খাদ সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডুয়া, কালনা রোড হইতেও মাটি খনন করিয়া বালির ব্যাপক ব্যবসা জমিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ধানজমিগুলিই যে শুধু নষ্ট হইতেছে তাহা নহে, খাদগুলির সংলগ্ন এক মাইলের মধ্যে ধানজমিগুলিতে চাষেরও খুব ক্ষতি সাধিত হইতেছে। বালির জন্য এই অঞ্চলে বৃষ্টির জল জমিতে পারে না। বৃষ্টির জল নিকটস্থ বালির খাদে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক হইয়া যায়, ফলে জমি পাট করার দারুণ অসুবিধা হয়। তাহার ফল জমির ফলনও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং জলের অভাবে জমিতে ঘাস উৎপন্ন হইতেছে বেশি, তাহা নিড়ান, কোপানো প্রভৃতি কাজের জন্য কৃষকগণের ব্যয়ও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিরাট এলাকার বালি লরীযোগে বাহিরে চালান দেওয়ার জন্য বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোড ও জি টি রোডে লরী দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ঐ অঞ্চলের প্রধান রাস্তাগুলিও বালির স্তূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে আসিলে মনে হয় কোন মরুভূমিতে উপনীত হইয়াছি। সর্বাপেক্ষা বিপদ দেখা দিয়াছে পুকুর হইতে বালি তোলার ফলে অধিকাংশ রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ী ধ্বসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পুকুর হইতে বালি তোলার ফলে খাদের গভীরতা ৬০ হইতে ১০০ ফিট পর্যন্ত হইয়াছে।

পূর্বে পিতলের বাসন এই জেলার কাঁসারীগণ, খুব সুন্দরভাবে প্রস্তুত করিত। কুমারগঞ্জ, বৈঁচী, থামারপাড়া, খোলসারা, বংশবাটী, মেরারহাট, মাহেশ প্রভৃতি গ্রামগুলি পিতলের বাসনের জন্য খ্যাত ছিল এবং এই বাসন দেশ দেশান্তরে রপ্তানী হইত। বর্তমানে

এই শিল্পটিও একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। চাপাডাঙ্গার পানদানি পূর্বে সর্বত্র সমাদৃত হইত। বর্তমানে হাট-বসন্তপুরে, বালি-দেওয়ানগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, বেলুন্ডি ও মাহেশে কিছু কিছু পিতলের বাসন প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। হুগলীতে ২৮টি ধান-কল আছে।

হুগলী জেলায় খুব ভাল চাউল উৎপন্ন হয়। এই জেলার সূক্ষ্ম ভাল চাউল কলিকাতায় চালান যায়। হুগলী জেলার মত সরু চাউল পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও প্রাচীনকালে উৎপন্ন হইত না। এই সম্বন্ধে হান্টার সাহেব লিখিয়াছেনঃ

A considerable quantity of the finer kinds of table rice is cultivated in Hugli chiefly for the Calcutta market. (৮)

বেতের ও চিকনের কাজ এই জেলার সর্বত্র পূর্বে দেখা যাইত। মায়াপুর, বন্দীপুর, শ্রীরামপুর, জনাই-বাকসা, ধনিয়াখালি, চন্ডীতলা, নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রামে এই কার্য বিশেষভাবে হইত। বর্তমানেও কিছু কিছু হইয়া থাকে।

চিকনের কাজ এই জেলার মুসলমান রমণীগণ অদ্যাপিও করিয়া থাকেন এবং তাহা আমেরিকায় ও ফ্রান্সে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। পালকি নির্মাণ বহুদিন যাবত এই জেলায় হইয়া থাকে; বর্তমানে বেলুন্ডী গ্রামে কিছু পালকী প্রতি বৎসর নির্মিত হয়।

মাছ ধরিবার হুইল এবং বঁটি ও কাটারী প্রস্তুতের জন্য জনাই ও বাকসা গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ধনিয়াখালি ও পুঁড়সুরা গ্রামে মৎস্য ধরিবার সুন্দর সুন্দর সরু সুতা এবং বড়শি তৈয়ারি অদ্যাপিও হইয়া থাকে। শিংয়ের সুন্দর সুন্দর কৌটা মাকলা গ্রামে এবং শাঁকের দ্রব্য সেনহাটি ও বদনগঞ্জে বর্তমানেও কিছু কিছু প্রস্তুত হয়। চাতরায় খুব ভাল দড়ি তৈয়ারী হয় এবং উহা এখনও বিদেশে রপ্তানী হয়। এই সকল কুটীরশিল্পের দ্বারা বহু লোকের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় একটি সিগার প্রস্তুতের কারখানা ছিল বলিয়া টয়েনবি সাহেব তাঁহার "ব্রিফ হিস্ট্রি অফ হুগলী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

॥ পাট কল ॥

হুগলী জেলায় প্রস্তুত চটের থলে, লাগলাইন দড়ি, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ লইয়া যাইত তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পাটের কল এই জেলার একটি প্রধান বিশেষত্ব হইলেও, বিদেশীগণ কর্তৃক ইহা পরিচালিত হওয়ায় ইহার দ্বারা জেলার কিছুই উন্নতি হয় না। বঙ্গদেশের প্রথম পাটকল চাঁপদানীতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় বলিয়া ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেনঃ

The Jute Mill at Champdani is one of the oldest in the Provinces having been built in 1872. (Hughly District Gazetteer)

কিন্তু বাঙ্গলাদেশে পাটের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সূত্রপাত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। জর্জ অকল্যান্ড নামক জনৈক স্কটল্যান্ডবাসী এই ব্যবসায়ের প্রথম উদ্যোক্তা। তাঁহারই চেষ্টায় মিঃ জন কার নামক এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহাকে টাকা দিয়া সাহায্য করেন। তিনি ভারতে কলকব্জা লইয়া আসিয়া হুগলী জেলার রিষড়াতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম পাটকল স্থাপন

করেন।(৯) ওম্যালী সাহেব চাঁপদানীতে প্রতিষ্ঠিত পাটকলকে বঙ্গের প্রথম পাটকল বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। কারণ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রিষড়াতে প্রথম পাটকল স্থাপিত হইয়াছিল। পাটশিল্প সম্বন্ধে বিবরণ ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

হুগলী জেলায় বর্তমানে তেরটি পাটকল আছে; এই কলগুলি হইতে পাটশিল্পের বার্ষিক উৎপাদন ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টন; মূল্য পঁচিশ কোটি টাকা। এই পাটকলগুলিতে সাত কোটি টাকার উপর মূলধন নিয়োজিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে বাঙ্গালীর কোন অর্থ নাই। কর্মসংস্থানের দিক হইতে এই শিল্পে সাঁইত্রিশ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। নিম্নে পাটকলগুলির নাম প্রদত্ত হইলঃ

১ হেস্টিংস মিলস্ লিমিটেড, রিষড়া।
২ ডালহৌসি জুট কোম্পানী লিমিটেড, রিষড়া।
৩ নর্থব্রুক জুট মিলস্ লিমিটেড, শ্রীরামপুর।
৪ এঙ্গাস্ জুট কোম্পানী লিমিটেড, ভদ্রেশ্বর।
৫ ভদ্রেশ্বর জুট ফ্যাক্টরী কোম্পানী লিমিটেড, ভদ্রেশ্বর।
৬ ভিক্টোরিয়া জুট কোম্পানী লিমিটেড, ভদ্রেশ্বর।
৭ চাঁপদানী জুট মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড, চাঁপদানী।
৮ ওয়েলিংটন জুট মিলস্ লিমিটেড, রিষড়া।
৯ গোন্দলপাড়া জুট মিলস্ লিমিটেড, গোন্দলপাড়া।
১০ ইণ্ডিয়া জুট কোম্পানী লিমিটেড, শ্রীরামপুর।
১১ গ্যাঞ্জেস্ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড, বাঁশবেড়িয়া।
১২ প্রেসিডেন্সি জুট মিলস্ লিমিটেড, রিষড়া।
১৩ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড, রিষড়া।

হান্টার সাহেব "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে হুগলী জেলার উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে রেশম ও তাঁতের কাপড় সর্বপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ১ লক্ষ পাউণ্ডের বস্ত্রাদি হুগলী হইতে ইংরেজ আমলেও রপ্তানী হইত। এই জেলার রেশম ও সুতার কাপড় খুব উন্নত ধরনের ছিল বলিয়া উহা খুব উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। সেই দক্ষ শিল্পীকুল কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কাগজ, দড়ি, তৈল, ঝুড়ি এবং মাটির বাসনের জন্যও হুগলী জেলা প্রসিদ্ধ ছিল। হান্টার সাহেবের বর্ণনা উদ্ধারযোগ্যঃ

The chief manufactures of Hugli are silk and cotton. In the early days of the East India Company, silk and cotton fabrics to the annual value of £ 100,000 were produced here, but the manufacture has gradually decayed, owing to the withdrawal of the company's weaving factories and the importation of English piecegoods. The silk and cotton fabrics of the District are of a superior description

and command high prices. Among the other manufactures of Hugli are paper, rope, oil, baskets and pottery.

॥ বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ ॥

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিবার জন্য যে আন্দোলন হয়, তাহার ফলেই ভারতের প্রথম কাপড়ের কল "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্" উপেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়া বঙ্গবাসী তখন বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সময় এই প্রসিদ্ধ গানটি বাঙ্গলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিলঃ

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে তোর, এর বেশী আর সাধ্য নাই॥

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য ও রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী এই কাপড়ের কলের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। এই মিল হইতে বাৎসরিক যে কাপড় উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

॥ কাপড়ের কল ॥

ভারতবর্ষের প্রথম কাপড়ের কল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয়। হুগলী জেলায় এখন ছয়টি বড় কাপড়ের কল এবং নয়টি 'পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরী' আছে। এই কলগুলিতে বাৎসরিক সাড়ে তিন কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হয় ও তাহার মূল্য সাত কোটি টাকার উপর। কাপড়ের কলগুলিতে পনের হাজার লোকের কর্ম্ম-সংস্থান হয়। হুগলী জেলার প্রধান কাপড়ের কলগুলির নাম এইস্থানে দেওয়া হইলঃ

১ বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিলস্ লিমিটেড, শ্রীরামপুর।
২ রামপুরিয়া কটন্ মিলস্ লিমিটেড, শ্রীরামপুর।
৩ লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিমিটেড, রিষড়া।
৪ বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড, শ্রীরামপুর।
৫ শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড, কোন্নগর।
৬ বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড, কোন্নগর।
৭ কেশোরাম রেয়ন, ত্রিবেণী।
৮ জয়শ্রী টেক্সটাইল লিমিটেড, রিষড়া।
৯ শ্রীরাম সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, রিষড়া। (ইহা রেশম শিল্পের একটি বড় কারখানা, ভারতবর্ষে রেশম শিল্পের এত বড় কারখানা খুব কম আছে।)

তুলা দিয়া সুতাকাটা ও তাহা হইতে তাঁতে কাপড় তৈয়ারী করা এদেশের অতি প্রাচীন ও মৌলিক হস্তশিল্প। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগেও এই শিল্পের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এইচ, টি, কোলব্রুক "হাসব্যাণ্ড্রি-ইন-বেঙ্গল" নামক পুস্তকে বাঙ্গলাদেশের কৃষি সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। আমাদের দেশে সুতা কাটা ও তাঁত বোনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেনঃ

তুলা উৎপাদনে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত এবং এখনও বাংলাদেশের মসলিনের সঙ্গে গ্রেট-ব্রিটেনের কোন সুতা কখনও তুলনায় দাঁড়াইতে পারিবে না।

হুগলী জেলায় তাঁত লাভজনক হস্তশিল্প হওয়ার পথে প্রধান অসুবিধা উহার কাঁচা মাল তুলা উৎপাদন। যে হস্তশিল্প একদিন ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিয়াছিল, আজও তুলা উৎপাদন করিতে পারিলে এই মৌলিক হ শিল্পটি আবার পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। **বস্ত্রশিল্প ও তুলার চাষ** সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। হুগলী জেলায় তাঁতের সংখ্যা বর্তমানে সাড়ে দশ হাজার এবং বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি গজ ও তাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। হুগলী জেলায় ত্রিশটি তাঁত-শিল্পের সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে। শ্রীরামপুরে তাঁত-শিল্পের গবেষণা হয়।

॥ ইস্পাতের কারখানা ॥

পূর্বে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে লৌহনির্মিত জিনিষ স্থানীয় কামারগণ তৈয়ারী করিত। বঁটি, কাটারী, খোঁচ, বঁড়শি প্রভৃতির জন্য প্রাচীনকালে খ্যাতি ছিল। ক্ষুদ্র পরিসর ছাড়া লোহার বৃহৎ কোন কারখানা এই অঞ্চলে ছিল না। বর্তমানে "হনুমান আয়রন ফাউন্ড্রী" এবং 'জে-কে-স্টীল' সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে 'বেলিং হুফস্' যে কয়েকটি কারখানায় প্রস্তুত হয়, জে-কে-স্টীল তাহাদের মধ্যে অন্যতম। 'ইস্পাতের দড়ি' অর্থাৎ 'স্টীল রোপ' ভারতের এই কারখানা ছাড়া আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। এই বিষয়ে তাহারা অগ্রণী বলা যায়। জে-কে-স্টীলের বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য দুই কোটি টাকা এবং মূলধন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ইহা ব্যতীত হুগলী জেলায় আরও অনেকগুলি ছোটখাট লোহার কারখানা আছে। হুগলীতে ১টি সিমেন্ট ও ১টি চুনের কারখানা আছে।

॥ কাঁচের কারখানা ॥

হুগলী জেলায় দুইটি বৃহৎ কাঁচের কারখানা আছে—তন্মধ্যে হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ভারতের মধ্যে ইহা অন্যতম বৃহৎ কারখানা বলিয়া পরিগণিত। ইহার বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য এক কোটি টাকার উপর।

কোন্নগরে কুসুম প্রডাক্টসের **"ডালডা"** প্রস্তুতের কারখানা এবং রিষড়ায় রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা ফসফেট্ কোম্পানীও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহা ছাড়া কোন্নগরে ডি, ওয়াল্ডি কোম্পানীর রং-এর কারখানা, হেওয়ার্ডসের মদের কারখানা হুগলী জেলার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। কোন্নগরের 'রতন প্লাস্টিক', চন্দননগরের 'দাসোলাইট' নামক মোটর-গাড়ির ব্যাটারি, হয়েলসের রং-এর কারখানাও হুগলী জেলার শিল্পে সমৃদ্ধি আনিয়াছে। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলায় সর্বপ্রথম আলু ও বীজ সংরক্ষণের জন্য ঠাণ্ডাঘরের প্রবর্তন করেন। ইহা দেখিয়া অন্যান্য জেলায় এখন ঠাণ্ডাঘর হইয়াছে। বর্তমানে হুগলী জেলায় বহু 'ঠাণ্ডাঘর' হইয়াছে, নিম্নে কয়েকটির নাম উদ্ধৃত হইলঃ

মর্ডান কোল্ড-স্টোরেজ, শ্রীরামপুর; নালিকুল কোল্ড-স্টোরেজ, ইস্টার্ন কোল্ড-স্টোরেজ, অম্বিকা কোল্ড-স্টোরেজ, সত্যনারায়ণ কোল্ড-স্টোরেজ, বেঙ্গল কোল্ড-স্টোরেজ, সিঙ্গুর

কোল্ড-স্টোরেজ, নারায়ণপুর কোল্ড-স্টোরেজ, তারকেশ্বর কোল্ড-স্টোরেজ, বাসুদেবপুর কোল্ড-স্টোরেজ, ধনিয়াখালি কোল্ড-স্টোরেজ, বালিয়া কোল্ড-স্টোরেজ প্রভৃতি।

হুগলী জেলায় হিউম পাইপ নির্মাণের দুইটি কারখানা আছে; একটি কোন্নগরের 'ইণ্ডিয়ান হিউম পাইপ কোম্পানী লিমিটেড', আর একটি আদিসপ্তগ্রামের হিন্দুস্থান স্পান পাইপস্ লিমিটেড।

॥ ডানলপ রবার কোম্পানী ॥

হুগলী জেলার সাহাগঞ্জে 'ডানলপ রবার কোম্পানী' ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। রবারের যাবতীয় দ্রব্য প্রস্তুতের এত বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমগ্র এশিয়ার মধ্যে আর নাই। উড়ো জাহাজ, মোটর গাড়ী, লরী, বাস, সাইকেল প্রভৃতির যাবতীয় টায়ার এই কারখানায় তৈয়ারী হয়। ইহা ছাড়া রবার কনভেয়ার, এলিভেটার বেল্টিং, ডানলোপিলো নামক গদি, বালিশ প্রভৃতি এই কারখানা হইতে উৎপন্ন হয়। কর্মসংস্থানের দিক হইতে এই কারখানায় প্রায় ছয় হাজার লোক কাজ করে। কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ কোম্পানীর নিজস্ব কোয়াটারে বাস করে। এই কারখানার জন্য সাহাগঞ্জ একটি সুন্দর শহরে পরিণত হইয়াছে। ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কোম্পানীর নিজস্ব হাসপাতালে কর্মচারী ব্যতীত এই অঞ্চলের অন্যান্য লোকও চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে। এই রবারের কলের বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য প্রায় ৩১ কোটি টাকা এবং ইহাতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর সুব্যবস্থার জন্য খ্যাতি আছে।

ডানলপের ন্যায় এ্যালকালি কেমিক্যালও হুগলী জেলার আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। রিষড়ায় ইহারা **'পলিথিন'** প্রস্তুতের একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এশিয়ার মধ্যে ইহা বৃহত্তম পলিথিন নির্মাণের কারখানা। এ্যালকালি কেমিক্যাল এই কারখানায় রং, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি আরও বহু প্রকারের ভারী রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে। এই কারখানার বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য পাঁচ কোটি টাকার উপর এবং ইহাতে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়োজিত আছে।

॥ হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেড ॥

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান মোটরস্ কর্তৃক ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরলা ব্রাদার্স ইহার পরিচালক। ভারতের মধ্যে আরও যে চারটি মোটর নির্মাণের কারখানা আছে, হিন্দুস্থান তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। এই কারখানা হইতে প্রতি বৎসর এক সিফ্টে প্রায় পঁচিশ হাজার মোটরগাড়ী নির্মিত হয়। এই কারখানার বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য ত্রিশ কোটি টাকা এবং নিয়োজিত মূলধন প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। তিন সিফ্টে কাজ হইলে এই কারখানা হইতে পঞ্চাশ হাজারের অধিক গাড়ী নির্মিত হইতে পারে। এই কারখানার জন্য ইস্টার্ন রেলওয়ের "হিন্দ্‌মোটর" নামক একটি ষ্টেশন হইয়াছে। ৬ হাজার কর্মচারী এই কারখানায় কাজ করে। কর্মচারীদের বসবাসের জন্য সুন্দর সুন্দর কোয়াটার স্থানটিকে এক মনোরম উপনগরীতে পরিণত করিয়াছে।

॥ পেনিসিলিন ॥

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্যার আলেকজান্দার ফ্লেমিং 'পেনিসিলিন' আবিস্কার করেন। পূর্ব-ভারতের মধ্যে ডাঃ এইচ, ঘোষ সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে "স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কাস লিমিটেড" প্রতিষ্ঠা করিয়া পেনিসিলিন ঔষধ প্রস্তুত করেন। বর্তমানে এই কারখানার সুযোগ্য গবেষকগণ যে প্রণালীতে পেনিসিলিন প্রস্তুত করেন অল্পমূল্যে সেইরূপ বিশুদ্ধ **"ওর‍্যাল পেনিসিলিন"** খুব অল্পই অন্য দেশে তৈয়ারী হয়।

Oral penicillin originally required yeast extract for its successful cultivation. But the Company has been able to obtain excellent yield from their patented oil cake medium as a result of researches in pilot plant study.

রিষড়ায় বিরলা ব্রাদার্সের জয়শ্রী টেক্সটাইল ভারতবর্ষের একমাত্র **লিনেন ফ্যাক্টরী।** ইহারা কাঁচা পশম হইতে পশমের খুব ভাল সুতা উৎপাদন করে। এই কোম্পানীর বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য দেড় কোটি টাকা এবং মূলধন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

ত্রিবেণী টিসু ফ্যাক্টরী হুগলী জেলার আর একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই কারখানায় **সিগারেটের পাতলা কাগজ** তৈয়ারী হয়। ইহার বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা। ত্রিবেণীতে বিরলা ব্রাদার্সের কেশোরাম রেয়নস্ একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষে ইহারাই সর্বপ্রথম **সিনথেটিক ফাইবারস্** প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানার বাৎসরিক উৎপাদন মূল্য প্রায় চার কোটি টাকা।

॥ মিষ্টান্ন শিল্প ॥

বঙ্গের প্রতি অঞ্চলেরই এক একটি মিষ্টান্ন খাবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, যেমন বর্ধমানের সীতাভোগ, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, জয়নগরের মোয়া, কৃষ্ণনগরের সরভাজা প্রভৃতি। বঙ্গবাসীরা কেবল 'মাছখোর' নয়; 'মিষ্টিখোর' বলিয়াও একটা প্রসিদ্ধি আছে।

The Bengalees are inordinately fond of sweets and Sandeshes. It is a national trait. (১০)

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"সন্দেশ বাংলাদেশে বাজিমাৎ করেছে; যা ছিল শুধু খবর; বাংলাদেশ তাকেই সাকার বানিয়ে করে দিল খাবার। সেখানকার সন্দেশও খবর-খাবারের অর্থাৎ সাকার নিরাকারের শিব-শক্তি মিলন।" (১১)

বহু প্রাচীনকাল হইতে হুগলী জেলার খেজুরে চিনি ও সাদা ভাল চিনি উৎপন্ন করিবার জন্য প্রসিদ্ধি ছিল। সেইজন্য হুগলী জেলার সর্বত্রই খুব ভাল মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। আখের চাষ পূর্বে এই অঞ্চলে খুব ভাল হইত। **"বোম্বাই আখ"** হুগলী জেলার উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল। ভাল তালের মিছরিও এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত এবং তাহা অন্যান্য স্থানে রপ্তানী হইত। ওম্যালী সাহেব লিখিয়াছেনঃ

Date juice is made into gur and refined into sugar, and the same is done with palm juice, the crystalline sugar (*michhri*) produced from it being highly esteemed for its medicinal value.

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পঙ্গপালের ন্যায় একপ্রকার শস্যধ্বংসকারী কীট হুগলী জেলায় আবির্ভূত হইয়া এই জেলার সমস্ত "বোম্বাই আখ" নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে চাষীগণ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলিয়া এই মূল্যবান চাষ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলী জেলায় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহাতে হুগলী জেলার খুব ক্ষতি হইয়াছে। এই সম্বন্ধে হান্টার সাহেব 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে' লিখিয়াছেন:

Blights occasionally visit Hugli, but with one exception, they have not affected any crop throughout the entire District. The exceptional case was that of the '*Bombay sugar-cane*' which was totally destroyed by blight in 1860, since which time the cultivation of this valuable crop has been almost abandoned.

কুটিরশিল্পের আকারে এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে গুড় ও চিনি এখনও উৎপন্ন হয়। আখ, তাল ও খেজুরের রস হইতে গুড় তৈয়ারী হয়; ইহার মধ্যে আখের গুড়ের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী।

হুগলী জেলার মিষ্টান্ন শিল্পের মধ্যে জনাই-এর 'মনোহরা', ধনিয়াখালির 'খইচুর', চন্দননগরের জলভরা 'তালশাঁস' সন্দেশ, হরিপালের 'রসগোল্লা', জেজুরের 'গুড়ছোলা', গুপ্তিপাড়ার 'সন্দেশ', জাঙ্গিপাড়ার 'পান্তুয়া', খানাকুলের 'করকণ্ড', কামারপুকুরের 'জিলাপি', গৌরহাটির 'রসকরা' ও শ্রীরামপুরের 'গুঁপো' সন্দেশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি বহু জিনিস বিলুপ্ত হইলেও হুগলী জেলার মিষ্টান্নগুলির খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক "ভীমনাগ" এবং "নবীন ময়রা" (রসগোল্লার আবিষ্কারক) ও তাঁহার পুত্র কে-সি-দাস (রসোমালাই-এর আবিষ্কারক) এই জেলার অধিবাসী ছিলেন।

॥ ব্যবসায়ে হুগলী জেলা ॥

ব্যবসাক্ষেত্রে হুগলী জেলার যে সকল ব্যক্তি স্বদেশের ও স্ব-সমাজের গণ্ডী ছাড়াইয়া সর্বভারতে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধনী ব্যবসায়ীর সংখ্যা হুগলী জেলার অসংখ্য বলিলে বোধহয় ভুল হয় না। হুগলী শহরের বালি অঞ্চলের অধিবাসী গৌরী সেনের নাম আজ "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত ব্যয় করিয়াও মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতায় ছাব্বিশখানি বাড়ি রাখিয়া যান। তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের হুগলী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত সোনাটিকরি গ্রামের অক্রূরচন্দ্র দত্ত কলিকাতায় বিদেশীয়-গণের সহিত ব্যবসায়াদি করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। কলিকাতায় রাজা সুবোধ

মল্লিক স্কোয়ারের উত্তরে তাঁহার বিরাট ঠাকুরবাড়ি ও প্রাসাদোপম অট্টালিকার কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। তাঁহার বংশধরগণ পূর্বপুরুষের অর্জিত অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন! অক্রূর দত্ত লেন নামে কলিকাতায় তাঁহার নামানুসারে একটি রাস্তা আছে। এই বংশের শ্রীসুশীলকুমার দত্ত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার।

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত কাটাগোড় গ্রামের রাধানাথ বসুমল্লিক ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে 'উইলিয়ম ওয়ালেস' নামক একটি বড় স্টীমার কিনিয়া মালপত্র বহনের ব্যবসা আরম্ভ করেন। পরে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া সালিখায় "হুগলী ডক্ ইয়ার্ড" নামে বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর উহার পরিচালনভার মার্টিন কোম্পানীর হস্তে দেওয়া হয়। রাধানাথ প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ার্ড' অদ্যাপি আছে এবং কলিকাতায় রাধানাথ মল্লিক লেন নামে একটি রাস্তা হইয়াছে। এই বংশের শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গরলগাছার পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বীমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডবলিউ আর, রে নামক জনৈক স্কচবাসীর সহিত বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম 'ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে বীমা ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন। ইহার পুত্র শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রণশিল্পে সুনাম অর্জন করিয়াছেন এবং লোটাস প্রেসের কর্ণধার। ঘৃতের ব্যবসায়ে "শ্রীঘৃতের" প্রবর্তক অশোক রক্ষিতের নাম প্রসিদ্ধ।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে সুবোধচন্দ্র মল্লিক "লাইট অফ এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড" নাম দিয়া জীবনবীমার অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল "বঙ্গবাসী জনসাধারণের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও সঞ্চয় প্রবৃত্তি জাগাইতে সহায়তা করা।"

বাগাটি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ বহুবিধ ব্যবসা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খরসারাই গ্রামের ক্ষেত্রমোহন দে ব্যবসা করিয়া ক্রোড়পতি হন। তাঁহার পুত্রগণ পরবর্তীকালে "যশোহর ঝিনাইদহ রেলওয়ে কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা করেন। স্টিভেডোরের কাজ করিয়া দশঘরার বিপিনকৃষ্ণ রায়, জেজুরের গোপাল ঘোষ ও বগল ঘোষ, ভাণ্ডারহাটির অতুলচন্দ্র চৌধুরী এবং বলাইলাল মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বহু অর্থ উপার্জন করেন। কলিকাতার সুবর্ণবণিক সমাজের বেশীর ভাগ লোকই হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম ও চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। এই সমাজের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের নাম সর্বজনবিদিত। ইহা ছাড়া মতিলাল শীল, প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও তাহার পুত্র দুর্গাচরণ ও পৌত্র রাজা হৃষিকেশ লাহা বাঙালী ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। বর্তমানে রাজা হৃষিকেশের পুত্র ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা বাঙলার অন্যতম প্রধান শিল্পপতি হিসাবে সুপরিচিত। এই লাহা পরিবার বিদ্যাচর্চা ও শিল্পচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ।

বাক্সার প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী শা-ওয়ালেশ কোম্পানীর সহিত বহুবিধ ব্যবসা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁহার পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরীও শা-ওয়ালেশ কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার ও চৌধুরী কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী। বাক্সার বিজয়চন্দ্র সিংহ কিলবার্ণ কোম্পানীর বেনিয়ান ও সিলেট চুনের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন। ইহা ছাড়া বামার লরির বেনিয়ান সতীশচন্দ্র মিত্র (রাজা মিত্র) ও অটল সেনের নামও প্রখ্যাত।

বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায়গণ বর্তমানে সর্ব ব্যবসায়ে অগ্রণী বলা যায়। ইহার জি, ডি, ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানীর কর্ণধার। শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ন্যাশনাল রবার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার। এই বংশের শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কয়লার খনি ও ফায়ার ব্রিকস্ প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

উত্তরপাড়ার ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে হুগলী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাত। হুগলী ব্যাঙ্কার্স ও টেডার্স লিমিটেড নাম দিয়া ইহার কার্য সুরু হয় এবং ইহার ক্রমোন্নতির সঙ্গে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্কের ত্রিশটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহার আদি নাম পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে ইহা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

চন্দননগরের মতিলাল রায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রবর্তক সঙ্ঘের সভ্যগণের সহযোগে স্বীয় প্রতিভা ও শ্রমকে অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়া বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহার মধ্যে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক জুট মিলস, প্রবর্তক পাবলিশিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃ সভ্যগণ কর্তৃক মনোনীত ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক এই সব অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়।

ধনিয়াখালির সুরবংশ বিভিন্ন ব্যবসায়ে খুব সুনাম অর্জন করিয়াছেন। এই বংশের শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর প্রথম 'রেফ্রিজারেটার' নির্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রেফ্রিজারেটারের নাম 'সারফ্রিজ'। ইহা ছাড়া সুর এনামেল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামচন্দ্র সুর ও শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সুর এনামেল ব্যবসায়ে সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

কলিকাতার সুবিখ্যাত পশম ব্যবসায়ী এল, মল্লিক তারকেশ্বরের অধিবাসী। ধর্মতলা স্ট্রীটে "উল হাউস" কলিকাতায় উলের অন্যতম সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাত। চাঁদনির মধ্যে শতকরা আশি জন ব্যবসায়ী হুগলী জেলার অধিবাসী। বড়বাজারে লোহার ব্যবসায়ে হুগলী জেলার অধিবাসী শতকরা সত্তর ভাগের উপর। প্রসিদ্ধ পুরাতন লৌহ ব্যবসায়ী হিসাবে কে, সি, ঘটক এণ্ড কোম্পানীর নাম সুপরিচিত। ইহারা বর্তমানে কুসুমিকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ নামে একটি কারখানা পরিচালনা করেন। ঘটকবংশ চন্দননগরের অন্যতম প্রাচীন বংশ। চন্দননগরের শেঠগণও লৌহ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

সোনারুপার কারবারে হুগলী জেলার অধিবাসী সর্বাধিক। 'বড়াল-বার' নামক সোনা হুগলীর বড়ালদের দ্বারা প্রথম প্রবর্তিত হয়। বোম্বাই শহরে হুগলী জেলার বহু ব্যক্তি সোনার গহনা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। দক্ষ শিল্পী বলিয়া তাঁহাদের খুব সুনাম আছে.

সুলভ মূল্যে সৎসাহিত্য প্রচার করিবার জন্য বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চন্দননগরের অধিবাসী ছিলেন। পুস্তকের ব্যবসা দ্বারা এবং মাসিক ও দৈনিক বসুমতী পত্র পরিচালনা করিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন।

লোহার ব্যবসায়ে ডি, এন, সিংহ এণ্ড কোম্পানীর নামও 'ধীরেন' মার্কা কড়াই নির্মাতা হিসাবে সুপরিচিত। ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ বেলুড়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ

করিয়াছেন। ইহার আদি বাড়ি হুগলী জেলার ভাস্তাড়া গ্রামে। ইহা ছাড়া লৌহ ব্যবসায়ে কৃষ্ণধন গাঙ্গুলী, রাসবিহারী সরকার ও দক্ষিণেশ্বর সরকার শৈলধর ঘোষ, নফরচন্দ্র আটা প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। লোহার ব্যবসা ছাড়া কলিকাতার পোস্তা, বাসনপটি, সোনাপটি অঞ্চলের অধিকাংশ ব্যবসায়ী হুগলী জেলার অধিবাসী।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বি, সি, নান এণ্ড ব্রাদার্স নামক প্রসিদ্ধ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পাইকারী ও খুচরা কাপড়ের ইহারা অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাত। এই নান বংশ চুঁচুড়ার অধিবাসী। রাজবলহাটের জহরলাল ভড় "দুলালের তালমিছরী" প্রস্তুত করিয়া সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

"ইক-মিক্-কুকারে"র আবিষ্কারক ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক হুগলীর অন্যতম সুসন্তান। এই বংশের মাননীয় বিচারপতি প্রকাশচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা রাইমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাও হুগলীর সন্তান।

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসায়ে কলিকাতায় এন. বি. সেন এণ্ড ব্রাদার্সের নামও সুপরিচিত। ইহা ছাড়া আরামবাগ মহকুমার বহু ব্যবসায়ী নানা প্রকার ব্যবসায়ে কলিকাতায় ব্রতী আছেন তাহার মধ্যে পাঁউরুটির ব্যবসা অন্যতম। ইহাতে বহু মুসলমান প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রবর্তিত শ্রীরামপুরের বেল্টিং ফ্যাক্টরীর নাম ভারতে বেল্টিং নির্মাণের প্রথম কারখানা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হুগলীর শ্রীনবকুমার বসু প্রসিদ্ধ বিলাতী চা-বাগান পুসিম্বিং টি কোম্পানীর পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর এই প্রশংসনীয় উদ্যম প্রথম বলিতে পারা যায়। হুগলীর প্রাচীনতম বস্ত্র প্রতিষ্ঠান পি. কে. বসু এণ্ড ব্রাদার্সেরও তিনি কর্ণধার। চুঁচুড়ার নান বংশ কোন্নগরে একটি কাপড় ও সুতার কল পরিচালনা করেন; উহার নাম বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড। নান পটারিসে্র-ও তাঁহারা পরিচালক।

চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনাথ চৌধুরী ফরাসীদের সহিত ব্যবসায়াদি করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার জীবনী আলোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুল্লিখিত হইল না। ইহা ছাড়া পরবর্তীকালে চন্দননগরের রাজা দুর্গাচরণ রক্ষিত ভারতের বাহিরে সুদূরে অস্ট্রেলিয়ার সহিত ব্যবসায়াদি করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন, ডাঃ দাশরথি দত্ত মালয়ে 'লালবাগান স্টেট' নামক রবারের বাগান করিয়াছেন।

বাঙ্গলার বাহিরে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর মাধ্যমে বৃহত্তম কন্ট্রাক্টার হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। হিন্দুস্থানের ন্যায় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এদেশে খুব অল্পই আছে। মগরায় তিনি পিতার নামে একটি কলেজ করিয়া দিয়াছেন।

ফিল্ম শিল্পে তড়া-আঁটপুরের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রবর্তিত নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের নাম ভারতবিখ্যাত। তাঁহার "চিত্রা" ও "নিউ সিনেমা", পণ্ডনান গ্রামের শ্রীবলাই বিশ্বাসের "রাধা সিনেমা", চুঁচুড়ার নান বংশের "রূপবাণী" ও "ভারতী" চন্দননগরের শ্রীতুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পূর্ণ থিয়েটার" এবং শিয়াখালার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহের "কালিকা" ও "আলেয়া" কলিকাতার বাঙ্গালী পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর হল বলিয়া বিখ্যাত

॥ মুদ্রার কথা ॥

ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাস খুব প্রাচীন; মহেঞ্জোদরোয় আবিস্কৃত ধাতুনির্মিত আয়তাকার মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রার প্রাচীনতম নিদর্শন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে এই মুদ্রা ভারতে প্রচলিত ছিল। তারও বহু পূর্বে জিনিষের বদলে জিনিষ দিয়া লেনদেন হইত। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে মুদ্রার আকৃতি ও রূপকল্পনার সৌন্দর্য বা শিল্পনৈপুণ্যের কোন স্থান ছিল না। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাঙ্গলাদেশে 'গণ্ডক' নামে এক প্রকার মুদ্রা ছিল। বর্গাকার বা আয়তকার তাম্র বা রৌপ্যখণ্ডের গায়ে যে কোন প্রকারে একটি প্রতীক মুদ্রিত করা হইত। এই মুদ্রার আকৃতি ও রূপকল্পনায় বিরাট পরিবর্তনের সূচনা সর্বপ্রথম গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়া আরম্ভ হয় এবং গ্রীক প্রভাবের ফলে ভারতীয় মুদ্রার ঐতিহ্য এক নূতন খাতে তাহার পর প্রবাহিত হয়।

অতি পূর্বকাল হইতে ভারতবর্ষে তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত। ভগবান মনু মনুসংহিতায় লিখিয়াছেন যে, বিক্রয়াদি লোক-ব্যবহারের জন্যই মুদ্রার সৃষ্টি।

লোকসংব্যবহারার্থং যাঃ সংজ্ঞাঃ প্রথিতা ভুবি।
তাম্ররূপ্যসুবর্ণানাং তাঃ প্রবক্ষ্যাম্যশেষত॥

কিরূপে মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত হইত, তাহাও এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বিবৃত আছে। কিভাবে ভারতে প্রথম মুদ্রা প্রচলন আরম্ভ হয়, তাহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। পূর্বে ভারতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল না। একমাত্র তাম্রমুদ্রাই ভারতে তখন প্রচলিত ছিল। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে অতি প্রাচীনকালে ফিনিক বনিক্‌দের দ্বারা ভারতবর্ষে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়। মনুসংহিতায় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার উল্লেখ থাকিলেও ঐতিহাসিক যুগে ইহাদের প্রচলন ছিল না।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের আমল হইতে ভারতীয় মুদ্রার এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। এই যুগে ভারতীয় শিল্পসাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের ধারা গড়িয়া উঠে। এই সব মুদ্রা খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের ভারতবর্ষের সমাজজীবন ও সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। গুপ্তযুগের বহু উল্লেখযোগ্য মুদ্রার ছবি ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃক প্রকাশিত জন অ্যালেনের 'ক্যাটলগ অফ গুপ্ত কয়েনস্' নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গুপ্ত যুগের মুদ্রায় শিল্পকলার যে পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ঐতিহ্য ভারতে তুর্কী বিজয় ও ইসলামের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। তারপর মুসলমান শাসনকর্তাদের আমলে এক নূতন ধরণের মুদ্রার উদ্ভব হইল। এই মুদ্রার অঙ্গসজ্জায় মূর্তির পরিবর্তে সুসজ্জিত লিপিমালা স্থান গ্রহণ করিল। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে বঙ্গের স্বাধীন রাজা দনুজমর্দন দেবের মুদ্রায় পাওয়া যায়। রাজা গণেশ ও রাজা দনুজমর্দন একই ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় বাংলা হরফে সংস্কৃত শব্দমালায় একদিকে "শ্রীশ্রীদনু[illegible]" এই কথাটি লেখা ছিল; আর অন্যদিকে লেখা ছিল চণ্ডীচরণপরায়ণস্য।

রাজা গণেশ গিয়াসউদ্দীন আজমশাহের রাজস্ব সচিব ছিলেন। তিনি ১৩১৬ হইতে ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, গৌড়ের সুলতানগণ পর্যন্ত তাঁহার হাতের পুতুল ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে তৎকালে গৌড়বঙ্গের সুলতানগণ রাজা গণেশের আজ্ঞাধীন ছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে গৌড়বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালিত হইত। গিয়াসউদ্দীনের নামাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা সপ্তগ্রামে ৭৯০, ৭৯৫, ৭৯৬ এবং ৭৯৮ হিজরায় মুদ্রিত হইয়াছিল।(১২) ইহা ছাড়া ময়ুজমাবাদে এবং গৌড়ে মুদ্রিত তাহার নামাঙ্কিত মুদ্রাও আবিস্কৃত হইয়াছে।(১৩)

গুপ্তযুগে বাঙ্গলাদেশে সোনা ও রুপা এই উভয় মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত 'দিনার' ছিল স্বর্ণমুদ্রা এবং 'রূপক' ছিল রৌপ্যমুদ্রা। ইহা ছাড়া তামার মুদ্রাও তখন প্রচলিত ছিল। তখন মুদ্রার নিম্নতম মান ছিল কড়ি; ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কড়ির প্রচলন সমগ্র বঙ্গদেশে ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলী জেলায় কড়ি দিয়া কর আদায় হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলাতে পর্যন্ত কড়ির চাহিদা ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের এক প্রস্তাবে লিখিত আছে যে, সারা বৎসর যে সকল কড়ি রাজস্ব হিসাবে আদায় হইবে তাহা প্রতি মাসে থলিতে পুরিয়া এক্সপোর্ট ওয়ারহাউসের রক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে। ইংলণ্ডে কড়ির অভাব অনুভব হইবার পূর্বেই উহা যেন জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে সরবরাহ করা যাইতে পারে।

That all cowries collected throughout the whole year for revenues be monthly put into bags and delivered into the care of the Export Warehouse Keeper that we may not be wholly in want of cowries when we want them to be shipped to England. (Resolution of the Council of Fort William dated 4th September 1715.)

সপ্তম শতাব্দীর পর হইতে স্বর্ণমুদ্রা বাঙ্গলা দেশ হইতে একপ্রকার উধাও হইয়া যায়। পালরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আবার নূতন করিয়া রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হইলেও স্বর্ণমুদ্রা আর ফিরিয়া আসে নাই। তারপর সেন রাজত্বে রুপার ও তামার মুদ্রাও উধাও হইয়া যায়; ফলে মুদ্রা হিসাবে একমাত্র কড়ির দ্বারাই যাবতীয় লেনদেনের কাজ তখন চলিতে থাকে।

রাজা গণেশ আজমসাহেবের মৃত্যুর পর স্বয়ং গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যদু মহম্মদ জলালউদ্দিন এই নাম ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন যে জলালউদ্দিন (ওরফে যদুনাথ ভাদুড়ী) রাজা গণেশের মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র বলিয়া সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। (১৪)

পাণ্ডুয়ায় ৮১৮, ৮১৯, ৮২২, ৮২৩, ও ৮২৮ ও ৮৩৪ হিজরায় জলালউদ্দিনের নামাঙ্কিত অনেকগুলি মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাহার সপ্তগ্রাম ট্যাকশালায় ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে (৮২১ হিজরায়) মুদ্রিত কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রাও আবিস্কৃত হইয়াছে।

(১৫) এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায় লিখিত আছে যে, সপ্তগ্রাম নিম্নবঙ্গের ট্যাকশাল ছিল এবং এই স্থান হইতে মুসলমান শাসনকর্তাদের যাবতীয় মুদ্রা মুদ্রিত হইত। আকবর উদারপন্থী ও সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। রাম-সীতার প্রতিকৃতি-যুক্ত মুদ্রাটি ইহার প্রতীক। জাহাঙ্গীরের মুদ্রাসমূহ অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোন মুদ্রার গায়ে সম্রাটের আবক্ষ প্রতিমূর্তি, কোনটায় বা সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে **সপ্তগ্রামে প্রথম ট্যাকশাল** স্থাপিত হয়। ১৫00 খৃষ্টাব্দে ইসলাম শার রাজত্ব পর্যন্ত সপ্তগ্রামে ট্যাকশাল ছিল।

তোগলক বংশীয় মহম্মদ তোগলকের সময় ১৩২৯ খৃষ্টাব্দের তারিখ সম্বলিত মুদ্রা **সপ্তগ্রামের প্রাচীনতম মুদ্রা।** ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে সামসউদ্দীনের সময় প্রচলিত যে মুদ্রা সপ্তগ্রামে আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রতিলিপি এই স্থানে প্রদত্ত হইল। এই মুদ্রা সেকেন্দার শাহের মুদ্রা। এই মুদ্রার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ১৩৩৯ সালের কার্তিক মাসের 'পঞ্চপুষ্প' নামক মাসিকপত্রে দিয়াছেন।

মুসলমানদের আমলে ভারতে মুদ্রাশিল্পের বিশেষ অবনতি হয়। মহম্মদ ঘোরী হইতে শামসউদ্দীন আলতমাস পর্যন্ত মুসলমান-মুদ্রায় হিন্দু আদর্শ রক্ষিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মুদ্রাশিল্পের বিগতস্মৃতি সুলতান আলতমাসের অশ্বারোহী মুদ্রায় যেন একবার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন শহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী হইতে গয়াসউদ্দীন পর্যন্ত নয় জন মুসলমান নৃপতির মোহরাদিতে তুঘ্রা বা পারসী লিপির সহিত ভারতবাসীর মনোরঞ্জন বা সুবিধার জন্য নাগরাক্ষরেও নামাঙ্কিত হইয়াছে। এমন কি, স্ব স্ব মুদ্রায় কুতুবুদ্দীন **'ভূপালঃ'**

সপ্তগ্রামে মুদ্রিত সামসউদ্দীনের মুদ্রা
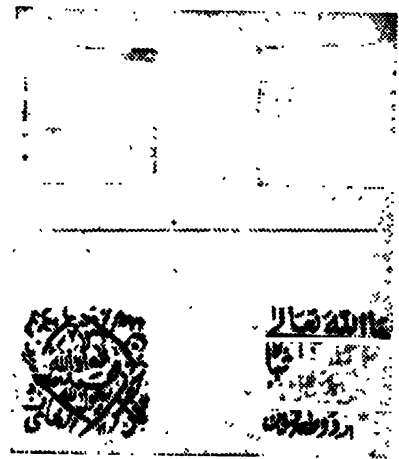
আলাউদ্দিনের সুবর্ণ মুদ্রা

ফিরোজ শাহ 'ধনুর ভূমিপতি' মৈজউদ্দীন ও আলাউদ্দিন 'নৃপঃ' বা 'নৃপতি' নাসিরুদ্দীন 'পৃথ্বীন্দ্র' এবং গয়াসউদ্দীন 'শ্রীহম্মীর' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। ১৬

ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলের পূর্বে মুদ্রার ধাতুমূল্য ও মূল্যমান সমানুপাতিক ছিল। পরে পূর্ণমান মুদ্রার স্থান প্রতীক মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রা পরিগ্রহ করিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই পাশাপাশি চলিত; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিনিময় হার সঠিকভাবে নির্দিষ্ট ছিল না। বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নরপতির নিজস্ব মুদ্রা ছিল। সেই সময় ভারতে ৯৯৪ রকমের বিভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। বলাবাহুল্য ইংরেজ শাসনকাল হইতে ভারতীয় মুদ্রা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান আকার ও আকৃতির ভারতীয় মুদ্রা সর্বপ্রথম নির্মিত হয়। এর ওজন ছিল ১৮০ গ্রেন ট্রয়, আর রৌপ্যের বিশুদ্ধি ছিল ১১।১২। আজকাল ট্যাকশাল বলিতে যাহা বুঝায় তার গোড়াপত্তন হয় কলিকাতায় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আর তাহাতে মুদ্রা নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় লিখিয়াছেন যে প্রথম স্তরে স্বর্ণমুদ্রার ওজন ও নিকষমূল্য ক্রমশ কমেছে; দ্বিতীয় স্তরে স্বর্ণমুদ্রা নকল ও জাল হয়েছে; তৃতীয় স্তরে রূপোর মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাকে হটিয়ে দিয়েছে। চতুর্থ স্তরে রূপোর মুদ্রা ক্রমেই খেলো হয়েছে; শেষ পর্যন্ত রূপোর মুদ্রাও একেবারে উধাও হয়েছে।

এইভাবে সোনা ও রূপোর মুদ্রা খেলো হ'তে হ'তে পরে একেবারে উধাও হয়ে যাবার কারণ আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে গুপ্ত আমলের পর থেকেই বাংলাদেশে একটা টাল-মাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শশাঙ্কের আমলেই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল। তারপর তো পুরো একশো বছর ধ'রে বাংলাদেশে একটানা অরাজক অবস্থা। এর ফলে দেশের ভেতরে ও বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য বড় রকমের ঘা খায়। এবং দেশের জীবনের ভিৎ পর্যন্ত নড়ে যায়।

স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন বন্ধ করিলে উহা পুনঃপ্রচলনের জন্য বাঙ্গলা দেশে বহু আলোচনা হয়। এই বিষয়ে ২৮ পৌষ ১২৫৯ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের প্রস্তাব

ইংলিশম্যান পত্রে কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, আমারদিগের রাজপুরুষেরা স্বর্ণ-মোহর অপ্রচলিত করণের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিলাতে যে প্রকাশ সবরিণ নামক স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত আছে, এদেশে সেই প্রকার দশ টাকা মূল্যে কোনরূপ স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হইলে সর্ব বিধায়ে উত্তম হয়। পত্র প্রেরক মহাশয়ের এই প্রস্তাব নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, কারণ স্বর্ণ মূল্যবান ধাতু, মুদ্রা স্থলে তাহার ব্যবহার করা আবশ্যক, বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে সুবর্ণ মুদ্রা পূর্বে বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, অতএব স্বর্ণ মুদ্রা পুনঃ প্রচলিত হইলে ক্রয়-বিক্রয় স্থলে ও রাজস্ব প্রদান সময়ে বিস্তর উপকার দর্শে,বিশেষতঃ একশত রৌপ্য মুদ্রা লইয়া

যাইতে অধিক ভার বোধ হয়, কিন্তু দশটা স্বর্ণ মুদ্রা অনায়াসে লইয়া যাওয়া যায়, পরন্তু অস্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়া এই উভয় স্থানে স্বর্ণাকর প্রকাশ হওয়াতে রাজপুরুষদিগের নিতান্ত ভয় জন্মিয়াছে, একারণ গবর্ণমেন্ট স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত করণে ভীত হইয়া থাকিবেন।

ইংরাজ কবি মুদ্রার দ্বারা চারিটি কার্য সমাধা হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— বস্তুর মাধ্যম, পরিমাপ, মান এবং সঞ্চয়।

Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard, a store.

৭ আগষ্ট ১৮৩৩ 'সমাচার দর্পণ' পত্রে ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে এই সংবাদটি বাহির হয়ঃ

এতদ্দেশীয় মুদ্রা।—কলিকাতার টাকার উপরে হামিয়েদিনে মহম্মদ অর্থাৎ মহম্মদের ধর্মপোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে। অতয়েব ইহার কএক শত বৎসর পরে এই টাকা দেখিয়া লোকের সন্দেহ হইতে পারে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ইংগলণ্ডিয়েরা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা মুসলমান কি খৃষ্টিয়ান ছিলেন। বোম্বাইয়ের নূতন টাকার উপরে যে কথা মুদ্রাঙ্কিত আছে তাহার অর্থ এই যে এই রাজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম বাদশাহের শুভ সিংহাসন প্রাপ্তির ৪৬ বৎসরে প্রস্তুত হয় কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে ঐ মুদ্রা বোম্বাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং জয়শীল বাদশাহ জীবদ্দশায় কয়েদ থাকিয়া বহুদিন লোকান্তরগত হইয়াছেন। অতয়েব ইংগলণ্ডীয়েরা আপনাদের মুদ্রার উপরি এতদ্রূপ কথা মুদ্রাঙ্কিত করেন এ অত্যাশ্চর্য বোধ হয় যেহেতুক ইংগলণ্ডীয়েরা নিয়ত সত্যাশ্রিতরূপে আপনারদিগকে জ্ঞান করেন এবং তাহা অপ্রকৃতও নহে।

॥ বিক্রমাদিত্যের সুবর্ণমুদ্রা ॥

সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অর্থাৎ **বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সম্প্রতি সংগ্রহ করিয়াছেন। হুগলী জেলার মহানাদ অঞ্চলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত ঐ সুবর্ণমুদ্রাটিতে কুষাণ যুগের প্রভাব নাকি সুস্পষ্ট। উক্ত মুদ্রাটি চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের গোড়ার দিকে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠে ধনুর্বাণ হস্তে রাজমূর্তি এবং পাশে গরুঢ়ধ্বজ দেখা যায়। অন্যদিকে সিংহাসনারূঢ়া শ্রী অথবা লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি। রাজমূর্তির বামহস্তের নীচে "শ্রীচন্দ্র" এবং মুদ্রার অপরপৃষ্ঠে "শ্রীবিক্রমঃ" এই দুইটি নাম ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা আছে।

এই ধরণের সুবর্ণমুদ্রা বাঙলাদেশে একান্তই বিরল এবং মুদ্রাটি রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের এক স্মরণীয় চিহ্ন হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। ঐ অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীপ্রবীরকুমার গোস্বামীর সহায়তায় প্রত্নতত্ত্ব অধিকার মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়াছেন।

॥ আলাউদ্দিনের সুবর্ণমুদ্রা ॥

মহানাদ হইতে পূর্বে বহু সুবর্ণমুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে। করবংশের লক্ষ্মীর হাঁড়িতে জিতেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক আবিস্কৃত একটি সুবর্ণমুদ্রা বহুদিন রক্ষিত ছিল। এই মুদ্রাটি চতুষ্কোণ এবং ওজন এক ভরি এক আনা। আলাউদ্দিন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খুল্লতাত

জালালুদ্দিনকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মুদ্রাটি তাঁহার সময়ের এবং আরবি অক্ষরে লিখিত কথাগুলির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করা হইয়াছেঃ

"হজরত ওমর গসমান আলআদিন। ইয়া আল্লা মহাম্মাদর রশুল্বাল্লা। আবুবক্কার আলি। সিদ্দিক আলগাজি। ইয়া আল্লা তায়ালা। মহম্মদ আলাওদ্দিন। আলগাজি, আশরফল। বাদসা সারবে আরদো। তায়া আফেরিন।"

বর্তমান ভারতবর্ষে তিনটি ট্যাকশাল আছে; একটি কলিকাতায় আলীপুরে, দ্বিতীয়টি বোম্বাই-এ আর তৃতীয়টি হায়দ্রাবাদে। আলীপুরের ট্যাকশালটি খুব বড়, এই বৃহদাকার আধুনিক সাজসরঞ্জামসমন্বিত ট্যাকশালটি ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুদ্রা নির্মাণের প্রক্রিয়া খুব জটিল। সামান্যতম ত্রুটির জন্য মুদ্রা বাতিল হইবার সর্বদা আশঙ্কা থাকে। এইজন্য এই কাজের জন্য প্রতিটি ধাপে চাই সতর্ক দৃষ্টি ও সুদক্ষ কারিগরী বিদ্যা। মাসের পর মাস ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতীত নূতন ধরণের কোন মুদ্রার নির্মাণ কখনও সম্ভব হয় না। মানুষের শিল্পসত্তা যুগে যুগে মুদ্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেবল বৈষয়িক উন্নতিতে একটি জাতির পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। জাতির সম্যক পরিচয় তাহার বৈষয়িক উৎকর্ষ, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির সামগ্রিক বিচার। কিন্তু শিল্প মানের বিচারে বর্তমান ভারতীয় মুদ্রা খুব সুন্দর নয়। অঙ্গসজ্জায় ভারতীয় মুদ্রা পূর্বের মত সৌন্দর্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

॥ সংকেত সূত্র ॥

১ Hedges Diary, Vol III
২ Wilson's Early Annals, Vol I.
৩, ৪ Hedges Diary, Vol II.
৫ An Account of the Trade in Hugly.
৬ Calcutta Gazette, 15 Nov. 1787.
৭ Hughly Medical Gazette.
৮ Imperial Gazetteer of India.
৯ ভারত পরিচয়—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
১০ ndian Cameos—W. S. Caine.
১১ বাঙ্গলার সাধনা—ক্ষিতিমোহ-, সেন
১২ Ibid.
১৩ Initial Coinage of Bengal.
১৪ Stewarts History of Bengal.
১৫ Ibid.
১৬ বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু

ভারতবর্ষে ব্যবসা করিবার জন্য ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ব্যাটাভিয়ায় ওলন্দাজগণ "ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" গঠন করেন। এবং উক্ত বৎসরেই তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পোর্তুগীজগণ মোগলদের হাতে বিধ্বস্ত হইলে ওলন্দাজগণ সেই সুযোগে চুঁচুড়ায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া এদেশের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেন এবং ওলন্দাজদের সহিত সংশ্রবের জন্যই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। দিল্লীর বাদসাহ সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রদত্ত ফরমানের সর্তানুযায়ী তাহারা চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং এই অখ্যাত স্থান তখন ভারতবর্ষে নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ওলন্দাজগণ প্রথমে বণিকরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন কিন্তু ইংরাজদের শাসন ক্ষমতা অর্জন করিতে দেখিয়া তাহারাও সেই দিকে মনোযোগ দেন। একবার মীরজাফর গোপনে বাংলা দেশ হইতে ইংরাজের প্রধান্য নষ্ট করিবার জন্য তাহাদের সাহায্য লইয়াছিলেন। চুঁচুড়া কিছুকাল ব্যাটাভিয়ার অধীন ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ওলন্দাজ যুদ্ধজাহাজ সৈন্য সামন্ত লইয়া ব্যাটাভিয়া হইতে এদেশে আসে। ইংরাজগণ তাহাদের বাধা প্রদান করিলে ওলন্দাজগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং তাহাদের রণতরীগুলিও ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। তাহার পর হইতে ওলন্দাজগণ শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন এবং তাহাদের উন্নতির সময়ে তাহারা 'ফোর্ট গ্যাসটোভাস' নামে চুঁচুড়ায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। চুঁচুড়া অধিকার করিবার পর ইংরাজগণ ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ ভাঙিগয়া ফেলেন এবং তথায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্য রাখিবার জন্য তাহারা একটি ব্যারাক নির্মাণ করেন। এখন এই ব্যারাকে কাছারী কালেক্টরি ও অন্যান্য অফিস অবস্থিত। প্রত্যেক তলায় ৬৫টি বৃহৎ খিলানযুক্ত এরূপ দীর্ঘ অট্টালিকা বঙ্গদেশে আর নাই। এই বৃহত্তম অট্টালিকা সেই আমলের স্থাপত্যশিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইবার পরও ওলন্দাজগণ বাণিজ্যসূত্রে বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং ব্যবসায়েও খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। ওলন্দাজদের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইলেও 'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র কর্মচারীদের অসাধুতায় লাভের সমস্ত অর্থ তাহাদের নিকট পোঁছাইত না। সেই জন্য তাহারা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে সুমাত্রা প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপের পরিবর্তে চুঁচুড়া ইংরাজদের ছাড়িয়া দেয়।

ওলন্দাজদের সময়ে অনেক আর্মেনীয় চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত চুঁচুড়ার আর্মেনীয় গির্জা বঙ্গের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গির্জার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই গীর্জা 'জন দি ব্যাপটিষ্ট'এর নামে উৎসর্গীকৃত বলিয়া প্রতিবৎসর ২৭শে জানুয়ারী এখানে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ ও আর্মেনীয়দের পুরাতন গোরস্থানে তখনকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাধি আছে। ব্যাণ্ডেলের গির্জা বাংলার প্রাচীনতম গির্জা। এখানকার আর্মেনিটোলা, মোগলটুলি, ফিরিঙ্গিটোলা প্রভৃতি পাড়ার নাম চুঁচুড়ার পূর্ব সমৃদ্ধি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে।

ওলন্দাজ শাসনকর্তাগণ সকলেই প্রাচ্যরীতি অনুযায়ী খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন এবং বাঙ্গালীদের সহিত তাহারা খুব মেলামেশা ও বাঙ্গালীদের রীতিনীতির অনুসরণ করিতেন। বহু ওলন্দাজ বঙ্গ মহিলা পর্যন্ত বিবাহ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মাঝখানে গঙ্গার ধারে গোস্বামীঘাটে "কনে বৌয়ের মন্দির" নামে একটি প্রকাণ্ড

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। পূর্বে ইহা একটি কালীমন্দির ছিল এবং দেবীচরণ সরকার নামে এক ধনী ব্যক্তি তাহার বাড়ির কনিষ্ঠা বধূর ইচ্ছানুসারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া ইহা "কনে বৌয়ের মন্দির" বলিয়া প্রখ্যাত হয়। ইহা ছাড়া চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর জীউর জাগ্রত দেবতা হিসাবে ষোড়শ শতাব্দী হইতে এই অঞ্চলে খ্যাতি আছে। এই মন্দিরের দুইটি পিতলের ঢাক তৎকালীন ওলন্দাজ গভর্ণর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন।

চুঁচুড়া বহু প্রাচীনকাল হইতে কেবল জেলার সদর নয় ইহা সমগ্র বর্ধমান বিভাগের হেড কোয়ার্টার ও কমিশনারের আবাসস্থান। বর্তমানে সদর মহকুমার চুঁচুড়া থানায় দুইটি মিউনিসিপ্যালিটি হুগলী-চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়া এবং কোদালিয়া-দেবানন্দপুর নামে একটি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। কোদালিয়া গ্রামের সার্বিক বিবরণ (মনোগ্রাফ) ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির তালিকায় বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ সার্বিক কোন গ্রামের বিবরণ পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া উহার সংক্ষিপ্তসার শেষে প্রদত্ত হইল।

মগরা থানার সার্ভে-ম্যাপ

চুঁচুড়া ও হুগলী

চুঁচুড়া হুগলী জেলার সদর শহর কলিকাতা হইতে দূরত্ব তেইশ মাইল। ওলন্দাজগণের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ব্যাটেভিয়ায় ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে 'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গঠিত হয় এবং উক্ত বৎসরেই তাঁহারা ব্যবসা করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করেন। হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার নামক সরকারী গ্রন্থের লেখক মিঃ এল, এস, এস, ওম্যালী ও মনোমোহন চক্রবর্তী লিখিয়াছেনঃ The earliest record of the arrival of Dutch ships in the north of the Bay was in 1615 দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ওলন্দাজদিগকে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে একখানি 'ফরমান' দেন এবং উক্ত 'ফরমানের' সর্তানুযায়ী চুঁচুড়া তাঁহাদের অধিকারে আসে। ব্যবসায়াদির জন্য তাহারা চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতে এই স্থানটি বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে **হুগলী-চুঁচুড়া** মিলিত শহর। এই দুইটি পুরাতন শহর বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

হান্টার সাহেব লিখিয়াছেনঃ Hugli and Chinsurah lie, in fact, so close to each other as to form in reality only one town.

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে চুঁচুড়া সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইঃ

"চন্দ্রমা-মাধুরী ধরি চুঁচুড়া নগরী,
জল-কেলি-আশে যেন উপকুলোপরি,
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে,
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস-বদনে—
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্বকালে প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য নিকেতন।
অপূর্ব উদ্যান-রাজি নয়ন রঞ্জন
যেন ব্রজে বনমালি-কেলি-কুঞ্জবন।
নবীন নবীন তরুপল্লব শ্যামল,
নগর-নগরী শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়
মুকুতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়।"

আধুনিক চুঁচুড়া সহর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই স্থান একটি সামান্য পল্লী ছিল এবং এতদ অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজকার্যাদি সপ্তগ্রাম হইতেই নির্বাহ হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট্ আকবরের রাজস্বসচিব তোডরমল্ল বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব নির্ধারণকল্পে সুবা বাঙ্গলাকে কয়েকটী সরকারে এবং উক্ত সরকারগুলিকে আবার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত করেন। সেই বিভক্ত পরগণা বা মহালের বিবরণ ১৫৮ পৃষ্ঠায় এবং রাজা তোডরমল্লের জীবনী ১৬৩ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই স্থান তৎকালে 'সরকার সাতগাঁও'এর অন্তর্গত 'আরসা' * পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 'কুলিহাণ্ডা' বলিয়া এই স্থানটি পরিচিত ছিল। বহু প্রাচীন দলিলাদিতে 'কুলিহাণ্ডা' নামটি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়; পরবর্তী কালে কুলিহাণ্ডা 'ধরমপুরে' পরিণত হয় এবং হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চার নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে 'ধর্মপুর' বলিয়া একটি পল্লী এখনও বর্তমান আছে। এই পল্লীর মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় বিশ হাত উচ্চ একটি প্রাচীন সমাধি আছে এবং 'বিবির-গোর্' বলিয়া উহা বর্তমানে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই এই স্থানের প্রাচীনতম স্মৃতিচিহ্ন।

চুঁচুড়ার ঘণ্টাঘাটও ওলন্দাজ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ১৭২৫ খৃঃ নৃসিংহ দাস এই ঘাটটি তৈরী করিয়াছিলেন। এই ঘাটের একপাশে হুগলী মহসীন কলেজ আর অন্য পাশে ওলন্দাজ চ্যাপেল বর্তমানে যাহা হুগলী কলেজের বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটারির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। চ্যাপেলের ঘণ্টার সংগে তাই ঘাটটিও ঘণ্টাঘাট বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। আজ চ্যাপেলও নাই—ঘণ্টাও নাই কিন্তু ঘণ্টাঘাট নামটি প্রচলিত প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদটি এইঃ

কে বলেরে জটাইবুড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবন।
ঘণ্টাঘাটের গির্জে দেখে বলে গিরি গোবর্ধন॥

চুঁচুড়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলিয়াছিলেন যে, 'ক্ষুদ্র' হইতে চুঁচুড়া নাম আসিয়াছে, কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ওলন্দাজগণ এই নাম দিয়াছিল, কিন্তু কেন এবং ইহার অর্থ যে কি তাহার কোন পূর্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না। চুঁচুড়া পোর্তুগীজ শব্দ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে বলেনঃ "আমরা ক্ষুদ্র। চুঁচুড়া শব্দের অর্থই ক্ষুদ্র। শব্দের অর্থই বা কেন বলি? ক্ষুদ্র শব্দের রূপান্তরই 'চুঁচুড়া'। ক্ষুদ্র, ছুটর, ছটরা, ছোট, ছোকরা, ছুকরী, খুচর, খুচরা, করচা, চুঁচুড়া, কুর্চা, কচি এই সকল পদই ক্ষুদ্র শব্দজাত। আমরা ক্ষুদ্র"

ইংরাজদিগের বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিবার বহু পূর্বে ওলন্দাজগণ এই দেশে বাণিজ্য করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহারা যে সময় চুঁচুড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই সময় ফরাসীগণ চন্দননগরে ছিল; দুইটি স্থান পাশাপাশি বলিয়া সীমা নির্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা একটি খাল খনন করিয়াছিলেন। এই সীমানা 'ফরাসীগড়' বলিয়া অদ্যাপি অভিহিত হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পোর্তুগীজগণ মুঘল হস্তে বিধ্বস্ত হইলে ওলন্দাজগণ এদেশের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা বণিকরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজদের শাসনক্ষমতা অর্জন করিতে দেখিয়া তাহারও সেদিকে মনোযোগ দেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাজাহান ওলন্দাজদিগকে চুঁচুড়ায় কুঠী নির্মাণের সনন্দ প্রদান করেন।

* সেওড়াফুলি হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত সেকালে আর্বা পরগণা বলিয়া খ্যাত ছিল।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সাজাহানের নিকট হইতে ও ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গ-জেবের নিকট হইতে ওলন্দাজগণ আরও দুইখানি সনন্দ বা 'ফরমান' পাইয়াছিলেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার একজন সামান্য ভূম্যাধিকারী শোভা সিংহ বর্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত সামান্য বিবাদ উপলক্ষ করিয়া বর্ধমান আক্রমণ এবং বাঙ্গালায় মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং বর্ধমানের রাজপ্রাসাদ অধিকারপূর্বক বিদ্রোহীরা রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করেন।* কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎরাম রায় কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁন এই সময় বাঙ্গলার নবাব এবং নুরউল্লা খাঁ হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের 'ফৌজদার' ছিলেন। বিদ্রোহীগণের উপদ্রবে বঙ্গদেশে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ফৌজদার নুরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি সহস্র সৈনিকের অধিনায়ক হইলেও কৃষি বাণিজ্যাদি অন্যান্য অর্থকর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় সৈন্যচালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, নবাবের হুকুম পাইয়া তিনি হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ফিল্ড সাহেব 'ফৌজদার' কথাটির যে অর্থ করিয়াছেন তাহা এই:

The Fouzdar was the Chief Police Officer and Judge of all crimes not capital.

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইউরোপীয় ব্যবসায়িবৃন্দ তাঁহা-দিগের উপনিবেশ ও বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি নবাবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং সেই সুযোগে চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণ 'ফোর্ট গ্যাস্টভস্' দুর্গ নির্মাণ করিলেন। নবাবের নিকট হইতে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পাইবার পূর্বেই ওলন্দাজ-গণ প্রাচীর দিয়া চুঁচুড়াকে সুরক্ষিত করিয়াছিল। কারণ ওলন্দাজ দুর্গের উত্তরদিকে "১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ" এবং দক্ষিণ দিকের ফটকে "১৬৮২ খৃষ্টাব্দ" এই সাল দুইটি লিখিত ছিল। উক্ত দুর্গ ঘণ্টাঘাট হইতে ব্যারাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া পূর্বোক্ত দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। দুর্গের উত্তরদিকের ফটকে "ও-ভি-সি ১৬৮৭" অঙ্কিত প্রস্তর ফলকখানি কমিশনার মহোদয়ের ভবনে রক্ষিত আছে। O. V. C. ইহার অর্থ Ostindiche Vereenigde Companie (United East India Company).

যাহা হউক, ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শত্রুর আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হুগলী-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অতঃপর দুর্গমধ্যে থাকা নিরাপদ নহে বলিয়া তিনি ফকিরের বেশে পলায়ন করেন এবং হুগলী শোভা সিংহের হস্তগত হয়। পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সহায়তায় হুগলী পুনরুদ্ধার করেন এবং বিদ্রোহীগণ সপ্তগ্রামে পলায়ন করে। বর্ধমান রাজ-পরিবারের যে সকল ব্যক্তি বন্দী

* বর্ধমানে রাজা কৃষ্ণরামের নামানুসারে "কৃষ্ণসায়র" নামে বৃহৎ একটি পুষ্করিণী আছে।

হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজার এক সুন্দরী কন্যাও ছিলেন। শোভাসিংহ তাহাকে বলপূর্বক অঙ্কশায়িনী করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি শাণিত ছুরিকার দ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়া পরে নিজেও 'কলঙ্কিনীর দেহ বহন করিব না' বলিয়া আত্মহত্যা করেন।

শোভাসিংহ বর্ধমান জয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ হুগলী জেলার অন্তর্গত মান্দারণ নামক স্থানে যে হজরৎ ইসমাইলের দরগা আছে তাহা নির্মাণ করিয়া দেন। শোভা সিংহের বীরত্বের কাহিনী পরে বিবৃত হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় যে-সমস্ত স্থান ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল তাহা হইতে তের হাজার একশত বাইশ টাকা (১৩,১২২৲) তাহাদের রাজস্ব আদায় হইত। বাস্তুভিটার উপর তাহারা বিঘা প্রতি সাড়ে বাইশ টাকা খাজনা আদায় করিত এবং চুঁচুড়ায় তৎকালে বাস্তু-ভিটার পরিমাণ ছয়শত আটান্ন বিঘা ছিল। মোগলদের নিকট হইতে চুঁচুড়া ওলন্দাজদের অধিকারে আসিবার পর, তাহারা খাজনার হার কিছু বৃদ্ধি করে নাই, তবে নষ্ট জমি বা জমি হস্তান্তর করিবার সময় তাহারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য খাজনা আদায় করিত। চুঁচুড়ার কোষাধ্যক্ষ মিঃ হার্কলোটো ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর কালেক্টার সাহেবকে বলেন যে, তিনি বিগত চল্লিশ বৎসরের ওলন্দাজের দলিলগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক জমির খাজনা তখনও যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপ আছে। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন ওলন্দাজদের চুঁচুড়া ও বরাহনগর কুঠী পরিদর্শন করেন বরাহনগর কুঠীকে তিনি দুর্নীতির আকর "School of debauchery" বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু চুঁচুড়ার সুখ্যাতি করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ্য:

About half a league further up is the Chinchura where the Dutch Emporium stands. It is a large Factory, walled high with brick, and the Factors have great many good houses standing pleasantly on the river side and all of them have pretty gardens to their houses. (১)

ওলন্দাজদের সময় একুশ ইঞ্চি মাপে সাধারণতঃ এক হাত ধরা হইত; কিন্তু ইংরাজী মাপে আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত হয়। জন ডিক্‌স নামক একজন ওলন্দাজের হাতের মাপে জমি মাপা হইত এবং তাহার হাত একুশ ইঞ্চি লম্বা ছিল। চুরাশী ইঞ্চি লম্বা একটি লাঠির দ্বারা জমি মাপা হইত এবং উক্ত লাঠিটী চারি ভাগে ভাগ করা ছিল। পরে উক্ত লাঠিটী তিন ইঞ্চি কমাইয়া দেওয়া হয় এবং লাঠিটীর মাপ সাড়ে চার হাত দাঁড়ায়; এই মাপকে 'রাইনল্যাণ্ড' মাপ বলা হইত। ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ওলন্দাজদিগের প্রদত্ত পাট্টা পরিবর্তন করিয়া আঠারো ইঞ্চি হিসাবে মাপিতে আরম্ভ করেন কিন্তু চুঁচুড়ার শীল-বংশ উক্ত পরিবর্তনে বিশেষ আপত্তি জ্ঞাপন করেন। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উক্ত পরিবর্তন করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং হুগলীর কালেক্টার মিঃ এইচ, বেলী কর্তৃক তিনি এই কার্যে নিযুক্ত হন।

ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া উপনিবেশ ব্যাটাভিয়ার অধীন ছিল এবং চুঁচুড়ায় কোন পদ

শূন্য হইলে ব্যাটেভিয়া হইতে উক্ত স্থানে কর্মচারী নিয়োগ হইত। একজন গভর্ণর ও সাতজন কাউন্সিলের সদস্যের উপর চুঁচুড়া-উপনিবেশ পরিচালনের ভার ছিল। উক্ত সাতজন সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন সদস্য ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন; বাকী দুইজন সদস্য ভোট দিতে না পারিলেও চুঁচুড়ার গভর্ণরকে মন্ত্রণা দিতে পারিতেন। ওলন্দাজ গভর্ণরগণ বিলাসিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকা তাঁহারা সংসার-খরচ করিতেন। চুঁচুড়া গভর্ণরের "তাঞ্জাম" একমাত্র গভর্ণর ব্যতীত আর কাহারও ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না। গভর্ণর যে সময় নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন সেই সময় বাদ্য-করগণ বাজনা বাজাইয়া অগ্রে যাইত। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্ণর কর্তৃক টানা-পাখার প্রথম প্রচলন এই দেশে হইয়াছিল এবং বড় বড় তালপাতার পাখাও তাহারা প্রথম ব্যবহার করিত। তৎকালে কাঁচের শার্সির প্রচলন না থাকিলেও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের বাড়ীতে বেতের জাফ্রি লাগান হইত। ওলন্দাজ গভর্ণরদের মধ্যে ভার্লেট, ভিনসেন্ট, সিট্যারম্যান, ওভারব্রিকের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ওলন্দাজদিগের প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়া গীর্জার মধ্যে বহু গভর্ণর এবং তাহাদের সহধর্মিণীদের তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল। ওলন্দাজ কাউন্সিলের সাতজন সদস্যের উপর চুঁচুড়া পরিচালনের ভার ন্যস্ত ছিল। তন্মধ্যে একজনের উপর বিচার ও শাসনের ভার ছিল, তিনি জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল এবং বেত্রাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া জেল ও ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি ধনী ব্যক্তি-গণকে জরিমানা করিতে পারিতেন। এতদ্ভিন্ন নগরাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি আরও কয়েকটী উচ্চ পদ ছিল। জমি হস্তান্তর করিবার জন্য ওলন্দাজদিগের দুইটি আদালত ছিল; একটি দেশীয় বা জমিদারী আদালত এবং আর একটি ইউরোপীয় আদালত।

ইংরাজদিগের সহিত ওলন্দাজদিগের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং ইংরাজগণ ওলন্দাজ-রমণীদের সহিত নৃত্য-গীত করিবার জন্য চুঁচুড়ায় প্রায়ই যাইতেন। প্রথম ইংরাজ গভর্ণর উইলিয়ম হেজ ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে আসিয়া ওলন্দাজ গভর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে হেজ সাহেবের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ গাইফোর্ডের মনোমালিন্য হইলে তিনি কিছুদিন চুঁচুড়ায় অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে তাহার ডাইরীতে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিলাম।

"I went to visit Dutch Direct or and give him thanks for his kindness in so readily in his quarters."

ওলন্দাজরা এই স্থান হইতে বহুবিধ জিনিষ ইউরোপে চালান দিয়া ধনৈশ্বর্য্যে ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে তাহারাই প্রধান হইয়াছিল। তন্মধ্যে জাভায় অহিফেন রপ্তানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওলন্দাজগণ পাটনা হইতে অহিফেন কিনিয়া জাভায় উহা চালান দিয়া বৎসরে চারলক্ষ টাকা লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত বাগানে তাহাদের বিশেষ সখ ছিল এবং কড়াইশুঁটির চাষ তাহারাই এই স্থানে প্রথম করিয়াছিল। 'ওলন্দাশুঁটি' নামক কড়াই আজও তাহাদের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। চুঁচুড়াতে তাহারা এত শাক-সব্জীর বাগান করিয়াছিল যে, শাক-সব্জী বিদেশে রপ্তানী করিয়া তাহারা বহু অর্থ লাভ করিত।

॥ সরস্বতী তীরে যুদ্ধ ॥

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ জয়লাভ করিয়া মিরজাফরকে বাঙগলার নবাব করেন কিন্তু তাহার শাসনকালে বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা বিরাজ করে। একদিকে ইংরাজের প্রভুত্ব ও অন্যদিকে মীরকাশিমের ষড়যন্ত্রে মীরজাফর আর একটি ইউরোপীয় জাতিকে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে সচেষ্ট হন। ওলন্দাজগণ এতদিন ব্যবসা লইয়াই ব্যস্ত ছিল কিন্তু [illegible] সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে তাহারাও রাজ্যস্থাপনে উদ্যোগী হয়। ব্যাটাভিয়া হইতে ওলন্দাজগণ সাতখানি রণতরী আনাইল, উহার তিনখানি জাহাজে ছত্রিশটি করিয়া কামান, আর তিনখানিতে ছাব্বিশটি করিয়া কামান এবং একখানি জাহাজে ষোলটি কামান বসান ছিল। এ ছাড়া ঐ সমস্ত জাহাজগুলিতে দেড় হাজার ওলন্দাজ সৈন্য ছিল। তাহারা বাহিরে প্রকাশ করিল যে, জাহাজগুলি করমন্ডল উপকূলে যাইবে, কোন বিশেষ কারণে কেবল একবার চুঁচুড়ায় থামিবে। ক্লাইভ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি অবশ্য যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করেন নাই, তথাপি ইংরাজদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার জন্য যে, জাহাজগুলি আসিয়াছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়া কর্ণেল ফোর্ডকে উক্ত নৌবহর ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। ফোর্ড লিখিত আদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইভ তখন তাস খেলিতেছিলেন। তাস খেলিতে খেলিতে লিখিলেন "প্রিয় ফোর্ড, অবিলম্বে যুদ্ধ কর। কৌন্সিলের আদেশ কাল পাঠাইব।" সরস্বতী তীরে বিদেড়া* ক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণেল ফোর্ড ওলন্দাজদিগকে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদের যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা অংকুরেই বিনাশ হইল। ম্যালিসন্ এই যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

The action was short, bloody and decisive. In half an hour the enemy were completely defeated. The loss of the English on this occasion was comparitively trifling. (২)

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা একবার চুঁচুড়া দখল করেন এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উহা প্রত্যর্পণ করেন। পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই ইংরাজগণ পুনরায় চুঁচুড়া অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর উহা প্রত্যর্পণ করেন। এই বাইশ বৎসর মিঃ আর ব্রিচ চুঁচুড়ার কমিশনার রূপে কার্য করেন। উক্ত সময় তিনি ইংরাজদিগকে ৮৪৭৲ টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া দিতেন। ওলন্দাজগণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইলেও 'ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' [illegible] অসাধুতায় সমস্ত অর্থ কোম্পানীর নিকট পৌঁছাইত না। ওলন্দাজ কর্মচারিবৃন্দের অসাধুতার জন্য হল্যান্ডের রাজা চুঁচুড়া ইংরাজগণকে ছাড়িয়া দেন। ইংরাজদিগেরও সমমাত্রায় লোকসান হইতেছিল বলিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং উক্ত সন্ধির সর্তানুযায়ী ওলন্দাজদিগের একশত আশী বৎসরের উপনিবেশ চুঁচুড়া সহর ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। উপরোক্ত সন্ধি অনুযায়ী ওলন্দাজ-

* বিদেড়া চন্দননগরের নিকট 'ব্যাজড়া' গ্রাম।

গণ ইংরাজদের নিকট হইতে সুমাত্রা দ্বীপ ও ফোর্ট মার্লবো প্রাপ্ত হয় এবং ইংরাজগণ চুঁচুড়া, মালকাপুর, পলতা, বালেশ্বর এবং মালাক্কা দ্বীপ প্রাপ্ত হয়। এই হস্তান্তর সম্বন্ধে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের "সমাচার-দর্পণে"র সংবাদটি এইরূপঃ

ইংরাজের হস্তে চুঁচুড়া সমর্পণ। "৭ই মে চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুক্ত বেলাই সাহেব ও শ্রীযুক্ত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তৎকর্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ দিন অতি প্রত্যূষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ সহরের বড় সাহেব শ্রীযুক্ত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলাণ্ডীয় অধিপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজপত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগ পর্যন্ত উঠিত যে হলাণ্ডীয় নিশান, সে নিশান নীচে নামান গেল। তখন ইংলণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে, এই স্থান এতদিন পর্যন্ত হলাণ্ডীয়দের অধিকার ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলাণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংলণ্ডীয় পতাকা উড্ডীয়মান হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।"

ওলন্দাজগণ খুব মিশুক ছিলেন এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহারা খুবই মেলামেশা করিতেন। বহু ওলন্দাজ বঙ্গ-মহিলা বিবাহ করিয়া চুঁচুড়ায় বহু বৎসর যাবত বসবাস করেন। তাহাদের বংশধরগণ হুগলীর কালেক্টরের নিকট হইতে পেন্সেন প্রাপ্ত হইতেন। চুঁচুড়ার হিন্দুদিগের প্রাচীন বিগ্রহ ষণ্ডেশ্বর জীউর যে পিতলের দুইটি ঢাক অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ওলন্দাজ গভর্ণর করিয়া দিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ ইংরাজদিগকে চুঁচুড়া অর্পণ করিলেও, ওলন্দাজ গভর্ণর ওভারব্রিক এবং আটজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাহাদের মাহিনার এক-তৃতীয়াংশ পেন্সন পাইতেন। প্রথমে পামার এণ্ড কোম্পানী পেন্সনের টাকা দিতেন; পরে হুগলীর কালেক্টার উক্ত পেন্সন দিতেন।

॥ চুঁচুড়া ব্যারাক ॥

ইংরাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ কর্তৃক নির্মিত "ফোর্ট গ্যাস্‌টোভস্" দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং উক্ত দুর্গের কড়ি, বরগা প্রভৃতি লইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদের জন্য ব্যারাক নির্মাণ করেন। এই ব্যারাক নির্মাণ করিবার জন্য ইংরাজগণ বহু প্রজার বাস উচ্ছেদ করেন এবং সেইজন্য তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। এই দীর্ঘ অট্টালিকার মধ্যে এক হাজার ব্যক্তির থাকিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। ইহাই বঙ্গদেশের দীর্ঘতম অট্টালিকা এবং প্রত্যেক তলায় ৬৫টী করিয়া বৃহৎ খিলান আছে। ব্যারাক নির্মাণের পূর্বে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবরের "সমাচার দর্পণে" এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিলঃ

"চুঁচুড়া—সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, চুঁচুড়া ইংলণ্ডীয়দের হস্তগত হইয়াছে। সম্প্রতি শুনা গেল যে, শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর সেখানকার প্রজাদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।"

এই অট্টালিকার দ্বিতলে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় নিম্নোক্ত লিপিগুলি খোদিত আছেঃ

"This Barracks were commenced December 1829. The foundation and plinth of the whole and superstructure of the lower storey west wing by Lt. J. A. Crommelin, Executive Engineer, the remainder of the structure and entire finishing by Captain Won Bell of Artillary Ex. Officer."

বঙ্গভাষায় লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত কা বেল সাহেবের দ্বারায় নুমর্তাসিদ্ধ শ্রীরামহরি সরকার, সাং চক্রবেড়ে এবং শ্রীসেখ তনু দফাদার, সাং চক্রবেড়ে, ইং সন ১৮২৯ বাঃ সন ১২৩৬।"

বহু প্রজা উচ্ছেদ এবং বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্যদের জন্য এই ব্যারাক নির্মিত হইলেও লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক এই স্থান হইতে ব্যয়সঙ্কোচ করিবার অজুহাতে সৈন্য স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জঙ্গী-লাট তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে বিলাতে এই ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য যায়। বিলাত হইতে সৈন্য স্থানান্তর করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং চুঁচুড়ার যাবতীয় সৈন্য কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং ব্যারাক খালি পড়িয়া থাকে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যারাকে ইংরাজ সৈন্য থাকিত। চুঁচুড়া হইতে গোরা সৈন্য স্থানান্তরে লইয়া যাইবার কারণ এই যে সেই সময় গোরা সৈন্যের অত্যাচারে চুঁচুড়া ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ ভীষণভাবে জর্জরিত হইয়াছিল। সেই জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৯ মার্চ মিউনিসিপ্যাল কমিটির সম্পাদক গোরা সৈন্যের অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গোরা সৈন্য ব্যারাক হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এবং চুঁচুড়ার অধিবাসিগণ নিশ্চিন্ত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের অফিস এবং হুগলী হইতে আদালতসমূহ উক্ত ব্যারাকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভাগীয় কমিশনার রূপে মন্ট্রেসর, আলেকজান্ডার, টয়েনবি, রমেশচন্দ্র দত্ত, বোর্ডিলন, বাকল্যান্ড, উইলিয়মস্, কেনেডি, ফলন্ডার, কাস্টেয়ার্স প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যনাথ ধামে কাস্টেয়ার্স সাহেবের উদ্যোগে "কাস্টেয়ার্স টাউন" স্থাপিত হয়।

॥ প্রাচীন গীর্জা ॥

চুঁচুড়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা হিসাবে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত আরমেনিয়ানদের গীর্জাটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টানদিগের উপাসনা করিবার ইহা বঙ্গদেশের মধ্যে দ্বিতীয় গীর্জা বলিয়া প্রসিদ্ধ। খোজা যোয়ানিজের পুত্র মার্গার এই গীর্জার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহার ভ্রাতা জোসেফ কর্তৃক ইহা সমাপ্ত হয়। প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী এই স্থানে আরমেনিয়ানগণ 'জন্-দি-ব্যাপ্টিস্টে'র স্মরণার্থে উপাসনা করিয়া থাকেন। মার্গার-বংশের কয়েকটি প্রাচীন সমাধি এই গীর্জার প্রাঙ্গণে আছে। এই প্রাচীন গীর্জা সম্বন্ধে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখের "সমাচার-দর্পণে" যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ

গির্জা—"মোং চুঁচুড়াতে এক আরমানী গীর্জাঘর আছে, সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রাতা ১৬৯৬ সালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গির্জাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না, তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবি বেগরাম ঐ গীর্জাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন ওলন্দাজ গভর্ণর মিঃ জি, ভারনেট কর্তৃক নির্মিত গঙ্গার ধারে একটি ওলন্দাজদিগের গির্জা আছে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে সিটারমান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি গতাসু হইলে মিঃ ভারনেট ইহা সমাপ্ত করেন। ইহার মধ্যে বহু ওলন্দাজ গভর্ণর ও তাহাদের সহধর্মিণীর তৈলচিত্র রক্ষিত ছিল। চুঁচুড়ার গির্জাটি ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের দান। চ্যাপেল স্থাপিত হইলেও এই স্থানে কয়েক বৎসর পর্যন্ত কোন ধর্মযাজক ছিল না, কারণ তাহারা ধর্ম লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইত না। সিটারম্যান গির্জার চূড়া ও ঘন্টাঘড়ি (চিম ক্লক) স্থাপন করেন। এই ঘণ্টাঘড়ি হইতে ইহার পাশে গঙ্গার ঘাট "ঘণ্টাঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যে প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়, তাহাতে গীর্জার চূড়া ও ঘন্টাঘড়ি পড়িয়া যায়। এই প্রাচীন গীর্জা সম্বন্ধে List of Ancient Monuments In Bengal নামক সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

"Chinsurah Church—Dutch now English Church. This Church was erected in A. D. in 1763 by G. Vernet, then attached Governor entirely out of his own means. The steeple had been previously constructed by Mr. Schittermann in 1744 who was Governor at that time. Hung around the inside of the Church are the portraits of some of the Dutch Governors and their wives."

এই চ্যাপেলটিতে কয়েকটি স্মৃতিফলক আছে। গভর্ণর সিটারম্যান সম্বন্ধে লেখাটি এই রকমঃ

GE BOVWD DOOR
J. A. SICHTERMANN
RAAD EXTRAORDINAR
VAN NEDERLANDS
INDIA EN DIRECTEVR
DISER BENGALSI
DIRECTINE ANNO 1742.

যা ছিল ধর্মমন্দির, আজ ইতিহাসের ভাগ্যচক্রে হইয়াছে বিদ্যামন্দির। এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন যে, পূর্ত বিভাগ তাহাদের চূণ বালির পলেস্তারায় অন্যান্য স্মৃতি ফলকগুলি আর পড়া যায় না। এখানে ওলন্দাজ গভর্নরদের অনেক আলেখ্য ছিল; সেগুলি যে কোথায় তাহার সন্ধান মেলে না। তবে এটা লক্ষণীয় যে, সিটারম্যানের যে স্মৃতিফলক আছে, তার তারিখ Anno 1742 সুস্পষ্ট। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে এই সালটি "১৭৪৪" বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা ভুল।

চুঁচুড়ায় রোমান-ক্যাথোলিকদের আর একটি গীর্জা আছে; ইহা সেবেস্তানা সাউ নামক এক মহিলার অর্থে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ইংরাজদিগের হস্তে আসিলে চুঁচুড়ার গীর্জাগুলি ও দুইটি সমাধিক্ষেত্র কলিকাতার লর্ড বিশপের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং ওলন্দাজগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে যে চারিখানি 'ফরমান' পাইয়াছিল তাহাও 'প্রেসিডেন্সী কমিটি অফ রেকর্ডে'র অফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চতুর্থ 'ফরমান' খানি ওলন্দাজগণ ১৭১১ খৃষ্টাব্দে পাইয়াছিল। অন্যান্য তিনখানির বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

ওলন্দাজদের শাসনকালে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে "হুগলী মহসীন কলেজের" ভবন নির্মিত হইয়াছিল; মঁসিয়ে পেরন্ নামক একজন ফরাসী সামান্য সৈনিকরূপে বঙ্গদেশে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন এবং মহারাষ্ট্রীদের কার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জন পূর্বক উক্ত সুবৃহৎ ভবনটি নির্মাণ করেন। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হুগলী কলেজ আলোচনাকালে বিবৃত হইয়াছে। এই বাটী নির্মাণের কিছুদিন পরেই তিনি ইউরোপে যাত্রা করেন এবং প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামক চুঁচুড়ার একজন বিলাসী ধনী জমিদার ইহা ক্রয় করিয়া তাঁহার বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। এই বাটীর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যে বৃহৎ ভবনটি বর্তমানে হুগলী মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্র নিবাসরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা পূর্বোক্ত হালদার মহাশয়ের পূজার বাড়ী ছিল এবং পঞ্চ খিলানবিশিষ্ট বৃহৎ দুর্গা-পূজার দালানটি অদ্যাপি এই স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তি এ অঞ্চলে তৎকালে কেহ ছিল না। ওলন্দাজগণ তাই তাহার প্রাসাদোপম বাড়ীর সম্মুখে ছয়জন সিপাহী রাখিবার অনুমতি দেন। পেরন সাহেবের বিষয় ৩৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তের হাজার টাকা দিয়া ত্রিবেণীতে সরস্বতী নদীর উপর একটি পুল নির্মাণ করাইয়া দেন। এই পুল সম্বন্ধে শম্ভুচন্দ্র দে লিখিয়াছেনঃ

In 1828 the well known Zamindar Babu Pran Krishna Haldar made a gift of Rs. 13000 for a masonary bridge over the river Saraswati at Tribeni." (৩)

তৎপর এই ভবন চুঁচুড়ার জগমোহন শীল ক্রয় করেন এবং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিশ হাজার টাকায় এই ভবনটি হুগলী মহসীন কলেজের জন্য ক্রয় করা হয় এবং উক্ত বৎসরের ১লা আগষ্ট তারিখে মহসীন কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। চুঁচুড়ার উক্ত হালদার বংশে বাবু নীলমণি হালদার এবং বহুভাষাবিদ সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার জন্মগ্রহণ করেন। নীলরত্ন হালদার কলিকাতা হইতে "বঙ্গদূত" নামক সপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করিতেন এবং এই পত্রিকাখানি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইঃ "বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ

ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্টবোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন। (৪)

বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক পুস্তকে ১ম খণ্ডে (২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৯) লিখিত আছে।

চুঁচুড়ায় 'হুগলী মহসীন কলেজ' বঙ্গদেশের একটি গৌরব, বঙ্গের প্রাচীনতম কলেজগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। হাজি মহম্মদ মহসীনর 'ফণ্ড' হইতে এই কলেজ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে খোলা হয় এবং ডক্টর টমাস, এ, ওয়াইজ নামক হুগলীর সিভিল সার্জেন এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথম এই কলেজের নাম "কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন" ছিল এবং প্রত্যেক ছাত্র জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিনা বেতনে এই কলেজে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। স্কুল ও কলেজ একই বাড়ীতে হইত এবং পরস্পর সংস্পর্শযুক্ত ছিল। তখন এন্ট্রান্স বা বি-এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয় নাই বলিয়া ছাত্রেরা জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দিত। তৎকালে এই কলেজের ইংরাজী বিভাগ কলেজ এবং কলেজিয়েট স্কুল এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। সিনিয়ার ডিভিসান সেকশ্যান 'এ' এবং জুনিয়ার ডিভিসনে সেকশ্যান 'বি' তন্মধ্যে সিনিয়ার ডিভিসানে তিনটি শ্রেণী ও জুনিয়ার ডিভিসানে চারিটি শ্রেণী ছিল।(৫)

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন' বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার প্রথা এই কলেজ হইতে তুলিয়া দেন এবং সিনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের তিন টাকা এবং জুনিয়ার বিভাগের ছাত্রদের দুই টাকা বেতন ধার্য হয়। অক্ষম ও দরিদ্র ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। কিন্তু শিক্ষকগণকে লইয়া একটি কমিটি উক্ত ছাত্রগণ বেতন দিতে অক্ষম কি না তাহা নির্ধারণ করিতেন। এই সময় হইতে এই কলেজের নাম "হুগলী কলেজ" বলিয়া অভিহিত হয়। হুগলী কলেজের বিবরণ ৩৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার ১ম জরিপ-কার্য (Trigonometrical Survey) অলিভার কর্তৃক আরম্ভ হইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়; উক্ত জরিপকার্যের জন্য এই কলেজের সুপ্রশস্ত ছাদ নির্বাচিত হইয়াছিল।(৬) জেলার অধিবাসিগণ গভর্ণমেন্টের জরিপ করার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারায় বিশেষভাবে বাধা প্রদান করে। জরিপে নিযুক্ত লোকজনকে সেইজন্য খুব কষ্ট পাইতে হয় এবং জরিপ শেষ হইতে অযথা বিলম্ব হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতর প্রথম গ্র্যাজুয়েট* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কলেজে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। চুঁচুড়ার অপর তীরস্থ কাঁটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখো গ্রামে এবং তাঁহার প্রপিতামহ রামজীবন চট্টোপাধ্যায় মাতুলের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "সঞ্জীবনী-সুধায়" লিখিয়াছেনঃ

"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণী ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব পুরুষ।

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যদুনাথ বসুও প্রথম বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যদুনাথের বিষয় ৩৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

গঙ্গানন্দের ঊর্দ্ধতন অষ্টমপুরুষ সর্ব্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়-ও 'অবসথ' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 'অবসথী' আখ্যা পান।

নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানে কল্প মহীরুহঃ।
অবসীথি বিখ্যাতো যস্যাবসথ্যং পালনাৎ॥

॥ লীলাবতী নাট্যাভিনয় ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন চুঁচুড়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে এই স্থানে বসিয়া তিনি 'আনন্দমঠ' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় এক সখের নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল এবং দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটক ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা চুঁচুড়ায় অভিনয় করেন।

এই সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত "বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্তে" লিখিয়াছেনঃ

"লীলাবতী মহলায় গিরিশচন্দ্র নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে প্রথমে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন সংবাদ আসিল দেশমান্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে চুঁচুড়ায় এক নাট্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়া 'লীলাবতী' মহলা দেওয়া হইতেছে, তখন, অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "চুঁচুড়ার দলের কাছে হেরে যাবো, আর তুমি বসে তাই দেখবে?" গিরিশ অগত্যা অভিনয়ে যোগদান করিয়া ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বয়ং গ্রন্থকার লীলাবতীর অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন; অভিনয় দেখিয়া দীনবন্ধু নিজে গিরিশবাবুকে শ্রদ্ধার সহিত সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার কবিতা যে এমন করে পড়া যায় তা আমি জানতাম না, আপনি Please take this compliment at least; অভিনেতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, এইবার চিঠি লিখবো—দুয়ো বঙ্কিম।"

১৮৭২, ৩০-এ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির উদ্যোগে চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটে মল্লিক-বাড়ীতে "লীলাবতী" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ১৮৭২, ৫ই এপ্রিল (শুক্রবার) তারিখের "এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহে" এই অভিনয় সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি এইরূপঃ

বিগত শনিবারে চুঁচুড়া শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটস্থ মল্লিক-বাটীতে বাবু দীননাথ মিত্র প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বাড়ীটী অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া মহা কোলাহল হইয়াছিল। অনেক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া রাত্রি শেষ করিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও এবং সুচারুরূপে দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

রাত্রি সার্দ্ধদশ ঘটিকার সময় পূর্বোক্ত নাটকাভিনয় কার্য আরম্ভ হইল। ঐক্যতান বাদ্যকরেরা আপনাপন যন্ত্রে সুর মিলাইয়া বাজনা আরম্ভ করিল। বাদ্য শুনিয়া দর্শকবৃন্দের অন্তরে বিকটভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলেই বিদ্রূপ করিতে লাগিল।... দৃশ্যগুলি বড় মন্দ হয় নাই। কস্যাচিৎ দর্শকস্য। শ্রীঃ—হুগলী ঘুটিয়াবাজার। ২২শে চৈত্র, ১২৭৮।

১৮৭২, ৪ঠা এপ্রিল তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' অভিনয়ের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইলঃ

চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।...অভিনয়টি অতি সুচারুপূর্বক হইয়াছিল। আমরা নাটকটির অভিনয় দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটি।

অক্ষয়কুমার সরকার চুঁচুড়ার অভিনয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে এই অভিনয়ের একটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেটি উদ্ধৃত না করিলে চুঁচুড়ার অভিনয়ের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

পিতা যখন যশোহরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়,...। পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে আরও দুই-চারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সহিত সাহিত্যের বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখযোগ্য; দীনবন্ধু বাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয়, বঙ্কিম বাবুতে আমাতে লীলাবতী একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিমবাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving scene প্রলাপ-দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুক্‌রা টুক্‌রা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।" এই অভিনয়-রঙ্গে ৭/৮টি গান ছিল; দুই একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীব বাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটি আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

"আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অংকুরে তাহার।
যত পেলে আঁখিজল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা ভরে—তরুমরে কে করে বিহিত তার?"

বোধকরি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের গুড্‌ফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক-বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি ভাটপাড়া হইতে ভট্টাচার্যগণ, কাঁঠালপাড়া হইতে সঞ্জীববাবুপ্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের

মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি শূরবীর রথীগণ শ্রোতা। বঙ্কিমবাবু গুডফ্রাইডের ছুটী পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।

খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটারে "কীর্তন" প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাঁটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম।—

"কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুণু বাজে তোরা শোন গো সবাই।"

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউন্ড-শিলিং-পেন্স গণনায় যাপিতজীবন মহারাজকে সকলে কঠোরপ্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধু বাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। ভাট-পাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধুলা লইয়া, মহা আনন্দে মহা আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন 'যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম্।' সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়াঃ

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে যাব জল।
কোথা গো লবঙ্গলতা, কোথা গো উর্বশী কোথা,
ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝমঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সে দিনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রস্পিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাথ মামা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন; তিনি আমাদের অভিনয়ে সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শক্তিও বেশ ছিল। এখনও আছে।

পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পৌঁছান পত্রের সঙ্গে গান আসিল। পিতা গাড়ীতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তাল,—

"আজি কি সুখের উদয়
লীলার সঙ্গে ললিতের আজ দিলাম পরিণয়॥
দুখ-তম তিরহিল, সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো আনন্দ আলয়।

যদি সব সভা-জন, এই সুখে সুখী হন,
বুঝিব সফল শ্রম, সফল আশায়॥

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাত করিয়াছিলাম।

॥ কুলীন কুলসর্বস্ব নাট্যাভিনয় ॥

লীলাবতীর অভিনয়ের বহু পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত "কুলীনকুল সর্বস্ব" নামক বঙ্গদেশের প্রথম অভিনীত নাটক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে, চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের বাড়ীতে অভিনয় করা হয়। চুঁচুড়ায় এই নাটকের অভিনয়ে তৎকালে কুলীনদিগের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। হরিনাভির সুবিখ্যাত পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় কুলীনগণ বহুবিবাহে রত থাকায় সমাজে যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উক্ত নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রূপচাঁদ পক্ষী উক্ত নাটকের জন্য কয়েকখানি সংগীত রচনা করিয়া দেন।

"Rupchand Pakshee a noted musician of that time, composed songs for the occasion and sang them." (Calcutta Review)

'সংবাদ প্রভাকরে' (৯ই জুলাই ১৮৫৮, শুক্রবার) এই অভিনয় সম্বন্ধে প্রকাশঃ

বিগত শনিবার রজনীযোগে চুঁচুড়া নগরস্থ 'নরোত্তম পালের পুত্র শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ পাল মহাশয়ের ভবনে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় প্রদর্শন অতি সুচারুরূপে হইয়া গিয়াছে, এই উপলক্ষে প্রায় নয় শত দর্শক সমুপস্থিত হইয়া সভাকে শোভায়মান করিয়াছিলেন, যেরূপে অভিনয় প্রদর্শনের কার্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল তদ্দর্শনে দর্শক মাত্রেই আমোদী হইয়াছিলেন এবং নটগণের অঙ্গভঙ্গী ও বাক্য-কৌশল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন, বিশেষতঃ নবানুরাগি নটগণ এই প্রথমবারেই এতদ্ব্যাপায় এবম্প্রকার উত্তমরূপে সুসম্পন্ন করাতে অনেকেই মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগের প্রশংসিত কর্মের ঘোষণা করিতেছেন, এই নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুত বাবু প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল, ইনি সাতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সরকারে নাটকাভিনয়ের নিয়মিত কার্য ধার্যকরণ একটি সভা করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কর্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ চন্দ্র। সভাপতি—শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ লাহা। রঙ্গভূমির ব্যবস্থাপক—শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র দিচ্ছিত। সহকারী ব্যবস্থাপক—শ্রীযুত বাবু প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত বাবু নিমাইচরণ শীল।

অধিকন্তু কোনো বিশেষ কারণে সহকারী ব্যবস্থাপক অবসর গ্রহণ করাতে সভার অনুমত্যানুসারে শ্রীযুত বাবু বনমালী সোম তাঁহার সকল কর্তব্যকর্ম নিষ্পাদন করিয়াছেন, পরন্তু শুনিলাম আগামী রবিবার দিবসে আর একবার উক্ত নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইবেক। কস্যচিৎ চুঁচুড়া নিবাসী দর্শকস্য।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারও চুঁচুড়ায় 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হইল।...প্রসিদ্ধ গায়ক

এবং গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও ছিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে-বাজারে গীত হইতে লাগিল।—'আধনীরে গুণমনি পড়েছে কি মনে হে?' কৌলীন্য ও এই নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ ২৩০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

চুঁচুড়ায় কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণ কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন তাহা ১৫ই জুলাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রে প্রকাশিত নিম্নের সংবাদটি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

The acting of the Kulinkulsarvasa Natak at Chinsurah has, it appears given great offence to the Kulins of the locality. The Natak is an illexecuted burlesque. The acting took place in the house of a gentleman of the Baniya caste and Kulin Brahmins indeed, it is said, to retaliate in kind. (Hindu Patriot)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে আমরা জানিতে পারি, ১২৭৭ সালের "৩০-এ আশ্বিন [১৫ই অক্টোবর] শনিবার হুগলীর ঘুটিয়া বাজারের নবনির্মিত রঙ্গভূমিতে চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীলের বিরচিত চন্দ্রাবতী নাটকখানির প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে।"

॥ শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বর জীউ ॥

চুঁচুড়ার গ্রাম্যদেবতা 'শ্রীশ্রীষণ্ডেশ্বরজীউ' নামক মহাদেব বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং জাগ্রত দেবতা। ষোড়শ শতাব্দীতে দিগম্বর হালদার ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে গঙ্গার ধারে এই স্থানে বহু জঙ্গল ছিল; দিগম্বর হালদারের পুত্র উক্ত বিগ্রহের মন্দির নিম্মাণের সময় জঙ্গল কাটিতে কাটিতে একটি বাঘ দেখিতে পান এবং তিনি এরূপ শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন যে একাই ঐ বাঘটিকে মারিয়া ফেলেন। সেই জন্য বাগু হালদার বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্বে ষণ্ডেশ্বর জীউর কাঁচা মন্দির ছিল; সিদ্ধেশ্বর রায় চৌধুরী বর্তমান পাকাবাড়ী নিম্মাণ করিয়া দেন। ষণ্ডেশ্বরের দুইটি পিতলের ঢাক ওলন্দাজ গর্ভনর তৈয়ারী করিয়া দেন। এবং গঙ্গার ধারে 'ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাট' নীলাম্বর শীল নিম্মাণ করিয়া দেন। ষণ্ডেশ্বরের পূজার জন্য যে সমস্ত দেবোত্তর জমি আছে তাহা "হালদারল্যাণ্ড" বলিয়া অভিহিত। চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটে ষণ্ডেশ্বরজীউর প্রতিষ্ঠাতা হালদারবংশের বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। বালীর গঙ্গোপাধ্যায় বংশ ষণ্ডেশ্বরজীউর বর্তমান সেবায়েত।

'ষণ্ডেশ্বর জীউর' মন্দিরের পার্শ্বে একটি দুর্গা-মন্দির আছে, চুঁচুড়ার বল্লভ সোম ইহা নির্মাণ করেন। বর্তমানে মন্দিরের উপরে নিম্নলিখিত লেখাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীশ্রীশ্যামাপদারবিন্দ

ভক্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ সন ১২৫২ সাল—বৈশাখ।

চুঁচুড়ার গ্রাম্যদেবতা 'ষণ্ডেশ্বর (শিবঠাকুর)' চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে দশদিনব্যাপী উৎসব এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। চৈত্রসংক্রান্তির দুই দিন পূর্বে প্রতি রাত্রে শিব বিবাহ দেখিতে এবং পরদিন অপরাহ্নে ১৫ ফুট উচ্চ মঞ্চ হইতে ষণ্ডেশ্বর-সন্ন্যাসীগণের তীক্ষ্ণধার ফলাযুক্ত বঁটির লম্ফ-প্রদান দেখিতে মন্দির প্রাঙ্গণ জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া যায়। শিবতলায় রাত্রি পর্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিরাত্রে যাত্রা কথকথা অনুষ্ঠিত হয়। এই কয়দিন রাত্রে ষণ্ডেশ্বর-দেবতাকে অপূর্ব ফুলশয্যায় সজ্জিত করা হয়।

চুঁচুড়ার শেষ ওলন্দাজ গভর্ণর এনথনি ওভারবেক (১৮২৪ খৃঃ) এই দেবতার ভক্ত ছিলেন এবং তিনি চুঁচুড়া বৃটিশ সরকারকে হস্তান্তরের প্রাক্কালে যে পিতলের সুবৃহৎ ঢাক উপহার দিয়াছিলেন (এবং যাহা অদ্যাবধিও গুরুগম্ভীর আওয়াজ দিয়া থাকে) তাহা এই কয়েকদিনব্যাপী উৎসবে প্রধান বাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

পূর্বে এই ষণ্ডেশ্বর শিবমন্দির সম্মুখস্ত গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত ছিল। চুঁচুড়া শ্যামবাবু ঘাটস্থ প্রসিদ্ধ হালদার বংশের শিবভক্ত এক সন্তান স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্থানীয় জেলেগণের জালে নিজেকে ধরা দেন। পরে এই শিবদেবতাকে আনিয়া বর্তমান স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং বর্তমান মন্দির গঠন করা হয়।

এই শিব-দেবতা পশ্চিমমুখে অধিষ্ঠিত; ইঁহার সম্মুখে পূর্বমুখে সিদ্ধেশ্বরী (কালী) মাতার নবকলেবর ও মন্দির নূতন করিয়া "সিদ্ধেশ্বরী মাতা মন্দির সংস্কার কমিটি" কর্তৃক গঠিত হইয়াছে। ইহার পর এই স্থানে বৈশাখী মেলা হয়।

॥ এমামবাড়া হাসপাতাল ॥

'এমামবাড়া হাসপাতাল' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর সিভিল সার্জন ডাক্তার টমাস ওয়াইজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হাজি মহম্মদ মহসীনের ফণ্ড হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতাল বর্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসে। দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীন ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহসীনের ভগ্নী মন্নু বেগম তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি মহসীনকে দিয়া যান। মহসীন উক্ত সম্পত্তি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে চরম দানপত্র দ্বারা সৎকার্যে ব্যয় করিবার জন্য দান করিয়া যান। মহসীনের মৃত্যুর পর তাঁহার নিযুক্ত মাতোয়ালীদ্বয় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মহসীনের দান নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। বান্দা আলি খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি মন্নু বেগমের পোষ্যপুত্র বলিয়া আদালতে নালিশ করেন এবং এই মামলায় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন এবং বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিল হইতে আলি খাঁ হারিয়া যায়। এই সময়ে সম্পত্তির আয় নয় লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল এবং গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া ইহার বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত অর্থ হইতে এই হাসপাতাল, হুগলী মহসীন কলেজ ও হুগলীতে প্রসিদ্ধ 'এমামবাড়া' নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'মহসীন ফণ্ড' হইতে বহু মক্তব এবং মুসলমান ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্যও অর্থ পাইত।

ইমামবাড়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে হুগলীর প্রথম সিভিল সার্জন হন ডাঃ টমাস

ওয়াইজ, দ্বিতীয় ক্যাপ্টেন ইনিস এবং তৃতীয় ডাঃ ওল্ডহ্যাম। ইহাদের সুচিকিৎসার জন্য হুগলীর সর্বত্র তাহাদের খুব খ্যাতি ছিল।

সম্মোহিত করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা

ক্লোরোফর্মের দ্বারা অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রচিকিৎসা করা বর্তমান পদ্ধতি। কিন্তু ইহার পূর্বে হুগলীর সিভিল সার্জন ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৩৯-১৮৪৭) ডাঃ জেমস্ এস্‌ডেল রোগীকে সম্মোহিত করিয়া অস্ত্রোপচার করিবার এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল হুগলীতে প্রথম পরীক্ষা করিয়া তিনি সাফল্য-মণ্ডিত হন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ডাঃ এস্‌ডেল তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন পদ্ধতি অনুযায়ী অস্ত্রোপচার করিয়া বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে লাগিলেন এবং আট মাসের মধ্যে তিনি ৭৩টি কঠিন রোগীকে আরোগ্য করেন। "মেডিক্যাল সার্ভিস" নামক পুস্তকে এবং টয়েনবি সাহেবের হুগলীর ইতিহাসে এস্‌ডেলের অস্ত্রচিকিৎসার কথা আছে।

"Esdaile began his firs periments in mesmerism in 1845 and performed the first operation on the 4th pril of that year. Within eight months he performed 73 operations, including major operations like Amputations, and removal of Tumours on patients rendered unconscious by mesmerism." (Medical College Centenary Volume.)

তাঁহার এই কার্যে হুগলী ইমামবাড়া হাসপাতালের এ্যাসিস্টেন্ট সার্জন বদনচন্দ্র চৌধুরী বিশেষ সহায়তা করিতেন। ডাঃ চৌধুরী মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম প্রথম ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধেও কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

"One of the Brahmin students Badan Chandra Chowdhury, who entered the Medical College with the first batch passed out in 1841 and was appointed Sub-Assistant Surgeon to the Imambara Hospital at Hoogli. He resided there for half a century, dying as recently as the 18th August 1907, aged 97, leaving a large fortune."

ডাঃ এস্‌ডেল হুগলীতে তাঁহার নূতন পদ্ধতিতে চিকিৎসার বিষয় সরকারকে জ্ঞাপন করিলে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া এই বিষয়ে আরও পরীক্ষা করিতে সরকার অনুরোধ করেন। তিনি কলিকাতা নেটিভ হাসপাতালেও পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করেন এবং সরকার কর্তৃক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মট লেনে "মেসমেরিক্ হাসপাতাল" সেইজন্য খোলা হয়।

তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "Mesmerism in India" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে তিনি যতগুলি অস্ত্রোপচার করিয়াছেন তাহা লিখিত আছে। তাঁহার আবিষ্কৃত পন্থায় অস্ত্রোপচার জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, কারণ স্যার জেমস সিম্পসন (১৮৪৬-৪৭) ইথার ও ক্লোরোফর্ম দিয়া অজ্ঞান করিয়া অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

চুঁচুড়ায় একটি প্রাচীন সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মূর্তি বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চুঁচুড়ায় সূর্যমূর্তি' ও উহার প্রতিষ্ঠাতা সোমবংশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছিঃ

"চুঁচুড়ায় সোমবংশ যে খুব বিখ্যাত তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে একজন ৬৯৯ বর্ষ (৭) পূর্ব্বে বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করেন তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বলভদ্র সোম গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী বা 'উজীর মমালক' ছিলেন। গৌড়েশ্বরের অন্যতম প্রধান কর্মচারী পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি আবাল্য সূর্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার এক পরম রূপবতী কন্যা নিত্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী সূর্যমূর্ত্তির পূজা করিতেন। একদিন সেই অনিন্দ্যসুন্দরী পূজানিরত রহিয়াছেন, এমন সময় বলভদ্র তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হন। তিনি পুরন্দরের নিকট কন্যা প্রার্থনা করেন এবং পুরন্দরও তাঁহাকে জামাতারূপে লাভ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। বিবাহান্তে বলভদ্র ক্রমশঃ সূর্যো-পাসক হইয়া পড়িলেন। এই বলভদ্রের বংশ-পরম্পরায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সূর্যমূর্ত্তির কিছুকাল পূজোপাসনা চলিয়া আসিতেছিল। বলভদ্রের প্রপৌত্র শ্যামরাম মন্ত্রান্তরে দীক্ষিত হন। তদবধি তাঁহাদিগের গৃহস্থিত সূর্যমূর্ত্তি অপূজিত থাকে। এই শ্যামরাম বাঙ্গলার নবাবের নিকট হইতে 'বাবু' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার নাম-প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইয়াছিল। ইনি সাধারণের জন্য দুইটি ঘাট নির্মাণ করাইয়াছেন। শ্যামরাম বাবুর বাড়ীতে কোন এক বৃহৎ কার্যোপলক্ষে সূর্যমূর্তিটি স্থানান্তরিত হইয়া তৎকর্তৃক নির্মিত ঘাটে স্থান লাভ করে।" শ্যামরাম বাবুর বিবরণ ৬১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

॥ চুঁচুড়ার সোম পরিবার ॥

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর লিখিয়াছেন যে 'চুঁচুড়ার সোমবংশ ও বাগবাজারের মহারাজ রাজবল্লভের বংশ একই। কারণ, লক্ষ্মীনারায়ণ সোম ও কৃষ্ণবল্লভ সোম এই দুই সহোদর যথাক্রমে উক্ত দুই বংশের পূর্বপুরুষ। (৮) সোমবংশের মধ্যে মহারাজা জানকীরাম সোম, মহারাজা দুর্লভরাম (ওরফে রায় দুর্লভ), রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং পরবর্তীকালে ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম, শিবচন্দ্র সোম ও নগেন্দ্রনাথ সোম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহা ছাড়া ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীতে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরবপূর্ণ কার্যদ্বারা সোম বংশের যে সকল কৃতি সন্তান সমাজের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের জন-হিতকর কার্যকলাপের বিবরণ শ্রীকেদারনাথ সোম লিখিত "সোম বাবুদের বংশাবলী" নামক পুস্তকে সবিস্তারে লিখিত আছে। সোমবাবুদের কুলদেবতা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখিতে খুব সুন্দর।

মহারাজা জানকীরাম সোম ॥ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কৃষ্ণবল্লভ উড়িষ্যার সুবেদার নবাব সুজাউদ্দিনের কানুনগো ছিলেন। কৃষ্ণবল্লভ জানকী-রামকে নবাবী সেরেস্তার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ স্বয়ং শিখাইয়াছিলেন। জানকীরাম, মীর্জা

মহম্মদ আলী নামে একজন তহশীলদারের অধীনে প্রথমে পেস্কার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এই মীর্জা মহম্মদ আলী পরে নবাব আলীবর্দী খাঁ নামে পরিচিত হন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন বাঙলার সুবেদার এবং আলীবর্দী বিহারের নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত হন। আলীবর্দী জানকীরামকে সুবে-বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর আলীবর্দী বাঙলার নবাব অথবা সুবেদার নিযুক্ত হইলেন। সুবেদার হইবার পর জানকীরামকে আলীবর্দী মুর্শিদাবাদে তাঁহার দেওয়ান অথবা রাজস্ব মন্ত্রীপদে বহাল করিলেন। অতঃপর জানকীরাম সোম বুদ্ধিবলে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিহত করিয়া মারাঠাগণকে পরাজিত করিতে পারায়, তাঁহার কৌশল ও বুদ্ধির জন্য জানকীরাম "দেওয়ান-ই-তান" অথবা সেনাবিভাগে প্রধান দেওয়ানী পদে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে নবাব তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বিহারে নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করেন তিনি নামতঃ সিরাজউদ্দৌলার অধীনে সুবেদার ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নবাব যখন মরাঠাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া উড়িষ্যায় গমন করেন তখন সিরাজদ্দৌলা স্ব-সৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হইয়া রাজা জানকীরামকে দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। জানকীরাম দুর্গ ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করাতে সিরাজদ্দৌলা তাঁহার প্রতি আগ্নেয়অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। রাজা জানকীরামও সেইভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন। সিরাজের সেনাপতি মেদী-নেসার যুদ্ধে নিহত হন এবং সিরাজদ্দৌলাও প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত শহরের বাহিরে এক কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দুইপক্ষকে শান্ত করিলেন রাজা জানকীরাম বিহারে নায়েব সুবেদার থাকাকালীন শাসনকার্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিদ্রোহী জমিদারগণকে সমূলে আয়ত্তে আনিয়া অতি নিপুণভাবে সরকারী রাজস্ব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং বিহারের জায়গীরদারসমূহের জমা দিল্লীর রাজ দরবারে সম্রাটদের নিকট প্রেরণ করিতেন। সেজন্য দিল্লীর সম্রাট জানকীরামকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে ছয় হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। মহারাজা জানকীরাম ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

মহারাজা দুর্লভরাম সোম ॥ (ইনি রায়দুর্লভ বলিয়া খ্যাত) মহারাজ জানকীরাম সোমের পুত্র। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত-সহ মারাঠাগণ তাঁহার পিতার কৌশলে ধ্বংস হইয়াছিল তখন আলীবর্দী খাঁ, সুবেদার আবদাস-সোভানের অধীনে মহারাজা দুর্লভরামকে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার পদে নিয়াগে করিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আবদাস-সোভানের মৃত্যুর পর, নবাব দুর্লভরামকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া উড়িষ্যায় সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। অনতিকাল মধ্যে মারাঠাগণ হঠাৎ উড়িষ্যা আক্রমণ করে। দুর্লভরাম বন্দী হইলেন তাঁহার উদ্ধারের জন্য মারাঠা সর্দারকে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হইলে তিন মুক্ত হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা নবাব হইলেন এবং তিনি দুর্লভরামকে ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর মিষ্টার ড্রেকের নিকট প্রেরণ করিয়া, ফোর্ট উইলিয়মের যে সকল অংশ সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নির্দেশ দেন।

মিঃ ড্রেক নবাবের নির্দেশনামা অমান্য করিলে নবাব দুর্লভরামকে তিন হাজার সৈন্য লইয়া ইংরাজদের কাশীমবাজারের কুঠী দখল করিবার হুকুম দেন। ৪ঠা জুন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াট সমগ্র কুঠী দুর্লভরামের হস্তে সমর্পণ করেন। ২০শে জুন ১৭৫৬ নবাব, কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করেন এবং মানিকচাঁদ নামে এক ব্যক্তি যাহার উপর দুর্গ রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাহার অসাবধানতায়, অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয়। ২রা জানুয়ারী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পুনরাধিকার করে। নবাব সেই সময় মীরজাফর ও রাজা দুর্লভরাম সেনাপতিদ্বয়-সহ কলিকাতার দিকে পুনর্যাত্রা করেন। কর্ণেল ক্লাইবের জীবন রাজা দুর্লভরামের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে লাগিল এবং কর্ণেল ক্লাইভ তখন সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফরকে সিংহাসন দেওয়া হইয়াছিল এবং রাজা দুর্লভরাম "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়া "দেওয়ান-ই-আলা" (প্রধানমন্ত্রী) হইয়াছিলেন। পরে ইংরাজদের এক সনন্দ দেওয়া হইল যে, দক্ষিণ কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য তাহারা একটি জমিদারী ক্রয় করিতে পারে। এই সনন্দ নবাব মীরজাফর প্রধানমন্ত্রী মহারাজা দুর্লভরাম এবং তদীয় পুত্র "হুজুরনবিশ" (চীফ-সেক্রেটারী) রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ, দিল্লীর সম্রাট "সা-আলমের" সহিত সন্ধিসূত্রে দৃঢ়তর হইয়াছিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে দুর্লভরামের জন্য সনন্দ "মহারাজা-মণীন্দ্র-বাহাদুর" লইয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইভ দুর্লভরামকে বিহারের নীটপুর নামক পরগণা 'জায়গীর' উপহার দিয়াছিলেন, যাহার বাৎসরিক আয় ৮৭,৫০০৲ টাকা ছিল। ১২ আগষ্ট ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ মহারাজা দুর্লভরামের পরামর্শে সম্রাট শা-আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। তাহার এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের জন্য মহারাজ দুর্লভরামকে লর্ড ক্লাইভ রংপুর জেলার অন্তর্গত 'পৈরাবন্দ-দিগার' বাৎসরিক ছয় লক্ষ টাকার আয়ের এক জায়গীর দান করিলেন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ রাজা দুর্লভরামের জন্য বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা পেন্‌সন্‌ মঞ্জুর করেন। মহারাজা দুর্লভরাম ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি ইংরাজদের অভূতপূর্ব সাহায্য দান করিয়াছিলেন বলিয়া কোম্পানী এক অঙ্গীকার পত্রে স্বীকার করেন। অঙ্গীকার পত্রখানি এইস্থানে উল্লেখ্যঃ

"আমরা বাইবেল চুম্বনপূর্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে অঙ্গীকার করিতেছি যেঃ যতদিন রাজা দুর্লভরামের (মহারাজা দুর্লভরাম সোম) পরিবারের মধ্যে একজন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা তাহাদের বংশ পরম্পরায় সম্মান ও ভরণপোষণের সম্যক যত্ন লইব।"

(স্বাক্ষর)— জে, গ্রেহ্যাম (স্বাক্ষর)— ভ্যানসিসটার্ট
সেক্রেটারী (স্বাক্ষর)— ক্যাম্যাক
১৭৭৫ (স্বাক্ষর)— হেস্টিংস

চুঁচুড়ার সোম বংশের একজন পূর্ব-পুরুষ রামচরণ সোম চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার এক পুত্রের নাম শ্যামরাম সোম। শ্যামবাবু ১৭১৭

খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্যামরাম সোম ওলন্দাজ কৌন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন ও গঙ্গার উপর ঘাট নির্মাণ করেন। ঘাটের সোপান গঙ্গাগর্ভের অতি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই ভাঁটার সময়ও সোপানের শেষ হইত না। ঐ অট্টালিকার চারিদিকে ৪টি সিংহদ্বার ছিল। ঐ অট্টালিকা নির্মাণ শেষ হইলে শ্যামরাম কৌশল করিয়া নবাবের নহবৎ আনাইয়া নিজ বাটীতে নহবৎ বাজাইয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে শ্যামরামকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করেন। তিনি কোন প্রকারে বাড়ীতে সংবাদ পাঠান, পরে বাটী হইতে কতকগুলি মূল্যবান উপঢৌকন নবাবকে দেওয়া হয়, নবাব উহা পাইয়া প্রীত হন এবং শ্যামরামকে ছাড়িয়া দেন শুধু তাহাই নহে, শ্যামরামকে তিনি বাবু উপাধি দিয়াছিলেন। "শ্যামবাবুর ঘাট" অদ্যাপিও চুঁচুড়ায় বিদ্যমান আছে। শ্যামরাম বাবু চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরস্থ একটি মনোরম বৈঠকখানা বাড়ী এবং সুন্দর ও সুসজ্জিত বাগান তৈয়ারী করিয়াছিলেন ঐ স্থানে বর্তমানে "চুঁচুড়া শিবচন্দ্র সোম ট্রেনিং একাডেমী" নামক স্কুল রহিয়াছে। ঐ বৈঠকখানার সম্মুখে তাঁহার নিজের নির্মাণ করা ঘাটের (যাহা অদ্যাবধি শ্যামবাবুর ঘাট বলিয়া খ্যাত) ও তদনুসারে সোম পরিবারের বাসের পল্লীর নাম শ্যামবাবুর ঘাট ও রাস্তার নাম "শ্যামবাবুর ঘাট রোড" হইয়াছে। তিনি বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকে যে ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভিন্ন তাহার উত্তর দিকে অর্থাৎ ষণ্ডেশ্বর তলার ঘাটের (এই ষণ্ডেশ্বর তলা ঘাট ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাবু পিতাম্বর শীলের দ্বারা নতুন সংস্কার হইয়াছিল) দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকদিগের স্নানের উপযোগী আরও একটি ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন। উভয় ঘাটই বর্তমানে ভগ্ন ও অতীব জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। ইহা ছাড়া তিনি ঐ ষণ্ডেশ্বর তলায় শ্রীশ্রীযোগদ্যা ঠাকুরাণী দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাবু পরলোকগমন করেন।

রাজা রাজবল্লভ ॥ মহারাজা দুর্লভরাম সোমের পুত্র। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজাফর কর্তৃক ইংরাজদিগের সনন্দ দেওয়া হয় যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য তাহারা জমিদারী ক্রয় করিতে পারেন। তখন রাজা রাজবল্লভ ঐ সনন্দে তাঁহার পিতা "হুজুরনবিশ" অর্থাৎ প্রধান সম্পাদক হইয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী, বীর্যবান, বুদ্ধিমান ও পরহিতকামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলিকাতায় তাঁহার পিতার প্রাসাদতুল্য বাটীতে বাস করিতেন। কলিকাতার উত্তরে বাগবাজার নামক স্থানে একটি রাস্তা আছে যাহা অদ্যাবধি তাঁহার নাম স্মরণার্থে "রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদানীন্তন মিঃ কটন লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতার কাশী মিত্র (যাঁহার নামে কাশী মিত্র ঘাট আছে) তিনি রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় ছিলেন। রাজা রাজবল্লভের বিষয়, মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের জীবন চরিতে লিখিত আছে দেখা যায়।

১১ই অক্টোবর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার সমগ্র পরিবারবর্গ, নবাব মীরকাশীমের কোনও কিছু ক্ষতির জন্য বিষম কোপানলে পতিত হইয়া তিন হাজার ইংরাজ ও অন্যান্য তিন হাজার ব্যক্তির সহিত মীরকাশীমের সেনাপতি রেনহার্ডের

(Reinhardt) দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যে ইংরাজদের হস্তে মীরকাশীম পরাজিত হইয়াছিলেন। আর, কে, মিত্র রচিত 'সেকালের কলিকাতা' নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। পাটনা শহরে গোরস্থানে যে সব ইংরাজগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণার্থে তাঁহাদের নাম পাথরে খোদিত আছে।

মুকুন্দবল্লভ ॥ ইনি রাজা রাজবল্লভের একমাত্র পুত্র। তাঁহার কোনও সন্তানাদি না হওয়াতে তাঁহার বিধবা পত্নী গৌরবল্লভ নামীয় এক শিশুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ অস্বীকার করায় রাজবল্লভের যাবতীয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর অভাবে ব্রিটিশ সরকারে স্বত্ব প্রত্যাবর্তন করে ও তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। রাজা রাজবল্লভের কন্যার বংশ কলিকাতায় বর্তমানে বাস করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রেজারার শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র রাজবল্লভের দৌহিত্র বংশ। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র সোম **করুণাময়ী দেবীর** পাষাণময়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার বসতবাটীর সামনে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। করুণাময়ী কাল কোষ্টী পাথরের ও শিবমূর্তি শ্বেতপাথরের দ্বারা নির্মিত। মহেশচন্দ্র তড়া আঁটপুরের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাম বসুর কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণরাম হুগলীর দেওয়ান ছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দশম আইন অনুসারে 'হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটী' গঠিত হইলে ঈশানচন্দ্র মিত্র মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং কৃষ্ণদাস লাহা চুঁচুড়ার জলের কলের জন্য একলক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতার বিখ্যাত 'লাহা-বংশ' চুঁচুড়ার লাহাবংশসম্ভূত। ইহা ছাড়া সেন, শীল, মণ্ডল, দত্ত প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত বংশও এইস্থানে আছে। পৌরসভার বিষয় ৬২০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রাচীন গদ্যপুস্তক 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচয়িতা রামরাম বসু, স্বনামধন্য মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সুরসিক সাহিত্যিক দীননাথ ধর, ঔপন্যাসিক তারকনাথ বিশ্বাস, বিচারপতি আমির আলি, প্রসিদ্ধ গায়ক লালবিহারী পাঠক, মথুরামোহন দত্ত, নিমাইচাঁদ শীল, নন্দলাল দে, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, নিতাইচাঁদ শীল, পদ্মলোচন মণ্ডল, প্রভৃতির আবাসস্থান এই চুঁচুড়ায়। এতদ্ব্যতীত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এবং বৈদেশিকগণের মধ্যে বাঙ্গলার প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মিশনারী কিরনাণ্ডার (ইনি বাঙ্গালীকে প্রথম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেন) এবং চার্লস ওয়েষ্টন নামক অন্ধকূপহত্যার সহিত জড়িত হলওয়েল সাহেবের বিশেষ বন্ধু এই স্থানে বাস করিতেন। ওয়েষ্টন সাহেব ব্যবসায়ের দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও, প্রতি মাসে ষোলশত টাকা করিয়া তিনি দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইলঃ

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৮২৭, ২২শে ফেব্রুয়ারি; মৃত্যু ১৮৯৪, ১৫ই মে। নিবাস—চুঁচুড়া, হুগলী। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পরে তিনি বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া শেষে সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং ইন্সপেক্টর-অব-স্কুল্স্ রূপে কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ হইতেই তিনি লেখকরূপে

খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাভাষায় প্রবন্ধ রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আদর্শ নিবন্ধ-লেখক হিসাবে তিনি সম্মানিত হইয়া থাকেন। বাংলাদেশের নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে উন্নত করিবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ', "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' (মাসিক) ও 'এডুকেশন গেজেট' (সাপ্তাহিক) তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার বিবরণ ৫০৯ পৃষ্ঠায় আছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল ॥ জন্ম ১৮৬০; মৃত্যু ১৯১৯, ১৯শে জুন, কলিকাতা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু আজীবন লেখাপড়ায় অনুরাগ ছিল। পাঠদ্দশায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই কবিতা রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১২৮৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "পুনর্মিলন" নামক কবিতাটি তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পরে সেকালের বিখ্যাত প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে, ইহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়া 'প্রদীপ' (প্রথম সংস্করণ ১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ', 'এষা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩রা অক্টোবর ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কঠোর সংগ্রাম করিয়া, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না মাড়াইয়াও একটি সাধারণ মানুষ কি করিয়া স্বীয় ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নিরলস সাধনা ও অধ্যবসায় বলে বাঙলা সাহিত্যের লুপ্ত রত্ন উদ্ধারে ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সাফল্যের শিখরে আরোহণ করিতে পারে, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। মাত্র ১ বৎসর বয়সে পিতৃহীন এবং ১১ বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়া তিনি এন্ট্রান্স কোর্স অবধি কায়ক্লেশে পাঠ করেন। ইহার পর কিছুকাল বিলাতী কোম্পানীতে কেরাণীগিরি করিয়া তিনি অবশেষে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীতে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ-রিভিউ'তে সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার কথা', 'বাঙলা সাময়িকপত্র' ও 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা বাঙলা-সাহিত্যে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় তাঁহার জন্ম হয়।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে বঙ্গদেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তারপর শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় এবং চুঁচুড়ার রামরাম বসুর উৎসাহে ও আগ্রহে বঙ্গভাষার অন্যতম প্রাচীন গদ্যপুস্তক "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" এবং "লিপিমালা" যথাক্রমে ১৮০১ এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। প্রতাপাদিত্য চরিত্র সম্বন্ধে ৪২৫ পৃষ্ঠায় এবং প্রথম মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ৪১৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে।

তৎকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন এবং তাঁহারা যাবতীয় চিঠি-পত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাবে চলিতেছিল। তারপর

খৃষ্টান মিশনারীগণের চেষ্টায় বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারকল্পে পূর্বোক্ত ধারার পরিবর্তন হয়। রামরাম বসুর রচিত প্রাচীন গদ্য পুস্তক কেরী সাহেবের চেষ্টায় শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয় এবং উক্ত পুস্তকের পত্রসংখ্যা ১৫৬। নিম্নে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র রচনার নমুনা প্রদত্ত হইল ঃ

"নহবৎখানার উপরে ঘড়ি-ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।" রামরাম বসুর ২য় পুস্তক "লিপিমালা" ১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক কি জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা উক্ত পুস্তকের নিম্নোক্ত কয়েক লাইন হইতেই বুঝা যাইবেঃ

"এ হিন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্যক্রমে এ সময় অন্যান্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্বর্তস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহাদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ভূমীয় যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রথিত করিয়া লিপিমালা নামক পুস্তক রচনা করা গেল।"

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া নিবাসী মথুরামোহন দত্ত 'মুগ্ধবোধের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণে সন্ধি-প্রকরণ পর্যন্ত আছে এবং ইহার পত্রসংখ্যা ৫৫। সাহিত্য প্রসঙ্গে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিষয় সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। তারকনাথ বিশ্বাসের জীবনী জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সম্পাদিত "বংশ পরিচয়" (২০শ খণ্ড) নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত সাময়িক পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বলা বাহুল্য সাময়িকপত্র প্রচার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসারে চুঁচুড়ার দান বড় কম নয়। চুঁচুড়া-হুগলী হইতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার বিস্তারিত বিবরণ ৫০৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

চন্দনগরের তন্তুবায়বংশীয় একজন অন্ধ স্বভাব-কবি চুঁচুড়ায় বাস করিতেন, লোকে তাঁহাকে 'কানাচণ্ডী' বলিয়া ডাকিত। ভিক্ষা করিয়া তিনি দিনাতিপাত করিতেন; স্বরচিত গান ব্যতীত অন্য কোন গান তিনি গাহিতেন না। আজও চুঁচুড়ায় লোকমুখে তাঁহার বহু গান প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কালনায় তাঁহার আদি নিবাস ছিল, কিন্তু তিনি ভগিনীর বাড়ী থাকিতেন। তাঁহার স্বরচিত একটি গানের দুই পঙক্তি এইরূপঃ

চক্ষু বিনে ভাই, যত দুঃখ পাই, বলে কি জানাব, আমি তা জানি।
অন্ধের যত কষ্ট, জানেন ধৃতরাষ্ট্র, আর জানেন বিশিষ্ট অন্ধমুনি॥

ভারতের মধ্যে একমাত্র চুঁচুড়ায় প্রাচীনকালে বরফ প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়। এই দুর্লভ পদার্থ কুলীহাণ্ডা মহালের অন্তর্গত নফরডাঙ্গার মাঠে উৎপন্ন হইত। (১০) ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কলিকাতায় সাহেবদের এক নাচের মজলিসে বরফ আসিয়াছিল দেখিয়া 'কলিকাতা গেজেটে' যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ ঃ

"The ice it is presumed must have come from the well known ice-field at Hooghly, the only one have existed in the lower provinces."

ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পরেও চুঁচুড়ার বরফ কুণ্ডে বহু বরফ উৎপন্ন হইত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল ঃ

"চুঁচুড়ায় বরফ।—স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে জানুয়ারী মাসের প্রথম ২৯ দিবস পর্য্যন্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মণ বরফ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বরফ মণ করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।" (১১)

॥ মহিষমর্দ্দিনী পূজা ॥

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রাধান্যের অবসানের পর হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুভ্যুত্থানে ক্রমশঃ পূজাপাবর্বনের বহুল প্রচলন সুরু হয়। সেই সময় চুঁচুড়া ধরমপুরে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ভগ্নাবশেষ মন্দিরে তথাকথিত ধর্ম্মরাজের পূজা নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীগণ শক্তিপূজায় আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীশ্রীমহিষমর্দ্দিনী মাতার পূজার প্রবর্তন করিলে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের উৎসব ক্রমে ম্লান হইয়া আসে।

ধরমপুর দক্ষিণপাড়ায় ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের ভগ্নমন্দিরের প্রায় পার্শ্বে অবস্থিত চণ্ডী-মণ্ডপে এই মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামাতার পূজা তদবধি একাদিকক্রমে চলিয়া আসিতেছে। দেবীর নামানুসারেই পল্লীটির নাম মহিষমর্দ্দিনীতলা। মণ্ডোপপরি দেবীর স্থায়ী দেউল বিদ্যমান। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের অরণ্যষষ্ঠী (জামাইষষ্ঠী) তিথিতে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সপ্তমী হইতে দশমী (দশহরা) পর্য্যন্ত যথাবিধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। **মূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য হইল, প্রতিমার দক্ষিণভাগে দেবাদিদেব মহাদেব এবং বামভাগে সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতির মূর্তি ব্যতীত লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিকের মূর্তি থাকে না।** মহিষমর্দিনীর আলোকচিত্র ১৫ নম্বর প্লেটে এবং অন্যান্য বিবরণ ২৬৪ পৃষ্ঠায় আছে। পূর্বে প্রচুর মহিষ, ছাগাদি বলির প্রথা ছিল। বহুদিন হইতে মহিষ বলি রহিত হইয়াছে এবং বর্তমানে ছাগাদির বলিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূজা চারিদিন বিধিনির্দ্দিষ্ট থাকিলেও পূর্বে প্রতিমা স্নানযাত্রার দিনাবধি মন্দিরে রক্ষিত হইত। সুতরাং উৎসব ততদিন ধরিয়া চলিত এবং গান যাত্রাভিনয়, পুতুলনাচাদি চলিতে থাকিত। স্নানযাত্রা দিবসে স্থানীয় "ময়রা-পুকুর" নামক পুষ্করিণীতে প্রতিমা নিরঞ্জন হইত। দেবী-মাহাত্ম্যে পুষ্করিণীটির জল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যাইলেও নিরঞ্জনকালে প্রয়োজনমত জল আপনি যোগাইত। বর্ত-মানে দশহরা-দিবসে নিরঞ্জন হইয়া থাকে। জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষানুসারে কয়েক বৎসর হইতে গঙ্গায় নিরঞ্জন করা হইতেছে। অধুনা উৎসবের জাঁকজমক বহুলাংশে হ্রাস পাইলেও যাত্রা, থিয়েটার, সঙ্গীতানুষ্ঠান যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও লালমোহন পাল ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লটারীতে এক লক্ষ টাকা

প্রাপ্ত হন। ১২২৮ সালের ৩ ফাল্গুন তারিখের সমাচার দর্পণের সংবাদটি উদ্ধারযোগ্য:

কলিকাতা ২৬ লাটরী ॥ ৮০ নম্বর টিকীটে ১০০০০০ এক লক্ষ টাকা চুঁচুড়ার শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুত লালমোহন পালের নামে উঠিয়াছে, এ টাকা তাহারা তুল্যাংশক্রমে লইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য ২ যে টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা যাইবে।"

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডি, সি, স্মিথ হুগলীর জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি হুগলী জেলার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি চাঁদা তুলিয়া চুঁচুড়ায় একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার নামানুসারে স্মিথ সাহেবের ঘাট আজও বিদ্যমান আছে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম কালেক্টরী স্থাপিত হয়। মিঃ বেলী প্রথম কালেক্টর হন বলিয়া টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি বিশ বৎসরকাল হুগলীর কালেক্টর ছিলেন। কিন্তু হান্টার সাহেব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সান্ডার্স সাহেব কালেক্টার নিযুক্ত হন বলিয়াছেন।

চুঁচুড়ায় কেবল যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাস করেন তাহা নয়, বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এই স্থানে বাস করেন এবং চুঁচুড়া হইতেছে বর্ধমান বিভাগের হেড কোয়াটার। ১৭৯৫ হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একই ব্যক্তি জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কার্য করিতেন বলিয়া তাঁহারা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া কথিত হইতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য পৃথক করা হয়। মিঃ এইচ, বি, ব্রাউনলো প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং স্মিথ সাহেব জজের কাজ করিতে লাগিলেন।

সরকারী কাগজপত্রে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর, হোমস-এর অধীনে হুগলী জেলা ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হুগলী বলিয়া কোন পৃথক জেলা গঠিত হয় নাই। ওম্যালি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ রাজস্ব আদায়ের জন্য বোধ হয় মিঃ হোমস্ হুগলী অঞ্চলে মিঃ রেডফিয়ার্ণ সাহেবের অধীনে কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি নিম্নে "হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার" হইতে উদ্ধৃত হইল।

"As mentioned in the history, in 1787 R. Holmes was in charge of Hughli, apparently as a sub-district which in March 1787 was combined with Nadiya under Mr. T. Redfearn. The jurisdiction of these officers was that of Revenue Collector than of Magistrate."

জেলা বোর্ড ॥ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ছত্রিশ আইনানুসারে বর্ধমান জেলাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া বর্ধমান ও হুগলী এই দুইটি জেলা গঠিত হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জেলার রাস্তাঘাট নির্মাণ মেরামত স্বাস্থ্যোন্নতি শিক্ষা, পানীয়জল সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করিবার জন্য হুগলী জেলা বোর্ড গঠিত হয়। চুঁচুড়ায় জেলা বোর্ডের কার্যালয় অবস্থিত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জেলা বোর্ডের কার্য পরিচালনের জন্য সরকার হইতে একজন চেয়ারম্যানকে মনোনয়ন করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর, মনোনয়ন প্রথা উঠিয়া যায় এবং সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইতেছেন।

বর্তমানে ত্রিশ জন সদস্য লইয়া হুগলী জেলা বোর্ড গঠিত। তন্মধ্যে কুড়ি জন সদস্য নির্বাচিত হন এবং দশজন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। জেলাবাসী খাজনার সহিত যে রোডসেস্ দেন, তাহা হইতে এবং সরকার প্রদত্ত অর্থে ও রেলওয়ে, খেয়াঘাট ও খোঁয়াড় প্রভৃতির আয় হইতে জেলা বোর্ডের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। সরকার জেলাবোর্ডগুলি তুলিয়া দিবার বিষয় এখন চিন্তা করিতেছেন। জেলাবোর্ডের সভাপতি-গণের নাম ঃ

মিঃ জি, টয়েনবি—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ এইচ, জি, কুক—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
স্যার এফ, ডিউক—১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ ডি, বি, এ্যালেন—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ এফ, সি, ফ্রেঞ্চ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ টি, ইংগলিশ—১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।
মিঃ এ, জি, হ্যালিফ্যাক্স—১৯০৩ হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত।
মিঃ বি, দে—১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত।
মিঃ জে, ল্যাং—১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ পর্যন্ত।
মিঃ ডবলিউ, প্রেণ্টিস—১৯১২ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত।
মিঃ এফ, ব্রাডলি-ব্যার্ট—১৯১৬ হইতে ১৯১৮ পর্যন্ত।
মিঃ এস, মুখার্জি—১৯১৮ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত।
মিঃ এ, এন, মবার্লি—১৯১৯ হইতে ১৯২০ (মার্চ) পর্যন্ত।
* শ্রীবরদা প্রসাদ দে—১৯২০ হইতে ১৯২৪ পর্যন্ত।
* রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মুখার্জি—১৯২৪ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত।
* শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়—১৯৩১ হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত।
* শ্রীঅতুল্য ঘোষ ১৪মে ১৯৪৯ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩।
* শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৪ মাচ ১৯৫৩ হইতে ১১ জানুয়ারী ১৯৫৬।
* শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২ জানুয়ারী ১৯৫৬ হইতে চলিতেছে।

॥ হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি ॥

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের দ্বাবিংশতি প্রবিধানানুসারে হুগলী-চুঁচুড়ায় আবর্জনা অপসারণ, রাস্তায় আলো দিবার ব্যবস্থা ও শহরের অন্যান্য উন্নতিকল্পে পৌরশাসনের প্রাথমিক কাজের সূত্রপাত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে পচা পুকুর ও খানাডোবা ভরাট করা, পাকা সাঁকো ও জলনিকাশের জন্য নালা তৈয়ারী করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও চওড়া করা এবং অন্যান্য ছোটখাটো উন্নয়ন করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং হুগলীর তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ জি, ডি, স্মিথের নেতৃত্বে এই সকল

* ইহারা বে-সরকারী এবং নির্বাচিত চেয়ারম্যান

কার্যের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। শহর উন্নয়নের জন্য ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের 'মিনিটে' যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার অংশবিশেষ এইরূপঃ "filling up hollows, stagnant pools and useless ditches, in the construction of *pucca* drains and bridges the opening up and widening of the public roads and in other minor improvements."

এই সমিতির মাধ্যমে শহর উন্নয়নের কাজ চলিতে লাগিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের দশম বিধানানুযায়ী উদ্বৃত্ত কর হইতে (surplus town duties for the improvement of the town) হুগলীর কাছারী বাড়ির নিকট রাস্তা চওড়া করিয়া তৈয়ারী হইল; ইহা ছাড়া রাস্তার ধারে পথচারীগণের জন্য গাছ লাগান, কতকগুলি নূতন পুকুর কাটান, অনেক রাস্তা ইট দিয়া বাঁধান, ময়লা বহনের জন্য গাড়ী কেনা এবং ময়লা সাফ করিবার জন্য কয়েকজন ঝাড়ুদারও নিযুক্ত হয়। প্রথম বৎসর দু'হাজার টাকা খরচ হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে অর্থকৃচ্ছতার দরুণ সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শহর উন্নয়নের জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার কাজ শেষ হইলেও, ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সমস্ত উন্নয়ন কার্যের ভার দেওয়া হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ জুন হুগলীতে স্থানীয় ব্যক্তিগণের এক সভায় হুগলী-চুঁচুড়া ও চন্দননগরে পৌরকার্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং স্থির হয় যে উক্ত কমিটি কর আদায়ের যাবতীয় ব্যবস্থা করিবে। এই সভায় হুগলীর কালেক্টার স্যামুয়েল সাহেব সভাপতিত্ব করেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সভার বিষয় জানান হইলে, দূষণাদি হইতে রক্ষা ও চৌকিদারী বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তৎকালীন আইনে বিধিবন্ধ না থাকায়, তিনি কিছু করিতে না পারিলেও, সরকারকে এই বিষয়ে জানান; ফলে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের দশম আইন প্রবর্তিত হয়। ইহাই বাঙলাদেশের নাগরিকগণের পৌরস্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রথম আইন। এই সম্বন্ধে টয়েনবি সাহেব লিখিয়াছেনঃ

The Committee requested the Magistrate to make over to them the full control of the conservancy and *chankidari* establishments, but this the Magistrate could not legally do. At length, after a year's correspondence, the committee asked the Magistrate to move the Government to define its duties, powers and responsibilities; and the outcome of this request was the passing of Act X of 1842, the first purely Municipal law in Bengal.

পৌরকার্যের সুব্যবস্থার জন্য প্রথম যে কমিটি গঠিত হয় (৫ই জুন ১৮৪০) তাহাতে বলরাম মল্লিক সভাপতি নির্বাচিত হন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য ছিলেনঃ

হুগলী : সৈয়দ কেরামত আলী, সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর, হলধর ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়। **চুঁচুড়া :** মিঃ জি, হারক্লট্স, জীবনকৃষ্ণ পাল, মৌলভী আকবর শাহ, চন্ডীচরণ ঘোষ। **চন্দননগর :** তারিণীচরণ চক্রবর্তী, রসিকলাল ঘোষ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পৌর আইন পাশ হইবার পর হুগলী যাহা ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র শহর-

হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভা এলাকা
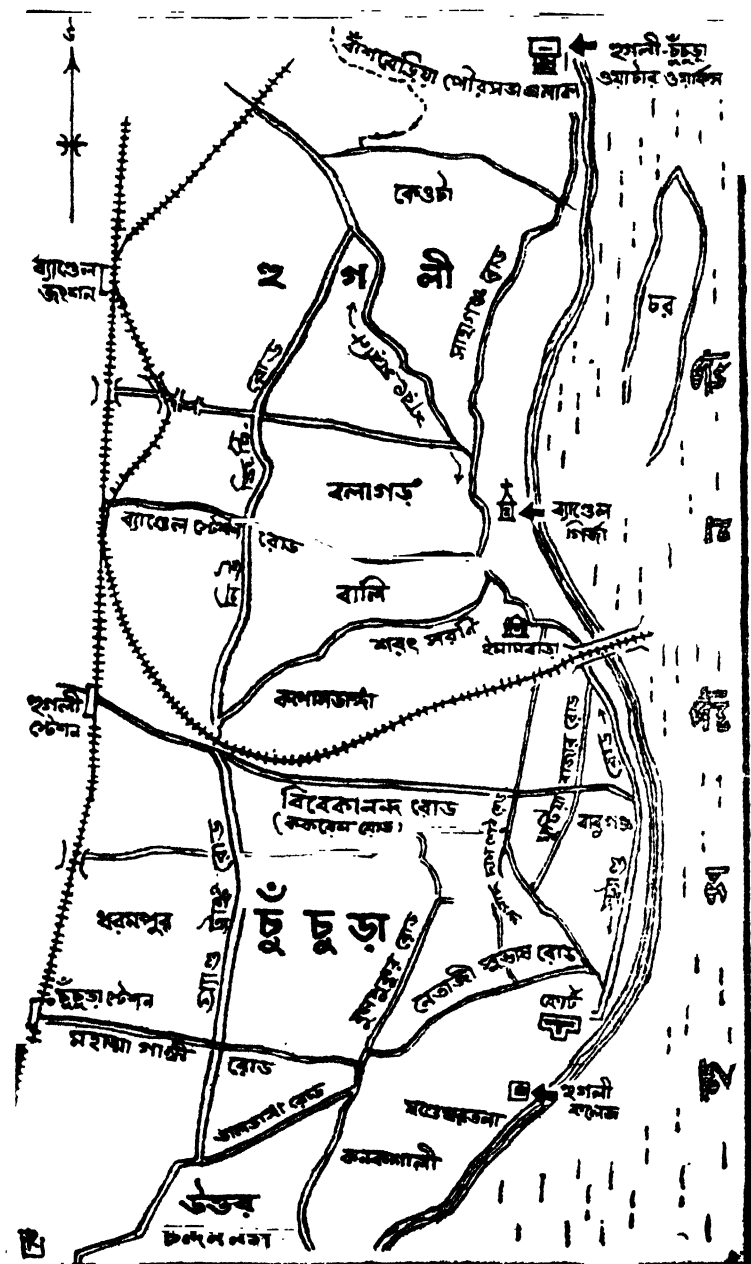
রূপে পরিগণিত হইত উহা চুঁচুড়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চন্দননগরের যে অংশ ইংরাজদের অধিকৃত ছিল তাহাও হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকার মধ্যে যায়। পৌরস্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনরায় একটি কমিটি গঠিত হইলেও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর, ডি, ককরেলের সভাপতিত্বে দশজন মনোনীত সদস্য লইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে গভর্নমেন্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মনোনীত করিতেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সভাপতি হইতেন এবং পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও সাত জন অধিবাসী লইয়া কমিটি গঠিত হইত। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ওমালী সাহেব লিখিয়াছেনঃ

Hooghly-Chinsurah was constituted a regular Municipality in 1865, and is now governed by the Bengal Municipal Act.

সরকার নিযুক্ত প্রথম পৌর সমিতির যাঁহারা সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের নামঃ

সভাপতি ঃ আর, ডি, ককরেল, **সহকারী সভাপতি ঃ** জি,এস, পার্ক, **সদস্য ঃ** টি, এম, কার্কউড, আর থোটস, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ লাহা, লালবিহারী দত্ত, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়চরণ নন্দী, রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ কেরামত আলী।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আইনে যখন বাংগলাদেশের সমস্ত পৌরসভার শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তখন হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার স্থান প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়। পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আইনে পৌরসভার অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন হয়। হুগলী-চুঁচুড়ার এলাকা ছয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সভাপতির পরিবর্তে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বেসরকারী নির্বাচিত সভাপতির দ্বারা কার্য পরিচালিত হয়। প্রথমে ছয়টি ওয়ার্ড হইতে দুইজন করিয়া নির্বাচিত সভ্য এই বারজন এবং সরকার মনোনীত চারিজন এই ষোলোজন এবং পদাধিকারবলে মনোনীত (এক্স-অফিসিও) দুইজন মোট আঠারোজন কমিশনার দ্বারা পৌরসভার কার্য নির্বাহ হইত।

Municipal Board consists of 18 Commissioners, of whom 12 are elected, 4 are nominated and 2 are *ex-officio* members.

নিম্নলিখিত স্থান লইয়া ছয়টি ওয়ার্ড বিভক্তঃ এক নম্বর ওয়ার্ড **সাহাগঞ্জ, কেওটা** ও **ব্যাণ্ডেল,** দুই নম্বর ওয়ার্ড **বালী** ও **হুগলী,** তিন নম্বর ওয়ার্ড **বাবুগঞ্জ,** [illegible] ও **পিপুলবাতি,** চার নম্বর ওয়ার্ড **বড়বাজার** ও **চুঁচুড়া,** পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড **চৌমাথা, কামার-পাড়া** ও **চুঁচুড়া** এবং ছয় নম্বর ওয়ার্ড **চন্দননগর**। উত্তর দিকের তিনটি ওয়ার্ড হুগলীর মধ্যে এবং দক্ষিণের তিনটি ওয়ার্ড চুঁচুড়ার মধ্যে অবস্থিত।

রায়বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার প্রথম বেসরকারী সভাপতি হন। মধ্যে দু-একবার সরকারী তত্ত্বাবধানে এই পৌরসভা যাইলেও, জনগণের দ্বারা ইহা যে সুপরিচালিত হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পৌরসভার এলাকার তুলনায় কমিশনারদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া, ভোটারদের সংখ্যার ভিত্তিতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ত্রিশ জন স্থির হয় এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকারী মনোনয়ন প্রথা বন্ধ

করা হয়। এই পৌরসভার জনসংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। নিম্নে ইহার সরকারী ও বেসরকারী সভাপতিগণের নাম ও কার্যকালের বৎসর প্রদত্ত হইলঃ

সরকারীঃ মিঃ আর, ডি, ককরেল (১৮৬৫-১৮৭০), মিঃ পি, এইচ, পেল্যু (১৮৭০-১৮৭৫), মিঃ এ, উইকস্ (১৮৭৫), মিঃ ডবলিউ, জে হারশেল (১৮৭৬), মিঃ আর, কর্নিশ (১৮৭৭-১৮৭৯), মিঃ জন, বিমস্ (১৮৮০), মিঃ আর, কর্নিশ (১৮৮০-১৮৮১), মিঃ এফ, উয়্যার (১৮৮২-১৮৮৪), মিঃ ব্রজেন্দ্রনাথ দে (১৮৮৫-১৮৮৭)।

বেসরকারীঃ রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র (১৮৮৭), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৮৮৭-১৮৮৯), বলরাম মল্লিক (১৯০০-১৯০১), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও প্রসাদদাস মল্লিক (১৯০১-১৯০৩), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৩-১৯০৬), বিপিনবিহারী মিত্র, (১৯০৬-১৯১০), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৯১১-১৯১৭), মিঃ এ, এল, মোবার্লি (সরকারী পরিচালক, ১৯১৮-১৯১৮), মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৯২০-১৯২৬), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২৬-১৯২৯), প্রসাদদাস মল্লিক (১৯২৯-১৯৩২), রাজেন্দ্রলাল সাধু (১৯৩২-১৯৩৮), খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় '১৯৩৮), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৮-১৯৪০), দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৯৪১), প্রসাদদাস মল্লিক (সরকারী পরিচালক ১৯৪১-১৯৪৫), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৫-১৯৪৭), নরেন্দ্রনাথ সেন (১৯৪৭-১৯৪৮), অবনীনাথ নন্দী (১৯৪৮-১৯৪৯), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সরকারী পরিচালক, ১৯৪৯-১৯৫২), অবনীনাথ নন্দী (১৯৫২-১৯৫৭), প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৫৭-১৯৬০) ইহার পর শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ এডমিনিস্ট্রেটর রূপে ইহা পরিচালনা করেন।

॥ পৌর-সমাচার ॥

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস হইতে হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির মুখপত্ররূপে **"পৌর-সমাচার"** নামে একখানি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক পত্র চুঁচুড়া শান্তি প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। ইহা সম্পাদনা করিতেন মেজর কমলকৃষ্ণ শীল, শ্রীবিশ্বনাথ বসু ও শ্রীশম্ভু ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র "হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট" ছাড়া আর কোন মিউনিসিপ্যালিটির কোন মুখপত্র ছিল না। পৌর-সমাচার সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পত্র। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুরোভাষে হুগলী-চুঁচুড়া পৌর-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীঅবনীনাথ নন্দী লিখিয়াছিলেনঃ

পৌর-সমাচার পত্রিকার মধ্য দিয়া পৌর সভার সদস্যদের কার্যধারার গতি ও প্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, মনুষ্য ও যান চলাচলের সুবিধা বিষয়ক ব্যবস্থা ও তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, কর-নীতি ইত্যাদি করদাতাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাদের গোচরে আনিবার ব্যবস্থা হইবে।

পত্রিকাখানি সৎসাহসের সহিত হুগলী-চুঁচুড়ার করদাতৃগণের নাগরিকবোধ বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও, অর্থাভাবে এই সুসম্পাদিত সুপাঠ্য কাগজখানি ১৯৫৭

খৃষ্টাব্দের যে মাস হইতে বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ পত্রিকা পৌরসভাকে পুনরায় আমরা বাহির করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যে সব রাস্তা আছে, তাহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় আশি মাইল, তাহার মধ্যে পঞ্চাশ মাইল পাকা ও ত্রিশ মাইল কাঁচা। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য পৌরসভার নিজস্ব এগারটি বিদ্যালয় আছে। পৌর এলাকায় পানীয়জলের কলের জন্য কৃষ্ণদাস লাহা এক লক্ষ টাকা দান করেন। বর্তমানে এই পৌরসভার বাৎসরিক আয় প্রায় সাত লক্ষ টাকা। শহরে কোন বড় কল-কারখানা স্থাপিত হয় নাই বলিয়া পৌরসভার আয়ও বিশেষ বাড়ে নাই।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার জয়ন্তী উৎসব স্মরণার্থে হুগলী-চুঁচুড়ার অধিবাসীগণের এক সভায় পৌরসভা ভবনে 'টাউন হল' নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ জুলাই বঙ্গের ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট 'ভিক্টোরিয়া হল'এর উদ্বোধন করেন। পৌরসভা ভবনে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

1891.

VICTORIA HALL

This Town Hall was erected in pursuance of a resolution at a public meeting of the inhabitants of Hooghly and Chinsurah held on the 31st March 1887 to commemorate the Jubilee of Her Most Gracious The Queen Empress of India.

The Hall was declared open by His Honour The Lieutenant Governor of Bengal by Sir Charles Elliott, K. C. S. I. on the 10th July.

হুগলী-চুঁচুড়ায় পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের আমলে নির্মিত জলনিষ্কাশনের জন্য গভীর পয়ঃপ্রণালী আছে। এইগুলি বৈজ্ঞানিক প্রথায় সুসংস্কৃত করিলে অর্থাৎ ঢাল ঠিক করিয়া দিলে এবং সমস্ত নর্দমাগুলি পাকা করিলে পৌর এলাকায় জল নিষ্কাশনের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। হাওড়া শ্রীরামপুর ও বৃহৎ কলিকাতার অন্যান্য শহর অপেক্ষা এই স্থানের রাস্তাঘাট ও নর্দামা অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং আবর্জনা রাস্তায় দিনের পর দিন পড়িয়া থাকে না। এই সম্বন্ধে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রে হুগলী-চুঁচুড়া সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধারযোগ্য :

To one, who has seen Howrah, Serampore and some other towns in greater Calcutta areas, Chinsurah in general appearance presents a vast improvement, Its streets are fairly clean and it was the first place, where I saw the drains are freshly swept. What was more important, the sweepings were not left on the road to be washed back into the drains.

॥ ডাচ আমলের পুরাতন শহর হুগলী-চুঁচুড়া ॥

পৌর এলাকার মধ্যে যে সকল পুরাতন ভূগর্ভস্থ নর্দমা আছে সেইগুলি ভাঙিতে আরম্ভ করিলে শহরের অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০ মাঘ ১৩৬৮ সালে যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্য:

হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকার অধিবাসীরা অনিদ্রায় রাত কাটাচ্ছেন, তাঁদের আতঙ্কের কারণ, কখন বাড়ীর কিছুটা অংশ ধসিয়া পড়ে, কেহই জানে না।

এই শহরের পত্তন করে ডাচ বণিকেরা চারশ' বছর আগে। এই সময়ে নির্মিত ভূগর্ভস্থ নর্দমাগুলো একের পর এক শহরের বিভিন্ন স্থানে ধসতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই আট জায়গায় ধস নেমেছে, তার মধ্যে চারটি বড় রকমের। সৌভাগ্যের কথা, সব গর্তই কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে বাড়ীর বাগানে এবং রাস্তার মাঝে ও পাশে। তাই এ পর্যন্ত কেহ হতাহত হননি, যদিও দত্ত লজের মালিক বলেন যে, অল্পের জন্য তিনি ও তাঁর ছোট মেয়ে বেঁচে গেছেন। যেদিন সন্ধ্যাবেলা দত্ত লজে ধস নেমে এক বিরাট গহ্বর সৃষ্টি হয়, সে সময় তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। এরূপ ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে মোঘলটুলিতে ছোট ইমামবাড়ার ঘরের মেঝের নীচে, ডান মেমোরিয়ালের সামনে, হুগলী মহসীন কলেজের সামনে, [illegible] কাছে, আর বড় রাস্তায়, চারটি বাস রুটের স্ট্যান্ড ক্লক টাওয়ারের একেবারে কাছে।

সবচেয়ে মজার কথা এই, ভূগর্ভস্থ নর্দমাগুলো সকলেই জানে শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কেউই জানে না, কোথা দিয়ে কিভাবে এগুলি বহে গেছে। চারশ' বছরের পুরানো এই নর্দমার কোন নক্সা সরকারের কাছে নেই, পৌরসভার কাছে নেই অথবা অন্য কোন স্থানেও নেই। থাকা সম্ভবও নয়। নর্দমার গতি দেখে মনে হয়, অনেকের বাড়ীর তলা দিয়েই শাখা-প্রশাখায় বিরাট নর্দমা বহে গেছে। উপর থেকে কেউ কোনদিন প্রবাহিত জলরাশির নীচেকার গর্জন ধ্বনি শুনতে পেয়েছে বলে জানা যায়নি।

পৌরসভার বর্তমান পরিচালকের মতে, একে একে সকল নর্দমাই ধসে পড়বে এবং গহ্বরের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকবে। জোড়াতালি দিয়ে এই নর্দমাকে টিঁকিয়ে রাখা যাবে না, যদিও পৌরসভা বর্তমানে তাই করছেন অর্থের অভাবে। যেখানেই গর্ত দেখা দিচ্ছে, পৌরসভার পক্ষ থেকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে এবং তার পরই চলছে প্রয়োজনমত মেরামতির কাজ।

সারা শহরের ভূগর্ভস্থ নর্দমার একটা পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করতে প্রাথমিক হিসাবে খরচ পড়বে নাকি একুশ হাজার টাকার মত আর নতুন করে তৈরী করতে হলে কত খরচ পড়বে তার হিসাব এখনও করা হয়নি।

এদিকে পৌরসভার পরিচালকের কথা শোনার পর থেকে শহরের বাসিন্দারা অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে, শীগগিরই আরও অনেক গর্ত দেখা দেবে।

পৌর এলাকায় এখন রাস্তার দুধারে অনেক নূতন দোকানঘর এবং বহু নূতন বসতি স্থাপিত হইয়াছে। বাবুগঞ্জ, বালী, তামলীপাড়া, রায়বাজার, বড়বাজার, চৌমাথা প্রভৃতি

স্থানে এখন আর খালি জমি পাওয়া যায় না। এই শহরের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক জমকালো হইয়াছে।

॥ দ্রষ্টব্য স্থান ॥

হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ

১। বঙ্গের প্রাচীনতম ও প্রথম গির্জা **ব্যাণ্ডেল চার্চ**। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই গির্জা নির্মিত হয়।

২। চুঁচুড়া ব্যারাকের উত্তর দিকে অবস্থিত **আর্মেনিয়ান চার্চ**। ইহা ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে মার্গাস কর্তৃক স্থাপিত হয়।

৩। রোমান ক্যাথলিক **চ্যাপেল**—ইহা মিঃ সিবাস্টিয়ান-এর অর্থ সাহায্যে ১৭৪০ খৃটাব্দে নির্মিত হয়।

৫। **প্রোটেস্টান্ট চার্চ** ওলন্দাজ গভর্ণর ভার্নেটের ব্যয়ে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহার পূর্বদিকের দ্বারে পোর্তুগীজ ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছেঃ

"Ad Majorem Dei Gloriam edificare Jussit G. Vernet A. D. I767."

৫। ইউরোপীয় **গোরস্থান** সম্ভবতঃ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। এই স্থানে খ্যাত-নামা ব্যক্তিদের সমাধিস্তম্ভ আছে। সমাধিস্থানের উত্তরে একটি বহু পুরাতন বাড়ির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই বাড়িতে এখনও ভূতের উপদ্রব হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

৬। **চুঁচুড়া ব্যারাক** বঙ্গদেশের দীর্ঘতম অট্টালিকা। ইহার নির্মাণকার্য ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহা চারটি ব্যারাকে বিভক্ত। বড় ব্যারাকটি ছয়শত হাত লম্বা, ইহার মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন আদালতসমূহ ও জেলাবোর্ডের অফিস স্থাপিত। চতুর্থ ব্যারাক সার্কিট হাউস, সিভিল সার্জন ও পুলিস সুপারিন্টেডেন্টের বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্যারাকের বিবরণ ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭। পুরাতন **সার্কিট হাউস** ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাণ্ডেলে স্থাপিত হয়। এই ভবনে পূর্বে ডাকাতি-কমিশনার অবস্থান করিতেন। ইহা 'হগসাহেবের কুঠী' বলিয়া খ্যাত। স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এই ভবন পরিত্যক্ত হয়।

৮। **কমিশনারের আবাস ভবনে** পূর্বে ওলন্দাজ গভর্নর বাস করিতেন। সিটারম্যান ইহা নির্মাণ করিয়া ইহার নাম দেন "Welgeleegen" প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী স্টাভোরিনাস এই ভবনের একটি সুন্দর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে এই ভবনের অনেক পরি-বর্তন হইয়াছে। বর্ধমান বিভাগের কমিশনার এই ভবনে বাস করেন।

৯। **হুগলী ইমামবাড়ী** ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। ইহার সম্বন্ধে পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

১০। **জুবিলী ব্রিজ** ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী বর্ষে খোলা হয়। বড়লাট লর্ড ডাফরিন ইহার উদ্বোধন করেন। প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ লেসলী সেতুটি নির্মাণ করেন। সমস্ত সেতুটি লৌহ নির্মিত ও লম্বা বারশত ফুট। সেতুটি তিন ভাগে বিভক্ত, মধ্যভাগের লম্বা ৩ শত ৬০ ফুট নদীগর্ভ হইতে গ্রথিত দুইটি বৃহৎ

স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অপর দুই অংশ প্রত্যেকটি ৪ শত ২০ ফুট লম্বা গঙ্গার দুই দিক হইতে টানিয়া মধ্যের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানী নৈহাটী হইতে হুগলীর যোগাযোগকল্পে ইহা নির্মাণ করেন। গঙ্গার উপর ইহাই প্রথম সেতু। হাওড়া ইম্প্রভমেন্ট ট্রাস্টের চীফ-ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এস, চট্টোপাধ্যায় এই সেতু সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

It is of cantilever type with the central span projected on both ends resting on the central piers. One end of the shore spans rests on the cantilever arm of the central span and the other end rests on the abutments. (Indian Construction News, June 1960)

হুগলী শহীদ স্তম্ভ

হুগলী শহরে রায়বাহাদুর সতীশ মুখার্জি রোডের উপর একটি শহীদ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। উক্ত স্তম্ভে হুগলী জেলার দশজন শহীদের নাম আছে। এই নামের তালিকায় দু-তিন জন ছাড়া অনেকের নামই সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত নয় বলিয়া, উক্ত শহীদদের সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা পাঠকগণকে নিবেদন করিলাম। শহীদ স্তম্ভে যে নামগুলি আছে, তন্মধ্যে গোপীনাথ সাহা ব্যতীত আর কেহ আক্ষরিকভাবে ঠিক শহীদের মৃত্যু বরণ না করিলেও, তাঁহারা দেশপ্রেমিকরূপে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারাও আজ শহীদ পর্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। বিদেশী শাসকের নির্যাতন, অবহেলা ও বন্দী অবস্থায় অত্যাচারের ফলে ইহারা সকলেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। শহীদগণের তথ্যানুসন্ধানে শ্রীলালমোহন ঘোষ আমায় সহায়তা করিয়াছেন। শহীদ স্তম্ভে সাদা পাথরের উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছেঃ

বন্দেমাতরম্

স্বাধীনতা সংগ্রামে এই নগরের যাঁহারা আত্মবলি দিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেনঃ

গৌরহরি সোম
ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়
রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
সাগরলাল হাজরা
সেখ শরুর আহম্মদ
গোপীনাথ সাহা
নীলরতন গঙ্গোপাধ্যায়
শশীশেখর রায়চৌধুরী

মোদের দেশের আদর্শ এঁরা, এঁদের করি নমস্কার। জয়হিন্দ, ১৩৫৪।

॥ শহীদ পরিচয় ॥

গৌরহরি সোম ॥ হুগলী জেলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; হুগলীর প্রসিদ্ধ সোম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হুগলীতে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী থাকা কালে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কাঁথিতে লবন আইন ভঙ্গ করায় কারাবরণ করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার দুইবার কমিশনার নির্বাচিত হন। হুগলী জেলার সর্বত্র কংগ্রেসের বাণী ইনি প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার

তিনি সভ্য নির্বাচিত হন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার পরলোকগমনে যেরূপ মর্মস্পর্শী ভাষায় শোক প্রকাশ করেন, তাহা সকলের পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ॥ চুঁচুড়া রায়েরবেড়ের বিখ্যাত রায়চৌধুরী বংশের দৌহিত্র। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ, তিনি ডেনহাম সাহেব ভ্রমে ফাউল সাহেবের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ধৃত হন এবং অল্প বয়স বলিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে প্রেরিত হন। সেই স্থানে জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি সত্তর দিন অনশনে থাকেন। ইহাই ভারতের মধ্যে বোধহয় প্রথম অনশন। জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়। অতঃপর তিনি যে কতবার কারাবরণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ইনি হুগলী শহরের অধিবাসী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারার্থে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে পরলোকগমন করেন।

দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ॥ ইনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এম-এ ও ল' পড়িবার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। ওটেন সাহেবের প্রেসিডেন্সী কলেজের হাঙ্গামার সহিত তিনিও জড়িত ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ইনি সুবক্তা ছিলেন এবং হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করেন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ॥ ইনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। হুগলীর নানা স্থানে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করেন। আরামবাগ মহকুমার কেশবপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বিভিন্ন গ্রাম পরিভ্রমণের সময় তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কেশবপুরে পরলোকগমন করেন।

সাগরলাল হাজরা ॥ ইনি হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আরামবাগ মহকুমার বড়ডোঙ্গল গ্রামে তিনি খদ্দরের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঐ স্থানে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিবার অপরাধে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। জেলে থাকাকালীন তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং জেল হইতে বহির্গত হইয়া তিনি অকালমৃত্যু বরণ করেন। তথায় "আনার কুটীর" তাহার পুণ্য স্মৃতি বহন করিতেছে।

সেখ শরুর আহম্মদ ॥ ইনি হুগলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন; কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবকরূপে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি অকালে পরলোকগমন করেন।

গোপীনাথ সাহা ॥ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া হুগলী শহরে আসেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী তিনি তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার স্যার টেগার্টের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় পার্ক স্ট্রীটে রিভলভার দিয়া হত্যা করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে মিঃ ডে নামক এক সাহেবকে হত্যা করেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। বিচারালয়ে নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সংবাদটি উল্লেখ্যঃ

চৌরঙ্গীতে হুলুস্থুল : বাঙ্গালী যুবকের গুলীতে ইউরোপীয় আহত

গতকল্য সকালবেলা পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে একজন বাঙ্গালী যুবক জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও তিনজন মোটর চালককে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। যুবকটির নাম এখনও জানা যায় নাই। যুবকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াই পুলিশ তাহার পকেট খানাতল্লাস করিয়া একটি পিস্তল ও কিছু অব্যবহৃত টোটা বাহির করে। প্রকাশ যে, গতকল্য ৫॥ টার সময় হাসপাতালে মিঃ ডের মৃত্যু হইয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গোপীনাথের দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া সিরাজগঞ্জে জাতীয় সম্মেলনে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া গোপীনাথ বলেন "আমার রক্তের প্রতি বিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।"

নীলরতন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ইনি চুঁচুড়া শহরের অধিবাসী ও কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বলাগড় থানায় কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিবার সময় তাহার এক সহকর্মী পুলিশে ধরাইয়া দেয়। তখন তাহার কাছে একটি রিভলবার ছিল। তিনি দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কারাবাসকালে তাহার মৃত্যু হয়।

শশীশেখর রায়চৌধুরী ॥ ইনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় প্রসিদ্ধ রায়চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি যখন দেশবন্ধু মেমোরিয়াল স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় বিনা বিচারে তাহাকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করা হয়। আটক অবস্থায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অন্তরীণ অবস্থায় তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

॥ শোভা সিংহ ॥

শোভা সিংহ বর্তমান মেদিনীপুরের অন্তর্গত চেতোবরদার তালুকদার ছিলেন। শোভা সিংহের প্রপিতামহ রঘুনাথ সিংহ প্রথমে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন; রঘুনাথের পুত্র কানাই সিংহ চেতুয়া মহল ক্রয় করেন পরে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় চেতুয়া মহল বরদার জমিদার ফতে সিংহের হস্তে গিয়া পড়ে। শোভা সিংহের পিতা দুর্জয় সিংহ ওরফে দুর্লভ সিংহ ফতে সিংহের পুত্র বীর সিংহেব নিকট হইতে চেতুয়া ক্রয় করেন, এবং শোভা সিংহ পৈতৃক সম্পত্তি চেতুয়ার সহিত বরদা সংযুক্ত করিয়া দেন। এই উভয় মহলের সংযোগে

শোভা সিংহ প্রভৃত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। চারিপুরুষ মাত্র বাঙগলায় বাস করিয়া ক্ষুদ্র তালুকদার বাঙগলার অধিপতি হইবার উচ্চাশা পোষণ করিতে থাকেন।

বর্ধমান পরগণার জমিদার ও চৌধুরী কৃষ্ণরাম রায় কোন সময়ে শোভা সিংহের তালুক লুণ্ঠন করিয়াছিলেন—সেই আক্রোশে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ করেন; কথিত আছে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ ও চন্দ্রকোণার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন; বর্তমান আরামবাগ মহকুমার মধ্য দিয়া এক অজানা বনপথ অবলম্বন করিয়া দামোদর পার হইয়া শোভা সিংহ একদিন হঠাৎ বর্ধমান রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী স্থানে সসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণরাম এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি স্বীয় পুত্র জগৎরামকে স্ত্রী-বেশে "স্ত্রীনামারোহণযোগ্যাযানেন" নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায়ের সন্নিধানে কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করিলেন, এবং আপনার সামান্য সৈন্যসম্ভার লইয়া অসীম সাহসে শোভা সিংহের সম্মুখীন হইলেন। কথিত আছে যুদ্ধাভিযানের পূর্বে কৃষ্ণরাম স্বীয় অন্তঃপুরচারিনি-গণকে বৈরীকৃত লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিবার মানসে প্রাচীন রাজপুত প্রথানুযায়ী জহরব্রতের অনুকরণে স্বহস্তে হত্যা করেন; এ ব্যাপার সত্য হইলে জহরব্রতেরও উপর এক পর্যায় বলিতে হইবে!

অল্প সৈন্য লইয়া শোভা সিংহের বিপুল সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধে কৃষ্ণরাম পরাজিত হইলেন এবং শোভা সিংহ কর্তৃক নিহত হইলেন। শোভা সিংহ রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করিলেন এবং কৃষ্ণরামের পরিবারবর্গকে বন্দী করিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বর্ধমান পরগণা তাঁহার হস্তগত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত বলবৃদ্ধি হইল, দলে দলে লোক তাঁহার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল।

জগৎ রায় কৃষ্ণনগর হইতে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া সুবাদারের নিকট বর্ধমানের বিপত্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম স্বয়ং শান্তিপ্রিয় শৌর্যবিহীন যুদ্ধানভিজ্ঞ এবং বর্তমান বিদ্রোহের প্রকৃতি ও পরিণাম কল্পনা করিতেও অক্ষম—তিনি যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লার উপর হুকুম দিলেন, শোভা সিংহকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হউক।

বর্ধমান জয়ের পর শোভা সিংহের দলবৃদ্ধি হইয়াছিল, শোভা সিংহ উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এই সময়ে রহিম খাঁও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কেহ বলেন বর্ধমান যুদ্ধের সময় রহিম খাঁ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শোভা সিংহের অভিযান বর্ধমানের জমিদারের প্রতি প্রতিহিংসা প্রণোদিত হইয়াই আরম্ভ হয়; তার পর বর্ধমান জয়ের পর আশা আর বাঁধ মানে নাই, সমগ্র বাঙগলা করগত করিতে ধাবিত হইয়াছিল; সেই সময় রহিম খাঁর সহায়তার আবশ্যক হয়।

যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য—ইব্রাহিম শান্ত কাব্যামোদী, নূরউল্লা নামে মাত্র ফৌজদার, ফৌজের বড় একটা সংবাদই রাখেন না, ব্যবসায় বাণিজ্য লইয়া অর্থসঞ্চয় লইয়া তাঁহার দিন কাটিত। তিনি তিনহাজারী মন্‌সব্‌দার্, তিন হাজারের কতক সৈন্য কোনমতে সংগ্রহ

করিয়া যশোহর হইতে হুগলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভাগীরথী পার হইয়া বিদ্রোহী সেনার ভঙ্গী দেখিয়াই তিনি হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাঙ্গলায় পরদেশীর সাহায্যে গৃহবিবাদ নিষ্পত্তি চেষ্টার এইখানে সূত্রপাত এবং পলাশিতে তাহার উদ্‌যাপন। বিদ্রোহী সৈন্য হুগলী দুর্গ অবরোধ করিল; নুরউল্লা প্রমাদ গণিলেন, আপনার প্রাণরক্ষার্থে ব্যস্ত হইলেন এবং গোপনে "একমাত্র ল্যাঙ্গট পরিধান করিয়া কেবল নাক কান লইয়া পলায়ন করিলেন"। সেনানায়ক পলায়িত দেখিয়া সৈন্যগণ দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল এবং বিদ্রোহী কটক হুগলী বন্দরের মালিক হইল (১লা আগস্ট, ১৬৯৬) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া চারিদিক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। নিকটবর্তী প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ধনপ্রাণ লইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের সুরক্ষিত অধিকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একদিন মাত্র হুগলী সহর বিদ্রোহীর কবলে ছিল, পরদিন ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ দুইখানি রণতরীর সাহায্যে নদীবক্ষ হইতে হুগলী দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ করেন, তাহাতে বিদ্রোহী সৈন্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রাম অভিমুখে চলিয়া যায়। সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া শোভা সিংহ চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণপূর্বক লোক সকলকে করায়ত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন; যে বশ্যতা স্বীকার না করিল বা বিদ্রোহে যোগ না দিল তাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইল। শোভা সিংহ তৎপরে রহিম খাঁকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া নদীয়া ও মুকসুদাবাদ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং বর্ধমানে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতি সত্বর হুগলী হইতে মুকসুদাবাদ পর্যন্ত নদীতীরবর্তী চৌকী অর্থাৎ পণ্যশুল্ক আদায়ের স্থান সকল বিদ্রোহী সেনাপতির কবলিত হইল। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে রহিম খাঁ নাক কান লইয়া পলায়ন করেন বলিয়া তিনি "নাক কাটা রহিম" বলিয়া খ্যাত হন।

লুণ্ঠন নিরত বিদ্রোহী সৈন্য ভাগীরথীর পশ্চিম তীরভূমিকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। ইউরোপীয়গণের কুঠিগুলি—বিশেষতঃ চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণ ও চন্দননগরে ফরাসীগণ এক প্রকার অবরোধের মধ্যে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট হইতে প্রায় সকল ইতিহাস লেখক বলেন ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ কুঠিয়ালগণ সম্মিলিত হইয়া এই বিপত্তির হস্ত হইতে উদ্ধারলাভের আশায় নবাব সরকারে নালিশ করেন, তাহার উত্তরে তাঁহারা সাধারণ ভাবে আপনাপন কুঠির রক্ষাকল্পে নিজে ব্যবস্থা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। এই আদেশ দুর্গ নির্মাণের আদেশ ধরিয়া লইয়া তাঁহারা দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়া দেন; চুঁচুড়ায় ফোর্টগ্যাসটোভস্, চন্দননগরে ফোর্ট ডি-অরলিন্স এবং সুতানটিতে ফোর্ট উইলিয়াম ইহাই সূচনা। ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের সম্বন্ধে এ কথার কোনই মূল্য নাই। ওলন্দাজগণের দুর্গের সূচনা ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ও চন্দননগর দুর্গের সূচনা ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। কালে উক্ত দুর্গদ্বয়ের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং শোভা সিংহের বিদ্রোহের পর কিছু অধিকমাত্রায় হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু সূচনা উক্ত ঘটনার বহু পূর্বে হইয়াছিল—অনুমতির অপেক্ষায় ছিল না, ইহা নিশ্চয়। সুতানুটিতে ইংরাজগণের কথা স্বতন্ত্র—কেননা ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আগস্ট মাসে জব চার্ণক সুতানুটিতে মাত্র ৩০টি

সৈনিক লইয়া কুঠি বসান। শোভা সিংহের বিদ্রোহের ছুতায় পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম রচনা আরম্ভ হইয়াছিল একথা সত্য। সকল কুঠিয়ালই এই বিদ্রোহ দুর্বিপাকে অস্থায়ী ভাবে দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত করিয়া আপনাপন বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শোভা সিংহ বর্ধমানে চলিয়া গেলেও, বিদ্রোহী সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া হুগলী ও চন্দন-নগরের সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ বিধ্বস্ত করিতে থাকে এবং মোগল সৈন্যের সহিত বহু খণ্ড যুদ্ধ স্থানে স্থানে হইতে থাকে। ২৫-এ আগস্ট তারিখে চন্দননগরের উত্তর প্রান্তে নবাব সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীগণের এক যুদ্ধ হয়, নবাব সৈন্য পরাজিত হইয়া অরলিন্স দুর্গের প্রাচীরপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বিদ্রোহীদলের বল ও উপদ্রবের প্রকোপ অনুভব করিয়া, দেশের শাসনকর্তার ঔদাসীন্য ও অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া এবং পরোক্ষভাবে নিজের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিজেই করিতে হইবে এইরূপ ইঙ্গিত লাভ করিয়া, ইউরোপীয় বণিকগণ পরস্পর একটা মন্ত্রণার ব্যবস্থা করিলেন; চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের কুঠিয়াল, ফরাসি ও ইংরাজ কুঠিয়াল দ্বয়ের মার্টিন ও চার্ণকের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে বিদ্রোহী রাজার নিকট তিন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটা আবেদন পাঠান হউক, যাহাতে তিনি এই তিনটি বণিক সম্প্রদায়ের কুঠিত্রয়ের নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন। মোগলের সঙ্গে হিন্দু ও পাঠানের দ্বন্দ্বে খৃষ্টীয়ান বিদেশী বণিকের যেন কোন সম্বন্ধ নাই; যে মোগল রাজশক্তির অনুগ্রহে তাঁহারা বার মাস ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন যেন সে রাজশক্তির প্রতি তাঁহাদের কোন কর্তব্য বা তাহার সহিত কোন বাধ্যবাধকতা নাই! ওলন্দাজ কুঠিয়ালের উপরোক্ত প্রস্তাব সমীচীন বোধে মার্টিন ও ডেস-ল্যানডেস্ চন্দননগরের কর্তৃযুগল পেলি নামক, জনৈক ফরাসীকে প্রতিনিধিরূপে চুঁচুড়ায় পাঠাইলেন কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ওলন্দাজগণ সমবেত চেষ্টার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইলেন।

সমবেত হইয়া কার্য হইল না বটে কিন্তু ব্যষ্টিভাবে ফরাসী ও ইংরাজ, বিদ্রোহীর সহিত একটা বুঝাপড়ার ব্যবস্থা করিলেন—দেশদ্রোহীর সহিত গুপ্ত পরামর্শ বা আদান-প্রদানের প্রচেষ্টা রাজদ্রোহিতার প্রকারান্তর মাত্র, বিদেশী বণিকগণ সে কার্য করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। ওলন্দাজগণ সম্বন্ধে কোন লিখিত প্রমাণ পাই নাই কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন তাহা মনে হয় না।

ফরাসী অধিনায়ক ফ্রানসিস্ মার্টিন শোভা সিংহের সহিত এবং পরে হিম্মৎ সিংহের সহিত গুপ্তভাবে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া আশু বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফলকাম হন নাই। সেই বৎসর নভেম্বর মাসে একদল বিদ্রোহী সৈনিক চন্দননগরের সংলগ্ন গ্রামে (বোধ হয় বোড়োতে) অগ্নি-সংযোগ করিয়া দগ্ধ করিবার উপক্রম করে; মার্টিন তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করেন এবং একদল পদাতিক ও নাবিকসেনা পাঠাইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং ওলন্দাজগণের অনু-করণে, চন্দননগর দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে কাঠের বেষ্টনী দিয়া দুর্গকে সুদৃঢ় করেন ও ভাগীরথী তীরবর্তী প্রাচীর প্রান্তে তোপ বসাইবার স্থান নির্মাণ করেন; এবং ভাগীরথী

বক্ষে ভাসমান ইউসিল ও গেলার্ড (Ecucil & Gaillard) নামক জাহাজ দুইখানিকে সুসজ্জিত করিয়া প্রহরায় নিযুক্ত করেন। ব্রুস তাঁহার এ্যানালস নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"The French and Dutch declared against the Rajah but the English did not intermeddle with either party."

ফরাসী কিরূপ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তাহার কথা বলিয়াছি এইবার ইংরাজের নিরপেক্ষতার পরিচয় দিব।

"ওল্ড ফোর্ট উইলিয়ম ইন বেঙ্গল" নামক গ্রন্থে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট সেন্ট জর্জ হইতে প্রেরিত পত্রের যে প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে, তাহা এইরূপ :

That which respects your Honors affairs is the present security of the factory (Sutanuti). The carrying on the investment and fortifying of the factory. The Agent (Mr. Eyre) and Council seem to have taken the most prudent method for those purposes in maintaining a friendship with both parties in such a manner as that the Raja (Sobha Sing) doth not suspect them and yet the Nabab sends them thanks for their assistance against the Raja. It will be difficult for them to carry on such a policy long without being necessitated by one accident or other to declare for one party in which case we have advised them in our letter of the 5th instant to take the part of the Moors Government as far as will consist with their present safety. Because it is more probable they will at last subdue the rebel. Then those who have assissted him must fall under the displeasure (?) of the Govt. and if they have built anything like a fortification it will be observed and probably will either be demolished or must be maintained by force, whereas the buildings of these who have assisted the govermnent may probably be connived at if not too great and too much like a Fort.

পাঠকগণকে উপরোক্ত ছত্র কয়টি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি—এই "বরের ঘরে মাসি ও ক'নের ঘরে পিসি" পদ্ধতি—ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে—"hunting with the hounds and running with the hare." —এই "পলিসি" জাতি-বিশেষের চিরন্তন নীতি এবং বর্তমান নিরাপত্তাই একমাত্র কাম্যবস্তু এবং ইহারই নাম 'ডিপ্লোমাসি'।

বর্ধমান রাজপরিবার শোভা সিংহের বন্দী, তন্মধ্যে কৃষ্ণরামের পরমাসুন্দরী কন্যা কুমারী সত্যবতী বন্দিনী। শোভা সিংহ সেই কন্যার রূপে মুগ্ধ। তারিখি বাঙ্গলার অজ্ঞাত-নামা লেখক বলেন "চীনের ছবির মত সুন্দরী, পবিত্র হৃদয়া রাজকন্যা কোন মতেই ব্যভিচার

পাপে লিপ্ত হইবেন না, দুর্বৃত্ত শোভা সিংহ কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে।" একদা রাত্রি-যোগে শোভা সিংহ কন্যার কারাগৃহে প্রবেশ করিল—"এবং শয়তানের পরামর্শে সেই অলোক-সামান্য রূপবতীকে কলঙ্কিত করিতে হস্ত প্রসারণ করিল। তেজস্বিনী রাজকন্যা তীক্ষ্ণ-ধার প্রাণনাশক ছুরিকা এইরূপ দুঃসময়ের জন্য সংগোপনে রক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা দ্বারা শোভা সিংহের নাভির নিম্নে আঘাত করিয়া উদর বিদীর্ণ করিলেন, তারপর সেই অস্ত্রাঘাতে স্বীয় আয়ুসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।"

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ অনেক সৈন্য লইয়া বর্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায় পলায়নপর জগৎরামকে কিয়ৎ-কালের জন্য আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবদ্বীপাধিপতি সে আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিলেন।

যতদিন শোভা সিংহ জীবিত ছিলেন রহিম খাঁ তাঁহার অধীনে সেনানী মাত্র ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর সৈন্যগণ রহিম খাঁকেই অধিনায়কত্বে বরণ করিল এবং রহিম খাঁ রহিম সা পদবী গ্রহণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী প্রদেশের অধিপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। ইউরোপীয় অধিষ্ঠানগুলি ব্যতিরেকে, রাজমহল হইতে সুবর্ণরেখার তীর পর্যন্ত, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তাঁহার পদানত হইল। তাঁহার লোকবল ও অর্থবল একজন পরাক্রান্ত নরপতির সমতুল্য হইল—তাঁহার বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা—সৈন্য সংখ্যা, ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩০ হাজার পদাতি।

তখনও বাংলার সুবাদার নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট; রহিম সার অব্যাহত গতি কেহই রোধ করিতে পারিল না—না রাজা না প্রজা। রহিম সার ফৌজ মুকসুদাবাদে গিয়া হানা দিল। তথায় দুই একজন তালুকদার বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়া দলপুষ্টি করিল; কিন্তু নিয়ামৎ খাঁ নামে একজন সাহসী রাজভক্ত জায়গীদার রহিম সার আনুগত্য স্বীকার করিল না। বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ামৎ খাঁর মাথা লইতে আদিষ্ট হইল। নিয়ামৎ খাঁ, মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। প্রথমে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তাহওয়ার বিপুল বিক্রমে বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিলেন কিন্তু অচিরে শত্রু পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। নেয়ামৎ খাঁ যুদ্ধ সজ্জায় অপেক্ষা না করিয়া "কেবল একখানি তরবারি গলদেশে রক্ষা করিয়া দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে শত্রু সেনা বিদীর্ণ করিয়া মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া রহিম সাহের মস্তকে আঘাত করিলেন।" রহিম সার শিরস্ত্রাণ ও বর্ম তাহাকে বার বার নেয়ামতের নিদারুণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিল, পরিশেষে নেয়ামত সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নিদারুণ পিপাসায় কাতর হইয়াও শত্রু প্রদত্ত বারি প্রত্যাখান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এক এক করিয়া তিন জন বীরপুরুষ বিদ্রোহীর অবাধগতির প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ফল হইল না—বর্ধমানে কৃষ্ণরাম রায়, নদীয়ায় রামকৃষ্ণ রায় ও মুকসুদাবাদে নিয়ামৎ খাঁ। দেশে অরাজকতার স্রোত বহিয়াছিল, তাহার গতিরোধ ব্যক্তিগত চেষ্টার অতীত, সুতরাং উক্ত বীরত্রয়ের ব্যক্তিগত বীরত্ব ব্যর্থ হইল। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মুক-

সুদাবাদ, কাশিমবাজার, রাজমহল, মালদহ—সবই রহিম খাঁর করতলগত হইল। রাজমহল নগরে ট্যাঁকশাল ছিল; কাশিমবাজার একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান ও তন্নিকটবর্তী চুনাখালী, হুগলীর ন্যায় বিশিষ্ট বাণিজ্য শুল্ক গ্রহণের স্থান ছিল।

কাশিমবাজারের বণিকগণ, বিদ্রোহী সেনাপতির নিকট একখানি আরজি পাঠান, যেন তিনি সহরের উচ্ছেদ সাধন না করেন; রহিম সা তাহাদের আরজি মঞ্জুর করেন কিন্তু পরিশেষে নবাব বণিকগণের মুখপাত্র গোপীচাঁদের কঠিন অর্থদণ্ড করেন।

কাশিমবাজারস্থিত ওলন্দাজ ও ফরাসী কুঠিয়ালদিগের উপর বিদ্রোহী সেনাপতি শুল্ক আরোপ করিবেন এই আশঙ্কায় ফরাসী কুঠিয়াল ফর্নভিল পূর্বাহ্নেই পলায়ন করেন; এবং একজন দেশীয় ও একজন ফরাসী সৈনিক কুঠির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। টাকা না দিতে পারিলে দুইজনের উপর বেত্রাঘাতের আদেশ হয়, কিন্তু কোন প্রকারে উভয়ে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পান। ফরাসী কুঠি লুণ্ঠিত হয়।

দক্ষিণে সুতানুটি পর্যন্ত বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করিবার উপক্রম করে; স্থানীয় জমিদারগণ তাহাদের গতিরোধ করে। ২৩শে ডিসেম্বর (১৬৯৬) বিদ্রোহী সেনা ভাগীরথী পার হইবার চেষ্টা করে। "ডায়মণ্ড" নামক একখানা জাহাজ সুতানুটির "ট্যাঁকে" থাকিয়া তাহাদিগকে নদীপার হইতে নিরস্ত করে; "টমাস" নামে আর একখানা জাহাজ বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ থানা দুর্গের সহায়তায় প্রেরিত হয়।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সকল উপদ্রব চলিতে থাকে। মার্টিন চন্দননগরের দুর্গপ্রাচীরের আর এক কোণে আর একটি কামান স্থাপনের স্থান প্রস্তুত করেন; বিদ্রোহী সৈন্য মুহুর্মুহু চন্দননগরের নিকট লুটপাট করিতে থাকে, তাহাদের উপর গোলা চালাইয়া ও তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া চন্দননগরের কুঠি রক্ষা হয়।

তখনও বাঙ্গলার সুবাদার নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া ভাবিতেছেন—"তরবারির ধার নরম, বিবাদের শৃঙ্খল বড়ই লম্বা, স্বীয় হস্ত বড়ই সংকীর্ণ" অতএব "বাদসাহের নিকট আরজী পাঠান যাউক"। তিনি বলিতেন "যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণী হত্যা করিতে হয়, অতএব উভয়পক্ষেই অনর্থক প্রাণীহত্যা করিয়া কি ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে?"

বাদসাহ সংবাদপত্রে বাঙ্গলার এই শোচনীয় অবস্থার কথা ও তাঁহার প্রতিনিধির নিশ্চেষ্টতার কথা অবগত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পৌত্র আজীমুশ্বানকে বাঙ্গলা-বেহারের শাসনভার দিয়া সসৈন্যে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন এবং ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও অন্যান্য চাকলার ফৌজদার-পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহ দমন জন্য নিয়োজিত করিলেন। অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বিহারের শাসনকর্তৃগণও বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্রোহ দমনের এই বিপুল আয়োজনের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল; রহিম সা পরাজিত হইলেন ও বঙ্গে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল। ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁর কৌশল ও বীরত্ব, আজীমুশ্বানের মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা, ও রহিম সার পরাজয়ের বিশদ ইতিহাস পাঠকগণ রিয়াজ-উস্-সালাতিন গ্রন্থে পাঠ করিবেন।

বিদ্রোহ শান্ত হইল। ইউরোপীয় কোম্পানীর কুঠিয়ালগণ তাঁহাদের ডিপ্লোমাসির ধারা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া বর্ধমানে অধিষ্ঠিত "ইন্দ্রপ্রস্থরাজপৌত্রে"র দরবারে সাত কুর্ণিস করিয়া নজরানা বহন করিয়া হাজির হইলেন। প্রথমে গেলেন ওলন্দাজ, তারপর ইংরাজ, সর্বশেষে "গতিরন্যথা" হইয়া ফরাসী। চ্যালোন ও ফর্নাভিল (যাহারা কাশিমবাজার হইতে পলায়ন করেন) নামে দুই জন ফরাসী ২৫০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যসম্ভার লইয়া ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, সুলতান মুসেন্দীর দরবারে হাজির হইলেন। ফরাসী প্রতিভূদ্বয় সুলতানের দরবারে নাকি বড় সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন; প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে ওলন্দাজগণের মত এক মাস দর্শনলাভের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় নাই পরন্তু তাঁহাদের উপস্থিতির তৃতীয় দিনেই দুইবার সুলতানের সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা স্ব স্ব তরবারি লইয়া সুলতান সমীপে উপস্থিত হইতে হুকুম পাইয়াছিলেন; তৃতীয়তঃ দরবারে প্রবেশের পূর্বে তাঁহাদের তল্লাস লওয়া হয় নাই। তার উপর সুলতান আওরঙ্গজেব-দত্ত ফরমানের সমর্থন করিয়াছিলেন। মার্টিন সুলতানের এই আপ্যায়নে একেবারে গলিয়া গিয়াছিলেন।

উপন্যাসের ঘটনাবলীর ন্যায় চমৎকারিণী বিদ্রোহ-কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের প্রথমেই মনে হয় রাজমহল হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত করায়ত্ত করিয়াও বিদ্রোহী সেনাপতি, ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কেশস্পর্শ করিতে পারেন নাই কেন? সুদূর কাশিমবাজারের বা মালদার ক্ষুদ্র কুঠি লুঠ করিতে পশ্চাৎপদ না হইলেও, চুঁচুড়া বা চন্দননগরের ত্রিসীমায় আসিতে পারেন নাই কেন? সুতানুটি না হয় ভাগীরথীর পরপারে ছিল কিন্তু যে হুগলী লুট করিতে পারে সে চুঁচুড়া চন্দননগর ছাড়িয়া দেয় কেন? ইহার উত্তরে এক এক করিয়া অনেক কথাই মনে হয়—হয়ত সেগুলা নগণ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, হয়ত চুঁচুড়া চন্দননগর জলে স্থলে সুরক্ষিত ছিল, জাহাজী কামানের আক্রমণ বড় ধাঁধা লাগাইয়া দিত, হয়ত বা শ্বেতাঙ্গগণের ডিপ্লোমাসি আরও ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া সেগুলিকে রক্ষা করিয়াছিল। কেননা আমরা দেখিয়াছি দেশের রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া তাঁহারা বিদ্রোহীর সহিত মিত্রতা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আবার রাজা জয়ী হইলে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন এবং বিদ্রোহ নিবারণের ব্যয়স্বরূপ যখন রাজা শুল্ক আরোপ করিয়াছেন তখন চীৎকার করিয়া গগন ফাটাইয়াছেন।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে দেশের লোক ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য দেশের রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া, বিদেশীয় আশ্রয়ে আসিয়া ধনমান সমপর্ণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এতখানি বিদেশী-প্রীতি কোথা হইতে আসিল? চন্দননগরের বহু সমৃদ্ধ পরিবার শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় বা পরবর্তী কালে, মারাঠার অক্রমণের সময় সাতগাঁ বা তন্নিকটবর্তী স্থান হইতে পলাইয়া আসিয়া বাস করিয়াছেন—চুঁচুড়া ও কলিকাতায়ও তাহাই। যাঁহারা সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা আপনাদের ধনরত্ন বিদেশীর সুরক্ষিত কুঠিতে স্থাপন করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন। কেহই দেশের রাজাকে বা দেশের লোককে আশ্রয় করিতে পারে নাই।

নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় ৪০ হাজার টাকা সুতানুটির এজেন্ট মিঃ আয়ারের নিকট মাসিক শতকরা দশ আনা সুদে গচ্ছিত করিয়া রাখেন।

রামকৃষ্ণ চক্রী কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামকৃষ্ণের সহিত এজেন্ট সাহেবের বড়ই প্রীতি ছিল—কৃষ্ণচন্দ্রের ইংরাজপ্রীতি বংশগত বলিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে সেই পুরাতন কাল হইতে বিদেশী বণিক দেশের রাজা-প্রজার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিয়া আসিতেছে—এই মনের উপর আধিপত্য যথাকালে রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

শোভা সিংহের বিদ্রোহরূপ এই খণ্ডপ্রলয় যে বঙ্গদেশের বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গেল তাহার নিগূঢ় অভিসন্ধি তখনকার বোধ হয় কেহই বুঝিতে পারেন নাই—সে অভিসন্ধি আওরঙ্গজেবের বিশাল সাম্রাজ্যের পতন আর নব সাম্রাজ্যের সূচনা। আওরঙ্গজেব ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গতাসু হন—তাহার ঠিক ১০ বৎসর পূর্বে ফরাসী কোম্পানীর অধিনায়ক ফ্রান্সিস মার্টিন শোভা সিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, এই সকল ক্ষুদ্র বিদ্রোহ তাহারই পূর্ব সূচনা মাত্র। সে বিপুল বিপ্লবে বাদসাহের সন্ততি ও সামন্তগণ তাঁহার উত্তরাধিকার লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইবেন—তজ্জন্য তাঁহারা বহু পূর্ব হইতেই স্ব স্ব পক্ষ পরিপুষ্ট করিতে ব্যস্ত।" (১১)

॥ হুগলী ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না; হুগলীর যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য স্মরণাতীত কাল হইতে সপ্তগ্রাম নির্বাহ করিত। সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ বণিকদের যত্নেই এই শহরের গোড়া পত্তন হয়; পর্তুগীজগণ এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গোলঘাটে* একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং এই দুর্গ হইতেই আধুনিক হুগলী শহরের উদ্ভব হইয়াছে। ভাগীরথী তীরবর্তী যে সমস্ত স্থানে ইউরোপীয় বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এই স্থানটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পর্তুগীজদের বাণিজ্যকুঠি এই স্থানে সংস্থাপিত হইবার পূর্বে ইহা একটি নগণ্য স্থান ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কল্যাণে হুগলীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে **প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের** পতন হয়। সেইজন্য হুগলী তৎকালে প্রাচ্যের একটি প্রধান বন্দর হইয়া উঠে।

হুগলী নামটি পর্তুগীজের দেওয়া নাম; তৎকালে ভাগীরথী তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাইত এবং হোগলা হইতেই হুগলী নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন পুস্তক ও কাগজপত্রাদিতে হুগলী—ওগোলি, ওগলি, গোলিন, হিউগলি, হাগলে, গুলি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু ঠিক কোন সময়ে যে, হুগলীর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

* Golghat or, as it is sometimes written Gholghat. It was so called from the fact that in the bank here there was a semi-circular cove (*gol*, circular and *ghat*, landing stage.)

বঙ্গদেশে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ সর্বপ্রথম বাণিজ্য বিস্তার করে; সেই সময় ভাগীরথীর অগভীর জলে তাহাদের বড় বড় জাহাজ আনিবার সুবিধা হইত না বলিয়া, তাহারা মুচিখোলার নিকটে জাহাজ নোঙ্গর করিত এবং তথা হইতে ছোট ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিত। ইহার কিছুদিন পর হইতে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয় এবং সরস্বতী নদীর খরস্রোত ক্রমশঃ মন্দীভূত ও মৃতকল্প হওয়ায়, সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করা পর্তুগীজদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য বিস্তার করিবার কয়েক বৎসর পরে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সাম্প্রায়ো নামক জনৈক পর্তুগীজ হুগলীতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন। পর্তুগীজদের এই নূতন উপনিবেশের এক দিকে নদী ও তিন দিকে বিল থাকায় বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ সপ্তগ্রামের যাবতীয় বাণিজ্য সেইজন্য এই স্থানেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

সাড়ে-চারি শত বৎসর পূর্বে তারকেশ্বরের তিন ক্রোশ দূরে দামুন্যা গ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত চণ্ডীকাব্যে হুগলীর পার্শ্বে ত্রিবেণী এবং ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত হালিসহর, গরিফা প্রভৃতির উল্লেখ আছে; কিন্তু হুগলীর উল্লেখ নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে হুগলীর অস্তিত্ব ছিল না।

বঙ্গদেশের প্রথম সাময়িক পত্র "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্রে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রধান নগরগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইলঃ

"হুগলী শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই পূর্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের তাবৎ হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগের বাণিজ্যের স্থান সেই ছিল পরে সেখান হইতে কলিকাতা হইল ইংলণ্ডীয়েরা এদেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গানদীর নাম হুগলী নদী কহিতেন।" (১২)

মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী বঙ্গের দ্বিতীয় শহর ছিল এবং অনার্য রমণীগণের নৃত্যসহকারে গানের সময় তৎকালে হুগলী নামের উল্লেখ করা হইত। নাগর, ধানুক, ঢাঁই; কোচ, পলে প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ মধুর কণ্ঠে আজও এই "লাচারি" গাহিয়া থাকে। উক্ত গানের দুইটি পঙ্‌ক্তি হরিদাস পালিত লিখিত **মালদহের পল্লীভাষা** হইতে উদ্ধৃত হইলঃ

"হুগলী সহড় সতী, আলেচুড়ি হাড়ওয়া।
আহো, পাটনা সহড় চলি যায় মুরলি॥" (১৩)

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সুরধুনী কাব্যে হুগলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

হুগলী নগর অতি রমণীয় স্থান,
পর্তুগীজগণ আসি করিল নির্মাণ;
তাদের গিরিজা আজো বিরাজে তথায়,
তেমন গঠন এবে নাহি দেখা যায়।
অপরূপ পথ ঘাট, সুন্দর সোপান,
মনোহর হর্ম্যরাজি ছুঁয়েছে বিমান।

পর্তুগীজদিগের 'গোলিন' নামক উপনিবেশের মধ্যে বাবুগঞ্জ, ব্যাণ্ডেল, পিপুলবাতি প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী ছিল এবং বন্দর ছিল বলিয়াই 'ব্যাণ্ডেল' নামটির উৎপত্তি হয়। পর্তুগীজদের দ্বারা হুগলী শহরের প্রভূত উন্নতি হয় এবং এই স্থানে তাহারা সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। হুগলীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহারা সপ্তগ্রামের ফৌজদারকেই অমান্য করিত। সম্রাট আকবর পর্তুগীজদিগকে সুনজরে দেখিতেন বলিয়া তাহাদের ঔদ্ধত্য ও দুর্বৃত্ততা চরমে উঠিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'আইন-ই-আকবরি' পাঠে জানা যায় যে সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্ধ ব্যবহিত দুইটি স্থানই ফিরিঙ্গিদের হস্তে ছিল এবং দেশীয় লেখকদের প্রতি তাহারা নানারূপ অত্যাচার করিত। ভাগীরথীতীরে যে কয়েকটি স্থানে পাশ্চাত্ত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহার মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং তাঁহাদের মধ্যে পোর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম প্রাচ্যে আসিয়াছিল।

ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকগণের সহিত ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহারা অযথা অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা নবাবের বিনা অনুমতিতে গঙ্গার দুই পার্শ্বে অবস্থান করায়, প্রত্যেক নৌকার যাতায়াতের সময় শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত বালক-বালিকাগণকে হরণ করিয়া দাস-ব্যবসা করিত এবং হুগলী ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের নিরীহ প্রজাদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগের গৃহে অগ্নিদান করিত। নরহত্যা, নারীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি কোন কুকর্ম করিতেই তাহারা পরাঙ্মুখ ছিল না। তাহাদের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িত এবং 'মগের মুলুক' নামক ঘৃণিত কথা তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়াই বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাগীরথীতে দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া, তৎকালে ভাগীরথীর নাম 'দস্যু-নদী' ছিল, কর্ণেল ইউল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। (১৪)

পর্তুগীজগণ হুগলী ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রায় শতবর্ষ যাবৎ এইরূপ অখণ্ড আধিপত্য ও দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা যাহাদের পাইত তাহাদের নৌকায় তুলিত; নৌকায় তাহাদের হাতের 'চেটো' ছিদ্র করিয়া, ছিদ্রমধ্যে বেত ঢুকাইয়া নর-নারীকে স্তূপাকারে নৌকার পাটাতনের নিম্নে রাখিয়া দিত এবং সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগীকে ধান দিবার মত, তাহাদের মুখের উপর কিছু ভাত ছড়াইয়া দিত। পর্তুগীজদের আগমন-সংবাদ পাইলে পাছে তাহারা কূলে নামিয়া উপদ্রব করে এই ভয়ে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কূলে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাহাদের নৌকায় লোক পাঠাইয়া দিতেন। দস্যুরা টাকা লইয়া বন্দীগণকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইত। (১৫)

১৬২২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খোরাম উত্তরকালে সম্রাট্ শাহ্জাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর পর্তুগীজ শাসনকর্তা মাইকেল রড্রিকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রড্রিক তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অস্বীকার করেন এবং এরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, শাহ্জাহান তাহাতে বিশেষ অপমানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী মমতাজ বেগম পৌত্তলিক পর্তুগীজদিগের উপর বিশেষ

ভাবে বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। যাহা হউক, শাহ্‌জাহান বঙ্গের শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁকে নিবৃত্ত করিয়া দুই বৎসর বঙ্গাধিকারী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় পর্তুগীজদিগের অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া যান। পরে পিতা-পুত্রের মিল হইয়া যায়।

পরবর্তীকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি পর্তুগীজদের অত্যাচার দমন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং বঙ্গের শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে পর্তুগীজদের দূরীভূত করিবার আদেশ দেন। কাশিম খাঁ বিশেষ সতর্কতার সহিত হুগলী আক্রমণের বন্দোবস্ত করেন এবং হুগলীর দুর্গ অবরোধ করিয়া, জয় করিতে তাঁহার সাড়ে তিন মাস সময় লাগিয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করিলে মোগলেরা পর্তুগীজদের প্রধান আড্ডা হুগলী দুর্গ দখল করে। বিজিত পর্তুগীজগণ কেহ মোগলের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল এবং অনেকে গঙ্গায় অবস্থিত তাহাদের জাহাজে উঠিতে গিয়া জলে ডুবিয়া গেল। গঙ্গায় পর্তুগীজদের একখানি বড় জাহাজে দুই হাজার নরনারী বহু ধনরত্নাদিসহ উক্ত জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু মোগলদের হস্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া তাহারা আগুন দিয়া নিজেরাই জাহাজখানি পুড়াইয়া দেয়। চৌষট্টিখানি বড় জাহাজ, সাতান্নখানি মাঝারি জাহাজ এবং দুই শত ছোট জাহাজের মধ্যে মাত্র একখানি মাঝারি ও দুইখানি ছোট জাহাজ মোগলদের কবল হইতে পলাইতে পারিয়াছিল। সাড়ে চার হাজার পর্তুগীজ নরনারী ও বালক-বালিকা বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুন্দরী যুবতীগণকে বাদশাহ্‌ ও ওমরাহ্‌দিগের অন্তঃপুরে প্রেরণ করা হয় এবং বালক-বালিকাদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

হুগলী অধিকার করিয়া মোগলেরা এই স্থানে একজন **'ফৌজদার'** নিযুক্ত করেন এবং সরকারী দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তগ্রাম পতনের পর হুগলী রাজবন্দর ও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। জলদস্যু মগ-দিগের আক্রমণ হইতে হুগলী বন্দর রক্ষা করিবার জন্য হিজলীতেও একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল।(১৬) পর্তুগীজদের নির্মিত দুর্গ হুগলী আক্রমণের সময় মোগলরা ধ্বংস করিয়াছিল বলিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ উল্লা এই স্থানে একটি নূতন কেল্লা নির্মাণ করেন।

ক্রীতদাস ব্যবসা ও জলে দস্যুবৃত্তি পর্তুগীজদিগের কলঙ্ক বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তাহারা বণিক বেশে এই দেশে আসিয়াছিল; উদ্দেশ্য এই দেশ হইতে অর্থ ও পণ্য লইয়া তাহাদের দেশকে সমৃদ্ধ করা। বহু বৎসর যাবত তাহারা বাণিজ্য কার্যে ব্যাপৃত ছিল এবং পরিণামে উক্ত দুইটি কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও, তাহারা আমাদের অনেক কিছু দিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি এমন কি তাহাদের রক্ত পর্যন্ত অদ্যাপি বঙ্গদেশে বিদ্যমান, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পর্তুগীজশক্তি এই স্থান হইতে বিলুপ্ত হইবার পর, বহুদিন পর্যন্ত তাহাদের ভাষা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিদের

'কথ্য-ভাষা' বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল পর্তুগীজ শব্দ আসিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ৫৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিজলী রাজ্য মোগল কর্তৃক অধিকৃত হয়; উক্ত রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ হুগলীর ফৌজদার চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকগণের সাহায্যে উক্ত রাজাকে পরাজিত করেন এবং পুনরায় তিনি কারারুদ্ধ হন। হুগলীর ফৌজদার সেইজন্য সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কর্তৃক Zeevoogd উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং হিজলীর শাসনভারও তাঁহার অধীনে জনৈক 'ক্ষুদ্র রাজা'র উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।(১৭)

ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকগণ যত দিন পর্যন্ত না নিজেদের নিজস্ব স্থান লাভ করিয়াছিল, তত দিন তাহারা হুগলীতে ব্যবসা করিয়াছিল এবং তাহার ফল স্বরূপ হুগলী বাণিজ্যসম্পদে বিশেষ সম্পদশালী হইয়াছিল। মোগল শাসনকর্তা সেই সময় হুগলীতে বসবাস করিতেন। সুলতান সুজার রাজত্বকালে তাঁহার নিকট হইতে 'ফারমান' লইয়া ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং বঙ্গে ইংরেজদিগের এই প্রথম বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন। বঙ্গের সুবাদারগণের অনুগ্রহে পুজোপচারে তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ হুগলী পর্যন্ত মাল বোঝাই করিবার জন্য জাহাজ আনিবার অনুমতি পাইলেন। ইহার পূর্বে তাঁহারা ছোট নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া আনিয়া নদীর মুখে অবস্থিত জাহাজে বোঝাই করিয়া লইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রৌটন সম্রাট্ শাহজাহানের কন্যার চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিলে, সম্রাট্ ডাক্তারকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বদেশহিতৈষী ডাঃ গেব্রিয়েল ব্রোটন পুরস্কারের পরিবর্তে বিনা মাশুলে বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য করিবার অনুমতি চান এবং সম্রাট্ সেই অনুমতি দান করেন। তারপর কি ভাবে ইংরেজগণ বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া 'রাজদণ্ড' গ্রহণ করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ইংরেজ বণিকের সেই প্রথম কালের ইতিহাসের সহিত হুগলীর সম্বন্ধ আছে, কারণ এই স্থানেই ইংরেজের প্রথম বাণিজ্য-কুঠি নির্মিত হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যখন হুগলীতে প্রধান কুঠী ছিল সে সময় কুঠীর প্রধান কর্মচারীর (Agent) বেতন ছিল বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ তৎকালে এক পাউণ্ড আট টাকা হিসাবে ৮০০৲ টাকা। তাঁহার অধীনে দ্বিতীয় কর্মচারীর বেতন ছিল ৪০ পাউণ্ড বা ৩২০ টাকা, তৃতীয় কর্মচারীর ৩০ পাউণ্ড বা ২৪০৲ টাকা, চতুর্থ এবং পঞ্চম কর্মচারীর প্রত্যেকে বার্ষিক ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৬০৲ টাকা। সকল কর্মচারী একত্রে আহার করিতে বাধ্য ছিলেন। আহারের ব্যয় কোম্পানী দিতেন। বিবাহিত কর্মচারীগণ পৃথক খোরাকী পাইতেন। সুশৃঙ্খলের সহিত কার্য নির্বাহের জন্য নিম্ন-লিখিত নিয়ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য করা হয়ঃ

॥ ১ ॥ রাত্রি ৯টার সময় ফটক বন্ধ হইলে পর এবং রাত্রিতে অনুপস্থিত হইলে জরিমানা হইত ১০্ টাকা।

॥ ২ ॥ শপথ করিলে ১ শিলিং জরিমানা বা তিন ঘণ্টা কয়েদ হইত।

॥ ৩ ॥ মিথ্যা কথা কহিলে প্রত্যেক মিথ্যা কথার জন্য ১ শিলিং জরিমানা।

॥ ৪ ॥ মাতলামি করিলে ৪ শিলিং জরিমানা।

॥ ৫ ॥ উপাসনার সময় অনুপস্থিত থাকিলে প্রত্যেক বারের জন্য ১ শিলিং।

॥ ৬ ॥ পরস্ত্রীগমন, কুমারীগমন, অপবিত্রতা, অন্যবিধ পাপ কর্ম, কুঠীর শান্তি ভঙ্গ, সর্বদা বিবাদ বিসম্বাদ এবং প্রথম পঞ্চম নিয়মের পুনঃ পুনঃ ব্যতিক্রম করিলে অপরাধীকে মান্দ্রাজ ফোর্ট সেণ্টজর্জে গুরুতর শাস্তির জন্য প্রেরণ করা হইত।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বৎসর হুগলীর প্রধান কুঠীয়ালগণের অর্থাৎ এজেণ্টদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১। কাপ্তেন জন ব্রুক্ হেভেন্ ১৬৫০ ২। জেমস্ ব্রিগ্ম্যান ১৬৫১-৫৩
৩। পাউল্ ওয়াল্ডি গ্রেভ ১৬৫৩ ৪। জর্জ গর্চন্ এবং বিলিংসলী ১৬৫৮
৫। এজেণ্ট জনাথন ট্রেভিসা ১৬৫৯-৬৩ ৬। উইলিয়ম ব্রেক্ ১৬৬৩-৬৯
৭। শেম্ ব্রিজেস ১৬৬৯-৭০ ৮। ওয়াল্টার ক্লাভেল ১৬৭০-৭৭
৯। মেথিয়াস্ ভিন্সেণ্ট ১৬৭৭-৮২ ১০। এজেণ্ট উইলিয়ম হেজেস ১৬৮২-৮৪
১১। এজেণ্ট জন বিয়ার্ড ১৬৮৫ ১২। ফ্রান্সিস এলিস ১৬৮৫-৮৬
১৩। জব চার্ণক (১৬৮৬—কলিকাতা প্রতিষ্ঠা করেন)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী "কলিকাতা গেজেটে" হুগলীর উন্নতি কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এইরূপঃ

Hooglee : The city of Hooglee, which was the seat of Government of the Mussulmans, has been in a ruinous state for a long time. Mr. Smith, the Judge and Magistrate, has improved it so much that one who sees it now will not know that it is that old and decayed town. He has also, by his judicious arrangements and exertions, adorned it with a splendid spacious pucka ghaut opposite to his Cutchery,

কলিকাতা স্থাপয়িতা জব চারণক প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট হইয়া হুগলীতে ছিলেন। সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে জব চার্ণকের সহিত দেশীয় ব্যক্তিগণের নানা কারণে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল কারণ বাণিজ্যের জন্য তাহারা দেশের ক্ষতি করিতেছিল এবং মোগলের সহিতও ইংরেজদের সদ্ভাব ছিল না। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করাই সমীচীন মনে করেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বে মাদ্রাজের 'ফোর্ট-জর্জের' শাসনকর্তাকে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে 'ফরমান' গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং গঙ্গার

মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের অনুমতি, হিজলীতে দুর্গ নির্মাণ এবং তাঁহার কর্মচারীগণ কর্তৃক যাহাতে ইংরেজগণ অত্যাচারিত না হয় তদ্বিষয়ে নির্দেশ দিবার জন্যও মাদ্রাজের শাসনকর্তাকে আদেশ দেওয়া হয়। আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ হুগলীতে প্রেরিত হয় এবং উক্ত জাহাজে বারটি করিয়া কামান এবং ছয় শত করিয়া সৈনিক ছিল।

নবাবের আদেশে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করা হইবে শুনিয়া, জব চারণক কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবেন সংবাদ পাইয়া, তিনি সমাগত রণপোত ও ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে নবাবের তিন হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া হুগলীর ফৌজদারকে পরাভূত করেন। ইহাই ইংরেজগণের সহিত মোগলদের প্রথম সংঘর্ষ। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে হুগলীর রাজপথে এই যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ বণিকগণ নবাগত সৈন্যের সাহায্যে তোপ দাগিয়া হুগলী শহরের বহুলাংশ উড়াইয়া দেন। তোপের আগুনেই হুগলীর পাঁচ শত বাড়ী এবং পণ্যরাশি-পরিপূর্ণ ইংরেজদিগের গুদামঘর পুড়িয়া যায়, ফলে কোম্পানীর ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। হুগলীর ফৌজদার ইংরেজদিগের অতর্কিত আক্রমণে সন্ধির সর্তানুযায়ী বাংলার নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজদিগকে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

হুগলী যুদ্ধের পর গঙ্গার উপর ইংরেজদিগের প্রভুত্ব অনেক বাড়িয়া যায় এবং তাঁহাদের যুদ্ধ জাহাজগুলি সমগ্র গঙ্গা নদী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন নিকলসন নবাবের হুগলীর কুঠি পুড়াইয়া দিয়া হিজলী অধিকার করেন। ইহার পর জব চারণক ইংরেজ সৈন্যকে প্রেরণ করেন এবং বালেশ্বর অধিকৃত হয়। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা হুগলী লুণ্ঠন, হিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন কিন্তু ভারতসম্রাট্ আওরঙ্গজেব ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি কেবল-মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হুগলী, হিজলী ও বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায়?"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ এযাবত বঙ্গদেশে মাদ্রাজস্থিত কোম্পানীর অধীন-ভাবে বাণিজ্য করিতেছিলেন; ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মাদ্রাজ কোম্পানীর অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ হেজেস প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন ও হুগলীতে তাঁহার আবাসস্থান নির্ধারিত হয়। মিঃ হেজেসের পর মিঃ গিফোর্ড ইংরেজ কোম্পানীর দ্বিতীয় গবর্ণর হইয়া হুগলীতে আগমন করেন এবং হুগলী তখন ইংরেজের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময় কোম্পানীর আটাশ হাজার মণ সোরা বিলাতে প্রতি বৎসর রপ্তানি করিত।

সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ডাঃ ব্রোটনের চেষ্টায় ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই

সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'মীরকাশিম' নাটকের মধ্যে নবাবের নিজস্ব ডাক্তার ফুলারটন সাহেব মিরকাশিমকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধারযোগ্য:

"আজ আমার স্মরণ হইতেছে বাউটন নামে একজন ইংরেজ ডাক্তার সম্রাট্ সাজিহানের কন্যাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বদান্য বাদসা তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলেন। বাদশাই পুরস্কারে বাউটন ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন কিন্তু Trueborn Englishman আপনার স্বার্থ না দেখিয়া বাংলায় ইংরেজের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের সনদ লিখিয়া লইয়াছিলেন। আমিও ডাক্তার,† আমিও নবাবের বেগমকে আরাম করিয়াছি, আর স্বদেশী হত্যা দেখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণদণ্ড মকুব হইল।" ওম্যালী সাহেব বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার ইতিহাসে লিখিয়াছেন:

"In all, 198 prisoners were massacred including one Lushington, who had been one of the few survivors of the Black Hole of Calcutta. Only one Dr. Fullarton was spared on account of services which he had rendered to Mr. Kasim Ali."

শায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদারী প্রাপ্ত হন; তিনি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার শাসনকালে ইংরেজ বণিকগণের বিশেষ সুবিধা হয়।(১৮) ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ বঙ্গদেশ হইতে মোগল অধিকার উচ্ছেদ করিবার জন্য বিদ্রোহী হন এবং বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করেন।

রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার করিয়া, শোভা সিংহ বর্ধমান রাজ প্রাসাদ অধিকার করেন; রাজকুমার জগৎরায় নদীয়ায় রাজা রাম কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শোভা সিংহ রহিম খাঁ নামক একজন আফগান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া হুগলী অধিকার করে। ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সাহায্যে বিদ্রোহীগণকে বিতাড়িত করেন এবং তাহারা সপ্তগ্রামে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। অতঃপর তাহারা রহিম খাঁর নেতৃত্বে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হয়। শোভা সিংহের বীরত্বের ইতিহাস ৬৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

বর্ধমান রাজকুমার নদীয়ায় পলায়ন করেন, কিন্তু রাজকুমারী পলায়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শোভা সিংহ রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহার ধর্মনাশ করিবার চেষ্টা করিলে, তেজস্বিনী রমণী ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহকে হত্যা করিয়া, নিজেও আত্মহত্যা করেন। অতঃপর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া লন।

দেশে এইরূপে অরাজকতার সুযোগে ইংরাজগণ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, ফরাসীগণ চন্দননগরে আরলী দুর্গ (Fort Orleans) এবং ওলন্দাজগণ চুচুঁড়ায় গেসটোভস্ দুর্গ (Fort Gastoves) দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব বঙ্গদেশে শান্তি স্থাপনার্থে তাহার পৌত্র আজিম ওস্বানকে প্রেরণ করেন। তিনি বঙ্গে আসিয়া দেখিলেন শোভাসিংহ নিহত এবং নবনিযুক্ত বঙ্গেশ্বর জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ অনেক দমন করিয়াছেন দেখিয়া তদানীন্তন জমিদারগণের সহিত বর্ধমানে থাকিয়া তিনি আনন্দোৎসব

করিতে লাগিলেন। বর্ধমানে যখন আনন্দোৎসব চলিতেছে, সেই সময় বিদ্রোহীগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া হুগলী এবং নদীয়া লুণ্ঠন করে।

"Thus while the prince was amusing himself at Burdwan, receiving the congratulations of Zamindars and principal men of the province, the rebels again collected in greatest force and had the audacity, not only to plunder the district of Nuddeah and Hoogly but to encamp within a few miles of Burdwan." (১৯)

॥ সিরাজদ্দৌলার বংশধর ॥

পলাশীর যুদ্ধ অভিনয়ের পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি নবাব সিরাজদ্দৌলা নিহত হন; মুর্শিদাবাদের খুসবাগে অদ্যাপি তাহার এবং নবাব আলিবর্দী খাঁর সমাধি দৃষ্ট হয়। নবাব সিরাজদ্দৌলার বংশধরগণ, তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। কোন ঐতিহাসিক তাঁহার বংশধরগণের বিষয় কোন কথা আলোচনা করেন নাই বলিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ্য।

নবাব আলিবর্দী খাঁর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, দুইটি কন্যা জন্মিয়াছিল; জ্যেষ্ঠের নাম আমিনা বেগম এবং কনিষ্ঠার নাম ঘষেটি বেগম। আমিনার সহিত নবাব হাইবৎ জঙ্গ এবং ঘষেটির সহিত নবাব সহমৎ জঙ্গের বিবাহ হয় কিন্তু কনিষ্ঠা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠা আমিনা বেগমের মির্জা মহম্মদ ও এক্রামদ্দৌলা নামক দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে এবং মির্জা মহম্মদ পরবর্তীকালে নবাব সিরাজদ্দৌলা নাম ধারণ পূর্বক বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা মৃত্যুকালে কুদসা বেগম নামে একটি কন্যা রাখিয়া যান, তাঁহার সহিত এক্রামদ্দৌলার পুত্র মুরাদুদ্দৌলার বিবাহ হয়। কুদসা বেগমের সামসের আলি খাঁ নামক একটি পুত্র এবং চারিটি কন্যা জন্মে; সামসের আলি ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে ১৮২৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পান এবং তাহার চার ভগ্নী যথাক্রমে ৯১৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। সামসের আলির দুইটি পুত্র জন্মে জ্যেষ্ঠ সৈয়দ লুৎফ আলি ও কনিষ্ঠ সৈয়দ জয়নাল আবেদিন। কনিষ্ঠ অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হন এবং জ্যেষ্ঠ সৈয়দ লুৎফ আলি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের সরকারী আদেশে মাসিক ৮০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। তাঁহার ফতেমা বেগম নাম্নী একটি কন্যা হয় এবং তিনিও সরকার হইতে মাসিক ১৪১৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দ্বারা দিনাতিপাত করেন।(২০) তাঁহার লুৎফন্নেসা বেগম, হাসমৎ আরা বেগম এবং অলফুন্নেসা বেগম নামক তিন কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ মাসিক ৮১৲ টাকা করিয়া এবং অন্য দুই কন্যা মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পান।

হাসমৎ আরা বেগম, মৌলভী সৈয়দ জাকি রেজা নামক এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন, তিনি পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলার সাব রেজিষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেও ১৯৩২

খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে সরকারী নির্দেশানুযায়ী (Govt. Order No. 152N.) ১৫৲ করিয়া বৃত্তি পান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনটি বিবাহযোগ্যা কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই এবং তাঁহারা মুর্শিদাবাদের মোগলটুলি অঞ্চলের একটি ভগ্ন বাটিতে দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া, কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।

রেজা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সৈয়দ গোলাম হায়দার এবং তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এটওয়াতে ড্রইং অফিসে ড্রাফট্‌সম্যানের অর্থাৎ নক্‌সার কার্য করেন। মধ্যম পুত্রের নাম সৈয়দ মহসিন রেজা এবং তিনি এম. ইস্পাহানী লিমিটেডে কার্য করেন। তৃতীয় পুত্র গোলাম মোর্তাজা মুর্শিদাবাদে সাব ডিভিস্যানাল অফিসারের দপ্তরে কেরানীগিরি চাকুরী করেন। চতুর্থ পুত্র সৈয়দ গোলাম আহম্মদ মুর্শিদাবাদে কৃষিকার্য করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ রেজা আলি বি-এ পাশ করিয়া ৭৫৲ টাকা মাহিনায় আবগারি বিভাগের ইন্সপেক্টর-রূপে কলিকাতায় চাকুরী করিয়া বর্তমানে দিনাতিপাত করিতেছেন।(২১)

বাঙ্গলাদেশে কিছুদিনের জন্য মুসলমানদের হস্তে ক্ষমতা আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার এই নবাব বংশকে রক্ষা করিবার জন্য করা হয় নাই, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

নূরউল্লা খাঁ যে সময়ে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ দেওয়া হয়। তিনি সৈন্য লইয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু শোভা সিংহ আসিতেছেন শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাত্রে ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন। হুগলী বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। পরে ইব্রাহিম খাঁ ওলন্দাজগণের সাহায্যে হুগলী পুনরুদ্ধার করেন।

হুগলীর ফৌজদার জৈনউদ্দীন ইউরোপীয়ানদের সাহায্য করিতেন বলিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া ওয়ালিবেগকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। জৈনউদ্দীন ফরাসী ও দিনেমারদিগের সহায়তায় ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ইউরোপীয় জাতিগুলিকে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু তাহারা জৈনউদ্দীনকে সাহায্য করে। ফলে মধ্যস্থতা করিবার জন্য নবাব কর্তৃক প্রেরিত দিলপতি সিংহ ফরাসী কামানের গোলায় নিহত হয়।(২২) তৎপরে হাসান আলি খাঁ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুজা খাঁকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলীবদর্দী খাঁ তাঁহাকে নিহত করিয়া বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই সময় মারহাট্টারা বঙ্গদেশ লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং ইহাই 'বর্গীর অত্যাচার' বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বর্গীর অমানুষিক অত্যাচারে পশ্চিম বঙ্গবাসী যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে,

ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বর্গীদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরেজ বণিকগণ কলিকাতায় 'মহারাষ্ট্র-খাত' (Marhatta Ditch) খনন করিয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক কলিকাতাকে সুরক্ষিত করেন। দেশে অরাজকতা বিরাজ করিতেছে দেখিয়া ভাগীরথী ও সরস্বতী তীরবর্তী গ্রামগুলি হইতে অসংখ্য নরনারী তাহাদের ধনপ্রাণ এবং নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বিধর্মী ইংরেজের শরণাপন্ন হয় এবং ইংরেজ বণিকগণের নব-নির্মিত বর্গীদের অনধিগম্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি হিন্দু মহারাষ্ট্রীয়গণ হিন্দু বঙ্গবাসিগণের প্রতি অত্যাচার না করিয়া কথঞ্চিৎ সাহায্য করিত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস যে ভিন্ন রূপ ধারণ করিত তাহা সুনিশ্চিত। বর্গীদিগের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। "বর্গীরা গ্রাম ও নগর পুড়াইয়া শস্যভাণ্ডারে আগুন লাগাইয়া এবং পুরুষের নাক-কান ও পুরস্ত্রীর স্তন কাটিয়া ও সতীত্ব নষ্ট করিয়া বাংলার প্রজাকুলকে সংহার করিয়াছিল।" (২৩)

হুগলীর ফৌজদারের নিকট ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তৎকালে সুতানটির জন্য ৩০৫ টাকা, গোবিন্দপুরের জন্য ৭০ টাকা ও কলিকাতার জন্য ৩৩ টাকা করিয়া কেবলমাত্র খাজনা দিত।

নবাব আলীবর্দী বর্গীদের সহিত পরে সন্ধি করেন যে, তিনি বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা করিয়া তাঁহাদের কর দিবেন; তাহা হইলে তাহারা আর বাংলায় অত্যাচার করিবে না। বর্গী সেনাপতি শিবরাও হুগলী লুণ্ঠন করেন। মীর হবিব হুগলী অধিকার করিবার জন্য বর্গীদের সহিত যোগ দেন এবং তিনি মীর আবুল হাসান ও আবুল কাশিম নামক দুই জন বণিকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বর্গীদের সাহায্যে হুগলী কিছুদিনের জন্য নিজ অধিকারে রাখেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হেদায়েৎ আলী হুগলীর ফৌজদার ছিলেন, সেই সময় নবাব আলীবর্দী খাঁ নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দেন। এই সময় চতুর্দিকে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নবাবের কাছে সকল সংবাদ পেঁছিত না। হেদায়েতের সহিত নন্দ-কুমারের অমিল হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই সময় হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক সাতাশ হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন। (২৪) পরে মহম্মদ ইয়ার বেগ হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে তিনি 'দেওয়ান নন্দকুমার' নামে অভিহিত হন। এই সময় আলীবর্দী সিরাজদ্দৌলাকে তাহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন এবং সিরাজও কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া যান। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে নবাব আলীবর্দী গতাসু হন এবং মৃত্যুকালে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজ বণিকদের হইতে সাবধান থাকিতে বলেন। (২৫)

নবাব আলীবর্দী সিরাজদ্দৌলাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ইংরাজদের দুর্গ স্থাপন বা সৈন্য সংগ্রহ করিতে দিয়া বিপদে পড়িও না; যদি তাহা করিতে দাও, তাহা হইলে এই দেশ আর তোমার থাকিবে না।"

"Suffer them not, my son, to have fortifications or soldiers ; if you do, the country is not yours." (Ibid. Vol I, Pp. 16)

সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের মাতৃষ্বসা ঘসেটী বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিবার সংকল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে সেই জন্য বহু ধনরত্ন দিয়া ইংরেজের নিকট কলিকাতায় পাঠান। সিরাজদ্দৌলা এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার চারদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং কৃষ্ণদাসকে ফেরত দিতে বলেন। ড্রেক সাহেব কৌশলে কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া যান এবং কলিকাতাকে প্রাচীরবেষ্টিত করা হয় নাই বলিয়া পত্র দেন। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন এবং ইংরেজগণ পরাজিত হইয়া শিবপুর ও ফলতা নামক স্থানে পলায়ন করে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা যে ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার মাতা আমিনা বেগম পছন্দ করিতেন না। কারণ আমিনা বেগম ও ঘসেটী বেগম ইংরেজের সহিত হুগলীতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইলে ইংরেজের সহিত ঝগড়া করিলে চলিবে না জানিয়াই তাঁহারা বিপদের সময় সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। আফিম ও সোরা জলঙ্গী দিয়া উমিচাঁদের মারফত হুগলীতে ইহাদের ব্যবসা চলিত। (২৬)

মহম্মদ আলি এই সময় হুগলীর ফৌজদার ছিলেন; খোজা ওয়াজিদ নামে একজন ধনী মুসলমান বণিক সেই সময় হুগলীতে বাস করিতেন, দৈনিক এক হাজার টাকা তাঁহার ব্যয় ছিল। তিনি ফরাসী জেনারেল ল' সাবেবকে সিরাজদ্দৌলার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহম্মদ আলি বিশেষ কাজের লোক ছিলেন না বলিয়া, তাঁহার পরিবর্তে নবাব সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরেজগণ ফলতায় পলায়ন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি; নবাব ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ আর কিছু করিবে না, সেইজন্য তিনি তাঁহাদিগকে ফলতা হইতে বিতাড়ন করেন নাই। কিন্তু ইংরেজগণ সেই সময় ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে নন্দকুমার হুগলী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। হুগলীর সহিত নন্দকুমারের সম্বন্ধের বিষয় ৬৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হন; তিনি ইংরেজদের আগমন রোধ করিবার জন্য বজবজ দুর্গের সংস্কার ও কলিকাতার দক্ষিণে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ এবং শিবপুরের দুর্গটিও সংস্কার করেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর নবাব কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান ইংরেজের সহিত মিলিত হন এবং ইংরেজের যাহাতে খাদ্যাভাব না হয় সেইজন্য ফলতায় হাট বসান। ক্লাইভ এই সময় সৈন্য লইয়া মাদ্রাজ হইতে আগমন করেন; দেওয়ান মাণিকচাঁদ বজবজে গিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধের অভিনয় করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, বজবজ ইংরেজ সৈন্য দখল করিল। তাহার পর মাণিকচাঁদ হুগলীতে নন্দকুমারকে সংবাদ দিয়া, মুর্শিদাবাদে নবাবকে সংবাদ দিতে চলিয়া

গেল; কলিকাতা অরক্ষিত অবস্থায় রহিল এবং ক্লাইভও সেই সুযোগে ইংরেজ সৈন্য লইয়া অবাধে কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতা পুনরাধিকারের সংবাদ পাইয়া হুগলী রক্ষার জন্য নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল এবং নূতন তিন হাজার, মোট পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া হুগলীকে সুরক্ষিত করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী মেজর কিলপ্যাট্রিক ইংরেজ সৈন্য লইয়া হুগলী আক্রমণ করিল। গোলাবর্ষণে হুগলীর কেল্লার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায় এবং উক্ত স্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে প্রবেশ করিয়া ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি কয়েকটি স্থান লুণ্ঠন ও গ্রামে অগ্নিদান করে। নন্দকুমার যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে হারাইয়া দেন এবং ইংরেজগণ কলিকাতায় পলাইয়া আসে। ইহার পর ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ হয়; বাংলায় কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেও ক্লাইভ মনে করিলেন যে, যদি ফরাসীগণ নবাবের সাহায্য পায়, তাহা হইলে বাংলার ইংরেজগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; সেইজন্য ক্লাইভ চন্দননগর আক্রমণ করেন। নবাবের সহিত ফরাসীদের বিশেষ প্রীতি ছিল, কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধে নন্দকুমার ফরাসীদিগকে সাহায্য না করায়, সিরাজদ্দৌলার নিকট সংবাদ গেল যে, নন্দকুমার ইংরেজের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া সাহায্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নবাব সেইজন্য নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্মি সাহেব লিখিয়াছেন—"নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরেজ কখনও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারিত না।"

১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ফরমান অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে হুগলীর ফৌজদারের নিকট বার্ষিক তিন হাজার টাকা বাণিজ্য-শুল্ক দাখিল করিতে হইত। ইহা ছাড়া, প্রতি চার মাস অন্তর ৪২৫৲ টাকা ভূমির রাজস্ব এবং হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক দুইশত টাকা নজরানা দিতে হইত। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট তারিখের মন্ত্রণাসভায় বাণিজ্য-শুল্ক ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদে দাখিল করা স্থির হয় কিন্তু ভূমির রাজস্ব হুগলীতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দাখিল করা হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের ছয় মাস পরে হুগলীর ফৌজদারের নায়েব সোলেমান বেগের সহিত কোম্পানীর ঘোলঘাট কুঠির সংলগ্ন জমিতে একটি বাজার উপলক্ষে গোলমাল হয়। তখনও সোলেমান বেগ বুঝেন নাই যে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজগণ বাঙ্গলার প্রভু হইয়াছেন।

পলাশীর রঙ্গমঞ্চে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ এ জুন যে যুদ্ধের অভিনয় হয় তাহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মিরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান এবং ক্লাইভের অনুমোদনে নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। মিরজাফরকে বাংলার নবাব করিলে তিনি যে টাকা ক্লাইভকে দিবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন, ক্লাইভ সেই টাকা চাহিলে তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হওয়ায়, নবাব ক্লাইভকে হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দেন এবং ক্লাইভ মহারাজ নন্দকুমারকে উক্ত রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের

১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'তহশীলদার' হন; হেষ্টিংস সেই সময় বর্ধমানের রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্ধমানের রাজা তাঁহার রাজস্ব হেষ্টিংসকে দিতেন এবং হেষ্টিংসের ঐ স্থানে তখন অনেক উপরি পাওনা ছিল। নন্দকুমার বর্ধমানের রাজাকে রাজস্ব তাঁহার নিকট হুগলীতে পাঠাইতে বলেন এবং সেইজন্য হেষ্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হয়। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট নন্দকুমারকে দুই বার বন্দী করেন। দেশের ও দশের উপকারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু হেষ্টিংসের চেষ্টায় মিথ্যা জাল মোকদ্দমায় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তাঁহার ফাঁসি হয়। বর্তমানে কলিকাতায় যে স্থানে বিডন উদ্যান হইয়াছে, পূর্বে উক্ত স্থানে মহারাজার সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল।

মিরজাফর ইংরেজের প্রতি বিরূপ হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ বণিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকে গদিচ্যুত করেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হন পরে তাহার সহিতও ইংরেজের মতানৈক্য হয় এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মিরজাফর দ্বিতীয়বার বঙ্গের মসনদে বসিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে 'নবাবী' করিতে হইল না। নবাব মীরকাশিমের শাসনকালে বর্গী-দলপতি শ্রীভট্ট পুনরায় হুগলী লণ্ঠন করেন। (২৭)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী, মিরজাফর দেহত্যাগ করিল; নন্দকুমার দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া মিরজাফরের পুত্র নাজিমদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসান। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক মতিরাম নামক এক ব্যক্তি হুগলীর ফৌজদার এবং বসন্ত রায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পরবর্তীকালে কোম্পানীর দ্বারা হঠাৎ কারারুদ্ধ হন।

॥ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ॥

মিরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আগস্ট মাসে সম্রাট সা-আলম কোম্পানীকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন কিন্তু পরবর্রী সাতবর্ষ যাবত দেশীয় কর্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে রাজস্ব আদায় হইত বলিয়া সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে এবং দুর্ভিক্ষে বাঙ্গলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পূর্বে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আর একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং মনুষ্যগণ নরমাংস খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছিল বলিয়া আবুল ফজল কৃত 'আকবরনামায়' লিখিত আছে। (২৮) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরে ইংরেজ বণিকগণ ও রেজা খাঁ সমগ্র বঙ্গের ধান্য একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর লর্ড ক্লাইভের স্বাক্ষরিত সিলেক্ট কমিটির একখানি পত্রে ক্লাইভ দেওয়ানীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

The collecting of all the revenues and after defraying the expenses of the army, and allowing a sufficient fund for the support

of *Nizamut*, to remit the remainder to Delhi or wherever the King shall reside or direct.

এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হয় এবং শিয়াল কুকুর রাস্তায় বসিয়া শব ভক্ষণ করিত। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর মৃতদেহে গঙ্গা ভরিয়া গিয়াছিল এবং শবদাহ করিবার কোন লোক ছিল না। দুর্ভিক্ষে হুগলীর অবস্থা সম্বন্ধে মেকলে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলামঃ

"Tender and delicate woman whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner-chamber in which Eastern jealousy had kept watch over their beauty, throw themselves before the passerby and with loud wailing, implored a handful of rice for their children. The Hooghly rolled down every day thousands of crops closed to the porticos and garden of the English conquerors." (২৯)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর।† মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙালী কাঁদে ও উৎসন্ন যায়।" (আনন্দমঠ)

এদেশীয় লেখকগণ এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নাই, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। তবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও নবাব রেজা খাঁর অত্যাচারের বিষয় একটি কবিতা তৎকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল; নিম্নে উহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইলঃ

"নদ-নদী খাল-বিল সব শুকাইল,
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল।
দেশের সমস্ত মাল কিনিয়া বাজারে
দেশ ছারখার গেল রেজা খাঁর ডরে।
একচেটে ব্যবসায় দাম খরতর,
ছিয়াত্তরে মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর।

† ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হয়; তাহার পর নাজিমদ্দৌলা নবাব হন এবং তৎপরে (১৭৬৬—১৭৭০) নবাব মিরজাফরের পুত্রদ্বয় সেফাউদ্দৌলা ও মুবারকউদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীকে শাসনভার দিয়া পেনসন প্রাপ্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র' মিরজাফর শব্দটি বঙ্গের ইংরেজ তাঁবেদারী নবাব এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে,
মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।"

স্যার জন শোর (পরবর্তীকালে লর্ড টেনমাউথ) সেই সময় বঙ্গদেশে ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিষয় কবিতাকারে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। উক্ত কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উল্লিখিত হইলঃ

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shribelled limbs, sunk eyes and lifeless hue ;
Still hear the mother's shrieks and infants moans,
Cries of despair and agonizing groans,
In wild confusion dead and dying lie ;
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl, as midst the glare of day
They riot unmolested on their prey !
Dire scenes of sorrow, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface." (৩০)

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণ হুগলীকে "বঙ্গদেশের চাবি কাঠি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের পর, প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী স্ট্রাভোরিনাস এই স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হুগলীর মধ্যে নবাবের বাড়ি ও হস্তিশালা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হুগলীকে শ্মশান করিয়া দিয়া গিয়াছে। পর্তুগীজ, মোগল, ইংরেজ, বর্গী প্রভৃতির অত্যাচার যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তাদের আত্মঘাতী নীতির ফলে, হুগলীর সেই সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৩৩ এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দেও হুগলীতে দুর্ভিক্ষ হয়।

হুগলীতে বিভিন্ন সময়ে চারটি দুর্গ ছিল। সর্বপ্রথম হইতেছে পোর্তুগীজ দুর্গ—১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ এই দুর্গ অধিকার করে। এই দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নাংশ বর্তমান জেলখানার নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী রাজকীয় বন্দরে পরিণত হইলে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ একটি দুর্গ নির্মাণ করনে। ইহা হুগলীর দ্বিতীয় দুর্গ। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মোগলদুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বর্তমান ইমামবাড়ি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভবন, পুরাতন আদালত প্রভৃতি স্থান লইয়া মোগলদুর্গ অবস্থিত ছিল। মোগলদুর্গের পরীখার পূর্বাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। তৃতীয় দুর্গ হইতেছে ইংরাজদের স্থাপিত ঘোলঘাট দুর্গ। বর্তমান জেলখানার কিছু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। এখন ইহার আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। হান্টার সাহেব হুগলীতে পোর্তুগীজদের ঘোলঘাট দুর্গ সম্বন্ধে "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্যঃ

GHOLGHAT—Village in Hugli District, Bengal. Famous as the site of a fortress built by the Portuguese, which gradually grew into the town and port visible in the bed of the river.

॥ নবাব খাঞ্জা খাঁ ॥

নবাব খাঞ্জা খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার, তিনি হুগলীর মোগল দুর্গের একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে বসবাস করিতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস হুগলীর ফৌজদারের পদ তুলিয়া দেন এবং সেইজন্য তাঁহার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। তাঁহার ন্যায় বিলাসী ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে কেহই ছিলেন না। আজও বঙ্গদেশে কোনও ব্যক্তি বাবুয়ানা করিলেও তাহাকে "নবাব খাঞ্জা খাঁ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি গতাসু হইলে, তাঁহার স্ত্রী যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে একশত টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর মোগল দুর্গের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধূলিসাৎ করিয়া লুপ্ত করা হয় এবং দুর্গের ভগ্নস্তূপ পরে দুই হাজার টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। গোন্দলপাড়া তালুক পূর্বে নবাব খাঞ্জা খাঁ-র জমিদারী ভুক্ত ছিল।

॥ গৌরী সেন ॥

পশ্চিমবঙ্গে গৌরী সেনের নাম জানে না, এরূপ লোক বিরল; তাঁহার নাম প্রবচনের মত তিন শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া অসাধারণ দানের জন্য সর্বত্র সুপ্রচলিত আছে। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া "লাগে টাকা—দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খ্যাতনামা ব্যক্তি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে হুগলী শহরের অন্তর্গত বালি নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার সম্পূর্ণ নাম গৌরীশঙ্কর সেন। ইনি জাতিতে সুবর্ণ বণিক। ইনি যখন হুগলীতে বর্তমান ছিলেন, তখন মুসলমান রাজত্বকাল হইলেও পর্তুগীজরাই হুগলীর সর্বময় শাসনকর্তা; ইংরাজ-শাসন তখনও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার পূর্বপুরুষ পুরন্দর সেন সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং তথায় ব্যবসাদি করিতেন। সপ্তগ্রামের পতনের পর পুরন্দরের অধস্তন বংশধর হলধর সেন হুগলীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; এই হলধরের প্রপৌত্রের নাম অনিরুদ্ধ সেন; অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম নন্দরাম; তাঁহার পুত্রের নাম গৌরী সেন।

গৌরী সেনের পিতা নন্দরাম সেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন এবং তিনি পুত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গৌরী সেন সামান্য কিছু মূলধন লইয়া তাঁহাদের বংশগত প্রথানুযায়ী আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং অতি সামান্য অবস্থা হইতে সাধুতা ও প্রখর বুদ্ধিবলে প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়া অসাধারণ দানের জন্য বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গৌরী সেন অসাধারণ সৌভাগ্য-সম্পদের অধীশ্বর ছিলেন; তাঁহার প্রতি সৌভাগ্য-দেবীর আকস্মিক কৃপা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। গৌরী সেন পর্তুগীজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার প্রথম গির্জা ব্যান্ডেল চার্চের দেওয়ান ছিলেন। গৌড়ের রাজার প্রীতি উৎপাদন করিয়া পর্তুগীজেরা ব্যান্ডেল নামক স্থানটি প্রাপ্ত হন এবং ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ওই স্থানে তাঁহারা একটি গির্জা নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টাননদের উপাসনা করিবার

ভজনালয় দেখিয়া তাঁহার মনে অনুরূপ একটি হিন্দু মন্দির করিবার বাসনা হয়। সেই সময় তিনি মেদিনীপুরের ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতেন এবং তাঁহার নিকট বিক্রয়ার্থ পণ্যদ্রব্য পর্তুগীজদের নিকট হুগলী হইতে ক্রয় করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইতেন। একবার তিনি সাতটি নৌকা বোঝাই করিয়া মেদিনীপুরে দস্তা চালান দেন। নৌকাগুলি মেদিনীপুরে পৌঁছিলে তাঁহার বন্ধু ভৈরবচন্দ্র দত্ত নৌকাগুলি রৌপ্যপূর্ণ দেখিয়া উহা তাঁহার জিনিস নয় বলিয়া হুগলীতে গৌরী সেনের নিকট সেই নৌকাগুলি ফেরত পাঠাইয়া দেন।

জনশ্রুতি আছে, যেদিন নৌকাগুলি হুগলীতে ফিরিয়া আসে, ঠিক তাহার পূর্ব রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, মহাদেব তাঁহার সম্মুখে যেন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে, তুমি মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে বলিয়া আমি তোমায় অর্থ পাঠাইয়াছি, কাল নৌকা হইতে তাহা গ্রহণ করিও এবং তোমার বাড়ির পশ্চিমদিকের বাগানে আমার মন্দির করিয়া দিও। পরদিন প্রাতঃকালে গৌরী সেন গঙ্গাতীরে যাইয়া তাঁহারই প্রেরিত সপ্ততরীর যাবতীয় দস্তা রৌপ্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় প্রাপ্ত এই অপর্যাপ্ত ধনরাশি পরহিতব্রতে ব্যয় করিবেন এই সংকল্প লইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দেবাদিষ্ট মন্দির অচিরে নির্মাণ করাইয়া তথায় জাঁক-জমকের সহিত প্রাত্যাহিক পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "গৌরীশঙ্কর মন্দির" অদ্যাপি হুগলীতে বিদ্যমান আছে। মন্দির গাত্রে একটি প্রস্তর ফলকে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ নিম্নোক্তভাবে লিখিত আছেঃ

গৌরী সেন
বাংলা সন ১০০৬ সাল
ইংরাজি সন ১৫৯৯ সাল

দৈবলব্ধ ধনরাশি পাইয়া তিনি অকাতরে দীন-দুঃখী-আতুর-অনাথদের মধ্যে দুই হস্তে সেই ধন দান করিতে লাগিলেন। যে-কোন লোক অভাবগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেই তিনি অকাতরে তাঁহার দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার দানশীলতার কথা দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং তখন লোকের কোন কার্যে অর্থাভাব ঘটিলে তাহাদের ভরসা ছিল যে, গৌরী সেনের নিকট চাহিলেই তাহা পাওয়া যাইবে। সপ্তগ্রামের সর্বত্র তখন যত খাবারের দোকান ছিল, সমস্ত দোকানে তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম করিয়া যে-কোন দরিদ্র ব্যক্তি খাইতে চাহিবেন, তাহাকে যেন খাইতে দেওয়া হয়। তাঁহার দানশীলতার সুযোগ লইয়া অনেকে তাঁহার অর্থের অপচয় করিত; কিন্তু তিনি তাহাতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতেন না। অমিতধনের অধিকারী হইয়াও তিনি বিনয়ী, ধীর ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুধর্মোক্ত যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপাদি তিনি খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করেন; তাঁহার পুত্রের বিবাহে তিনি তাঁহার স্বজাতিবৃন্দকে এরূপ এক বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করেন যে, গঙ্গার পশ্চিম কূলে সেইরূপ ভোজের ব্যবস্থা আর-কেহ করিতে পারেন নাই।

সেই সময় কেহ কোন জনহিতকর কার্য আরম্ভ করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলে গৌরী সেন তাহাকে অর্থ প্রদান করিতেন, সুতরাং অর্থের সংগ্রহ না করিয়া তখন কেহ কার্য আরম্ভ করিতে সংকোচ বোধ করিত না—কারণ সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।" এইরূপ অসামান্য বদান্যতার জন্য তাঁহার খ্যাতি লোকমুখে প্রবচনের মত আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অনুমান ১৬৬৭ খৃীষ্টাব্দে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন।*

গৌরী সেনের বংশধরগণ এখনও হুগলীতে বিদ্যমান আছেন; কিন্তু পূর্বের সে অর্থবল এখন আর তাঁহাদের নাই। বেশিদিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই বংশের কলিকাতায় ত্রিশখানি বাড়ি ছিল; এখন বোধ হয় দুই-একখানি আছে। বর্তমানে শ্রীসত্যচরণ সেন, গৌরী সেনের বংশে বর্তমান আছেন; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌরী সেনের যে বংশ-

* হুগলীর অন্যতম পাক্ষিকপত্র "বর্তমান ভারতে"র [১৫ আশ্বিন ১৩৬৬] সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহা উল্লেখ্য : **লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন॥** এই বাক্যটি এখনও বাংলার মাঠে-ঘাটে, সহরে অলিতে-গলিতে বহু লোকের মুখেই শোনা যায়। এই গৌরী সেন সম্পর্কে হুগলী জেলার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্প্রতি দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'বর্তমান ভরত' পত্রিকায় দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া স্থানীয় এলাকায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মতে গৌরী সেন ছিলেন এক ধনী ব্যক্তি এবং তিনি পরে সর্বস্ব দান করিয়া ফকির হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে সংসার চলে না—গৌরী সেন টাকা দিবে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দিতে অক্ষম—গৌরী সেন টাকা দিবে, দোল-দুর্গোৎসব হইবে—গৌরী সেন টাকা দিবে, এমন কি লোকে দোকানে জিনিষপত্র লইবে—গৌরী সেন টাকা দিবে ইত্যাদি।

সেই সুবর্ণ বণিক সমাজকুল শ্রেষ্ঠ দানবীর গৌরী সেন হুগলীর অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার এখনও বহু নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুগলী-চুঁচুড়া পৌর কর্তৃপক্ষ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। এমন কি একটি রাস্তার নামকরণও গৌরী সেনের নামে হয় নাই। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও হুগলী-চুঁচুড়া পৌর কর্তৃপক্ষ বৃটিশ সরকারের প্রিয়পাত্র, দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল কায়েমকারী, সেই বৃটিশ চাটুকার, বৃটিশ খেতাবধারী, প্রগতি-বিরোধী, এমন কি সমাজ কল্যাণে যাহাদের কোনরূপ অবদান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাঁহাদের নামে রাস্তার নামকরণ করিতেছেন; তাঁহাদের নামে নেমপ্লেটও পড়িতেছে। কিন্তু এই স্বনামধন্য ব্যক্তি গৌরী সেনের স্মৃতিরক্ষার্থে কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নাই। ইহা অতীব লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। আমরা এই বিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ এবং গৌরী সেনের সুযোগ্য বংশধর যাঁহারা হুগলী সহরে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তালিকা পাইয়াছি, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল। শ্রীসত্যচরণ সেন গৌরী সেন হইতে অধস্তন দশম পুরুষ। তাঁহার অন্যতম পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র সেনের নাম মন্দিরে একখানি প্রস্তরে সেবায়েত বলিয়া উৎকীর্ণ আছে। বর্তমানে শ্রীমহাদেব সেন এই মন্দিরের সেবায়েত। গৌরী সেনের প্রাসাদোপম বিরাট ভবন আজও আছে; কিন্তু তিনি যে-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া গিয়াছে। আর আছে তৎপ্রতিষ্ঠিত গৌরীশংকরের মন্দির।

গৌরী সেনের বংশ-তালিকা

অনিরুদ্ধ সেন। তৎপুত্র নন্দরাম সেন। তৎপুত্র গৌরীশঙ্কর সেন। তৎপুত্র হরেকৃষ্ণ ও মুরলীধর সেন। হরেকৃষ্ণের পুত্র ভীমচাঁদ সেন। তৎপুত্র ঠাকুরদাস সেন। তৎপুত্র চৈতন্যচরণ সেন। তৎপুত্র রাসবিহারী সেন। তৎপুত্র প্রেমচাঁদ সেন। প্রেমচাঁদের তিন পুত্র—ক্ষেত্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও নাটুরাম সেন। ক্ষেত্রমোহনের আট পুত্র—গোবিন্দ, মাণিক, ইন্দ্র, হাবু, জহর, অমৃত, মোহন ও মন্মথ সেন। গোবিন্দের পুত্রের নাম সত্যচরণ। সুশীলকুমার দে "বাংলা প্রবাদে" গৌরী সেনের নাম গৌরীকান্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম ছিল গৌরীশঙ্কর। আর এক জায়গায় "ইনি হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামের (কাহারো মতে, বহরমপুরের) অধিবাসী ছিলেন।" (পৃঃ ৭১৩) লিখিয়াছেন। তিনি কখনও বহরমপুরের অধিবাসী ছিলেন না।

॥ হুগলী ও মহারাজ নন্দকুমার ॥

মহারাজ নন্দকুমার অনুমান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রপুর ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণী নদী বর্তমান সময়ে লোপ পাইয়াছে। নন্দকুমারের পিতার নাম পদ্মনাভ, রাঢ়ী শ্রেণীর কশ্যপ গোত্র। তাঁহার পিতামহের আদি নিবাস জরুল গ্রামে। পিতামহের বিবাহের পর তাঁহারা ভদ্রপুরে আসিয়া বাস করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বুদ্ধিমান, সাহসী ও উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বাঙগলা, সংস্কৃত ও তদানীন্তন পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ক্ষেমঙ্করী। নন্দকুমার বিবাহের পূর্বেই পিতার সহিত থাকিয়া বিষয়কার্য শিক্ষা করেন। বিবাহের পর পুনরায় পিতার অধীনে থাকিয়া ফতে সিং, ঘোড়াঘাট ও সাতপাইকা পরগণার নায়েব হন।

নন্দকুমার যখন দূরদেশে ছিলেন, তখন বৃদ্ধ জগৎ শেঠ ফতে চাঁদ, রায় রাঁইয়া আলমচাঁদ ও আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরফরাজের প্রধানমন্ত্রী হাজী মহম্মদ, আলীবর্দীকে বাঙগলার নবাব করিবার জন্য সরফরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন এবং গিরিয়ার যুদ্ধে ঐ চক্রান্ত সফল হইল—নবাব সরফরাজ ঐ যুদ্ধে নিহত হইলেন। উমিচাঁদ ও দীপচাঁদও এই ষড়যন্ত্রে ছিল। এই সময় নন্দকুমারের বয়স ৩৫ বৎসর। বিপ্লব শেষ হইলে নবাব আলীবর্দী নন্দকুমারকে হিজলী ও মহিষাদলের রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন, এই সময় হিজলী প্রভৃতি স্থানে বর্গীর আক্রমণ হয়। রাজস্ব আদায় দুরূহ হইয়া পড়িল অথচ নবাবের টাকা চাই। ৮০ হাজার টাকা বাকী পড়িল। চিন্ময় রায় নামে জনৈক বাঙ্গালী নন্দকুমারকে টাকা অনাদায়ের জন্য কর্মচ্যুত করিয়া কারাগারে পাঠাইলেন। নন্দকুমারের পিতা এই টাকা দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। নন্দকুমার অনন্য উপায় হইয়া হোসেনকুলী খাঁর নিকট কর্মপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু তাহাতে চিন্ময় রায় বাধা দিলেন। তিনি বিফলমনোরথ হইয়া

সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। কারণ, সেনাপতির উপর চিন্ময় রায়ের কোন আধিপত্য ছিল না। এই সময় মুস্তফার সহিত আলীবর্দ্দীর মনোমালিন্য চলিতেছিল। কারণ আলীবর্দ্দী মুস্তাফাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি নবাব হইলে, মুস্তাফাকে বিহারের শাসনকর্তা করিবেন। আলীবর্দ্দী ঐ প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। মুস্তাফা সৈন্যাদিগের বেতন চাহিয়া পাঠাইলেন। নবাব হুকুম দিলেন, জমিদারির রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে। জমিদারগণ নন্দকুমারের আশ্রয় লইলেন এবং তিনি তাঁহাদের জামিন হইলেন। এই উদারতাই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। টাকা আদায় না হওয়াতে মুস্তফা নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া চিন্ময় রায়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। নন্দকুমার কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কলিকাতা আগমন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে মুস্তফা সমরক্ষেত্রে নিহত হন এবং চিন্ময়েরও ঐ সময় মৃত্যু হয়। নন্দকুমার পুনরায় মুর্শিদাবাদে আসিলেন। অনুমান ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলীতে আসেন। নবাব গুণগ্রাহী ছিলেন, মুর্শিদাবাদ অবস্থানকালে তিনি আলীবর্দ্দীর সুনজরে পড়িয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে হুগলীর দেওয়ানী পদ দিলেন। হেদায়েৎ আলি তখন হুগলীর ফৌজদার—নন্দকুমারের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। এই সময় চারিদিকে যুদ্ধ; নবাবের কাছে সকল সংবাদ পৌঁছিত না। নন্দকুমার হেদায়েতের হাত এড়াইতে না পারিয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন এই সময় লহরীমল হুগলীর দেওয়ান হইলেন। লহরীমলের পদচ্যুতির পর মুন্সী সাদকউল্লার বিশেষ সহায়তায় হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগের সময় নন্দকুমার পুনরায় হুগলীর দেওয়ান পদ পাইলেন।

এই সময়ে নন্দকুমার "দেওয়ান নন্দকুমার" নামে অভিহিত হইলেন। তখন হুগলীর ফৌজদারের হস্তে হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি প্রদেশ ছিল। ফৌজদারের পরেই দেওয়ানের পদ। ফৌজদারকে সর্ব্দা বৈদেশিক বণিকদিগের কার্যকলাপ ও পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক সংগ্রহ ও পরস্পরের বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইত। বৈদেশিক বণিকরা ফৌজদার ও দেওয়ানকে অর্থ দিয়া বিনা শুল্কে অনেক সময় ব্যবসা চালাইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফৌজদারকে বার্ষিক ২৭ হাজার টাকা দিতেন। এই সময় বৃদ্ধ আলীবর্দ্দী সিরাজকে উত্তরাধিকারী স্থির করেন। সিরাজ কিছুদিন হুগলীতে থাকিয়া মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া যান।

কয়েক বৎসর পরে ইয়ারবেগ হুগলীর ফৌজদারী পদ ত্যাগ করিয়া নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে হিসাব বুঝাইয়া দিতে গেলেন। নন্দকুমারেরও দেওয়ানী পদ চলিয়া গেল। কারণ, ফৌজদারই দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। এই সময় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল আলীবর্দ্দীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুসময়ে তিনি সিরাজকে ইংরেজ হইতে সাবধান হইতে বলেন।

সিরাজের সিংহাসন আরোহণের পূর্বেই তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন, রাজা রাজবল্লভ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া সিরাজের মাতৃষ্বসা ঘসিটি বেগমের নামে বঙ্গদেশ শাসন করিতে সংকল্প করেন। রাজা রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণদাসকে বহু ধনরত্ন দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস নবাবের ভয়ে পুরী তীর্থ যাইবার ভাণ করিয়া কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় লইলেন। সিরাজ সিংহাসন আরোহণের ৪/৫ দিন পরেই ইংরেজকে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন কলিকাতার দুর্গ ভাঙিয়া ফেলেন এবং

কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠান। এই কৃষ্ণদাসই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, পরে ভীষণ দাবানলে পরিণত করাইয়া মুসলমান রাজ্যের পতনসাধন করান। ড্রেক সাহেব কৃষ্ণদাসের কথা চাপিয়া নবাবকে জানাইলেন, তাঁহারা নগরের চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত করেন নাই। সিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ পরাজিত হইয়া শিবপুর, ফলতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইলেন। অবশিষ্ট বন্দী হইলেন। সিরাজ কৃষ্ণদাসকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। সিরাজের এ মহত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নবাব কলিকাতা অধিকার করিয়া বর্ধমানের দেওয়ান মাণিকচাঁদকে* কলিকাতার ভার দিয়া মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া গেলেন। এই সময় হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ আলি। নবাব কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতা দেখিয়া সেখ উমরউল্লাকে হুগলীর ফৌজদার এবং নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমার যখন হুগলীতে আসেন, তখন ইংরেজ বণিক ফলতায় থাকিয়া মাদ্রাজ হইতে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নবাব ভাবিয়াছিলেন, ইংরেজ আর কিছু করিবে না, সে জন্য ফলতা হইতে উহাদের তাড়াইয়া দেন নাই। এই সামান্য ভুলের জন্য বাঙলা ইংরেজের হইয়াছিল। সিরাজ মাণিকচাঁদ ও নন্দকুমারের উপর কলিকাতার ভার দিয়া কিছুদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই সময় পূর্ণিয়ার নবাব সকতজঙ্গকে দমন করিতে নবাব ব্যস্ত ছিলেন।

নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার হইয়াই হুগলীর প্রবেশপথ রক্ষা করিতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। বজবজ দুর্গের সংস্কার করিলেন এবং ইংরেজের আগমন রোধ করিবার জন্য কলিকাতার দক্ষিণ আলিগড়ে নূতন কেল্লা স্থাপন করিলেন এবং ইহার অপর পার্শ্বে থানা , দুর্গ মেরামত করিলেন। এই দুই দুর্গের মধ্যে গঙ্গা নদী অপ্রশস্ত ও অগভীর ছিল। তিনি ঐ স্থানে ইষ্টকপূর্ণ জাহাজ জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য দুইখানি জাহাজ ক্রয় করিলেন। ঐ স্থান বুজিয়া গেলে ইংরেজের জাহাজ হুগলী আসিতে পারিবে না। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতক মাণিকচাঁদ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া ফলতায় হাট বসাইলেন —যাহাতে ইংরেজের খাদ্যাভাব না হয়। এই সময়েই ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে সৈন্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাণিকচাঁদ লোকলজ্জার খাতিরে সৈন্য লইয়া বজবজ আসিলেন; সামান্য যুদ্ধও হইল। শেষে মাণিকচাঁদ বজবজ রক্ষা না করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন এবং হুগলী হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। মাণিকচাঁদের অভাবনীয় পলায়ন, নন্দকুমারের চিন্তার অতীত—ঐ ইষ্টকপূর্ণ জাহাজ আর গঙ্গায় ডুবাইবার সময় পাইলেন না। ইংরেজ অবাধে সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। নায়কবিহীন সৈন্যগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলাইল—ক্লাইব কলিকাতা দখল করিলেন।

সিরাজ মাণিকচাঁদের কাছে কলিকাতা দখলের কথা শুনিয়া নন্দকুমারকে তিন হাজার সৈন্য হুগলীর রক্ষার জন্য পাঠাইলেন; হুগলীতে নন্দকুমারের দুই হাজার সৈন্য ছিল। তিনি হুগলী সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদ পৌঁছিয়া ইংরেজের বলবীর্য এমনভাবে বর্ণনা করিলেন—যাহাতে সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং ঐ ভীত

মানিকচাঁদ বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের আত্মীয় ছিলেন।

সৈন্যই নন্দকুমারের কাছে পাঠান হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী ইংরেজ হুগলী আক্রমণে বাহির হইলেন—মেজর কিলপ্যাট্রিক সেনানায়ক হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এক জোয়ারেই হুগলী আসিবেন, কিন্তু একখানি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া কয়েক দিন দেরী হইল। ১০ই জানুয়ারী তিনি হুগলী আক্রমণ করিলেন। হুগলীতে একটি মোগল কেল্লা ছিল। ইংরেজ রাত্রি পর্যন্ত গোলা বর্ষণ করিয়া একটি স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরদিন প্রভাতে বড় দরজার দিক দিয়া ইংরেজ ভাল করিয়া আক্রমণ করিল। মোগল সৈন্য ঐ দিক রক্ষার জন্য দৌড়াইল, এ দিকে পূর্বোক্ত ভগ্নস্থান দিয়া ইংরেজ সৈন্য প্রবেশ করিল। নবাবের সৈন্যগণ পলাইল। দুর্গজয় করিয়া-কাপ্তেন কুট কতকগুলি সৈন্য লইয়া ব্যাণ্ডেল লুঠ করিতে গেলেন। নন্দকুমার এই স্থানে ইংরেজকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। শেষে কুট কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন।

নবাব হুগলী আক্রমণ ও গ্রামাদি লুণ্ঠন ও দহনের সংবাদ পাইয়া ইংরেজ দমনে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও ৬০ হাজার পদাতিক এবং ৫০টা কামান লইয়া কলিকাতার নিকট হালসী বাগানে* উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ ইতিপূর্বে জগৎশেঠের নিকট দেড় কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইংরেজ শেঠের আশ্রয়ে গেলেন। শেঠ দেখিল, ইংরেজ ধ্বংস হইলে তাঁহাদের টাকা মারা যায়, সে জন্য রণজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তিকে নবাবের নিকট ইংরেজের পক্ষ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সন্ধি কার্যে পরিণত হইল না। ৫ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইব হঠাৎ নবাবশিবির আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে যদি মীরজাফর, রায়দুর্লভ লবণের মান্য রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর অভিনয় হইত না। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ক্লাইব কলিকাতা দুর্গে প্রবেশ করিলেন। উমিচাঁদ (আমিনাচাঁদ) ও জগৎ শেঠের কর্মচারী রণজিৎ রায়ের সাহায্যে সন্ধির প্রস্তাব হইল। নবাব দেখিলেন, সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, সুতরাং সন্ধি স্থাপিত হইল।

॥ চন্দননগর ও নন্দকুমার ॥

ইংরেজের সহিত নবাবের সন্ধি হইবার পর দুইটি বিশিষ্ট ঘটনা হয়—১ম সংবাদ আসে, আবদুল্লা কান্দাহার হইতে উত্তরভারতে আসিয়াছেন এবং তিনি বাঙ্গলা আক্রমণ করিবেন। দ্বিতীয় য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়াছে! নবাব সন্ধির কথামত আসন্ন বিপদের জন্য ক্লাইবের নিকট সৈন্য-সাহায্য চাহিলেন। এ সময় বাঙ্গলায় ইংরেজ ও ফরাসীতে কোন যুদ্ধ হয় নাই—সম্ভাবই ছিল। কিন্তু ক্লাইব মনে করিলেন, যদি ফরাসী নবাবের সাহায্য পায়, তবে ইংরেজকে ধ্বংস করিবে; সুতরাং ফরাসী ধ্বংস করা উচিত। ক্লাইব যেন নবাবকে সাহায্য করিতে যাইতেছেন এই ভাব দেখাইয়া চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। নবাব-নন্দকুমারকে কিছু সৈন্য পাঠাইলেন—ভাবিলেন, ক্লাইব যদি হুগলী আক্রমণ করেন। এ সময় নবাবের ফরাসী-প্রীতি ছিল স্বীকার করিতে হইবে। নন্দকুমারের সৈন্য আসিলে ক্লাইব নবাবকে জানাইলেন, তিনি বুঝি ফরাসীকে সৈন্য সাহায্য পাঠাইলেন।'

* উহা উমিচাঁদের বাগান, বর্তমান সময়ে ঐখানে পরেশনাথের জৈন মন্দির আছে।

নবাব জানাইলেন, ফরাসী তাঁহাকে এককানা কড়িও দেয় নাই—সৈন্য নন্দকুমারের জন্যই পাঠান হইয়াছে; ফরাসী ইংরেজের অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। ফরাসীরা কয়েকখানি অকর্ম্মণ্য জাহাজ গঙ্গায় ডুবাইয়াছিল— যাহাতে ইংরেজের জাহাজ বাধা পায়। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে কিছু অসুবিধা থাকে না। সাব-লেফটেনেন্ট টেরেনিয়ান নামে এক ফরাসী বিশ্বাস-ঘাতক ওয়াটসন সাহেবের নিকট ঘুষ লইয়া ঐ সংবাদ দেয়। ইংরেজ সতর্ক হইল—যুদ্ধ হইল—ফরাসী পরাজিত হইল। এই যুদ্ধের বিষয় ইংরেজ লেখক হিল বলেন, "নন্দকুমারকে ইংরেজ ১২ হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছিল, সেই জন্য নন্দকুমার হুগলীতে নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়াছিলেন।" এই অভিযোগ সবন্ধে দেশী লেখকগণ নীরব। কিন্তু মুতাক্ষরীণ-লেখক গোলাম হোসেন—যিনি নন্দকুমারের দোষ দেখাইতে শতমুখ, তিনিও কিছু লেখেন নাই।

In February 1757 the well-known Nanda Kumar was Diwan and acted as *Faujdar* of Hooghly. Mr. Watts through Umichand, offered him Rs. 10,000 to Rs. 12,000, on condition that he gave no assistance to the Fernch—a condition fulfilled by him—and later on dangled before him the prospeet of being confirmed permanently as *Faujdar*. (Bengal in 1756-57 by S. C. Hill.)

নন্দকুমার নবাবকে জানাইয়াছিলেন, "ফরাসী ইংরেজ-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব; পাছে আপনার বিজয়ী সৈন্যের অবমাননা হয়, আমি সেজন্য সৈন্যদিগকে হুগলী আনিয়াছি। নন্দকুমার ইহাও ভাবিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির অভাব নাই, বিশেষতঃ মাণিকচাঁদ ও অন্যান্য সেনাপতি অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের সাহায্য পাওয়াও অসম্ভব। এ অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয়ঃ। এ দিকে নবাবের কাছে সংবাদ গেল, নন্দকুমার ইংরেজের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া ফরাসীকে সাহায্য করেন নাই। অথচ নবাবের হুকুমও ছিল না যে, ফরাসীকে সাহায্য করা। নবাব নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিলেন। নন্দকুমার সম্বন্ধে ইন্দোস্তান লেখক অর্ম্মি সাহেব বলেন, নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার থাকিলে ইংরেজ মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারিতেন না।" পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে নন্দকুমারের কোন সংস্রব ছিল না, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

নন্দকুমার সিরাজ কর্তৃক পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ইহার পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই—ঐ যুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ী হন—মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে বসেন। নন্দকুমার সিরাজ কর্তৃক পদচ্যুত হইলেও জগৎ শেঠ ভবনে ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন নাই, কোন লেখক তাঁহার সম্বন্ধে দোষারোপ করেন নাই—তাঁহার চরিত্রের ঐ একটা গৌরবজনক বিশিষ্টতা। মীরজাফর দেখিলেন, তিনি নবাব হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্লাইবের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। মন্ত্রী রায়দুর্লভ বিশ্বাসঘাতক। সেইজন্য তিনি মন্ত্রীকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষার অবসানে মীরজাফর পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন ও পাটনায় রামনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং রায়-দুর্লভকে সঙ্গে যাইবার হুকুম দিলেন। মন্ত্রী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে অসুস্থতার

ভাণ করিলেন। নবাব ভাবিলেন, তিনি যদি মন্ত্রীকে ফেলিয়া যান, কি জানি, ক্লাইবের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, সেই জন্য তিনি ক্লাইবকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ক্লাইব নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিলেন—মন্ত্রীর অসুখ সারিয়া গেল। রায়দুর্লভ নন্দকুমারকে বিশেষরূপ চিনিতেন, সে জন্য তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিলেন—পাছে মীরজাফর তাঁহার বিরুদ্ধে ক্লাইবকে কিছু বলেন। নন্দকুমার ক্লাইবের সঙ্গেই রহিলেন।

নবাব দুর্লভরাম, ক্লাইব ও নন্দকুমার সৈন্য লইয়া পাটনা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া পাটনায় রামনারায়ণের বিরুদ্ধে চলিলেন। রামনারায়ণও সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি ক্লাইবকে এক পত্র দিলেন যে, তিনি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিন। নবাব ভাবিয়াছিলেন, রামনারায়ণকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবেন। নবাব যুদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—কি জানি, দুর্লভরাম দ্বিতীয় পলাশীর অভিনয় করে। নবাব রামনারায়ণকে নির্ভয় হইতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীরণকে নবাব করিলেন, রামনারায়ণকে দেওয়ান করিলেন। এই ব্যাপারে নন্দকুমার যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ক্লাইব, রামনারায়ণ, এমন কি, নবাবও তাঁহার অনুরক্ত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় সমাজে যেমন ক্লাইব 'কর্ণেল ক্লাইব' নামে খ্যাত হন, জনসমাজে নন্দকুমারও সেইরূপ "কালা কর্ণেল" নামে খ্যাত হন।

ক্লাইব কিছুদিন পাটনায় থাকিয়া নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। নন্দকুমার ক্লাইবের সনুমোদনে হুগলীর দেওয়ান হইলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব মীরজাফরের নিকট তাঁহার পাওনা টাকা চাহিলে, নবাব তাহা দিতে না পারায়, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় করিয়া লইতে অনুমতি দিলেন। ক্লাইব ঐ গোলযোগের ভিতর না গিয়া নন্দকুমারের উপর ঐ রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৯ আগস্ট নন্দকুমার ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানীর তহশীলদার হইলেন। এই সময় হেস্টিংস বর্ধমানের রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইতেন। ইহাতে তাঁহার অনেক সুবিধা ছিল। নন্দকুমার বর্ধমানরাজকে রাজস্ব হুগলীতে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হুকুম দিলেন। হেস্টিংস ক্লাইবকে পত্র দিলেন। ক্লাইব নন্দকুমারকে সমর্থন করিলেন। এই দিন হইতেই হেস্টিংস নন্দকুমারের শত্রু হইলেন। রেসিডেন্ট বস্তুটি যে কি, তাহার সম্বন্ধে ১২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

নন্দকুমার যখন হুগলীতে, তখন মুর্শিদাবাদে নবাব ও রায়দুর্লভের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য চলিতেছিল, উভয়েই উভয়কে হত্যা করিতে চেষ্টিত ছিলেন। রায়দুর্লভ আত্মরক্ষার জন্য নন্দকুমারকে সংবাদ দিলেন। তিনিও কিছু সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিলেন। হেস্টিংস এই সুযোগে ক্লাইবকে লিখিলেন নবাব নন্দকুমারের উপর অসন্তুষ্ট। ক্লাইব জবাব দিলেন, নন্দকুমার ইংরেজপক্ষ, সেই জন্য নবাব অসন্তুষ্ট। নবাবের অসন্তোষ, আমিরবেগের ফৌজদারি পদত্যাগ জন্য, নন্দকুমার দেওয়ানী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

নন্দকুমার, রায়দুর্লভ ও আমিরবেগ তিন জনেই কলিকাতায় একত্র মিলিত হইলে

নবাবের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইংরেজ ধ্বংস করিতে বাসনা করিলেন। দূরদর্শী ক্লাইব ওলন্দাজের চুঁচুড়া আক্রমণ করিয়া ওলন্দাজ ধ্বংস করিলেন। ইংরেজ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসাইলেন। মীরজাফরের নবাবী তিন বৎসর চারি মাস মাত্র হইয়াছিল। মীরজাফর অনন্যোপায় হইয়া পূর্ববৈরতা ত্যাগ করিয়া নন্দকুমারের আশ্রয় লইলেন। বৃদ্ধ নবাব প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি পুনরায় নবাব হইলে তাঁহাকে মন্ত্রী করিবেন। গবর্ণর ভ্যানসিটার্ট ও হেস্টিংসের আক্রোশ বর্ধিত হইতে লাগিল। নন্দকুমার কর্ণেল কুটের আশ্রয় লইলেন। কুটের প্রস্তাবে নন্দকুমার তাঁহার সহিত ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাটনায় যাত্রা করিলেন। ইহার পর নন্দকুমার হেস্টিংস ও ভ্যানসিটার্ট দ্বারা দুইবার বন্দী হন। মীরকাশিম পদচ্যুত হইলে মীরজাফর পুনরায় নবাব হইলেন। ইংরেজের অনুমতি লইয়া নন্দকুমার নবাবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ আসিলেন। ইহার পর তিনি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান হন। মীরজাফর যত দিন জীবিত ছিলেন, নন্দকুমার তাঁহার মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই জন্য কোন ইংরেজ লেখক নন্দকুমাররের চরিত্রে দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। মীরজাফর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুসময়ে নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। নন্দকুমার বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া নাজিমউদ্দৌল্লাকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময় হইতে নন্দকুমারের সহিত হুগলীর কোন সম্বন্ধ ছিল না; সুতরাং সে সম্বন্ধে লেখা অনাবশ্যক।

এত দূর পর্যন্ত যাহা লিখিলাম, তাহা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনকাহিনী; পারিবারিক জীবনচরিত এবং শেষ জীবনকাহিনী না লিখিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সেজন্য লেখা আবশ্যক। মহারাজের পারিবারিক জীবন সুখকর ছিল। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী ক্ষেমঙ্করী আদর্শ-পত্নী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ছিলেন—সকলেই একত্রে বাস করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতেন। তাঁহার একমাত্র অশান্তি ছিল—তাঁহার জামাতা জগচ্চন্দ্রের জন্য। মহারাজ তাঁহাকে পুত্র গুরুদাসের অধীনে পেস্কার-কার্যে নিযুক্ত করেন। এই জামাতাই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ হইয়াছিলেন। অপর জামাতা রাধাচরণ বিপদে সম্পদে মহারাজের সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন আর জগচ্চন্দ্র বিশ্বাসঘাতক হইয়া সর্বদাই দূরে থাকিতেন। নন্দকুমারের পূর্বপুরুষগণ শাক্তধর্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী হন; পরন্তু শাক্তকে কখনও ঘৃণা করিতেন না। তিনি হুগলীর কার্যে অবসর পাইলেই হালিসহরে আসিয়া ভক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মার নামগান করিতেন; নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সহিত একত্র বসিয়া মহামায়ার উপাসনা করিতেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার এতই উদারতা ছিল।

অদ্যাবধি যে কার্য কেহ করিতে পারেন নাই, মহারাজ সেই কার্য করিয়াছিলেন—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণ। তাঁহার রাজোচিত প্রাসাদে লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু লক্ষ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিতে পারেন নাই।

যিনিই অত্যাচারপীড়িত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি সাহায্য করিতেন—নিজের শুভাশুভ দেখিতেন না—ইহাই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল এবং এই বিশিষ্টতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। অত্যাচারী, লোভী, অর্থগৃধ্নুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সেই মহামানবকে ধ্বংস করিয়াছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোন সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহারাজের আশ্রয় লন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বৈবাহিক হইলেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন—এ কি কম নৈতিক বল? ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) বাঙ্গালার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় এবং যাহাকে অদ্যাবধি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালাদেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় তিনি ভদ্রপুর ও মালিহাটী গ্রামে সমস্ত লোককে রক্ষা করেন, অধিকন্তু যে কেহ তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়াছিল, সেই রক্ষা পাইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ রেজাখাঁ ও ইংরেজ বণিক। ইহারা ধান্য একচেটিয়া করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। এই দুর্ভিক্ষে অনেকে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল—নিম্নে একখানি আত্মবিক্রয়পত্রের অবিকল নকল দিলাম।

"শ্রীলালা গুরুদাস রায় আওলাদে শ্রীযুক্ত মহারাজ নন্দকুমার রায় ইবনে পদ্মনাভ রায় সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচারু বেওয়া অওলাদে তীতু গোপ ইবনে গঙ্গারাম গোপ বন্দা আটীবিপত্র মিদং সন ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তরি অব্দে লিখনং কার্যঞ্চ আগে অকালে অন্নাভাবে মরি মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম, ভরণপোষণ করিয়া দাস্যে দাখিল করিবেন, একরায় বিকাইলাম ইহাতে পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন এতদর্থে বন্দা আটীবিপত্র দিলাম ইতি সন সদর বতারিখ ৫ জমাদিলোন মোতাবেক।" "শ্রীচারুবেওয়া সংঘরুতা।"

মহারাজের শেষ জীবন

যে নন্দকুমার এক দিন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন, আশ্রিতকে আশ্রয়দান যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, যিনি দরিদ্রের মা-বাপ ছিলেন, তাঁহার শেষ জীবন বড়ই দুঃখময়। হেস্টিংসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহারাজ হেস্টিংসের অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কাউন্সিলে দিয়াছিলেন। হেস্টিংস আত্মরক্ষার্থ তাঁহার অনুচরগণ দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে জাল মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া ফাঁসী দেওয়াইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তখনকার আইনে জাল মোকদ্দমায় ফাঁসি হইত।

বুলাকিদাস নামে এক জন শেঠের কাছে মহারাজ কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন, কিন্তু উহা মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য বুলাকি, নন্দকুমারকে এক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেয় যথা—"আমি বুলাকিদাস। এক ছড়া মুক্তার হার, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ, চারিটা আংটি দুইটা হীরার, দুইটা মাণিকের। রঘুনাথ জীউ মহারাজ নন্দকুমার বাহাদুরের পক্ষ হইয়া ১১৬৫ সালের আষাঢ় মাসে আমার মুর্শিদাবাদের কুঠীতে বিক্রয় জন্য গচ্ছিত রাখেন। নবাব মীর মহম্মদ কাশীম খাঁ সৈন্যের পরাজয়ের পর উপর উক্ত মহারাজ পূর্বকথিত গচ্ছিত জহরত আমার নিকট দাওয়া করেন, আমার অবস্থা ভাল না হওয়াতে জহরত ফিরাইয়া বা তাহার মূল্যে

দিতে অক্ষম হই। আমি অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে, কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ টাকা যাহা আমার কোম্পানীর কাছে প্রাপ্য আছে, সেই টাকা প্রাপ্ত হইলেই আট-চল্লিশ হাজার একুশ সিক্কা টাকা জহরতের মূল্য আমার কাছে পাওনা আছে, সেই টাকার সহিত টাকা প্রতি চার আনা সুদ দিব। এ বিষয় আমি মহারাজার কাছে কোন ওজর আপত্তি করিব না। ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র লিখিত হইল।"

বুলাকি দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী পদ্মমোহন ও গঙ্গাবিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে বুলাকি দাসের পাওনা টাকা আদায় করিয়া লেন এবং বুলাকির বিধবা পত্নী মহারাজের দেনা শোধ করিয়াছিলেন। চিরপ্রথানুসারে মহারাজ ঐ খতগুলির কোণ ছিঁড়িয়া ফেরৎ দেন।

বুলাকির বিধবা পত্নী ও পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর মোহনপ্রসাদ ও অন্যান্য অংশীদারগণ গঙ্গাবিষ্ণুকে উত্তেজিত করিয়া মহারাজের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা আনিলেন। এ মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইল। মোহনপ্রসাদের উদ্দেশ্য ছিল, যদি ঐ টাকা আদায় হয়, তবে সে শতকরা ৫৲ টাকা পাইবে—না পাইলেও পাইবে এই বন্দোবস্ত হয়। পক (Mr. Palk) সাহেব মোকদ্দমার বিচারের পূর্বেই মহারাজকে কারাগারে দিলেন। এই সময় রেজাখাঁর মোকদ্দমা চলিতেছিল। হেস্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার ব্যতীত উদ্ধার নাই, সুতরাং কারাগার হইতে তাঁহাকে আনা হইল। কার্যোদ্ধার হইয়া গেলে তিনি পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন। পরে পূর্বোক্ত দলিল জাল হইয়াছে বলিয়া মহারাজকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিয়া সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। এই ঘটনা ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে শনিবার আরম্ভ হয় এবং প্রথম বিচারের দিন ৮ই জুন পড়িল। মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। সরকার পক্ষের সাক্ষী—মোহনপ্রসাদ, কমলউদ্দীন ও তাহার ভৃত্য হোসেন আলি, খোজা পিদ্রুস, সদরউদ্দীন, সহবৎ পাঠক, কৃষ্ণজীবন দাস ও মুন্সী পরে রাজা নবকৃষ্ণ। এই সকল সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, (১) বুলাকি দাসের অঙ্গীকারপত্রোক্ত তিন জন সাক্ষীর মধ্যে কমলউদ্দীন খাঁই মহম্মদ কমল, (২) মহাতাব রায় নামে কোন ব্যক্তি ছিল না, (৩) শীলাবতের মৃত্যু হইয়াছে। মহারাজের সাক্ষী—তেজরায় বর্ধমান রাণীর পেস্কার, রূপনারায়ণ চৌধুরী, লালা তোমন সিং, চৈতন্যদাস ও ইয়ারবক্স মহম্মদ। মহারাজের সাক্ষীরা বলেন, কমল মহম্মদ মরিয়া গিয়াছে, এ সে কমল নহে! কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, নবাব নজামউদ্দৌলার সময় কমল-উদ্দীন আলিখাঁ উপাধি লাভ করেন এবং ঐ নামের মোহর ব্যবহার করেন। কমলের কথা সমর্থন করে খোজা পিদ্রুস ও সদর উদ্দীন। শীলাবতের সহি জাল, ইহা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিলেন সহবৎ পাঠক ও মুন্সী নবকৃষ্ণ। মহারাজের পক্ষে সাক্ষী শেষ হইতে না হইতে হুজুরিমল ও কাশীপ্রসাদকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হইল। সকলেই মহারাজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। এই মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন লেসেস্টার ও হাইড সাহেব এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন সার ইলাইজা ইম্পে। ইম্পে হেস্টিংসের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। জুরীরা সকলেই ইংরেজ, দেশী জুরীর প্রার্থনা করিলেও ইংরেজি আইনমতে সকলই ইংরেজ জুরী গৃহীত হয়। ১৬ই জুন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জাল অপরাধে

অপরাধী ঘোষিত হইল ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বাহির হইল। ৯ই আগস্ট কলিকাতার কুলীবাজারে (এই স্থানের বর্তমান নাম হেস্টিংস, খিদিরপুর পুলের উত্তর দিক) মহারাজের ফাঁসী হইল। ব্রাহ্মণের এই প্রথম ফাঁসী। মহাত্মা সক্রেটিসের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার এক শিষ্য বলিয়াছিলেন—"বড়ই পরিতাপের বিষয়, আপনি নির্দোষ, তবু মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইল।" ইহাতে সক্রেটিশ বলিয়াছিলেন, "তুমি কি আমায় দোষী দেখিলে সুখী হইতে?" মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই। কারণ, তিনি নির্দোষ হইয়া মৃত্যুর কবলে গিয়াছিলেন। সোমিড়ার রাজা রামচন্দ্র নন্দকুমারের বন্ধু ছিলেন। নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি হেস্টিংসকে হত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু উহা ব্যর্থ হয়।

কলিকাতায় মহারাজের স্মৃতিচিহ্ন কিছুই নাই। মুন্সী নবকৃষ্ণ রাজা উপাধি পাইলেন; তাঁহার নামে রাস্তা আছে, এমন কি, হুজুরিমলের নামে বহুবাজারে "হুজুরিমল লেন" আছে। মহারাজ কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন—ইহাই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন। মহারাজার প্রাসাদ যে স্থানে ছিল, উহা ভাঙ্গিয়া কলিকাতায় "বিডন উদ্যান" হইয়াছে। উক্ত উদ্যান তাঁহার নামে করিলে মহারাজ নন্দকুমারের স্মৃতিরক্ষা হইতে পারে।

মহারাজ নন্দকুমারের জীবনচরিত এক অদ্ভুত কাহিনী। তাঁহার জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, পুরুষকারের ও অদৃষ্টের ভীষণ যুদ্ধ—শেষ পুরুষকারের পরাজয়, অদৃষ্টের জয়। তিনি দেশের জন্য—দশের উপকারের জন্য কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। বাঙ্গালীর ভিতর তিনি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, অদ্ভুত ও অক্লান্তকর্মী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, দেশসেবক, প্রভুভক্ত ও দরিদ্রপ্রতিপালক ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। (৩১)

॥ দৈব দুর্ঘটনা ॥

সন ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে (১৮২৩ খৃষ্টাব্দ সেপ্টেম্বর মাস) হুগলী জেলায় ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। ভাগীরথীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ধরমপুর, মোল্লা কাশিমের হাট, রাণীর মাঠ এবং বালী একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। রাস্তা সকল জলপূর্ণ হওয়ায় লোক যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের বন্যা এবং উক্ত বৎসরের ২রা নবেম্বরের প্রবল ঝটিকার সময়ও গঙ্গায় এত জল বৃদ্ধি হয় নাই। সহরের যে যে উচ্চভূমিতে জলপ্লাবন হয় নাই সে সকল স্থানে বহু লোকে আশ্রয় লইয়াছিল। মফঃস্বলে জলপ্লাবন হওয়ায় অনেকে হুগলীতে আসিয়া আশ্রয় লয়। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট স্মীথ সাহেব তাহাদিগকে আশ্রয় ও সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের বাসের জন্য তিনি মোগল দুর্গের নিকটে অস্থায়ী কুটীর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অক্ষম দিগকে ১২৩৲ মূল্যের খাদ্য প্রদান করা হয়। সক্ষমদিগকে স্টেশন রোডে কার্য করাইয়া ১৩৮৲ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এই প্রবল বন্যায় পরগণা মণ্ডলঘাটের (এক্ষণে মেদিনীপুর জেলায়) বিশেষ ক্ষতি হয়। কলেক্টর বেলী সাহেব স্বয়ং তথায় গমণ করিয়া প্রজাদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন। সেই বৎসর উক্ত পরগণার রাজস্ব গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মণ্ডলঘাট প্রভৃতি পরগণায় পুনরায় বন্যা এবং ঝড় হইয়া বিশেষ অনিষ্ট হয়। চৈত্র কিস্তি পর্যন্ত ২,০৪,৯৭২ টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়া-

ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রূপনারায়ণ এবং দামোদর নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া মণ্ডলঘাট পরগণা পুনর্বার জলমগ্ন হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে দামোদর নদীর বাঁধ ভাঙিয়া হুগলী জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জমিদারগণের ১৭০টি বাঁধ ও ভেড়ী ভাসিয়া যায়। বালী হইতে ধনিয়াখালী পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জলমগ্ন হইয়া বিশাল সমুদ্রের আকার ধারণ করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পর এ-প্রদেশে এরূপ বন্যা পূর্বে হয় নাই। হুগলী চুঁচুড়ার পয়ঃপ্রণালী এবং রাস্তা জলমগ্ন হইয়াছিল। জলপ্লাবনে শস্য অজন্মা হইল। অন্নকষ্ট এবং মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। সন ১৩০৭ সালের বন্যাতে ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের শিলা বৃষ্টিতে হুগলী জেলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর হুগলী জেলায় ভয়ংকর ঝড় হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২১ মে তারিখের ঝড় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আরও ভয়ংকর। অকস্মাৎ ঘূর্ণীবায়ু উত্থিত হইয়া ছয় ঘণ্টা ধরিয়া প্রবলবেগে বহিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হয়। এই দৈব দুর্বিপাকে বহুলোক আশ্রয়হীন হইয়াছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের ঘূর্ণী ঝটিকাতেও জেলার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে যে ভূমিকম্প হয়, সেই ভূমিকম্পে হুগলী জেলার নানা স্থানে বহু গৃহ পড়িয়া যাওয়ায় অনেক লোকের মৃত্যু হয়।

হুগলীতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে একটি ভীষণ বন্যার সংবাদ "হেজেস ডায়েরী" হইতে পাওয়া যায়। সংবাদটি এইরূপ ঃ

"September 3rd 1684—The river of Ganges is risen so high as it has not been known in ye memory of man—the water being 3 and 4 foot high in ye Bazaar. It is reported more than 1000 houses are fallen down ye Dutch quarters and boats may row round their factory in Hoogly."

॥ হুগলীতে প্রথম ॥

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ প্রবর্তিত **প্রথম মুদ্রাযন্ত্র** হুগলীতে স্থাপিত হয় এবং বঙ্গভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক "এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ" ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ন্যাথনেল ব্রাসী হ্যালহেড কর্তৃক প্রণীত হইয়া, হুগলীর উইলকিন্স সাহেবের ছাপাখানা হইতে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বঙ্গদেশে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা হইত না বলিয়া, তিনি বঙ্গভাষার শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য সাধনের এবং ইংরেজ বণিকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এই ব্যাকরণখানি রচনা করেন; কারণ সেই সময় বিচারাদি ও জমিদারী কার্যের যাবতীয় কাগজপত্র পূর্বের ন্যায় বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। সেই জন্য ইংরেজগণ বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষায় অজ্ঞতার দরুণ তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত। কোম্পানীর কর্মচারিবৃন্দের অসুবিধা দূরীকরণার্থে তিনি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশদভাবে ৪১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

হুগলী-নিবাসী এস, কে, ধর সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈয়ারী করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে বরফ আসিবার পূর্বে হুগলীতে বরফ প্রস্তুত হইত

যে স্থানে বরফ তৈয়ারী হইত, উক্ত স্থানটি অদ্যাপি 'বরফ তোলার মাঠ' বলিয়া খ্যাত। "ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা" পুস্তকে হুগলীর বরফ তৈয়ারীর কথা লিখিত আছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ডাক বিভাগের কার্য আরম্ভ হয় এবং হুগলীতে আড়াই তোলা ওজনের একখানি পত্র পাঠাইতে এক আনা এবং কাশীতে ঐ ওজনের পত্র পাঠাইতে সাত আনা ব্যয় হইত। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী ভ্রমণের জন্য 'ডাক-চৌকি খোলা হয়। উক্ত চৌকিতে জলপথে বজরা করিয়া এবং স্থলপথে পাল্কি করিয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা সুরু হয়। কলিকাতা হইতে ডাক-চৌকিতে হুগলী যাইতে ৪৬।০ খরচা পড়িত। ডাকঘর ও ডাক চৌকির ইতিকথা ৩৩০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে বলিয়া আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

॥ টানা পাখা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোর্তুগীজরা হুগলীতে সর্বপ্রথম টানা পাখা আবিষ্কার করিয়া তাহাদের ঘরে ব্যবহার করেন। ইহার পূর্বে আমাদের দেশে তালপাতার পাখার প্রচলন ছিল। ভোলানাথ চন্দ্র পোর্তুগীজগণ যে টানাপাখার আবিষ্কারক তাহা লিখিয়াছেন। দ্যা-গ্রান্ডে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টানাপাখার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উল্লেখ্যঃ

Many houses have a large fan from the ceiling over the eating table, of a square form balanced of an axle fitted to the upper part of it. (M. L. De Grandre)

টানা পাখার জন্ম ১৭৮৪ হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হয়। অনেকে ইংরেজদের টানাপাখার প্রবর্তক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভুল। ব্যক্তিগত বিলাশবিহ্বল জীবনকে শান্তি দিবার জন্য পোর্তুগীজগণ সদাসর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন এবং তাহার ফলস্বরূপ টানাপাখা আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে "ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল" এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেনঃ

It is generally known that the punkahs which are suspended in our rooms are machines originally introduced in this country by the Portuguese.

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরিয়ান বঙ্গদেশে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় হুগলী জেলায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার বসবাসের প্রিয়তম স্থান ছিল হুগলী মট্-সাহেবের "হুগলী হাউস" নামক আবাসভবন। হুগলীতে অবস্থান কালে হেস্টিংস তাঁহাকে যে সকল পত্র দেন, তাহা বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তৎকালীন বিদেশী সুন্দরীগণের মধ্যে সর্বপ্রধান মাদাম গ্রান্ডও এই স্থানে বাস করিতেন। ডাঃ বাস্টিড তাঁহার "ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা" নামক পুস্তকে মাদাম গ্র্যান্ডের দুইখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এ ছাড়া প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ্ ফিচ্, পার্কাশ, হ্যামিল্টন প্রভৃতি পর্যটকগণ এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হুগলীর সেন, মল্লিক, চৌধুরী, মিত্র প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। মল্লিক বংশ খুব প্রাচীন এবং এই বংশের ব্রজমোহন মল্লিক-চৌধুরী ও মিত্র বংশের ঈশানচন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে হুগলীর বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন। মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে কাশিম আলি মল্লিক, মির্জা সালেউদ্দিন, মহম্মদ খাঁ আশারুল্লা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ হুগলী ইমামবাড়া ॥

হুগলীর ইমামবাড়া ভারতের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু; ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে বাংলার গৌরব হাজি মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির অংশ হইতে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এব ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুন্দর ভবনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। ইমামবাড়ার সম্মুখের বৃহৎ ঘড়িটি বিলাত হইতে আনাইতে ১১৭২১ টাকা এবং গঙ্গার ধার ইট দিয়া বাঁধাইতে ষাট হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইরূপ সুন্দর অট্টালিকা বঙ্গদেশে তৎকালে খুব অল্পই ছিল। গঙ্গার ধারে ইমামবাড়ার গাত্রে ইংরেজী ভাষায় হাজি মহম্মদ মহসীনের দানপত্রখানি উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে দানবীর মহাত্মা হাজি মহসীন হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে কয়জন মহাত্মার আবির্ভাবে বঙ্গজননী গৌরবান্বিত মহম্মদ মহসীন তন্মধ্যে অন্যতম। বাল্যকালে তিনি সিরাজী নামক এক পণ্ডিতের নিকট আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার মাতার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের সন্তানের নাম মন্নু বেগম; মন্নুর পিতা আগা মোতাহার বহু সম্পত্তি রাখিয়া গতাসু হইলে, মন্নুর মাতা ফৈজুল্লাকে বিবাহ করেন মহসীন তাঁহার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান মির্জা সালাউদ্দিনের সহিত মন্নুর বিবাহ হয়, কিন্তু তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নু তাঁহার ভ্রাতা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ফকির মহসীনকে অর্ধ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া যান।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহসীন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি সৎকার্যে ব্যয় করিবার জন্য দান-পত্র করিয়া যান। পরে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। উক্ত 'মহসীন-ফন্ড' হইতে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমামবাড়া হাসপাতাল, হুগলীর ইমামবাড়া, বহু মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। গঙ্গাতীরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। পূর্বে সমাধিস্থলে কোন আচ্ছাদন ছিল না কিন্তু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ বাহাদুর আস্রাফউদ্দীন আহম্মদের চেষ্টায় এবং জন-সাধারণের অর্থে তাঁহার সমাধির উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মহসীনের জন্মে হুগলী ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মহসীনের সমাধি মন্দিরটি আধুনিক হইলেও একটি দর্শনীয় বস্তু; এই মন্দিরের মধ্যে ছয়টি সমাধি বিদ্যমান আছে। শ্বেত প্রস্তরের আড়ম্বর-বিহীন সমাধিগুলির শীর্ষ-দেশে মার্বেল প্রস্তরের এক একখানি ফলক আছে এবং প্রতি ফলকের উপর মৃত ব্যক্তির পরিচয়-লিপি উর্দুভাষায় উৎকীর্ণ আছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে তরুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যে হাজি মহম্মদ মহসীন, তাঁহার ভগ্নীপতি সালাউদ্দীন খাঁ, ভগ্নী মন্নু বেগম, মাতা জনাব বেগম, পিতা আগা মহম্মদ মুতাহার এবং গুরুদেব সৈয়দ কামাল-উদ্দীন ঠিক যেন এক বিছানায় শয়ন করিয়া আছেন, আর ভাগীরথীও যেন প্রতি উচ্ছ্বাসে মহসীনের পবিত্র নাম বঙ্গবাসীকে সত্যেন্দ্রনাথের কথায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছে:

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে,

সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।"

॥ মহসীনের দানপত্র ॥

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে তিনি নিম্নলিখিতরূপ দানপত্র সুসম্পন্ন করেন। এই দানপত্র হুগলী ইমামবাড়ার ধনভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে। উহার ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান ইমামবাড়ার গঙ্গার তীরবর্তী প্রাচীর গাত্রে খোদিত রহিয়াছে, আমরা এখানে মূল দানলিপির বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলামঃ

"আমি হাজি মহম্মদ মহসীন বন্দর হুগলী নিবাসী হাজি ফৈজুল্লার পুত্র এবং আগা ফৈজুল্লার পৌত্র স্বজ্ঞানে স্ববুদ্ধিতে স্বেচ্ছাক্রমে নিম্নলিখিত সত্য এবং ন্যায্য কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। যশোহর জিলার সংলগ্ন কিস্মত সৈয়দপুর এবং হুগলী অবস্থিত ইমামবাড়া নামক বিখ্যাত বাড়ী ইমামবাজার এবং হাট ও স্বতন্ত্র তালিকাভুক্ত ইমামবাড়া সংলগ্ন সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি যে সকল আমি উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইহার দখল সত্ত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি, আমার কোন পুত্র, পৌত্র এমন কি ন্যায্য আইনসঙ্গত কোন উত্তরাধিকারী পর্যন্ত না থাকায় এবং আমাদের বংশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে হজরতের 'ফতে' ইত্যাদি পর্বোপলক্ষে দানকার্য ও অন্যান্য রীতিনীতি রক্ষা করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকায় আমি পূর্বোক্ত সমুদয় সম্পত্তি সর্ববিধ অধিকার সহ নিম্নসর্তানিরূপ ব্যয়নির্বাহার্থ খোদার নামে স্থায়ীভাবে দান করিয়া যাইতেছি।

"সেখ মহম্মদ সাদিকের পুত্র রাজবউলিখাঁ ও আমাদ খাঁর পুত্র সকিরউলি খাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম-প্রবণতা এবং সাধুতা দেখিয়া আমি ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উক্ত কার্যনির্বাহের জন্য আমার সম্পত্তির মাতোয়ালি বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতেছি। তাঁহারা পরস্পরের উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণান্তর পরামর্শ করিয়া ও একমত হইয়া উক্ত কার্য একত্রে নিম্নলিখিতভাবে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবেন। পূর্বোক্ত মতোয়ালিগণ রাজস্ব প্রদানপূর্বক অবশিষ্ট উপসত্ত্ব নয়ভাগে বিভক্ত করিবেন। তাহা হইতে তিন সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি হজরত সৈয়দ ইকায়ুনত এবং নিষ্পাপ ইমামগণের 'ফতে'র জন্য মহরম উলহরাম, উস্রা ও অন্যান্য পর্ব, পর্বদিন উপলক্ষে এবং ইমামবাড়া ও সমাধি স্থান সংস্কারের জন্য ব্যয় করিবেন! দুইভাগ সমভাবে বিভক্ত করিয়া মাতোয়ালিগণ নিজ নিজ খরচের জন্য রাখিবেন। অবশিষ্ট চারিভাগ কর্মচারিদিগের মাহিয়ানা ও তৎসংক্রান্ত নানাবিধ খরচাদি এবং যাহাদের নাম আমার স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত করিয়া ভিন্ন তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদের জন্য প্রদান করিবেন। দৈনিক ব্যয়ও মাসিক বৃত্তি বা বেতন বিষয়ে সর্ত রহিল যে উক্ত বৃত্তি বা বেতনধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, প্যায়দাগণ ও অন্যান্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ্যতা ও উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া উক্ত মাতোয়ালীগণ স্বেচ্ছামত তাহাদিগকে কর্মে বহাল কিম্বা কর্মচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। আমি সর্বজনসমক্ষে এই অধিকার উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের হস্তে প্রদান করিয়াছি। যদি কোন সময়ে কোন মাতোয়ালী

এই দলিলোক্ত কার্য করিতে অক্ষম বোধ করেন তাহা হইলে তিনি একজন উপযুক্ত এবং সুদক্ষ ব্যক্তি নির্বাচন করিয়া তাহার পক্ষ হইতে মাতোয়ালির কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন উল্লিখিত সর্তগুলি আজ হিজিরা ১১২১, বাঙ্গলা ১২১৩ সনের বৈশাখ মাসের ১১শে তারিখে এই দলিল লিখিয়া দেওয়া গেল এবং প্রয়োজন হইলে উক্ত দলিলই আমার ন্যায়ানুমোদিত কার্যের যথার্থতা সপ্রমাণ করিবে।"

বাঙ্গালী ভ্রমণকারী ভোলানাথ চন্দ্র হুগলী ইমামবাড়ার যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ঃ

One of the noblest buildings in Bengal is the Emambarah of Hooghly. The courtyard is spacions and grand. The trough in the middle is a little-sized tank. The two-storied buildings, all around are neat and elegant. The great hall has a royal magnificience. But it is profusly adorned in the Mahomedan taste with chandeliers and lanterns and well-shades of all the colours of the rain-bow. The surface of the walls is painted in blue and red inscriptions from the Koran. Nothing can be more gorgeous than the doors of the gateway. They are richly gilded all over and upon them is inscribed in golden letters, the dates and history of the Musjeed. (Travels of a Hindu)

ব্যাণ্ডেল

ব্যাণ্ডেল হাওড়া হইতে পঁচিশ মাইল দূর। বন্দর কথা হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে ইহা পর্তুগীজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ এখানে একটি সুবৃহৎ গির্জা নির্মাণ করেন। ইহাই বাংলার আদি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দির।

হান্টার সাহেব "ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া" নামক গ্রন্থে এই প্রাচীন গির্জা সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

BANDEL, a village on the river bank, about a mile above Hugli, containing a Roman Catholic monastery, the oldest Christian Church of Bengal.

ইহার প্রাচীরগাত্রে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে। বালক যীশু ও মাতা মেরীর মূর্তি এখানে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজিত হয় এবং রোগ আরোগ্য ও মনস্কামানা পূর্ণ হইবার আশায় বহু রোম্যান-ক্যাথলিক খৃষ্টান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই গির্জাটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

এই গির্জাটি একাধিকবার যুদ্ধ-বিগ্রহে ধ্বংস ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হস্তে পর্তুগীজগণ পরাজিত এবং মুঘল কর্তৃক হুগলী অধিকৃত হইবার সময় পর্তুগীজগণের দুর্গ ও এই গির্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুঘলগণ বহু খৃষ্টানকে বন্দী করিয়া

আগ্রায় লইয়া যায়। কথিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে বন্দী পাদ্রী দা' ক্রুজকে একটি মত্ত হস্তীর সম্মুখে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু হস্তী তাঁহাকে পদদলিত না করিয়া শুড়ে দিয়া আদর করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর ভীত ও বিস্মিত হইয়া দা' ক্রুজকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার অনুরোধে ব্যাণ্ডেলের গির্জা পুনরায় নির্মাণ করিবার অনুমতি দেন এবং উহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য বহু নিস্কর জমি প্রদান করেন।

এই সম্বন্ধে ওম্যালী সাহেব "হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে" লিখিয়াছেনঃ

The land thus assigned was given free of rent, and the Priars were declared exempted from the authority of the *subahdars*, *faujdars* and other officers of state. They were even allowed to exercise magisterial power over Christians, but not in the matters of life and death.

হস্তীর পদতল হইতে পাদ্রী দা' ক্রুজের আশ্চর্যরূপে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটির স্মরণে আজও প্রতিবৎসর এই গির্জায় "ডোমিংগো দা' ক্রুজ" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২১ মে তারিখের "বেঙ্গল ক্যাথোলিক হেরাল্ড" পত্রে এই ঘটনার বিবরণ লিখিত আছে। প্রবাদ, এই গির্জায় মাতা মেরীর যে মূর্তি আছে উহা পূর্বে হুগলীস্থ পর্তুগীজ সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাদ্রী দা' ক্রুজ ও তাঁহার এক স্বজাতীয় বণিক বন্ধু এই মূর্তির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের মুঘল-পর্তুগীজ সংঘর্ষের সময় উক্ত বণিক লাঞ্ছনার হাত হইতে এই মূর্তিকে রক্ষা করিবার জন্য উহা লইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন, কিন্তু মূর্তি বা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাদ্রী দা' ক্রুজ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং মূর্তিটির উদ্ধার সাধনের জন্য দিনরাত প্রার্থনা করিতে থাকেন। আগ্রা হইতে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহলের খৃষ্টানগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে ব্যাণ্ডেল গির্জার সংস্কার আরম্ভ করেন। কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে গির্জার সম্মুখে নদীর জল ভীষণভাবে আলোড়িত হইয়া উঠে। সেই শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে পাদ্রী দা' ক্রুজ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন বহুদিন পূর্বে জলমগ্ন তাঁহার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন জ্যোৎস্নালোকে নদীর এক অংশ যেন উদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এক ব্যক্তি গির্জার দিকে আসিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল এবং নদীর আলোকিত অংশ পুনরায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিবার পর পাদ্রী দা' ক্রুজ দেখিলেন বহু লোক গির্জার সম্মুখে একত্র হইয়া বলাবলি করিতেছে "গুরুমা আসিয়াছেন"। দা' ক্রুজ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন তাঁহার সেই অতি প্রিয় মেরীর মূর্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল পূর্বরাত্রে তিনি যে তাঁহার বণিক বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন উহা কেবলমাত্র স্বপ্ন নহে। অতঃপর মহা আড়ম্বরে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্যাণ্ডেল গির্জার দক্ষিণে কয়েকটি সমাধির মধ্যে একটি জাহাজের মাস্তুল প্রোথিত দেখা যায়। যে দিন মাতা মেরীর মূর্তি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন অকস্মাৎ

একখানি বড় পর্তুগীজ জাহাজ গির্জার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ বলেন যে তাঁহারা বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়েন; জাহাজ রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি মাতা মেরীর নিকট প্রার্থনা ও মানত করেন যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া জাহাজখানিকে কোন নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দেন। কিছু পরে ঝড় থামিলে তিনি সবিস্ময়ে দেখিতে পান যে জাহাজখানি এই গির্জার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। জাহাজের নাবিকগণ মহোৎসাহে মাতা মেরীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করেন এবং মানত রক্ষার জন্য জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ হইতে একটি মাস্তুল লইয়া গির্জায় উপহার প্রদান করেন। তদবধি এই উৎসর্গীকৃত মাস্তুল গির্জার প্রাঙ্গণে শোভা পাইতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঝড়, জল ও রৌদ্রে ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই জাহাজ বা অধ্যক্ষের নাম জানা যায় নাই।

ব্যাণ্ডেল হুগলী জেলার অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; এবং ইউরোপীয়গণ কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায়ই যাইত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার রবার্ট চ্যাম্বারস্‌ পর্যন্ত এই সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর ব্যাণ্ডেলে ছুটি উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে সংবাদটি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বরের "কলিকাতা গেজেট" হইতে এইস্থানে উদ্ধৃত হইল:

"Sir Robert Chambers, Judge of the Supreme Court, had gone to spend the vacation at the pleasant and healthy settlement of Bandel."

পর্তুগীজদের ব্যাণ্ডেল গীর্জা বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা বলিয়া, বিভিন্ন স্থানের ইউরোপীয়গণ ভজনা করিবার জন্য এই স্থানে সমবেত হইতেন; কিন্তু বহু অসৎপ্রকৃতির ইউরোপীয় এই ভজনাগারের মধ্যে নানা প্রকারের গোলমাল করিয়া প্রায়ই বিঘ্ন সৃষ্টি করিত। এই সম্বন্ধে 'কলিকাতা গেজেটের' নিম্নোক্ত সংবাদটি হইতে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইবে। [১৫ নভেম্বর ১৮০৪]

"Caution—Bandel, 10th November 1804. Every person presents at Bandel Church while divine service is performing from the 15th to the 24th current, are requested to behave with every due respect as in their own Churches, on the contrary, they shall be compelled to quit the temple immediatety, without attending the quality of person."

ব্যাণ্ডেল গির্জার অধ্যক্ষ আলেকজাণ্ডার রডরিক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার জন্য "সেন্ট জনস মিডিল ইংলিশ স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ইহাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং হুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মবার্লি সাহেব উদ্বোধন করেন। "ওরিলাস-হাউসে" অবস্থিত এই বিদ্যালয় হুগলী জেলার অন্যতম প্রধান শিক্ষালয়ের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গির্জার পরিচালন ভার গোয়া মায়লাপুর হইতে হইত। তাহার পর হইতে ইহা কলিকাতার আর্চবিশপের অধীনে আছে। বর্তমানে আর্চবিশপ পদে প্রথম ভারতীয় রেভারেন্ড অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি হুগলী জিলার অধিবাসী।

ব্যাণ্ডেলের প্রশংসা করিয়া জনৈক ইংরাজ কবি ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, কবিতাটি এই স্থানে উল্লেখ্যঃ

BANDEL

Come listen to me, whilst I tell,
In pleasing lines the objects fell,
There's Hughli mounted on a swell
Here the bank rises, there's a dwell.
Water you'll find in many a well
No dirty roads or stinking smell
All billious gloom you'll soon dispel
And now here meet with the parcil
'Tis fine to hear the Padre's bell
Would you be known to many a belle
Ask....................who loves to dwell
Lives like a hermit in his cell
I thought to have found there madame Pelle
Each other place is hot as hell
I'm sure no argument can quell
I'll kick the rogue and make him yell
Had I ten houses, all I'd sell
Come let's away there ; haste pelmel
The charms I found at fair Bandel
In prophet viewed from high Bandel
To improve the scenery round Bandel
A change peculiar to Bandel
That's clear and sweet about Bandel
Will e'er offened you at Bandel
By a short sejour at Bandel
Of healthy air that's at Bandel,
Summon to vespers at Bandel.
Whose beauty charms you at Bandel,
And scribble verses at Bandel.

হুগলীর প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পর্তুগীজদিগের নির্মিত ব্যাণ্ডেল গীর্জা বাংলা-দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খৃষ্টীয় উপাসনাগার। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই গীর্জা নির্মিত হয় এবং মোগল কর্তৃক হুগলী আক্রমণের সময় ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহা ধ্বংস করা হয়। এই প্রাচীন গির্জা সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইলঃ

"This Church was founded in 1588 A. D. and the oldest Christian Church in Bengal. The Church was burnt during the siege of Hooghly but the key stone with the year 1588 inscribed on it remained in tact and this key stone was used when the Church was rebuilt in A. D. 1661 by a Portugese gentleman named Gomes De Soto. who lies buried within the precincts of the church along with other relations. When Hooghly was taken, the Mahammadans destroyed the images and books of this Church. The Emperor of Delhi subsequently made a grant of 771 bighas of land, rent free, to the church. In November of each year there is a celebrity at this Church the disciple of Novena to which the Roman Catholics largely resort from Calcutta." (List of Ancient Monuments in Bengal)

সরকারী গ্রন্থে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রস্তরফলক দেখিয়া এই উপাসনাগার উক্ত বৎসর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এই গির্জার ধর্মাধ্যক্ষ (Prior) কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন পুস্তিকায় ইহার প্রতিষ্ঠা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে দেখিয়াছি। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই গির্জার সাড়ে তিনশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সমারোহের সহিত জয়ন্তী উৎসব ২৮ অক্টোবর হইতে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে গঙ্গার ধারে যেখানে মেরীর মূর্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই চিহ্নিত স্থানে একটি পাথরের বেদীর উপর ক্রস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে উহা **"ক্রস মেমোরিয়াল অলটার"** বলিয়া পরিচিত। যীশুখৃষ্টের মাতা মেরীর শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত মূর্তি দেখিতে খুব সুন্দর। এই স্থানের মূর্তি "লেডি অফ ব্যাণ্ডেল" বলিয়া খৃষ্টানদের নিকট খ্যাত। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জয়ন্তী উৎসবে "লেডি অফ ব্যাণ্ডেলে"র উদ্দেশ্যে যে কবিতা প্রচারিত হইয়াছিল তাহার কয়েক লাইন এইরূপঃ

O dearest Mother, round thy altar thronging
Behold thy children in this hallowed spot.
For peace and rest their weary hearts are longing,
Which to its slaves this drear world giveth not.

ব্যাণ্ডেলের নিকট গঙ্গার উপর 'জুবিলী-ব্রীজ' অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও এখানকার একটি দর্শনীয় বস্তু। এই সেতু লম্বায় বার শত ফুট এবং ইহা নির্মাণ করিতে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীকে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় বর্ধমানের মহারাজা, স্বর্গীয়

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সংগৃহীত অর্থে হুগলীর তৎকালীন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্মিথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। ঈশানবাবু বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম "হায়ার গ্রেডেড সার্ভিস" পাইয়াছিলেন এবং ৭৫০্ বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে তিনি হুগলী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কর্মবহুল জীবনের ঘটনাবলী 'গুপ্তিপাড়া' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। সদর দেওয়ানী আদালত কর্তৃক জজদের প্রেরিত একটি সার্কুলার অর্ডার হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত রূপে মধুসূদন বাচস্পতি কার্য করেন। সেকালের ভদ্রসমাজে কবি ও খেউড গান প্রচলিত ছিল। এই কবিগান রচনায় চুঁচুড়া নিবাসী লালুনন্দ লাল খুব বিখ্যাত ছিলেন। তাহার পর হুগলী নিবাসী রামজী উত্তম কবিগায়ক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র "সেকালের আমোদ-প্রমোদ" প্রবন্ধে ইহাদের বিষয় লিখিয়াছেন।

ব্যাণ্ডেল হইতে একটি শাখা লাইন জুবিলী ব্রিজের উপর দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূর্ব-রেলপথের নৈহাটি স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপর একটি শাখা নবদ্বীপ ও কাটোয়া হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বারহাড়োয়া পর্যন্ত গিয়াছে।

॥ চুঁচুড়ার সঙ ॥

চুঁচুড়ায় বারোয়ারী পূজো উপলক্ষে প্রাচীনকালে খুব জাঁকজমকের সহিত সঙ বাহির হইত। এই সঙের বিষয়ে তৎকালীন সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' এবং অমৃতলাল বসু বাবু-তে চুঁচুড়ার সঙের বিষয় লিখিয়াছেন :

'চুঁচুড়োর সঙ আমার কেবল দ্যায়লা করছেন।'

কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছেন: পূর্বে চুঁচুড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হত না। 'আচাভো', 'বোম্বা চাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হত; শহরের নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজ্‌রা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন; লোকের এত জনতা হত যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিল, চোরেরা আণ্ডিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরোস্তর হাঁড়ি চড়েনি।

প্রসিদ্ধ গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী তাঁহার গানের মধ্যেও চুঁচুড়ার সঙের কথা সুর-তান-লয় যোগে গাহিতেন। যথা:

গুলি হাড়কালি মা কালীর মত রঙ।
টানলে ছিটে বেচায় ভিটে যেন চুঁচুড়োর সঙ॥

চুঁচুড়ার সঙের বিষয় এখন তাই প্রবাদে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। প্রবাদটি এই:

গুলিখোরের কিবা ঢঙ, দেখতে যেন চুঁচুড়োর সঙ।

হুগলী সম্বন্ধেও প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে।

"মোগল মিশি মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা॥"

॥ সাময়িক পত্র ॥

উনিশ শতকে বাঙ্গলাদেশে পত্র-পত্রিকার জনক-জননী ছিল হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া। সাময়িক সাহিত্য আলোচনাকালে (৪৯১-৫৪৯ পৃষ্ঠা) হুগলী জেলার পত্র-পত্রিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশে হুগলীর গৌরব এখন কলিকাতা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ কলিকাতায় বহু লোকের বাস ও বিচিত্র রুচির পাঠকের সমাবেশ এবং দ্বিতীয় কারণ কাগজ, ছাপাখানা প্রভৃতির প্রাচুর্য ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সুবিধা। ইহার ফলে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং সংবাদপত্রের জনক হুগলী আজ তাহার পূর্ব গৌরব ধীরে ধীরে হারাইয়া ফেলিতেছে। হুগলী জেলা হইতে এখন আর কোন দৈনিকপত্র প্রকাশিত হয় না। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বর্ধমান প্রথম, চব্বিশ পরগণা দ্বিতীয়, মেদিনীপুর তৃতীয় ও হুগলী চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্নে কোন জেলা হইতে কতগুলি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইলঃ

	সাপ্তাহিক	পাক্ষিক	মাসিক	ত্রৈমাসিক	মোট
বর্ধমান	১৪	৭	৫	৩	২৯
চব্বিশ পরগণা	৭	৫	৭	৬	২৫
মেদিনীপুর	১৪	—	৬	—	২০
হুগলী	৭	৮	৩	১	১৯
হাওড়া	১	৩	৬	৩	১৩
বীরভূম	৯	১	১	২	১৩
মুর্শিদাবাদ	৮	১	১	২	১২
নদীয়া	৩	৪	৪	—	১১
বাঁকুড়া	৩	৪	১	—	৮
মালদহ	৫	—	২	১	৮
পুরুলিয়া	২	১	১	—	৪

॥ দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ ॥

বাঙ্গলাভাষায় সর্বপ্রথম প্রবাদপুস্তক **"দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ"** চুঁচুড়া নিবাসী রেভারেণ্ড উইলিয়ম মর্টন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশ করেন বলিয়া শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার বাংলা প্রবাদে লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ ও ৭০টি সংস্কৃত প্রবাদ আছে। এই পুস্তকখানি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকায় মর্টন সাহেব নামের পাশে "Chinsura, July 1832" এইরূপ তারিখ দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। পরে তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা খৃষ্টান

অবর্জাভার" পত্রের চারিটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে "বেঙ্গলী প্রর্ভাব" নাম দিয়া আরো ১৫৬টি বাংলা প্রবাদ প্রকাশ করেন।

ইহার আগে চুঁচুড়া নিবাসী 'বঙ্গদূত' সম্পাদক নীলরত্ন হালদার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে **"কবিতা রত্নাকর "** পুস্তকেও ২০৩টি সংস্কৃত নীতিবাক্য সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে জন মার্শম্যান লিখিত ইংরাজী ভূমিকা ও প্রবাদগুলির ইংরাজী অনুবাদ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'কবিতা রত্নাকরে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হুগলী **ভবানী প্রেস** হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির নাম "এ ফিউ সেয়িংস এন্ড ওপিনিয়ান্স অফ লেট্ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি"।

॥ ফৌজদার ॥

হুগলীর ফৌজদার বা গভর্নরদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায় ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মালিক বেগ্ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ বরাবর ঐ পদে ছিলেন না। চট্টগ্রাম অধিকার করিবার পূর্বে সংগ্রামগড়ের দুর্গ রক্ষার জন্য ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ সরীফকে পাঠান হয় বলিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে লিখিত আছে। তারপর মালিক বেগের পুত্র মালিক কাসিম ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দুইবার ফৌজদার হন বলিয়া টমাস বাউরি তাঁহার "কানট্রিস রাউন্ড দি বে অফ বেঙ্গল" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। হেজেস সাহেব তাঁহার ডায়রীতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে সফিদ মহম্মদ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন বলিয়াছেন। তাহার পর মালিক বরকুর্দার ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ফৌজদার হন। তিনি ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদুল গণি, ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে জিয়াউদ্দীন খাঁন ফৌজদার ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। উইলসন সাহেব আর্লি এ্যানালস অফ বেঙ্গল নামক পুস্তকে জিয়াউদ্দীন খাঁন ১৭১০ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে ফৌজদারের কার্যভার গ্রহণ করেন বলিয়াছেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল না বলিয়া মির্জাওয়ালি বেগকে তিনি নিজের ইচ্ছায় ফৌজদার করেন। এই পদে দুইজন মনোনীত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং ওয়ালি বেগ হারিয়া যান। জিয়াউদ্দীন খাঁন ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া করমন্ডলের দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। জিয়াউদ্দীন খাঁন সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উ সালাতিন' গ্রন্থ হইতে ওম্যালী সাহেব বলেন ঃ

Zia-ud-din Khan was friendly to the English and other Europeans, but was on bad terms with Murshid Kuli Khan, who selected Mirza Wali Beg as *Faujdar* on his own authority. The two took up arms to support their claims, the struggle ending in the defeat of Wali Beg. (Hooghly District Gazetteer).

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মীর নাসির হুগলীর ফৌজদার হন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে আসানুল্লা খাঁন ফৌজদার থাকাকালীন অস্টেড কোম্পানীর বাঁকিবাজারের কুঠী অধিকার করেন।

তাঁহার পর পীর খাঁ ফৌজদার হন এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফৌজদার ছিলেন। পীর খাঁ গিরীয়ার যুদ্ধে নবাব সরফরাজ খাঁ-র বিরুদ্ধে যান এবং আলিবর্দী খাঁ-কে সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন এবং আলিবর্দী বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহন করেন। তাঁহার সময়ে বর্গীদের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং দেশময় অরাজকতা বিরাজ করিত। পীর খাঁ আলিবর্দীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরতা ও সদাশয়তার বিষয় বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেবরায় লিখিয়াছেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের পেস্কার মানিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার ও কলিকাতা অধিকারে নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। ইংরেজ লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, মানিকচাঁদই অন্ধকূপ হত্যার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। মানিকচাঁদের পর নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হন। মোগল সরকারে তাঁহার প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল। কলিকাতায় লোয়ার চিৎপুর রোড ও কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড়ে যে বাটীতে কবিরাজ বিনোদলাল সেন বাস করিতেন, তথায় হুগলীর ফৌজদারের কাছারীবাড়ি ছিল। রাজা মাণিকচাঁদ কয়েক মাস এই বাটীতে আদালত করিয়া দেশীয় ব্যক্তিদের মামলা মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের পর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ওমর বেগ খাঁন হুগলীর ফৌজদার হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বয়ং দেওয়ানী গ্রহণ করেন এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ফৌজদার পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। খাঞ্জা খাঁ হুগলীর শেষ ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা উল্লেখ্য ঃ

In 1780 the system was again changed. In each of the six divisions a separate civil court was set up under a European Judge who in 1781 was vested with the powers of a Magistrate, while the establishment of *Faujdars* and *Thanadars* was abolished.

॥ দেওয়ান ॥

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে রাজকিশোর রায় নামক এই ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁহার কালী-কীর্তনের এক স্থলে রাজকিশোর রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেনঃ

"শ্রীরাজকিশোরদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

ভূকৈলাসের মহারাজা উক্ত সময়ে ভারতের তীর্থগুলি পর্যটন করেন এবং ভারতের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান ও দর্শনীয় বস্তুসমূহের বিবরণ তাঁহার আদেশে বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজকিশোর রায় সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা উল্লিখিত হইল।

"চলাচল আইলা নৌকা হুগলী সহরে।
সে রাত্রি বঞ্চিলা কর্তা নৌকার ভিতরে॥

হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায়॥
বৈদ্যের প্রধান তিনি বড় কুলবান।
এ দেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান॥
ক্ষণেক কর্তার সংগে আলাপ কথনে।
নৌকা হৈতে উঠি গেলা সহর ভ্রমণে॥"

হুগলীতে আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দেওয়ান হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণরাম বসু। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার তড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনর বৎসর বয়সে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহিত লবণের ব্যবসা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে তিনি হুগলীর দেওয়ান হন। হুগলী, যশোহর ও বীরভূম জেলায় তিনি বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং উক্ত স্থানগুলিতে দেবকীর্তি স্থাপন করিয়া দেবসেবার জন্য বহু জমি বন্দোবস্ত করিয়া যান। মাহেশে ও পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার খরচের জন্য তিনি বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং তাঁহারই প্রদত্ত দেবসেবা হইতে মাহেশের রথযাত্রা অদ্যাপি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। তিনি দানশীলতার জন্য তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। যদুনাথ সর্বাধিকারী রচিত 'তীর্থ-ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে (১৭৪ পৃষ্ঠা) এবং লোকনাথ ঘোষের "মডার্ন হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান চিফস" পুস্তকের ২য় খণ্ডে (৪৪ পৃষ্ঠা) কৃষ্ণরাম বসুর উল্লেখ আছে। তাঁহার নামে শ্যামবাজারে একটি রাস্তা আছে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে জুডিসিয়েল এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের জন্য হুগলীতে প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন পদে মৌলভী সৈয়দ আহম্মদ এবং সদর আমিন পদে মিঃ গ্রেগোরিয়াস হার্কলটস (সিনিয়ার) ও রাধাগোবিন্দ সোম মনোনীত হইয়াছিলেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংবাদে ময়মনসিংহ সাহাবাদ, জঙ্গল মহল, পাটনা, সিলেট, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও সদর আইন নিয়োগের কথা আছে।

॥ হুগলী রেলস্টেশন ॥

বাঙ্গলাদেশের প্রথম রেলগাড়ী হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ১৫ই আগস্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিতে সুরু হয়। সেই দিন রেলে প্রথম ভ্রমণ করিবার জন্য তিন হাজার দরখাস্ত পড়ে, কিন্তু এই নব-অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সৌভাগ্য মাত্র চারশত লোকের হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কারণ গাড়ীর সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচখানি ও খোলা ট্রাক ছিল তিনখানি। ট্রাকগুলি ছিল তৃতীয় শ্রেণী আর পাঁচখানি গাড়ীর মধ্যে তিনখানি ছিল প্রথম শ্রেণী ও দুইখানি ছিল দ্বিতীয় শ্রেণী। সমস্ত কামরাগুলি এই দেশেই তৈয়ারি হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিলাত হইতে "ফেয়ারী কুইন' নামে একখানি ইঞ্জিন আসে। এই 'ফেয়ারী-কুইন' প্রথম রেলগাড়ীগুলি লইয়া হাওড়া স্টেশন হইতে হুগলী স্টেশন পর্যন্ত এই চব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে। সকাল সাড়ে আটটা

হাওড়া হইতে যাত্রা সুরু হয়। অগণিত জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতারে কাতারে এই চমকপ্রদ দৃশ্য দেখিবার জন্য সারি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন প্রথম রেলগাড়ী তাহাদের নিকট আসিল তখন শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা জনতা রেলগাড়ীকে অভিনন্দন জানাইল। কেহবা ইঞ্জিনে ফুলের মালা দিল। বেলা বারটার পর প্রথম রেলগাড়ী **বাঙ্গলার প্রথম রেলস্টেশন হুগলীতে** আসিয়া পোঁছিল।

প্রথম রেলযাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট তারিখের "বেঙ্গল হরকরা" পত্রে প্রকাশিত হয়। হুগলীর রূপচাঁদ ঘোষ নামে একজন ব্যবসায়ী প্রথম ট্রেনের যাত্রী ছিলেন তিনি হুগলী পোঁছিয়া এমন দিশাহারা হইয়াছিলেন, যে তাহার বিশ্বাস হয় নাই তিনি হুগলী পোঁছিয়াছেন। তাই তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে সত্যই এই স্থানটি হুগলী কি না? শেষে সত্যই যখন তিনি হুগলীতে আসিয়াছেন সকলে বলিতে লাগিল, তখন তিনি আশ্বস্ত হন। আর একজন যাত্রীর নাম পণ্ডিত রাধালঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাঁজিতে দিন ক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করেন। কিন্তু রেলগাড়ীতে তিনি আর ফেরেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাঁজিতে লিখিয়াছে "অগ্নিদেবের এই রথে অতিরিক্ত ভ্রমণে ফল আশু মৃত্যু" তাই তিনি রেলে আর ফিরিয়া যান নাই।

হুগলী* বাঙ্গলার প্রথম রেলস্টেশন হইলেও একদিকে চুঁচুড়া আর এক দিকে ব্যাণ্ডেল স্টেশনের চাপে ইহা আজ একটি নগণ্য স্টেশনে পরিণত হইয়াছে।

॥ প্রাণকৃষ্ণ হালদার ॥

হুগলী*—বাঙ্গলার প্রথম রেলস্টেশন হইলেও একদিকে চুঁচুড়া আর এক দিকে ব্যাণ্ডেল সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। ইহার ন্যায় ধনী ও বিলাসী ব্যক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে খুব অল্পই ছিল। তাঁহার ভবনে প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব হইত। তদুপলক্ষে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকীগণ উপস্থিত হইয়া অতিথি-বৃন্দকে নৃত্যগীতে পরিতৃপ্ত করিত। পূজোপলক্ষে দশ-পনের দিন ধরিয়া তিনি সমাগত অগণিত ব্যক্তিকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিতেন। এইরূপ সমারোহের সহিত দুর্গা-পূজা হুগলী জেলায় আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। প্রতি বৎসর পূজায় তাঁহার লক্ষাধিক টাকার উপর ব্যয় হইত। তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া পূজায় সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ করিতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে নাচের ও তাঁহার ভবনে দশ দিন আহার ও বাস-স্থানের সুব্যবস্থা করিয়া যে বিজ্ঞাপন তিনি "কলিকাতা গেজেটে" দিয়াছিলেন, তাহা ২০শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেট হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

*রেলপথ প্রসঙ্গে ৩২৪ পৃষ্ঠায় হাওড়া হইতে হুগলী মুদ্রাকর প্রমাদ বশত ২৪ মাইলের স্থলে ৪০ মাইল ছাপা হইয়াছে।

GRAND NAUCHES
Doorga Pooja Holidays
BABOO PRANKISSEN HOLDAR
of Chinsurah

Begs to inform the Ladies and Gentlemen, and the Public in General, that he has commenced giving a Grand Nauch this day, that it will continue till the 29th inst. Those Ladies and Gentlemen who have received Invitation Cards, are respectfully solicited to favour him with their Company on the days mentioned above: and those to whom the Invitation Tickets have not been sent (strangers to the Baboo), are also respectfully solicited to favour him with their Company.

Baboo Pran Kissen Holdar further begs to say, that every attention and respect will be paid to the Ladies and Gentlemen who will favour him with their Company, and that he will be happy to furnish them with Tiffin, Dinner, Wines, &c.. during their stay there.

Chinsurah, September 14, 1827. PRANKISSEN HOLDAR.

দুঃখের বিষয় বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য তাঁহার সর্বনাশ ঘনাইয়া আসে। কথিত আছে মাটির নীচে গুপ্তগৃহ নির্মাণ করিয়া তিনি সেখানে নোট জাল করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ধরা পড়িয়া সাত বৎসরের জন্য তিনি দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার বিচার হয়। তাঁহার বিচারের সংবাদ ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির রায় ৯ মার্চ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। বিচারপতি তাঁহার দীর্ঘ রায়ের একস্থানে বলেন যে, ৬০ লক্ষ টাকা তিনি জালিয়াতির দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের পক্ষ হইতে "ব্রাহ্মণ ও ধনী ব্যক্তি" বলিয়া তাঁহার শাস্তি যাহাতে কম হয় সেই জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু বিচারপতি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই বরং তিনি বলিয়াছিলেন যতদিন ইংরাজী আইন থাকিবে, ততদিন এক দোষে ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি কম সাজা পাইবেন, তাহা কখনই হইতে পারে না।

Brahmins should suffer a less severe punishment than any other person for an offence, for such a principle has never been recognised nor ever will be recognised so long the English Law exists.

"কলিকাতা গেজেটে" সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়ে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ তারিখে প্রাণকৃষ্ণ হালদার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উল্লিখিত হইলঃ

Judgment was pronounced on Monday, in the case of Praun Kissen Holdar for forgery, when he was sentenced to be transported for seven years to Prince of Wales Island. This unfortunate man

once moved in a superior sphere of life, and was, at one time, understood to be a person of great wealth, and of an expensive turn, as the splendid nautches, which he was in the habit of giving sufficiently testified. Whether these extravagant entertainments trenched so far upon his means, as to produce calls that could not well be liquidated, and tempted him to have recourse to forgery, to enable him to meet the demands made upon him, we cannot say ; but the case is certainly a melancholy one, and to some will, we hope, prove warningly instructive.

প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দ্বীপান্তর বাসকালে তাঁহার কলিকাতা ও চুঁচুড়ার যাবতীয় সম্পত্তি নিলামে ম্যাকেঞ্জি লায়াল এন্ড কোম্পানী কর্তৃক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই তারিখে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। চুঁচুড়ার বাড়ি তিনি প্রাণকৃষ্ণ শীলের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৩৭ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলেন। উক্ত বাড়ি প্রাণকৃষ্ণ শীল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বম্ভর* শীলের নামে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র সাড়ে ষোল হাজার টাকায় ক্রয় করেন। সেই ভবন পরে তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ হাজার টাকায় হুগলী কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিক্রয় করেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুলাই "কলিকাতা গেজেটে" নিলামের বিজ্ঞাপনটি এইরূপঃ

BABOO
PRAWNKISSEN HOLDAR'S
EXTENSIVE AND VALUABLE
LANDED PROPERTY
FOR ABSOLUTE AND UNRESERVED SALE
AT THE EXCHANGE

MACKENZIE, LYALL AND CO.

BEG to announce to the Public, that they will submit for Sale, by Public Auction, at the Exchange Rooms, on FRIDAY, next, the 31st JULY, 1829, the following extensive and valuable LANDED PROPERTY ; belonging to Baboo Prawnkissen Holdar, absolutely to the highest bidders, without limit or reserve :

প্রাণকৃষ্ণ হালদারের পনেরটি সম্পত্তি ৩১ জুলাই তারিখে নিলাম হয়। ইহার মধ্যে আটটি সম্পত্তি কলিকাতায়, ছয়টি চুঁচুড়ায় ও একটি চন্দননগরের মধ্যে ছিল। কলিকাতার সম্পত্তির মধ্যে প্রথম ছিল এক বিঘা চোদ্দ কাঠা দশ ছটাক জমির উপর হেয়ার স্ট্রীটের ত্রিতল বাড়ি। ফার্গুসান এন্ড কোম্পানী এই ভবনের জন্য মাসিক ৪৫০্ টাকা ভাড়া দিতেন।

কলিকাতার সম্পত্তির দ্বিতীয় লটে ছিল ৯নং রাসেল স্ট্রীটে আট বিঘা পনের কাঠা জমির উপর বাড়ি। মিঃ বার্ড মাসিক ৩০০্ টাকায় এই বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। তিন নম্বর লটে ছিল পার্কস্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে তিন বিঘা জমির উপর দুইটি বাড়ি।

* বিশ্বম্ভর নামটি ৩৫৬ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে ব্রজেন্দ্রকুমার বলিয়া ছাপা হইয়াছে।

বড় বাড়ির ভাড়া ছিল ৩৫০৲ টাকা ও ছোট বাড়ির ভাড়া ছিল ১০০৲ টাকা। চার নম্বর লটে জোড়াসাঁকো চাঁপধোবা পাড়ায় বার কাঠা জমির উপর বাড়ি। পাঁচ ও ছয় নম্বর লটে চার কাঠা চার ছটাক জমির উপর সুতানটিতে দ্বিতল বাড়ি। সাত নম্বর লটে খিদিরপুর মনসাতলায় দুই বিঘা সাত কাঠা জমি। আট নম্বর লটে বেনিয়াপুকুরে এগার বিঘা বাগান।

চুঁচুড়ায় সতের বিঘা জমির উপর তাঁহার ভবন নয় নম্বর লটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া চুঁচুড়ায় দশ নম্বর লটে আট বিঘা দশ কাঠা জমির উপর একটি বাড়ি, এগার নম্বর লটে ছয় বিঘা দশ কাঠার উপর বাড়ি, বার ও তের নম্বর লটে চুঁচুড়া চৌমাথার নিকট দুইটি বাড়ি এবং চোদ্দ নম্বর লটে চুঁচুড়ায় মিরের (Merare) নামক স্থানে বাড়ি ছিল।

চন্দননগরের একটি বিরাট বাগানবাড়ি পনের নম্বর লটের মধ্যে ছিল। কলিকাতা গেজেটে সমস্ত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ও চৌহদ্দি লিখিত আছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ মার্চ তারিখে টুলো এন্ড কোম্পানী প্রাণকৃষ্ণের হুগলী ও ২৪ পরগণায় অবস্থিত আরো আটটি তালুক নিলামে বিক্রয় করে। এই নিলামের বিজ্ঞাপন উক্ত বৎসরের ৮ মার্চ তারিখের 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত হয়। হুগলী জেলার তালুকগুলির বিবরণ এইরূপঃ

লট নং ১—তালুক তুরুফ জগদীশপুর; ইহার মধ্যে ১০৬টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

লট নং ২—তালুক বাহাদুরপুর ও নরোত্তমবাটী; ইহার মধ্যে ৪০টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

লট নং ৩—তালুক মহম্মদপুর; ইহার মধ্যে ২১টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

লট নং ৪—তালুক হারিট; ইহার মধ্যে ৪টি গ্রাম অথবা মৌজা আছে।

প্রাণকৃষ্ণের বিলাসিতার কথা লোকস্মৃতিতে প্রবাহিত হইতে হইতে শেষে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়। সুশীলকুমার দে বাংলা প্রবাদে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদটি এইঃ

ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার॥

প্রাণকৃষ্ণের পুত্রের নাম নবীনচন্দ্র হালদার। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন। দ্বীপান্তর সাধারণতঃ চৌদ্দ বৎসর হইত বলিয়া ৩৫৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার কারাবাস চৌদ্দ বৎসর লিখিত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সাত বৎসরের জন্য দণ্ডিত হন। তাঁহার ভবন সম্বন্ধে হুগলীর রেভিনিউ কমিশনারকে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে লোক্যাল এজেণ্ট কর্তৃক লিখিত একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, যখন কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রাণকৃষ্ণের বাড়ী শীল বংশের নিকট হইতে ক্রয় করিতে উদ্যোগী হন, তখন প্রাণকৃষ্ণের পুত্র নবীনচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত শীল বংশের যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তিনানুযায়ী এবং প্রাণকৃষ্ণের কারাবাসের জন্য অনুপস্থিতিতে উক্ত বাড়ী ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নিলাম করানো একরারনামা অনুসারে সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া তিনি আপত্তি করেন। বলাবাহুল্য তাঁহার আপত্তি টিকে নাই। রেভিনিউ কমিশনারকে লিখিত পত্র এইরূপঃ

"Prankissen Seal, however, it would appear, instead of acting upon this agreement and exacting a deed of mortgage from Prankissen Halder sued him in the year 1834 upon the simple bond, obtained a judgement in his favour and had the two houses in Chinsurah put up at the Sheriff's sale in satisfaction of the debt."

কমিশনারকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্র দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ শীলের নিলাম করান ঠিক হয় নাই বলিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াইজ সিদ্ধান্ত করেন যে দলিলে বিক্রেতা হিসাবে শীলদের সহিত হালদারদেরও সহি না করাইলে সরকার নিবুঢ়সত্ত্বে ইহা ক্রয় করিতে পারে না। সেই জন্য ডাঃ ওয়াইজ হালদার মহাশয়দের দলিলে সহি করিবার জন্য মত করান ও তজ্জন্য তাঁহারা বাড়ির জন্য দুই হাজার টাকা মূল্য পান। এই সম্বন্ধে হুগলী কলেজের ইতিহাসে লিখিত বিবরণ উদ্ধারযোগ্যঃ

To make the title safe, an attempt was made to induce the Haldars to join in the conveyance ; and, at length, early in 1839 Dr. Wise drew a bill for Co. Rs. 23,333-5-4 of which Rs. 21,333-5-4 (Sicca Rs. 20,000) were to go to Seals, and Rs. 2,000 to the Haldars.

॥ হুগলী আদালত ॥

প্রাচীনকালে মুসলমান আইন-কানুন অনুসারে কাজীগণ যাবতীয় বিচারাদি করিতেন। পরবর্তীকালে ফৌজদারগণ বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন কিন্তু প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের বিচার নাজিমের দ্বারা সাধিত হইত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগেও এই নিয়মে কার্য হইত কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস এই প্রথা বদলাইয়া দেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী বিচারের ভার অমিলদের হাতে দেওয়া হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজ বিচারকের হাতে জেলার ভার দেওয়া হয় এবং ফৌজদার পদ উঠিয়া যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুন্সেফ পদ সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাদিগকে বেতনের পরিবর্তে তখন কমিশন দেওয়া হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কমিশন দেওয়া রহিত করিয়া মাসিক একশত টাকা হইতে দেড়শত টাকা পর্যন্ত বেতন নির্দিষ্ট করা হয়। মুন্সেফদের বেতন কম থাকায় তাঁহারা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিতেন। সেইজন্য পরে তাঁহাদের বেতন দুইশত হইতে চারশত টাকা বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী, নওসরাই, মহানাদ, বৈদ্যবাটী, রাজপুর, দ্যরহাট্টা, ক্ষীরপাই, বালী ও উলুবেড়িয়া এই নয় জায়গায় মুন্সেফী আদালত ছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবে বাংলা মাসের প্রচলন ছিল। কিন্তু আদালতসমূহে পারস্য ভাষা চলিত। হুগলী ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে পারস্যভাষা সম্পূর্ণ রহিত হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলিত হয়। এই সময় রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবে ইংরাজী মাসের প্রচলন হয়। ডেপুটি-ক্যালেক্টার নিযুক্ত করিবার জন্য ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ প্রার্থীগণের আবেদন সকলের আগে মঞ্জুর হইত। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি না পাওয়ায় হুগলী কলেজের অধ্যক্ষকে ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রগণকে ডেপুটি-ক্যালেক্টার কিম্বা ইংরাজী বিভাগের অন্যান্য কার্যের জন্য মনোনীত করিয়া পাঠাইতে লেখা হইত। আবগারী কমিশনার মিঃ ডোনলে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ছাত্রদের ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতার কথায় লিখিয়াছেনঃ

Native lads are much better acquainted with English than their own language.

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হইতে প্রেরিত হরচন্দ্র ঘোষ (আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) মথুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণীধর রায় (সেরেস্তাদার), যাদবচন্দ্র বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেস্কার নিযুক্ত হন।

॥ জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা ॥

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ একটি বড় মোকদ্দমা হুগলী আদালতে হইয়াছিল এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর মেদিনীপুরের রাজা রুদ্রনারায়ণের এই প্রকারের আর একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল।* এই মোকদ্দমাটি হুগলী জেলার নহে বলিয়া উহার বিবরণ দিলাম না। তখনকার দিনে প্রত্যেক লোকমুখে প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমার কথা হইত—তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইত। প্রায় শতকরা ৯৯ জন লোক প্রতাপের পক্ষে কথা বলিতেন। এই মোকদ্দমায় বড় বড় সাহেব, রাজা, জমিদার, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ সাক্ষী ছিলেন। এরূপ চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমা কেবল হুগলী জেলায় নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আর হয় নাই।

প্রতাপচাঁদ বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র—নানকী মহারাণীর একমাত্র পুত্র। মহারাণী প্রতাপের শৈশবেই দেহত্যাগ করেন। প্রতাপের কতকগুলি দোষও ছিল—গুণের ভাগ অধিক ছিল। প্রতাপ কোন একটা মহাপাতক করিয়াছিলেন, সেই জন্য পণ্ডিতরা ব্যবস্থা দেন যে, ১৪ বৎসর অজ্ঞাতবাসই প্রায়শ্চিত্ত। প্রতাপ এই প্রায়শ্চিত্ত মানিয়া লইলেন। প্রতাপ বাড়ী হইতে পলাইলেন। কিন্তু মহারাজ তেজচন্দ্র তাঁহার সন্ধান পাইয়া রাজমহল হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। এইখানেই বলিয়া রাখি, প্রতাপ একজন হঠযোগী ছিলেন। তিনি অসুখের ভাণ করিতে পারিতেন, এমন কি, মৃত্যুর ভাণও করিতে পারিতেন। ডাক্তার-কবিরাজ কিছুতেই উহা ভাণ কি সত্য ধরিতে পারিতেন না।

এক দিন স্নানান্তে প্রতাপ জ্বরের ভাণ করিলেন। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তার-কবিরাজ আসিলেন, কেহই কিছু করিতে পারিলেন না—শেষ কালনায় গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইল। মহারাজ সঙ্গে যান নাই। গঙ্গার ঘাট কানটে ঘেরা হইল। রাত্রিতে মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র হইল। প্রতাপ কিন্তু পলাইলেন। প্রতাপের পলায়নের পর মহারাজ প্রায়ই বলিতেন—"প্রতাপ আবার আসিবে।" লোকে বলিত, মহারাজ শোকার্ত হইয়াই ঐ কথা বলিতেছেন। প্রতাপ তখন পূর্ণযুবা।

১৪ বৎসর অতীত হইলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একজন সন্ন্যাসী বর্ধমানে প্রবেশ করিলেন। এইখানে গোপীনাথ ময়রা প্রথম তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। চারিদিকে কথা ছড়াইয়া পড়িল। মহারাজা ইহার ৭।৮ বৎসর পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজার শ্যালক

* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ" গ্রন্থে প্রতাপচাঁদের এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" রাজা রুদ্রনারায়ণের মামলার বিবরণ আছে।

(এবং শ্বশুরও বটে, কারণ, শ্যালক-কন্যাকে তিনি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করেন) পরাণবাবু (পুরাতন সংবাদপত্রে প্রাণবাবু উল্লেখ আছে) ল'ঠীয়াল লাগাইয়া সন্ন্যাসীকে দামোদর নদ পার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মহারাজার মৃত্যুর পূর্বে মহারাজ তেজচন্দ্র পরাণবাবুর নাবালক পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাণবাবুই তাঁহার অভিভাবকরূপে কার্য চালাইতেছিলেন।

প্রতাপ বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট চলিয়া গেলেন—তিনি প্রতাপকে চিনিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিলেন। সেখানে ৩ মাস রহিলেন। রাজা পরামর্শ দিলেন, বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হুকুম লইয়া বর্ধমানে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রতাপ সন্ন্যাসিবেশেই বাঁকুড়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ডাকবাংলোর কাছে একটি তেঁতুলতলায় সাহেবের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এই সময় বাঁকুড়ায় জংগলী লোকের একটি বিদ্রোহ হয়। সেজন্য ফৌজও আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, বর্ধমান-রাজকুমার প্রতাপ দেশে ফিরিয়াছেন—রাজা ক্ষেত্রনাথ সিংহ তাঁহাকে চিনিয়াছেন। সুতরাং চারিদিক হইতে ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য জনতা হইতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়েট বলিলেন, ঐ ফকিরই 'আলেক সা' বিদ্রোহীর নেতা। ফৌজের কর্তা লিটিল সাহেব যুদ্ধে আসিলেন। সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারের দরকার হইল না। প্রতাপকে জেলে দেওয়া হইল। লিটিল সাহেবের বীরত্ব সংবাদপত্রে ঘোষিত হইল। এই ঘটনা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হয়। প্রতাপের দুর্ভাগ্যের এটি তৃতীয় পর্ব—প্রথম পর্ব সন্ন্যাসী হওয়া; দ্বিতীয় পর্ব বর্ধমান হইতে তাড়িত হওয়া।

কয়েকমাস জেলে থাকিয়া মুক্তিলাভ করিয়া প্রতাপ কলিকাতায় গেলেন। সেখানে বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, নৌকাযোগে কোন আড়ম্বর না করিয়া প্রতাপ বর্ধমান যাইবেন। এই সময় ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ ডেপুটি গভর্ণর আলেকজাণ্ডার রস্ সাহেবকে এক দরখাস্ত করেন যে, বর্ধমান যাইলে যেন তাঁহাকে উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া হয়, যাহাতে তাঁহার কোন বিপদ বা প্রাণহানি না হয়। কিন্তু ৫ই মার্চ গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ ফ্রেড্রিক হ্যালিডে (পরে ছোটলাট হইয়াছিলেন) ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। তবুও প্রতাপ ভগ্নমনোরথ না হইয়া বর্ধমান যাত্রা করিলেন। আড়ম্বর খুব কমই হইল। তবুও ৪০।৫০ খানি নৌকা এবং ২।৩ খানি বজরা লইয়া তিনি প্রথম কালনায় (১৩।৪।১৮৩৯) তারিখে পৌঁছিলেন। তাঁহার উকিল 'শ' সাহেব ও সিঙ্গুরের নবাববাবু (শ্রীনাথবাবু) স্থলপথে যাত্রা করিলেন। ইহা ২রা বৈশাখের ঘটনা। পরাণবাবুও ঐ সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি প্যারীলাল নামে জনৈক ক্ষত্রিয়কে কালনায় পাঠাইলেন। তাহার বন্দোবস্তে, প্রতাপ যখন কালনায় পৌঁছিলেন (৮ই বৈশাখ), তখন প্রতাপের লোকজনকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হইল না। প্যারীলাল পুলিসকে হাত করিলেন এবং একজন দেশী খৃষ্টানকে হাত করিলেন। প্রতাপ যখন কালনায় অবতরণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন, তখন দারোগা মহিবুল্লা লোকজন লইয়া চলিলেন, হটো হটো শব্দে দিগন্ত কাঁপাইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট, পাদরী আলেকজাণ্ডার সাহেবকে ঐ বিষয় জানিবার জন্য পত্র দিলেন এবং একটু নজর রাখিতে অনুরোধ করিলেন। পাদরী সাহেব তাঁহার

জনৈক খৃষ্টানকে ঐ বিষয়ের তদন্ত করিতে বলিলেন। ঐ খৃষ্টান (যাহাকে প্যারীলাল হস্তগত করিয়াছিল) যাহা বলিল, পাদরী সাহেব তাহাই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইলেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন, প্রতাপ উন্মুক্ত অসি হস্তে এক শত অস্ত্রধারী, তাহার দ্বিগুণ লাঠীয়াল ও প্রায় ৪।৫ হাজার লোক লইয়া আইন-বিরুদ্ধ জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কর্মঠ দারোগা মহিবুল্লা উহাদিগকে বাধা দিয়াছে! এই সময় উকিল 'শ' সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতাপ সম্বন্ধে জানাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রতাপকে ও শ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হইল। শুধু তাহাই নহে, প্রায় ৩।৪ শত অধিবাসীকেও ধরা হইল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণও বাদ পড়ে নাই। সকলেরই চালান হইল হুগলীতে। শ সাহেব, সাহেব বলিয়া অতি কষ্টে রেহাই পাইলেন। খবরের কাগজে উঠিল, কালনায় একটা মস্ত বিদ্রোহ হইয়াছিল—বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্যামুয়েল সাহেব হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট—কিছুদিন পূর্বে বর্ধমানে ছিলেন। পরাণ-বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। প্রতাপ যখন প্রথম বর্ধমানে গিয়াছিলেন, স্যামুয়েল সাহেব তখন বর্ধমানে ছিলেন। পরাণবাবু তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, প্রতাপ একজন জুয়াচোর। এখন প্রতাপকে হাতে পাইলেন। ইতিপূর্বে গোয়াড়ির শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল নামে একজন জুয়াচোর ৪।৫ বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। এখন সেই ব্যক্তিই জালরাজা সাজিয়াছে, অতএব সনাক্তের জন্য নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হালকোট সাহেবকে পত্র দিলেন। হালকোট সাহেব লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণলাল বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিল না। সুতরাং পুনরায় চিঠি গেল। এবার সরকারী কর্মচারী-দিগকে পাঠান হইল। এই সময় কলিকাতার দ্বারিকানাথ ঠাকুরকে স্যামুয়েল সাহেব এক পত্র দিলেন। তখনকার দিনে সাক্ষীর জবানবন্দী কাহাকেও শুনান হইত না। অনেক সময় আসামীর অনুপস্থিতে সাক্ষী লওয়া হইত। জালরাজার বিরুদ্ধের সাক্ষীদের জবান-বন্দী 'সমাচার দর্পণে' ছাপা হইত এবং গ্রামে গ্রামে পাঠান হইত; কিন্তু জালরাজার স্বপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী কোথাও পাঠান হইত না।

স্যামুয়েল সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর জালরাজার মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। জালরাজাকে বলিলেন, "তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেই জন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।" রাজা অবাক। ইহার কিছুদিন পূর্বে কালনায় তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া অন্যায় জনতার সৃষ্টি করা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইল আর এখন জালরাজা! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, অপরাধ গুরুতর,—জামিন দেওয়া হইবে না—চারি মাস হাজতে কাটিল। আরও আশ্চর্য এই যে, প্রতাপের নাম ব্যবহার করায় যাহাদের ক্ষতি হইবে, তাহারা কেহ নালিশ করিল না, পরাণ-বাবু নালিশ করিলেন না, তবে গবর্ণমেণ্টের এত কি গরজ, এই কথা লোকে বলিতে লাগিল।

তিন বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। ১ম জালরাজার সনাক্ত সম্বন্ধে, ২য় প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে, ৩য় জালরাজা গোয়াড়ির কৃষ্ণলাল কি না এই তিন চার্জ দিয়া দায়রা-সোপরর্দ করা হইল। প্রতাপের সঙ্গে আরও কয়েক জনকে আসামী করিয়া গ্রেপ্তার করা

হইল, যথা—রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল (প্রতাপের মোক্তার), হাফেজ ফতেউল্লা, সাগরচন্দ্র ধর, কালী-প্রসাদ সিং, জুমন খাঁ ও রাজা নরহরিচন্দ্র। গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৬ মাস পূর্বে বিগনেল সাহেবকে ৫০০্ টাকা বেতনে ডেপুটী লিগাল রিমেমব্রেনসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। মটন সাহেব ও শ সাহেব আসামীর পক্ষে ছিলেন। মটন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্ত করিলেন যে, তিনি আসামীর পক্ষে থাকিবেন, তাহাতে তাঁহার আপত্তি আছে কি না? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিগনেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিগনেল সাহেব বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন আপত্তি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মটনের দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। আদালতে চিনার (একজন ফরাসী চিত্রকর প্রতাপের চেহারা অংকিত করিয়াছিল) অংকিত প্রতাপের ছবি আনা হইল।

প্রথমে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের লোকদের সাক্ষী পাঠাইলেন। সেক্রেটারী প্রিন্সেপ, দেওয়ানীর জজ হাচিসন, বোর্ডের মেম্বার প্যাটেল ঐরাবতী জাহাজে চড়িয়া হুগলী আসিলেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুর নিজের ষ্টীমারে হুগলী আসিলেন।

সনাক্তঃ—গবর্ণমেণ্ট সাক্ষী দি, টি, ট্রাওয়ার বলিলেন, অপর ঘরে যে ছবি আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে; কিন্তু এ আসামী প্রতাপ নহে। প্রতাপের চক্ষু কটা ছিল, এই ব্যক্তির চক্ষু লাল।...কিন্তু ডাক্তার হ্যালিডে (তখন তিনি কাশীতে ছিলেন) বলিয়াছিলেন, এই আসামীই প্রতাপচাঁদ। দায়রায় বলিলেন, এই আসামী কখনই প্রতাপ নহে।

প্রিন্সেপ সাহেব (গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী) বলিলেন, প্রতাপ বেঁটে ছিলেন, এ লোকটা লম্বা। দায়রায় বলিলেন যে, জেনারেল আলার্ড (রণজিৎ সিংহের সেনাপতি) ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় এক দিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সংগে অনেক দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আসামী তখন ফকিরের বেশে বেড়াইতেন।

প্যাটেল সাহেব (James Patel) বোর্ডের মেম্বর বলিলেন, "এই ছবির সহিত আসামীর কোন সাদৃশ্য নাই।"

বিচার সাহেব (John Beacher) বলিলেন, "মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একইরূপ লম্বা। দায়রায় এই সাক্ষীকে সাক্ষী দেওয়া হয় নাই।

ওভারবিক (Overbeck) সাহেব ওলন্দাজ-গভর্ণর প্রতাপের ছবি দেখিয়া বলিলেন, "এখন আমি আসামীকে চিনিলাম,—ইনি আমার পূর্বপরিচিত ছোট রাজা...তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর বামভাগে মেহগিন রঙের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল। তিনি ঊর্ধে চাহিলে সেটি দেখা যাইত। এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে।......

দ্বারিকানাথ ঠাকুর বলিলেন, "প্রতাপচাঁদের সহিত আমার বড় বন্ধুত্ব ছিল...প্রতাপের ছবি আদালতে দেখিলাম, তাহার সংগে এই আসামীর সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না, এই আসামী প্রতাপচাঁদ কি না, তবে আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।

রাজা বৈদ্যনাথ বলিলেন, ইহাকে প্রতাপ মনে করিয়াছি, টাকা কর্জ দিয়াছি। ডাঃ হ্যালিডে জেনারল আলার্ড এইরূপই বলিয়াছিলেন—এই সেই প্রতাপচাঁদ।

গোপীমোহন দেব বলিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।" পরাণবাবুর সকল সাক্ষীই বলিল—এ প্রতাপচাঁদ নহে।

সনাক্ত সম্বন্ধে আসামী প্রতাপচাঁদের সাক্ষীঃ ডাক্তার স্কট (মাদ্রাজ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রী) বলিলেন, "আমি ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানে ছিলাম।......... প্রতাপের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছি, এই সেই প্রতাপচাঁদ।

মিঃ জন, রিডলি, বিবি হ্যারিয়েট, সফিয়াক্রেন, ফ্রানস্য়া স্লিমান (ফরাসী), হাজী আবু তালেক, আমীর উদ্দীন, আগা আব্বাস, ডেভিড হেয়ার, রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ মোকদ্দমা যখন চলিতেছিল, তখন "হরকরা" কাগজে এই বিষয়ে অনেক কথা বাহির হয়।

পরাণবাবুর সাক্ষীদের কথায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিশ্বাস করিয়া বলিলেনঃ

The proof here is of the strongest description of the witnesses.

পরাণবাবুর লোকরা প্রতাপের মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত বলিয়া ছিল, কিন্তু তাহার বারো বৎসর পরে মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যুর খবর বলিতে পারে নাই। প্রতাপ যে মৃত্যুর ভাণ করিতে পারিতেন তাহা অনেক বড় বড় ডাক্তার বলিয়াছিলেন। প্রতাপ বলিলেন, তিনি মৃত্যুর ভাণ করিয়া পলাইয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহা বিশ্বাস করিলেন না। এই মোকদ্দমা যখন চলিতেছিল, তখন "হরকরা" কাগজে মামলা সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হয়।

নিজামত আদালতে প্রতাপ জামিন দিয়া খালাস চাহিলেন, সে হুকুমও হইল, কিন্তু কার্টিস সাহেব নিজামতের হুকুম শুনিলেন না। যাহারা জাল রাজার সঙ্গে জেলে গিয়াছিল, তাহাদের ৭ মাস পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

মোকদ্দমার রায়ঃ—এই সময় হুগলীর জজ সাহেব জাল রাজার সম্বন্ধে যে এস্তে-মেজাজ করিয়াছিলেন, তাহা নিজামত আদালতে পেষ করা হইল। জজরা বড় বিপদে পড়িলেন; ভাবিলেন, আসামীকে কি করিয়া সাজা দেওয়া যায়? শেষে কাজী সাহেব রক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আত্ম-উপকারের নিমিত্ত যদি কেহ অন্যের নাম ব্যবহার করে, তাহা হইলে মহম্মদী ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি অপরাধী। জজরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন—হুকুম দিলেন যে, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করার নিমিত্ত আসামী আলেকশা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা গেল এবং অনাদায়ে ছয় মাস কারাবাস হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য চার্জ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল। এই রায়ের উপর প্রতাপ দরখাস্ত করিলেন, নিজামত আদালত উহা অগ্রাহ্য করিলেন। নিজামত আদালত হুকুম দিলেন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যাইবে না। দরখাস্তকারী ভবিষ্যতে প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে তাহা আর গ্রহণ করা হইবে না। কেন না, বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ নহে। এই হুকুমই প্রতাপের সর্বনাশের মূল। প্রতাপের সকল পথ বন্ধ হইল। প্রতাপ যে ফকির, সেই ফকিরই হইলেন। প্রতাপের মোকদ্দমা শেষ হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর।

শেষ যবনিকাঃ—প্রতাপ কিছুদিন কলিকাতার চাঁপাতলায় ছিলেন। তাহার পর কলু-টোলার গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে ২।৩ মাস ছিলেন। গোবিন্দ প্রতাপের জন্য সর্বস্ব

ব্যয় করিয়াছিলেন। পরে কিছুদিন শ্যামপুকুরে ছিলেন। ঐ সময় লাহোরে লড়াই বাধে। গভর্ণমেণ্ট প্রতাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। তিনি অগত্যা ফরাসী চন্দন-নগরের বোড়াই চণ্ডীতলায় আসিয়া বাস করিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীরামপুরে আসেন। তখন শ্রীরামপুর দিনেমারদের অধিকারে। এখানে ৬।৭ বৎসর ছিলেন। এই সময় তিনি ঠাকুর সাজিয়া সমস্ত দিন ঝারায় বসিয়া থাকিতেন। বেশ্যারা পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় আরাত্রিক করিত। প্রতাপ বিশিষ্ট বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ ও রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ফরাসী ও রুশ রাজনীতি সকলকে বুঝাইতেন। বেদান্ত লইয়া পণ্ডিতদিগের সহিত আলোচনা ও মীমাংসা করিতেন। লোকের ধারণা হইয়াছিল, তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। এই সময় তাঁহার অনেক মন্ত্র-শিষ্যও হইয়াছিল। তিনিই বর্তমান "ঘোষপাড়ার দলের" সৃষ্টি-কর্তা। মৃত্যুর আট মাস পূর্বে বরাহনগরে আসিয়া বাস করেন। ১৮৫২ কিম্বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ময়রাডাঙ্গার পল্লীতে দুই তিনটি লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার প্রাক্তন কর্মফল শেষ হয়। তাঁহার শবযাত্রার সময় চোখের জল ফেলিবার কেহ ছিল না। তাই বলি, হে পুরুষকার, তুমি কিছুই নহ। তোমার আশ্রয় করিয়া মানুষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া থাকে, শেষ মনস্তাপ ভোগ করিয়া ইহলীলা সম্বরণ করে! তাই বলি "বিধিরহো বলবান্ ইতি মে মতিঃ!"

॥ পুরাতন সংবাদপত্রে প্রতাপের কথা ॥

"জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত এক পত্রে লেখে যে শ্রীযুত জেনারেল আলার্ড সাহেব* হুগলীর কারাগারে যাইয়া রাজা যিনি কারাগারে বন্ধ আছেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিলেন; অনুমান তিন ঘণ্টা বেলার সময়ে শ্রীযুত সৈন্যাধিপতি তত্রস্থ কয়েক জন সাহেবের সমভি-ব্যাহারে কারাগারে প্রবেশ করিবাতে রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া সমাদর পূর্বক চৌকিতে বসাইলেন, পরে অনেক কথোপথন হইল, তাহাতে শ্রীযুত কহিলেন যে, তোমার দুর্ভাগ্য দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং সাধ্যমত যদি কোন সাহায্য করিতে পারি, তবে করিব। অনন্তর বেলা ৪॥০টার সময়ে শ্রীযুত প্রস্থান করিলেন। ১১২১ সংখ্যা কলম ১৯, ৭ই জানুয়ারী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ "সমাচার দর্পণ" হইতে উদ্ধৃত।

"জেনারেল আলার্ড ও বর্ধমানের রাজা"

"শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ-সম্পাদক মহাশয়েষু"

"শ্রীযুত জেনারেল আলার্ড সাহেব যে হুগলীর কারাগারে শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, আপনি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয় নাই, অতএব আমি বিশেষ করিয়া লিখিতেছি অনুগ্রহ পূর্বক জ্ঞানান্বেষণে অর্পণ করিবেন।

ঐ শ্রীযুত জেনরল সাহেব কলিকাতাতে আসিয়া প্রথমে শ্রীযুত মহারাজের উকীলের বাসাতে লোক প্রেরণ করেন, তাহাতে উকিলবাবু শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল সাহেবের ঘরে গিয়া সাক্ষাৎ করিবাতে সাহেব রাজার সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, তুমি সন্ন্যাসীর

* পাঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রধান সেনাপতি। ইনি ফরাসী ছিলেন।

নিকট গিয়া আমার সংবাদ জ্ঞাপন কর এবং তিনি যদি পত্র লেখেন তবে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব। পরে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল ৬ই পৌষ হুগলীতে গিয়া শ্রীযুত মহারাজকে সংবাদ কহিবাতে শ্রীযুত মহারাজ তৎক্ষণাৎ সাহেবকে পত্র লেখেন, তাহারই পরে সাহেব হুগলীতে গমন করেন।

শ্রীযুত জেনরল সাহেব হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ সাহেবকে সমাদর পূর্বক গ্রহণার্থ রাধাকৃষ্ণ ঘোষালকে অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন এবং শ্রীযুত সাহেব কারাগারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রাজা আপন বাসগৃহের বাহিরে আসিয়া সাহেবকে গ্রহণ করেন। প্রথম সাক্ষাতে সাহেব রাজাকে অগ্রে সেলাম করিলেন, পরে মহারাজ শ্রীযুতের হস্তধারণ পূর্বক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আলিঙ্গন পূর্বক শিষ্টাচার করত গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বসিলেন, পরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনকার এরূপ দুর্দশা কেন হইল? তাহাতে রাজা কহিলেন, 'আমার অসৌভাগ্যের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? পাঞ্জাব হইতে আসিয়া কতক লোক সহিত আপন বাটীতে যাইতেছিলাম, এই অপরাধে বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সঙ্গী লোকদিগের সহিত আমাকে কয়েদ করেন এবং সেইখানে ছয় সাত মাস কারাভোগ করিয়া দোষী লোকের ন্যায় ধৃত হইয়া হুগলীতে আসিয়াছিলাম, তাহাতে ভরসা ছিল, হুগলীতে আসিয়া খালাস পাইব; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত এখানেও ছয় মাসের মিয়াদে কয়েদ হইয়াছি।"

শ্রীযুত রাজার ঐ সকল কাতরোক্তি শ্রবণে শ্রীযুত জেনরল আলার্ড সাহেব যে পর্যন্ত খেদ প্রকাশ করিলেন, আমি তাহা এ স্থলে বিস্তারিত করিয়া লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি ঐ দিবস সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে যখন প্রত্যাগমন করেন, তখন শ্রীযুত রাজার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমি আপনার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব এবং শ্রীযুত মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট যে পত্রাদি লিখিত হইবে, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, আমি আরও এক দিবস আসিয়া তাহা লইয়া যাইব।" সম্পাদক মহাশয়, ঐ দিবস শ্রীযুত জেনরল কারাগারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বাবধি কারাগারের চতুর্দিকে ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং কারাগারের বাহিরে আসিবামাত্র ঐ লোকসমূহ সাহেবকে বলিতে লাগিলেন, আমরা ভাবিয়াছিলাম, আপনি শ্রীযুত মহারাজকে খালাস করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া মহাশয় চলিলেন। অতএব আমরা নিরাশ হইয়া মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে রাজা খালাস হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন, আপনি অবশ্য তাহার চেষ্টা করেন। ...শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র এইক্ষণে বলিতেছেন, তিনি পঞ্জাবে থাকিতে শ্রীযুত শীকরাজ বর্ধমানের বৃদ্ধ মহারাজকে যুবরাজের বিষয়ে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ মহারাজ উত্তর লিখিয়া পঞ্জাব হইতে লালকবুতর আনিবার জন্য রণজিৎ সিংহের নিকট তিনজন আর্দালী পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে বধূরাণীদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরে শীকরাজা লালকবুতর শব্দের সঙ্কেতার্থ বুঝিয়া শ্রীযুত যুবরাজের বিশেষ সমাচার লিখিয়া ঐ তিন আর্দালীকে বর্ধমান পাঠাইয়া দেন এবং ঐ পত্র আসিবামাত্রই বৃদ্ধ মহারাজ বধূরাণীদিগের সহিত আপস করেন এবং বধূরাণীরাও সেই

পত্রের মর্মার্থ শুনিয়া মুশহেরা পাইয়া চুপ করিয়াছিলেন, পরে বৃদ্ধ মহারাজ ঐ পত্র কোন গোপন স্থানে রাখিয়া যান; কিন্তু লোকেরা এই সকল গোপন বিষয় জানে না। শ্রীযুত যুবরাজ কহেন, ঐ পত্র তাঁহার হস্তে আসিয়াছে, যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পক্ষে সুবিচার করেন, তবে ঐ পত্র এবং আরও অনেক দলিল গবর্ণমেণ্টকে দেখাইবেন, আর যদি তাহা না করেন, তবে ফকির ভাবেই থাকিয়া দেখিবেন।

এইক্ষণে কতিপয় পুরাতন আমলা আসিয়া যুবরাজের শরণাগত হইয়াছেন এবং বৃদ্ধ মহারাজ শীকরাজার নিকট যে তিন জন আর্দালী পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও বর্তমান আছে। অতএব যদি গবর্ণমেণ্ট সাক্ষ্যের অপেক্ষা করেন, তবে শ্রীযুত রাজার পক্ষে সাক্ষী অনেক পাইবেন এবং পূর্বে সন্দেহ ছিল, ছয় মাস কয়েদ উত্তীর্ণ হইলেও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র জামিন দিতে পারিবেন না। অতএব পুনরায় কয়েদ থাকিতে হইবেক, কিন্তু এইক্ষণে সে সন্দেহ দূর হইয়াছে, অনেক ভদ্র ভাগ্যধর লোক জামীন হইতে প্রস্তুত আছেন, আর এক মাস পরেই তাঁহার ব্যক্ত হইবেন, বিশেষতঃ শ্রীযুত জেনরল আলার্ড সাহেবের সুযোগে অনেক ইংগরেজরাও পক্ষ হইয়াছেন।" জ্ঞানান্বেষণ; (৩২) ১৪ জানুয়ারি ১৮৩৭।

ডেভিড হেয়ার বলেনঃ আমি আসামীকে নিতান্ত বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র জ্ঞান করাতে অদ্য তারিখের পূর্বে তাঁহার সংগে কখন কথা কহি নাই, আমি আসামীর নাসিকাতে একটা আশ্চর্য বিষয় দেখিলাম, তাঁহার নাসিকাতে ঘর্ম হইয়া থাকে। জেহেলখানায় অন্য কোন আসামীর এইরূপ ঘর্ম হয় না। (সমাচার দর্পণ, ১২ জানুয়ারী ১৮৩৯)

বংগদর্শনে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রকাশিত হইলে সম্পাদক বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সরকারের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। অবিচারে রাজ্য পাইতেছেন না বলিয়া যে লোকে প্রতাপচাঁদের উপর সহানুভূতি দেখাইত কেবল তাহা নহে, তখন সত্য সত্য অনেকে বিশ্বাস করিত যে প্রতাপ শ্রীগৌরাংগ অবতার রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। লোকে বলিত প্রতাপ গৌরাংগ আর মুর্শিদাবাদের নবাব নিত্যানন্দ।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদের জীবদ্দশায় কাটোয়া শ্রীখণ্ড নিবাসী অনুপচন্দ্র দত্ত **"প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসংগ সংগীত"** নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি ১৭৬৫ শকে ১৩ই অগ্রহায়ণ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত হইয়াছিল এবং ম্লেচ্ছদলন করিবার জন্য যে প্রতাপের জন্ম হইয়াছিল অথবা শ্রীহরি পুনরায় অবতার হইয়াছিলেন গ্রন্থে তাহাই সুললিত ভাষায় লিখিত আছে।

নিম্নে প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসংগ সংগীত হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত হইল ঃ

উগ্রাধিপতি শ্রীমান রণজিত রাজন।
বহু সৈন্য বেষ্টিত আছয়ে সেই জন॥
বর্ধমান রাজধানীর প্রাপ্তির বিলম্বে।
আনিবে সিংহের সৈন্য সেই অবিলম্বে॥
ম্লেচ্ছদলন হেতু সেই মহাজন।
সখা প্রিয়তম সংগে হইবে মিলন॥

॥ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ॥

ভারতের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যাণ্ডেলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (২০ এপ্রিল ১৯৬২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কার্যের উদ্বোধন করেন। ইহা নির্মাণের ব্যয় ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঋণস্বরূপ দিয়াছেন এবং চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ব্যাণ্ডেলের এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ নির্মিত হইলে ইহা কলিকাতা ও উহার সমগ্র শিল্পাঞ্চলের বিদ্যুৎ সংকটের অবসান করিতে সক্ষম হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক ইহা পরিচালিত। এখানে একটি পাওয়ার হাউস ও পঁচাত্তর হাজার কিলোওয়াটের চারটি জেনারেটিং ইউনিট হইবে।

ব্যাণ্ডেলের পর পৌর এলাকার মধ্যে **কেওটা** নামে একটি পল্লী আছে। এই স্থানে হুগলীর জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেবের একটি বাগান-বাড়ী ছিল। তিনি এই বাড়ীতে ও এখানকার 'সারকিট হাউসে' বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই ভবন নির্মিত হইয়াছিল। পূর্বে বিচারপতিগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়া তথায় বাস করিতেন এবং বিচারকার্য সমাধা করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে বিচারপতিদের নির্দিষ্ট বাড়ী থাকিত; ইহাও সেইরূপ একটি ভবন ছিল। সরকার কর্তৃক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ষোল হাজার টাকায় এই ভবন ক্রয় করা হয়। সাম্প্রতিক কালে হুগলীর অন্যতম সাধক শ্রীসীতারামদাস এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেওটার উত্তরে বাঁশবেড়িয়া পৌর এলাকার মধ্যে সাগঞ্জ বা সাহাগঞ্জ অবস্থিত। সাহাগঞ্জের বিবরণ বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

হুগলীতে মোগলটুলির গলির মধ্যে আর একটি **ইমামবাড়া** ছিল। এই ইমামবাড়া হাজি কারবালা নামক এক ধনী বণিকের দ্বারা নির্মিত হয়। পারস্যদেশে তাঁহার আদি বাড়ী ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে হাজি কারবালা হুগলীর পশ্চিমাংশে কাশীমপুর ও বাঁশবেড়িয়া এই দুইটি লখেরাজ সম্পত্তি উহার জন্য দান করেন। মল্লিক কাশীমের নাম হইতে কাশীমপুর নামটির উদ্ভব হইয়াছে। রেভারেন্ড লং সাহেব এই নাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে দিল্লীর সম্রাট পূর্বে বাংলাদেশকে 'দোজাক' অর্থাৎ নরক বলিয়া মনে করিতেন। কেহ গুরুতর অপরাধ করিলে সেই সময় তাহার শিরশ্ছেদ না করিয়া তাহাকে বাংলায় নির্বাসিত করা হইত। মল্লিক কাশীম একজন পদস্থ ওমরাহ ছিলেন, কোন গুরুতর অপরাধ করায় তাহাকে হুগলীতে পাঠান হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হুগলীর শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার নামে হুগলীতে একটি হাট আজও চলিতেছে। দান-ধ্যানের জন্য হুগলীতে তিনি খুব খ্যাতিলাভ করেন।

হুগলীতে **রাধাকৃষ্ণের** ঠাকুরবাড়ী ও শ্রীমদ্ **চতুরদাস বাবাজী** প্রতিষ্ঠিত বড় আখড়াও দ্রষ্টব্য স্থান। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে চতুরদাস বাবাজী হুগলীতে এই আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁশবেড়িয়ার দক্ষিণাংশ খামারপাড়ায় ইহার একটি শাখা আছে। **চতুরদাস বাবাজীর সমাধি** এই আখড়ায় সংরক্ষিত আছে। চুঁচুড়া মালাইটোলায় শ্রীশ্রীবলরামজীউর আখড়ায় সিদ্ধ **মাধবদাস বাবাজীর** সমাধি আছে। দুইশত বৎসর পূর্বে তিনি এই স্থানে বাস করিতেন। এই দুইটি সমাধিকে সকলে খুব ভক্তি করে।

॥ সংকেত সূত্র ॥

১ Captain Hamiltons Narrative
২ History of the Bengal Army By Malleson.
৩, ৬ Hooghly Past and Present By Shumbhoo Chunder Dey.
৪ সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু
৫, ৯ History of Hooghly College By K. Zachariah.
৭, ১৩ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সন ১৩৩৮
৮ বিশ্ববাণী, সন ১৩৩৭
১০ Calcutta Gazette 1787.
১১ শোভা সিংহের বিদ্রোহ—চারুচন্দ্র রায় (প্রবর্তক)
১২ দিগ্‌দর্শন, আগস্ট ১৮১৮
১৪ Hedges Diary, Vol III
১৫ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1807,
১৬ Statistical Account of Bengal, Vol III By W. W. Hunter.
১৭ Valentins Memoirs to Von-Den Brooke's Map.
১৮ Wilson's Early Annals of the English in Bengal.
১৯ Memoirs of the Moghul Empire By Eradut Khan.
২০ Government Orders dated 4th January 1871.
২১ Government Orders dated 2nd October 1833.
২২ Historical Sketches of Bengal.
২৩ Holwell's Interesting Historical Events.
২৪ Long's Selections.
২৫ Parker's Evidence.
২৬ বাংলার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭ Long's Records
২৮ Akbarnama Translated By H. Beveridge.
২৯ Essay on Lord Clive.
৩০ Memoirs of the life and Correspondence of John Lord Teignmouth.
৩১ হুগলী ও মহারাজ নন্দকুমার—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী
৩২ জাল প্রতাপচাঁদের মোকদ্দমা—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী)

চুঁচুড়া থানার সার্ভে-ম্যাপ
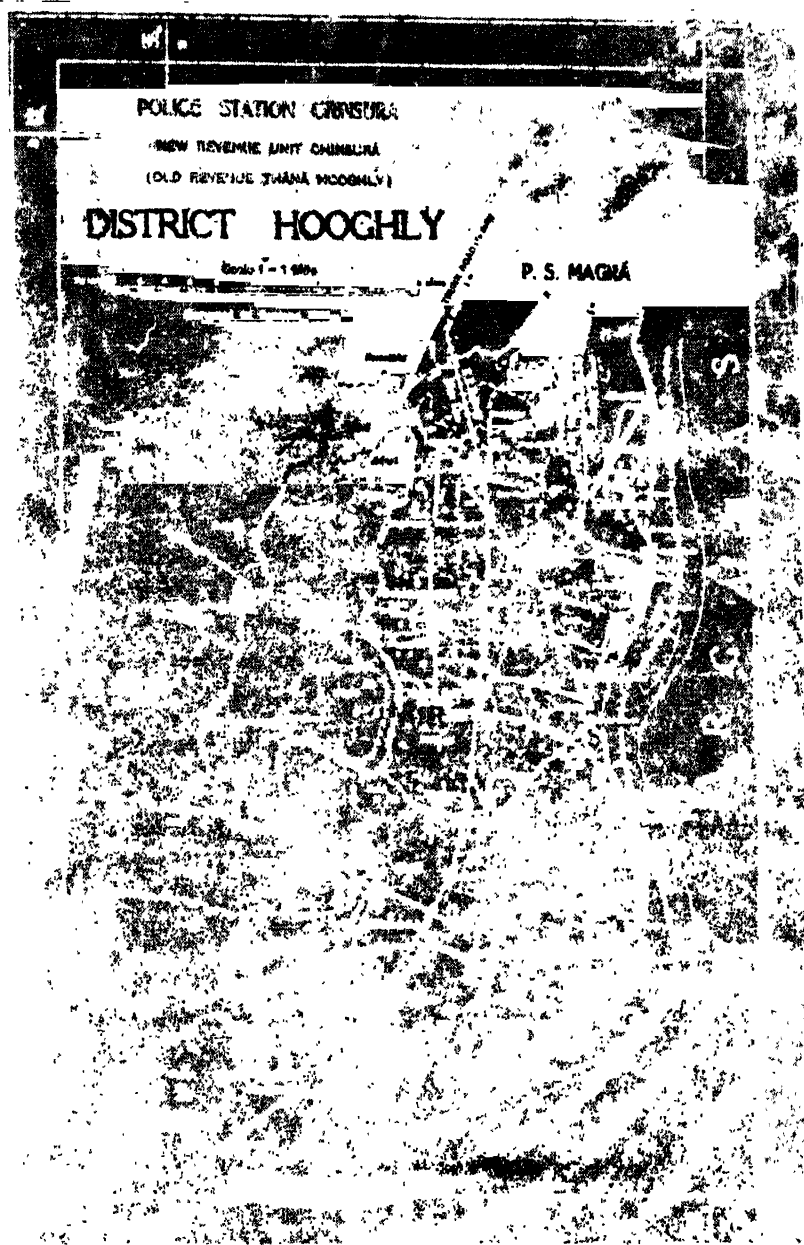
পরমাপ্রকৃতি সারদাদেবী
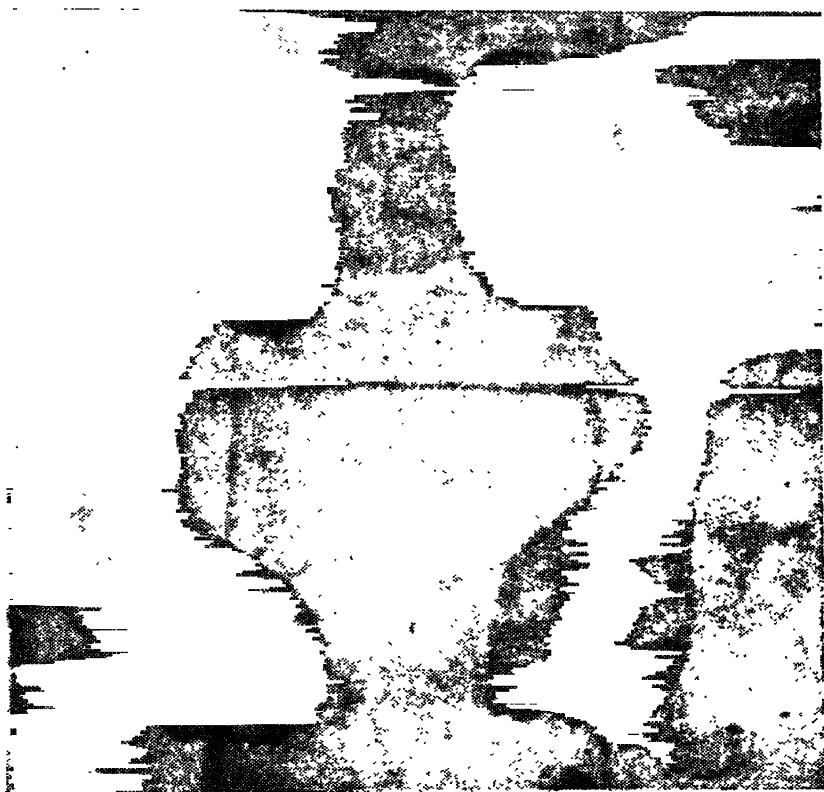
শ্রীশ্রীমায়ের পদচিহ্ন

উইলিয়াম কেরী

সেন্ট ওলাফস্ চার্চ (শ্রীরামপুর)

শ্রীরামপুর মিশন চার্চ